নব্যভারতের অষ্টম খণ্ডের সূচী।

নব্যভারত

(অষ্টম খণ্ড ।)

সাহেবীকরণের দিনে !

মানুষ যে পথে প্রতারিত হয়, সে পথে পুনঃ পা ফেলিতে সে কিছু সশঙ্কিত। কিন্তু আশার উত্তেজনা আবারও তাহাকে সে পথে লইয়া যায়, আবারও প্রতারণায় ফেলে। এইরূপ বারম্বার প্রতারিত হইলেও মানুষ আশার কুহকে আবার ভোলে। এ ভুল—মহাভুল। কিন্তু জীবন-মমতা থাকিতে এ ভ্রমের হাত হইতে কেহই নিষ্কৃতি পায় না। আশারও বিরাম নাই, ভুলেরও কূল কিনারা নাই। মানুষ দিবা-নিশি ভুল বুঝিয়া, ভুলে মজিয়া, ভুলকেই আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইতেছে! আশ্চর্য্য লীলা !!

দ্যূতক্রীড়ার ছলনায় ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির রাজ্যধন সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও বুঝিলেন না, প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত। আবার পাশার দান ফেলিলেন—ক্রমে আপনাদিগকে পর্য্যন্ত বনবাসী করিলেন। মহাভারতের এই প্রহেলিকার তবুও একটা মহা অর্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমরা যে কেন বারম্বার প্রতারিত হইয়াও পুনঃ সেই পথেই পা ফেলিতেছি, নিজেরাই বুঝি না। সময়ের ফের, মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি!

নূতন বর্ষ সমাগমে আবার সবলে হাল-খাতা বাঁধিলেন। নিকাশপত্রে দেখা গিয়াছে কেবল লোকসান;—কিন্তু তবুও আশার বাজার গরম হইয়া উঠিতেছে। মানুষ যত ঠকিতেছে, নূতন নূতন ভেল্কির উপায় উদ্ভাবনে ততই ব্যতিব্যস্ত হইতেছে। বুঝিতেছে না যে, প্রতারণার পরিণাম প্রতারণাই, কিন্তু তবুও ইহারই আশ্রয় লইতেছে। উপহারের চোটে সাহিত্যের বাজার গরম হইয়া উঠিতেছে। গতবৎসরে যে শূন্য পাইয়াছে, সে শূন্যের জোরেই আজ আবার আশার নব মাতোয়ারা। সংসার, বলিহারি তোর ভেল্কির কুহক !!

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কেন নিরাশাই বা কিসে? এদেশ যে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জাতীয় মহাসমিতির এই মহামেলার দিনে কেন আক্ষেপ কর? আশার কথা শুন, চাহিয়া দেখ, ভারত কত উন্নতির দিকে চলিয়াছে! আন্দোলনে ভারত যেন ইংরাজের কাছাকাছি হইয়াছে, আর ভাবনা কিসের?

একদিকে যতই আশার তুরি-ভেরির শব্দ শুনিতেছি, ততই আমরা গভীর নিরাশার মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছি। ২৭

আশা করিয়া মহাত্মা রিপণের প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্ব-শাসন আহ্বান করিয়াছিলাম, আজ তাহাতেও গাঢ় নিরাশার ছবি দেখিতেছি ,—প্রভুত্ব ঘোষণায়, আত্ম কলহে, নানা কূট তর্কে, ঝগড়া বিবাদে বৃথা দিন কাটিয়া যাইতেছে, সমষ্টিতেও দেশের উন্নতি হইতেছে না। এমন যে জাতীয় মহাসমিতি,ইহাও মনোমিলনের ক্ষেত্র না হইয়া এখন মনোভঙ্গের কারণে পরিণত হইতে চলিয়াছে ;—ভিক্ষানীতির ধুয়া এখন বিলাত পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে! এই অধঃপতিত জাতির আশা ভরসা উহাতেও বড় একটা দেখিতেছি না। আমরা দুটি প্রশ্নের মীমাংসা না পাইয়া ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছি। পৃথিবীর জাতীয় উন্নতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছি, জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন না করিয়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত পাই নাই। ধর্ম্মের উন্নতি সাধন না করিয়াও কোন জাতি পৃথিবীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহা স্থায়ী করিতে পারিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু ভারতে এ সকল কল্পনার স্বপ্ন বলিয়া উপেক্ষিত। আশা কোথায়?

সে দিন একখানি সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছিলাম, গত ১০ বৎসরে ইংরাজি ভাষা এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, আর আর সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আপন শিষ্যের সংখ্যা দ্বিগুণিত, ত্রিগুণিত করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইংরাজি ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ জাতির প্রভুত্ব পৃথিবীতে দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক ও রোমক; আধুনিক ফরাসি, মুসলমান, কি ইংরাজ, যে কোন জাতির কথাই বল না কেন, ধর্ম্ম ও ভাষার উন্নতির দিনেই এই সকল জাতির আধিপত্য দেখা যায়, এবং তাহার অপকর্ষের দিনেই অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ—দিন দিনই ধর্ম্মচ্যুত, দিন দিনই জাতীয় ভাষাচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন! এখন পাশ্চাত্য ধর্ম্ম,এখন পাশ্চাত্য ভাষা ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। শনৈঃ শনৈঃ এখন লোক সকল ইংরাজ অধিকৃত হইয়া পড়িতেছেন। কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, কি জ্ঞানে, কি সভ্যতায়—ভারতবাসী, শিক্ষিত ভারতবাসী,এখন ষোল আনা সাহেবী-কৃত! ইহা ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিয়া ফল নাই। তবে ইহা ঠিক যে, এ দেশের আপামর সাধারণ লোকশ্রেণী হইতে শিক্ষিত শ্রেণী,এখন ক্রমে ক্রমে বড়ই দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছেন। কি জ্ঞানে,কি সভ্যতায়, নিম্ন শ্রেণী হইতে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী দিন দিন বহু দূরে সরিতেছেন; কাযেই সহানুভূতির বাজারটায় দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই রহিয়াছে! ঢাকার "শক্তি" আক্ষেপেই করুন,আর যাহাই করুন, নিম্নশ্রেণীর রক্ষার জন্য "শিক্ষালয়" (School) কি "অর্থালয়" (Bank), কোন আলয়ই মধ্যবর্ত্তী লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ইহাকে যদি জাতীয়তা গঠনের প্রথম সোপান বলিতে চাও, বল। পর-মুখ-প্রত্যাশীর দলকে যদি ভারতগগনের-উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে অভিনন্দন দিতে চাও, এবং বাড়ীতে নিমন্ত্রণ সভা না গঠন করিয়া ম্লেচ্ছের হোটেলে সুরা-পূর্ণ গ্লাসের মধ্যে স্বাস্থ্য পানের ব্যবস্থা করিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিতে চাও, কর। আমরা এ সকলে কোন আশার কথা পাঠ করিতে না পারিয়া নববর্ষের প্রথমে কেবল নিরাশার ক্রন্দন তুলিয়া অস্থির হইতেছি! হিতৈষণা, তুই আমাদিগের জন্য একটুও আশা রাখিলি নে?

কাল আদমীর বুলি লইয়া যাদের ব্যবসা, এই ঘোর সাহেবীকরণের দিনে তাহাদের আর আশা ভরসা কোথায়? তোমার

কাল মুখের মলিন বুলি—W. C. Banerjeeই বল, এবং P. M. Mukerjeeই বল, পড়িতে বসিয়া আপন আপন গৌরব নষ্ট করিতে পারেন না! "বাঙ্গলা ভাষাটা রাখ কেন? ইংরাজি ভাষার ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়ার যতটা সম্ভব, আর কোন ভাষার তেমন সম্ভব নাই"—কত বে-নামী, অ-নামী লেখক, আমাদের সপিণ্ডীকরণ করিয়া, সঞ্জীবনী প্রভৃতি কংগ্রেস-প্রমুখ পত্রিকায় এই কথা ঘোষণা করিয়া "হাম বড়" বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হইতেছেন! সেই ভয়ে, বুঝিবা, প্রচার নীরব হইলেন, নবজীবন সভয়েও দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, যোগেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র—এখন নীরব ভাষার সাধন করিতে বসিয়াছেন! আর রমেশচন্দ্র আর্য্য ইতিহাস, সময় বুঝিয়া ইংরাজিতে লিখিতেছেন;—এবং কেহ কেহ রামায়ণ মহাভারতকে ইংরাজি করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন! উন্নতি ত এক দিকে হয় না;—সকল দিকেই সাহেবীকরণের ছটা! ইহাকেই প্রকৃত উন্নতি বলে। নব আমেরিকা, নব অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় ভারতবর্ষও নাকি জাতি ধর্ম্ম ভাষা ভুলিয়া একদিন স্বাধীন ইংরাজ হইয়া যাইবে! আমরা, এই প্রাচীন অধঃপতিত জাতি, মহাত্মা হার্বার্ট স্পেন্সরের (Survival of the Fittest) উপযুক্ততার মতের খাতিরে জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া ইংরাজের উদরস্থ হইয়া যাইব! তাই সাহেবীকরণের বাজারে আনন্দের রোল উঠিয়াছে!

বাঙ্গলা কাগজের গ্রাহক জুটে না; যাহার জুটে, সেও মূল্য পায় না। বাঙ্গলা কাগজ কেহ পড়ে না, যাহারা পড়ে, তাহারাও সাধারণের ঘৃণার জিনিস। বাঙ্গলা ভাষা আফিস হইতে উঠিয়া গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে না,—দেশের সভা সমিতিতে চলে না;—জাতীয় মহা সমিতিতে গ্রাহ্য নয়, বরং ঘৃণ্য; এমন বাঙ্গলা ভাষা যে পড়ে, সে ঘৃণার জিনিস হইবে না? জানি না, কোন্ আশায় জমীদার পঞ্চায়ৎ সভা এই চাষার ভাষা, এই অসভ্যদের ভাষাটা গ্রহণ করিয়া জাতীয়তা-হীনতা দেখাইয়া সাহেবীকৃত বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা হারাইতে বসিলেন! এই ভাষাতে যে কথা বলে, সে অসভ্য; যে পত্র লেখে, সে অসভ্য, যে বক্তৃতা করে, সে আরো অসভ্য! যে এই ভাষার পার্শ্বকর্তা করে, এই ভাষার সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্র পাঠ করে, বা কোন পুস্তক ক্রয় করে, সে ঘোরতর মূর্খ। এই জন্য একটা কথা উঠিয়াছে;—"বাঙ্গলা পুস্তক কিনি মেয়েদের জন্য!" কটকে একজন বন্ধুকে নব্যভারতের গ্রাহক হইতে বলায়, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "মেয়েদের জন্য বামাবোধিনী লইতেছি, তাহাই তাহারা পড়িয়া উঠিতে পারে না—তাহাদের আর সময় কই?" এই অত্যুদার ঘৃণার ভয়েই, বুঝিবা যাহারা পত্রিকা গ্রহণ করে, তাহারাও মূল্য দেয় না। এমন অপকর্ম্ম করিয়া কি লোকের নিকট বলা যায়!!

এ সকল কি অত্যুক্তি-প্রলাপ বকিতেছি? যাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানেন, তাঁহারা কখনও একথা বলিবেন না। তোমাদের হিতৈষী-শ্রেষ্ঠ প্যারীমোহন, ও বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া, মুন্সেফ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহাদের আমলাগণ পর্য্যন্ত, দুই দশজন বাদে প্রায় সকলেই, বাঙ্গলা ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে! যে দু পৃষ্ঠা ইংরাজি 'পড়িয়াছে' সেও; যে কখন ইংরাজি স্পর্শও করে নাই, সেও। ইহার পরিচয় এদেশে প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গ-দর্শন, আর্য্যদর্শন, প্রচার,

উঠিল কেন? বান্ধব, নবজীবন যায় যায় হইয়াছে কেন? পত্রিকার মূল্য যে আদায় হয় না, তাহার পরিচয়—"বঙ্গবাসীও উপহার খুব দিতে আরম্ভ করিয়াছেন!" এমন দেশ-ব্যাপী ঘৃণার স্রোত আর কোন দেশে কখনও দেখা যায় নাই। ধন্য সাহেবীকরণ!

ভাষাতে চূড়ান্ত সাহেবীকরণ দেখাইলাম। ধর্ম্মে কি সাহেবীকরণটা কিছু কম? একদিন মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, "এই কলিকাতায় এমন বড় লোক নাই, যিনি উইলসনের বাড়ীর খানা খান না।" ভাল মন্দ বিচারের ভার, পাঠকগণের হাতে; আমরা অবস্থাটাই জানাইতেছি। শশধর, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, কৃষ্ণপ্রসাদ—যে দেশের ধর্ম্মের তত্ত্বটাকে বক্তৃতার বিষয় করিয়া পাদরী সাহেবের ন্যায় ব্যবসা চালাইতেছেন; সে দেশের ধর্ম্ম কত দূরে যাইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, ভাবাও কঠিন। আমরা এই সকল মহাত্মাদের প্রতি ঘৃণা দেখাইতেছি না; তবে এই কথা বলিতেছি, ধর্ম্মটাকে বক্তৃতার আসরে নামাইয়া ইঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অগৌরব করিতেছেন; অধিকারী ভেদে উপদেশ দেওয়ার অমূল্য তত্ত্বকে ডুবাইয়াছেন;—ধর্ম্মকে বৃথা হুজুগে পরিণত করিয়াছেন! ফল যাহা হওয়ার, খুব হইতেছে;—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা—পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থাকেও কেহ কেহ উন্নতির অবস্থা বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন! মোটের উপর কি হইতেছে, কেমনে বলিব? কিন্তু এ কথা বলিতে পারি যে, আমরা দিন দিন চরিত্রহীন হইয়া এক অপকৃষ্ট জীবের সৃষ্টি করিতেছি। যাক্, সে সকল দুঃখের কাহিনী বলিয়া আর কাজ কি?

এইরূপ ঘোরতর সাহেবীকরণরূপ নিরাশার ঘনঘটার মধ্যে পড়িয়াও নব্যভারত কি—আশায় রহিয়াছে? ১২৯৬ সালের গভীর শোকের পরও আবার মাথা তুলিতেছে কেন? কেহ কেহ এই প্রশ্ন তুলিতে পারেন। যে দেশে ভাল কাজেও সহানুভূতি প্রকাশ করিবার বন্ধু জুটে না, কর্ত্তব্য-পালনে একটু সাহায্য মিলে না, চরণ ধরিলেও প্রসন্ন মুখের হাসি টুকুও উপহার পাওয়া যায় না, সে দেশে আবার এই "নব্যভারত" থাকে কেন?—উত্তর,—ইহাও মহাভুল!

মহামতি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, বুঝিয়াও ফিরিতে পারেন নাই;—আমরা কর্ত্তব্য-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, বুঝিয়াও ফিরিতে পারিতেছি না। ফিরিয়া দাঁড়াই বা কোথা? যদি ধর্ম্ম যায়, ভাষা যায়;—ভারতের আর বাকী থাকে কি? কি লইয়া থাকিব? কার মায়ায় থাকিব? বুঝিতেছি, দিন দিন সাহেবীকরণেরই জয় হইতেছে, তবুও একটু একটু আশার কুহকে না মজিয়া পারিতেছি না। কালে আমরা কেহই থাকিব না—জানি; কিন্তু আজই নব্যভারত তুলিয়া দিতে পারিতেছি না। এ এক মহা ভ্রান্তির ঘোর! ধন জন প্রাণ—সব এদেশের কর্ত্তব্য-পালনে ফেলিয়া দিয়া শেষে পলায়ন করিব! কন্যা শোকের দারুণ আঘাতে, সাহেবীকরণের গভীর নিরাশার কশাঘাতে, বন্ধুবান্ধবগণের সহানুভূতি ও দয়া-শূন্য এই কর্ত্তব্যরূপ মহাশ্মশানে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, সকল তীব্র বাণ সহ্য করিয়া করিয়া শেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। নব্যভারত তারপর আর মাথা তুলিবে না; সেই দিন—সাহেবীকরণের ষোল কলা এই ভারত-শ্মশানে রাজত্ব করিবে। সেই দিন "বঙ্গবাসীর" গভীর হাহাকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কাহারও চক্ষে আর বিন্দুমাত্র জলও পড়িবে না; হার্বার্ট স্পেন্সার সাহেবের জয় জয় কারে চতুর্দ্দিকে পরিপূর্ণ হইবে।

ধর্ম্ম।

পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দু, এই চারিটীই প্রধান। বয়সে হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ, ঋষিরা ইহাকে মানব ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তদপেক্ষা তরুণ বৌদ্ধ, তদপেক্ষা খ্রীষ্টান ও সর্ব্বাপেক্ষা মুসলমান। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই সংস্থাপনকর্ত্তাদিগের এই অভিপ্রায় ছিল যে, ক্রমে ক্রমে সমগ্র মানব জাতি তদীয় ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে, জগতে আর বৈষম্য হইবেনা, বা থাকিবে না, কিন্তু ঘটনার কি কুচক্র! কাহারও উদ্দেশ্য সফল হয় নাই, প্রত্যেক সাধু চেষ্টায় মানুষ যেন স্পর্দ্ধা করিয়া নূতন নূতন ভেদ উদ্ভাবন পূর্ব্বক সেই সেই ভেদ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

এক্ষণ পৃথিবীর জন সংখ্যার যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি রেল, ষ্টীমার ও টেলিগ্রাফের প্রসাদে সমস্ত মানব জাতি বহুল পরিমাণে এক পরিবার ভুক্ত হইয়া পড়িতেছে। আমেরিকা, আফ্রিকার প্রশ্নের উত্তর করিতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টার চিনকে কাপড় পরাইতেছে। জ্ঞানের চর্চ্চা খরতর বেগে চলিতেছে; চিনবালক আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেছে, অষ্ট্রেলিয়ার লোক বার্লিনে যাইয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে। একই ব্যক্তি একবৎসরের মধ্যে কিয়ৎকাল নিউইয়র্কে, কিয়ৎকাল জেডোয় ও কিয়ৎকাল কলিকাতায় বক্তৃতা দিতেছে। ইহাতে মতামতের যে একটা অদ্ভুত ঝটিকা উপস্থিত করিয়াছে, তাহার ফলাফল অনুমান করা সহজ নহে।

মানব জাতি স্বভাবতঃ বড়ই স্থিতিশীল; সুন্দর হইলেও একটা পরিবর্ত্তের প্রস্তাব করিলেই অমনি কেহ তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না, যদি তাহা চাহিত, তাহা প্রত্যেক নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের উন্মাদিনী ভাষা ও স্বর্গীয় প্রকৃতিতে জগৎ গলিয়া এতদিন এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া যাইত। আজ মত সম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া যে ঝটিকা বহিতেছে, তাহাতে অতীত দেখিয়া ভবিষ্যতের অনুমান না করিয়া অনেকে আশা করিতেছেন যে, কাল ক্রমে সমগ্র পৃথিবী এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে, কিন্তু সেই এক ধর্ম্ম কোন্ ধর্ম্ম হইবে, এবং সেই ধর্ম্মোপদেষ্টা জগৎ গুরুর কোন দেশে আবির্ভাব হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এসিয়াই এপর্য্যন্ত জগতের গুরুত্ব করিয়া আসিয়াছে; ইউরোপ বল, আমেরিকা বল, আফ্রিকা বল, সকলেই এসিয়ায় শিষ্য, কিন্তু সেই এসিয়ার অবস্থা এখন শোচনীয়! যে ভারতবর্ষ নিঃসৃত ধর্ম্ম এক্ষণও পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের অবলম্বন, সেই ভারতবর্ষ এক্ষণ ইংলণ্ডের কুক্ষিগত। ভারতসন্তান সব জীর্ণ শীর্ণ; ফেরুপালের ন্যায় ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; মস্তকে মনীষা নাই, হৃদয়ে তেজ নাই, বিজয়ীদিগের এরূপ অনুগত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদিগের চা'লে চলিতে, তাহাদিগের খানা খাইতে ও তাহাদিগের পরিচ্ছেদ পরিতে অসীম প্রীতি অনুভব করিতেছে। এই প্রকারের ভবিষ্যৎ, অন্ধ অবিমৃষ্যকারী, কেন্দ্র ভ্রষ্ট প্রায় সমস্ত উচ্চ

লোক। তারপর ভারত কেবল যে পরাধীন, এমত নহে। বিভক্ত লম্বোদর গজানন পুঞ্জকে বক্ষে ধারণ করিয়া একরূপ অধিকারীশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ ইংরেজের অধীনে আছে, অতঃপর রুস লইবার জন্য শাসাইতেছে; কিছুদিন রুসের পরিচর্য্যা করিলে পর জার্ম্মানি ফরাসী প্রভৃতি অপরাপর প্রতাপান্বিত জাতিরা যে কিছু কাল আধিপত্য না করিয়া ছাড়িবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? যে জাতি এরূপ পরসেবায় নিরত, পরপদানত, তাহার দ্বারা জগতের ধর্ম্ম-সমীকরণ সম্ভবনীয় কি?

মুসা, যীশু ও মহম্মদের জন্মদাতা আরব তুরস্কও এক্ষণ ওষ্ঠাগতপ্রাণ; ইউরোপে তাহারা "রুগ্ন" নামে অভিহিত; রাজ্যের উত্তরের কথকাংশ রুস লইয়াছে, দক্ষিণ পশ্চিমের একটা বৃহৎ অংশ ইংরেজ প্রায় উদরস্থ করিয়াছে; বিনাদোষে আমির শেরআলিকে লর্ড লিটন নষ্ট করিল,আমরা তাহাকে প্রাণ ভরিয়া অভিনন্দন দিলাম। কাল যদি শুভ্র বীর সমস্ত তুরুস্ক গ্রাস করেন, তাহাতে অভিনন্দন দিব না কি? তুরস্কের এইরূপ শোচনীয় দশা; চীন আত্মরক্ষণে সমর্থ হইলেও একটা সম্ভ্রান্ত শক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কারণ, কাল তাহার শরণাগত থিবকে বিনাপরাধে ইংরাজে মারিয়া খাইল, চীন চাহিয়াও দেখিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত; বৌদ্ধেরা হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করাতে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ব্যবহারের দোষে ইংরেজেরা আমেরিকা হইতে নিষ্কাসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ইংরেজ ও আমেরিকার ধর্ম্মের কোন বৈষম্য ঘটে নাই, বরঞ্চ সময়ে সময়ে প্রগাঢ় বন্ধুতা দৃষ্ট হইয়াছে, এজন্য অনুমান করি, বৌদ্ধের সহিত হিন্দুর মনোমালিন্য এখন নাই; তাহারা তীর্থ দর্শনে গয়ায় আসিয়া অনেক হিন্দুর নিকট যত্ন পাইয়া থাকে। তুরস্ক, পারস্য, আফগান, ইহারাও একধর্ম্মী, ইহাদিগেরও যথেষ্ট বন্ধুতা আছে। দুটী প্রবল এসিয়া-বাসী জাতির একত্র সমাবেশ হইয়াছে। ইহা এসিয়ার পক্ষে একটী অতিশয় উজ্জ্বল ভাবী-শুভ চিহ্ন হইতে পারে, এজন্য আমি কেবল স্বদেশের ভাবনা ভাবিতে ইচ্ছা করি; আমার স্বদেশীয়দিগকেও আমি গললগ্নকৃত বাসে এই পথের পথিক হইতে অনুরোধ করি।

মহাসমুদ্রের নিকট নদী সকল যেমন তুল্য, ঈশ্বরের নিকটও নানা ধর্ম্ম তদ্রূপ। এক বৃষ্টির জল কূপে, সরোবরে ও নদীতে পড়িয়া কূপোদকাদি নানা প্রকার নাম ধারণ করে, কিন্তু সেই জল যখন সৌরকরে পরিশুদ্ধ হইয়া বাতাসভরে ঊর্দ্ধে গমন করে, তখন তাহার নাম-ভেদ বৈষম্য থাকে না; ধর্ম্ম ও সেইরূপ শ্রেণীবিশেষকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু পরিশুদ্ধ হইলে তাহারও নাম-পার্থক্য থাকে না, সুতরাং কোন ধর্ম্মের দোষ-সংস্কারের যে আবশ্যক হইয়াছে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না: আবশ্যক হইয়াছে, ব্যক্তিদিগের আত্ম-সংস্কারের। আমি ইহা অবগত আছি যে, ধর্ম্মভেদ হইতে সৌহার্দ্দের বাধা জন্মিয়াছে, অপরাধী স্বধর্ম্মীকে লোকে যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে, নির্দ্দোষ বিধর্ম্মীকে সেরূপ করে নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই ব্যক্তিদিগের

স্বভাবের দোষ; ধর্ম্মের দোষ নহে। কারণ অপরাধীর সাহায্য করিতে কোন ধর্ম্মের অনুমতি নাই।

কিন্তু ব্যক্তিদিগের সংস্কার সাধন করা সহজ ব্যাপার নহে, এজন্য মহাত্মা রামমোহন রায় জগতের ধর্ম্ম সকলের সন্ধিস্থান অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অবতারণা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মহাত্মা নানক চৈতন্যও ঠিক সেই উদ্দেশ্যে শিখ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ও শিখের উন্নতি এখন রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা একটী অখণ্ডনীয় সত্য যে, কোন ধর্ম্ম-সংস্থাপকই একাকী সেই ধর্ম্মের পূর্ণাবয়ব গঠন করিতে সমর্থ হন নাই। মার্ক, লুক, জন না আবির্ভূত হইলে যীশুর নাম কেহই শুনিতে পাইত না, আবুবেকের, ও ওমর প্রভৃতি না হইলে মহম্মদের নাম লোপ পাইত। চৈতন্য ও গুরুগোবিন্দের বংশ পরম্পরায় যদি তাহাদিগের সদৃশ ধর্ম্মভাবাপন্ন, মহাপুরুষের আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে তত্তৎধর্ম্মের অধিকার নিশ্চয়ই প্রসারিত হইত। ব্রাহ্মধর্ম্ম একরূপ সদ্যজাত ধর্ম্ম, এখনও উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গঠিত হয় নাই, কি ভবিষ্যৎ উহার অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা আমি অনুমান করিতে সাহস করিনা; কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদি রামমোহন রায়ের শিষ্যদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর কেশব বাবুর ন্যায় উপযুক্ত শিষ্যের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে উহা বিস্তার লাভ করিতে পারিবে; কিন্তু যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে কালক্রমে উহার শিখ বৈষ্ণবাদি শ্রেণীভুক্ত হওয়া কেহই নিবারণ করিতে পারিবেন না।

মুসলমান ধর্ম্ম নিরাকারবাদের লীলাভূমি, কিন্তু কোরাণে সাকার কল্পনার আভাস ও স্পষ্টতঃ দেবতাদির কল্পনা আছে। সুরা এরাকের ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "পরমেশ্বর ৬ দিবসে স্বর্গলোক ও ভূলোক সৃজন করিয়াছেন ও তৎপরে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন।" আবার ঐ সুরা এরাকের ৪৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "স্বর্গ নরকের মধ্যে এরাকের (বিযোজক ক্ষেত্র বা প্রাচীরের) উপরে পুরুষ সকল আছেন, তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁহার কর্ম্মানুসারে চিনিবেন এবং স্বর্গবাসের যোগ্যদিগকে সলাম করিবেন।" এই পুরুষ সকল অবশ্যই দেবলোক। তার পর "জিবরিল" (স্বর্গের কর্ত্তা), "মেকাইল" (শস্যের কর্ত্তা), "এছরাকিল" (কেয়ামত জানাইবার জন্য শৃঙ্গহস্ত পুরুষ), "বদর" (জলস্থলের কর্ত্তা), "মালাক" (নরকের কর্ত্তা), ইহারাও ফেরেস্তা অর্থাৎ দেবতা। "আজাজিল" (শয়তান) বোধহয় হিন্দুশাস্ত্রের অবিদ্যা। এতদ্‌ভিন্ন মহম্মদ, ইব্রাহিম প্রভৃতি নবী ও অনেক পীর প্যাগম্বরের উল্লেখ আছে।

হিন্দুশাস্ত্রে পাঁচ প্রকারের উপাসনা নিরূপিত আছে; মুসলমানদিগেরও ঠিক সেইরূপ কার্য্য দেখিতে পাই, যথা;—

(১) অভিগমন, অর্থাৎ দেবমন্দিরের মার্জ্জন ও অনুলেপন। মুসলমানেরা জুম্মা ঘর মার্জ্জন ও অনুলেপন করিয়া থাকেন।

(২) উপাদান—গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজন; মুসলমানেরা তণ্ডুল, দুগ্ধ মিষ্টান্নাদির আয়োজন করিয়া থাকেন।

(৩) ইজ্যা—পূজা—মন্ত্র দ্বারা পুষ্প ও অন্যান্য উপকরণের

সমর্পণ। মুসলমানেরা মন্ত্রদ্বারা পূজোপকরণ সমর্পণ করিয়া থাকেন।

(৪) স্বাধ্যায়—শাস্ত্রপাঠ, মুসলমানেরা শাস্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন।

(৫) যোগ—দেবতানুসন্ধান; মুসলমানেরা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

কোরাণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, মহম্মদের ঈশ্বর ভক্তি দেখিয়া না আর্দ্র হয়,এরূপ পাপাত্মা-ভূতলে নাই; প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাঁহার অসীম দয়া ও অনন্ত শক্তির কথা,হৃদয়ের অন্তস্তলীর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে পৃথিবীতে যদি কেহ ঈশ্বরকে জানিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মহম্মদ সেই পরম-সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষদিগের একজন। যে আর্য্য শাস্ত্র শুক নারদাদি ভক্ত চূড়ামণিদিগের গৌরব মালায় পরিপূর্ণ; ভক্তপ্রবর মহম্মদের নাম সেই শাস্ত্রে সন্নিবেশিত করিবার উপযুক্ত।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে"

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ঈশ্বরের জীবত গ্রন্থ! ইহার সহিত মিশাইয়া শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। বাক্‌পাণি পাদ ও পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী মনুষ্যের কর্ম্মেন্দ্রিয়, অর্থাৎ ইহা ব্যতিরেকে মনুষ্য কর্ম্ম করিতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর ইহার অভাবেও কর্ম্ম করিতে সমর্থ। যথা শ্রুতি—"আপনি পাদো জবনো গৃহীতা, পশ্যত্য চক্ষু স শৃণোত্য কর্ণঃ স বিশ্বং বেত্তি,নহি তস্য বেত্তা, তমাহু রাজ্যঃ পুরুষ প্রধানম।" আমরাও দেখি, তাঁহার বায়ু বিনাপদে মহীতলে ভ্রমণ করিতেছে, তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ বিনাহস্তে ফল ফুল টানিয়া লইতেছে, তাঁহার তাড়িত বিনাহস্তে ভূমণ্ডলে সংবাদ সকল বিতরণ করিতেছে। তিনি অবশ্যই এ সকল নহেন, কারণ আমরা ইহাদিগের হ্রাসবৃদ্ধি অনুভব করিয়া থাকি, সুতরাং ইহারা অন্য পদার্থ। তবে অপানি পাদো—ইত্যাদি কাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে? ঐ বায়ু, তেজ ও মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপক যে শক্তি, সেই শক্তির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, সেই শক্তিই ঈশ্বর। যিনি ঐ ক্ষুদ্র সকল কণাকে দৃঢ় ভাবে সম্বদ্ধ রাখিয়াছেন, তিনিই এই মহীতলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনিই এই সৌরজগতের নিয়ন্তা ও অনন্তব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা।

এক্ষণে কথা হইতেছে, সেই শক্তির স্বরূপ কি? যদি ধরাতলে কেহ এই শক্তির তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান মানবজাতির আদিপুরুষ মহর্ষিগণ; আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা আমাদিগের প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র ও দর্শনাদি নানা শাস্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন; অতএব আমরা তাঁহাদিগের শাস্ত্রেই শক্তিতত্ত্ব অন্বেষণ করিব।

শ্রুতি বলেন—

একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষীচেতঃ, কেবলোনির্গুণশ্চ।

সকলের আদিবীজ তিনি, যিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ও সর্ব্বব্যাপী, কর্ম্মের অধ্যক্ষ, চিত্তের সাক্ষী অথচ নির্গুণ।

এই আদিবীজকেই অন্যান্য শাস্ত্রে ত্রিগুণাতীত নির্লিপ্ত কূটস্থ চৈতন্য বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; ইঁহার স্বরূপ চিন্তার অতীত, মনের অকল্পনীয় ; ইনিই সেই বেদোক্ত তুরীয়াতীত ব্রহ্ম ; শ্রুতিতে যাঁহার সম্বন্ধে "যতঃ বাচঃ নিবৰ্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" উক্ত হইয়াছে, ইনিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম।

ঋষিরা এই নির্গুণ ব্রহ্মকে উপাসনার অবিষয় বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যাঁহারা যোগ শাস্ত্রোক্ত সংযমী নির্বিকল্প সমাধির অধিকারী, তাঁহারাই তাঁহার সত্তা অনুভব করিতে পারেন।

এই নির্গুণ ব্রহ্মের দুট ভাব আছে, (১) পুরুষভাব; (২) প্রকৃতিভাব। এই প্রকৃতিকেই বেদান্তে পরমাণু ও পাতঞ্জলে মায়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিগুণের উৎপত্তি হয় ; এবং প্রকৃতি পুরুষ এই উভয়ের যুক্তক্রিয়ায় এই ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। প্রকৃতি গুণের আশ্রয়, সুতরাং সগুণ ; পুরুষও প্রকৃতির সহিত জড়িত, সুতরাং সগুণ, কিন্তু আশ্রয় দোষে সগুণ বলিয়া নিজে সগুণ নহে। গীতায় মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃত সম্ভবান।"

মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমান বৃক্ষং পরিষস্ব জাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলংস্বদ্বত্ত্যশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।"

অর্থাৎ সুন্দর পক্ষ যুক্ত দুইটী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহার একটী পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মজন্য ফলভোগ করেন, অন্যটী নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন মাত্র করেন।

প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম অবশ্যই সগুণ ব্রহ্ম ; নির্গুণ ব্রহ্মের যখন উপাসনা হয় না, তখন সগুণ ব্রহ্মই আমাদিগের উপাস্য ঈশ্বর। আমরা জগতে (মাধ্যাকর্ষণে, তাড়িতে ও অন্যান্য পদার্থে) যত প্রকার শক্তি দেখিতে পাই, সে সমুদয়ই গৌণভাবে সেই নির্গুণ ব্রহ্মাত্মক কিন্তু মুখ্যভাবে প্রকৃতি পুরুষাশ্রিত। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন আমাদিগের দুরধিগম্য, তখন এই জগতের অব্যবহিত কারণ স্বরূপ প্রকৃতি পুরুষরূপী ঈশ্বরকে (আল্লাকে বা গডকে) উপাসনা করা ব্যতিরেকে আমাদিগের গত্যন্তর নাই। এই সমন্বিত প্রকৃতি পুরুষই বেদে "আত্মা" শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। তাহাকে কি প্রকারে লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ; যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূস্বাং।"

অর্থাৎ প্রবচন, মেধা বা শ্রুতি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, যে তাঁহার প্রার্থী হয়, তাঁহারই নিকটে তিনি স্বীয় রূপ প্রকাশ করেন।

অতএব এক্ষণ কথা হইতেছে এই, আমাদিগের প্রার্থী হইতে হইবে কি প্রকারে? সেই প্রকৃতি পুরুষ সমন্বিত ব্রহ্ম অবশ্যই নিরাকার। আমি শব্দে কখনই আমার এ দেহ নহে। যখন জন্মের পূর্ব্বে এ দেহ আমার ছিল না, মৃত্যুর পরেও আমার থাকিবে না, তখন এই দেহ কদাচ আমি হইতে পারি না। আরও ইহা দ্রষ্টব্য যে, দৃশ্য ও দ্রষ্টা কখনও এক হইতে পারে না। আমার এই হস্ত আমি দেখিতেছি ; দেখিতেছে যে সে কখনও হস্ত হইতে পারে না, অতএব যে দেখিতেছে সেই আমি

অর্থাৎ জীবাত্মা। পুরুষপ্রকৃতি স্বরূপ আত্মাকে এই জীবাত্মার জানিতে হইবে। কিন্তু নিরাকার আত্মাকে আমি কি প্রকারে জানিব ?

এ বিষয় চিন্তা করিবার পূর্ব্বে একবার জীবাত্মার জ্ঞানের সীমা সকল পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মনের যে জ্ঞান আছে, জীবাত্মারও সেই জ্ঞান আছে; কিন্তু মনের সমস্ত জ্ঞানই এই শরীরের দ্বারা লব্ধ। যাহা শরীর দেখায় নাই, শুনায় নাই, জানায় নাই, মন তাহা জানে না, সুতরাং জীবাত্মার বর্ত্তমান জ্ঞান সকলই সাকার-লব্ধ. কিন্তু জ্ঞান যত সকলই নিরাকার, অতএব প্রতিপাদিত হইতেছে যে নিরাকার জীবাত্মা নিরাকার জ্ঞান লাভ করিয়াছে সাকার দেহের দ্বারা।

আবার দেখা যাউক, নিরাকার আত্মজ্ঞান ভিন্ন জীবাত্মা অন্য কোন নিরাকারের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে কি না এবং যদি করিয়া থাকে. তবে তাহা লাভ করিয়া থাকে [illegible] অনুসন্ধানে দেখা যাই- [illegible] সুগন্ধ, সুস্বাদ, সুস্বর, [illegible] প্রকার নিরাকার দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে এবং তাহা লাভ করে তত্তৎগুণের আধার স্বরূপ দ্রব্যের দ্বারা, অতএব নিরাকার আত্মজ্ঞান তদুপযোগী সাকার ব্যতিরেকে লাভ হইতে পারে না।

এক্ষণ কথা হইতেছে, আত্মজ্ঞানের উপযোগী সাকার কি ? আত্মজ্ঞানত প্রকৃতি পুরুষরূপী এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত; এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকারে অবলম্বন করা যাইতে পারে ? সুতরাং অবলম্বনীয় হইতেছে ইহার কোন একটী অংশ; সেই অংশ মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর কাষ্ঠ, অগ্নি, বিষ্ঠা, গোবর, গুল্ম, জীব, লতাদি, সকলই হইতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত বস্তু অবলম্বন করিতে হইলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে কতকগুলি বিভৎরসাত্মক দাহকরী, ক্ষয়শীল, বিকৃতিপ্রবণ, সুতরাং যে সকল দ্রব্য এ প্রকারের দোষাশ্রিত, তাহা অবশ্যই বর্জ্জনীয়। ঐ সকল বাদ দিলে রহিল মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর ও সারবান কাষ্ঠ সকল। আশ্বালায়ন গৃহ্য সূত্রের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের তৃতীয় সূত্রে পূজ্য দ্রব্যের এই সকল গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "দারুজা কামদা; সৌবর্ণা ভক্তি মুক্তিপ্রদা; রাজতা স্বর্গদা; তাম্রময়ী আয়ুবর্দ্ধিনী; কাংস্যা আপদ্ধর্ত্রী, পৈতলি শত্রুনাশিনী; শৈলাসর্ব্বভোগপ্রদা, স্ফাটিকী দিপ্তীদা; মৃণ্ময়ী মহাভোগপ্রদা।

মূর্ত্তি বা প্রতিমা বলিলে দ্রব্য বুঝিতে হইবে, সেই দ্রব্য পিণ্ড, বর্ত্তুল বা দেহাকারে গঠিত হওয়াতে কোন ইতর বিশেষ নাই। আবাহন বিসর্জ্জন সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহারা বলেন "সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে আবার আহ্বান কেন ?" ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে দুইটী উক্তি আছে, ইহার কোনটীকেই কেহ মিথ্যা বলিতে পারেন না।

(১) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম

(২) যতঃ ইমানি ভুতানি যায়ন্তে

যখন দ্বিতীয়টী উক্ত হয়, তখন ভুত হইতে তাঁহাকে পৃথক্ ভাবা হয়; ইচ্ছা করিলে তিনি যে পৃথক্ হইতে পারেন না, ইহা কে বলিতে পারে ? সুতরাং সেই পৃথক স্থলে আবাহন দূষনীয় হইতে পারে না। স্থিরতর মূর্ত্তির প্রতি আবাহন বিসর্জ্জন

নিষিদ্ধ, কারণ একবার আবাহন করা হইয়াছে।

ধর্ম্ম সাধনের যে প্রবল বাধা কি, তাহা আজ কালকার লোকের জানিবার সুবিধা নাই, কারণ ধর্ম্ম এক্ষণ লোকের ওষ্ঠাগ্রে কিম্বা লেখনীর উপান্তে অবস্থিত; নির্দ্দোষ বক্তৃতা দিতে কিম্বা নির্দ্দোষ প্রবন্ধ লিখিতে পারিলেই ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধাম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়া যায়, কোন অনুষ্ঠানের আবশ্যক করে না। এজন্য ধর্ম্ম সাধনের বাধা জানিবার কোন উপায় নাই, কিন্তু ধর্ম্মের বর্ণ পরিচয় যিনি অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিও ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, সুদৃঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাস লাভকরা একটী অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। আজ যিনি ঘোর আস্তিক তিনি কাল যে ঘোর নাস্তিক হইবেন না, ইহার নিশ্চয়তা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। প্রবলতর তার্কিকের পাল্লায় পড়িয়া পরিবর্ত্তিত হইতে সচরাচর দেখা যায়, ইহা ব্যতীত মনের বিচারে নিজে পরিবর্ত্তিত হওয়াও কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই প্রকারের মত বিপর্য্যয়ের শঙ্কট পিতামহেরাও অবশ্যই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং নিশ্চয়ই এই রকমের পর্য্যায় নিবারণের নিমিত্ত সাধনার সোপান স্বরূপ কর্ম্ম কাণ্ডের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" অর্থাৎ সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্ম নিজেই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। পৃথিবীর লোকে হিন্দুর ছত্রিশ কোটি দেবতা শুনিয়া হাসে, কিন্তু প্রত্যহ আমরা চক্ষু সমীপে ব্রহ্মের যে কোটি কোটি বিকাশ-স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহা দেখিয়া কেহ হাসে না। সে যে মূর্ত্তিতে তিনি এ পর্য্যন্ত মানব জাতিকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তন্ত্র তাহার শতাংশের একাংশও বর্ণনা করিতে পারে নাই। এক্ষণও ভক্তেরা স্বপ্নযোগে কত মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন, তাহা তুমি আমি মিথ্যা বলিলে ভক্ত শুনিবে কেন?

উপাসনায় সাকারের আবশ্যকতা অস্বীকার করা অতিশয় সহজ ব্যাপার, কিন্তু যে ঋষিরা ব্রহ্ম নিরূপণের পরাকাষ্ঠা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মের নিরাকার নির্গুণ ভাব [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা [illegible] সাকারোপাসনার ব্যবস্থা দিলেন, ইহ[illegible] চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। বেদে সাকারবাদ নিরাকারবাদ, দুইই আছে।

ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টমাষ্টকে "দুর্গেষু বিষম ঘোরে, সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে

অগ্নিচৌর নিপাতেষু, দুষ্টগ্রহ নিবারণে

দুর্গেষু বিষমেষু ত্বাং সংগ্রামেষু বনেষুচ

মোহয়িত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ংকুরু।"

যজুর্ব্বেদে শিব অম্বিকার উল্লেখ আছে। কেনোপনিষদে "উমা হৈমবতী", মুণ্ডকোপনিষদে "কালী করালী" কৈবল্যোপনিষদে "উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং", তৈত্তিরীয় আরণ্যক "উমাপতয়ে" আত্মপ্রবোধোপনিষদে "নারায়ণায় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরায়" আছে।

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মমতের ব্রাহ্ম ও হিন্দুমতের ব্রাহ্ম তত্ত্বজ্ঞানে তুল্য পদবীস্থ কিন্তু ব্রাহ্মমতের ব্রাহ্মকে সাধনাপথে অনেক গুপ্ত বিবের পড়িতে হয়, সময় সময় পথ হারাইয়া অন্ধকারে হাতড়াইতে হয়। কিন্তু হিন্দুকে যে পথে যাইতে হইবে, তাহা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, সে পথ বহু সাধুজন পৃষ্ঠ পদে পদে উপদেশপূর্ণ প্রশস্ত রাজপথ। অন্য ধর্ম্মীরও সেপথ অবলম্বনের কোন বাধা নাই।

হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য সকল ধর্ম্মের অবলম্বী-দিগের মানুষ ফুসলইয়া নিজধর্ম্ম লইবার রীতি আছে; নিউটেষ্টামেণ্টের সেণ্টমাথুর অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৩য় প্যারায় জনসাধারণকে ব্যাপটাইস হইবার উপদেশ আছে, আর বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতিরেকে মুক্তি নাই। স্থরা আলো এমরাণের ৮৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "যে ব্যক্তি এছলাম ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম অন্বেষণ করে, তাহার সেই ধর্ম্ম গৃহীত হইবে না, সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্ত-দিগের একজন।" হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ কোন উক্তি দেখিতে পাই না; হিন্দু সমাজেরও অন্য ধর্ম্মকে প্রবেশ করাইবার প্রশস্ত পথ নাই। হিন্দুর ইহাই ইচ্ছা যে, মুসলমান উত্তম মুসলমান হন, খ্রীষ্টান উত্তম খ্রীষ্টান হন, হিন্দু উত্তম হিন্দু হন। এ সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাস গীতায় বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বানুষ্ঠিতাৎ"
"স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং"

মনু বলিয়াছেন,

"যেনাস্য পিতরোজাতা যেন জাতা পিতামহা
তেন যায়াৎ সতাংমার্গং তেনগচ্ছন্নরিষ্যতি।"

অর্থাৎ পিতৃ পিতামহগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে গেলে কেহ দোষভাগী হয় না। স্বধর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা স্বজনের মনস্তাপ সংঘটন করিবার বিশেষ কোন আবশ্যক দেখা যায় না। এবিষয়ে ব্যাস বলেন,—

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ
সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতঃ।"

মানুষ লইয়া টানাটানি করাটা নিশ্চয়ই কলুষিত কালের লক্ষণ; এক্ষণ নিজে বুঝিবার অপেক্ষা অন্যকে বুঝাইবার আবশ্যক অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিজের মুক্তিলাভ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণ যেন কেবল অন্যকে মুক্ত করিতে পারিলেই কার্য্য সমাধা হয়, পাদরীদিগের উদ্দেশ্য এই কি? না, ইহার নাম রাজনৈতিক-ক্ষেত্রের সহিত ধর্ম্মক্ষেত্রের একীকরণ! ঈশ্বর লইয়া যুদ্ধ হইলে যাহারা ন্যূন সংখ্যক, তাহারা পরাস্ত হইয়া নিরীশ্বর হইয়া যাইবে, এ ভয় নয় ত? কেমন করিয়া জ্ঞানবান্ লোকেরা এরূপ কার্য্যের অনুমোদন করেন, তাহা আমরা বুঝিনা; আমরা উত্তম স্বধর্ম্ম নিরত লোক দেখিলেই আনন্দিত হইতে ইচ্ছা করি এবং ধর্ম্ম-বিরোধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সকলে একস্বরে বলিতে চাই, "সত্যং পরং ধীমহি।"

শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চৈতন্যচরিত চৈতন্যধর্ম্ম। (৩৪শ)

(সন্ন্যাসান্তে)

এই পরিচ্ছেদের লিখিত বিবরণে বৈষ্ণব গ্রন্থকারদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল ও ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত আছে, চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বৃত্তান্ত তাহা অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন। আমরা প্রথমোক্ত গ্রন্থকারদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া বক্তব্য বিষয় বলিয়া পরে শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয়ের মত ব্যক্ত করিব।

সন্ন্যাসের নিশা প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইল। গৌরের প্রেমতরঙ্গে পড়িয়া কঠোর বৈরাগী ভারতী গোঁসাইও নাকি কাঁদিয়া বিভোর হইলেন; তাঁহার দণ্ড কুমণ্ডলু কোথায় পড়িয়া রহিল; গুরু শিষ্যে হাত ধরাধরি করিয়া, কখন কোলাকুলি করিয়া নাচিয়া কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইলেন। শীত কালের দীর্ঘযামিনী কোন দিক দিয়া পোহাইয়া গেল, কেহ টের পাইলেন না। রজনী প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন, "পিতঃ আপনি নবদ্বীপে গমন করুন; আমার শোক-বিহ্বলা জননী ও প্রাণের বন্ধুবর্গকে আমার সন্ন্যাসের কথা বলিয়া বলিবেন, "যে যদিও কর্ত্তব্যপালন জন্য আমি বনগমন করিতেছি, তথাচ তাঁহাদের অন্তর হইতে আমি কখনই দূরে থাকিতে পারিব না। আর আপনি, আমার পিতা যখন স্মরণ করিবেন, আমার দেখা পাইবেন।" আচার্য্যরত্নাদি শোকবিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং দিবাবসান সময়ে শচীগৃহে উপনীত হইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী সমক্ষে সর্ব্বকথা খুলিয়া বলিলেন। গৌরের গমন হইতে এই তিন দিন পর্য্যন্ত নবদ্বীপ-নগর বিষাদ ধাম হইয়াছে। ভক্তমণ্ডলী মৃতকল্প শচী মাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া গৌরগুণকীর্ত্তন করিয়া কতই কাঁদিতেছেন। মা শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া আছেন, প্রভাত সময়ে গৌর যাইবার সময় বাড়ীর অবস্থা যেরূপ ছিল, সেইরূপ সকল বাসি হইয়া পড়িয়া আছে, তিন দিন পর্য্যন্ত কেহ জলবিন্দু স্পর্শ করেন নাই। এক্ষণে আচার্য্যরত্নের কথায় তাঁহাদের শোকাবেগ শতগুণ বৃদ্ধি হইল এবং নানাভাবে সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তগণ শোকে আত্মহারা হইয়া জীবনান্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পরক্ষণেই প্রত্যাদিষ্ট হইলেন যে আত্মহত্যারূপ পাপ [illegible]মগ্ন হইবেনা। অল্প সময় মধ্যেই গৌরের সঙ্গে পুনর্ম্মিলন হইবে। তখন তাঁহারা আপনাদের ভীষণ প্রতিজ্ঞা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বিষাদের কালিমায় নবদ্বীপের আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দুঃখ বিষাদে মগ্ন হইয়া ভক্তমণ্ডলী কালের কুটিল গতির দিকে চাহিয়া থাকিলেন।

এ দিকে আচার্য্যরত্নকে বিদায় দিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনগমনে উদ্যত হইলেন। ভারতী গোস্বামী গৌরের প্রেমমন্ত্রে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার গমনোদ্যোগ দেখিয়া বলিলেন "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। এখানে একাকী থাকিয়া কি করিব? তোমার সঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে সুখে দিন কাটিয়া যাইবে। প্রেমানন্দের কণা পাইলে আর শুষ্ক জ্ঞান যোগ ভাল লাগেনা।" গৌরচন্দ্র অনুমতি দিলে অগ্রে ভারতী মধ্যে নূতন সন্ন্যাসী, পশ্চাতে নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গৌর তখন নবজীবনের নবভাবে বিভোর। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী যেমন পিঞ্জর হইতে বাহির হইতে পারিলে প্রমুক্ত আকাশে সুখপূর্ণ উৎসাহে বিচরণ করিতে থাকে, তেমনি সংসার পিঞ্জর কাটিয়া গৌর-পাখী আজ ব্রহ্মাণ্ডের সুপ্রশস্ত পথে বাহির হইয়াছেন, সংকীর্ণতার নীচ সীমা

আজ তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাণে অসীম অনন্তের ছায়া পড়িয়াছে, প্রেমের জ্বলন্ত অনল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এবং এত দিনে প্রাণ নাথের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবেন বলিয়া আনন্দসাগরে বুক ভাসিয়া যাইতেছে, গৌর আত্মহারা হইয়া ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ;—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাং ঘ্রিনিষেবয়ৈব।"

পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অবলম্বিত পরমাত্ম নিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া মুকুন্দ চরণ সেবা দ্বারা আমি দুস্তর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।"

ভ্রাতৃগণ! সংসার মোহ উত্তীর্ণ হইতে হইলে পূর্ব্বতন মহর্ষিদিগের অবলম্বিত পরমাত্ম নিষ্ঠাই সার। পরমাত্মাতে নিষ্ঠা স্থাপিত না হইলে তাঁহার চরণ সেবার অধিকার জন্মে না। অতএব তোমরা এখন অনুমতি কর, আমি নিভৃতে যাইয়া পরমাত্মনিষ্ঠা অভ্যাস করি। "এই বলিয়া অনুরাগ ভরে গৌরচন্দ্র দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধুগণও তাঁহার সঙ্গে ছুটিয়া চলিলেন। এদিকে অপরূপ মুরতি নূতন সন্নাসী দেখিয়া নগরের বহু সংখ্যক নর নারী তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং গৌরের তৎকালের জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও প্রেম অবলোকন করিয়া তাঁহার মাতা পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া কত রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন; গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অতি মধুর ভাবে নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন।

"ভাই সব! গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গৃহ ধর্ম্মে মনোযোগ কর। কিন্তু দেখো—যেন সংসারে আসক্ত হইও না। পবিত্র কর্ত্তব্য জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে সকল ধর্ম্ম সমারম্ভ কর। অনুদিন হরি নাম সংকীর্ত্তন কর এবং কৃষ্ণ গত প্রাণ হও। আমি প্রার্থনা করি, শুকাদির ও দুর্লভ প্রেম যেন তোমাদের লাভ হয়।" লোক সকল প্রেমানন্দে গদ গদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া চলিল।

দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বন্ধুগণ রাঢ় ভূমিতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। রাঢ়দেশের উচ্চ ভূমি সকল পরম সুন্দর, সুপ্রশস্ত প্রস্তরের চারিদিকে অশ্বত্থবৃক্ষরাজি সারি সারি শোভা পাইতেছে, গাভীগণ মহানন্দে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া গৌরের বৃন্দাবন ভাবাবেশ হইল এবং মত্ততার সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ কীর্ত্তন জুড়িয়া দিলেন। নাচিতে নাচিতে প্রভু বলিলেন, বক্রেশ্বর যে বনে তপস্যা করিতেছেন, আমি সেইখানে যাইব। নিভৃতে কৃষ্ণনাম করিব। এই বলিয়া নবসন্ন্যাসী উদ্ভ্রান্ত নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। বেলা অবসান হইল দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন, এবং কিছু জলযোগান্তে সকলে গৌরকে বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মণের বাহির বাড়ীতে শয়ন করিয়া থাকিলেন। রজনী তৃতীয় প্রহরের সময় নিত্যানন্দ জাগরিত হইয়া দেখেন, গৌরচন্দ্র শয্যায় নাই। অত্যন্ত ব্যস্তমনা হইয়া তিনি আর আর সঙ্গীদিগকে জাগাইলেন এবং সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার

অন্বেষণে বাহির হইলেন। গ্রামখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাঁহারা প্রান্তর ভূমিতে গমন করিলে নৈশ নিস্তব্ধতাভেদ করিয়া সুদূর হইতে বিলাপযুক্ত রোদনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শব্দ তত সুস্পষ্ট না হইলেও তাঁহারা গৌর কণ্ঠবিনির্গত বলিয়া তাহারা বুঝিতে পারিলেন এবং শব্দানুসারে গমন করিয়া লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রভাতীয় ক্ষীণালোকে ভক্তগণ দেখিতে পাইলেন, নির্জ্জন প্রান্তর ভূমিতে বসিয়া সেই নবীন সন্ন্যাসী চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া "কৃষ্ণরে প্রভুরে ওরে কৃষ্ণ মোর বাপ" বলিয়া কাঁদিতেছেন, তাহার গভীর বিলাপধ্বনি নৈশ আকাশে প্রতিধ্বনিত হইয়া দিক্‌মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিতেছে; এবং সাক্ষাৎ বৈরাগ্য প্রতিমূর্ত্তি ধরিয়া যেন তাঁহার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। ভক্তগণ তাঁহার তদানীন্তন শোকে বিষাদের ভাব দেখিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। মুকুন্দ অবসর বুঝিয়া মধুর কণ্ঠে সংকীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করিলেন। রসময় হরিনাম শুনিবা মাত্র গৌরের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তিনি অমনি উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে এই অপূর্ব্ব ভক্তগণ ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। হরি সংকীর্ত্তন কাহাকে বলে, তখন কেহ জানিত না। যে গ্রামের পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, নরনারী সকল অবাক্ হইয়া তাঁহাদের ভাব গতিক দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের কথা লইয়া গ্রামে গ্রামে কতই আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই রূপে রাঢ় দেশ ধন্য করিয়া বিশ্বম্ভর বক্রেশ্বরের আশ্রমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। চারিক্রোশ মাত্র পথ অবশিষ্ট আছে, হঠাৎ তাঁহার গতি ফিরিল। যাইতেছিলেন পশ্চিমাভিমুখে, হঠাৎ পূর্ব্বাস্য হইলেন। সঙ্গীগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, আমাকে নীলাচলে যাইতে হইবে; জগন্নাথ প্রভুর আদেশ হইয়াছে যে শীঘ্র নীলাচলে চল। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া পরম সুখী হইলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, যখন ইতি পূর্ব্বে পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া শচী মাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসান্তে তিনি কোথায় থাকিবেন। গৌর তখন জননীকে কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই, এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, জননীরে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া যাইবেন, বিশ্বরূপের ন্যায় নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবেন না। ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদিগের এই এক বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় যে, তাঁহারা চিরদিনই প্রিয়তমের শ্রীমুখের আজ্ঞার আজ্ঞাকারী। সেই আজ্ঞায় মরিতে হয়, সেও ভাল, তথাচ পৃথিবীর কথায় সহস্র লাভ হইলেও তাহারা তাহা মানিতে প্রস্তুত নহেন। এক মাত্র ভগবদাদেশেই ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ জীবনান্তকারী বিপদকেও গ্রাহ্য করেন নাই। মহর্ষি ঈশা বুক পাতিয়া ক্রুশের আঘাত লইয়াছিলেন। আর তাহাতেই গৌরকে পথের ভিখারী করিল। যাহা হউক, প্রত্যাদেশের অভ্রান্তবাণী আজ তাঁহার ভবিষ্যতের বাসস্থান যেই নির্ণয় করিয়া দিল, অমনি মত্ত মাতঙ্গের গতি ফিরিল। মেষ শিশুর ন্যায় আদেশের নির্দ্দেশানুসারে তিনি গঙ্গাভিমুখে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে গ্রামবাসীদিগের কাহারও মুখে হরিনাম না শুনিয়া গৌরের হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। তিনি বলিলেন,

"এই কয়েকদিন যাবত এই দেশে বেড়াইতেছি, কিন্তু হায়! কাহারও মুখে একবার "কৃষ্ণ হেন নাম" শুনিতে পাইলাম না, কি পরিতাপের বিষয়"। এই ভাবে যাইতে যাইতে গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া কিছু অগ্রগামী হইলেন এবং ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া গভীর সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক এক স্থানে যাইয়া নিমীলিত নেত্রে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ নিকটবর্ত্তী হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলেন। তাঁহারা দেখিলেন, কয়েক জন গরুর রাখাল স্তিমিত নেত্র বিশ্বম্ভরকে বেষ্টন করিয়া হরিবোল বলিয়া হাতে করতালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। মধ্য স্থানে দাঁড়াইয়া চৈতন্য প্রভু নামানন্দে ভাসিতেছেন। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে এই ব্যাপার দেখিয়া মহাসুখী হইলেন এবং দেশবাসীদিগের মুখে হরিনাম না শুনিয়া তাঁহার প্রাণে যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহা অপনীত হইল। সহাস্য মুখে গৌর চন্দ্র রাখাল বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখান হইতে গঙ্গা কত দূর?" বালকগণ উত্তর করিল এক প্রহরের পথ।

গঙ্গা নিকটবর্ত্তী শুনিয়া গৌরচন্দ্র গঙ্গাবগাহনের জন্য দৌড়িতে লাগিলেন। সঙ্গের ভক্তগণ কেহ তাহার সঙ্গে চলিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল নিত্যানন্দ তাঁহার দেহ রক্ষায় ব্যগ্র হইয়া কোন মতে মতে তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন। প্রায় সন্ধ্যাসময়ে উভয়ে গঙ্গাতীরে পৌঁছিলে গৌরচন্দ্র মনের সাধে অবগাহন উদর পূরিয়া গঙ্গাজল পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গঙ্গা দর্শনে তাঁহার প্রেমাবেগ প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি গঙ্গার স্তব পড়িতে পড়িতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। "ব্রহ্মরূপের দ্রবভাবরূপিনী গঙ্গে, তোমার জল প্রেম রস স্বরূপ, উহা পানে স্নানে অশেষ পাপ দূরীভূত হইয়া কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়। জগতের মঙ্গলের জন্যই তোমার মর্ত্ত্যে আগমন।" ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেনা গঙ্গার ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ হইবেন না কেন? নিত্যানন্দের সহিত গৌর সেই নিশা সে গ্রামে যাপন করিলে প্রভাতে অনুবর্ত্তী ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "নিতাই! আমার বিরহে মা ও শ্রীবাসাদি ভক্ত মণ্ডলী ম্রিয়মান হইয়া আছেন; তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত কর এবং আমার আগমন সংবাদ দিয়া বলিও যে আমি তাঁহাদের দর্শনাপেক্ষায় শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিতেছি। এখান হইতে শান্তিপুর বেশী দূর নয়, আমি গঙ্গা পার হইয়া ভক্ত হরি দাসের আশ্রমে ফুলিয়া নগর দর্শন করিয়া শান্তিপুরে যাইব। তুমি ইতি মধ্যে নবদ্বীপ হইতে মা ও বন্ধুদিগকে লইয়া আচার্য্য ভবনে আগমন করিও।" এই বলিয়া সকলে একত্রে গঙ্গা পার হইলেন এবং নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া গৌরচন্দ্র ফুলিয়া অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

এই তো গেল চৈতন্যভাগবত গ্রন্থকার প্রমুখ গ্রন্থকারদিগের মত। ইহাদিগের মতে সন্ন্যাসযাত্রা হইতে এপর্য্যন্ত দ্বাদশ দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে চরিতামৃতে ও চন্দ্রোদয় নাটকে কিছু অন্যরূপ বর্ণনা দেখা যায়। চরিতামৃতের মতে

সন্ন্যাস গ্রহণান্তে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৌরচন্দ্র বৃন্দাবনে যাইবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ, আচার্য্য-রত্ন ও মুকুন্দ এই তিনজন মাত্র অনুগমন করিলেন। কবি কর্ণপূর বলেন যে, সঙ্গে কেবল মাত্র নিত্যানন্দই ছিলেন; আচার্য্য-রত্নকে পূর্ব্বেই বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহাপ্রভু প্রেমে আত্মহারা হইয়া তিন দিন দিবা রাত্রি রাঢ় দেশের মধ্যে দৌড়াইয়া বেড়াইয়া ছিলেন। গোপবালকদিগকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলে, নিত্যানন্দের শিক্ষামত তাহারা তাঁহাকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। চরিতামৃতকার বলেন যে, এইখানে নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্নকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে, "শচীমাতা ও ভক্তগণকে লইয়া তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে যাইবেন। আমি কোন রূপে প্রভুকে ভুলাইয়া তথায় গমন করিব।" এইরূপে আচার্য্য-রত্নকে বিদায় দিয়া নিত্যানন্দ প্রেম-মুগ্ধ গৌরচন্দ্রের সম্মুখে যাইয়া দর্শন দিলেন। গৌর বিস্মিতের ন্যায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ গোঁসাই! আপনি কোথায় যাইবেন?"

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন "তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব।"

জিজ্ঞাসা— বৃন্দাবন কত দূরে?

"এই যমুনা দর্শন কর" বলিয়া নিতাই গৌরকে গঙ্গাতীরে আনিলেন: এবং কোন আগন্তুককে দেখিতে পাইয়া তাহাদের আগমন-সংবাদ অদ্বৈতের সমীপে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌরচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞান করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। এবং স্নান মার্জ্জন করিয়া আর্দ্র কৌপিনে নাম কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতি মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য সবান্ধবে নূতন কৌপিন বহির্ব্বাস লইয়া নৌকারোহণে আগমন করিয়া নবীন সন্ন্যাসীর রূপ ও ভাবমধুরী দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আমি বৃন্দাবনে আসিয়াছি, তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

অদ্বৈত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "প্রভু! তুমি যেখানে, সেই বৃন্দাবন। আমার সৌভাগ্য, তোমার আমার দেশের গঙ্গাতীরে আগমন হইয়াছে।" এই বলিয়া আচার্য্য কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরকে শুষ্ক কৌপীন পরাইয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন, "বুঝিয়াছি, নিত্যানন্দ আমাকে বঞ্চনা করিয়া যমুনা দর্শনচ্ছলে এই গঙ্গাতীরে আনিয়াছেন"।

অদ্বৈত বলিলেন, "শ্রীপাদের কথা মিথ্যা নয়। যুক্ত বেনী প্রয়াগ হইতে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী তিনে সম্মিলিত হইয়া এক ধারে প্রবাহিত হইতেছে, তন্মধ্যে গঙ্গার মধ্যে সরস্বতী পূর্ব্বে ও যমুনার ধারা পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। তুমি যখন সেই পশ্চিম পারে অবগাহন করিয়াছ, তখন যমুনায় স্নান করা হইয়াছে। চারি দিন উপবাসী রহিয়াছ, এক্ষণে এই নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া আমার বাড়ীতে এক মুষ্টি রুক্ষা শুকা ভাত খাইতে হইবে।

নিতাই হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন "রুক্ষা শুকার কর্ম্ম নয়। চারি চারি দিন উপবাসী আছি, ভোজনের আয়োজনটা ভাল নাহলে তোমার বাড়ী যাওয়া হইবে

না।" অদ্বৈত পরিহাস করিয়া বলিলেন, "কেন : তোমার আবার উপাস কিসের? যেখানে যাও, তোমার পূজা না হলে কি ছাড়?"

নিতাই উত্তর করিলেন "আর পেটপূজা! উনি না হয় হরি-প্রেমরস পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন; আমার তো আর রস কস নাই, আমি কি খেয়ে বাঁচি বল দেখি? উনি দণ্ড নিয়ে দিন রাত্রি মাঠে মাঠে ঘুরুছেন, আমার এ কি দণ্ড যে আমি না খেয়ে না শুয়ে পেছে পেছে ঘুরে মরি।"

অদ্বৈত মনে মনে নিত্যানন্দের অকৃত্রিম ও সরল সৌহার্দ্দ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন "এখন চল্ বামনা পেটে পিটে যাহা যেখানে হয় খেতে পাইবি এখন।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সকলে গৌরকে লইয়া নৌকারোহণে পর পারে চলিয়া গেলেন। এ বৃত্তান্তে ভুলিয়া যাইবার কথা নাই। এবং সন্ন্যাস হইতে শান্তিপুরে আগমন পর্য্যন্ত চারি দিন রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ব্যষ্টি না সমষ্টি।

"Ich dien."—* "আমি সেবক।"

হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, ইউরোপ ব্যক্তিত্ব-প্রধান ও ভারত সমাজপ্রধান দেশ; কিন্তু একটু ভিতরে প্রবেশ করিলেই ঠিক বিপরীতভাব নয়নগোচর হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারাদি নানাপ্রকার বাহ্যিক বন্ধনের চিহ্ন থাকা সত্বেও কঠোর অন্যায় সামাজিক দৌরাত্ম্যের অধীনস্থ ভারত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিত্বপ্রধান, নিজকে লইয়াই সবাই ব্যস্ত, অপরের কথা ভাবিবার অবকাশ নাই; ইউরোপে সব রকমে ষোলআনা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা আপনার আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিলেও, সমাজের জন্য, দেশের জন্য, এমন কি সময়ে সময়ে পৃথিবীর সীমান্তরস্থিত পরদেশী জনসমাজের হিতের জন্য বিস্তর লোক প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সমগ্র মানবজাতির, অন্ততঃ অধিকাংশের অপার্য্যমানে দেশের, নিতান্ত পক্ষে আপন সমাজের কল্যাণ সাধন প্রত্যেক জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; সরল-জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনানুসারে যথাসাধ্য ঐ পথে চলা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

অনেকে বলেন, ধর্ম্মের (formulated

---

* প্রিন্স অব্ ওয়েলসের শিরোভূষণে "ইশ ডীন" এই দুইটী জর্ম্মান শব্দ উজ্জ্বল অ. করে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের এক জন সাধারণ ধনী এরূপ বাক্য কখন সহ্য করিবেন না—"আমি সেবক? আমি চাকর? ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ আমার সেবায় রত, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল আমার পদতলে, আমি আবার কাহার সেবক হইব?"—বাবুর কথা এই। আর পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাট 'সংসারের সেবক' বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, পরম গৌরব বোধ করেন। পূর্ব্ব পশ্চিমে এতই তফাৎ।

religion) শাসনাভাব হইলে মানব আপন আপন পাশব প্রবৃত্তি অনুসারে যথেচ্ছাচারী হইবে, পরস্পরে গলাকাটাকাটি করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না; সুতরাং যেমন তেমন একটা ধর্ম্মের ভয় ব্যতীত ঠিক রাখিতে পারা সম্ভব নয়। অপরদিকে বহু সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মত যে, অনৈসর্গিক অমানুষী শক্তির কল্পনা দ্বারা শাসনের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না, কঠোর প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সমাজ আপনার অবস্থা আপনি করিয়া লইবে; যাহারা সাধারণের ক্ষতি করিয়া বা অশান্তি জন্মাইয়া আপনাদের নিকৃষ্ট স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, বা চেষ্টা পাইবে, তাহাদের দমন বা দূরীকরণ অবশ্যম্ভব। ইঁহারা বলেন, কেবল পুণ্যপ্রতাপ জাতীয় সমুন্নতির একমাত্র কারণ; (Righteousness alone exalteth a nation); যে সমাজে পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব, অপ্রত্যয়, হিংসা, দ্বেষ, যেখানে হিতের জন্য কোন একটা সামান্য স্বার্থও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়, এমন ভীরু, হীন, জঘন্য-স্বার্থপরতার-দুর্গন্ধময়-অন্ধকূপস্বরূপ, আত্মঘাতী সমাজের বিনাশ অনিবার্য্য। যদি কোথাও অত্যন্ত দূষিত কদর্য্য সমাজ বিদ্যমান দেখা যায়, স্থির জানিতে হইবে, উহা দ্বারা অলক্ষিত ভাবে কোন শুভ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে, নতুবা এতদিন নিশ্চয় লোপ পাইত। চোরেরও ন্যায়বোধ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে। প্রত্যহ নরশোণিতে কলঙ্কিতহস্ত মহাপাপগ্রস্ত সুবিখ্যাত দস্যু রত্নাকরের পাষাণসম কঠিন হৃদয়েও বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান এরূপ দৃঢ় ছিল যে, কেবলমাত্র তাঁহাদেরই জন্য এতাদৃশ নৃশংস কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অপরের সঙ্গে সম্যকপ্রকারে সম্বন্ধ-বিরহিত নির্লিপ্তাবস্থায় এরূপ সম্ভবে না। আমার উপর যাহাদের দাবী আছে; এমন কতকগুলি লোকের সঙ্গে সংশ্রব ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রভাবে আমার ব্যক্তিত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা অসম্ভব। ঈশ্বর * ভিন্ন সমস্তই আপেক্ষিক, সুতরাং অন্যের সহিত তুলনা বা সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মত-বিশ্বাসের ধর্ম্ম সংসার হইতে একেবারে গেলে কতকগুলি পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী;— অনেক বিষয় যাহা দৃঢ় সংস্কার বশত এখন ঘৃণার চক্ষে দেখি, তখন নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হইবে; যে কার্য্যের দ্বারা কাহারও কোন প্রকার অসুখ বা ক্ষতি হয় না, অথচ কেবল একটা ভ্রান্তমত ও অন্ধবিশ্বাস হেতু এখন দোষের বলিয়া বোধ হয়, সেগুলি তখন কাহারও আপত্তির বিষয় হইবে না, বরং অনেক সময় প্রয়োজনীয় বোধ হইবে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, খ্রীষ্ট, পল, নানক, চৈতন্য প্রভৃতিকে তাঁহাদের জগৎ-পূজ্য মহোচ্চপদ হইতে নীচে নামাইবার কোন কারণ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু বুদ্ধ, কপিল, মিল, কোমৎ, ব্রুণো, স্পাইনোজা প্রভৃতিকে নাস্তিক বলিয়া সংসার এখন যে ভাবে দেখিতেছে, তদপেক্ষা

* শাস্ত্রকারগণ বলেন, ঈশ্বর আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য বিশ্ব সৃষ্টি করেন। যখন একাকী ছিলেন, তখন ব্যক্তিত্বহীন অব্যক্তাবস্থা। আপন আনন্দে আপনি ভাসিতেছিলেন, জীবকে সঙ্গী ও অংশী করিয়া সুখী হইলেন। (যদিও এমতে অনেক তর্ক উপস্থিত হইতে পারে।)

অনেক উন্নত ও পূজার্হ বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবে না। একমাত্র সামাজিক হিত সম্বন্ধে (the greatest good for the largest number) উপযোগীতানুসারে নির্ব্বিশেষে সকল কার্য্যের বিচার সংসারে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। যাহারা সমাজে অশুভ বা অহিত কার্য্য করিবে, তাহাদের সংশোধন চেষ্টা প্রথম, পরে সমাজের মর্য্যাদা ও জীবন রক্ষার্থ, যে কোন উপায়ে হউক, সম্যকশাসন সমুচিত। বিলক্ষণ দেখা গিয়াছে, যে জাতি বা সমাজ দ্বারা সংসারে ক্রমাগত অমঙ্গল আনীত হইয়াছে, তাহার অনিবার্য্য পরিণাম ধ্বংস, হাজার পরিষ্কার ধর্ম্মমত থাকুক, এবং ব্রত, নিয়ম, যাগ, যজ্ঞাদি বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপের ঘটা যতই হউক, কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই; কারণ, একজনের জন্য দশজন ভুগিতে পারে না, এই উৎকৃষ্ট নিয়ম পৃথিবীর আদি কাল হইতে সমান তেজের সহিত ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে।

অনেক ধর্ম্ম-প্রচারক, ধর্ম্ম-যাজক এবং ইহলোক ফেলিয়া রাখিয়া পরলোকের জন্য ব্যস্ত ধর্ম্মব্রতধারী, মহোদয় বলেন যে, ঈশ্বরপূজা অর্থাৎ, কেবল ধ্যান ধারণা জপ তপাদি, আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য; তাহা সারিয়া সময় থাকিলে মানুষের সেবা, জীবের প্রতি প্রেম ইত্যাদি অল্পাবশ্যকীয় বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। নচেৎ আত্মার মুক্তির জন্য ও সকল ছোট কাজ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। পরন্তু ভগবান তাঁহার প্রিয় সাধুসন্তানগণ দ্বারা বারম্বার সংসারে প্রচার করিয়াছেন, "জীবে দয়া, নামে রুচি, মানব-সেবা, তিন এক সঙ্গে চাই, কোনটী কম হইলে চলিবে না"। "আমার এই ক্ষুদ্র সন্তানগুলির মধ্যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরটীর প্রতি যদি কোন প্রকার ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা আমার প্রতি হইয়াছে জানিবে"। "যে তাহার ভ্রাতাকে ভালবাসিতে না পারে, যাহাকে চর্ম্ম চক্ষুতে নিয়ত দেখিতেছে; কি প্রকারে ঈশ্বরকে প্রেম করিবে, যিনি কখন তাহার নয়নগোচর হন নাই?" এই সকল ভগবান বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ঈশ্বর-দাস্য ও মনুষ্য-সেবা অভিন্ন;—যে ভগবদ্ভক্তি ঊর্দ্ধ হইতে নীচে নামিয়া নরলোকের পরিচর্য্যায় রত না হয়, তাহা অসম্পূর্ণ, অসার, অলীক; এবং যে ভ্রাতৃসেবা পৃথিবী হইতে উচ্চে উঠিয়া স্বর্গীয় পিতার আরাধনায় পরিণত না হয়, তাহাও অপূর্ণ, ভ্রান্ত, অশুদ্ধ।

ইহ জীবনে কোনই ফল নাই, এ কথা দুই জনের মুখে বেশ সাজে, পরিতৃপ্ত অথচ অসন্তুষ্ট ভোগবিলাসান্বেষী এবং ত্যাগী বাতাতপ-সহিষ্ণু সন্ন্যাসী। প্রথম ব্যক্তি বলেন, বিলাস ভাল কিন্তু বড় শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, সুখটুকু উত্তপ্ত পারদের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া শেষ হিসাবে দুঃখের ভাগ বেশী দাঁড়ায়; সুতরাং জীবন অসুখ ও অমঙ্গলের কারণ মাত্র। বিরক্ত বৈরাগী, বিলাসীর সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া উপরান্ত বলেন, এ শরীরে যখন বাসনা তৃপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, তখন ইহাকে কষ্ট দিয়া ভবিষ্যতের আশা রাখাই যুক্তি-সঙ্গত। ক্ষুদ্রতা বশত ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে দেখিবার অসামর্থ্য হেতু উভয়ের ঐ রূপ সঙ্কুচিত ও অসঙ্গত মত; ছোট বড় সর্ব্ব প্রকার বাসনার সম্বন্ধ যে সমাজের সঙ্গে, ব্যক্তির সঙ্গে নয়, ইহা দুই জনেরই লক্ষ্য নাই।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সংসারে সুখাপেক্ষা দুঃখের ভাগ অনেক বেশী বোধ হয়। তাই কবি গাইয়াছেন,

"Count o'er the joys thine hours have seen.
Count o'er thy days from anguish free
And know whatever thou hast been,
'T is something better not to be."

কবি কেন? চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই দৈনিক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বিশ্রাম কালীন চারিদিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "এত খাটিয়া কি লাভ হইয়াছে?" প্রতিধ্বনি স্পষ্ট উত্তর দেয়, "কিছু না। সমস্তই গিল্‌টী, ফাঁপা; মানুষ কেবল হাওয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছে। পুরাকাল হইতে এই রূপ জিজ্ঞাসা চলিয়া আসিতেছে। ভারতের দর্শনাদিতে ত পিষ্ট পেষিত হইয়াছে, কর্ম্ম প্রধান পাশ্চাত্য জগতেও কম হয় নাই। * কিন্তু সমস্তই হতাশের ব্যক্তিগত বিলাপ মাত্র। নিরাশা হইতে সন্দেহের উৎপত্তি. এবং সংশয় বহু কাল পোষিত হইলে অবশেষে অশিববাদ (Pessimism) ও নাস্তিকতায় লইয়া ফেলে! এই ভয়ঙ্কর প্রবল স্রোতে গা ভাসান দিয়া (অজ্ঞাতসারে) শুপনর (Schopenhauer), হীন (Heine), লিন (Lenau), ভন হারমান (Von Hartmann), বায়রণ (Byron), শাটো ব্রিয়া (Chateau Briaud.) প্রভৃতি কত দেশের কত অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহামহোপাধ্যায়, হিংস্র জন্তু পূর্ণ, ঘোরতিমিরাচ্ছন্ন, ঝঞ্ঝা-তাড়িত, বিপদসঙ্কুল অবিশ্বাস-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের বিভীষিকা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই। ইঁহারা যদি, মানব সমাজের ক্রমোন্নতি, ও নরলোকের দুঃখ দূরীকরণের জন্য সভ্য জগৎ দ্বারা যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেন, নিরাশার কোনই কারণ ছিল না।

হইতে পারে, সুখ অপ্রাপ্য সামগ্রী, অন্তত প্রয়াস দ্বারা; তাই বলিয়া যাহাতে দুঃখ দূর বা হ্রাস হয়, এরূপ চেষ্টা কোন

* অতি প্রাচীন কালে মিদাস নৃপতির (Midas King of Phrygia) প্রশ্নোত্তরে বনদেবতা সিলিনস (Satyr Silenus) বলিয়াছেন, পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ না করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আর যদি জন্ম হয়, যত শীঘ্র মরিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। বর্ত্তমান যুগে কবি বায়রণ (Byron) ঈশ্বরদ্রোহী আদম-পুত্র কেইনের (Cain) দোহাই দিয়া জীবনসম্বন্ধে নিম্নোক্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন:—

"————I was unborn:
I sought not to be born; nor love the state
To which that birth has brought me
* * * *
* They have but
One answer all questions, "'T was *his* will,
And *he* is good." How know I that? Because
He is all powerful, must all good, too follow?
I judge but by the fruits—and they are bitter—
Which I must feed on for a fault not mine"

ইহার পূর্ব্বে মানফ্রেডের (Manfred) মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন, "But grief shall be the instructor of the wise; sorrow is knowledge;—" ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, "the gloomy heat of an unbounded and exuberant despair becomes at last oppressive to us." বায়রণ সম্বন্ধে গেটের এই কথা স্মরণ থাকা।

অংশে দোষের বা ক্ষতির হইতে পারে না। চারিদিকের দুঃখ দারিদ্র্য দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, বহু জীবের জীবন ভারবহ ও বিফল (hardly worth the living); কিন্তু ঐ সকল শোচনীয় অবস্থায় অসুখের এমন অনেকগুলি কারণ দৃষ্ট হয়, যাহা ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ দ্বারা অনায়াসে নিরসন হইতে পারে। নৈতিক উন্নতির সঙ্গে কতকগুলি অন্তর্হিত হওয়া অবশ্যম্ভব, কিন্তু মৌলিক বহু আছে, যাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া কপর্দ্দক-হীন দুঃখী দরিদ্রের নিজের সাধ্যায়ত্ত কিছুতেই নয়। অন্ধ অসহায়তা ও দারুণ নিঃসম্বল অবস্থা, এই দুই মুখ্য কারণের নিরাকরণ জন্য গরিব কাঙ্গাল ভাইগুলিকে সতৃষ্ণ নয়নে সৌভাগ্যশালী জ্যেষ্ঠ সহোদরগণের মুখের দিকে সর্ব্বদা তাকাইয়া থাকিতে হয়; অথচ সহস্রে একবারও সম্যক সহানুভূতি পাইতে দেখা যায় না। আমার বাড়ীতে লুচি মণ্ডার ভিয়ান বসিয়াছে; দশ দিন ধরিয়া সহস্র সহস্র বন্ধু বান্ধব যোড়শোপচারে ভোগ পাইতেছেন; উপস্থিত গরিব, দুঃখী, অনাথ, অসহায়, কাঙ্গাল, ফকির, কুকুর, বিড়ালের সঙ্গে বসিয়া পাতের ত্যক্ত সামগ্রী দ্বারা জ্বলন্ত জঠর শীতল করিতেছে; কিন্তু আমার প্রাসাদের ঠিক পার্শ্বস্থ পর্ণকুটীরে উত্থান-শক্তি-রহিত রুগ্ন পিতা মাতা দুইটী শিশু-সন্তান লইয়া তিন দিন অনাহারী; খোজ খবর লইবার কেহ নাই, আমার লোক জনের অবকাশ কোথা? এরূপ মর্ম্মভেদী দৃশ্য সংসার আর কত দিন দেখিবে, জানি না। ধরা ভারাক্রান্ত হইয়াছে, সতর্কতার আবশ্যক, আর কিছুর জন্য না হউক, শান্তির জন্য; পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে এক একটী ফরাসি বিপ্লব বাঞ্ছনীয় নয়।

মোহজনিত স্বার্থপরতা হেতু সংসারে উন্নতি অবরুদ্ধ রহিয়াছে; ইতিহাস এপর্য্যন্ত আদর্শ সমাজ দেখাইতে পারে নাই; সুতরাং মানব-জীবন কতদূর সুখের, প্রকাশ পাইবার অবকাশ উপস্থিত হয় নাই। একবার মনের মত সুবাতাস পাইলে এই সামাজিক জীবন-তরি যে কোন সুখ-বন্দরে পঁহুছে, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে জীবনের উপযোগীতার বিরুদ্ধে মীমাংসা করা নিতান্ত দোষের। যদি কোন অশিববাদী আপত্তি করেন, কবে জগতের সুখ হইবে, সে আশায় আমাদের সান্ত্বনা হয় কৈ? মানব প্রেম সম্বন্ধে তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিতে হইবে। নিম্ন জগতে ধাড়ি শাবকের জন্য প্রাণ দিতেছে; বংশ রক্ষা করিতে গিয়া, জানিয়া শুনিয়া নিজে নিধন হইতেছে; আমাদের মধ্যে পুত্র পৌত্রের ভোগের জন্য লোকে তাল নারিকেল রোপণ করিয়া যাইতেছে; বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া সন্তানগণকে দিয়া যাইতে পারিলে সবাই সুখী। এই রূপ নানা বিষয় দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অন্যের হিতের জন্য চেষ্টা ব্যতীত মানুষ নিজের প্রকৃত সত্তা (True Self.) উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তাই সহস্র মোহাচ্ছন্ন হইলেও মানুষ ভাবে, "আমার অবর্ত্তমানে ছেলে পিলের কি হবে?" এই পরার্থ ভাবনা পরিবার মধ্যে উদ্ভূত হয়, বিশ্বে বিস্তীর্ণ হইবার জন্য; চতুর্দ্দিকে যত ছড়াইতে পারিবে, ততই জীবনে সুখ। প্রসারিত বক্ষ উদার পরার্থপর ও সঙ্কুচিত হৃদয় ক্ষুদ্র স্বার্থপরের ভিতরে দেখিবার অবকাশ

পাইলে এই সত্যের উজ্জ্বলতা বিলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। তখন বুঝিতে পারা যায়, "The Happiest life is one which is largely concerned with the life of others, one in which a man's thoughts are taken away form himself and fastened upon the needs and interests of those about him" শুধু সুখ দুঃখের কথা নয়। আচার্য্যগণের মতে ও রূপ না করিতে পারিলে মহা পাপ; এমন কি নিজের আত্মার পরিত্রাণের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যস্ত হইয়া যিনি পরের মঙ্গল চিন্তার অবকাশ পান না, তিনি সম্যক অপরাধী। ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান তিন কালের লোক সমষ্টি আমাদের, এবং আমরা এই সমস্তের সামান্য অংশ মাত্র;—এই মুক্তিপ্রদ মহামন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে পরিত্রাণ কোথায়? ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সকলের নিকট আমাদের শিক্ষা করা উচিত যে

"To cut the link of brotherhood, by which
One common maker bound me to the kind."

অনৈসর্গিক, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে দুঃখ বিপদের কারণ। "Fellowship is heaven, and lack of fellowship is hell; fellowship is life, and lack of fellowship is death." ইহাই আমাদের জপমালা হওয়া শ্রেয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কবিতার দর্পণ।

(Goethe's Muse's Mirror এর অনুবাদ।)

সাজাইতে চারু অঙ্গ কবিতা সুন্দরী—
প্রভাতে তটিনীকূলে দেখিছে বিচরি',
কোথা স্থির নীর রাশি স্বচ্ছ সুবিমল!
বহে যায় প্রবাহিনী; যত চোলে যায়,
কবিতার প্রতিবিম্ব জলেতে মিশায়
আবর্ত্তে তরঙ্গ ভঙ্গে হইয়া চঞ্চল!!
ক্রোধে দেবী, নদীকূল ছেড়ে চোলে যায়,
বিদ্রুপ করিয়ে নদী, কহিল তাহায়:—
"বুঝিলাম ঠিক যাহা, চাহ না দেখিতে;
তোমার স্বরূপ ছবি আমারি দর্পণে।"
কিন্তু তার কথা দেবী, না তুলি শ্রবণে,
স্বচ্ছ সরসীর তীরে দাঁড়াল নিভৃতে;
আনন্দে নেহারি জলে রূপ আপনার,
গুঁজিল খোঁপায় ফুল স্বর্ণ কর্ণিকার!

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

একটি নক্ষত্রের প্রতি।

"Love is a star, never sleeping, ever bright"

কি আঁধারে কি আলোকে—সকল সময়,
সুন্দর মধুর তুমি উজল আকাশে।
বিরক্তি, বিনাশ নাই, নিত্যানন্দময়;
শ্রান্ত পান্থ পায় পথ—তোমার বিকাশে।
নিদ্রা নাই জেগে আছ—চির জাগরণ;
অন্তরে প্রবেশ যার, তা'রেও জাগাও!

অসীম সৌন্দর্য্য কা'র কর বিকীরণ,
অজ্ঞানতা জড় ভাব অন্তরে লুকাও।

শ্রান্ত আত্মা শান্তি পায়—পরশে তোমার;
জীবনের ক্ষুদ্র আশা তৃষার বালাই।
সসীম জগত ধরে অসীম আকার:
যেতে সে অনন্ত পানে আপনা হারাই।

পশেনা ও চিরোজ্জ্বল আলোক যেখানে,
চির অমানিশা সেথা, মরুভূমি শত!
হেরি এই 'বিশ্ব রূপ' তোমার নয়ানে;
তুমি আছ বলে আছি, আছে এজগত।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুল ভাঙ্গা।

একদিন স্বপনে ডুবিয়া
ভাবিতাম স্বরগ ধরণী,
একদিন অমানিশি কোলে
ভ্রম হ'ত চাঁদিনী যামিনী!
একদিন বরিষার বুকে
দেখিতাম বসন্তের হাসি,
গাছে গাছে ফুটিত কুসুম,
বাজিয়া উঠিত দূরে বাঁশী!
দেখিতাম জোছনায় মাখা
সুশ্যামল সুখময় ধরা,
বিকশিত প্রণয়ের বুকে
সুখ শান্তি স্বপনেতে ভরা!
হায় সেই সুখের স্বপন,
কেন আজ ভাঙ্গিল আমার?
প্রেম ভরা হৃদি গুলি হায়
দেখিলাম কপট আগার!
দেখিলাম সুখের সাগরে
তলে তলে পাপের প্রবাহ,
ভাবিতাম ভালবাসা যারে,
সেও শুধু হৃদয়ের মোহ!
ডুবে গেল বিষাদ সাগরে
ধীরে ধীরে পূর্ণিমার শশী!
সংসারের কুটিল কটাক্ষে,
মিশে গেল হরষের হাসি।
চিনিলাম কেন এ ধরণী?
কেন হায়, ভাঙ্গিল স্বপন?
ডুবে গেল বিষাদ সাগরে
কল্পনার নন্দন কানন!

শ্রীপ্রমীলা বসু।

কবি।

শারদ চাঁদিনী নিশি বহিছে মৃদুল বায়,
আকাশে মধুর শশী হেসে হেসে ভেসে যায়!
তরু লতা ফাঁক দিয়ে শ্যামল ধরার পরে
ঘুমের কুহক নিয়ে চাঁদের কিরণ ঝরে!
কোকিল কুহরে 'কুহু' ফুল-বাসে ছায় দিক,
সুনীল গগন গায় তারা গুলি ঝিক্ মিক্।
পিয়ে কুসুমের মধু, বিমল জ্যোছনা ধারা,
স্বভাবের কোলে ব'সে ভাবে কবি মাতোয়ারা!
ঢলু ঢলু আঁখি দুটী, আবেশে মুদিয়া আসে,
হৃদয় তটিনী পরে স্বপন লহরী ভাসে!
কল্পনার সাথে প্রাণ যেন কোন্ মেঘ পুরে,
মাখিয়া শিশির কণা বেড়াইছে ঘুরে ঘুরে।
কত সাধ কত ভাব, কুসুম রেণুর মত,
হৃদয়ে সমীর সহ পশিতেছে অবিরত।
দূরে দূরে, ছায়া পথে কে যেন গাহিছে গান,
অলখিতে সুর তার ছুঁয়েছে কবির প্রাণ।
কি যেন মাধুরী ছবি ভাসিছে আঁখির পাশে,
প্রতিচ্ছায়া যেন তার প'ড়েছে হৃদয়াকাশে।
নেহারি জগতে আজ কি-এক স্বপন পারা,
আপনার মাঝে কবি আপনি হয়েছে হারা!!

শ্রীবিনয় কুমারী বসু।

শিশু।

কত মহাকাব্য তোর ও মুখে বিকায়ে যায় ;
কত ঈশা কত মুসা প'ড়ে আছে তোর পায়।
কত শরতের চাঁদ ও মুখেতে নিতি ওঠে ;
কত বসন্তের ফুল ও মুখেতে নীতি ফোটে।
নীলিম নয়ন দুটী নির্ম্মল ললাট তলে ;
শিখাইছে সারধর্ম্ম জগতে সংসারী দলে।
ও ললাট পবিত্রতা শান্তির মঙ্গল ঘট,
চিতার কলঙ্ক-লেখা আঁকে নি ও চারু পট !
বুকে ধূলি, মুখে ধূলি, ধূলি শিরোপরে রয়,
এখনও না জানিস্ ও যে ধূলি ধূলিময়।
কাল কাকা রাঙা কাকা যে ডাকে পসারি কর
ঝাঁপরি পড়িস্ তুই তাহারি বুকের 'পর।
সরলতা শুভ্রবাসে আবরিত সর্ব্বকায়,
'আভা কাপোল' 'আভা জামা' ভূমে—
গড়াগড়ি যায়।
আমরা সংসারী নর, কি কব লজ্জার ক'থা—
বুকে ঢাকা কপটতা মুখে মাখা সরলতা।

আমার কোলের চাঁদ আকাশের চাঁদ-সনে,
কে দেয় তুলনা ? তার দয়া কিরে নাই মনে।
কঠিন পাষাণ চাঁদ সদা দগ্ধ রবিকরে,
আমার ননীর চাঁদ নিঃশ্বাসে উলিয়ে পড়ে।
সুধা আছে ওর কাছে লোকে বলাবলি করে
আমার সোণার চাঁদে কথায় অমৃত ঝরে।
মুক আকাশের চাঁদ জড়পিণ্ড প্রাণহীন।
আমার কোলের চাঁদ হাসে গায় সারাদিন।
আহারে স্বর্গের জীব! তোর কি তুলনা আছে!
চুণী পান্না চাঁদ ফুল নিভে যায় তোর কাছে।
দেখাতে স্বর্গের শোভা পাপাসক্ত নরগণে,
পাঠায়ে দেছেন বুঝি বিধি তোরে এ ভবনে।
অথবা বেড়াতে ছিলি একাকী বিমান-পথে,
পথভুলে এসেছিস্ আমাদের এ জগতে।
তাই বুঝি শিশু ! তুই এমন লাবণ্যধার ;
এ জগতে নাহি মিলে একটী উপমা যার।
কিন্তু হায় আমাদের দরশ পরশে তুই,
হইবি মোদেরি মত, বাকী মাত্র দিন দুই।
যে দিন শিখিবি তুই দর্পণে দেখিতে মুখ ;
সে দিন হইতে তোর ফুরাবে লাবণ্যটুক।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

দেবতাগো ! ভেঙ্গে দাও দেহের বন্ধন,
দুটী প্রাণ এক সাথে দাও মিলাইয়া ;
সহিতে পারিনা আর বিরহ বেদন—
বিরহ রজনী এবে—যাক পোহাইয়া !
তিল তিল করি নিশি পশিতেছে প্রাণে,
তিল তিল করে প্রাণ যেতেছে ভাঙ্গিয়া ;
প্রাণের—উদয় গীতি নিরাশার তানে—
তিল তিল করি বুঝি যেতেছে মরিয়া !
বাসনা হৃদয়ে মোর ছিল কোনদিন।
বাহিতে সংসারে বসি সুখের জীবন ;
সে আশা ফুরায়ে গেছে, হয়ে গেছে লীন—
সংসার হয়েছে এবে—কণ্টক কানন !
পারিনা খেলিতে আর এ ভবের খেলা—
চাহিনা হইতে বন্দী—দেহ কারাগারে ;
দেবতাগো ! দাও দাও, মিলাইয়ে মেলা—
দেহ কারাগার মোর—যাক ভেঙ্গে চুরে !
এক আশা ছিল প্রাণে সংসার মাঝারে—
সেই আশা যদি দেব ! গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
তবে আর কেন মায়া জীবনের তরে—
জীবনের সূত্র মম—দাওগো কাটিয়া !
আঁধারে হেরিয়ে আলো পড়িনু ঝাঁপায়ে !
ভেবেছিনু কাছে গেলে আলোকিবে প্রাণ ;
কোথা হতে ঝড় এল, দিল নিবাইয়ে—
ভেঙ্গে চুরে গেল মোর—আশার স্বপন।
দেবতাগো ! ভেঙ্গে দাও দেহের বন্ধন,
দুটী প্রাণ এক সাথে দাও মিশাইয়া ;
সহিতে পারিনা আর বিরহ বেদন—
বিরহ রজনী এবে—যাক পোহাইয়া !

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

ইন্দ্র-চন্দ্র সংবাদ।

(৮ম)

২৮শে মার্চ, Houses of Parliament, Westminister, পার্লামেণ্ট মহাসভাগৃহ। রাত্রি ৮টার সময় House of Commons সভাগৃহে উপস্থিত হইলাম। আয়র্লণ্ডের জমীসংক্রান্ত আইনের কোন প্রশ্ন লইয়া বিতণ্ডা চলিতেছিল। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে পুরাতন গৃহ অগ্নি-দগ্ধ হয়। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে এপ্রেল তারিখে ভিত্তি স্থাপিত হইয়া ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে এই নূতন গৃহ প্রস্তুত হয়। সমগ্র মহাসভাগৃহ একখানি গ্রাম বলিলে চলে, প্রায় ২৫ বিঘা জমি ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান। সর্ব্বোচ্চ ধ্বজা (tower) ২৩৫ হাত উচ্চ, এইখানে ৫৬০ মণের একটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। গৃহমধ্যে প্রকাণ্ড হল গালারি প্রভৃতি ১৫টী। সম্ভ্রান্ত বৃহৎ পরিবার বাস করিতে পারেন, এরূপ ৮টী মহল (official residences)। সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত ৩২টী কমিটী ঘর। এতদ্ব্যতীত পুস্তকালয়, আফিস, খানা-কামরা প্রভৃতি যে কত, বলা যায় না। সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০ ভাগে (apartments) বিভক্ত। সুবিশাল ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্যের উপযুক্ত সভাগৃহ, সন্দেহ নাই। গৃহাভ্যন্তরে পিট (Pitt), ফক্স (Fox) প্রভৃতি বহু মহাজীবের শ্বেত মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত। এ স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের সাধ্যাতীত। সুতরাং কবির এই কয়টী কথা দ্বারা শেষ করিলাম।

> "The echoes of its vaults are eloquent,
> The stones have voices, and the walls do live;
> It is the house of memory"
>
> Maturin.

৩০ শে মার্চ্চ, University Boat-race; কালেজের বাইচ। চারিদিকে বসন্তের হাওয়া ছুটিতেছে, পৃথিবীর নরনারী, পশুপক্ষী, এমন কি অচেতন (?) উদ্ভিদ-জগৎ পর্য্যন্ত হর্ষে পুলকিত-তনু। স্ফূর্ত্তির বাতাস শীত-পীড়িত সংসারে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়া অভিনব সুন্দর দৃশ্যাবলী দ্বারা জীবলোককে অনুপ্রাণিত করিতেছে। কিন্তু ভাই! দেশের বসন্তের কিছুই এখানে দেখা যায় না; ঋতুরাজের সেই প্রাণপাগলকারী ঔদাস্যময় আধিপত্য এখানে খাটে না;—ব্রিটীশরাজের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে সৌরজগতের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব পর্য্যন্ত সর্ব্বদা জড়সড়, বসন্ত কোন্ ছার;—সেই তমাল তরুর নবীন পত্র, প্রস্ফুটিত কিংশুক পুষ্পসকল, সুগন্ধ বাতাবিলেবু ফুল, সুমিষ্ট সৌরভ প্রচার দ্বারা চতুর্দ্দিক আমোদিতকারী বিকশিত আম্রমুকুল, সুললিত চন্দ্রপ্রভা, চন্দনতরুসঙ্কুল মলয়াচল-সম্বন্ধী ফুরফুরে দক্ষিণ পবন, সুকোমল হরিতপত্র-শোভিত বৃক্ষোপরি ক্রীড়মাণ কোকিল কলাপের শ্রবণ-মনবিহ্বলকারী সুমধুর কুহুরব, একল ইউরোপে সম্ভোগ করা স্বপ্নের অগোচর ব্যাপার। আর শুনিতে পাওয়া

যায় না, বসন্তরাগে গীত শরীর মন অবসাদক জয়দেবের গান ;—

"ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে

"মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কুজিত কুঞ্জকুটীরে।

"বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে,

"নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে।"

যে বসন্ত ঋতু সমাগমে ভারতে রতি ক্রীড়াহেতু নিকুঞ্জবনে কৃষ্ণসকাশে সত্বর যাইবার জন্য সখিগণ রাধিকাকে

"রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশং

"ন কুরুনিতম্বিনি গমনবিলম্ব মনুসর তং হৃদয়েশং॥

"ধীরসমীরে যমুনাতীরেবসতি বনে বনমালী।

"পীতপয়োধর পরিসরমর্দ্দন চঞ্চলকর যুগশালী॥"

বলিয়া উত্তেজনা করিতেছেন, সেই সময়ে পৃথিবীর প্রধান নগর লণ্ডনের লোক কবি বার্জিলের (Virgil) সহিত "Cundti adsint, meriloegue expectent proemuia palmoe." (আইস, সকলে উপস্থিত হই, এবং উপযুক্ত পুরস্কার আশা করি।) গান গাইতে গাইতে কলেজ বাইচের জন্য বিশেষ উদ্যোগী। ইংলণ্ডের চক্ষুস্বরূপ অক্সফোর্ড (Oxford) ও কেম্ব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছা বাছা ১৬ জন বলিষ্ঠ যুবক (তন্মধ্যে লর্ড আম্‌থিল :)—Ampthill এক জন) ক্ষেপণী চালনায় শক্তি ও নৈপুণ্য প্রকাশ দ্বারা বীরত্বের পরিচয় দিবেন, ইহারই জন্য এক মাস হইতে নানাবিধ আয়োজন। মানসিক উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বল বিক্রমাদির বিকাশের প্রতি যাহাদের এরূপ লক্ষ্য, তাহাদের জাতির উন্নতি না হইবে কেন? শুধু শরীর বা মনের বর্দ্ধন দ্বারা প্রকৃত উন্নতি লাভ অসম্ভব, যুগপৎ উভয়ের পুষ্টিসাধন প্রত্যেক বিজ্ঞজাতির বাঞ্ছনীয় ও কর্ত্তব্য। আর্য্যদিগের অভ্যুদয় কালে হঠযোগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল? প্রাচীন গ্রীকগণ এ বিষয়ে ইউরোপের আদর্শ স্থল। বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপ ও আমেরিকা, বিশেষ রূপে ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। *

অক্সফোর্ডের চিহ্ন ঈষৎ নীল, কেম্ব্রিজের ঘন নীল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ;—দোকানী, পসারি, গাড়োয়ান, রাস্তার মুটে, গরিব দুঃখী সন্তানগণ, (Children of the gutter) পর্য্যন্ত সবাই দুইয়ের এক প্রকারের ফিতা (Ribbon), গলার বন্ধ (Neckti) বা ফুল (Rosette), পরিয়াছে ; এমন কি, যাহারা কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড কোথায়, বা বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকে বলে, কোন কালে জানে না, † নৌকায় কখন চড়ে

* এই কালেজ বাইচ ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত হয়। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত হিসাব করিলে অক্সফোর্ডের একবাজি জিত আছে। গত চারিবার ক্রমাগত কেম্ব্রিজের জয়।

† Grand daughter—Grand ma, What they mean by these light and dark blue?

Grand-mother,—Eton and Harrow are going to row a cricket match.

বালিকা নাতিনী।—ঠাকুর মা! এই সব ঈষৎ নীল ও ঘন নীলের মানে কি?

বৃদ্ধা পিতামহী।—ইটন ও হ্যারো (লণ্ডনের নিকটস্থ দুইটি এক্টে্‌স স্কুলের নাম) ব্যাটবলের বাইচ খেলিবে।

কলেজ বাইচ সম্বন্ধে অনেকের এইরূপ জ্ঞান।

নাই, বাইচ কখন দেখে নাই, তাহারা পর্য্যন্ত এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া তচ্চিহ্ন ধারণ করিতে ছাড়ে নাই। কত লোক কেম্বিজের উপর, কত লোক অক্সফোর্ডের উপর রাশি রাশি টাকা বাজি রাখিয়াছে। †

নানাদিক হইতে নানারঙ্গের লোক নানা প্রকার যানে ও পদব্রজে প্রাতঃকাল হইতে বাইচ স্থলাভিমুখে ধাবমান। বেলা ১০ টার মধ্যে পাটনি (Putney) হইতে মোর্‌লেক (Mortlake) পর্য্যন্ত সাড়ে চারি মাইল নদীর দুইধার লোকে লোকারণ্য। বাইচের ৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে ওয়েষ্টমিনিষ্টর সেতু, (Westiminister Bridge) হইতে মোর্‌লেক পর্য্যন্ত ৫ ক্রোশ নদীবক্ষ নানা শ্রেণীর নানা সাজের বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা পূর্ণ, বৈদ্যুতিক, বাষ্পীয় হইতে গাধাবোট পর্য্যন্ত, নানা রকমের জলযানে আকীর্ণ। জলযান সমূহ মধ্যে, কেম্বিজের একখানি, অক্সফোর্ডের এক খানি, শালিস (Umpire) একখানি ও সংবাদ পত্রের একখানি বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে উজান বাহিয়া মোর্‌লেকাভিমুখে যাইতেছে। ব্যবসায়ীগণ বিজ্ঞাপন প্রচারোদ্দেশে নানা প্রকার নৌকা নানা ছন্দে সাজাইয়া লোকের চিত্তাকর্ষণে যত্নবান। তীরে ৭।৮ জায়গায় প্রায় ২০ হাজার দর্শকের জন্য দাঁড়াইবার ও বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; দেখিতে দেখিতে সকল স্থান পূর্ণ হইয়া গেল; টিকিটের মূল্য ২৲ হইতে ১৫৲।

নির্দ্দিষ্ট কালে বেলা ৪ টার সময় সুন্দর সুস্থ সবল ১৬ জন দাঁড়ীসহ অতি পরিষ্কার দুইখানি ছোট ডিঙ্গি পাটনি হইতে ছাড়িল। ১০ মিনিটের মধ্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। যে রূপ শান্ত সমাহিত ভাবে, গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদার সহিত আসন রক্ষা করিয়া দাঁড় ফেলা হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় না যে, কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বীতা আছে। আর আমাদের দেশের বাইচে সপ্তশিব উন্নতি করত দাঁত মুখ সিঁটকাইয়া আসন হইতে এক হাত উচ্চে উঠিয়া সজোরে দাঁড়ে থাবা দ্বারা জল ছিটাইয়া নদী তোলপাড় না করিলে বিক্রম প্রকাশ হয় না। যেখানে বিধাতার কৃপা বর্ষে, সেখানে নিম্বও সুমিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। অল্পক্ষণ পরে প্রচারিত হইল, কেম্বিজের জিত, ১০ হাত আগে; পাটনি হইতে মোর্‌লেক পঁহুছিতে ২০ মিনিট ১৪ সেকেণ্ড লাগিয়াছে। যেমন শেষ হইল অমনি আমরা ঘরে ফিরিলাম; পথে দেখি বাইচের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ বহু সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছে। দেখ ভাই! কি ভয়ানক এই উদ্যম।

এই জলে স্থলে ৪।৫ লক্ষ লোকের উৎসাহ, উদ্যম, বিমল প্রফুল্লতা দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। এরূপ বিরাট জনতার এ প্রকার আমোদ আহ্লাদ প্রকাশ দ্বারা দেশের যুবকবৃন্দকে শারীরিক ব্যায়ামাদির সম্বন্ধে যে পরিমাণে উৎসাহ প্রদান করা হইল, তাহার ফল অতি উপাদেয় এবং সেরূপ উৎসাহ সহস্র সহস্র পুস্তক বা উপদেশ দ্বারা কখন সম্ভবে না। আর একটী বড় সুখ-

---

† এখানকার লোক বাজি রাখিতে খুব মজবুত। এই বাইচ উপলক্ষে ৮।১০ কোটী টাকার খেলা হইয়া গেল। আমাদের হোটেলের আমি ছাড়া আর সবাই কোন একপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৫।৬ জন বাজিও রাখিয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়, বাইচ, পার্লামেন্টের সভ্য নির্ব্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারে খুব বাজির ধুম।

প্রদ ভাব এই সময়ে মনে হইল। শুনিয়াছি, পুরিতে জগন্নাথের মন্দিরে পাণ্ডাদের বালকগণ দেবতার সম্মুখে করযোড়ে প্রার্থনা করে, "সংসার সুখী কর, ঠাকুর।" বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা উচ্চ কামনা মানুষ প্রকাশ করিতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা-প্রধান দেশের দেবমন্দিরে "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি" র স্থানে এরূপ উদার উন্নত প্রার্থনা সম্ভবে, পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল না; তাই সংবাদটী শুনিবা মাত্র হৃদয় রাজ্যে এক অভিনব আনন্দ তাড়িত-বেগে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কথাগুলি প্রাণে এত মিষ্ট লাগিয়াছে যে, যখন তখন মনে হয়, এবং প্রাণ ভাবিয়া উচ্চারণ করিলে বিপুল সুখ পাই। এই প্রকাণ্ড জনতার সমারোহে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম, এত লোককে একত্রে পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিতে দেখিলে নিজে কি অতুল অনির্ব্বচনীয় সুখ পাওয়া যায়। যদি সমগ্র সংসার এই ভাবে চিরসুখী হয়, সুরলোক ইহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

সাঁওতাল কাহিনী।

যে দিকে সূর্য্যের উদয় হয়, সে দিকে মনুষ্যের জন্ম হইয়াছিল। প্রথমে কেবল জল ছিল, জলের নীচে মাটী ছিল। ক্রমে রাঘব বোয়াল কাঁকড়া চিংড়ী প্রভৃতি জলজন্তুর সৃষ্টি হয়; তাহার পরে পক্ষীর সৃষ্টি হয়। পক্ষীগণ জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইত, কিন্তু আহার পাইত না। তখন ঠাকুর কুম্ভীর চিংড়ীমাছ ও বোয়াল মাছের সাহায্যে সমুদ্রের নীচের মাটী উপরে তুলিতে চেষ্টা করিলেন। তাহারা কেহই সফল হইল না। এই অপরাধে বোয়াল মাছের আঁইস হয় না। তখন ঠাকুর কচ্ছপকে জলের মধ্যে পায়ে শিকল বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেন। একটা কেঁচো সেই কচ্ছপের উপর লেজ রাখিয়া মুখ দিয়া সমুদ্রের তল হইতে মাটী তুলিয়া মলদ্বার দিয়া সেই মাটী কচ্ছপের উপর জমা করিল। তাহাতে পৃথিবী সৃষ্টি হইল। ঠাকুর মই দিয়া সেই মাটী সমান করিয়া দিলেন। মই দিয়া যে মাটী ভাঙ্গিল না, তাহাই পাহাড় হইল।

জমী সমান হইলে ঠাকুর তাহাতে বেণাবীজ বপন করিয়া দেন। ক্রমে অন্যান্য বৃক্ষ জন্মে, বেণা বনে হংস-ডিম্ব হইতে নর নারী উৎপন্ন হয়। বড় ঠাকুরের আদেশে পাখী দুটী আপনারা যাহা খাইত, তাহার রসে তুলা ভিজাইয়া নর নারীর মুখে চাপিয়া দিত। এইরূপে শিশু দুটী বড় হইলে তাহারা পূর্ব্ব দিকে হিহিড়ী পিপিড়ী দেশে নর নারীকে রাখিয়া প্রস্থান করিল। এই নর নারীর নাম পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ী। সামা ঘাসের বীজে তাহারা জীবন ধারণ করিত। তখন তাহাদের পরিধেয় ছিল না, লজ্জাও ছিল না।

লিটা তাহাদিগকে ভাতে বাখর মিশাইয়া মদ প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া দেয়।

এবং মারং বুরুকে (বড় পর্ব্বতের প্রেত) উৎসর্গ করিয়া মদ খাইতে পরামর্শ দেয়। তাহারা সেই উপদেশমত মদ প্রস্তুত করিয়া তিনটী শালপাতের দোনায় মদ রাখিয়া এক দোনা মারং বুরুকে দিয়া দুই দোনা দুজনে খায়। এবং উন্মত্ত অবস্থায় সহবাস করে। রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা আপন নগ্নতায় লজ্জাবোধ করে। তখন বট পত্র পরিধান করিয়া নগ্নতা নিবারণ করিয়াছিল।

পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ীর সাত পুত্র ও সাত কন্যা হয়। বুড়া যুবা পুত্রদিগকে লইয়া শীকারে যাইত ও বুড়ী কন্যাগণকে লইয়া শাক তুলিত। শাক তুলা শেষ হইলে একদিন যুবতীরা চাপাকিয়া নামক বট বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিয়া ঝুরি ধরিয়া ঝুলিতে নাচিতে এবং গাইতে লাগিল। ইত্যবসরে যুবকেরা একটী মৃগ শিশু লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল এবং ক্রমে যুবতীগণের সহিত নাচিতে লাগিল; ক্রমে বয়স মত এক একজন এক এক জনকে বাছিয়া লইল। যখন তাহারা আপনি পছন্দ করিয়া লইল, বুড়া বুড়ী কোন আপত্তি করিল না। তাহাদের অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। কিন্তু আর কেহ সগোত্র বিবাহ করিতে না পারে, এজন্য গোত্র বা পারিশ ভিন্ন হইল।

প্রথমে সাত গোত্র হইয়াছিল (১) হাঁসদা (২) মুর্ম্মু (৩) কিস্কু (৪) হেম্ব্রোম (৫) মাড়ণ্ডী (৬) সরেণ (৭) টুডু। সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সে দেশ ছাড়িয়া তাহারা খোজকামান দেশে প্রস্থান করে। এখানে তাহাদের অনাচার বৃদ্ধি হইলে ঠাকুর অগ্নি জল বর্ষণ করিয়া সকলকে নাশ করেন। কেবল যাহারা হারাতা পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাই রক্ষা পাইয়াছিল। কিছু কাল হারাতা পর্ব্বতের নিকট বাস করিয়া শেষে শশানবেড়ার বিস্তৃত মাঠে যাইয়া বাস করে। এখানে আর ৫ পাঁচটী পারিশের নিয়ম হয়।

(৮) বাসকে (৯) বেসরা (১০) পাঞ্জরিয়া (১১) চঁড়ে এবং (১২) বেদেয়া। এই বেদেয়া পারিশের লোক এখন আর দেখা যায় না।

"হিহিড়ী পিপিড়ীরে বোন জনমলেন
খোজকামান রে বোন খোজ লেন
হারাতারে বোন হারা লেন
শশানবেড়ারে বোদ জাতে না হো।"

শশানবেড়া হইতে সাঁওতালেরা জরপি দেশে এবং তথা হইতে জঙ্গলের মধ্য দিয়া সিংতুয়ার গিরিসঙ্কটে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আইরে দেশে আসে, তথা হইতে কায়ণ্ডে, কায়ণ্ডে হইতে চাই দেশে আইসে। চাইদেশে আসিয়া তাহারা অনেক দিন বাস করিয়াছিল। অনন্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সাতনদী চাম্পা দেশে উঠিয়া যায়। এখানে শত্রু আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এক একটী গড় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে এক এক পারিশ বাস করিত। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিস্কুরা রাজা ছিল, মুর্ম্মুরা পৌরহিত্য করিত, সরেণেরা প্রহরীর কার্য্য করিত, হেম্‌রোমেরা যুদ্ধে যাইত, মারাণ্ডীরা ধনপতি, টুডুরা বাদ্যকর এবং বাস্কেরা ব্যবসা করিত। এইরূপে অন্যান্য পারিশের একএকটি কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চাম্পা দেশে তাহারা বহুযুগ ছিল, তজ্জন্য চম্পাকে সাঁওতালের আদিম নিবাস বলিয়া উল্লেখ করে। এখান হইতে (হিন্দু) খেরো-

বার সাঁওতালেরা রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে লঙ্কায় গিয়াছিল। তদবধি অনেক দিন পর্য্যন্ত দিকু (বিদেশী) দিগের সহিত তাহাদের কোন বিবাদ হয় নাই। সাঁওতালেরা জঙ্গলে ও দিকুরা মাঠে বাস করিত। কিন্তু ভবিষ্যতে দিকুদের সহিত অনেক বার বিবাদ হইয়াছিল। "আমরা অরণ্য পরিষ্কার করি, দিকু আসিয়া কাড়িয়া লয়।

"যদি সাহেবেরা তাহাদের সপক্ষতা না করিত, এতদিনে আমরা তাহাদিগকে গঙ্গা পারে তাড়াইয়া দিতাম।" একবার দিকুরা চাম্পাগড় জয় করিয়াছিল, সাঁওতালেরা পুনরায় তাহা কাড়িয়া লয়। এই সময় দিকুরা এই গানটী করিয়াছিল।

দাদাষা ইনদান সিন মন্দান সিন
দাদাষা ছুটালন চাম্পাকা গড়
বহিন গে না কাঁদো না খিজো
বহিন গে হাতে কা শাঁকা বিচৌ
বহিন গে কানেকা সোণা বিচৌ
বহিন গে ভাউ হোনা লেবো চাম্পাকা গড়।

চম্পা হইতে সাঁওতালেরা তোড়ে পোখোরী বাহা বান্দেলায় উঠিয়া যায়। এখানে থাকিবার সময় মৃত দেহ দাহ করিবার ও অজয়ে অস্থিদিবার কিম্বা বিবাহে স্ত্রীলোকদের মাথায় সিন্দুর দিবার প্রথা তাহাদের মধ্যে ছিল না। তখন মৃত দেহের কবর হইত। এ প্রথা পরে তাহারা হিন্দুদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল।

কেহ কেহ বলে, "মুসলমানদিগের ভয়ে সাঁওতালেরা তোড়ে পোখেরী বাহা বন্দেলা হইতে জোনা জগপুর পলাইয়া যায়। সেখানে অধিক দিন থাকিতে না পারিয়া খাবপাল বেলগুঞ্জাতে পলায়ন করে। এখান হইতে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে যায়। কেহ শিখার দেশে, কেহ নাগপুরে যায়। শিখার দেশে ইহারা ছাতা পর্ব্ব শিখে। শিখার দেশে স্থান অভাব হইলে টুণ্ডি দেশে উঠিয়া যায়। অজয় পার হইতে পূর্ব্ব পুরুষ নিবারণ করিয়াছিল, কিন্তু পেটের জালায় সে নিয়ম ভঙ্গ করিয়াই সাঁওতাল দেশে আসিয়াছি, এখন আবার কোন দিকে চলিয়া যাইব।"

রাজমহলের পথে অনেকে গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছে। জানিনা ঠাকুর কোন দোষে আমাদিগকে শাস্তি দিতেছেন। কেহ কেহ বলে, চম্পা হইতে সাতদেশে গিয়া বাস করিয়াছিল বলিয়া ইহাদের নাম সাত বা শান্ত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সান্তাল নাম হইয়াছে। অন্যেরা বলে, সাঁওতালিতে বাস করিয়াছে বলিয়া ইহাদের নাম সান্তাল হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, পশ্চিম দিক হইতে সাঁওতালেরা এখানে আসিয়াছে। সাঁওতাল পরগণার পূর্ব্ব নাম ভুড়ুক দেশ। আরমানদের ন্যায় সাঁওতালেরা অপনাদিগকে হোড় বা মনুষ্য বলিয়া ডাকে। হোড় বীরহোড় মুণ্ডা, বা কুড়ুখী চম্পা বাস কালে সকলকে খেরয়ার বলিত। ক্রমে কুড়ুখীরা দিকু হইয়া কুর্ম্মী হয় এবং বীর হোড়েরা বানরের মাংস খাইয়া পতিত হয়। সাঁওতালও দিকুর মিশ্রণে সিংহ ঘাটোয়াল জাতির সৃষ্টি। এই জাতীয় মাধো সিংহ চাম্পা হইতে সাঁওতালদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

কয়েক বৎসর হইল পারশোতার ভাগবত মাঝি (সাঁওতাল) স্বজাতীয়দিগকে শূকর ও কুক্কুট মাংস পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু হইতে শিখাইয়াছিল। তদবধি সাঁওতালেরা সাধু বা সাফা, বুটা এবং বেদিয়া এই তিন শ্রেণী হইয়াছে। সাফা সাঁওতালেরা হিন্দুর মত আচরণ করে।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী

মহাত্মা জর্জ মুলারের জীবনচরিত।

প্রথম অধ্যায়।

বাল্য জীবন।

ব্রিষ্টলের নিকট এ্যাসলিডাউনের উপরে নির্ম্মিত অনাথাশ্রম নামক সুন্দর অট্টালিকা শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পাঁচটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকায় দুই সহস্রের অধিক অনাথ বালক বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। এই আশ্রমগুলি তাহাদিগের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা জর্জমুলারের দয়া ও সহৃদয়তার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কিন্তু বাস্তবিক মুলারের শৈশব ও যৌবন কাল কোন অসাধারণ কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ নহে। মুলার নিজ বিবরণীতে স্বীকার করেন যে, তাঁহার বাল্য জীবন অতি গর্হিত কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে। পরিণামে সেই সকল স্মরণ করিয়া তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের সপ্তবিংশ দিবসে প্রুসিয়া দেশের অন্তর্গত ক্রুপেণষ্ট্যাড নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে জর্জমুলার কলেবর পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম হার মুলার। হার মুলার রাজ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মুলারের পাঁচ বৎসর বয়ক্রম কালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে হিমারসলবেন লইয়া যান। ক্রুপেনষ্ট্যাড হইতে হিমারসলবেন দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

জর্জের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। হার মুলার অধিক বেতন না পাইলেও পুত্র দুইটীকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিতেন। পুত্রগণ টাকা খরচ না করিয়া সঞ্চয় করিবে এবং এইরূপ সঞ্চয় করা অভ্যাস থাকিলে অর্থ ব্যবহারে পটু হইবে, এই আশায় তিনি তাহাদিগকে বহুল পরিমাণে অর্থ দিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা অযথা ব্যয় করিয়া ফেলিতেন, এবং পিতার বিরক্তিভাজন হইতেন ও তাঁহার নিকট মধ্যেমধ্যে শাস্তি প্রাপ্ত হইতেন।

একাদশ বর্ষে জর্জের পিতা জর্জকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করণাভিপ্রায়ে হ্যালবারষ্ট্যাডের ক্ল্যাসিকেল বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। জর্জ উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাঁহাকে পুরোহিতের কর্ম্মে নিয়োজিত করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং তিনি তাঁহার পুত্রকে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।

মুলারের স্বকীয় বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই সময়ে তিনি পাঠে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হইয়া ছিলেন ও উপাসনায় তাঁহার কিছু মাত্র অনুরাগ ছিল না। মুলারের পিতা বোধ হয় মুলারকে পরজীবনে সুখী দেখিবার জন্য তাঁহাকে পৌরহিত্যে বিনিয়োগ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পৌরহিত্যের দায়িত্ব ও যোগ্যতার বিষয় একবারও স্মরণ করেন নাই। মুলার পিতার অভিপ্রায়ানুযায়ী জার্ম্মেনীর পুরোহিত হইতে না পারিলেও, ঈশ্বরেচ্ছায় এরূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, যাহা প্রচলিত সময়ের কোন ধর্ম্মযাজক করিতে সমর্থ হন নাই।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জর্জ মাতৃহীন হইলেন। মাতার আদর্শ যে মুলারের জীবনের কোন উন্নতি সাধন করিয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু মাতৃবিয়োগ হওয়ায় মুলার অবশ্য শোকবিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি অল্পদিন মধ্যেই মাতার মৃত্যুশোক বিস্মৃত হইলেন এবং অল্প বয়সেই তিনি পান্থনিবাসে যাইয়া তাস ক্রীড়া ও সুরাপানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হওয়ায় ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইল। দীক্ষাগ্রহণের পর কিছুদিনের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতাপিত হইলেন। কিন্তু অসৎসঙ্গের কুহকে পড়িয়া তিনি পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় একেবারে বিস্মৃত হইলেন। এবং এরূপ ভাবে সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন যে, পরে সেই সকল স্মরণ করিয়া তাঁহাকে অনেক মর্ম্মপীড়া পাইতে হইয়াছিল। কুসঙ্গে থাকিয়াও বালক মুলার বিবেকের দংশন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি উদ্ধারের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, নূতন স্থানে গিয়া নবসহচরগণের সহিত মিলিত হইলে তাঁহার চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে। দীক্ষার পর তিনি কিছুদিন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। শেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেন। তিনি বলেন—"ঐ সময় আমি পরমপিতা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিখি নাই, তাঁহাকে জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করি নাই বলিয়া আমার সকল প্রতিজ্ঞা কথায় পর্য্যবসিত হইল। আমি ক্রমেই অসৎ হইতে লাগিলাম।"

এই সময়ে মুলারের পিতা ম্যাকডিবর্গের নিকট স্কোনবেক নগরে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। জর্জ তাঁহার পিতার নিকট তাঁহাকে হ্যালবারষ্টাডের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া ম্যাকডিবর্গের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার পিতা কয়েকটী অসৎ বালকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন, এবং হীমারসলবেনে একজন গ্রীকৃরোমক ইত্যাদি ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের অধীনে রাখিয়া দিলেন।

ষোড়শ বর্ষ বয়সের সময় একদিন মুলার ব্রানসিক্ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তথায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিলেন। একটী হোটেলে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত বড়মানুসী ধরণে আহারাদি করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত টাকা খরচ হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে অর্থের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দিতে হইল। আর একবার উলফেনবাটেলের হোটেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদে পতিত হন। এইবার তিনি তাঁহার দেয় টাকা না দিয়া হোটেল হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করায় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন, এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলেন। অবশেষে তাঁহার পিতার প্রেরিত অর্থ আসিয়া পৌছিলে, হোটেলের ঋণ পরিশোধ হইল, জর্জ মুক্ত হইলেন। তিনি বাটী প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বকৃত পাপ সকল স্মরণ হওয়ায় তাঁহার অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে

লাগিল। তিনি এরূপ পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাভ্যাসে রত হইলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন ও জর্ম্মান ভাষায় এবং অঙ্ক বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কয়েক মাস অত্যন্ত পরিশ্রমের পর, তিনি নর্ডহেমনে প্রেরিত হইলেন এবং তথাকার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। সার্দ্ধ বৎসর কাল এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, মুলার হিব্রু ও গ্রীক্ ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। এই সময় এরূপ পরিশ্রম করিতেন যে, প্রত্যহ প্রাতে চারি ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুস্তকপাঠ করিতেন।

এক্ষণে মুলারের বয়ক্রম বিংশতিবৎসর। তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার শত শত পুস্তক সমন্বিত একটি সুন্দর পুস্তকাগার ছিল। কিন্তু তাঁহার এক খানিও ধর্ম্মপুস্তক ছিল না। তিনি অন্যান্য সহচরগণের সহিত বৎসরে দুইবার খ্রীষ্টীয় ভোজে (Lord's Supper) উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু [illegible] পরিবর্ত্তনে কোন ফল দর্শিল না। [illegible] স্বয়ং বলিয়াছেন;—"আমি এক্ষণে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক হইয়া উঠিলাম। [illegible] আমি কতদূর দুর্ব্বিনীত হইয়া- [illegible] তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী বিষয়ের [illegible] করিতেছি। আমি লোকের নিকট [illegible] অনেক টাকা ঋণ করিলাম। ঋণ [illegible] পরিশোধ করা আমার পক্ষে বড়ই [illegible] এমন কি সেগুলি পরিশোধ [illegible] উপায় ছিল না, কারণ [illegible] আমাকে আমার ভরণ পোষণের [illegible]র্থ ব্যতীত অধিক আর কিছুই দিতেন না। এক দিন পিতার নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমার কয়েকটি বন্ধুকে তাহা দেখাইলাম। পর দিন আমি আমার বাক্সের তালা ভগ্ন করিয়া, যেন কতই ভীত হইয়াছি এই ভাবে, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের গৃহে দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম 'কে যেন আমার টাকা চুরি করিয়াছে!' কয়েকটী বন্ধু আমাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমি যত টাকা চুরি গিয়াছে ভাণ করিয়াছিলাম, তত টাকা আমাকে দিলেন। এই ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় কিছুদিন আমার উত্তমর্ণদিগের মুখ বন্ধ করিবার সুন্দর উপায় হইল।

মুলার পরিণামে এই সকল দুষ্কর্ম্মের জন্য অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সময় অধ্যক্ষের পত্নী অনেক দিন তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সেই হেতু তিনি অধ্যক্ষ-পত্নীর সম্মুখে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইতে পারিতেন না; কারণ তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বের প্রতারণার কথা মনে পড়িত। যাহা হউক, তিনি এই বিদ্যালয় ছাড়িয়া হলবিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এই বিদ্যালয়ের সভ্য হইলেন এবং সম্মান-সূচক প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তিনি জর্ম্মানীর ধর্ম্মমন্দিরে প্রচারক হইবার ক্ষমতা পাইলেন। এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার চরিত্র সংশোধনে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। কারণ সচ্চরিত্র না হইলে কোন প্রদেশের লোক তাঁহাকে যাজক কার্য্যে মনোনীত করিবে না। প্রুসিয়াতে কোন যাজক সম্মানের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। ইহা বিবেচন

করিয়া মুলার যাজকতা কার্য্যের উপযোগী শিক্ষা আরম্ভ করিবার সময়ে অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা বিফল হইল। হল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই পূর্ব্বকার কুকার্য্য সকল অনুসরণ করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে সমস্ত অর্থব্যয় করিয়া ফেলিলেন, পরে বস্ত্র এবং ঘড়ি বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ করিয়া পাশকাদি ক্রীড়ায় প্রমত্ত হইলেন। এই রূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

কখন কখন মুলার ও কয়েকটী সহপাঠী একত্র হইয়া সমস্ত মূল্যবান পুস্তক বন্ধক রাখিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। একবার ভ্রমণে তাঁহারা ত্রয়োশ্চত্বারিংশ দিবস অতিবাহিত করেন। মুলার স্বীকার করেন যে, তিনি নিজের খরচ কমাইবার জন্য সাধারণের টাকা হইতে কিছু কিছু আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, ভ্রমণকালীন যে অর্থব্যয় হয়, তাহার হিসাব বুঝাইবার সময় অনেক গুলি অসত্য বলেন। বোধ হয়, যে কয় সপ্তাহ মুলার বাটীতে ছিলেন, সে সময় অত্যন্ত মনে কষ্ট পাইয়া ছিলেন এবং অনুষ্ঠিত পাপাচরণের জন্য অনুতাপ-দাহন অনুভব করিয়া সৎ হইবার জন্য অন্তরের সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পরন্তু বিদ্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া সে সমুদয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় দুষ্কর্ম্মে রত হইলেন।

এখন হইতে তাঁহার সকল পাপ ও ত্রুটী সত্বেও তাঁহার জীবনের যথার্থ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। মুলার বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিলেন। তিনি পুরোহিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ইতি মধ্যেই ধর্ম্ম প্রচারে অনুমতি পাইলেন; কিন্তু এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন নাই।—বাস্তবিক ধর্ম্ম পুস্তকের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ অতি অল্পই ছিল। তিনি বলেন, জগৎপিতা জগদীশ্বর তাঁহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত জীবনের পাপ সকল তাঁহার সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার বিবেক কে এরূপ তাড়না করিয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। এপর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ শ্রবণ করেন নাই, অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে জীবন অতিবাহিত করিতে অভিলাষী কোন ধর্ম্মযাজকের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। মুলার উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া কখন লেখা পড়ায় অবহেলা করিতেন, কখন বা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন; আবার কোন কোন সময় অনুষ্ঠিত অসদাচরণের বিষয় আন্দোলন করিয়া, পরিণামে সাধু ও সজ্জন হইবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন। এই রূপে তাঁহার বাল্য ও যৌবনের সমগ্র সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার বাল্য-জীবন কোন ক্রমেই আশাপ্রদছিল না। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বোধ হইয়াছিল যে, এই অলস ও অনৃতবাদী বালক, এই 'আমোদপ্রিয় দুঃশীল ছাত্র একদিন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, সহৃদয়-শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু, প্রার্থনাশীল খ্রীষ্টিয়ান প্রবর বলিয়া পরিগণিত হইবে! মুলার এই সকল ঘটনা স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার এই সকল ঘটনাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার ন্যায় অবস্থাপন্ন যুবকগণ উৎসাহিত হইবে এবং ঈশ্বরানুগ্রহে হতাশ হইবে না। যে মহান. পরমেশ্বরা

তাঁহাকে পাপের অন্ধকূপ হইতে পুণ্যময় জ্যোতিতে আনিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের মহিমা প্রকটিত করাও অপর এক উদ্দেশ্য। তাঁহার সমস্ত ইতিহাস উপদেশে পূর্ণ; কারণ বাল্যকালে চিন্তা শূন্য ও অসৎ কার্য্যানুরক্ত হইলেও, তিনি করুণা উপাসনাশীলতা ও পরোপকারের নিমিত্ত প্রথিত-নাম হইয়াছেন। অধিকন্তু পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইবে, সে সকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে, কারণ এই সকল ঘটনা তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

শ্রীরাখাল চন্দ্র মিত্র।

মাঘভট্ট।

সংস্কৃত ভাষা, পুরাতন ও অপ্রচলিত হইলেও, আজ কাল দেশীয় বিদেশীয় কৃত বিদ্যমাত্রেই এই ভাষার অসাধারণ মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ। কি প্রাচীন কি নব্য শ্রেণী, কে না ইহার রসাস্বাদন করিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য হন? সেই সংস্কৃত ভাষায় যে সকল মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাঘভট্ট এক জন সুবিখ্যাত। এই কবির এতদূর সৌভাগ্য যে মাঘের শিশুপালবধ কেন, যাঁহারা কোন দিন কোন ভাষার কোন কাব্যের রসাস্বাদন করেন নাই, তাঁহারাও মাঘের নাম ধ্বনিত হইবামাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। এই কবির সম্বন্ধে কতকগুলি শ্লোক ও শ্লোকাংশ শিষ্ট সমাজে প্রচলিত, সেগুলি এই, যথা;—"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থ গৌরবং। নৈষধে পদ লালিত্যং মাঘেসন্তি ত্রয়োগুণাঃ।। অপিচ। কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ। অপিচ। তাবদ্ভা ভারবে র্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয় ইত্যাদি।

এই কবির জীবনচরিত আলোচনা করা অপেক্ষা ইঁহার কৃত কাব্যের আলোচনায় সমধিক ফল; কেননা ভারতীয় কোন কবির বা গ্রন্থকারের ধারাবাহী ইতিবৃত্ত পাইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সামান্য কিঞ্চিৎ অবগত হইয়া সমস্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লেখা অপেক্ষা অন্য প্রকার উপন্যাস লেখা বরং ভাল। আমাদের দেশে মাঘ নামে যে কাব্য প্রচলিত, উহার প্রকৃত নাম শিশুপাল বধ, মাঘভট্টের রচিত বলিয়া মাঘনামেই সচরাচর পরিচিত। শিশুপাল বধ বিংশতি সর্গে বিভক্ত। এই কাব্য বীররস প্রধান, ইহার নায়ক কৃষ্ণ, প্রতিনায়ক শিশুপাল। চেদিরাজ শিশুপালের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেবতারা, দেবর্ষি নারদকে কৃষ্ণের নিকট দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। নারদের মুখে পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা শিশুপালের অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া দ্বারকা-পতি কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং দেবর্ষিকে বিদায় দিয়া ইহার প্রতি-বিধানের জন্য বলদেব ও উদ্ধবকে ডাকিয়া মন্ত্রণা করিতে বাসিলেন। শেষে স্থির হইল, ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালকে বধ করা হইবে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের দূত নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া আসিয়াছিল। কৃষ্ণ সপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ

যাত্রা করিলেন, পথি মধ্যে রৈবতক পর্ব্বতে কিছু কাল বিহার করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন। ভীষ্মের পরামর্শে কৃষ্ণকেই যজ্ঞীয় অর্ঘ্য প্রদত্ত হইল। তাহাতে শিশুপাল ও তৎপক্ষীয় রাজন্যবর্গ কুপিত হইয়া উঠিল, এবং ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা আর কৃষ্ণকে শিশুপাল গালি দিতে লাগিল। পরে উভয় পক্ষের দূতের মুখে কথোপকথন হওয়ার পর যুদ্ধারম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিশুপাল নিহত হইল।

এই মহাভারতীয় ঘটনাই মাঘকাব্যের মূল, সামান্য বিবরণ অবলম্বন করিয়া কবি বিস্তৃত কাব্যরচনা করিয়াছেন। দেখা যাউক, এই কবি কত দিন হইল এই কাব্যরচনা করিয়াছেন। এই তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য পুরাতন কোন লেখকের বাক্য উদ্ধৃত করিবার সম্ভাবনা নাই, অনুসন্ধানের চক্ষে পাঠ করিলে বলা যাইতে পারে, যে কালিদাস ও ভারবির পরে এবং নৈষধকারের পূর্ব্বে মাঘকবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রমাণের জন্য নিম্নে রঘুবংশ ও মাঘ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

প্রসাধিকালম্বিত মগ্র পাদ
মাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমেব।
উৎসৃষ্ট লীলাগতিরাগবাক্ষা
দলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥ ৭।

কালীদাস, রঘুবংশ, ৭ম সর্গ।

দাসী আলতা পরাইতেছিল, কোন মহিলা আর্দ্র অলক্তযুক্ত অগ্রপাদ আকর্ষণ করিয়া লইয়া দ্রুতগতি গবাক্ষ পর্য্যন্ত গমন করায় (কৃষ্ণ দর্শনের আকাঙ্খায়) সমস্ত পথ অলক্ত চিহ্নিত হইয়াছিল।

ব্যতনোদপাস্য চরণং প্রসাধিকা
করপল্লবাদ্রসবশেন কাচন।
দ্রুতযাবকৈক পদচিহ্নিতাবনি
ম্পদবীং গতেবগিরিজা হরার্দ্ধতাং ॥ ১৩।

মাঘ, শিশুপালবধ, ১৩শ সর্গ।

দাসী বেশবিন্যাস করিতেছিল, কোন মহিলা (হরির দর্শন লালসায়) কৌতূহল বশতঃ অধীর হইয়া দাসীর হস্ত হইতে চরণ টানিয়া লইয়া হরার্দ্ধদেহা গৌরীর ন্যায় আর্দ্র অলক্ত দ্বারা গবাক্ষ পর্য্যন্ত পথ চিহ্নিত করিয়াছিল।

এই দুইটী শ্লোকের মর্ম্ম পাঠ করিয়া কেনা বলিবেন যে, কালিদাসের শ্লোকটি আদর্শ আর মাঘের শ্লোকটী উহারই অনুকরণ-প্রসূত। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মাঘ যে ভারবির পরবর্ত্তী, তাহার প্রমাণ কি? এ বিষয়ে মতভেদও অলক্ষিত হয়। তথাপি মাঘ যে পরবর্ত্তী, তাহা প্রদর্শন করা তত কঠিন নহে। যদিচ মাঘ ও ভারবির কাব্য এক প্রণালীতে লিখিত, এবং উভয়েই মহাভারত হইতে প্রায় একপ্রকার ঐতিহাসিক মূল পরিগ্রহ করিয়াছেন, তথাপি ভারবির ভাষার সারল্য ও বর্ণনার সংক্ষিপ্ততা প্রভৃতিই প্রাচীনতার হেতু। মাঘ কবি ভারবির সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন। ভারবিতে যেমন ব্যাসের সহ যুধিষ্ঠিরাদির সাক্ষাৎকার ও দ্রৌপদীর ওজস্বিনী বক্তৃতা, বনবিহার, জলবিহার, ইন্দ্রকিল পর্ব্বতের বর্ণনা, কিরাতরূপী মহাদেবের সহ অর্জ্জুনের সংগ্রাম, পাশুপতাস্ত্র লাভ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, মাঘেও অবিকল ঐরূপ কৃষ্ণের সহ নারদের সাক্ষাৎকার, বীররসের অবতারস্বরূপ বলদেবের তেজস্বিনী

স্ফূর্ত্তা, বনবিহার, জলবিহার, রৈবতক পর্ব্বতের বর্ণনা, শিশুপালের সহ কৃষ্ণের যুদ্ধ ও শিশুপালবধ। এমন কি, ভারবি গ্রন্থারম্ভে অথ শব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন। মাঘও তাহাই করিয়াছেন, ভারবির প্রথম সর্গ বংশস্থবিলছন্দে রচিত, মাঘেরও প্রথম সর্গ উক্ত ছন্দেই লিখিত। অনেক স্থলে ভারবির ভাব মাঘে অনুকৃত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই একথা বেশ বুঝা যাইবে।

তথাপি কল্যাণকরীং গিরং তে
মাং শ্রোতুমিচ্ছা মুখরী করোতি ॥ভারবি॥

তাহা হইলেও মঙ্গলময় আপনার বাক্য শ্রবণের ইচ্ছাই আমাকে বলাইতে বাধ্য করিতেছে।

তথাপি শুশ্রূষুরহং গরীয়সী
গিরোঽথবা শ্রেয়সি কেনতৃপ্যতে। মাঘ।

তথাচ আপনার গরীয়সী বাক্যপরম্পরা শ্রবণে আমি অভিলাষী, কল্যাণবিষয়ে কে তৃপ্ত হইতে পারে।

যদিচ মাঘ তাঁহার উর্দ্ধতন কবিদিগের অনুকরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা যায় না। তিনি অনন্ত জলরাশি সমুদ্রের ও সর্ব্ববিধ সুষমার আকর রৈবতক পর্ব্বতের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়।

মাঘের ধীরোদাত্ত নায়ক কৃষ্ণ নৃপতিগণের আধার, মহাভারতে কৃষ্ণের সহস্র কূটনীতির পরিচয় থাকুক, কিন্তু মাঘের কৃষ্ণ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, যেন সর্ব্ববিধ রজোচিত গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। মাঘের বলদেব বীররসের জলন্ত ছবি, সতেজে প্রদীপ্ত অগ্নিরাশির ন্যায় বিরাজমান। পৃথিবীর মধ্যে তিনি বিক্রমে কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেছেন না, পৃথিবীর রাজন্যবর্গ তাঁহার নিকট তৃণবৎ। মাঘের উদ্ধব ইউরোপের জর্ম্মান বিষমার্কের ন্যায় মন্ত্রনা-কুশল ও ধীর, কিন্তু ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী বার্কের ন্যায় ভবিষ্যদ্বক্তা। মাঘ তাঁহার ভীষ্মকে যে বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। সেরূপ তেজস্বিতা ও মহত্বের ছবি কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। যবক ও অনুপ্রাস সৃষ্টিতে মাঘ অসাধারণ ক্ষমতাশালী। ভট্টিকাব্যের লেখক ভট্টিকবি ব্যতীত তাঁহার তুল্য শব্দালঙ্কারের মাধুরী কেহই দেখাইতে পারেন নাই। কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ
স্ফুট পরাগ পরাগত পঙ্কজং।
মৃদু লতান্ত লতান্ত মলোকয়ৎ
স সুরভিং সুরভিং সুমনোভরৈঃ॥
নব কদম্বরজোরুণিতাম্বরৈ
রধি পুরন্ধ্রি শিলীন্ধ্র সুগন্ধিভিঃ।
মনসি রাগবতা মনুর গিতা
নব নব বন বায়ুভিরাদদে।
জগতি নৈশ মশীতকরঃ করৈ
র্বিয়তি বারিদবৃন্দ ময়ন্তমঃ।
জলজরাজিষু নৈদ্রমদিদ্রব
ন্নমহতা মহতাঃ কুচ নারয়ঃ॥

৬ষ্ঠ সর্গ, মাঘ।

যে উচ্চ কবিহৃদয়ের পরিচয় দিয়া মাঘ প্রাচীন পণ্ডিতগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রাচীনেরা যাঁহাকে সংস্কৃত কবিগণের সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় মাঘ ১৬শ সর্গের ২১ হইতে ৩১ শ্লোকে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা হইতে দুটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

স্বকুমার মহো লঘীয়সাং
হৃদয়ং তদ্গত মপ্রিয়ং যতঃ।
সহসৈব সমুদ্গিরন্ত্য মী
ক্ষপায়ন্ত্যেবহিতগ্মনীষিনঃ ॥ ২১।

উপকার পরঃ স্বভাবতঃ
সততং সর্ব্বজনস্য সজ্জনঃ।
অসতামনিশং তথাপ্যহো
গুরুহৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ ॥ ২২।

২১ শ শ্লোক হইতে ২৫ শ শ্লোক ভিন্ন ৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত বঙ্গানুবাদ এইঃ—

আহা লঘুব্যক্তিদের অন্তঃকরণ কি ক্ষুদ্র? যে হেতু হৃদয়স্থ অপ্রিয় ভাব গুলি তাহারা সহসা প্রকাশ করিয়া ফেলে, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহা অতিযত্নে গোপন করেন ।২১। সাধু শীল ব্যক্তি সর্ব্বদা সকলের উপকারী, তথাপি তাঁহাব উন্নতিতে অসাধুদিগের হৃদয়ে সন্তাপ উপস্থিত হয়, কি আশ্চর্য্য ।।২২। অন্যের উন্নতি হইলে উত্তম ব্যক্তিরা কিছুমাত্র ব্যথিত হয়েন না, মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা কিঞ্চিৎ সন্তপ্ত হইলেও মনোভাব গোপন করেন, কিন্তু অধম ব্যক্তিরা তাহাদের পরশ্রীকাতরতারূপ অসদ্ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে ।২৩। রৌদ্র বা তাপ নাশে অক্ষম ফলহীন বা প্রয়োজন-বিরহিত পুষ্প কিম্বা সদাশয় ব্যক্তি কর্তৃক ত্যক্ত অবিদ্যমান-রূপিণী গগনলতিকার ন্যায় খলতা কেন বিজ্ঞব্যক্তি অবলম্বন করিবেন ।২৪। মহান্ ব্যক্তিরা ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, ক্রোধ লঘুব্যক্তিকে বলে জয় করিয়াছে, অতএব পরাজিত ক্রোধ কর্তৃক অভিভূত দুর্ম্মতি ব্যক্তির সহ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-দের আবার প্রতিদ্বন্দ্বীতা কি? ।২৬। অসাধুদিগেব উদ্ধত বাক্যে কি কখন মহান্ ব্যক্তিদের গৌরব নষ্ট করিতে পাবে? ধূলি দ্বারা আচ্ছন্নমণিব মহামূল্যত্ব কি দূর হয় ।।২৭। অন্যের পরিতোষ জন্মাইতে পারে, যাহার এমন কোন গুণ নাই, সেই লঘুব্যক্তিই অন্যেব দোষ কীর্ত্তন করিয়া আত্মীয় জনকে পরিতুষ্ট করিতে ইচ্ছা করে ।।২৮। অসাধুরা নিজের দোষ অতিমহৎ হইলেও স্বভাবতঃই উহা দেখিতে পায় না, কিন্তু অন্যের দোষ দর্শনে সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং আত্ম-প্রশংসায় বড় প্রগল্‌ভভাষী, অপিচ অন্যের প্রশংসার অবসর উপস্থিত হইলেই মৌনাব-লম্বন করিয়া থাকে ।।২৯। উন্নতমনা ব্যক্তিরা অন্যের দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়াও উহা চিরকালের জন্য গোপনের নিমিত্ত অতিশয় নৈপুন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আত্মগুণ প্রকাশের জন্য কোনই কৌশল করেন না ।।৩০। মহাত্মা ব্যক্তি সর্ব্বলোকে প্রখ্যাত আত্মগুণ কেনই বা প্রকশে করিবেন, ক্ষুদ্রব্যক্তির গুণের বক্তা অন্য কেহ নাই, তজ্জন্যই সে আত্মপ্রশংসা নিজেই করিতে বাধ্য হয় ।।৩১।।

মাঘ, কবি ছিলেন বলিয়া যে বিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্র জানিতেন না, এমন নহে, তিনি স্বরচিত গ্রন্থে বিজ্ঞান ও দর্শনজ্ঞতার সুন্দর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। দিবসে গগনাবলম্বী নক্ষত্রগণ কেন অদৃশ্য হয়, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ইউরোপীয় বিজ্ঞান খুজিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই, কবি উক্ত বিজ্ঞান না জানিয়াও উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ দৃশে ভাস্কর রুচাংহি নঘঃ
সতমীস্তমোভিরভিগমাত্তাং।
দ্যুতিমগ্রহী দগ্রহ গণোলঘবঃ
প্রকটি ভবন্তি মলিনাশ্রয়ন্তঃ ॥

৯ম সর্গ, মাঘ।

যে গ্রহগণ সূর্য্যের কিরণে দিবসে পরিলক্ষিত হয় না, সেই গ্রহগণ অন্ধকারময়ী রজনী প্রাপ্ত হইয়া দীপ্তিলাভ করিয়া থাকে, ক্ষুদ্রেরা প্রায়ই নিকৃষ্টের আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। *

মাঘ প্রথম সর্গে সাঙ্খ্যমতাবলম্বী হইয়া কৃষ্ণকে প্রকৃতি ও পুরুষের অন্যতর পুরুষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যথা ;—

উদাসিতারং নিগৃহীতমানসৈ
গৃহীত মধ্যাত্ম দৃশা কথঞ্চন।
বহির্ব্বিকারং প্রকৃতেঃ পৃথগ্বিদুঃ
পুরাতনং ত্বাং পুরুষং পুরাবিদঃ॥ ৩৩।
১ম সর্গ, মাঘ।

পূর্ব্বজ্ঞ কপিলেরা তোমাকে পুরাতন পুরুষ বলিয়া জানেন, সংযতচেতাঃ যোগীরা তোমাকে অধ্যাত্মনয়নে কথঞ্চিৎ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। তুমি উদাসীন (অর্থাৎ প্রকৃতি স্বার্থ প্রবৃত্ত হইলেও তুমি স্বয়ং অপ্রাকৃত বলিয়া প্রকৃতি কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট) এবং বিকার হইতে বহিঃস্থ ও মহদাদি হইতে পৃথক্॥

মাঘকৃত শিশুপালবধ পাঠ করিয়া যেমন আনন্দ, তেমন ক্ষোভও উপস্থিত হয়। যদি ১৯শ সর্গের একাক্ষরী, দ্ব্যক্ষরী, সমুদ্গ, গোমূত্রিকাবন্ধ, অতালব্য, নিরোষ্ঠ্য, অসংযোগ, অর্থত্রয়বাচী, সর্ব্বতোভদ্র, প্রভৃতি রচনা করিয়া তিনি মূল্যবান্ সময় ও চিন্তা ব্যয় না করিতেন, তাহা হইলে মাঘকৃত আরও কত কাব্য পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিতাম! পূর্ব্বতন কবিদিগের রুচি প্রদর্শনের জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

একাক্ষরী।

দাদদো দুদ্দদুদ্দাদী
দাদাদো দুদদীদদোঃ।
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে
দদাদদদদো দদঃ॥ ১৪৪।

সর্ব্বতোভদ্র।

স কা র না না র কা স
কা য় সা দ দ সা য় কা
র সা হ বা বা হ সা র
না দ বা দ দ বা দ না। ২৭।
১৯শ সর্গ মাঘ।

এই চিত্রময় শ্লোকটীর যে দিক হইতেই পাঠ করা যাউক না কেন, এক রূপ অর্থ উদ্ভাবিত হইবে।

উদ্ধৃত দুইটী কবিতা ও ষষ্ঠ সর্গের কয়েকটী কবিতায়, শব্দের বৈচিত্র্য ব্যতীত তত ভাবের মাধুর্য্য নাই; সুতরাং অনুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীনেরা মাঘকে কালিদাস ভারবি অপেক্ষা উচ্চতম স্থান প্রদান করিলেও ফলতঃ তিনি এই উভয় কবির নিম্নে ও অন্যান্য কবির উচ্চে আসন পাইবার যোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্য সংসারে কালিদাস অদ্বিতীয়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তাঁহার নিম্নেই ভারবি, কারণ মাঘের বর্ণনার আতিশয্য প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারবিতে তাহা নাই—"ভারবেরর্থ গৌরবং" এই কথাটী পক্ষপাত শূন্য ও সার্থক। কিন্তু যদিও মাঘ সংস্কৃত সাহিত্যের তৃতীয় কবি কিন্তু ভবভূতি ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহার নিকটে আসন পাইবার যোগ্য নহে। নৈষধকার শ্রীহর্ষ তাঁহার অনেক নিম্নবর্ত্তী। শিশুপালবধের শেষ ভাগে কবির যে বংশাবলী লিখিত হইয়াছে, উহা হইতে আমরা প্রবন্ধান্তরে মাঘ ভট্টের আবির্ভাব কাল ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রকটনের চেষ্টা করিব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন।

* সূর্য্য কিরণে নক্ষত্রগণের অদৃশ্য হওয়ার বিষয় ভাস্করাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্ত শিরোমণি (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ত্রিপুরারাজ্য, বর্ত্তমান মহারাজা ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কুকিদিগের অত্যাচার কাহিনী বর্ণন করিব বলিয়া আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কুকিদিগের জাতীয় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। সুতরাং রণ-দুর্ম্মদ কুকিদিগের দ্বারা ব্রিটীস ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে যে সকল লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। *

ভাষাতত্ত্বালোচনা দ্বারা অনুমিত হইয়াছে যে বাঙ্গালার পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতবাসী মানবগণ সকলেই এক বংশ সম্ভূত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে তিব্বতি-ব্রহ্মবংশজ বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাদিগকে "লৌহিত্য" বংশজ বলিয়া উল্লেখ করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। এই লোহিত্য বংশের একটি প্রধান শাখা "তাওঁংতা" শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। তাওঁংতাগণ অনেকগুলি শ্রেণী বা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা, মরুং (ত্রিপুরা,) রিয়াং, রাংখল চিলু, পৈতু, খজাক (খচাক) তাঙ্গন, কামহাউ, হাউলং, সাইলু, সিন্ধু প্রভৃতি। পূর্ব্বকালে তাওঁংতা বংশীয় মরুংগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল। ত্রিপুরার মহারাজ মরুংজাতির সরদার। সুতরাং পরাক্রমশালী মরুংদিগের সাহায্যে তিনি সমস্ত তাওঁংতা বংশকে স্বীয় করতলস্থ করিয়াছিলেন। তাওঁংতা বংশীয়দিগের মধ্যে মরুংদিগকে ত্রিপুরা ও অন্যান্য মানবগণকে বঙ্গবাসীগণ কুকি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কাছারবাসীগণ ইহাদিগকে লুচাই নামে পরিচিত করিতেন, আমাদের রাজপুরুষগণ কাছারীদিগের নিকট হইতে "লুসাই" শব্দটী গ্রহণ করিয়াছেন।

মুসলমানদিগের সহিত অবিশ্রান্ত কলহ করিয়া যখন ত্রিপুরেশ্বর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তখন ত্রিপুররাজবংশীয়গণ আত্ম কলহ দ্বারা রণ দুর্ম্মদ কুকিদিগকে অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীর অন্তভাগে ইহার সূত্রপাত হয়। তদবধি দুর্দ্দান্ত কুকিগণ পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বঙ্গীয় সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করত নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া আসিতেছে।

রামগঙ্গা ও দুর্গা মানিক্যের কলহ কালে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে পৈতু কুকিগণ ত্রিপুরা আক্রমণ করে। তৎকালে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট সৈন্য দ্বারা ত্রিপুরেশ্বর রামগঙ্গা মাণিককে সাহায্য না করিলে রামগঙ্গা সপরিবারে কুকিদিগের দ্বারা নিহত হইতেন।

১৮২৪—১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের প্ররোচনায় কুকিগণ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণ ত্রিপুরা রাজবংশীয় রামকানু ঠাকুরের সহিত সম্মিলিত

---

* কুকিদিগের অত্যাচার কাহিনী বিস্তৃত ভাবে লিখিতে গেলে এক বৎসরের নব্যভারতেও তাহার স্থান সঙ্কুলান হইবে কিনা সন্দেহ, এজন্য আমরা সংক্ষেপে লিখিতে মনস্থ করিয়াছি।

হইয়া ত্রিপুরার অন্তর্গত খণ্ডল পর্য্যন্ত নর-রুধীরে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত লোমহর্ষণ ঘটনাগুলি এবং তৎপরবর্ত্তী আরও কয়েকটী ঘটনা প্রধানত পৈতু কুকি দ্বারা হইয়াছিল, এজন্য এস্থলে আমরা তাহাদের রাজবংশের একটী বংশাবলী অঙ্কিত করিতেছি। বিগত শতাব্দীর অন্তকালে পৈতু কুকির প্রধান সরদার শিব্‌বুত ২৫ হাজার কুকি পরিবার লইয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার উত্তর পুরুষদিগের মধ্যে অদ্যাপি কেহ কেহ স্বাধীন রহিয়াছে; অন্যেরা ত্রিপুরেশ্বরের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক তাহাদের জাতীয় প্রথা অনুসারে কর প্রদান করিয়া থাকে।

রাজা মুরাছুইলাল * ডুকিনীপুর
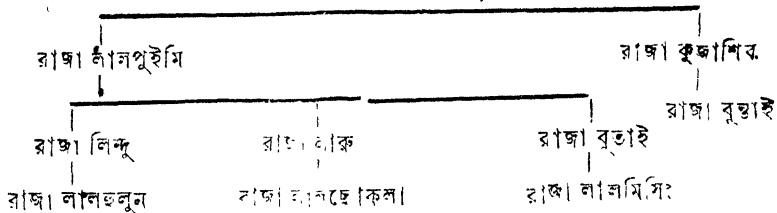
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের অন্তভাগে পরাক্রমশালী পৈতু কুকিসরদার লারুর মৃত্যু হয়। তাহার উপযুক্ত পুত্র লালছোকলা পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য উপযুক্ত রূপ সম্পন্ন করিবার জন্য মানস্থ করিলেন। এরূপ এক জন পরাক্রমশালী বীরের শ্রাদ্ধ কার্য্য কখনই নরমুণ্ড ও দাসদাসী ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। বিশেষত ব্রিটীশ রাজ্যের অস্ত্র শস্ত্র বিহীন অধিবাসী হইলে নরমুণ্ড কিম্বা দাসদাসী সংগ্রহের সুবিধা হয় না। সুতরাং বীরবর লালছোকলা ত্রিপুরা পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল রাত্রে শ্রীহট্টের অন্তর্গত প্রতাপগড় পরগণার মধ্যগত কচুবাড়ী নামক গ্রাম আক্রমণ করিয়া ২০টি নরমুণ্ড ও ৬টি দাসদাসী সংগ্রহ করিলেন। শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট এই লোমহর্ষণ ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারকারীগণকে ধৃত করিবার জন্য ত্রিপুরার মহারাজকে লিখিলেন, মহারাজ ত্রিপুরেশ্বরদিগের চিরন্তন প্রথানুসারে তদুত্তরে লিখিলেন যে, "উহারা তাহার অধীনস্থ নহে।" * কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার মহারাজকে অত্যাচারী কুকিদিগকে ধৃত করিবার জন্য লিখিলেন। অগত্যা মহারাজ বাধ্য হইয়া এক জন দারোগাকে ১০ জন বরকন্দাজের সহিত লাল ছোকলাকে ধৃত করিবার জন্য প্রেরণ

* মুরছাইলালের রাণীরাণী খোদী সুবিখ্যাত "লুসাই" সরদার ভুত্পুইলালের ভগিনী।

* অনেক সময় ত্রিপুরেশ্বর কুকিদিগকে তাহার অধীনস্থ নহে বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এবম্প্রকার অবস্থায় মণিপুরেশ্বরগণ ইহা কখনও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত পাইলেই কুকিদিগের দমনজন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়া আপনাদের রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতেই রাজ্যের বর্ত্তমান আয়তন ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এরূপ উত্তর প্রদান পূর্ব্বক ত্রিপুরেশ্বরগণ তাহাদের রাজ্য নিতান্ত খর্ব করিয়া লইয়াছেন।

করিলেন। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎসংবাদ শ্রবণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ইহাকে তাঁহারা একটী প্রহসন বলিয়া মনে করিলেন।

প্রবন্ধ-লেখক ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, কুকিরাজ লাল ছোকলা কিয়ৎ পরিমাণে ত্রিপুরেশ্বরের অধীন ছিলেন। লালছোকলার পুত্র মুরছইলালের নাম পাঠকগণ মৎপ্রণীত ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে দেখিতে পাইবেন।

গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরেশ্বরের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে লিখিলেন যে, আগামী ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে প্রকৃত অত্যাচারীকে ধৃত করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ না করিলে ব্রিটিস সৈন্যদল তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যাচারকারীকে ধৃত করিবে। এই ঘটনার পর ত্রিপুরেশ্বর ৪জন কুকি অপরাধীকে ২৭ জন সাক্ষীর সহিত শ্রীহট্টের মেজেষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিল যে, তাহারা ইহার কিছুই অবগত নহে। এই সকল ঘটনায় কিছু কাল অতিবাহিত হইল, অবশেষে নিরূপিত ১লা ডিসেম্বরে কাপ্তেন ব্লেকউড একদল পদাতি সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করত লাল ছোকলার গ্রাম অবরোধ করিলেন।

ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ৪ঠা ডিসেম্বর লালছোকলা কাপ্তেন ব্লেকউডের হস্তে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু প্রবন্ধলেখক বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছেন যে, ত্রিপুরেশ্বর জনৈক (সেনাপতি কেলি ফেরিঙ্গী) লালছোকলাকে ধৃত করিয়া ব্লেকউডের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে লাল ছোকলার বিচার হয়। সেই বিচারে লাল ছোকলা দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণ শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত স্থানে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, দেড়শতের অধিক প্রজা তাহাতে বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সংবাদ গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মহারাজ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাহার রাজ্য মধ্যে হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার, গবর্ণমেণ্টের কোন অধিকার নাই। কিছু কাল এই কথা লইয়া গণ্ডগোল চলিয়াছিল। অবশেষে কাপ্তেন ফিসারের মানচিত্র দ্বারা ঘটনা স্থানে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত নির্ণীত হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল। তৎপর মহারাজ এই দুর্বৃত্তদিগের দমন জন্য আর কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সিন্দু, খচাক ও লুসাই প্রভৃতি কুকিগণ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও কাছার দেশে প্রবেশ করিয়া অনেক গুলি লোকের প্রাণ সংহার ও কয়েকখানি গ্রাম ভস্মীভূত করিয়াছিল। এই সময় কুকিগণ প্রায় ৪২ জন লোককে ধৃত করিয়া লইয়া যায়।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট কুকিদিগের দ্বারা এই রূপ জ্বালাতন হইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন কর্ণেল লেষ্টার সৈন্য লইয়া কাছার হইতে কুকিদিগের বাসস্থানাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় পূর্ব্বদিক হইতে

প্রায় ৪০০ কুকি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে ও কাছারের দক্ষিণদিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আর একদল কুকি শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাতু থানার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের চিরঅভ্যস্থ নরহত্যা গৃহ দাহ প্রভৃতি কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া পলায়ন করে। লাতুর নিকটবর্ত্তী স্থান ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া মহারাজ বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিলেন, এবং আক্রমণকারী কুকিগণও ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ বলিয়া প্রকাশ হইয়াছিল।

কর্ণেল লেষ্টারের যুদ্ধ যাত্রার ফল মোটের উপর এই হইয়াছিল যে, বিখ্যাত কুকি সরদার সুকপাইলাল গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কুকিদিগের এই সকল স্বীকৃত বাক্যের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিলেও আমরা এই সকল অসভ্য বর্ব্বরদিগকে কিছু মাত্র বিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হউক, ইহার পর প্রায় দশবৎসরকাল কুকিদিগের দ্বারা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কোন ঘটনা হয় নাই। কেবল ১৮৫০—৫১ সালে চট্টগ্রামের সীমান্ত কতক গুলি গ্রাম কাঠুরিয়া কুকিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক, আমাদের গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য এই সময় যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, তন্মধ্যে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য জেলা সৃষ্টি করিয়া তথায় এক জন ইংরাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সংস্থাপন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে খণ্ডলের বিখ্যাত হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। আমরা বাল্য কালে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, অদ্যাপি তাহা স্মরণ করিলে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। পাঠকগণ, সেই দুঃখের কথা কি বলিব। কানপুরে বিদ্রোহী সিপাইগণ যে লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহা অনন্তকাল ইতিহাস পটে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু কানপুরের হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় অভিনয় স্বরূপ খণ্ডলের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ কতজন পাঠক অবগত আছেন? আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিজ্ঞাপনীতে এই ঘটনা এই রূপ সামান্য আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

"Early in January 1860, reports were received at Chittagong, of assembling of a body of 400 or 500 Kookis at the head of the River Fenny, and soon the tale of burning villages and slaughtered men gave token of the work they had on hand. On the 31st January, before any intimation of the purpose could reach us, the Kookis, after sweeping down the course of the Fenny, burst into the plains of Tipperah at Chagalneyah, burnt or plundered 15 villages, butchered 185 British subjects, and carried off about 100 captive."

এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া রাধা মোহন নামক জনৈক গ্রাম্য কবি একটি গীতি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আমরা বাল্য কালে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। সেই কবিতা সম্পূর্ণ রূপে এক্ষণে আমাদের স্মরণ নাই। * তাহার

* এই কবিতার কিয়দংশ যাহা স্মরণ আছে, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল;—

শুন সর্ব্ব সাধু ইহার নির্ণয়,
যেন মতে খণ্ডলেতে কাটা কাটি হয়।

সারাংশ মাত্র স্মরণ রহিয়াছে। তৎকালে যাহারা পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাদের নিকট এই ঘটনা যেরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এইস্থলে তাহাই প্রকাশ করা গেল।

দেখ মাঘ মাসে শনিবারে শ্রীপঞ্চমী ছিল।
মুনসীর থীল বাজারে বাবু ধুরন্ধর * আছিল।
সেদিন প্রভাত কালে,
করেছিল পূজার আয়োজন,
চিনি শর্করাদি যত লয় মন।
পূজা আরম্ভিল, হেন কালে প্রমাদ ঘটিল।
অকস্মাৎ তিপ্রাকুকি এসে দেখা দিল।
তারা দাও সেল হাতে, বন্দুক কান্দে দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দেখে প্রাণ ভয়ে কাঁপে কালা ভুসঙ্গর।
ঘরে প্রবেশিল।
যারে পায় কাটিয়ে ফেলায়,
অবনিতে কাটা পরি ধুলাতে লুটায়।
রুধির আবেসিল।
আকাশেতে উড়িছে শকুন। ঘর নিচয় লুঠ করি চালে দেয় আগুন।
তারা খন্তা নিল, কুড়ল নিল আর নিল দাও কাঁচি।
সিন্ধুক ভাঙ্গি কাপড় নিল ভাল ভাল বাচি।
* * * *
ঠিক দুপর বেলা হল পুড়ে মুনসী বাড়ী।
সেদিন ফিরে যায়। রাত পোহাল ছিল রবিবার।
কাটা গ্রামে কাটি আসি দেল পুনর্ব্বার।
* * * *
চলেছে কোলা পাড়া।
কোলা পাড়া যেতে তারা করেছে গমন।
বাউনালীর † কোলে আসি দিল দরশন।
দেখে গুণাগাজি,
গুণাগাজি এল সাজি, সিকাই সঙ্গে করি।
তিপ্রা কুকি ফিরাইল, বন্দুক আওয়াজ করি

---

* কাপ্তেন ধরনীধর সিংহ, ত্রিপুরেশ্বরের এক জন সেনাপতি।

† বাউনালী নদী।

মুনাসীরথীল নামক গ্রামস্থ বাজারে ত্রিপুরেশ্বরের জনৈক সেনাপতি—কাপ্তেন ধরনীধর সিংহ কতিপয় সৈন্যের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। ১৬ই মাঘ শনিবার শ্রীপঞ্চমী পূজা ছিল। কাপ্তেন তাহার সঙ্গীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া পূজার জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে, ৪০০।৫০০ কুকি নিকটবর্ত্তী গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে। কাপ্তেন মহাশয় এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র অস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করিলেন। কুকিগণ নির্ব্বিঘ্নে গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক গ্রামবাসীদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল! যে সকল রমণী শিশু সন্তানের সহিত কুকিদিগের হস্তে ধৃত হইল, কুকিগণ সেই সকল শিশুকে মাতার বক্ষ হইতে কাড়িয়া লইয়া শূন্যে নিক্ষেপ করত নিম্নে সুতীক্ষ্ণ সেল ধারণ করিয়া শিশুগুলিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল! হতভাগিনী জননীগণ এই রূপ নিষ্ঠুরতার সহিত অপত্য নিধন দর্শনে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কুকিগণ পুরুষ মাত্রকেই নির্দ্দয়তার সহিত হত্যা করিয়া যুবতী রমণীগণকে পশুর ন্যায় বন্ধন করত আপনাদের সঙ্গে লইয়া চলিল। তাহারা এই রূপে ১৫ খানা গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত ও ১৮৫ জন মনুষ্যের প্রাণ সংহার করত প্রায় একশত জন মনুষ্যকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, তন্মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ যুবতী। এই ১৫ খানা গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া তাহারা যে সমস্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, ও লৌহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই লইয়া গিয়াছিল।

এই সময় গুণাগাজি নামক গ্রামস্থ এক জন প্রধান ব্যক্তি চতুর্দ্দিকস্থ পল্লি সমূহ

অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রায় ২৫। ৩০টি বন্দুক সংগ্রহ করিয়া বাউনালী নদীর তটে কুকিদিগকে আক্রমণ করে। কুকিদিগের অধিক বন্দুক ছিল না, সুতরাং তাহারা বন্দুকের মুখে নদী পার হইতে সাহসী না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। বিশেষত কুকিগণ প্রায়ই সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হয় না। ওগাগাজি এরূপ সাহস অবলম্বন না করিলে যে আরও কত গ্রাম ভস্মীভূত এবং কত লোক কুকিদিগের দ্বারা বিনষ্ট হইত, তাহা কে বলিতে পারে ?

জেলা ত্রিপুরার মেজিষ্ট্রেট সাহেব এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র কতিপয় সৈন্য খণ্ডলাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কেবল মাত্র কুকিদিগের অত্যাচারের জলন্ত চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিলেন। কুকিগণ ইহার পূর্ব্বেই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল।

এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"It was at first supposed that this extended movement on the part of these tribes was directed by certain near relatives of the Tipperah Raja, and was intended to involve that chief in trouble with the English Government. But it was afterwards ascertained, with considerable certainty, that the main instigators of the invasion were three or four Hill Tipperah refugees, Thakurs who had lived for sometime among Kookis, and who took advantage of the ill-feeling caused by an attack made by the Raja's subjects upon some Duptung Kookis, to excite a rising, that unfortunately became diverted to British territory. Driven by the Raja from his dominions, these men had formed alliance among the various Kooki tribes interior, and year by year villages, supposed to be friendly to the Raja, had been attacked and plunderd, vague rumours of which disturbances had reached our ears. Some of the Raja's own subjects, moreover, exasperated by his constant exactions, were believed to have invited the Kookis to ravage his territories."

উল্লেখিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ আমরা যাহা অবগত আছি, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন। ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে রিয়াং নামক সম্প্রদায় আছে, ইহারা কুকিদিগের ন্যায় তত ভীষণ প্রকৃতি না হইলেও, নিতান্ত নিরীহ জাতি নহে। রিয়াংগণ খণ্ডলের বাঙ্গালী মহাজনগণ হইতে সর্ব্বদা টাকা কর্জ লইত। পার্ব্বত্য প্রদেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রায় দুই তিন বৎসর শস্য জন্মে নাই। সুদে আসলে অনেক টাকা হইয়া দাঁড়াইল। মহাজনেরা সর্ব্বদা রিয়াংদিগকে টাকার জন্য তাগাদা করিত। তাহারা ইহা অসহ্য বোধে দুথাং ও অন্যান্য কুকিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই কার্য্য সম্পাদন করে। ইহাতে কৃষ্ণ চন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি রাজ বংশীয় কয়েক জন ব্যক্তি সংসৃষ্ট ছিলেন। মতান্তরে পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতবাসী রতনপুইয়া নামক সরদারও ইহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল।

কুকিদিগের অত্যাচারে যে সকল খণ্ডবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট

তাহাদিগকে ১৩৭০০ টাকা ক্ষতি পূরণ স্বরূপ প্রদান করেন। ইহার অর্দ্ধাংশ ত্রিপুরেশ্বর হইতে আদায় করা হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার মানসে তৎ পর বৎসর শীতকালে একটি যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে (১৮৬১ খ্রীঃঅঃ জানুয়ারিতে) ও একদল কুকি ত্রিপুরেশ্বর-দিগের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করে। উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরের একটী সেনা-নিবাস ছিল। তাহাতে এক জন হাওল-দার ও ২৫ জন সিপাই থাকিত। ইহারা কুকিদিগের নাম শ্রবণ মাত্র, "মেগেজিন" ফেলিয়া পলায়ন করে। কুকিগণ সেই মেগেজিনের বারুদ ও গুলি গোলা প্রাপ্ত হইয়া প্রবল বিক্রমে উদয়পুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী দুই খানা গ্রাম ও একটি প্রকাণ্ড রাজার ভস্মীভূত ও কতকগুলি লোকের প্রাণবধ করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে। তথায় চাকমা সরদার কালিন্দী রাণীর অধিকৃত কয়েক খানা গ্রাম অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের একদল পুলিস সৈন্যের সহিত তাহা-দের একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে কুকিগণ বিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিল।

এই সকল ঘটনার পর কুকিদিগকে বিশেষ রূপে নির্য্যাতন করিবার মানসে ত্রিপুরেশ্বরের সহিত উপযুক্ত পরামর্শ করিবার জন্য কাপ্তান গ্রেহাম সাহেব আগড়তালায় প্রেরিত হন। সেই সকল বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

তৎপর বৎসর বর্ত্তমান মহারাজ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে) চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণাংশে কোন গণ্ডগোল হয় নাই, কিন্তু উত্তরাংশে শ্রীহট্ট জেলায় সীমান্তবর্ত্তী স্থানে আদমপুরের বিখ্যাত হত্যাকণ্ড সম্পাদিত হয়।

ইতি পূর্ব্বে পৈতু কুকির যে বংশাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, লাল ছোকলারপুত্র মুবছুইলাল বিখ্যাত লুসাই সরদার ছুকপাই-লালের ভগিনী ভানুইথাঙ্গীকে বিবাহ করেন। কোন কারণ বসত মুবছুই লাল স্বীয় পত্নী ভানুইথাঙ্গীকে অপমানিত করেন। উপযুক্ত ভ্রাতার উপযুক্ত ভগিনী সেই অপ-মান সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় ভ্রাতা ছুক পাইলালকে তৎ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া-ছিলেন। তাহাতেই কুকিদিগের মধ্যে একটি গোলযোগ উপস্থিত হয়। মতান্তরে মুবছুই-লালের সহিত ভানুথাঙ্গীর বিবাহ কালে, কন্যার যৌতুক প্রদান করিবার জন্য আদমপুর আক্রমণ করিয়া কতকগুলি দাস দাসী সংগ্রহ করা হইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক না কেন, মুবছুইলাল, ছুকপাইলাল, রাংবুং ও লালহুলন নামক ৪ জন কুকিরাজা সম্মিলিত হইয়া ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রাম ও শ্রীহট্টের অন্তর্গত আদমপুরের নিকটবর্ত্তী তিন খানা গ্রাম অগ্নি দ্বারা দগ্ধ ও কতকগুলি লোক নির্দ্দয় ভাবে হত্যা ও কতকগুলি লোক বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এই ৪ জন সরদার মধ্যে মুবছুইলাল ও রাংবুং ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ এবং ছুকপাইলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন, লালহুলুন মুবছুইলালের খুল্লতাত ভ্রাতা ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আদমপুরের হত্যাকাণ্ডের পর ১৮৬২-

৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্টে বলে ও কৌশলে কুকি সরদারদিগকে বাধ্য করিয়া পূর্ব্বসীমান্তে শান্তি সংস্থাপন করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন সুপারিটেণ্ডেন্ট গ্রেহাম রতন পুঁইয়ার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। তৎ কালে ইহা অবধারিত হয় যে সীমান্ত প্রদেশে শান্তি রক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট প্রতি বৎসর রতন পুঁইয়াকে ৪০০ টাকা, হাউলংদিগের ৮০০ টাকা ও লাইলো কুকিগণ ৮০০ টাকা বার্ষিক প্রদান করিবেন।

উত্তরদিক কাছারের ডিপুটী কমিসনর ষ্টুয়ার্ট সাহেব বিখ্যাত সরদার ছকপাইলাল ও মোল্লা সুরদার বনপুইলালের সহিত সামান্য প্রকারের সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সুকপাইলাল গবর্ণমেন্টের আনুগত্য স্বীকার করত শান্তি রক্ষা করিলে তাহাকে বার্ষিক ৬০০ টাকা গবর্ণমেন্ট হইতে প্রদত্ত হইবে, এরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল।

আদমপুরের হত্যাকাণ্ডের সময় কুকিগণ যে সকল স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া লইয়া যায়, তন্মধ্যে কয়েকটি পালাইয়া কাছারে উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যান্য স্ত্রীলোক গুলিকে কুকিগণ বিবাহ করে।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে কুকিগণ নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহারা বাঙ্গলার সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই।

১৮৬৫ এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণ বঙ্গীয় সমতল ক্ষেত্রে কোন অত্যাচার করেনাই। কিন্তু তৎকালেও যে তাহারা তাহাদের চিরঅভ্যস্থ কার্য্যে বিরত ছিল, এমত নহে, কারণ সেই সময় তাহারা আত্ম কলহে নিযুক্ত ছিল। সৌভাগ্য বশত আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের সতর্কতায় তাহারা সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়নাই।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসে প্রায় ৫০০ শত হাউলাং তাহাদের রাক্ষস বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষগণ রতন পুঁইয়ার দ্বারা এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র চট্টগ্রামের পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য যত্নবান হইলেন। হাউলংগণ সেই দিকে সুবিধা প্রাপ্ত না হইয়া ত্রিপুরা রাজ্যাভিমুখে ধাবিত হইল। সৌভাগ্যবশত হাউলংগণ এবার ত্রিপুরা রাজ্যে কোনরূপ উপদ্রব করিতে সক্ষম হয় নাই।

১৮৬৮—৬৯, ৬৯—৭০, ৭০—৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর কুকিদিগের অত্যাচার কার্য্য সমভাবে চলিয়াছিল। কাছারের চাক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যে সময় যেস্থানে সুবিধা পাইয়াছে, সেই সময় সেই স্থানেই তাহাদের চির অভ্যস্ত গৃহ দাহ,নর হত্যা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আপনাদের রাক্ষস বৃত্তি চরিতার্থ করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করি নাই। আমাদের গবর্ণমেন্ট এই সকল অত্যাচার নিবারণ জন্য যথাসাধ্য যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। কাছারও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে সৈন্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে কি হইতেছে, সেই রাজ্যের পূর্ব্ব দিকস্থ দুর্দ্দান্ত কুকিদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্বর কি রূপ ব্যবহার করিতেছেন, গবর্ণমেন্ট তাহার নিশ্চয় সংবাদ কিছুই প্রাপ্ত হন না। অথচ দুর্দ্দান্ত কুকিজাতিকে দমন জন্য আশু একটী যুদ্ধ যাত্রার

প্রয়োজন হইয়াছে, তৎকালে ত্রিপুরারাজ্যে জনৈক গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী না থাকিলে তাহার ফল সন্তোষজনক হইবে কিনা, তাহা স্থির বলা যাইতে পারে না। এই সকল কারণে বাধ্য হইয়া গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরারাজ্যে একজন পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। কুকি অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার উইলিয়ম গ্রের প্রস্তাব অনুসারে লর্ড মেও ত্রিপুরা রাজ্যে জনৈক পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্তের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে আরও দুই বৎসর অতীত হইয়াছিল।

প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত না করিলে, কাছার ও চট্টগ্রাম প্রান্তে সৈন্য স্থাপন করিয়াও গবর্ণমেণ্ট কুকিগণকে সম্পূর্ণরূপে নির্যাতন করিতে পারিতেন না। আভ্যন্তরিক ঘটনা অবগত না হইয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে দোষারোপ করা বঙ্গীয় সম্পাদকদিগের মধ্যে একটি রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামরিক বিভাগের প্রতি ত্রিপুরেশ্বরদিগের উপযুক্ত দৃষ্টি না থাকাতেই কুকিগণ এরূপ প্রবল হইতে সক্ষম হইয়াছিল। এসম্বন্ধে মণিপুর পতি-দিগের কার্য্য কলাপ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। রাজস্ব সম্বন্ধে তুলনা করিতে গেলে মণিপুর-পতি ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ প্রধান তালুকদারের সহিত একসঙ্গে স্থান প্রাপ্ত হইতে পারেন। মণিপুর-পতির রাজস্ব প্রায় পঞ্চবিংশতি সহস্র মুদ্রা মাত্র। তথাপি তাঁহার অধীনে চারি শত সুশিক্ষিত সৈন্য রহিয়াছে। কুকিগণ মণিপুর রাজ্যে কোনরূপ সামান্য অত্যাচার করিলে মণিপুরেশ্বর স্বীয় উপযুক্ত ও সুদক্ষ সৈনিকদিগের সাহায্যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিশোধ লইয়া থাকেন। আর আমাদের ত্রিপুরেশ্বরগণ সেই সকল অত্যাচার ও অপমান নীরবে সহ্য করিয়া থাকেন। ত্রিপুরেশ্বর গীত বাদ্য ও চিত্র বিদ্যা প্রভৃতি অকর্ম্মণ্য কার্য্যের জন্য এবং পৌনে দুই গণ্ডা দেওনের কল্যাণ প্রতি বৎসর যে অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, সেই অর্থ সৈন্য বিভাগে ব্যয় করিলে তাহার কত উন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধি হইতে পারে। তাহার ৪০০।৫০০ শত মাত্র সৈন্য আছে, সে গুলিও তত উপযুক্ত নহে। তাহারা আবার নিয়মিত রূপ বেতন প্রাপ্ত হয় না। মহারাজের সৈন্য-গণ নিয়মিত রূপে বেতন না পাইয়া তাহা-দের দুঃখের কাহিনী পলিটিকেল এজেণ্টকে জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এই সকল দুঃখের কথা কাহাকে বলিব!

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।

বিরহ-সঙ্গীত।

১

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

বলিতে দিয়াছে বিধি, যত সাধ ব'লে যাও।
হাসিয়া সুধার হাসি, যত সাধ হেসে চাও।

এ ভুল ক'রেছি যবে,
সকলি সহিতে হবে;
যা কর তা শোভা পাবে, কর যাতে সুখ পাও।

তোমার সুখের লাগি,
কি না পারি হা অভাগি!
প্রাণ ল'য়ে তুচ্ছ খেলা, হেসে হলাহল দাও।

---

(২)

বেহাগ খাম্বাজ—আড়া।

যত—কর উপহাস,
ভাঙা প্রেম জোড়া দিতে মিছে এ প্রয়াস।
যে স্বপন গেছে দূরে,
সে নেশা আর কি ফিরে?
ওড়া পাতা আরো ওড়ে লাগিলে বাতাস।

---

(৩)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

সুখ-সাধে প'ড়ে দুখ-ফাঁদে—
অবোধ মন সদা কাঁদে।
ভাবিয়া না পায় কিছু কি দিয়ে পরাণ বাঁধে।
বোঝেনি বিভল মন—
প্রেমে আছে বিস্মরণ,
স্বপনেতে জাগরণ, দহন শীতল চাঁদে।

---

(৪)

বাগেশ্রী—আড়া।

ফিরিতে হইবে যদি মিলন-সাগরে এসে,
তা হলে এ খর-স্রোতে কে সাধে—
আসিত ভেসে!
উজানে আধেক বাই,
হৃদে আর বল নাই!
কেমনে ফিরিয়া যাই, সে চির-বিরহ-দেশে।
মিছে ভাঙা গিরি-বাঁধা,
মিছে ত্যজা গুহা-আঁধা,
ভালবেসে ছিল কাঁদা সেই যদি আগে শেষে।

---

(৫)

টোরি, কাওয়ালী।

আর—সহেনা যাতন,
ধরণী হয়েছে পুরাতন।
হেরি উষারূপ-রাশি
মনে পড়ে তার হাসি;
বিধু-কোলে সে বিধু-বদন।
হেরিলে কাননে ফুল
মনে পড়ে সেই ভুল,
সে আকৃতি, সে প্রীতি-নয়ন।
কাঁপে বায়ু ফুল-বাসে
মনে হয় সেই শ্বাসে;
বিহগ কূজনে সে বচন।
নবীনতা-হারা ধরা,
স্মৃতি পুরাতনে ভরা!
দাও ভেঙে এ ধরা এ মন—
ওরে রে মরণ!

---

(৬)

সফর্দা, আড়া।

কাটে না সময় আর, আসেনা মরণ,
বেঁচে আছি—পড়ে আছি জড়ের মতন।
কিছুতে বসেনা আশা,
ধরা যেন পর-বাসা;
কোথা পর-ভালবাসা, কোথা সে স্বপন!
কোথা সে সুখের সাধ,
সাধের সে অবসাদ,
সাধা-সাধি কাঁদা-কাঁদি বাঁধিতে জীবন;
স্রোত-হারা নদী মত,
প'ড়ে আর রব কত!
শুকাতেছি পলে পলে, মরিব কখন?

৭

ঝিঁঝিট, মধ্যমান।

কাঁদিব কত আর
বাঁধিব কত হিয়ে—
যাতনা সুধু সার
আপনা পরে দিয়ে।
বোঝে না পরে মন,
খোঁজেনা পর জন (এ মন),
কেমন সুখ-পণ
স্বপন-খেল নিয়ে
কাঁদিব কত আর!

৮

সাহানা, যৎ।

সুধু-আঁখির পিপাসা,
হ'তো যদি আজি হায় আমার এ ভালবাসা
কত ফুল, কত ছবি,
আধ শশী, নব রবি,
কত গিরি, কত নদী মিটাত নয়ন-আশা।
এ যে রে প্রাণের ভুল,
অকাল মরণ-মূল!
শূন্য-পানে চেয়ে চেয়ে শূন্য প্রাণে—
কাঁদা-হাসা!
নহে আঁখির পিপাসা
আমার এ ভালবাসা।

৯

পিলু, যৎ।

রাজ-পথ দিয়ে ধীরে পথিক গেলো।
মুখ-পানে চেয়ে তার, কার মুখ মনে এলো!
মানুষ মানুষ-কাছে
কি বাঁধনে বাঁধা আছে।
সে আছে সবার পাছে, একি স্মৃতি, একি—
খেলো!
মোরে সুধু দূরে রাখি,
সে আছে সবারে ঢাকি,
যা দেখি তারেই দেখি, একি বেঁধা—
মারা-শেল।

১০

হাম্বির, কাওয়ালী।

কোথা তুমি ধ্রুব-তারা!
অকূল বিরহ-মাঝে আমি আজি লক্ষ্য-হারা।
গরজে নিরাশা-ঝড়,
অভিমান কড়-কড়,
ডোবে ডোবে হৃদি-তরী, ঝর ঝর নিন্দা-ধারা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

উৎকল-ভ্রমণ।

(পুরীর রাস্তা ও পিপ্‌লী চটী।)

সেই উত্তপ্ত ধূলিময় রাস্তা দিয়া, ফাল্গুন মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথায় করিয়া গাড়ী ঈষৎ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পূর্ব্বদিনের অর্দ্ধাহার বা অনাহার, রাত্রের দারুণ পথ-কষ্ট, প্রাতের ভ্রমণ—এ সকলে শরীর অবসন্ন হওয়ারই কথা। এক গাড়ীতে দুই জন, এক জন পীড়িত—গাড়ীর পার্শ্ব ১৷৷,১৸ হাত বই নয়—তাতে শরীর অবসন্ন, তাতে

আগুনকণা চতুর্দ্দিকে, তায় ধূলিবালি গাড়ীর চতুর্দ্দিকে সদাই উড়িতেছে—কষ্টের আর সীমা নাই। কিন্তু এই বিষম কষ্টের মধ্যেও সুখ পাইলাম। পুরীর প্রশস্ত সুদীর্ঘ পথ এক অলৌকিক কীর্ত্তিস্তম্ভ। হিন্দু রাজাদিগের সময়ে এই প্রকাণ্ড পথ নির্ম্মিত। আসামের ট্রঙ্ক রোড দেখিয়াছি, পরেশনাথ পাহাড় ও বগডরের নীচ দিয়া ভারতের যে প্রকাণ্ড প্রশস্ত ট্রঙ্ক (Great trunk road,) গিয়াছে, তাহাও দেখিয়াছি, কিন্তু তুলনায় পুরীর রাস্তাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। শুনিলাম, জনৈক ইংরাজ-ভ্রমণকারী এই রাস্তাটীকে ভারতের একটী আশ্চর্য্য কীর্ত্তিস্তম্ভ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই রাস্তা নিম্ন ভুমি হইতে অনেক উচ্চ। রাস্তার দুই পার্শ্বে নানা বৃক্ষ সারি সারি বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন কাহিনী নীরবে ঘোষণা করিতেছে। কোন কোন স্থানের বৃক্ষগুলি আধুনিক। এই সুদীর্ঘ রাস্তা মেদিনীপুর হইতে বালেশ্বর, বালেশ্বর হইতে কটক, এবং কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং রাস্তাটী বহুদূর বিস্তৃত। মধ্যে মধ্যে যে সকল বড় বড় নদী পড়িয়াছে, সে সকল নৌকায় পার হইতে হয়, তদ্ভিন্ন ছোট ছোট নদীর উপর বিস্তর প্রস্তর-নির্ম্মিত পুল বিদ্যমান। কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, তাহাতে কয়েকটী অপেক্ষা-কৃত বড় নদী পড়িয়াছে, কিন্তু যে নদী শীত কালে জল-শূন্য, সুধু বালুময়, গরুর গাড়ী তাহার উপর দিয়া চলিয়া যায়। বর্ষাকালে নৌকায় গাড়ী পার হয়। এই রাস্তার মধ্যে যে সকল পুল আছে, সেই সকলের প্রত্যেক পুলেই স্মারক-লিপি ছিল, কিন্তু ইংরাজ-বাহাদুর যে সকল স্মারক-লিপি অন্তর্হিত করিয়া আপন গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিতেছেন। পুরীর রাস্তা প্রস্তর-নির্ম্মিত। পাহাড় হইতে রাশি রাশি প্রস্তর খণ্ড আনয়ন করিয়া রাস্তার উপরই ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে, দেখিলাম। সে প্রস্তর অপেক্ষাকৃত কোমল, ঈষৎ লালবর্ণ, যেন না-মাটী-না-পাথর। পুরীর রাস্তায় যত যাত্রীর ভিড় হয়, এত আর ভারতের কোন রাস্তায় হয় কি না সন্দেহ। অসংখ্য লোক, অসংখ্য মালের গাড়ী, যাত্রীর গাড়ী—অনবরতই চলিতেছে। দোল ও রথ যাত্রার সময়ের ত কথাই নাই। তখন সময়ে সময়ে রাস্তার লোক ঠেলিয়া চলা দুষ্কর হইয়া উঠে। এই প্রকাণ্ড রাস্তার স্থানে স্থানে যাত্রী-নিবাস বা চটী আছে। চটীতে খড়ের ঘর, পাতকুয়া, কোথাও দুই একটী পুকুর, কোথাও নদী, যাত্রীদিগের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বিদ্যমান আছে। ইংরাজ-বাহাদুর অনেক চটীতে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য পায়খানা প্রস্তুত করিয়া মহৎ উপকার করিয়াছেন। পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষ অবিভেদে এক মাঠে, পাশাপাশী হইয়া, মল মূত্র ত্যাগ করিত। চাঁদবালীতে এ রূপ দৃশ্য এখনও দেখা যায়,—আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। চাঁদবালী ভদ্রকের অধীন; এইটী জাহাজ হইতে অবতরণের স্থান—এখানে পায়খানার বন্দোবস্ত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্ট যে সকল পায়খানা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার একদিকে পুরুষ ও একদিক স্ত্রীলোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট;—ঠিক যেন রেলওয়ে ষ্টেসনের বন্দোবস্ত। বড় বড় চটীতে বড় বড় পায়খানা। কিন্তু এই পায়খানার ধারেই—স্থানে স্থানে অসংখ্য নর-কঙ্কাল দেখা যায়। পুরীর পথে যখন বসন্ত বা ওলাউঠার ধুম পড়ে,—তখন সৎকার করি-

বার লোক থাকে না। রাস্তার ধারে মৃত, অর্দ্ধমৃত লোকদিগকে ফেলিয়া যাত্রীরা পলায়ন করে। সে অতি ভীষণ দৃশ্য। আমরা স্থানে স্থানে এই রূপ রাশি রাশি নর কঙ্কাল দেখিয়া অনেক বার অশ্রুপাত করিয়াছি, এবং ভাবিয়াছি, যে তীর্থের জন্য এত আয়োজন--সেই তীর্থের পথে চিকিৎসালয়ের কোন বন্দোবস্ত হিন্দু রাজারা কেন করেন নাই? আমাদের দেশের দানের ব্যবস্থা অন্যরূপ। যে পথে সহস্র সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে পথে ঔষধের কোন বন্দোবস্ত নাই, দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইলাম। কত ধনী ব্যক্তি এই ভারতে বিদ্যমান, কিন্তু কেহই ইহার সুব্যবস্থা করিতেছেন না; এ দুঃখ আর রাখিবার ঠাঁই নাই। এখন দুই একটী স্থানে গবর্ণমেণ্ট চিকিৎসালয় প্রস্তুত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প এবং তাহার বন্দোবস্ত এত সামান্য যে, মানুষ-সাগরের উপর দিয়া যখন প্রবল পরাক্রমে মারিভয়ের ঢেউ চলে, তখন কিছুই প্রতিবিধান করিতে পারে না। যা'ক। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে ও সুন্দর রাস্তার শোভা দেখিতে দেখিতে, শারীরিক কষ্টের কিছু লাঘব হইল। গাড়ী চলিতে চলিতে বেলা আনুমানিক দুই ঘটিকার সময় পিপ্‌লীতে পৌঁছিল। পিপ্‌লী একটী প্রকাণ্ড চটী, এখানে দাতব্য-চিকিৎসালয়, ডাকঘর, থানা, রেজেষ্ট্রারের আফিস, পুকুর, বাগান ও বহু দোকান পসারী আছে। এটী যেন একটী ছোট সহরের মত। মধ্যদিয়া পুরীর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে;—দুই ধারে সারি২ অসংখ্য ঘরবাড়ী। পুরীর সকল চটীতেই বাজার আছে, কিন্তু এখানকার বাজারটী কিছু বড়। বাজারে চিড়া, গুড়, চাউল, ডাইল, তৈল, লবণ, কাষ্ঠ,—এবং সর্ব্বস্থানেই—প্রচুর পরিমাণে পান পাওয়া যায়। পিপ্‌লীতে পৌঁছিয়াই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম। পথে ভাবিতেছিলাম, পীড়িত বন্ধুকে কি পথ্য দিব, পিপ্‌লীতে পৌঁছিয়াই দেখি, গাড়ীর নিকট গরম দুগ্ধ লইয়া দুই তিনটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হাজির। এ এক অপরূপ ব্যাপার। পুরী হইতে ফিরিবার সময় এই খানে কত চেষ্টা করিয়াছি, দুগ্ধ পাই নাই। কিন্তু আজ দারুণ অভাবের দিনে, বিধাতা অসহায়দিগের জন্য যেন এই মহা আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন! দেখিয়া অবাক হইলাম, চক্ষু হইতে জল পড়িল। বিধাতার এই অযাচিত দান, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, বন্ধুকে কতক পান করিতে দিলাম, কতক রাখিয়া দিলাম, আমিও কিছু পান করিলাম এবং ভাবিলাম, এই জন্য বুঝি বা সেই কোপিলেশ্বরের পুরীষময় সাগু আনা ঘটে নাই। কতক ক্ষণ পর দেখিলাম, সেখানে মৎস্যও উপস্থিত। বন্ধুকে কতক সুস্থ করিয়া স্নান করিলাম এবং গাড়োয়ান ভায়ার যত্নে কিছু অন্নাহার করিলাম। এই পিপ্‌লীতে বন্ধুর কয়েকবার দাস্ত হইল। তাহাতেই যেন দারুণ জ্বর পলায়ন করিতে লাগিল। ঔষধ-পথ্যহীন নর-কঙ্কালপূর্ণ সেই রাস্তায়, বিধাতা আমাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া যেন আপনি অবতীর্ণ হইলেন। বন্ধুর আরো অনেকবার জ্বর হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোন বারই এত অল্পে ছাড়ে নাই। বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া মোহিত হইলাম, দেহের ও মনের ক্লান্তি এই পিপ্‌লী সহরের বাজারে ফেলিয়া বেলা ৫ টার সময় আবার গাড়ীতে উঠিলাম। পিপ্‌লী সহর বহুদূর বিস্তৃত—অর্থাৎ এই রাস্তার বহুদূর পর্য্যন্ত পিপ্‌লীর সজ্জিত গৃহরাজি পরিশোভিত। পিপ্‌লীতে অনেক নারিকেল গাছ আছে, দেখিলাম। এই স্থান হইতে নারিকেল গাছ আরম্ভ। পুরী জেলায় নারিকেল গাছের যেরূপ আমদানী, উড়িষ্যায় আর কোথাও তেমন নাই। পুরী জেলা সমুদ্রের তীরে স্থাপিত, সুতরাং লবণাক্ত, এই জন্যই বুঝি নারিকেলের কিছু অধিক স্ফূর্ত্তি। পুরীর রাস্তা দিয়া গাড়ী ক্রমাগত চলিতে লাগিল। পথে স্থানে স্থানে দস্যুর ভয়, কিন্তু গাড়ীতে যে বিপদ—দস্যুর ভয় করিবার অবসর ছিল না;—সে বিষয় ভাবিবারও সময় ছিল না। গাড়ী ক্রমাগত

চলিল। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় আর একটী চটীতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া অল্প বিশ্রাম করা হইল; এবং কিয়ৎ কাল পরেই গাড়ী ছাড়া হইল। গরুভায়াদের আহার,খড়,ও কুড়া (কুণ্ড) অথবা চূর্ণীকৃত তুষ। এই কুড়া সকল চটীতেই প্রায় পাওয়া যায়। কুড়া জলে মিশাইয়া দিলে গরু-ভায়ারা মহাহ্লাদে তাহা উদরস্থ করে। ইহাতে অধিক সময়ও লাগেনা আছে,অথচ গরু খুব সবল ও সুস্থ থাকে। সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিল। বেলা আটঘটিকার সময় রাস্তায় যাত্রীর ভিড় বাড়িল। বেলা বৃদ্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে বুঝিলাম, আমরা পুরীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। যাত্রীগণের আনন্দ,উৎসাহ দেখিয়া মোহিত হইলাম, আপনাদিগের ধর্ম্মজীবনকে শত ধিক্কার দিলাম। জগন্নাথের মন্দির দেখিলেই যেন সকল কষ্ট দূর হইবে—এই আশায় তাহারা—সকল কষ্ট ভুলিয়া তীরবেগে রুধিরাক্ত পায়ে ছুটিয়াছে। কেহ ছিন্নবস্ত্র জড়াইয়া পায়ের রক্ত নিবারণ করিতেছে,কেহ মস্তকে মলিন বস্ত্রে রৌদ্রের তেজ নিবারণ করিতেছে;—পথকষ্টে শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তবুও তাহাদের মুখ প্রসন্ন। এমন দৃশ্য দেখিলেও নবজীবন লাভ হয়। আমরা জীবনে আর কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই। জীবন যেন এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইল। ক্রমে জগন্নাথমন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত নিশান গগনে বাহু তুলিয়া তুলিয়া তুলিয়া যেন যাত্রীদিগকে কত আশার কথা বলিয়া ডাকিতেছে। যখন মন্দিরের নিশান ও শ্বেত চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল—তখন চতুর্দ্দিক হইতে মহা কল্লোলে "জয় জগন্নাথ"শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। সে যে কি আনন্দের ব্যাপার, সে যে কি উৎসাহের সংবাদ, ভাষায় ব্যক্ত হয় না। আমারা যাত্রীগণের মূর্ত্তিতে ধর্ম্মজীবনের অনন্ত তত্ত্ব পাঠ করিতে করিতে সেই শ্রেষ্ঠতীর্থাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, নানা রূপ বেশধারী পাণ্ডাদের যাতায়াত বাড়িতে লাগিল, অনেক অনেক ছোট ছোট মন্দির সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এই রূপ মহা সুখ উপভোগ করিতে করিতে,গাড়ী ৯ টার সময় আঠারনালার নিকট পৌঁছিল। লোকে বলে এবং হণ্টার সাহেবের পুস্তকে লেখা,আঠার, কিন্তু দুটী রাখাল বালকের কথানুসারে গণিয়া দেখিয়াছি, এই প্রকাণ্ড পুলে আঠার খিলানের পরিবর্ত্তে ১৯টী খিলান আছে। এই পুলটী মারহাট্টাদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ। এত বড় পুল পুরীর রাস্তায় আর নাই। সমস্ত খিলান গুলি প্রস্তর নির্ম্মিত। কখনও যে ধ্বংস হইবে, মনে হয় না।

সাহিত্য-বাজার। (৩)

(সংবাদ ও সাময়িক পত্র।)

গত দুইবারে সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতির কথা বলিয়াছি, কিন্তু সংবাদ ও সাময়িক পত্রের কথা কিছুই বলি নাই। সংবাদ ও সাময়িক পত্র সাহিত্য-বাজারের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলশক্তি। সর্ব্বদেশের জাতীয় ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, সংবাদ ও সাময়িক পত্র ভিন্ন কোন দেশ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এজগতে সাময়িক পত্রের ন্যায় জাতীয় ভাষার পৃষ্ঠপোষক আর দ্বিতীয় নাই। এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিস বাঙ্গালায় কেমন উন্নতিলাভ করিতেছে বর্ষারম্ভে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। পত্রিকাদি সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মতামত প্রদানের জন্য আমরা বিশেষরূপ অনুরুদ্ধও হইয়া থাকি। কিন্তু নানা কারণে এ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আমরা কোন কথা বলি নাই। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় এ সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা না বলিলে প্রস্তাবটা

অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অতি অরুচিকর হইলেও, সেই জন্য, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। পূর্ব্বে সংবাদ পত্রের বর্ষ-সমালোচনায় এ কার্য্যটী এক রূপ নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু, কি জানি কেন, এখন কোন সংবাদ-পত্রকেই এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে দেখি না। ইহার কারণ কি, জানিনা। অন্যের প্রশংসা অসহ্য, অন্যের উন্নতি-ঘোষণা নিজের পক্ষে অনিষ্টকর, অথবা অন্যকে ভাল বলিলে নিজে ছোট হইতে হয়, সেই সকল কারণ ঘটা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু কোথাও যে এরূপ ঘটে না, তাহাও বলা কঠিন। এই সকল কারণেই হউক, বা অমনোযোগিতার জন্যই হউক, সময়ের অল্পতা প্রযুক্তই হউক, অথবা লোকের অপ্রিয় হইবার ভয়েই হউক,—এখন আর বর্ষ-সমালোচন কালে সম্পাদকগণ সংবাদ ও সাময়িক পত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন না। অমুক রাজা জাগিল, কি অমুক রাজা মরিল, ইহাপেক্ষা সাহিত্য-সেবক ও জাতীয় উন্নতি-প্রয়াসী-দিগের পক্ষে, কোন পত্রিকার কিরূপ অবস্থা হইল, কোন্ কাগজ নূতন সৃষ্ট হইল, কোন্ কাগজ প্রাণত্যাগ করিল, এই সকল সংবাদ অধিক আকর্ষণের জিনিস। আমাদের দেশে পত্রিকার উন্নতি হইতেছে না কেন? অনেক কাগজই অসময়ে প্রাণ-ত্যাগ করে কেন, এ সকল তত্ত্বের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখন এ সম্বন্ধে অনেকেই নীরব। অন্য সকলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া আমাদেরও নীরব থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া শেষ করিয়া ছাড়া উচিত, বিবেচনায়, এই কার্য্য প্রবৃত্তি হইলাম।

মানুষ যেসকল কাজ করে, সেসকল কাজেরই একটা লক্ষ্য বা একটা উদ্দেশ্য থাকে। পৃথিবীতে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া যশোমন্দিরে স্থায়ী-আসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের লক্ষ্য বাল্যকালেই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে যত বড় বড় সম্পাদক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকল সম্পাদকই একটা লক্ষ্যস্থির করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশটা কিছু স্বতন্ত্র ভাবে চলিয়াছে। এদেশে লক্ষ্য স্থির অতি অল্প ব্যক্তির হইয়াছে। স্রোতে ভাসমান তৃণ বা বায়ুতে উড্ডীয়মান ধূলিকণার ন্যায় আত্ম-লক্ষ্যশূন্য আমাদের দেশের বহু লোক ঘটনা-স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছেন। পরিণাম কেহ ভাবে না, কেহ গণে না। লক্ষ্য স্থির করিয়া অগ্রসর হওয়া যে উচিত, একথা বড় একটা গণনার বিষয় নয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে বসিলে, এত অকৃতকার্য্যতা আমাদের দেশের ভাগ্যে ঘটিত কিনা, সন্দেহ।

ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে, লক্ষ্যহীনতা বশতই আমাদের দেশের সংবাদ-পত্র-বাজারের এত হীনাবস্থা। সম্পাদকীয় কার্য্যটা একটা সখের জিনিশের ন্যায় হইয়াছে। অনেকের পক্ষেই এটা একটা জীবনের ব্রত নয়। কোন রূপ ব্রত গ্রহণ করিলে অল্পে কেহই ছাড়ে না। বাঙ্গালীর গ্রাহক-গণের ঘোরতর ঔদাসীন্য এসম্বন্ধে আছে বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে গেলে বলিতেই হইবে, দোষ গ্রাহক অপেক্ষা দায়িত্ব-হীন সম্পাদকগণের অধিক। এই দোষেই অনেক কাগজ দুই এক মাস পরেই উঠিয়া যায়। নাম কিনিতেও ইচ্ছা, অথচ দায়িত্ব বোধ নাই, উপযুক্ত আয়োজন নাই, অর্থবল নাই। এরূপ হইলে উন্নতি হইবে কেন, বলত?

অনেক ভাল কার্য্যের সূত্রপাত এদেশে হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞান-সভা ভিন্ন একটারও ভাল ফল ফলে নাই। বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং করপোরেসন হইতে আরম্ভ করিয়া ইণ্ডিয়ান লিগ, রিপন-মেমোরিয়াল-কমিটি প্রভৃতির অকৃতকার্য্যতা স্মরণ করিলে মনে হয় না, কুষ্ঠাশ্রম (Leper Asylum) ভিক্টরের স্থায়ী মেমোরিয়াল কমিটির দ্বারা সংস্থাপিত হইবে। সকল কাজেই অপরিণাম-দর্শিতা, বাহ্যাড়ম্বর ও চিন্তাহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া, যে লক্ষ্য স্থির করিয়া কাজ করে, সে অকৃতকার্য্য হইবে কেন,

মোটেই বুঝি না। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই যেন উদ্দেশ্য-হীন লক্ষ্যহীন। জাতীয় সাহিত্যের যাঁহারা সেবক, তাহারা সকলই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। যাঁহারা দেশের উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু বলিতে দুঃখ এবং লজ্জা হয়, বৎসরের মধ্যে কত হিতৈষীর অভ্যুত্থান হয়, আবার পতন হয়।—কত সাহিত্য-সেবক জন্মগ্রহণ করেন, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, আবার অন্তর্হিত হন; খুঁজিয়া আর বাজারে পাওয়া যায় না। বৎসরের মধ্যে কত নূতন কাগজ জন্মগ্রহণ করে, কত কাগজ কলেবর ত্যাগ করে, ভাবিলে বিস্ময়ে ডুবিতে হয়। গ্রাহকেরা টাকা দেয় না, লোকেরা সহায়তা করে না, বন্ধুগণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন না, একথাত সর্ব্ববাদীসম্মত; জানিয়া শুনিয়া কি ব্রত গ্রহণ করা উচিত? দোষ গ্রাহকদের, না চিন্তাবিহীন অপরিনামদর্শী সম্পাদকগণের? গত বৎসর এই রূপ চিন্তাবিহীন কত সম্পাদক অভ্যুদিত হইয়া যে জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। দুই দশদিন সখ মিটাইবার জন্য যে এরূপ কার্য্যে সকলে ব্রতী হন, বুঝি না। বর্ত্তমান সময়ে দেশের এরূপ অবস্থা উপস্থিত যে, কোন নবসহযোগীকে জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিলে আর আনন্দ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না;—কখন তাহার পতন হয়, এই কথাই মনে জাগে। যে সকল সহযোগীগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্থির-লক্ষ্য ব্যক্তি অনেক আছেন। কেহ কেহ লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, এমনও আছেন। কেহ কেহ লক্ষ্য-শূন্য হইয়া রহিয়াছেন, এমনও আছেন। সে সকলের ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া বড় সোজা কথা নয়, এবং তাহা সকলের প্রিয় হইবারও কথা নয়। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে প্রধান প্রধান পত্রের অবস্থা যথাযথ রূপ প্রকাশ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব, কোন্ পত্রিকার দ্বারা দেশের কিরূপ উপকার হইতেছে। দায়িত্ব-হীন, ভাষা-জ্ঞান-হীন, অন্যের অনিষ্টকারী, "হাম-বড়", যে সকল সম্পাদক বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা একার্য্যে খুব বিরক্ত হইবেন, জানি। কিন্তু তাঁহাদের বিরক্তির জন্য আমাদের কোনই উপায় অবলম্বনের পথ নাই।

ফুলরেণু।

বিরহ।

মিলন হইতে দেবি! বরঞ্চ বিরহ ভাল,
দেখিব বলিয়া আশা মনে থাকে চিরকাল!
নিরাশা নাহিক জানি,
সদা শুনি দৈববাণী,
মৃত সঞ্জীবনী ভাষা-"বাসি ভাল! বাসি ভাল!"
যে দিকে—যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব বিশ্ব-রূপে করে আ'ল!
মিলনে বিরহ ভয়,
আকুল করে হৃদয়,
চুম্বিতে চমকি উঠি, নিশি বা পোহায়ে গেল!

সামান্য নারী।

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ?
শূন্য ক'রে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ?
একটু গিয়েছে হাসি,
একটু গিয়েছে কান্না,
একটু আঁখির জলে মাখা অভিমান!
একটু চুম্বন গেছে,
একটু নিশ্বাস দীর্ঘ,
একটুকু আলিঙ্গন—তৃণের সমান!
যা গেছে সে ক্ষুদ্র গেছে,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে,
তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য স্থান?
সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস

বিদ্যালয়ের নীতিশিক্ষা ও গবর্ণমেণ্ট।

টমসন বাহাদুর যখন বাঙ্গলার তক্ত জলুস করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণনগর, যশোহর ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানের বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে লইয়া কয়েকটী মোকদ্দমা হয়। তাহাতে অনেক গৌরাঙ্গ সম্প্রদায়ের চিহ্নিত মহাত্মারা বালকদিগের উপর বড়ই চটিয়া যান। স্বয়ং ছোট লাট টমসন বাহাদুর কলিকাতা সিটি বিদ্যালয়ের গৃহপ্রতিষ্ঠা সভায় যখন প্রবেশ করেন,তখন ছাত্রেরা নাকি তাঁহাকে করতালী দিয়া অভ্যর্থনা করে নাই; আর বড়লাট রিপণ বাহাদুর পৌঁছিতে না পৌঁছিতে করতালীর বজ্রনিনাদ হইয়াছিল। তাহাতে ছোটলাট একটু খানি মুখ ভারি করেন। ইহা ছাড়া মফঃস্বলের অনেক রাঙ্গা হুজুর হাটে বাটে মাটে ঘাটে পরিভ্রমণের সময় বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সেলাম বহুৎ বহুৎ কার্য্যনঞ্চাগে প্রাপ্ত হন নাই, ইহাও শুনিতে পাওয়া যায়। গয়াক্ষেত্রে এক দিন পিণ্ড না পড়িলে গয়াসুর মাথা তোলেন, মা মনসার দুধ কলার বরাদ্দ না হওয়াতে "বেউলা কেঁদে রাঁড় হ'ল"; পূজ্য পূজকের সম্বন্ধ এমন বাঁধাবাঁধি থাকিতেও এত বিভ্রাট কেন ঘটিয়াছিল, বুঝি না। হাজার হইলেও গয়াক্ষেত্রে আমাদেরই পিতৃপুরুষের ভূত; মা মনসা আমাদেরই ঘরের ঠাকুর; তাঁহাদিগকে বরং একদিন চটান যায়, কিন্তু যে দেবতাদিগের সঙ্গে এক সূর্য্যে ধান ভানিয়া খাইবার সম্পর্কটাও নাই, তাঁহাদিগকে এমন করিয়া ঘাঁটানটা ভাল কি? কাজটা বড় ভাল হয় নাই। এক বৎসর ধরিয়া প্রথমে কাণাঘুসা চলিল, তাহার পর সহসা একদিন লাটের সভায় স্থির হইয়া গেল যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রগুলি বড় দুর্বিনীত। নীতিহীনতার পরিচয় আরও দেখা গিয়াছে; রাজপুত্রের অভ্যর্থনায় ছোটলাট বেলী কেলির পক্ষে, বাইনাচের দিকে,বাজীপোড়ানের অনুকূলে; আর চেঙ্গড়া ছেলেগুলি কুষ্ঠরোগীদিগকে দুটী পয়সা দিতে চায়। আর সহ্য হইল না, বালকদিগকে নীতিপরায়ণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নীতিশিক্ষার গ্রন্থও রচিত হইয়াছে; The Government of India নামে এক খানি পুস্তকও বুঝি এই উদ্দেশ্যে।

যে কারণেই হউক, সরকার বাহাদুর যে নীতিশিক্ষার পক্ষপাতী হইয়াছেন, এটা শুভ লক্ষণ। শারীরিক শিক্ষা, মানসিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, এ সকলি চাই, নহিলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, শিক্ষা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ থাকে, একথা সকলেই মানে। কিন্তু এতদিন দেশীয় লোকের ধর্ম্মের উপর পাছে হাত দেওয়া হয়, এই আশঙ্কায় নীতিশিক্ষার বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট উদাসীন ছিলেন; এখন কিন্তু বেশ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বড় গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্ট সমূহের নামে চিঠি জারি হয় যে, বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অবাধ্য, দুর্বিনীত, বে-আড়া; ইহার কারণ অনুসন্ধান করা চাই এবং প্রতিকারের ঔষধির ব্যবস্থাও করা চাই। লাট সভার নির্দ্ধারণে এ কথা কয়টী এইরূপ আছেঃ—"In the letter addressed by the Home department

to Local Governments and Administrations, their attention was drawn to the growth of tendencies unfavourable to discipline and favourable to irreverence in the rising Generation in India". প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্ট-সমূহ, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, পরিদর্শক প্রভৃতি মান্যগণ্য ১০ দশ জনের মত জানিয়া পাঠান। এই সকল মত সংগৃহীত হওয়ার পর বড় লাটের নির্দ্ধারণ সহ সেগুলি এক সঙ্গে ২৫৫ পৃষ্ঠার একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়া দুটাকা মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। এগ্রন্থে দেখিবার ও শিখিবার অনেক কথা আছে। এদেশে যাঁহারা শিক্ষা কার্য্যের সহিত সংসৃষ্ট, যাঁহারা বাস্তবিকই দশজনের মধ্যে একজন, এরূপ অনেক ব্যক্তির মত এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। তাঁহাদিগের মত ও অভিপ্রায়ে নূতনত্ব বড় একটা থাকুক আর নাই থাকুক, খুব বৈচিত্র্য আছে।

বঙ্গদেশের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক শ্রীমান ক্রফট্ ও মান্দ্রাজের সরকারী বড় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীমান ডানকান যাহা বলিয়াছেন, এ প্রকাণ্ড গ্রন্থের মধ্যে তাহাই খুব আলোচনার যোগ্য। বালকদিগের দুর্বিনয় রোগের কারণ সম্বন্ধে ডানকান (Duncan) যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি সার কথা। ডানকান বলেন যে, এ রোগ যে কেবল ভারতবর্ষীয় বালকদিগকেই আক্রমণ করিয়াছে, তাহা নহে। এ সংক্রামক রোগ সমগ্র সভ্য পৃথিবীময় ছড়াইয়াছে। যাহা কালের লক্ষণ, কালের ধর্ম্ম, কালের গতি, তাহা ভারতবর্ষেও দেখা দিয়াছে, তাহার বিচিত্র কি? এ যুগের দর্শন, বিজ্ঞান প্রাচীন কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে; সুতরা নব্য শিক্ষিতেরা প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন; কোন কথায় আর পীর পয়গম্বর মানে না, দোহাই মানে না। কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, সকল বিভাগেই গুরুতর বিপ্লব চলিতেছে। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, নূতন শিক্ষা পদ্ধতি, বিচার পদ্ধতি প্রভৃতি ধীরে ধীরে হিন্দুজাতির চিত্তে এক বিপুল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে; ইংরাজের ধর্ম্মাধিকরণে ব্রাহ্মণ শূদ্রে, রাজা প্রজায় প্রভেদ নাই; ইংরাজি পাঠশালায় প্রাচীন সংস্কারের নীচ জাতীয় বালক উচ্চ জাতীয় বালককে পরাভূত করিয়া সম্মান লাভ করিতেছে; সুতরাং নূতন ভাব-তরঙ্গের অভিঘাতে চারিদিকে উচ্ছৃঙ্খলতা খুব দেখা দিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, এই উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়া যিনি প্রাচীন প্রথার মধ্যে এই যুগের যুবকদিগের মাথা গুঁজিয়া দিতে চান, তিনি প্রবহমান গঙ্গার স্রোত বাম হস্তে ঠেলিয়া গোমুখীর ক্ষুদ্র গর্ভে পূরিবার অভিলাষী। বালকেরা শাস্ত্র মানে না, দোহাই মানে না; বিচার করিয়া আপনার পথ আপনি দেখিয়া লইতে চায়, এসকল কুলক্ষণ নহে, সুলক্ষণ। তবে ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা চলিয়াছে, বিচারের নামে দুর্বিনয় স্থান পাইতেছে, তাহার অবশ্যই প্রতিকার চাই। আসল কথা এই, স্বাধীন ভাব বিনষ্ট করিতে না দিয়া বরং যাহাতে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার হয়, এরূপ শিক্ষা চাই। উচ্ছৃঙ্খল বালকদিগের চিত্ত নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র নেতা চাই। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়, সুসংস্কৃত বিজ্ঞানানুমোদিত নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া বালকদিগকে নিয়-

মিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন ও পাইতেছেন; এবং এবিষয়ে তাঁহার কৃতকার্য্যতা কতদূর, তাহা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ছাত্রসভার যাঁহারা খবর রাখেন, তাঁহারা বিশেষ সাক্ষ্য দিতে পারেন। ব্রাহ্মদিগের এই সাধু উদ্যমের কথা ক্রফট্ বাহাদুর স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বলেন যে, ব্রাহ্মদিগের প্রভাব বালকদিগের উপর খুব বহু বিস্তৃত নহে। এ কথা এ ব্রাহ্মলেখকও স্বীকার করেন। এখন দেখা যাউক, গভর্ণমেণ্ট এই নীতি শিক্ষার ভার লইতে গিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে ফলবত্তার আশা কত দূর।

একথা বিচারের পূর্ব্বে, ক্রফট্ মহোদয়ের অভিপ্রায় হইতে দুই একটী কথা তুলিব। ক্রফট্, বহরমপুর বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয়ের সারগর্ভ কথা গুলিতে সায় দিয়া সেই গুলি তুলিয়া বলিয়াছেন যে, এদেশের গৃহ সুসংস্কৃত না হইলে বালকদিগকে সুনীতিপরায়ণ করিবার চেষ্টা দুরাশা মাত্র। যে গৃহের পিতামাতার শিক্ষা, রুচি ও মতের প্রতি সন্তানেরা শ্রদ্ধাহীন, সে সংসারের বালকেরা যে বিদ্যালয়ের শিক্ষকের প্রতি বড় একটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে পারিবে, এ আশা নাই। যেখানে শ্রদ্ধা ভক্তির প্রকৃত শিক্ষা-স্থল, সেখানে যদি তাহা না হয়, তবে বাহিরে হইবে কি প্রকারে? আরও কথা আছে; ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে উচ্চ উচ্চ মত শিক্ষা করে, কিন্তু গৃহে সমাজের খাতিরে সে গুলি চাপিয়া রাখিয়া, যাহা মানে না, তাহারই বাধ্যতা স্বীকার করে। এইরূপে গভীর কপটতায় চরিত্রের গ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহারা নিজে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া আরও ১০ জনকে দুর্নীতি-পরায়ণ করিয়া তুলে। কোন স্থলে পৃথিবী টলিয়া গেলেও আত্মবিশ্বাসের আদর ও সম্মান করিতে হইবে, এবং কোন স্থলে প্রাণ পাত করিয়াও বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে, তাহা বড় লোকে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছে না; সুতরাং ইহাদের স্বাধীন নস্ত্রে একে আর ফল হইতেছে। একথাও ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ অনেক বার বলিয়া বলিয়া শ্রান্ত হইয়াছেন।• কিন্তু গভর্ণমেণ্ট কিছু গৃহ-সংস্কার করিতে পারিবেন না। তবে বিদ্যালয়ের বালকদিগকে সৎসাহসে অনুপ্রাণীত করিতে চেষ্টা পাইতে পারেন। অবশ্যই ইহা নীতিশিক্ষার একটা প্রধান কথা।

এখন প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে ক্রফটের অভিপ্রায়টা বলি।

ক্রফট্ বলেন যে, যদি বিদ্যালয়ে নীতি-শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হয়, তবে ভাল শিক্ষক নিযুক্ত করা চাই। কিন্তু অল্প টাকায় যে ভাল শিক্ষক পাওয়া দুরূহ, সে কথা ক্রফট্ স্বীকার করিয়াও সে সম্বন্ধে আর কথা তুলেন নাই। টাকা খরচ করিতে ক্রফট্ রাজি নহেন; গবর্ণমেণ্টও বলেন যে, ক্রফটের কথা খুব ঠিক। বিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত টাকা খরচ অপব্যয়; অথচ ভাল শিক্ষকও চাই!! কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, দিনে দিনে ব্রাহ্মণের গোক্ষুর কিছু অপ্রতুল হইতেছে; টাকার অভাবে অনেক সুযোগ্য শিক্ষকই শিক্ষকতা ছাড়িয়া অন্য বিভাগে যাইতেছেন; কেবল যাহাদের অন্য কোথাও পয়সা হয় না, তাঁহারাই এ বিভাগ উজ্জ্বল করিতেছেন! ভাল শিক্ষকের কথা ঐ পর্য্যন্ত। তার পর ক্রফট্ বলেন যে, নীতিশিক্ষা বলিয়া নীতিশিক্ষা দিতে গেলে

শিক্ষাটা তিক্ত হইয়া উঠিবে, কিছু ফল হইবে না। একথা আমরাও মানি। ওরূপ করিলে নীতিশিক্ষার শ্রেণী, ঠিক পাদরী বিদ্যালয়ের বাইবল শ্রেণীর মত তামাসার জিনিষ হইয়া দাঁড়াইবে। ক্রফটের মতে আমরা সায় দিয়া বলি যে, পড়িবার গ্রন্থই এরূপ স্থির করা উচিত, যাহাতে পরোক্ষভাবে বালকদিগের হৃদয় সাধুতার দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে। কিন্তু এরূপ পুস্তক নির্ব্বাচন বড় সহজ নহে। এই অভিপ্রায়ে "Golden Deeds" প্রবেশিকার পাঠ্য করা হইয়াছিল; কিন্তু সে গ্রন্থে যেরূপ খ্রীষ্টানি গোঁড়ামী, এবং অযথা, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে ফল উল্টা দাঁড়াইতে পারে। যাহা হউক, মানিয়া লওয়া গেল যে, ভাল পুস্তক নির্ব্বাচিত হইবে; কিন্তু সর্ব্বত্র শিক্ষা দিবার শিক্ষক কই। টাকা না দিলে ভাল লোক হয় না; গভর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে সংযত-হস্ত, তবে উপায় কি? সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, গভর্ণমেণ্টের এত আয়োজন, এত বাক্য, কালি কলম এবং কাগজ ব্যয়, যেন একটু বৃথা হইবার দিকে চলিল। সুধু কুস্তি করিয়া এবং নির্ব্বাচিত গ্রন্থ পড়িয়াই বালকেরা ভাল হইয়া যদি যায়, ভাল কথা, কিন্তু তাহার আশা আছে কি? †

———o———

জীবন সম্বন্ধে দুই একটী কথা।

"Death doth lurk always in life's delicious cup;
The mulberry leaf must bear the biting of a worm,
That so it may be raised to wear a silken form"

Ruckert.

শৈশবের বিমল জ্যোৎস্না দেখিতে দেখিতে ডুবিয়া যায়; যৌবনের মনোমোহন মাধুর্য্য ও বলবিক্রম স্বপ্নময় জোয়ারের জল; প্রৌঢ়াবস্থা তিন দিনের খেলা, সংসার পাতিতে ও গুছাইতেই ফুরাইয়া যায়; উচিত ব্যবস্থায় ভাল করিয়া জীবন কাটান হয় নাই, সময়ের সদ্ব্যবহার রীতিমত হয় নাই, এই আপশোষে "হায়" "হায়" করিতে করিতে চকিতের ন্যায় বার্দ্ধক্য শেষ হয়; জরা মৃত্যুর পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্ত্তমাত্র; সকলই ক্ষণস্থায়ী। এই কয়টী আশুপরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সমষ্টিকে আমরা মানবজীবন বলি। পশ্চাতে অনাদি ভূত, সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যত, মাঝখানকার এই কয় বৎসরকে বিশেষ মূল্যবান জ্ঞান করিয়া উক্ত আখ্যা প্রদান করি, যেন অগ্রপশ্চাৎ উভয়দিক কিছুই নয়, কেবলই শূন্যময়। এই অতি স্বল্পকাল মধ্যে আমরা কতই দেখি, কতই শুনি, কতই নাচি, কতই গাই। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, প্রত্যেক সুদীর্ঘজীবী মনুষ্য জন্মাবধি মৃত্যু

† হউক বা না হউক, সে কথার বিচার পরে। গভর্ণমেণ্টের একাজটা যে মন্দের ভাল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, একাজে একটু মুক্ত হস্ত হউন। ন, স।

পর্য্যন্ত গড়ে প্রায় ১৬০০০০০০০০ ভাব (Impressions) গ্রহণ করিয়া থাকেন। * এই প্রকাণ্ড সংখ্যক ভাবের ছবি কোন্ স্থানে সমাবিষ্ট, চর্ম্মচক্ষুতে তাহা দেখিবার জো নাই। এই ভাবসমষ্টির আধার মানবাত্মা। ভুক্ত, পীত, এবং নিশ্বাস ত্বকাদি দ্বারা গৃহীত পদার্থ নিচয় যেমন সুসূক্ষ্ম অবস্থায় দেহ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, ভাবসমূহ সেইরূপ আত্মাতে স্থান পাইয়া তাহার পোষণ ক্রিয়া সম্পাদন করে। প্রভেদ এই যে, যাহা কিছু বাহ্য জগতের অবস্থাধীন, তাহা সর্ব্বদা রূপান্তরিত হইতেছে, এবং কোন এক সময়ে—শত, সহস্র, লক্ষ, কোটী, লক্ষ কোটী, কোটী কোটী বৎসরে হউক—বর্ত্তমান অবস্থার সুদূর চিহ্নমাত্রও ধারণ করিবে না; কিন্তু আত্মা ভাবে পুষ্ট হইবে, অথচ ভিন্ন রূপে পরিণত হইবে না; সুতরাং ইন্দ্রিয়াদি গোচর সংসারিক অবস্থার অতীত বস্তু। চারিহাজার বৎসরের বৃদ্ধ তরুবর কালে ভূতলশায়ী হইয়া আপন তনু প্রকৃতির সর্ব্বভুক বিশ্লেষণ শক্তির হস্তে সমর্পণ করিবে; পিরামিড চিরকাল থাকিবে না; ভূষণ্ডি হিমালয় এক দিন ধূলিসাৎ হইবে; ঐ কোমল কিরণ সুধাকর পূর্ব্বে জীব জন্তুর আবাসভূমি ছিল, এখন প্রাণীশূন্য মরুময় জড়পিণ্ডমাত্র, ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর; এই প্রাণপ্রিয় পৃথিবী, যাহাকে বিশাল বিশ্বের সার বলিয়া আমাদের আপাততঃ ভ্রম জন্মে, ইহাও ধীরে ধীরে সহযোগী চন্দ্রের পথে চলিতেছে, সম্পূর্ণ জীর্ণ হইয়া কবে ভুশ্ করিয়া বায়ুতে মিশাইয়া যাইবে; সূর্য্যদেব জ্যোতিহীন হইয়া আকাশ পটে আর বিরাজ করিবেন না, কিম্বা আপন তেজে আপনি ভস্ম হইয়া বিলুপ্ত হইবেন, সঙ্গে সঙ্গে তদ্গত-প্রাণ গ্রহগণ লীলা সম্বরণ করিবে, এমন দিন আসিবে; *—জড় জগতের ক্ষুদ্র মহৎ প্রত্যেকে নূতন সৃষ্টির জন্য যথাসময়ে নিজ স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য। কিন্তু আমি আমার এই বিশ্বগ্রাসী আত্মা—অনন্তকালস্থায়ী। যাহা সাদি, তাহা সান্ত, যাহা অনাদি তাহা অনন্ত, বিশ্বের এই অখণ্ডনীয় নিয়ম। আত্মার আরম্ভ নাই, সুতরাং শেষও নাই। যাঁহারা আত্মাকে সৃষ্ট বস্তু বলিয়া উহা হইতে অনাদ্যনন্তের ছাপ মুছিয়া ফেলিতে চান, তাঁহারা উহাকে অমর বলেন কি প্রকারে, বুঝি না। জীবাত্মার জন্মমৃত্যুবিরহিত ঐশী ভাব অস্বীকার করিলে উহার বিশেষ মর্য্যাদাহানি করা হয়। অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরে আমি অবস্থিতি করিয়া আসিতেছি, বর্ত্তমানেও তাঁহাতেই, এবং অনন্ত

*. এই বিপুল সংখ্যা আপাততঃ শুনিতে আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজে বুঝা যায়, ইহা অপেক্ষাও অধিক সম্ভব:— যদি এক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ৫০ বৎসর বয়সের পর—৪০ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে বহুভাব গ্রহণ-ক্ষমতা বিকাশ পায়—শেষ ৩০।৪০।৫০।৬০ বৎসর ক্রমাগত রেল জাহাজ ব্যোমযানাদিতে ভ্রমন করেন, তাঁহার চিত্তে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ছাপ পড়িবার কথা। তর্কের খাতিরে (Hypothetically) বলা হইল, জানিতে হইবে।

* অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহাত্মা লাগ্রাঞ্জ (Lagrange) বহুবিধ যুক্তি তর্ক দ্বারা প্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছেন যে, এই গ্রহ জগৎ (Planetary System) বর্ত্তমান ব্যবস্থায় চিরকাল থাকিবে। কিন্তু তাঁহার প্রতি সমুচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা পুরঃসর এ কথাও মানিতে হইবে যে, যে মূর্ত্তি পূর্ব্বে ছিল না, নূতন হইয়াছে, তাহা অনন্তকাল এক ভাবে তিষ্টিতে পারে না। সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল উপাদানে গঠিত জড়জগৎ আংশিক ও সমষ্টিভাবে সমান পরিবর্ত্তনশীল। খুব সম্ভব, এই স্থানে অসংখ্য বার সৃষ্টি স্থিতি লয় হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে অসংখ্য-বার হইবে। বর্ত্তমান ব্যবস্থা (System) তাহার একবার কার

-ভবিষ্যতে অজর অমর ভাবে সেই মহাশক্তির ক্রোড়ে বিরাজ করিব।

তবে মৃত্যু কি? পার্থিব জন্ম ও মৃত্যু একই জিনিস—অবস্থান্তর হইবার দ্বার মাত্র, উভয়ের ভিতর দিয়া নূতনভাবে প্রসূত হই। অধিকাংশ এই মহাপ্রশ্নের দিকে আদবেই খেয়াল করেন না; এই আড়াই দিনের খেলায় তাঁহারা এমনই মত্ত, ভবের সদাভাঙ্গা-হাটের ব্যবসায় বাণিজ্যে এতই নিবিষ্টচিত্ত যে, ওরূপ তুচ্ছকথা তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না, ক্ষণ জীবী (Ephemera) কীটানুর মত প্রহরখানেকের নৃত্য কীর্ত্তন তাঁহাদের নিকট সব (All-in-all); যাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অবকাশ আছে, তাঁহারা মৃত্যু-দ্বারা সংসারের নানাবিধ জ্বালা যন্ত্রণার হাত এড়াইবেন বলিয়া এক প্রকার বিষণ্ণ হর্ষের সহিত উহার দিকে তাকান; আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা বলেন "One world at a time is an excellent rule to go by." সুতরাং মৃত্যু আমাদিগকে কোথায় কি ভাবে লইয়া যাইবে, ভাবিয়া অনর্থক মাথা ঘামাইবার দরকার দেখি না, যাহা কর্ত্তব্য বোধ কর, করিয়া চলিয়া যাও ও সব ঢেঁকির কচ্ কচি বৃথা; এতদ্ভিন্ন একদল "পণ্ডিত মূর্খ" আছেন, যাঁহারা চিরকাল বিজ্ঞানের সেবা করিয়া শেষ স্থির করিয়াছেন;—জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য প্রভৃতি অসীম বল শক্তি সকল মরণশীল, অথচ জড়জগতের অণু ও শক্তিসমূহের বিনাশ নাই। এই মহাপুরুষেরা মদগর্ব্বের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বের স্রষ্টা পাতা পবিত্রাতা ভগবানের অধীনতা স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিয়া তাঁহার জাজ্জ্বল্যমান বিরাট অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে সাহসী হন। ইহাদের গুণে ঘাট নাই, ইহারা সংসারে বিশেষ ক্ষতি করেন, ইহাদের চাকচিক্যশালী হুজুগে পড়িয়া অনেক গরিব, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত, অনলে পতঙ্গের ন্যায় মারা যায়।

মৃত্যুর অপরপারের অবস্থার ভাব এখান হইতে পাওয়া অসম্ভব। এই যুক্তির উপর দাঁড়াইয়া অনেকে পরলোক বিশ্বাস করিতে চান না। তাঁহারা খেয়াল করেন না যে, মৃত্যুর অন্তরালের ব্যাপার সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের পক্ষে অহিতকর জানিয়া বিধাতা আমাদিগ হইতে উহা বর্ত্তমানের জন্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বিশেষ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। কবি সদি (Southey) বলেন, উহা অনাবশ্যকীয় জানিয়া পিতা আমাদিগকে ওবিষয়ে জানিতে দেন নাই;—

"Our Father hath not made that mystery known,
Needless the knowledge, therefore not revealed."

যে যাহাই বলুক, আত্মার বিনাশ সম্বন্ধে কোন কথাই আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না, ভাসিয়া চলিয়া যায়। ইহাই জীবাত্মার অমরত্বের লক্ষণ। চক্ষে দেখার মত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবিষয়ে অসম্ভব, আমরা তদুপযুক্ত নই, এসংসারে আমাদের ক্ষমতা অতি সংকীর্ণ। কুকের (Captain Cook) অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পূর্ব্বে বড় বড় জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরও কাঙ্গারু (Kangaroo) ও অরিন্থরিঙ্কস (Orinthorhynchus) সম্বন্ধীয় ভাবের ইঙ্গিতমাত্র হৃদয়ে উদয় হয় নাই; তাহা হইতে পারে না। যখন এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বিষয়ে এরূপ, পরলোক জ্ঞান সম্বন্ধে কতদূর অনুপযুক্ত আমাদের ধারণাশক্তি হওয়া উচিত, সহজেই বুঝা যায়।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যুক্তি তর্ক নাই। আত্মার নিজের কথায় বিশ্বাস করিয়া এবং পূর্ব্বগত মহাজনদিগের ইঙ্গিতে আমরা যাহা কিছু বল পাই। সুতরাং উপসংহারে এই মাত্র বলিতে পারি যে, কেটোর (ক) মত দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া, হাওয়াডের (খ) ন্যায় বিনীতভাবে প্রফুল্লচিত্তে অপেক্ষা করত, সংসারের প্রধান লোকচরিত শিক্ষক মহাকবি সেক্সপীরের (গ) বর্ণনার মত যাহাতে মরিতে পারা যায়, তাহাই আমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। মৃত্যুঞ্জয় এবিষয়ে আমাদিগকে বল প্রদান করুন।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন

ঢাকার পুরাতন কাহিনী।

(প্রথম প্রস্তাব)

ঢাকা পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে সর্ব্ব প্রকারে প্রধান নগরী। ঢাকা নগরী এত প্রাচীন যে, ইহার সহিত তুলনা করিলে, কলিকাতাকে নিতান্ত আধুনিক নগরী বলিয়া প্রতীতি জন্মে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে সমতট দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বঙ্গের রাজধানী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ্ স্বকীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে

(ক) "It must be so Plato, thou reason'st well !
Else whence this pleasing hope, this fond desire,
This longing after immortality ?
Or whence this secret dread & inward horror,
Of falling into nought? Why shrinks the soul
Back on herself, and startles at destruction ?
'Tis the divinity that stirs within us;
'Tis heaven itself that points out an hereafter,
And intimates eternity to man.

* * * *

If there's a power above us
(And that there is, all nature cries aloud
Thro' all her works) he must delight in virtue,
And that which he delights in must be happy.

* * * *

The soul secur'd in her existence, smiles
At the drawn dagger, and defies its point.
The stars shall fade away, the sun himself
Grow dim with age, and nature sink in years
But thou shalt flourish in immortal youth,
Unhurt amidst the war of elements
The wrecks of matter, and the crush of worlds."

Cato.

(খ) "Death has no terrors for me; it is an event I always look with cheerfulness, if not with pleasure: and be assured, the subject is more grateful to me than any other. Suffer no pomp to be used at my funeral, no monument to mark the spot where I am laid; but put me quietly in the earth, place a sundial over my grave, and let me be forgotten."

John Howard

(গ) "Nothing in his life
Became him like the leaving it, he died
As one who has been studied in his death,
To throw away the dearest things he owed,
As 'twere a careless trifle.

Shakespeare

সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, ও তাম্রলিপ্তকে সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজবংশ রামপাল নগরে বহুকাল রাজত্ব করেন। রামপালের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের স্বাধীনতা ও ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়। কেহ কেহ বিশিষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই রামপাল সুপ্রাচীন সমতটেরই নামান্তর মাত্র। রামপালের ভগ্নাবশেষ ঢাকার দক্ষিণ ভাগে বর্ত্তমান মুন্সীগঞ্জ উপবিভাগের সন্নিকটে অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া, সেন রাজগণের অতীত গৌরব-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। সমগ্র বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন, মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক তদানীন্তন নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী নবদ্বীপ অধিকারের পর, তথা হইতে সপরিবারে পলায়ন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত প্রাচীন পৈতৃক রাজধানী এই রামপালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে রাম পালে কি সোনারগাঁয় রাজধানী স্থাপন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার বংশধরেরা প্রায় শতবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু রাজগণের শাসন প্রভাব অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মুসলমানগণের দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রমে নবদ্বীপ পতনের বহু কাল পরে পূর্ব্ববঙ্গ অধিকৃত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই বাঙ্গালার স্বাধীনতার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, বাঙ্গালীর দাসত্ব ও জাতীয় অধোগতি সম্পূর্ণরূপে আরম্ভ হয়। এই পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে সমস্ত দেশের 'বাঙ্গলা' ও 'বঙ্গ' নাম প্রচারিত হয়।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, বিচক্ষণ পুরাতত্ত্ববিৎ ও ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের দীর্ঘকালব্যাপী আয়াসসাধ্য গভীর গবেষণায়ও সেই প্রাচীন হিন্দু সময়ের বঙ্গ দেশের ধারাবাহিক বিবরণ বিশেষ কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহাও এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও অবিসংবাদিত রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। সেই প্রাচীন সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে নানা বিষয়ে ইতিহাসবিৎ পণ্ডিতবর্গের মতভেদ সংশয়জালে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। অদ্য পর্য্যন্তও সেই সকল বিষয়ের যথোচিত সন্তোষকর মীমাংসা হয় নাই।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গলায় হিন্দু রাজত্ব বিলুপ্ত হয় এবং মুসলদিগের প্রভুতা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সংস্থাপিত হয়। সাময়িক ইতিহাস রচনা বিষয়ে মুসলমানেরা হিন্দু অপেক্ষা সবিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস রচনা বিষয়ে জগতের যে কোন সভ্যজাতির সহিত মুসলমান জাতির তুলনা হইতে পারে। তুলনায় কোন ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা তাঁহারা নিকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এই সময় হইতে ভারতবর্ষের মুসলমানাধিকৃত অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেরও ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হইতে থাকে।

রামপালের অধঃপতনের পর হইতে সোনারগাঁর উন্নতি আরম্ভ হয়, এবং মুসলমানদিগের প্রণীত ইতিহাসে সোণাঁর নাম উল্লিখিত হইতে থাকে। জিয়াউদ্দিন বরনী সর্ব্ব প্রথম সোনারগাঁর উল্লেখ করেন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগেও সোনারগাঁয় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আরম্ভেই

সোনারগাঁয় মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইতে থাকে এবং সোনারগাঁ পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হয়। এই সময়ে সোনারগাঁর উন্নতির একশেষ হয়। সোনারগাঁর বাণিজ্যদ্রব্য দূরবর্ত্তী দেশে প্রেরিত ও আদৃত হইতে থাকে। সোনারগাঁর অতি সূক্ষ্ম ও শুভ্র মছলিন বস্ত্র সভ্য জগতের বিস্ময়ের পরাকাষ্ঠা উৎপাদন করিয়া, সোনারগাঁকে তদানীন্তন সভ্য জগতে সুপরিচিত করে। মছলিন বস্ত্রের জন্মস্থান সোনারগাঁ, ঢাকা নগরীকে উহার প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দিয়া ঢাকার ভাবী প্রসিদ্ধি ও প্রাধান্যের সূত্রপাত করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সোনারগাঁয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। সোনারগাঁর উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও চাউল ভারতবর্ষের নানা স্থানের ন্যায় সিংহল, পেগু, জাবা, মলক্কস, সুমাত্রা প্রভৃতি অনেকানেক দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরিত হইত। বিদেশীয় পর্য্যটকগণ সুদূর আরব ও ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, বহু ক্লেশ ও আয়াস সহ্য করিতে হইলেও সোনারগাঁর শোভাসমৃদ্ধি স্বচক্ষে দর্শন করা অতি আবশ্যক মনে করিতেন। সোনারগাঁর ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসাগীতি গান করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সমগ্র বঙ্গদেশ সোনারগাঁর আধিপত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। বাঙ্গলা সোনারগাঁর পদ অনুসরণ করিয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা-পাশ ছিন্ন ভিন্ন করণান্তর আপনাকে স্বাধীন বলিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করে, এবং দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে বহু আয়সলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষা করে। সোনারগাঁর পূর্ব্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে তাহার নাম ও স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট আছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে ঢাকার নাম ইতিহাসে উল্লিখিত হইতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তথায় সম্রাটের সেনাসন্নিবেশ সংস্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় বাঙ্গলার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতে শত বর্ষ পর্য্যন্ত ঢাকার গৌরব ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। এই সময়ে ঢাকার ভূয়সী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। ঢাকার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সোনারগাঁর সৌভাগ্য বিলুপ্ত হইতে থাকে। রাজধানী স্থাপনের পর হইতে ঢাকার রাজপ্রাসাদ হইতে সমগ্র বঙ্গদেশ শাসিত হইত, ঢাকার রাজকোষে বাঙ্গালার রাজস্ব সংগৃহীত হইত, ঢাকার সুদৃঢ় সেনানিবাস হইতে মোগলসেনাগণ বহির্গত হইয়া আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করিত এবং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্বাধীন রাজন্যবর্গকে পদানত করিয়া দিল্লীশ্বরের শাসনপ্রভাব বিস্তার করিত। দিল্লির সম্রাটের বংশধর ঢাকার রাজপুরুষগণ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় আপনাদের শাসনক্ষমতার পরিচয় দিয়া, কোন কোন সময়ে সমগ্র ভারত সাম্রাজ্যের আধিপত্য পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। দিল্লীর প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত ওমরাহগণ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের শাসনকার্য্যে স্ব স্ব কৃতিত্ব ও নিপুণতার পরিচয় দিয়া, ঢাকার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইতে পারিলে আপনাদিগকে যথেষ্টরূপে পুরস্কৃত মনে করিয়া কৃতার্থ হইতেন। দিল্লীশ্বরের প্রিয়তম পুত্র ও পৌত্রগণ ঢাকার শাসনকার্য্য প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ঢাকা হইতে মুরসিদাবাদে বাঙ্গ-

লার রাজধানী নীত হওয়ার পর হইতেই ঢাকার সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অন্তর্হিত হয়, ঢাকার অতীত গৌরব বিনষ্ট হয়। এই সময় হইতে ঢাকা বঙ্গদেশের একতম প্রধান নগরী বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে। বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই ঢাকার নির্ম্মিত সাধারণ বাণিজ্যদ্রব্যের বিদেশে রপ্তানির পরিমাণ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে। এই সময় হইতেই ঢাকার বর্ত্তমান বাণিজ্যবিষয়ক অবনতি আরম্ভ হয়।

ঢাকার এই সকল বিবরণ সংগৃহীত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতে চেষ্টা করিব। ঢাকার বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে, আবশ্যকীয় বোধ হইলে পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য জিলার বিবরণও অতি সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইবে। ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস বাঙ্গলার ইতিহাসের সহিত কতদূর ঘনিষ্ট ভাবে সংসৃষ্ট, যথাসাধ্য তাহা বিবৃত করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাঙ্গলার ইতিহাসের ভাবী লেখক এই অজ্ঞাত কল্প অংশের সংগ্রহ দ্বারা যদি বা কিছু সহায়তা লাভ করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই পাঠকবর্গের নিকটে উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ-লেখকের পদে পদে ত্রুটি ও ভ্রম প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা ও ভ্রমপ্রমাদ পাঠকবর্গ যেন দয়া করিয়া মার্জ্জনা করেন এবং লেখককে তাহার ত্রুটি দেখাইয়া দেন—প্রবন্ধ লেখকের এই বিনীত অনুরোধ।

—০—

(উপক্রমণিকা।)

অতি প্রাচীনকাল হইতে সংস্কৃত সাহিত্যে 'বঙ্গ' রাজ্যের নাম উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুঙ্গ নামে পাঁচ জন পুত্র বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা পৈতৃক রাজ্য বিভাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব নামে যে পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাপিত করেন, 'বঙ্গ' তাহাদের অন্যতম। এই পঞ্চ রাজ্যের কিয়দংশ লইয়া বর্ত্তমান বাঙ্গলা ও বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশ সংগঠিত হইয়াছে।

অঙ্গরাজ লোমপাদ অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথের পরম বন্ধু ছিলেন বলিয়া রামায়ণে বর্ণিত আছে। মহাভারতেও অঙ্গ ও বঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায়। কীকট, অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও কৌশিকীকচ্ছের অধিপতিগণ মহাপরাক্রান্ত বিজয়ী পাণ্ডবদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। অঙ্গপতি ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের সেই অতি ভীষণ সমরে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া পাণ্ডবদিগের হস্তে নিহত হন। মহাবীর সাত্যকি বঙ্গাধিপতিকে এবং সহদেব পৌণ্ড্ররাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। পুরাণাদি গ্রন্থে ঐতিহাসিক সত্য কি পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় রূপে বলা যায় না। কবি-কল্পনা-প্রসূত মনোহর উপাখ্যানই পুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্য অণুমাত্রও নাই—ইহা মনে করিয়া পুরাণাদি গ্রন্থ দূরে নিক্ষেপ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি জন্মে না।

খ্রীষ্টীয় অব্দ সংস্থাপনের চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দী পূর্ব্বে প্রবল পরাক্রান্ত মৌর্য্য ও অন্ধ্র বংশীয় নরপতিগণ যখন মগধে অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, যখন গুজরাট হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে তাঁহাদের অবিসংবাদিত অধিকার বিস্তৃত হয়, যখন তাঁহাদের বিজয় বৈজয়ন্তীর সমীপে দূরবর্ত্তী সমস্ত দেশ মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছিল—সেই সময়ে বঙ্গদেশ তাঁহাদের পদানত হয় নাই, ইহা কোনও ক্রমে বিশ্বাস করা যায় না। মগধের সংলগ্ন বঙ্গদেশে তাঁহাদের আধিপত্য সংস্থাপিত হওয়াই অধিকতর সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের সেই তুমুল সংগ্রাম হইতে অদ্বিতীয় ধর্ম্মবীর বুদ্ধদেবের সময় পর্য্যন্ত (সহদেব হইতে অজাতশত্রু পর্য্যন্ত) সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫ জন রাজা মগধে রাজত্ব করেন বলিয়া কোন কোন ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাননীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ত্রয়োদশ কি দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল *। পালিভাষায় লিখিত সিংহল দ্বীপের মহাবংশাদি বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বতন ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে (৫৪৩ খ্রীঃপূঃ) বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু জেনারেল কানিংহাম ও অধ্যাপক মেক্সমুলার প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মতে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বতন ৪৭৭ কি ৪৭৮ অব্দে এই

* বিগত বর্ষে রমেশ বাবু 'ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস' নামে যে উৎকৃষ্ট পুস্তকের প্রথম ভাগ ইংরেজীতে লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি হিন্দু সময়ের প্রাচীন ইতিহাসকে নিম্নলিখিত পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (১) বৈদিক সময় (খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বতন ২০০০-১৪০০ বৎসর), (২) মহাভারতীয় সময় (খ্রীঃ পূঃ ১৪০০-১০০০ বৎসর), (৩) দার্শনিক সময় (খ্রীঃ পূঃ ১০০০-২৪২ বৎসর), (৪) বৌদ্ধ সময় (খ্রীঃ পূঃ ২৪২—খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ৫০০ বৎসর), এবং (৫) পৌরাণিক সময় (খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর ৫০০-১১৯৪ খ্রীঃ)।

বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ মধ্য আসিয়া হইতে পঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হন। সিন্ধু ও তাহার পঞ্চ প্রসিদ্ধ শাখার তীরে একত্র সম্মিলিতভাবে বসতি স্থাপন করিয়া তাঁহারা প্রকৃতিদেবীর ভীমকান্ত মূর্ত্তির উপাসনায় নিযুক্ত হন। প্রকৃতিদেবীর বিভিন্ন শক্তি সম্বন্ধীয় ঋগবেদীয় মন্ত্র ও স্তোত্রমালা এই সময়ে রচিত হয়। এই সময়ে জাতিভেদ, দেবমূর্ত্তি ও দেবমন্দিরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কল্পিত হয় নাই। এই সময়ে গঙ্গা যমুনার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না।

মহাভারতীয় (Epic) সময়ে আর্য্যগণ পঞ্জাব হইতে দলে দলে বহির্গত হইয়া ত্রিহুত পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে যে সকল পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হন, পরবর্ত্তীকালে রচিত মহাভারত ও রামায়ণে তাহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। দিল্লীর চতুর্দ্দিকে কুরুগণ, কনোজে পঞ্চালগণ, অযোধ্যা প্রভৃতি যমুনা ও গণ্ডকীনদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগে কোশলগণ, গণ্ডকীর পূর্ব্বভাগে ত্রিহুতে বিদেহগণ, এবং বারানসীর চতুর্দ্দিকে কাশীবংশীয়গণ—তন্মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্রীঃ পূঃ ১৪০০-১২০০ বর্ষে কুরু ও পঞ্চালগণ, এবং ১২০০-

ঘটনা সংঘটিত হয়। এই সময় হইতেই ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত

১০০০ খ্রীঃ পূঃ বর্ষে কোশল ও বিদেহগণ উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করে। এই সময়ে বেদ চারিভাগে সংগৃহীত ও বিভক্ত হয়। ঋগ্বেদীয় সরল মন্ত্রের অর্থ ও ভাব বিকৃত ও রূপান্তরিত হয়। যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডের বহুল প্রচার হইতে অসার ও নির্জীব ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গ্রন্থ রচিত হয়। আর্য্যগণ জ্ঞান, সভ্যতা ও বিদ্যাবুত্তায় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উন্নত হয়,—কিন্তু তাহাদের শৌর্য্য, বীর্য্য, ঔদার্য্য, মহত্ত্ব ও পুরুষত্ব বিষয়ে যথেষ্ট অবনতি হয়। জনসাধারণের (বৈশ্যদিগের) দুর্ব্বলতা ও নির্জীবতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের প্রভাব বর্দ্ধিত হয়, এবং বৈশ্যসমাজ হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়। অর্থহীন ও অসার যাগযজ্ঞাদির বাহুল্যে বিরক্ত হইয়া বিদেহরাজ ক্ষত্রিশিরোমণি জনক প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর পূর্ব্বতন একাদশ শতাব্দীতে জনকের জ্ঞানালোচনা ও সত্যানুসন্ধানের ফল স্বরূপ উপনিষদ্ সমূহ রচিত হইতে আরম্ভ হইয়া ভারতবর্ষে নব যুগের অবতারণা করে। এই উপনিষদ্ হইতেই ভবিষ্যতের যাবতীয় ধর্ম্ম ও দার্শনিক মত কালক্রমে উৎপন্ন হয়। কুরুপঞ্চালের ভীষণ যুদ্ধ এই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে) সংঘটিত হয়। কিংবদন্তী ও মহাভারত হইতে জানা যায়, বেদের বিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেব এই সময়ে বর্ত্তমান থাকিয়া মহাভারত রচনা করেন। তৃতীয় ও চতুর্থযুগে ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া রামায়ণ ও

হয়। এই ঘটনা হইতেই ভারতীয় ইতিহাসের সময় গণনা আরম্ভ হয়। বুদ্ধদেবের

মহাভারত উভয়ই পৌরাণিক যুগে বর্ত্তমান আকার ধারণ করে।

দার্শনিক যুগে আর্য্যগণ অনুগঙ্গ প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ আক্রমণ ও অধিকার করেন। সুবিজ্ঞ উইলসন সাহেবের মতেও এই সময়ের আরম্ভেই আর্য্যাবর্ত্তবাসী আর্য্যগণের অধিকার, ধর্ম্ম ও সভ্যতা দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এই সময়ে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সভ্যতা প্রবিষ্ট হয়। কি রাজ্যবিস্তৃতি, কি সাহিত্যবিষয়ক উন্নতি, সকল সম্পর্কেই এই যুগে হিন্দুগণ সবিশেষ উৎকর্ষতা লাভ করেন। এই সময়ের শেষ ভাগে মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পৌত্র অশোক কর্তৃক মৌর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের প্রাধান্য ও আধিপত্য সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় কোন রাজ্যই মগধের ন্যায় প্রতাপ ও সমৃদ্ধি প্রদর্শনে সমর্থ হয় নাই। উত্তর ভারতে যখন মৌর্য্যবংশের অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সময়ে দক্ষিণাপথে অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ অতি পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপিত করেন। এই অন্ধ্রগণ কর্ত্তৃকই প্রাচীন চের, চোল (কাঞ্চী) ও পাণ্ড্যরাজ্য খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীরও পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্ধ্ররাজগণের আশ্রয়ে হিন্দু ধর্ম্ম, জ্ঞান ও সভ্যতা দক্ষিণাপথে প্রসৃত হইয়া সবিশেষ উন্নতি লাভ করে। অন্ধ্ররাজগণ হইতেই প্রাচীন সৌরাষ্ট্রে (গুজরাট ও মহারাষ্ট্র দেশে) সভ্যতালোক প্রবিষ্ট হয়। এই সময়ে সিংহল দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়। মহারাজ অশোক তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে বৌদ্ধধর্ম্ম

নির্ব্বাণ প্রাপ্তির পরবর্ত্তী শত বৎসরের মধ্যে (৪৭৭-৩৭৭ খ্রীঃ পূঃ) বৌদ্ধগণের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়। সেই বিরোধের যথোচিত মীমাংসা করিয়া

প্রচারার্থ সিংহলে প্রেরণ করেন। বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণ অশোকের পূর্ব্বেই উড়িষ্যায় আগত ও উপনিবিষ্ট হইয়া বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্যের সহিত বিবিধ পর্ব্বতগহ্বর নির্ম্মাণ ও খোদিত করিতে আরম্ভ করে।

এই যুগের সজীবতা ও কার্য্যকুশলতা রাজ্যবিস্তারে কেবল পর্য্যবসিত না হইয়া জাতীয় সংস্কৃত সাহিত্যেও প্রকাশিত হয়। সুবিস্তীর্ণ ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের উপদেশ ও ক্রিয়াকলাপ অতি সংক্ষিপ্তভাবে সূত্রগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সর্ব্বত্র অসংখ্য বেদবিৎ সূত্রকারগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যামিতি, অভিধান ও ধর্ম্মসূত্রাদি প্রণয়ন করিতে থাকেন। যাস্কের নিরুক্ত, পাণিনির ব্যাকরণ, গৌতম ও বৌধায়ন এবং আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্র, এবং জ্যামিতিবিষয়ক শূন্বসূত্র এই সময়ে (বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে) বিরচিত হয়। খ্রীঃ পূঃ অষ্টম কি সপ্তম শতাব্দীতে মহর্ষি কপিল প্রাদুর্ভূত হইয়া সাংখ্যসূত্রে অলৌকিক জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় দেন। এই সাংখ্যদর্শন ভারতবর্ষের সাহিত্য ও ইতিহাসে সমধিক আধিপত্য প্রকটিত করিয়া স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। কপিলের সাংখ্যসূত্রের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দার্শনিক সূত্র সকলও রচিত হইতে আরম্ভ হইয়া, উপনিষদের জ্ঞানালোচনার প্রভাব ও মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হইয়া কপিলের নীরস জ্ঞানালোচনায় বিশ্বজনীন প্রেমের অমৃতময় রস সঞ্চারিত করেন। বুদ্ধদেবের প্রেম, মৈত্রী ও সাম্যবাদ ধীরে ধীরে দুর্ব্বল ও দরিদ্র এবং উৎপীড়িত সমাজে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার সাম্যবাদ জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নির্জীব ও প্রপীড়িত সমাজে ক্রমে ক্রমে সজীবতা বিধান করিতে লাগিল। অবশেষে মহারাজা অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের জাতীয় প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া প্রায় সমগ্র আসিয়া খণ্ডের একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া উঠিল।

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের মহাত্ম্য বিলুপ্ত প্রায় হয়। মহারাজা অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির পরাকাষ্ঠা সাধিত হয়। সুসভ্য গ্রীক এবং অসভ্য তুরেনিয়ান, কাম্বোজিয়া, শক, হুন প্রভৃতি জাতির আক্রমণে ভারতবর্ষ পুনঃ পুনঃ ব্যতিব্যস্ত হয়। বিদেশীয় আক্রমণকারীগণ বাহুবলে ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট ও উপবিষ্ট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতের অধিবাসী বলিয়া পরিগণিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্ম প্রবল হয়।

পৌরাণিক যুগে হিন্দুজ্ঞান, ধর্ম্ম ও প্রতিভা, নির্জীব ও বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিয়া পুনরায় প্রবল হইয়া উঠে। হিন্দুধর্ম্ম নবীন বেশে ও নূতন উৎসাহে অভ্যুদিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাজিত করে। উজ্জয়িনী হইতে এই নবযুগ আবির্ভূত হইয়া ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয়। বৌদ্ধ বিহার মন্দিরাদির পরিবর্ত্তে নূতন প্রণালীতে ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু দেবমন্দিরাদি নির্ম্মিত হইতে থাকে। পৌরাণিক অসংখ্য দেবদেবীগণ স্বল্পসংখ্যক বৈদিক

বুদ্ধদেবের মত অবিসংবাদিতরূপে ধর্ম্মগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য বিভিন্নপক্ষীয় প্রধান প্রধান বৌদ্ধগণ ক্রমান্বয়ে দুইটী সভাতে সমবেত হন। কিন্তু তাহাতেও ধর্ম্মবিরোধের উপশম না হওয়াতে, খ্রীঃ পূঃ ২৪২ অব্দে মহারাজা অশোক তৃতীয়বার বিরোধী বৌদ্ধগণের প্রতিনিধিদিগকে বিহারে একত্রিত করিয়া বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমত স্থিরীকৃত করিতে বাধ্য হন এবং উচ্চ ভারতের সর্ব্বত্র ও বহির্ভাগে তাহা প্রচারিত করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের তদানীন্তন নেতা মহারাজা কনিষ্ক স্বরাজ্য কাশ্মীরে উত্তরাঞ্চলবাসী বৌদ্ধদিগকে পুনরায় আহ্বান

দেবতাদিগের স্থান অধিকার করিয়া, সম্পূর্ণ অভিনব আকারে হিন্দুধর্ম্মকে জনসমাজে প্রবর্ত্তিত করে। বেদের শ্রেষ্ঠত্ব বিলুপ্ত হইয়া পুরাণের উৎকর্ষ হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবধর্ম্মশাস্ত্র এই যুগের চিন্তাপ্রণালী, আচারব্যবহার ও রীতিনীতি শিক্ষা দেয়। মনুসংহিতার রচনা সময়েও বাণিজ্য এবং ব্যবসায় অনুসারে বিভিন্ন অসংখ্য জাতির সৃষ্টি হয় নাই।

ধর্ম্ম ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই অভিনব পৌরাণিক যুগের নেতা ও প্রবর্ত্তক। মহাকবি কালিদাস ও কোষকার অমরসিংহ, এই বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের প্রধান রত্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভারবি কালিদাসের সময়ে না হইলেও তাঁহার অল্পকাল পরেই প্রাদুর্ভূত হন। হিয়াংসাঙ স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে কান্যকুব্জপতি যে শিলাদিত্য (দ্বিতীয়) রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, দণ্ডী, সুবন্ধু, বাণভট্ট ও ভর্ত্তৃহরি সেই বিদ্যোৎসাহী নরপতির সভায় বর্ত্তমান থাকিয়া দশকুমার-চরিতাদি গ্রন্থ রচনা করেন। 'রত্নাবলী' প্রণেতা এই শিলাদিত্য (শ্রীহর্ষবর্দ্ধন) খ্রীষ্টীয় ৬১০ হইতে ৬৫০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভবভূতি রাজা যশোবর্ম্মার সময়ে (৭০০—৭৪০খ্রীঃ) বর্ত্তমান থাকিয়া উত্তরচরিতাদি সুপ্রসিদ্ধ নাটক রচনা করেন। আধুনিক হিন্দু জ্যোতিষের জনক আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্য বরাহমিহির বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাণভট্টের সমসাময়িক জ্যোতির্ব্বিৎ ব্রহ্মগুপ্তের ৫৯৮ খ্রীঃ জন্ম হয়। সূর্য্য সিদ্ধান্ত প্রণেতাও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতেই বর্ত্তমান ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৫০০-৭৫০ অব্দকে সংস্কৃত সাহিত্যের অভূতপূর্ব্ব গৌরবের কাল বলিয়া অনায়াসে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই সময় মধ্যেই মহাভারত ও রামায়ণ বর্ত্তমান আকারে পরিণত হয় এবং বিবিধ পুরাণ রচিত হয়।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য কুরুক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে বিধর্ম্মী ও অসভ্য শকজাতিকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ এবং হিন্দু ধর্ম্ম, জ্ঞান, সভ্যতা ও বিজ্ঞান দর্শনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনা হইতে তিনি যে অব্দ প্রচলিত করেন, তাহা সংবতাব্দ নামে সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হিন্দু জ্যোতির্ব্বিৎগণ ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে বা তৎসন্নিহিত কালে এই সংবতাব্দের ব্যবহার আরম্ভ করেন। কিন্তু বৌদ্ধরাজ কনিষ্কের প্রবর্ত্তিত শকাব্দের অপেক্ষা হিন্দুরাজের প্রতিষ্ঠিত অব্দের প্রাচীনত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্য, প্রকৃত সময়ের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বতন বলিয়া সংবতাব্দের কাল নির্দ্ধারণ করেন।

করিয়া, তাঁহাদের মতবিরোধ প্রশমিত করেন। পালিভাষায় লিখিত সিংহলের ধর্ম্ম-গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মের, এবং নেপাল, তিব্বত, চীন ও জাপান দেশের ধর্ম্মপুস্তকে পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তৎপর খ্রীঃপূঃ চতুর্থ ও তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশীয় রাজন্যবর্গ মগধের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একাধিপত্য লাভ করেন। এরূপ পরাক্রান্ত ও প্রতাপশালী রাজ্য ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর দেখা যায় নাই। সম্ভবতঃ ৩২০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধে মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শোণ (হিরণ্যবাহু) ও গঙ্গা নদীর সঙ্গম স্থল হইতে বর্ত্তমান পাটনা নগরী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজধানী পাটলীপুত্র বিস্তৃত ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৩১৭ অব্দে ভুবনবিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডারের প্রতিষ্ঠিত গ্রীকাধিকৃত ভারতের শাসনকর্ত্তা চন্দ্রগুপ্তের বুদ্ধিকৌশলে নিহত হয়। ব্যাকটিয়া ও সিরিয়ার অধিপতি সুপ্রসিদ্ধ সেলিউকাস নাইকেটর স্বীয় দুহিতাকে সম্প্রদানপূর্ব্বক তাহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়া, মিগাস্থিনিসকে তাঁহার রাজধানীতে দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করে। চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রতিপক্ষ এণ্টিগোনাসকে দমন করিবার জন্য সেলিউকাস খ্রীঃ পূঃ ৩১২ অব্দে ব্যাবিলন নগরে প্রত্যাবৃত্ত হন।

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, প্রিয়দর্শী অশোক উড়িষ্যা হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত খ্রীঃ পূঃ ২৬৪-২২৩ অব্দ পর্য্যন্ত শাসন করেন। কনষ্টাণ্টিনোপলের সম্রাট কনষ্টেণ্টাইন স্বয়ং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যেমন তাহা সমস্ত রোম সাম্রাজ্যের অবলম্বনীয় প্রধান ধর্ম্ম করিয়া তোলেন, সেইরূপ মগধের সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্মকে ভারত সাম্রাজ্যের জাতীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠপদে অধিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের চূড়ান্ত উন্নতি হয়। গুজরাট, পেশোয়ার, দিল্লী, আলাহাবাদ ও উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার আদেশলিপি পাওয়া গিয়াছে। রাজতরঙ্গিনীতে তিনি কাশ্মীরের রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সিরিয়ার এণ্টিয়োকাস্ থিয়স্ (দ্বিতীয়), মিসরের টলেমি ফিলাডেলফস্, মেসিডনের এণ্টিগোনাস, এপিরসের আলেকজাণ্ডার, কাইরিনের মেগাস্ প্রভৃতি পরাক্রান্ত বিদেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত সন্ধি বন্ধন করিয়া, অশোক তাঁহাদের রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত বৌদ্ধধর্ম্মোপদেষ্টা প্রেরণ করেন। খ্রীঃ পূঃ ২৪৭ অব্দে পূর্ব্বোক্ত টলেমির মৃত্যু হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ অশোক স্বীয় পুত্রকে সিংহলে প্রেরণ করেন। মহারাজ অশোকের সময় হইতেই ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সায়াম, চীন প্রভৃতি প্রায় সমগ্র আসিয়ায় ব্যাপ্ত হয়। *

* দশপুরুষ পর্য্যন্ত মৌর্য্যবংশ মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করে। তদনন্তর শূদ্র জাতীয় সুঙ্গ ও কাণ্ব বংশ খ্রীঃ পূঃ ১৮৩—২৬ অব্দ পর্য্যন্ত যথাক্রমে প্রবল হইয়া মগধে রাজত্ব করে। কাণ্ববংশীয় শেষ রাজাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দক্ষিণাপথ হইতে অন্ধ্রবংশ মগধে রাজপাট সংস্থাপন পূর্ব্বক সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একাধিপত্য লাভ করে। খ্রীঃ পূঃ ২৬ অব্দ হইতে

মহারাজ অশোকের বংশধরগণের প্রতাপ ও পরাক্রম কালক্রমে খর্ব্ব হইতে লাগিল। দশম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মৌর্য্যবংশ বিলুপ্ত হইল। মিত্র (সুঙ্গ) বংশীয় নরপতিগণ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিল। চৌদ্দজন মিত্রবংশীয় রাজা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী সময়ে নাগ, দত্ত, দেব, কান্ব, কুনন্দ ও অন্যান্য রাজবংশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে প্রতীয়মান হইতেছে। খৃষ্টীয় অব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে নয় জন নাগবংশীয় রাজা রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সময়ে কনোজে গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়।

খৃষ্টীয় অব্দের ১৪১ হইতে ৩১৯ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত চন্দ্রবংশীয় গুপ্তসম্রাটদিগের পদানত থাকে। প্রিন্সেপ সাহেবের মতে তের জন গুপ্তবংশীয় হিন্দু রাজা আর্য্যাবর্ত্তে রাজত্ব করেন। মতান্তরে ৮ জন রাজার নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চন্দ্র (?) গুপ্ত, ঘটোৎকচ, চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্র গুপ্ত, চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় (বক্রগুপ্ত), কুমার গুপ্ত (মহেন্দ্র গুপ্ত), স্কন্দ গুপ্ত, বুদ্ধগুপ্ত (নরগুপ্ত) ডাক্তর হারনলি গুপ্তবংশীয় এই আট জনের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ৪৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সার্দ্ধ চারিশত বৎসর অন্ধ্রবংশ প্রবল পরাক্রমের সহিত আর্য্যাবর্ত্ত শাসন করিয়া কনোজের গুপ্ত সম্রাটদিগের পদানত হয়। গুপ্ত সম্রাটগণ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের একাধিপতি ছিলেন। তাঁহারা হিন্দু হইলেও বৌদ্ধদিগকে উচ্ছেদ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। তাঁহারা সূর্য্যবংশীয় ছিলেন। তাঁহারা সকলেই শৈব ছিলেন। তাঁহাদের নামাঙ্কিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দৃষ্টে ইতিহাসবিৎগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহাদের দ্বারা এই উভয়বিধ মুদ্রাই আর্য্যাবর্ত্তে প্রথমতঃ প্রচলিত হয়। কান্যকুব্জের ন্যায় উজ্জয়িনী ও পাটলীপুত্রে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংস্কৃত পুরাণেও তাঁহাদিগকে মগধের রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মগধের সন্নিহিত বঙ্গদেশও তাঁহাদের শাসন দণ্ডের অধীন থাকাই সম্ভবপর *। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য হইতে কোন ক্রমেই অল্পায়তন ছিল বলিয়া বোধ হয় না। গুপ্তবংশের অধঃপতনের পর তাঁহাদের সাম্রাজ্য নানা

* উড়িষ্যার চন্দ্রবংশীয় গুপ্তসম্রাট্‌গণ বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন বলিয়া বোধ হইতেছে। উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ কেশরীবংশ তাঁহাদের দ্বারাই স্থাপিত হয়। কটকে বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যে তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে দেখা যায় 'সোমকুলতিলজ ত্রিকলিঙ্গাধিপতি মহারাজাধিরাজ' মহাভব গুপ্তের পুত্র মহারাজ মহাশিব গুপ্তের নামে জনমেজয়ের পুত্র মহারাজ যজাতি কেশরী স্বীয় রাজত্বের নবম বর্ষে কিয়ৎপরিমাণ ভূমি গঙ্গাপাণিভট্টকে প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ সম্বলপুর হইতে প্রাপ্ত যে তাম্রশাসন প্রকাশিত করেন, তাহা হইতেও দেখা যায় যে, শিবগুপ্তদেবের পুত্র মহাভব গুপ্তের নামে পূর্ব্বোক্ত জনমেজয় দেব স্বীয় রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে কিছু ভূমি চারিগোত্রের চারিজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫২ বৎসরকাল মহারাজ যযাতি কেশরী উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। এই সময়ে গুপ্তদিগের সাম্রাজ্য উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে ৩১৯ খৃঃ গুপ্তবংশের পতন কিরূপে সম্ভব হয়? কিন্তু তাম্রশাসনের প্রতিলিপিতে কান্যকুব্জের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি না। এই গুপ্তগণ তাহা হইলে কোথায় রাজত্ব করিতেন?

ভাগে বিভক্ত হয়। মহারাজ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের প্রথম বর্ষে (১৬৬ খ্রীঃ) গুপ্ত-অব্দ প্রচলিত হয়। গুপ্তগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শক (Scythian) বংশীয়, কাশ্মীর ও কাবুলের সম্রাট্‌গণের এবং সৌরাষ্ট্রের সত্রপ (Satrap) রাজাদিগের পরে প্রাদুর্ভূত হন।

খ্রীঃ পূঃ ২৫০-১২০ অব্দ পর্য্যন্ত গ্রীকদিগের সংস্থাপিত ব্যাকট্রিয়ানা রাজ্য, আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর হইতে নানাভাগে বিভক্ত হইয়া, স্বীয় স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের ৪৪ জন নৃপতি ও রাজ্ঞীর নাম এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন রাজ্য আফগানিস্থান ও পাঞ্জাব পর্য্যন্ত আধিপত্য সংস্থাপন করে। ব্যাকট্রিয়ানার পূর্ব্বভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য পালিভাষা প্রচলিত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ১২০ অব্দে অসভ্য শকজাতি মধ্য আসিয়া হইতে বহির্গত হইয়া ব্যাকট্রিয়ানার স্বাধীনতা ধ্বংশ করেন। সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়। শকজাতীয় ক্যাড্‌ফাইছিছ নাইছা রাজ্যের গ্রীক অধিপতি ছার্ম্মিয়াস্‌কে পরাজিত করিয়া নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশ, কাবুলে রাজধানী স্থাপন করিয়া, কাসগর, ইয়ারকন্দ, কাবুল, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও গুজারাট প্রভৃতি ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রান্তস্থিত দেশে, খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় অব্দের দ্বিতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত, শাসন করেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সভ্যতার সোপানে আরূঢ় হন। কনিষ্ক এই বংশের সর্ব্বপ্রধান নরপতি। অশোকের পর আর কোন বৌদ্ধ সম্রাট এতাদৃশী প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (বৌদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের ৪০০ বৎসর পরে) সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যে অব্দ প্রচলিত করেন, তাহা শকাব্দ নামে অদ্যাপি প্রচলিত আছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে হিন্দুগণ এই অব্দ পাটনরাজ শালিবাহনের নামে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। কনিষ্ক (কেনার্কি) হুষ্ক (হুয়ার্কি) ও বাসুদেবের নাম কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে। বাসুদেব এই বংশের শেষ রাজা।

খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় অব্দের সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত ২৬ জন সত্রপ সৌরাষ্ট্রে (গুজরাট ও কচ্ছ দেশে) রাজত্ব করেন। তাঁহাদের নামাঙ্কিত মুদ্রা দৃষ্টে তাঁহাদিগকে অশোকের পরবর্ত্তী ও গুপ্ত বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতি বলিয়া বোধ হয়। ডাক্তার হারণলির মতে সংবতাব্দ (৫৭খ্রীঃপূঃ) তাঁহাদিগের রাজত্বকালের আরম্ভ হইতে প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর।

গুপ্তবংশের অধঃপতনের পর গুজরাটের বল্লভীবংশ ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে বল্লভীপুরে অতি পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপিত করে। এই বংশের স্থাপয়িতা কনক সেন ও ধর সেন কনোজের গুপ্তসম্রাটদিগের অধীনে গুজরাটের শাসন কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। বল্লভী বংশীয় ১৯ জন নরপতি ৩১৯—৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কাহারও মতে তাঁহারা এগার পুরুষে ২৪০ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। গুপ্তগণের প্রবর্ত্তিত অব্দ বল্লভীগণ ব্যবহার করিতে থাকেন। এই বল্লভীবংশীয় ধর্ম্মশিলাদিত্যকে ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিয়াংশঙ দর্শন করেন।

উত্তর ভারতবর্ষের ইতিহাসে ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্বো-

ল্লিখিত রাজবংশসমূহের ন্যায় প্রবল পরাক্রমশালী কোনও রাজবংশ আধিপত্য স্থাপন করে নাই, কোনও প্রসিদ্ধ মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইয়া শিল্পশাস্ত্রের উৎকর্ষতার পরিচয় দেয় নাই, সাহিত্য ও দর্শনবিজ্ঞানের আলোচনার কোনও বিশেষ চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই, কপিল কালিদাসাদির ন্যায় কোনও প্রসিদ্ধ দার্শনিক বা কবি অভ্যুদিত হয় নাই। অশোক কি বিক্রমাদিত্যের ন্যায় কোনও প্রসিদ্ধ নৃপতি জন্ম গ্রহণ করে নাই। এই দুই শত বর্ষের অন্ধতমসাচ্ছন্ন কালকে ভারতীয় ইতিহাসের তমোযুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই তমোযুগে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ রূপে উৎপীড়িত ও উন্মূলিত হইয়া, ভারতবর্ষ হইতে তিব্বত ও চীন প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান শত্রু সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণাপথের অন্তর্গত মলবার দেশে ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বকীয় অলৌকিক প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার বলে তিনি বৌদ্ধাচার্য্যদিগের মত যুক্তিতর্কবলে খণ্ডন করিয়া, জনসমাজে বৌদ্ধধর্ম্মের অসারতা ও হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করেন। তিনি অদম্য উৎসাহের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিয়া, ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল উৎপাটিত করেন। তিনি গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে যেরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন, সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মানুরাগী নূতন রাজন্যবর্গ বৌদ্ধদিগের প্রতি অত্যাচার ও অবিচারের একশেষ প্রদর্শন করেন। এই সকল রাজবংশের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের রাজপুতগণ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই রাজপুত নরপতিগণ লাহোর, কনোজ, উজ্জয়িনী ও গুজরাট প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপিত করেন। উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য ৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে করুরের যুদ্ধক্ষেত্রে যে শকজাতিকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল তরঙ্গের গতিরোধ করেন, কথিত আছে, এই রাজপুতগণ তাঁহাদেরই বংশধর। বিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যবীর্য্যের নিকট পরাজিত হইয়া, তাঁহারা শান্তভাবে পশ্চিম ভারতের অনুর্ব্বর মরুপ্রদেশাদিতে উপনিবিষ্ঠ হন। তাঁহারা সম্ভবতঃ পৈতৃক বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সভ্যতার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নব ধর্ম্ম ও সভ্যতার যথোচিত বিস্তারে সবিশেষ যত্নপর হন। পুরাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগের পর তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধে নব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার্থ তুমুল সংগ্রাম করিয়া ধর্ম্মদ্রোহিতার পরিচয় দিবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? হিন্দু ধর্ম্মের নবীন অনুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা যেখানেই বিজয়ীর বেশে উপস্থিত হইয়াছেন, সেইখানেই বৌদ্ধ মন্দির ও ধর্ম্মশালা ভূমিসাৎ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে হিন্দু দেবমন্দির নির্ম্মাণ পুরঃসর হিন্দু দেব দেবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই রাজপুত জাতির অভ্যুদয় হইতেই আধুনিক হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণজাতির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া, হিন্দুজাতির বর্ত্তমান অধোগতির সূত্রপাত হয়। সমাজের এক অঙ্গ প্রবল হওয়াতে অপর অঙ্গ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া উঠে।

পশ্চিম ইউরোপের সহিত উত্তর ভারতের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। রোম সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর ইউরোপের তমোযুগে ফ্রেঙ্ক, লম্বার্ড, ভেণ্ডাল, গথ, হুন

প্রভৃতি অসভ্য জাতি উত্তর ইউরোপ হইতে বহির্গত হইয়া রোম সম্রাজ্যের বিভিন্নভাগে স্ব স্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। কালক্রমে তাহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক রোমের প্রবর্ত্তিত খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সভ্যতার সোপানে আরোহণ করে এবং তদ্দ্বারা তত্তৎ দেশীয় জনগণের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে। মগধ সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকগণ ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়া উড়িষ্যা পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক গ্রীক বিজ্ঞান ও সভ্যতা বিজিত দেশে প্রথমতঃ আনয়ন করে। তৎ-পর তুরেনিয়ান, সাইথিয়ান, কাম্বোজিয়ান, শক ও হুন প্রভৃতি অসভ্য জাতি খ্রীষ্টীয় অব্দের পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত পশ্চিম ভারতে প্রবিষ্ট হইয়া রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে। এই সকল বিদেশীয় জাতি মগধের বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সভ্য হইয়া ভারতীয় অধি-বাসীগণের সহিত মিশিয়া যায়। কালক্রমে তাহাদের সহিত ভারতবাসীর পার্থক্য সম্পূর্ণ রূপে তিরোহিত হয়। তাঁহাদের বংশধর রাজপুতদিগের দ্বারাই হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্টিত হইয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সূত্রপাত করে। ৫৪৪ খ্রীঃ করুরের যুদ্ধে বিক্রমাদিত্য বৌদ্ধ শকজাতির রাজ্যবিস্তৃতি নিরুদ্ধ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল উচ্ছ্বাস হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সম্রাট তৃতীয় ভেলেন্‌টিনিয়ানের সময়ে, ৪৫১ খ্রীষ্টীয়াব্দে, রোমসেনানী ইটিয়াস ও থিওডোরিক সেলোনের যুদ্ধক্ষেত্রে হুনরাজ এট্টিলাকে পরাজিত করিয়া অসভ্য হুনজাতির বিজয়িনী গতি সম্পূর্ণরূপে নিরোধপূর্ব্বক ইউরোপকে রক্ষা করেন। ৭৩২ খ্রীষ্টীয়াব্দে ফ্রেঙ্ক-নৃপতি বীরচূড়ামণি চার্লস্ পোইটিয়ারসের সুপ্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী মুসলমান সেনাপতি আব-দুল রহমানকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল উচ্ছ্বাস হইতে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপকে চিরকালের জন্য পরিত্রাণ করেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের সময়ে ভারত-বর্ষে হিন্দুধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হইয়া মৃতপ্রায় সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরবান্বিত নব যুগের অবতারণা করে। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে সম্রাট সারলিমেনের সময়ে (৭৭০-৮১৪ খ্রীঃ) ইউরোপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও সাহিত্যের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সভা মহাকবি কালিদাসাদি নব রত্নের দ্বারা যেমন অলঙ্কৃত হইয়াছিল, সেইরূপ সম্রাট চার্লসের (Charlemagne) সভায় এলকুইন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান ছিলেন। মগধের সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহা ভারতীয় জাতীয় ধর্ম্মে পরিণত করেন, সম্রাট কনষ্টেণ্টাইন খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ইউরোপে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সর্ব্বতোমুখী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম বৈষম্যবাদ ও জাতি ভেদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ধনী ও দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, দেশীয় ও বিদেশীয় সকলের মধ্যে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাব ও সার্ব্বভৌমিক প্রেম প্রতিষ্ঠিত করে। ইউরোপে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম জাতিমর্য্যাদা নির্ব্বি-শেষে সকলশ্রেণীর লোকের মধ্যে মধুর ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত করিয়া সাম্যবাদের মূল মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করে। খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের সাম্যবাদে দীক্ষিত ইউরোপ একতার

মাহাত্ম্যে বিজয়ী মুসলমান জাতির দুর্দ্ধর্ষ ও অপ্রতিহত গতি সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করিয়া বর্ত্তমান উন্নতি ও সভ্যতার সূত্রপাত করে। বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাম্যবাদকে পদদলিত করিয়া হিন্দুধর্ম্ম জাতিভেদ ও বৈষম্যবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে। হিন্দুধর্ম্মের বৈষম্যবাদে জর্জ্জরিত ও প্রপীড়িত হইয়া একতার অভাবে ভারতবর্ষ বিজয়ী মুসলমানজাতির দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপের নিকট মস্তক অবনত করে এবং স্বাধীনতা হারাইয়া চির দাসত্বের দুশ্ছেদ্য লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। সাম্যবাদের মহামন্ত্র বিস্মৃত হইয়া ভারতবর্ষ জাতীয় অধোগতির চরমসীমায় উপনীত হয়। ১১৯৩ খ্রীঃ হিন্দুজাতির স্বাধীনতা অন্তর্হিত হইয়া বিদেশীয় মুসলমান জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে সময়ে রাজপুত সামন্তগণ পশ্চিমভারতে অভ্যুদিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে উন্মূলিত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন, সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে মধ্যযুগ আরম্ভ হয়। এই যুগের আরম্ভ হইতেই ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বংশ কর্ত্তৃক বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাপিত হয়। ইহাদের মধ্যে—কাবুল ও পাঞ্জাবের পালোপাধিক হিন্দুরাজগণ, কাশ্মীরের উৎপলবংশ, কাঙ্গরার মহারাজবংশ, আজমীর ও দিল্লীর চৌহান ও তুয়ার বংশ, মালবের প্রথরবংশ, মিবারের শিশোদিয়া (গেহ্লোট) বংশ, অম্বর ও গোয়ালিয়ারের কচবহ বংশ, ত্রিপুরীর কুলাচারী চেদি বংশ, কনোজের গহড়গড় রাঠোর বংশ, মহোবার পরিহর ও চাণ্ডেল বংশ, বঙ্গ ও বিহারের পালবংশ এবং বাঙ্গলার সেনবংশ সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের রাজ্য, প্রতাপ ও পরাক্রম, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে নাই। এই সকল রাজবংশের মধ্যে একতার সম্পূর্ণ অভাব ও পরস্পরের ঘোরতর ঈর্ষা বিদ্বেষ বিরাজিত ছিল। ইহারা স্বদেশের কল্যাণের নিমিত্ত স্ব স্ব ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ও পরস্পর বিদ্বেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সমবেতভাবে একতার মহা মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিলে, ভারতবর্ষে মুসলমানজাতির প্রভুতা কোন কালেও সংস্থাপিত হইতে পারিত কি না, সন্দেহ স্থল।

কনোজের গুপ্তসম্রাটদিগের অধঃপতন ও গৌড়ের পালবংশীয় রাজন্যবর্গের অভ্যুদয়ের মধ্যভাগে বাঙ্গলায় কাহারা কি ভাবে রাজত্ব করেন, অতীত সাক্ষী ইতিহাস আজ পর্য্যন্তও তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। মধ্যযুগে যে সমস্ত রাজবংশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রাধান্য লাভ করেন, তন্মধ্যে পালবংশের সহিত দূরতর ভাবে এবং সেনবংশের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে ঢাকার ইতিহাস সংসৃষ্ট রহিয়াছে বিধায়, সংক্ষেপে তাঁহাদের বিবরণ পরবর্ত্তী প্রস্তাবে ক্রমে ক্রমে বিবৃত করিব।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

—০—

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (৩৫শ)

শান্তিপুরে।

বেলা অবসান হইয়াছে। শচীমন্দিরে ভক্তগণ সমবেত। শচীদেবী ভূপতিতা, সংজ্ঞা-হীনা। আজ বার দিন নিমাই সন্ন্যাসে গিয়াছেন, শচী দেবীর এই বার দিন উপবাস। গভীর পুত্রশোকে শচীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তিনি জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছেন। রামকৃষ্ণকে অক্রুর মথুরায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, শচীদেবী যশোদার ভাবে বিহ্বলা, এক একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যাহাকে দেখিতেছেন, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হ্যাঁগো তোমরা কি মথুরাবাসী? আমার রামকৃষ্ণ কেমন আছেন-জান?" এমন সময়ে নিত্যানন্দ আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; শচীদেবী একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন 'তুমি কি অক্রূর এলে? ঐ শুন গোষ্ঠ মাঝে সিঙ্গা বেণু বাজিতেছে; আমি বলিয়া পাঠাইতেছি, আমার রামকৃষ্ণ যেন গহনবনে চলিয়া যান্, তাহলে তো অক্রূর, তুমি তাঁদের ধরিতে পারিবে না।' নিত্যানন্দ দেখিলেন, শচী প্রলাপ বকিতেছেন। আর কিছু না বলিয়া উচ্চরবে বলিয়া উঠিলেন, "গৌর, আপনাকে দেখিবার জন্য, শান্তিপুরে অদ্বৈত ভবনে অপেক্ষা করিতেছেন। আপনাদের লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।" ভক্তগণ শুনিয়া বিষাদ পরিত্যাগ করিলেন, আনন্দ উৎসাহে প্রফুল্ল হইলেন। কথা শচীর কাণে প্রবেশ করিয়া অমৃত সিঞ্চন করিল। মস্তিষ্কের জড়তা দূর হইল এবং অল্পে অল্পে জ্ঞান লাভ করিয়া নিত্যানন্দকে চিনিতে পারিলেন। অবিরল ধারায় নয়ন ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল তিনি নিত্যানন্দের হাত ধরিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ শচীর দ্বাদশ উপবাসের কথা শুনিয়া বলিলেন "মা! আমি কি জানি যে তোমাকে প্রবোধ দিব; তুমি কি শ্রীকৃষ্ণের রহস্য বুঝিতেছো না? তোমার পুত্র অলোক-সামান্য; কে তাঁহার মহিমা জানিতে পারে? তিনি যখন তোমার বুকে হাত দিয়া বারবার বলিয়াছেন যে, ঐহিক পারমার্থিকের তোমার যত ভার, সকলই তাঁহার, তখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকা কি ভাল নয়? যাহাতে তোমার ভাল হইবে, নিশ্চয়ই তিনি তাহা করিবেন। শোক সম্বরণ করিয়া স্নানাহ্নিক করত শ্রীকৃষ্ণের ভোগের আয়োজন কর; ইষ্টদেব উপবাসী থাকিলে প্রত্যবায় হয়।'

শচীদেবী নিত্যানন্দের কথায় আশ্বস্ত হইয়া স্নানাদি করিয়া পাক করিলেন; এবং ভক্তদিগকে আহার করাইয়া নিজে কিছু ভোজন করিলেন এবং পর দিন শান্তিপুরে পুত্র দর্শনে যাইবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দের মুখে গৌরের ফুলিয়া গমন বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপের স্ত্রীবালক বৃদ্ধ সকলেই সাজিল। অতি প্রত্যূষ হইতে যাত্রীদল দলে দলে চলিতে লাগিল। খেয়াঘাটে লোকে লোকারণ্য। খেয়ারী পার

করিয়া উঠিতে পারিতেছে না; কেহ বা নৌকায়, কেহ বা ভেলায়, কেহ কেহ ঘট বুকে দিয়া এবং কেহ বা সন্তরণ করিয়া নদী পার হইয়া ফুলিয়া অভিমুখে চলিয়াছে। শান্তিপুর, ফুলিয়া, নবদ্বীপ তখন এক পারে; সুতরাং বর্ত্তমান ঋড়ে নদী পারের কথাই লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, যাত্রীদল ফুলিয়া নগরে যাইয়া অপরূপ সন্ন্যাসী দেখিয়া কৃতার্থ হইল। গৌরচন্দ্র আগন্তুকদিগকে যথাযোগ্য মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া বিদায় দিয়া শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন; কিন্তু জনতার হাত এড়াইতে পারিলেন না। যাত্রীদলও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শান্তিপুরে চলিল। চৈতন্যচরিতামৃতে ফুলিয়া গমনের কোন উল্লেখ নাই। চৈতন্যভাগবতে যদিও উহা উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তথায় গমন করিয়াছিলেন ও কোথায়ই বা অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ বৃত্তান্ত দেখা যায় না। 'ভক্ত হরিদাসের আশ্রমে যাই' বলিয়া গৌর তথায় গিয়াছিলেন; ইহার পরে শান্তিপুরে অবস্থিতি সময়ে হরিদাসের উপস্থিতি দেখা যায়। মনে হয়, হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে লইয়া যাওয়াই গৌরের ফুলিয়া যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল।

নবীন সন্ন্যাসী শ্রীপাদ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মুকুন্দ হরিদাসের সহিত অদ্বৈত ভবনে উপনীত হইলে, আচার্য্য বিস্ময়ে আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার আগমনের কথা নগরে রাষ্ট্র হইয়াছিল। তিনি আসিতে না আসিতে অদ্বৈত মন্দির লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। সকলের মুখেই আনন্দ ও উৎসাহের চিহ্ন। আজ হইতে অদ্বৈত গৃহে মহা মহোৎসব আরম্ভ হইল। অদ্বৈতাচার্য্যের শিশুপুত্র অচ্যুতানন্দ দিগম্বর হইয়া ধুলিধুসরিত অঙ্গে খেলা করিতেছিল। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলে গৌরচন্দ্র শিশুকে কোলে করিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন "কেমন অচ্যুত! অদ্বৈত আচার্য্য আমার পিতা, তুমি আমার ভাই; এস ভাই আমরা ভাই ভাই খেলা করি।" কথিত আছে, বালক অচ্যুতানন্দ উত্তর করিয়াছিলেন, হাঁ দৈবযোগে তুমি কখন কখন জীবের সখা হও বটে, কিন্তু সর্ব্বদাই তুমি সকলের পিতা। এমন সময় নবদ্বীপের ভক্তগণ সঙ্গে নিত্যানন্দ অগ্রে দোলায় চড়াইয়া শচীদেবীকে লইয়া উপনীত হইলেন। চরিতামৃতের মতে আচার্য্য-রত্ন ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ গৌরের সঙ্গে ছিলেন। যাহা হউক, জননীকে দেখিয়া গৌরচন্দ্র সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ হইলেন। শচী পুত্রকে কোলে লইয়া পুত্রের মুণ্ডিত মস্তক ও সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। পুনঃ পুনঃ মুখ চুম্বন করিতে ও অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। শচী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা নিমাই! সন্ন্যাসী হয়েছিস্ হয়েছিস্, কিন্তু দেখিস্, বিশ্বরূপের মত আমাকে যেন ফেলে পালাস্ নে।" বিশ্বম্ভরও জননীর ব্যাকুলতা দেখিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "মা! এই শরীর দেহ মন সকলই তোমার, আমি জন্ম জন্মান্তরে তোমার মত মায়ের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। সহসা সন্ন্যাস করিয়াছি বলিয়া তোমার প্রতি কখনই উদাসীন হইতে পারিব না। তুমি যে আজ্ঞা করিবে ও যেখানে থাকিতে বলিবে,

তাহাই করিব।" শচীদেবী আশ্বস্তচিত্তে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপের বন্ধুদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলেই মহানন্দে মত্ত হইয়া পূর্ব্বের বিরহ দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। অদ্বৈতাচার্য্য সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র বাসস্থান ও পরিচারক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অদ্বৈত গৃহে মহামহোৎসব আরম্ভ হইল। যথাসময়ে নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে গৌরচন্দ্র সবান্ধবে ভোজন করিতে বসিলেন। স্বয়ং অদ্বৈত পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আচার্য্য-পত্নী সীতা দেবী আজ মনের উল্লাসে কতই পাক করিয়াছেন। চৈ মরিচের ঝালে সুক্তা, নানা বিধ শাক, বার্ত্তাকু যোগে কোমল নিম্বপত্র ভাজা, মোচার ঘণ্ট, বড় অম্ল, মধুরাম্ল প্রভৃতি আর ছয় প্রকারের অম্ল, মুগের দাইল, নানাপ্রকার বড়া, ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি পিষ্টকাদি সঘৃত পায়সান্ন, ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, চাঁপা কলা, নারিকেল শস্য, ছানা, শর্করা যোগে সুমিষ্ট পিষ্টক, সুবাসিত সূক্ষ্ম আতপের সঘৃতান্ন প্রভৃতি আহারের নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক এক জনের অন্নস্তূপের চারিদিকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ ব্যঞ্জনপূর্ণ দোনা সজ্জিত। চৈতন্য প্রভু ভোজন করিবেন কি, অন্নব্যঞ্জনের পারিপাট্য দেখিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, এবং অদ্বৈতাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বসিব? এত ভাত তরকারী খাইতে পারিব না।" অদ্বৈত বলিলেন, "খেতে না পার, পাতে পড়িয়া থাকিবে।" চৈতন্য বলিলেন, "সন্ন্যাসীর পাতে উচ্ছিষ্ট রাখা কর্ত্তব্য নয়।" আচার্য্য পরিহাস করিয়া বলিলেন, "তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি আমি সব জানি, আর গোলে কাজ নেই, এখন খেতে বসো।" এই বলিয়া গৌরের হাত ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ বলিয়া উঠিলেন, "পাঁচ পাঁচটা উপবাস করে আছি, আজ দেখ্‌ছি এই কয়টা ভাতে পেটই ভরিবে না।" অদ্বৈত বলিলেন, "বেশ তো সন্ন্যাসী দেখ্‌ছি, সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, যে যাহা দেয়, সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাই লইতে হয়। অসন্তুষ্ট হইলে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যে মুষ্টিকান্ন দিয়াছি, তাতেই সন্তুষ্ট হও, লোভ করো না।" নিতাই কৃত্রিম কোপভরে বলিলেন, "নিমন্ত্রণ করিতে গিয়েছিলে কেন? যত চাইব, তত দিতে হবে।"

অদ্বৈত বলিলেন, "এটা কোথাকার ভ্রষ্ট অবধূত। এমনি করে দরিদ্র গৃহস্থকে জ্বালাতন কর্‌তে সন্ন্যাসী হয়েছো না কি? যা পেয়েছো, তাতেই সন্তুষ্ট হও। আমার ঘরে আর ভাত নেই।"

এইরূপে হাস্য কৌতুকে ভোজন চলিতে লাগিল। শ্রীচৈতন্য এক এক ব্যঞ্জনের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক খাইয়া রাখিতে লাগিলেন; অদ্বৈত পুনরায় তাহা পূরণ করিয়া দিতে লাগিলেন। গৌর বলিলেন, "আর খেতে পারি না।" অদ্বৈত উত্তর করিলেন, "তা হবে না, আগে যাহা দিয়াছি, তা সব খেতে হবে, এক্ষণে যাহা দিচ্চি তাহার অর্দ্ধেক খাইবে, অর্দ্ধেক রাখিবে"। নিতাই বলিলেন, "আজ যখন পেটই ভরিল না, তখন তোর ভাত তুই নে" এই বলিয়া একমুষ্টি উচ্ছিষ্টান্ন লইয়া আচার্য্যের গায়ে ছড়াইয়া দিলেন। অদ্বৈত ভাত গায়ে লইয়া নাচিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিলেন, "ঢঙ্গটার এঁটু গায়ে

করে, আজ পবিত্র হলেম, হাঁরে নিতাই গায়ে এঁটু দিয়ে আমার জাতকুল নাশ করিলি।” নিতাই বলিলেন, “কৃষ্ণের প্রসাদকে তুমি এঁটু বলে অপরাধ কর্‌লে, একশত সন্ন্যাসী ভোজন না করালে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।” অদ্বৈত কৃত্রিম ক্রোধ ভরে বলিলেন, “যা! যা! তোর মত সন্ন্যাসীতে আমার কাজ নাই, সন্ন্যাসী গুলাই তো আমার স্মৃতিধর্ম্ম নাশ করিল।” ভোজন সমাধান্তে সকলে বিশ্রাম করিলেন। অদ্বৈত মাল্য চন্দন লইয়া মহাপ্রভুর যোগ করিতে উপস্থিত হইলে গৌর বলিলেন, “আমাকে অনেক নাচাইলে, আর কাজ নাই, এক্ষণে ভোজন করগে।”

সন্ধ্যা সমাগত হইলে অদ্বৈতাচার্য্যের বাহির প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শান্তিপুরের লোক নূতন সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। ক্ষণকালে প্রাঙ্গন গৃহ লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। গৌরের অপরূপ লাবণ্য মুণ্ডিত মস্তক, পরিধেয় অরুণ বর্ণের কৌপীন বহির্বাস, গলায় হরিনামের মালা, সর্ব্বাঙ্গ চন্দন মাল্যে সুশোভিত দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। প্রথমে অদ্বৈতাচার্য্য গাইতে ও নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, আনন্দ, উৎসাহ ও মত্ততায় লোকে প্রেম বিহ্বলে কাঁদিতে লাগিল। তিনি এই পদ গাইতে লাগিলেন ঃ—

“কি কহিব রে আজ কি আনন্দ ওর,
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর।”

ক্রমে গৌর নিতাই যোগ দিলে মুকুন্দ দত্ত এই পদ গাইতে লাগিলেম ঃ—

“হাহা প্রাণপ্রিয় সখি! কিনা হৈল মোরে
কানুপ্রেম বিষে মোর তনুমন জরে।
রাত্রিদিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঙ;
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ।”

ক্রমে গৌরের ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিল, এবং “বোল বোল” বলিয়া এক প্রহর কাল উদ্দণ্ড নৃত্য করিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রম দেখিয়া ভক্তগণ কীর্ত্তন থামাইয়া তাঁহার সুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র যখন ভাবাবেশে সংকীর্ত্তন মাঝে আছাড় খাইতে লাগিলেন, তখন শচী দেবী ইষ্ট দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, “দেব নারায়ণ! আমি বাল্যকাল হইতে তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, এখন এই আশীর্ব্বাদ চাই, যেন নিমাই পড়িলে তার অঙ্গে ব্যাথা না লাগে।”

পর দিন প্রাতঃকালে শচী দেবী আচার্য্যকে বলিলেন যে, আমি আর নিমাইয়ের দেখা কোথায় পাইব, যে কয় দিন এখানে থাকেন, আমি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে চাই। আচার্য্য শচীর কথার মর্ম্ম বুঝিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন, সেই দিন হইতে দেবী শচী স্বহস্তে পাক করিয়া বৈষ্ণব গণের সহিত পুত্রকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। প্রাতে বন্ধুদিগের সহিত প্রেমালাপ, মধ্যাহ্নে সকলে একত্র ভোজন এবং সায়হ্নে বহুজনতার মধ্যে নৃত্য কীর্ত্তনে গৌরের দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। শচী মাতার স্নেহে, অদ্বৈতের যত্ন ও অনুরোধে এবং ধর্ম্মবন্ধুদিগের প্রেমের খাতিরে এক দুই করিয়া ক্রমে দশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। গৌরের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইলে যেমন বিবেকের তাড়নায় আত্মগ্লানি হয়, তেমনি তিনি

অশান্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। একাদশ দিনের প্রাতঃকালে গৌরচন্দ্র সমবেত আত্মীয় ও মাতৃ সন্নিধানে বলিতে লাগিলেন, "মা! তোমার মত মা আমি যেন জন্ম জন্মান্তরে পাই, তোমার প্রেমে আমি চিরবদ্ধ। প্রাণের বন্ধুগণ! তোমরা আমার চিরসঙ্গী, প্রাণ ছাড়া যায়, তবু তোমাদের ছাড়া যায় না। আমি যদিও সহসা সন্ন্যাস করিয়াছি, কিন্তু তা বলে কি তোমাদের ছাড়িতে পারি? এই দেখ, নীলাচল চন্দ্র দেখিতে যাইতেছিলাম, তোমাদের স্নেহই আমাকে নিবর্ত্তিত করিয়া এখানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। কিন্তু দেখ, সন্ন্যাস করিয়া আত্মীয় স্বজন লইয়া নিজ জন্মস্থানে থাকিলে কি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নষ্ট হয় না? লোকে এই সব কথা বলে কি নিন্দা কুৎসা রটাইতে ত্রুটি করিবে? তোমরা প্রাণের বন্ধু, যাহাতে দুই দিক্ বজায় থাকে, তাহা কর।"

কেহ কোন কথা না বলিতে শচী দেবী ধৈর্য্য সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "বাপ নিমাই! তুই যদি ঘরে থাকিস্, তবেই আমার সুখ। কিন্তু তোর সন্ন্যাস ধর্ম্মের হানি হইলে ও নিন্দা রটিলে আমার কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। বাপ রে, যাহাতে তোর সংবাদ মাঝে মাঝে পাই ও কখন কখন সাক্ষাৎ পাই, এমন কোন স্থানে থাকিলে সকল দিক্ রক্ষা হয়। নীলাচলে যাবি মনে করেছিস্, সেই বেশ যায়গা। লোক যাতায়াতে সংবাদ পাইব, অথবা শ্রীবাসাদিও মাঝে মাঝে যাইতে পারিবেন, কিম্বা গঙ্গা স্নান উপলক্ষে তুইও কখন কখন আসিয়া দেখা দিয়ে যেতে পারিবি। আমি বলি, সেই খানেই তোর বাস নির্দ্দিষ্ট হউক।" এই বলিয়া শচী দেবী অবিরল অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র বুদ্ধিমতী মাতার সারগর্ভ কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রসংশা করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, "মা! তবে এখন বিদায় দিন্, সময়ান্তে আবার দেখা হইবে।" অদ্বৈত প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ! তবে এখন বিদায় হই, তোমরা স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া হরি সংকীর্ত্তন কর গে; আমার সঙ্গে পুনরায় দেখা হইবে। কখন আমি গঙ্গাস্নানে আসিব, কখন বা তোমরা নীলাদ্রি যাইবে।"

ভক্তগণের মধ্যে হরিদাস কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি তো নীলাচলে যাইবে? আমার গতি কি হইবে? আমার তো নীলাচল চন্দ্র দর্শনের অধিকার নাই। তোমার বিরহে আমি কিরূপে বাঁচিব?"

চৈতন্য দেব উত্তর করিলেন, "হরিদাস! আর কেঁদো না। তোমার ক্রন্দনে আমি বড় ব্যাকুল হই। আমি তোমার জন্য জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া তোমাকে নীলাচলে লইয়া যাইব।"

অদ্বৈতাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে অভীপ্সিত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আরও কিছুদিন রাখিবার উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন, "তোমার যখন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, কাহার সাধ্য প্রতিনিবৃত্ত করিবে? কিন্তু সময় অতি ভয়ট; রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইতেছে; পথে দস্যুগণ ফিরিতেছে; অরাজকতা উপস্থিত। সে জন্য বলি, যে পর্য্যন্ত এই উৎপাতটা মিটিয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত এখানে থাকিলে হয় না কি?

"তাথাপিও হইয়াছে দুর্ঘট সময়;
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি যায়।
দুই রাজে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ;
মহা দস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ।
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়;
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয়।"

চৈঃ ভাঃ।

পাঠক মহাশয়! জানেন এই সময়ে গৌড়ের সুবাদারের সহিত উৎকল রাজের সীমান্ত প্রদেশ লইয়া বিবাদ চলিতেছিল। এ ১৪৩৩ অর্থাৎ ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দের কথা। যাহা হউক, অনুরাগী ভক্ত এ বাধায় কি পশ্চাৎপদ হন? শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, "যতই কেন উৎপাত হউক না; আমি অবশ্যই যাইব।"

অদ্বৈত অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "তোমার বিঘ্ন কে করিতে পারে? যাঁহার নামে সকল বিঘ্ন দূর হয়, সেই শ্রীহরি যখন তোমার হৃদয়ে, তখন কাহার সাধ্য তোমার গতিরোধ করে?"

শ্রীচৈতন্য আর কিছু না বলিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করত একেবারে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ, এই ছয় জন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত যাইতে প্রস্তুত ছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা তাঁহার অনুসরণ করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে চারিজন মাত্র সঙ্গীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত। অদ্বৈত কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে যাত্রীগণের অনুগমন করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার হাত ধরিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন, "দেখুন, আপনি ব্যাকুল হইলে সকল দিক্ নষ্ট হইবে। কোথায় আপনি জননীকে প্রবোধ দিবেন ও ভক্তদিগের নেতা হইয়া তাহাদের রক্ষা করিবেন; না আপনি শোকে বিহ্বল হইলেন! প্রতিনিবৃত্ত হউন, ভক্তগোষ্ঠির ভার আপনার উপর।" এই বলিয়া গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করিয়া গৌরচন্দ্র অদ্বৈতাচার্য্যকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সসঙ্গী গঙ্গার ধারে ধারে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে অদ্বৈত-গৃহে মহা ক্রন্দনের রোল উঠিল। শচীদেবী বজ্রাহতের ন্যায় শায়িতা; ভক্তদল কাঁদিয়া ব্যাকুল। অদ্বৈত কিছুদিন তাঁহাদের সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা করিয়া স্ব স্ব গৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

শ্মশান-বৈরাগ্য।

অমা তামসীর নিবিড় কালিমা
ঘিরিল সকল দিশি।
শন শন করি নিশার সমীরে
লইয়া খেলিছে নিশি।
ঘন ঘোরঘটা ছাইছে গগন
নাহিক তারকা লেশ,
আঁধারের ভয়ে আলোক লইয়া
জোনাকি ছাড়িল দেশ।
মুখ ভার করি যেন রে রজনী
নিরাশ স্বপন হেরে।
চারি দিক হতে নিবিড় কালিমা
অন্তর বাহির ঘেরে।
ধীরে ধীরে ধীরে হরিহবি বলি
মানব কয়েক জন।

শব ভার লয়ে শ্মশানে চলিছে
ভয়েতে আকুল মন।
ধীরে ধীরে ধীরে কলকল করি
তটিনী সাগরে যায়।
অলক্ষ্যে যেমন মানব জীবন
অনন্তের কোলে ধায়।
শোভিছে দুকূলে মাটীর কলসী,
মরার বিছানা রাশি,
আঁধারের কোলে অবাধে চলেছে
নরকপালের হাসি।
এহেন সময়ে হরিহরি বলি
ভূমিতে ফেলিল শব,
পলাইল ভয়ে দেরু পাল দল
থামিল ঝিল্লীর রব।
সাজাইল চিতা হরিনাম করি
খুলিল শবের মুখ,
আঁধারেও যেন রমণী বদনে
ভাসিছে স্বর্গের সুখ।
কিবা সে গঠন কিবা সে বদন,
মরণ কেবল গালি,
হায় রে রমণী কাহার হৃদয়ে
ঢালিলি শোকের কালি!
আলোক আনিলে শবের নিকটে
যুবার নিঃশ্বাস পড়ে।
ধীরে ধীরে ধীরে দুই ফোঁটা জল
কপোল বহিয়া ঝরে।
বিদেশে যখন শিক্ষার কারণ
ছিলেন যুবক রত,
লিখেছিল বালা এস একবার
দেখি জনমের মত।
মরণের আগে সুধু একবার
নয়নে নয়নে দেখা!
সে দৃষ্টিতে যেন চিরজীবনের
সকলি রয়েছে লেখা।
যেন এক বালা তাহারি কারণ
সহে নির্ব্বাসন ক্লেশ,
যেন তারই তরে সকল সহিয়া
পরিছে সুখের বেশ।
যেন, যার হাতে জীবন মরণ
সে কেন নিঠুর এত;
যায় প্রাণ যায় কি ক্ষতি তাহার
যদি দরশন পেত।

•

হায় কি মরম ব্যথা,
যাহার কারণ দিল এ জীবন
এমন কণক লতা,
মরণ সময় সে পাষাণময়
সুধাল না কোন কথা!
পিপাসা সময় রোগের জ্বালায়
পেল না একটু জল।
রোগের সময় কোনও ভিষকের
ঔষধ না হল তল।
কুপথ্যের তরে বাড়িল সে রোগ
জীবন বাঁচান ভার,
তথাপি বালার দাসত্বের হাতে
না হল নিস্তার আর।
রোগেতে মরিত রাঁধিত বাড়িত
খাটিত দাসীর মত,
দিনে তিনবার সিনান করিয়া
বলহে বাঁচিবে কত?

সমাজ, ধিক্ শতবার তোরে,
কেন নারীগণ একঠিন দেশে
জনমি অনলে পোড়ে?
কন্যার জনম শুনি পিতা মাতা
ফেলায় চোখের জল।
বিবাহের তরে অভাগা জনক
ভুঞ্জয়ে পাপের ফল।

চিরদিন বসি যে ধন সঞ্চিল
তাতেও না পেল কুল।
বিবাহের পরে এমনি অকালে
শুকাল স্নেহের ফুল।
কি ভয় পতির এ বঙ্গভাণ্ডারে
কতই বালিকা আছে।
ধনরত্ন দিয়া যার পিতা মাতা
দিবে মৃতদার কাছে।
গেল যার ধন জনম মতন
শুকাল আশার নদী।
হায় কি কারণ দুহিতা রতন
পাঠাও এ দেশে বিধি।

শেল বিঁধিল নবীন মনে,
হায় কি কারণ লইনু বন্ধন
ফেলিতে অশ্রুর সনে।

কেন বান্ধিলাম সে দৃঢ় বন্ধন
কাটিতে আপনি তাহা।
কেন পরিলাম সুন্দর মালিকা
রাখিতে নারিনু যাহা।

বিধি দেও মোরে এই বর,
আর যেন পুন এ পাষাণ হিয়া
ফিরিয়া না যায় ঘর।
আর লইব না প্রেমের বন্ধন
সংসারী হব না আর।
দেশে দেশে দেশে ফিরিয়া ফিরিয়া
বলিব একথা সার।
"যদি কেহ চাও মানব পিশাচ
দেখিতে নয়ন ভরে।
এসে দেখে যাও রমণী ঘাতক
বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে।"

শ্রীগৌরিশঙ্কর দাস গুপ্ত।

ভক্তি কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২০৭। অচল সকল বলিতেছে "মানব, তুমি অচল হইয়া নিরন্তর প্রাণেশ্বরের মঙ্গল চরণ নিত্য কাল পূজা কর। তোমার ভক্তি প্রেম ও বিশ্বাস অচল হইয়া তাঁহারি পবিত্র চরণে তোমায় অচল করুক"।

২০৮। যেমন নদ নদীর ক্ষুদ্র জলরাশি বিশাল সাগরের বৃহত্তর জলরাশিতে মিলিত হইয়া আনন্দ ও স্ফূর্ত্তিতে সমুদ্রতরঙ্গে নৃত্য করিতে থাকে, তেমনি মানবের ক্ষুদ্রতম প্রেম সেই অনন্ত ও অসীম প্রেম সাগরে মিলিয়া কতই আনন্দ স্ফূর্ত্তি ও পবিত্রতা ভোগ করে, "নাহি নাহি অন্ত তাহার"।

২০৯। যেমন অলক্ত জ্যোতির্বেত্তা পাগল বলিয়া স্বীকৃত হন, তেমনি অলক্ত চিকিৎসক পাগল নামেরই যোগ্য হন। চিকিৎসা বিদ্যার, জ্যোতির্বিদ্যার মত, এতই ব্রহ্ম দর্শন লাভের সম্ভাবনা।

২১০। অনিত্যতা হইতে নিত্যতার উৎপাদন! কি আশ্চর্য্য মঙ্গল ময়ের মঙ্গল সাধন। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বতশেখর, গিরি গুহা, গিরি কানন, তরুরাজী, লতা, পাতা, জলপ্রপাত, পক্ষীর মধুর কলরব প্রভৃতি নৈসর্গিক শোভা ও শব্দ সকলই অনিত্য পদার্থ; কিন্তু তাহারা লইয়া যায়, মানবের মন প্রাণ পূজিতে মঙ্গলময়ের নিত্য পবিত্র চরণ, ও হয় তজ্জন্যই তাহারা নিত্য মঙ্গলোন্নতির কারণ, কি আশ্চর্য্য মঙ্গলময়ের মঙ্গল সাধন!

২১১। সময় নষ্ট করা, আর অল্পে অল্পে আত্মঘাতী হওয়া, একই কথা।

২১২। যখন যাহার যেমন সহবাস, তখন তাহার তেমনই গুণলাভ, যতই পবিত্র স্বরূপের সহবাস ভোগ, ততই মানব জীবনের পবিত্রতা লাভ।

২১৩। পবিত্র স্বরূপের সঙ্গ-বিয়োগই পাপ, তাঁহার সঙ্গে যোগই পুণ্য।

২১৪। যেমন দূরস্থিত নীলাম্বর অচল প্রাতঃকালের মেঘাচ্ছন্ন অল্পালোকে মানবের চক্ষু গোচর হয়, ও তরুণ অরুণের কিরণ যতই প্রকাশিত ও উজ্জ্বল হইতে থাকে, ততই সে অদৃশ্য হইয়া মেঘরাশিতে যেন মিলিত হইয়া যায়, সেইরূপ, গুপ্ত পাপ ও অজ্ঞান অপবিত্রতাও মোহের সন্ধ্যালোকে মস্তকোত্তলন করে, ও যতই বিশুদ্ধ জ্ঞানালোক, পবিত্রতা ও প্রেমালোক বৃদ্ধি হয়, ততই সে অদৃশ্য হইয়া অনিত্যতার অন্ধকারে মিলিত হয়।

২১৫। ভক্ত জীবন না হইলে, নানা পার্থিব বিদ্যার উন্নতি সহকারে, অথবা বিজ্ঞান শাস্ত্র ও আলোচনা জনিত জ্ঞানালোকে জ্ঞানময়ের প্রকাশ দেখিতে পায় না। ঐ প্রকার তাঁহার দর্শন যাহারা পায়, তাহারা কতই পবিত্র সুখে সুখী হয়, ও অনিত্যতা হইতে নিত্যতাতে বাস করে।

২১৬। যখন প্রাতঃকালের সুখ সমীরণ বহমান হয়, ও তরুণ অরুণের লোহিত ও পীত কিরণে প্রকৃতির হাস্য আস্য হইতে মধু ক্ষরিত হয়, তখন ভক্তের প্রাণে আনন্দময়ের কতই আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে থাকে; কিন্তু ক্ষণকাল পরে যাই দিবাকরকে নীলাকাশে মেঘ আচ্ছাদন করে, তাই প্রকৃতির মলিন বেশ দেখিয়া ভক্ত চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতি সতীর এরূপ নীরস বদন হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করে। "প্রাণপতির অদর্শনে কাতরা হইয়াছি," এই উত্তর শুনিয়া ভক্তের প্রাণ আপন হৃদয় দেখিয়া কাঁদিয়া উঠে। বলে, "কোথায় রহিলে প্রাণ নাথ! ফেলিয়া আমায় মোহ পাপের আঁধারে। 'দাও দেখা কাতরে'। বল কে তাঁরে জানে, কোথায় গেলে দর্শন পাব সেই প্রাণের প্রাণে।" প্রকৃতি সতী যেমন প্রাণপতির অদর্শনে শোকাতুরা হয়, ভক্তের প্রাণ তেমন ভক্ত-নাথের অদর্শনে শোকাকুল হয়। প্রকৃতির জ্যোতিঃ যেমন সূর্য্য, ভক্ত প্রাণের জ্যোতিঃ তেমন ভক্ত-নাথ।

২১৭। যেমন দিনপতির উদয়াস্তে আকাশমণ্ডল লোহিত, পীত নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া মানবের নয়ন মন আকর্ষণ করিলে ভক্তের প্রাণে কতই ভাব স্রোত বহিতে থাকে, তেমনই, পূর্ণালোকের আগমন ও বিদায়ে সাধকের হৃদয়াকাশে নানা শোভা প্রকাশিত হইয়া তাহার প্রাণকে কতই আনন্দনীরে মগ্ন করে। মঙ্গলময়ের কি অপরূপ মঙ্গল বিধান!

২১৮। দিবাকরের অধীনতাতেই চন্দ্রমার কিরণে এত সুধা? পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ের সেবায় ভক্তের জীবন না জানি কতই অমৃতময় হয়!

২১৯। দিবাকর সমস্ত দিন করিয়া কর প্রসারণ, যতই অস্তাচলে করিতে থাকে গমন, ততই অচল সকল পাইয়া অবসর, কতই প্রকৃতি নাথের মহিমা কীর্ত্তন করে; যতই তাহারা অচল হইয়া করে তাঁহার গুণ গান, ততই তাহাদিগের শরীর হয় ঘন সুন্দর নীল বরণে শোভন। মানব প্রাণ সেইরূপ দৈনিক [illegible] নহন,

পূজা করে অবসর কালে প্রাণনাথের মঙ্গল চরণ। যতই সে পূজার গভীরতর আনন্দে হয় মগন, ততই তাঁহার পবিত্রতায় শোভিত হয় তাহার জীবন।

২২০। যাহাতে প্রেমময়ের প্রেমমুখচ্ছবি আচ্ছাদিত করে, তাহাই পাপ।

২২১। সন্তান দম্পতীর বিশুদ্ধ প্রণয়ের মধুময় ফলস্বরূপ। এ প্রকার ফল লাভের জন্য জায়াপতির বিশেষ যত্ন-সম্ভূত সংযুক্ত পবিত্র জীবনের নিতান্ত প্রয়োজন।

২২২। মানব মনে চিন্তার প্রবাহ নিরন্তর বহিতেছে; উহা কখন পবিত্র, কখন অপবিত্র আকার ধারণ করে। অপবিত্র স্রোতের বেগ ফিরাইবার জন্য, সদ্বিষয়ের স্মরণ, মনন ও কথন করিবে। তাহা হইলে অসচ্চিন্তার নিবারণ ও জীবন পবিত্র হইবে।

২২৩। যেমন গিরি কানন নানা সুন্দর সুগন্ধ ও পুষ্পিত ফুলে পূর্ণ হইয়া মঙ্গলময়ের চরণে তাহার গন্ধ দান করিয়া সার্থক হয়, সেইরূপ মানব ভক্তি ও প্রেমের মোহন পুষ্পে শোভিত হইয়া জীবনের সৌরভ ঐ চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হয়।

২২৪। মূর্ত্তি-উপাসকেরা জগদ্ধাত্রীর পূজা করে ইহারি জন্য যে জগজ্জননীর কৃপায় মানবের পশুভাব দেবভাব দ্বারা পরাভূত হইবে। উপাসক! তুমি এতই তমঃ ও রজঃ গুণের অধীন যে, তোমার সে সাত্বিক ভাবের দিকে দৃষ্টি নাই?

২২৫। যাহার জীবন নিয়ম বদ্ধ নহে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মের কঠোর শাসনাধীন হইতে বড়ই অক্ষম।

২২৬। অচলসম হইয়া নিত্য করিবে পূজা মঙ্গলময়ের মঙ্গলচরণ, নতুবা প্রাণনাথ করিবেন না তোমার সেই ভক্তি রসহীন পূজা গ্রহণ।

২২৭। মানব জীবন দ্বিবিধ, নিত্য ও অনিত্য। নিত্য জীবনের ভোগ দ্বার একমাত্র মস্তিষ্ক, ও ভোগ্য একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর। অনিত্য জীবনের ভোগ দ্বার নানা প্রকার ও ভোগ্য বহুবিধ বিষয়। যাহার নিত্য জীবনের একমাত্র মস্তিষ্ক, রুগ্ন ও অপবিত্র তাহার জীবন কীদৃশ দুঃখময়, তাহা সেই সর্ব্বান্তর্যামীই জানেন!!

২২৮। নৈসর্গিক শোভা ও শিল্প কার্য্যের মনোহারিতার প্রভেদ এই যে, প্রথমটি দৃষ্টে মানব প্রাণ সেই শোভনতমের চরণ তলে আকৃষ্ট হয় ও ভোগ করে তাঁহার পবিত্র সহবাসের কতই রসবর্ষণ; আর শেষোক্তটি লইয়া যায় মানবের নয়ন ও মন হীন ক্ষীণ মানুষ শিল্পকারীর নিকট ও দেখায় তাহার সামাজিক বিনয়রূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত গুপ্ত অভিমান!!

২২৯। ব্রহ্মোপাসনা সময়ে অশ্রুপাত না হইলে, আত্মার স্নান হয় না। প্রতিদিন শরীরের স্নানের সঙ্গে সঙ্গে, আত্মার স্নান হইলে, শরীর ও মন সুস্থ ও পবিত্র হয়।

২৩০। ব্রহ্মোপসনাকালীন তাঁহার দর্শনজনিত যে স্নিগ্ধতা ও শীতলতা মস্তিষ্কে অনুভূত হয়, তাহা জল সেবনে, সৌগন্ধের ঘ্রাণে অথবা অন্য কোন রূপ পার্থিব দ্রব্য ব্যবহারে হইতে পারে না। আনন্দময়ের প্রকাশে যে আনন্দ হয়, তাহা তাঁহার রচিত সজীব ও নির্জীব পদার্থে হইবার নয়।

২৩১। এ কি! এই নিশীথ কালে চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার ও নিঃশব্দতা; কিন্তু ঊর্দ্ধে দেখি অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় পুষ্পের বিকাশ, কতই আনন্দ তাহারা করিতেছে

প্রকাশ। নিরন্তর পূজা করিয়া বিশ্বনাথের মঙ্গলময় চরণ তাহারা করিয়াছে এমন সুন্দর উজ্জ্বল বেশ ধারণ। ওরে পাপ অন্ধকারাবৃত আমার মন! প্রাণ ভরিয়া পূজা করিলে প্রাণনাথের পবিত্র চরণ, ঘন অন্ধকারের মধ্যে হইবে তোরও উজ্জ্বল বেশ ভূষণ।

২৩২। কাহার লেখা, বাক্য, মত অথবা চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ ও প্রয়োজন বিনা কখন নিকৃষ্টভাবের অধীন হইও না। নিকৃষ্টভাবের অধীনতায় জীবন কলঙ্কিত ও হীন হয়। ভ্রান্ত উৎকৃষ্ট ভাবাধীনতা ভ্রান্ত নিকৃষ্ট ভাবাধীনতা অপেক্ষা অনিন্দনীয়।

২৩৩। মানব প্রাণ যথার্থ শোভায় দীপ্তি পায়, যখন শোভনতমের শোভা তাহাতে প্রতিভাত হয়।

২৩৪। মানব জীবন ও যৌবনের শোভা ও সৌরভ হয় সার্থক তখন যখন সে করে তাহা প্রাণনাথের পবিত্র চরণে অর্পণ।

২৩৫। ইচ্ছাপূর্ব্বক রাগ, কাম, অহঙ্কার, ঈর্ষা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-উদ্দীপক অসচ্চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিলে তজ্জনিত দূষিত রক্ত নানা শারীরিক ও মানসিক রোগের কারণ হয়।

২৩৬। হে প্রাণনাথ! আমি যেমন সময় ও খাদ্যের পরিমাণ ধরিয়া চলি, তেমনি কবে বাক্য ও চিন্তার পরিমাণ নিরূপণ করিতে পারিব? নিষ্প্রয়োজনীয় ও অসদ্ভাব উদ্দীপক অথবা প্রকাশক বাক্যের দ্বার একবারে রুদ্ধ করিতে সহায় হও। নিত্য জীবনের চিন্তা ব্যতীত অনিত্য জীবনের চিন্তা যতদূর যখন তোমার আজ্ঞা পালন জন্য আবশ্যক হইবে, তাহার অধিক যেন আমার মনে স্থান না পায়। হে পবিত্রস্বরূপ! অসদ্বাক্য ও অসচ্চিন্তা হইতে আমায় সম্যকরূপে উদ্ধার কর।

২৩৭। মানুষ মানুষকে চিনিতে পারে না। আমরা এতই ভ্রান্তবুদ্ধি ও ভ্রান্তনয়নে পরস্পর পরস্পরকে দেখি! আমি কিম্বা তুমি ঠিক কি, তাহা সেই অভ্রান্ত ও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বিনা কাহার সাধ্য নাই জানিবার ও বলিবার? আমি আমাকেই চিনিতে পারি না ত অন্যকে কেমন করিয়া চিনিব?

২৩৮। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে বলেন, স্বভাবের ক্রিয়া; ভক্ত তাহাকে বলেন, ভক্তনাথের অথবা প্রাণেশ্বরের ক্রিয়া।

২৩৯। ঔষধমাত্রেই পরম বৈদ্যনাথের দান। সকল ঔষধে মঙ্গলালয়ের মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে। মানব তাহা প্রস্তুত ও সেবন করিবার নানা প্রথা নানা স্থানে নানা সময়ে অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। কোন প্রথার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিলে নিতান্ত অনুদারতা দোষে দূষিত হইতে হয়। ভক্তের উদার ও প্রশস্ত বুদ্ধি ও প্রেমিক হৃদয় এরূপ দোষ সহ্য করিতে পারে না। কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ে যেমন বদ্ধ হওয়া উচিত নহে, তেমনি কোন এক বিশেষ চিকিৎসা প্রথাতে বদ্ধ হওয়া দূষণীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন সকল প্রকার প্রচলিত ধর্ম্মের সার, সেইরূপ সকল প্রকার চিকিৎসা প্রথার সারপ্রথা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। কবে যে তাহা হইবে, তাহা সেই পরম জ্ঞানময় বৈদ্যনাথই জানেন।

২৪০। সেই পূর্ণস্বরূপ জগৎ শাসনকর্ত্তা হইয়া কেবল জগতের অশেষ মঙ্গলের জন্য তাঁহার শাসন কার্য্য সম্পাদন করিতে-

ছেন, আর বলিতেছেন "মানব! তুমি দেশ বিদেশের রাজা হও, অথবা সমাজপতি বা সভাপতি হও, কিম্বা সভা বিশেষের অধ্যক্ষ হও, গৃহপতি, পিতা, বা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপাসনালয়ের উপদেষ্টা হও, বা বহু ভৃত্যের প্রভু বা বহু পরিজনবর্গের স্বামী হও, যখন যে কোন শাসনকার্য্যভার গ্রহণ করিবে, তব শাসনগত, শাসনলক্ষ্য জনগণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য, নিরবচ্ছিন্ন তাহাদিগের সর্ব্ববিধ কল্যাণের জন্য ঐ ভার বহন করিবে। কদাচ নিজ স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। তাহা করিলে তুমি শ্রীভ্রষ্ট হইবে। স্বার্থ তোমারে পাপ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবে, ও তোমার ও অন্যের নানা দুঃখের, অমঙ্গলের কারণ হইবে।" ভক্ত এই সুনীতির অনুসরণ না করিলে প্রকৃত ভক্ত হইতে কখনই পারিবে না। এই মহদ্বাক্যের অনুশাসনে শাসিত হইয়া কেবল প্রাণনাথের মঙ্গলচরণ পূজা করিবার জন্য, কোন বিশেষ সুখে সুখী হইবার জন্য নহে, রিপুকুলের শাসন, বা ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিবার গুরুভার বহন করিতে হইবে।

২৪১। পীড়াজনিত শয্যাশায়ী আদি-ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, ঈশ্বরের স্বরূপ অনন্ত; মানুষের জীবনের গতি অনন্ত।

২৪২। কাঁটা ঝাঁপ ও বঁটি ঝাঁপ। এই দুই ঝাঁপের উদ্দেশ্য বড় উচ্চ। ভক্তগণ মহাদরে সম্মুখে নিজ নিজ স্বার্থপরতাকে বিনষ্ট করিবে বলিয়া উচ্চ স্থান হইতে কণ্টকোপরি ঝম্প প্রদান করিল, তাহাতে ঐ অন্তঃ শত্রুর বিনাশ হইল না। তাহাতে তাহারা পরদিবস অধিকতর উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত আপনাদিগের উপাস্য দেবতার আশীর্ব্বাদ চাহিয়া মানবের ঐ চির বৈরকে খণ্ড খণ্ড করিবে বলিয়া বঁটির শয্যার উপর ঝাঁপ দিল!! বাস্তবিক শরীরকে নির্য্যাতন করিলে অন্তঃ শত্রুরা কিয়ৎ পরিমাণে কিছু দিনের জন্য পরাভূত হয় বটে। আশ্চর্য্য মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান।

নিম্নলিখিত তিন সংখ্যা ভুলক্রমে পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই।

১৬৫। শুষ্ক জ্ঞান নিয়ন্তাকে ছাড়িয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নিয়মাদি দেখে ও পালন করে। ভক্তি রসার্দ্র জ্ঞান তাঁহার নিয়মাদি পালনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দর্শন লাভ করে।

১৬৬। ব্রহ্মাণ্ডপতি পার্থিব রাজার মত আমাদিগের নিকট সম্মান চাহেন না। যিনি পূর্ণস্বভাব, তাঁহার আবার তাঁহা কর্ত্তৃক ক্ষুদ্র, সৃষ্ট মনুষ্যের নিকট সম্মান পাইবার অভিলাষ!! তিনি চাহেন যে, আমরা তাঁহার সহবাস ভোগ করিয়া পবিত্র উন্নত ও সুখী হই। তিনি চাহেন যে, আমরা তাঁহার আজ্ঞানুগত ও প্রেমাধীন হইয়া তাঁহার অনুচর ও সহচর হইতে থাকি।

১৬৭। ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্তের কোনরূপ পাপদূষিত মৃত্যু হয় না। তিনি তাহাকে সে রূপ মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন।

শ্রীকানাই লাল পাইন।

পরিচ্ছদ।

পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য কি ? এ প্রশ্ন আমাদের মনে উপস্থিত হইলে তিনটি উত্তর স্বভাবতঃ আমাদের অন্তরে উদিত হয় ; ১ম, শীতোত্তাপ হইতে দেহ রক্ষণোপযোগীতা ; ২য়, লজ্জা নিবারণ ; ৩য়, সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন। পরিচ্ছদ বিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সৌন্দর্য্যই সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যের পরিচ্ছদ ধারণের মৌলিক কারণ। যে সমস্ত অসভ্যজাতি আজও অত্যাবশ্যকীয় বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে শিখে নাই, শীতোত্তাপে প্রপীড়িত হইতেছে, তাহারাও সৌন্দর্য্যের প্রতি উদাসীন্ নহে, বরং তদ্বিপরীত। তাহারা আপনাদিগকে সুসজ্জিত করিতে যে পরিমাণে ব্যস্ত, বস্ত্রাদি ব্যবহার দ্বারা শীতোত্তাপ নিবারণে সেরূপ যত্নশীল নহে। যখন শীতাদির প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বস্ত্র ব্যবহার দূরে থাক্, পশুচর্ম্মও ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে নাই, তখনই বর্ব্বরজাতীয় পুরুষ রমণীগণ নগ্নদেহ নানা প্রকার রং ও উল্কী দ্বারা চিত্রিত করিত এবং তাহারা এই প্রকার বীভৎস সৌন্দর্য্যের মোহিনীমায়ায় মুগ্ধ ছিল। শীতে কম্পান্বিত কলেবর হইয়াও যাহারা কোনও প্রকার আবরণের আবশ্যকতা অনুভব করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহারাই কড়ি, প্রবাল প্রভৃতি গ্রন্থন করিয়া নগ্ন কটীতে বন্ধন করিয়া সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিত। এ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর হার্বার্ট স্পেন্সর বলিয়াছেন,—"It has been truly remarked that, in order of time, decoration precedes dress. Among people who submit to great physical suffering that they may have themselves handsomely tattooed, extremes of temperature are borne with but little attempt at mitigation. Humboldt tells us that an Orinoco Indian, though quite regardless of bodily comfort, will yet labour for a fortnight to purchase pigment wherewith to make himself admired ; and the same woman who would not hesitate to leave her hut without a fragment of clothing on, would not dare to commit such breach of decorum as to go out unpainted. Indeed the facts of aboriginal life seem to indicate that dress is developed out of decorations. And when we remember that even among ourselves most think more about the fineness of the fabric than its warmth, and more about the cut than the convenience—when we see that the function is still in great measure subordinated to the appearance—we have further reason for inferring such an origin."

সৌন্দর্য্য স্পৃহা হইতেই পরিচ্ছদের

উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু সৌন্দর্য্য কি? কোন্ বস্তু প্রকৃত অর্থাৎ সর্ব্ববাদীসম্মত সুন্দর? ইহা নির্ণয় করা অসম্ভব। Absolute সুন্দর বলিয়া কিছু আছে কি না জানি না। যাহা এক জনের নিকট অতীব সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, তাহাই অন্যের নিকট অত্যন্ত কুৎসিত বলিয়া প্রতিভাত হয়; যাহা একজাতির নিকট সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হয়, অপর জাতি তাহার বিপরীতকেই আদর্শ সুন্দর বলিয়া গ্রহণ করে। এইরূপে আমরা ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের রুচি সমালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, সৌন্দর্য্যের আদর্শ সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল—কোথায়ও এ আদর্শের স্থিরতা নাই। কেবল ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা জাতিতে জাতিতে এ আদর্শের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে, কিন্তু একই ব্যক্তির নিকট আদর্শ কখনও স্থির থাকে না। Fashion পরিবর্ত্তন এই আদর্শ পরিবর্ত্তনের বাহ্যবিকাশ।

সৌন্দর্য্যের প্রকৃতস্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব না হইলেও ইহার অবস্থা (conditions) স্থির করা তত কঠিন নহে। আমরা এই সমস্ত রুচি ও বেশভূষা পরিবর্ত্তনের মধ্যে সৌন্দর্য্য ও অবস্থার মধ্যে একটি সুনিশ্চিত সম্বন্ধ দেখিতে পাই। আমরা যাহা চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই এবং যাহার মধ্যে আমরা বাল্যকাল হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, তাহাই আমরা সুন্দর বলিয়া মনে করি, এবং যাহা এই প্রচলিত রুচি বিরুদ্ধ তাহাকে আমরা কুৎসিৎ বলিয়া বিবেচনা করি। এই কারণে সকল দেশে ও সকল কালে নব প্রবর্ত্তিত কোন রুচির বিরুদ্ধে লোক সাধারণকে দেখিতে পাওয়া যায়—নবপ্রবর্ত্তিত রুচিসম্পন্ন লোকদিগকে Fashion প্রিয় বাবু, বা তত্তুল্য অন্য কোন নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। এমন কি সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের নেতাগণকে সমসাময়িক লোকের নিকট নিন্দিত হইতে দেখা যায়, যেন প্রচলিত যাহা কিছু তাহার পরিবর্ত্তন একটা ভয়ানক দোষাবহ কার্য্য। কিন্তু কাল সহকারে সেই নব প্রবর্ত্তিত রুচি ক্রমে ক্রমে লোক সাধারণের মধ্যে ব্যাপৃত হইতে থাকে। যখন তাহাতে লোক সাধারণের চক্ষু অভ্যস্ত হইয়া আইসে, যখন তাহা ক্রমশঃ অভিনবত্ব হারাইয়া Custom এর মধ্যে পরিগণিত হয়, তখন আবার তাহাই সাধারণ চক্ষে সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে। তখন আবার সেই প্রতিবাদকারীগণকেই সাদরে তাহাই গ্রহণ করিতে দেখা যায়। এমন কি যদি কালে আবার সেই পূর্ব্বতন রুচি কেহ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিতে প্রস্তুত হন, তবে সেই পূর্ব্বতন প্রতিবাদকারীগণই যে এবারও প্রতিবাদের হস্ত উত্তোলন করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই শ্রেণীর লোক চিরদিনই অভ্যাসের দাস,—চিরাভ্যস্ত রুচি বিরুদ্ধ কার্য্য তাহাদের নিকট কুৎসিৎ বা ন্যূন পক্ষে "কেমন, কেমন" বলিয়া মনে হইবে। সুতরাং তাহারা যে সকল প্রকার পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে তাহাতে আবার আশ্চর্য্য কি? প্রকৃত উন্নতিশীল ব্যক্তি কখনই সে ভাবে কোনও নব প্রবর্ত্তিত রুচির সমালোচনা করিবেন না। তিনি কেবল তাহাতে মানবের সুবিধা অসুবিধার বিচার করিবেন, সাধারণ বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের রুচিসম্মত বা রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার নিকট কিছুই যায় আ'সে না। তিনি

সকল বস্তুরই ব্যবহারোপযোগীতার প্রতি লক্ষ্য স্থাপন করেন এবং তাহা লইয়াই বিচার করেন;—সৌন্দর্য্যের ভ্রান্তিজাল তাঁহার বিচার শক্তিকে মলিন করিতে পারে না। প্রকৃত উন্নতিশীল ব্যক্তি স্বীয় আদর্শের অনুসরণ করেন, তাহাই তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে যান, বর্ত্তমান তাঁহার আদর্শ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত কি না সে বিবেচনা তাঁহার চিন্তা বা কার্য্যকে নিয়মিত করিতে পারে না,—তিনি ভবিষ্যতের জন্য কার্য্য করেন, ভবিষ্যতই তাঁহার ক্রীড়া রঙ্গভূমি।

সৌন্দর্য্যের ন্যায় লজ্জা নিবারণও বেশ ভূষার একটি উদ্দেশ্য। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনার পূর্ব্বে লজ্জা সম্বন্ধে দুচারিটি কথা বলাই বিধি। লজ্জা কি? লজ্জার মূল কোথায়? প্রচলিত "লজ্জায় জড়সড়" কথাটিই লজ্জার প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রাণের এই সঙ্কুচিতভাব বিশেষেরই নাম লজ্জা। ইহার কারণ কি? সৌন্দর্য্যের ন্যায় ইহাও যে একটি অভ্যাসজাত সংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে ইহা সকল দেশের ও সকল জাতির লজ্জা সম্বন্ধে আদর্শ পর্য্যালোচনা করিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। এক জাতি যে কার্য্যে লজ্জায় ম্রিয়মান হইবে, অপর জাতি তাহাতে লজ্জার কিছুমাত্র কারণ দেখিতে পায় না। সভ্য জাতিদের মধ্যে তথাপি একটা একতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ব্বরজাতির সহিত সভ্যজাতির লজ্জার আদর্শ তুলনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। যে নগ্নাবস্থা সভ্যজাতি মাত্রেই নিতান্ত লজ্জাকর বলিয়া বিবেচনা করেন, যে সংস্কার সভ্যজাতিদের মধ্যে এতদূর প্রবল হইয়াছে যে, অনেকে লজ্জা রক্ষার জন্য মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই নগ্নাবস্থাই বর্ব্বরজাতির স্বাভাবিক অবস্থা, তাহাতে তাহাদের লজ্জা হওয়া দূরে থাকুক, অপিচ তাহাদের নগ্নদেহকে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করাই তাহারা পরম লজ্জার কারণ বলিয়া বিবেচনা করে। বর্ব্বর জাতির বিবরণ পাঠ করিলে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ব্বর জাতির কথা পরিত্যাগ করিয়া সভ্যজাতিদের লজ্জার আদর্শ সমালোচনা করিলে অভ্যাসের মোহিনী শক্তি আরও সূক্ষ্মরূপে আমরা বুঝিতে সমর্থ হইব। এক জন ইংরাজ ললনা অনাবৃত পদে কোন পুরুষ সম্মুখে বাহির হওয়া বিষম লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করিবেন বটে, কিন্তু অর্দ্ধ অনাবৃত বক্ষে পরপুরুষের সহিত নৃত্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না। একজন হিন্দু মহিলার নিকট ইহা নিতান্তই বীভৎস বলিয়া বোধ হইবে, এবং ইহা শুনিবামাত্র লজ্জায় মুখ অবনত করিবেন। সাধারণ রুচির প্রভাব এমনই প্রবল যে, একজন ইংরাজ বা ফরাসী ভদ্রলোক যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রাতঃকালে লোক সমক্ষে যাইতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হন না, সেই পরিচ্ছদ পরিয়া কোন সান্ধ্যসমিতিতে যাইতে লজ্জা বোধ করেন। যাহা লোক সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নাই, যাহা সাধারণ রুচি বিরুদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠান করিতে একটু কেমন সঙ্কোচ হয়, একটু "কেমন কেমন" করে, তাহারই নাম লজ্জা, কম বেশী কেবল অবস্থার উপর নির্ভর করে।

সৌন্দর্য্য ও লজ্জার আদর্শ এত পরিবর্ত্তনশীল হইলেও, ইহার মূল মানবের এত সামান্য একটি বৃত্তির উপর নির্ভর করিলেও

ইহার যে কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই, এরূপ বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। অপিচ লজ্জা ও সৌন্দর্য্য যদি বেশ ভূষার দুটি প্রধান অঙ্গ না হইত, তাহা হইলে অনেক দেশে বৎসরের অধিকাংশ সময়েই পরিচ্ছদের কিছু মাত্র প্রয়োজন হইত না। তবে বেশভুষা সম্বন্ধে সৌন্দর্য্য ও লজ্জার উপযুক্ত সীমা নির্দ্ধারণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

শীতোত্তাপ হইতে দেহ রক্ষা, লজ্জা নিবারণ ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধনই পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য। এই তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে সমঞ্জসীভূত সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিলেই আমরা ইহাদের পরস্পরের সীমা দেখিতে পাইব। শীতোত্তাপ হইতে দেহ রক্ষা যে পরিচ্ছদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্ব প্রথম উদ্দেশ্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। প্রকৃতির প্রবল শক্তির তাড়নায় মানব অনেক অসুবিধা সহ্য করিয়াও স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবরণ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু প্রকৃতির এ শক্তি সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সমভাবে প্রকটিত নহে, সুতরাং ইহার কার্য্যকারীতারও স্থিরতা নাই। নিতান্ত বাধ্য না হইলে বা অন্য কোন লোভনীয় পদার্থ সম্মুখে না থাকিলে কেহই এ অসুবিধা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইত না। মানুষ সাধ করিয়া স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাঁধিয়া রাখিত না। এমন সময় লজ্জা আসিয়া প্রকৃতির সাহায্যে উপনীত হইল, লজ্জার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মানুষ স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবরণ করিতে বাধ্য হইল। যে পরিচ্ছদ ব্যবহার পূর্ব্বে ইচ্ছাধীন ছিল, তাহা এখন অবশ্য প্রতিপাল্য হইয়া উঠিল। মানব সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবৃত করিতে বাধ্য হইল। মানবের এই লজ্জা বৃত্তির উৎপত্তি স্থান কোথায়, তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি। যদিও চির পরিবর্ত্তনশীল ব্যবহার ও রুচির উপর লজ্জাবৃত্তির কার্য্য প্রধানতঃ নির্ভর করে, যদিও ব্যবহার ও রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার আদর্শ সর্ব্বক্ষণ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তথাপি মানব-সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এ আদর্শের আমূল পরিবর্ত্তন অসম্ভব। মানবের সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানবান্তরে এমন একটি বৃত্তির বিকাশ হইয়াছে, যাহার সহিত লজ্জাবৃত্তির অতি নিকট সম্বন্ধ, এবং যত দিন না তাহার আমূল উচ্ছেদ হইয়া মানব পুনরায় বর্ব্বরাবস্থায় পরিণত হইতেছে, তত দিন এবৃত্তির একান্ত উচ্ছেদ অসম্ভব। এটি মানবের নৈতিক বৃত্তি। পশু সমাজে স্ত্রী ও পুরুষ যে ভাবে পরস্পরের সঙ্গ কামনা করে, মানবের বর্ব্বরাবস্থায়ও ঠিক সেই ভাবেই পুরুষ রমণী পরস্পরের সহিত মিলিত হইত, পশুভাবই তাহাদের একমাত্র আকর্ষণী ছিল। ক্রমে যখন মানব হৃদয়ে জ্ঞানের প্রভা অল্পে অল্পে প্রতিফলিত হইতে লাগিল, মানব স্বীয় জীবনের উচ্চতর লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল, মানব হৃদয় স্বতঃই স্বীয় লক্ষ্য লাভে উন্মুখ হইয়া পড়িল। পুরুষ রমণী আর কেবল পশুভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া মিশিতে চাহিল না। এই আদর্শের পবিত্র ক্ষেত্রই তাহাদের মিলনের রঙ্গভূমি হইল, পশুভাবের পরিবর্ত্তে এই আদর্শই তাহাদের প্রধান আকর্ষণী হইল। যাহারা মানবহৃদয়ে এ বৃত্তির ক্রম-বিকাশ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিতে পাইবেন যে, মানবহৃদয়ে এ আদর্শের মোহিনী শক্তি কত প্রবল। যখন মানব হৃদয়

আদর্শের অপার মহিমা কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিল, তখন একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ভাবের আবেগে মানব আপনাকে ঘৃণা করিতে লাগিল, পশুবৃত্তির সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। এ আদর্শ-লাভের প্রবল কামনায় নানা প্রকার অস্বাভাবিক উপায় পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে লাগিল। এই উচ্চতর লক্ষ্যের অনুযায়ী জীবনকে গঠিত করিতে হইলে এক দিকে যেমন আদর্শকে অতি যত্নে হৃদয়ে পোষণ করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনই তল্লাভের অন্তরায় গুলিকে সর্ব্বদাই দূরে রাখা প্রয়োজন হইয়া উঠে। এখানেই বস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন, এখানেই পুরুষ রমণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুচারুরূপে আবৃত রাখা অবশ্যপ্রতি-পাল্য হইয়া পড়ে, স্থান ও ঋতুভেদ আর কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না।

অঙ্গাবরণের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইল। এখন কি ভাবে অঙ্গাবরণ সুবিধা জনক দেখা যাউক। একখানি সুদীর্ঘ বস্ত্রদ্বারা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে একত্রে আবৃত করিয়া লজ্জা নিবারণ করা যায় এবং এই রূপে দেহাবরণ করাই লজ্জা নিবারণের সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রশস্ত উপায় বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু এরূপ আচ্ছাদন দ্বারা আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রমুক্ত ক্রিয়া বন্ধ করা হয়, ইহা বোধ হয়, কেহ অস্বীকার করিবেন না। অপর দিকে প্রমুক্ত ক্রিয়া বন্ধ না করিয়াও সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিকে পৃথক রূপে আবরণ করা যাইতে পারে এবং এরূপ পরিচ্ছদই যে ক্রিয়াশীল মানবজীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন তাহা কোন সুবিবেচক ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। ক্রিয়াশীল ইউরোপীয় পুরুষ জাতির পরিচ্ছদই মানবের একান্ত উপযোগী। এখানেও আপত্তিকারীর অভাব নাই। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, কর্ম্মশীল জীবনের পক্ষে এরূপ পরিচ্ছদ সুবিধাজনক হইলেও, তাহা সকল অবস্থার উপযোগী নহে। মানব জীবনে এরূপ বহুতর দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে যে সময় এরূপ পরিচ্ছদ বিশেষভাবে মানবের অমঙ্গলকারী। জলমগ্ন হইলে বা বস্ত্রে অগ্নি লাগিলে এ পরিচ্ছদ জীবনকে বিশেষ ভাবে সঙ্কটাপন্ন করে। তাঁহাদের মতে এরূপ স্থলে বঙ্গদেশের পরিচ্ছদই অত্যন্ত উপযোগী। বস্তুত ইহাঁদের আপত্তির সারবত্তা আমরা কোন ক্রমেই অস্বীকার করিতে পারি না। আমরা এরূপ ঘটনার হাত এড়াইবার জন্য দিগম্বর থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী মনে করি!!

পুরুষজাতির পরিচ্ছদ লইয়া তত আপত্তি নাই। আজ কাল যে কারণেই হউক, আমাদের দেশের পুরুষেরা ইউরোপীয় পোষাকের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন। দেশ ভেদে তাহারও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। ইউরোপ শীত প্রধান, ভারতবর্ষ গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, সুতরাং ইউরোপের ন্যায় ভারতে কখনই উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইউরোপের পরিচ্ছদ ভারতের উপযোগী করিতে হইলে সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিলেই হইবে। সে পরিবর্ত্তন ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাউক, স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদ কিরূপ হওয়া উচিত। আমাদের (বঙ্গ) দেশের প্রচলিত স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদ স্ত্রীমাত্রের স্বাভাবিক অলঙ্কার ও অতি

সন্নিকট তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আর যদি স্বাভাবিক অবস্থাই মানবের বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশীয় স্ত্রী জাতির পরিচ্ছদই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, সুতরাং বৎসরের অধিকাংশ সময়ই আমাদিগের বস্ত্র ব্যবহারের কোন স্বাভাবিক প্রয়োজন নাই, বরং বস্ত্র ব্যবহার অনেক সময় কষ্টদায়ক। তবে একমাত্র লজ্জার খাতিরে আমাদিগকে গ্রীষ্মাতিশয্যের মধ্যেও বস্ত্রব্যবহারের অসহ্য কষ্টও সহ্য করিতে হয়! আমাদের একটু আচ্ছাদনের প্রয়োজন হইয়া উঠে!! আমাদের রমণীরা পুরুষ সমাগম বিহীন অন্তঃপুরে আবদ্ধ, তাঁহাদিগকে কখনই অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে হয় না, সুতরাং তাঁহারা এক প্রকার লজ্জার হাত হইতে মুক্ত। তবে জীবনের একটি বিশেষ দুর্ঘটনার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাঁহাদের এক খানি আচ্ছাদনের প্রয়োজন। একটি উদাহরণ দিলেই এ দুর্ঘটনার প্রকৃতি বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। যে সব স্থানে তৃণাচ্ছাদিত গৃহ প্রচলিত ও অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ও বিদ্যমান আছে, সেখানে অগ্নিদাহের ভয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটি বড় সুন্দর উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। জল পূর্ণ মৃৎ কলসী গৃহের উপরিভাগে সজ্জিত থাকে এবং তাহাতে একটি রজ্জু সংলগ্ন থাকে। যখন গৃহে অগ্নি লাগে, তখন সেই রজ্জু ধরিয়া টানিলেই উক্ত কলসীর জলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। আমাদের রমণীদের পরিচ্ছদও তদ্রূপ। যদি কখন পুরুষ সম্মুখীন হওয়া রূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়, তবে সেই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একখানি বস্ত্র সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখা হয়, যে বিপদে পড়িলেই তদ্দ্বারা লজ্জা নিবারণ করা যাইতে পারে। প্রকৃত কথা বলিতে হইলে, সর্ব্বাঙ্গ সুচারুরূপে বস্ত্রাবৃত করা পরিচ্ছদের একটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের দেশের রমণীরা অন্তঃপুরবদ্ধা। কিন্তু দেশের সৌভাগ্যে এমন দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যখন হিন্দুরমণীদের ভিন্ন রূপ ভবিষ্যত চিন্তা করা আর বাতুলের কার্য্য নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এমন এক দিন অবশ্যম্ভাবী, যখন আমাদের রমণীরা আর অন্তঃপুরেই আবদ্ধ থাকিবেন না, তাঁহারাও সুশিক্ষা লাভ করিয়া পুরুষের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন। আমরাও সেই দিনকে লক্ষ্যপথে রাখিয়া রমণীর পরিচ্ছদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

মানব হৃদয় স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যের অনুরাগী। সৌন্দর্য্য মনুষ্যের একটি সুখের দ্বার, যাহাতে সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। যিনি মানব জীবনে একটি নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিলেন, তিনি প্রকৃতই মনুষ্য সমাজের কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরা সৌন্দর্য্যের প্রতিকূল নহি, বরং তাহার অনুরাগী। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। সৌন্দর্য্য বলিয়া কোন সুদৃঢ়, বাঁধা বাধি জিনিস নাই। সাময়িক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। এক সময়ে আমাদের দেশে সুদীর্ঘকেশ রমণীর ন্যায় পুরুষের মস্তকেরও শোভা বর্দ্ধন করিত। পরে মুসলমানদের প্রভুত্ব কালে তাহাদের দৃষ্টান্তে চুল কিঞ্চিৎ ছোট হইয়া "বাবরী" আকার ধারণ করিল। তখন আপামর সাধারণ সকলেই "বাবরী" চুলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইল। ৪০।৫০ বৎসর

পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহাই সাধারণের রুচি সঙ্গত ছিল। ক্রমে ইংরাজের দৃষ্টান্তে আমরা চুল একেবারে ছোট করিতে শিখিয়াছি। এখন ইহাই আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সমস্ত সভ্যজগতে অন্ততঃ রমণীদের দীর্ঘ কেশ সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এজন্য প্রকৃতি যাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন নাই, তিনি পরচুলা ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু "কালস্য কুটিলা গতিঃ।" অধুনাতন সুসভ্য ইউরোপ ভূমিতে কোন কোন রমণী কেশচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং এরূপ আশা করা যায়, যখন রমণীরা স্বাস্থ্য ও সুবিধার দিকে অধিকতর মনোযোগী হইবেন, তখন এই প্রথাই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবে। সৌন্দর্য্যের আদর্শ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন এতই অধিক যে, তাহার প্রমাণসংগ্রহ করিবার প্রয়োজন নাই।

ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশের রমণীদের পরিচ্ছদ বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহাদ্বারা পরিচ্ছদের তিনটি লক্ষ্যের মধ্যে একটিও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। না ইহাতে শীত নিবারণ হয়, না লজ্জা নিবারণ হয়, না সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন হয়। এ পরিচ্ছদ যে আমূল সংস্কৃত হওয়া প্রয়োজন, তাহা বোধ হয় কোন সুবিবেচক ব্যক্তিই অস্বীকার করিবেন না। এখন কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া বিধি, তাহাই বিবেচ্য। ইউরোপীয় রমণীর সেমিজ, পেটিকোট, জ্যাকেট ও হিন্দু রমণীর সাড়ী লইয়া খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম মহিলাগণ এক প্রকার নূতন পরিচ্ছদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার দ্বারা উল্লিখিত তিনটি লক্ষ্য অল্পাধিক পরিমাণে সংসিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু তাহাও কখন ভবিষ্যতের পোষাক হইতে পারে না। আমাদের রমণীরা আজও অন্যের উপার্জ্জিত অর্থে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে এখনও জীবন সংগ্রামে পড়িয়া নিজের ভরণ পোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয় না। এরূপ অবস্থা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। সে দিন বহুদূর নয়, যে দিন রমণীদিগকেও পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জীবন সংগ্রামে খাটিতে হইবে। তখন এরূপ পরিচ্ছদে কখনই চলিতে পারিবে না। তবে কি ইউরোপীয় রমণীগণের পরিচ্ছদ অনুকরণ করা বিধি? আমরা ঠিক্ তাহারও পক্ষপাতী নহি। ইউরোপেও স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদ সংস্কারের জন্য নানা প্রকার আলোচনা ও আন্দোলন হইতেছে।

মানবদেহই নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের চরম ফল। প্রকৃতির রাজ্যে এতদপেক্ষা সুন্দরতর জিনিস আর কিছুই নাই। পরিচ্ছদ এক দিকে যেমন শীতোত্তাপ ও লজ্জা নিবারণ করিবেক, তেমনই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করাও পরিচ্ছদের একটা লক্ষ্য। সর্ব্বোপরি সুবিধা ও আরামের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। পরিচ্ছদ যদি মানবদেহের সমস্ত অঙ্গসৌষ্টব একেবারে আবৃত করিয়া রাখে, তাহা হইলে সৌন্দর্য্য রক্ষা করা হইল না। তদ্ভিন্ন অঙ্গ সঞ্চালনাদিরও ব্যাঘাত হইতে পারে। আমরা এরূপ পরিচ্ছদের পক্ষপাতী নহি। "Clothing should follow, and drapery should not contradict, the natural lines of the body." এই মতই আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। স্বভাব প্রদত্ত দুখানি পা একটি পেটিকোট দ্বারা আবদ্ধ না হইয়া, দুটি স্বতন্ত্র পেটিকোট দ্বারা আবৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তাহা হইলে পরিচ্ছদের কার্য্যকারীতা অধিকতর বাড়িবে। কেবল যে কার্য্য-কারীতা বাড়িবে তাহা নহে, ইহা স্বাস্থ্য-নীতিরও অনুমোদিত। এজন্য অনেক চিকিৎসক এরূপ পরিচ্ছদের স্বপক্ষে মত দিয়াছেন। ইংলণ্ডে স্ত্রীপরিচ্ছদ সংস্কারের জন্য Rational Dress Society নামক একটি সভা হইয়াছে। এই সভার কোন একটি সভ্য দ্বারা ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে ২৯ মে তারিখের Pall Mall Budget নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে এবিষয়ে একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে স্ত্রীজাতির Duel Skirt (দ্বিপদী পোষাক) র পক্ষে নানা প্রকার যুক্তি দেখান হইয়াছে। ইহা মানুষের দুর্ব্বলতা হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে ইহা বড়ই সত্য যে, সে আপনাকে সুন্দর করিতে চায়, নিজের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে চায়। যতদিন পর্য্যন্ত যৌননির্ব্বাচন প্রণালীর মহা নিয়ম প্রকৃতির অন্তর্গত থাকিবে, তত দিন এ স্পৃহাও বলবতী থাকিবে। বৈরাগ্য যুক্ত ব্যক্তি ইহার নিন্দাবাদ করিতে পারেন, ইহাতে তিনি মানবের মৌলিক পাপের চিহ্ন দেখিতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃতি প্রকৃতিই থাকিবে এবং সৃষ্টি বিনাশ হইতে না বসিলে এ স্পৃহারও লোপ হইবে না। এ স্পৃহার উচ্ছেদ সাধন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা, তবে ইহাকে নিয়মিত করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। এ স্পৃহা কার্য্য-কালে একটি নিয়মানুগত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইংলণ্ডের পরিচ্ছদ সংস্কারক সভার সম্পাদক লিখিতেছেন,—In proof of the truth of the theory that undue hiding of one part of the body leads to undue exposure and morbid desire for the display of the other, let it be remembered that when tied back skirts were in fashion, which allowed the outline of the lower limbs to be seen, waists were permitted to grow perceptibly larger, and low-necked dresses went very much out of fashion. (And any one may be convinced of the truth of this statement by referring to the pictures in Punch of that time). But now that inflated and crinoleted skirts have come in again, waist pinching has once more become the fashion, and with it exposed neck, shoulders and arms. When men took to wearing a long petticoaty style of coat it was whispered that some of them took to wearing stays also. The Highlander who attired himself in a short petticoat called a kilt also compensates himself by showing a bare leg." আমাদের দেশের রমণীরা যে নিতান্ত পাতলা কাপড়ের পক্ষপাতী, তাহাতেও ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে।

যেমন অত্যন্ত কসিয়া কাপড় পরিলে শরীরাভ্যন্তরস্থিত যন্ত্রাদির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। তেমনই কোমর হইতে বেশী ভারি কাপড় পরিলে ও বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। Rational Dress Society যে পরিচ্ছদ উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাতে সে অভাব দূরীভূত হইয়াছে। এবিষয়েও উক্ত

সভার সম্পাদক লিখিতেছেন, "We maintain that we have devised a dress by which no internal organ can be injured, no muscle cramped, no movement of the body impeded, and to which the wearer may add as much grace and beauty as her own taste may dictate."

আমরা এস্থলে এই সভার অনুমোদিত পরিচ্ছদের একটি চিত্র সংযোজিত করিয়া দিলাম।

আমাদের দেশে রমণীদের পক্ষে পা জামা পরা সম্পূর্ণ নূতন নহে। পা জামা পরিলে যে রমণীদের সৌন্দর্য্য হ্রাস হইবে, ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত মত। পশ্চিমের উচ্চ বংশীয়া মুসলমান রমণীরাও পাজামা পরিয়া থাকেন এবং সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে মুসলমান জাতি কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন, ইহা বলিতে অধিক সাহসিকতার প্রয়োজন হয় না। পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের নানা স্থানে রমণীরা সচরাচর পা জামাই পরিয়া থাকেন এবং তাহাতে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য হ্রাস হয় না।

পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য, এক প্রকার শেষ হইল। ইহার জন্য যে আমাদিগকে অনেক বিদ্রূপের পাত্র হইতে হইবে, তাহাও জানি। তবে ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, মানুষের আরাম ও সুবিধা লক্ষ্য করিয়া, পরিচ্ছদের উপযোগিতা সম্বন্ধে যাহা আমাদের নিকট যুক্তিযুক্ত বোধ হইল, তাহাই বলিলাম। যাঁহারা যুক্তি মার্গানুসরণ করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিবেন, তাহারা সম্মানার্হ প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁহাদের যুক্তির যথোচিত উত্তর দানে চেষ্টা করিব, না হয় আপনাদের ত্রুটী হইলে তাহা সংশোধন করিব। আমাদের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত হইলেও যে এখনই সকল রমণী শাড়ী ছাড়িয়া পাজামা পরিবেন, এরূপ আশা আমরা করি না। আমরা সকলেই অভ্যাসের দাস। যাহা কিছু যুক্তিসঙ্গত, তাহাই যে আমরা সর্ব্বদা করিতে পারি, তাহা নহে। কিন্তু কি ভাল, কি মন্দ জানা আবশ্যক, বিচার করা আবশ্যক; এবং যাহা আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি, তাহা ক্রমে ক্রমে আমাদের সংস্কারের সহিত মিলিয়া যাইবে, এরূপ আশা করাও অন্যায় নহে। কোন নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে অগ্রে মন প্রস্তুত করা আবশ্যক, মন প্রস্তুত হইলে কার্য্যে পরিণত করা সহজ হইবে। সেই আশায়েই আমরা এবিষয়ের প্রস্তাবনা করিলাম।

শ্রীসীতানাথ নন্দী।

নীতি কথা।

মনুষ্য জীবনের কার্য্য সকল চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। প্রথম নিজ-সম্বন্ধীয়, দ্বিতীয় পারিবারিক, তৃতীয় সামাজিক, চতুর্থ আধ্যাত্মিক।

কি রকম করিয়া উঠিতে, বসিতে, চলিতে ফিরিতে, খাইতে, শুইতে, লইতে ও দিতে হয়, ইহা নিজ-সম্বন্ধীয় কার্য্য; ইহা না শিখিলে মানুষ মানুষ বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না। তুমি যদি আত্ম কর্ত্তব্য সকল সুচারুরূপে না শিক্ষা কর, সংসারে পদে পদে তোমাকে অপদস্থ হইতে হইবে, তাহাতে কেহ তোমার সহায়তা করিতে পারিবে না। তুমি যদি কাহাকেও অসম্মান সূচক কথা বলিয়া ব্যথিত কর, তাহার ফল-ভোগ তোমার নিজেরই করিতে হইবে; পৃথিবী শুদ্ধ লোকে যুঠিয়াও ক্রুদ্ধকে সে রাগ পাত্রান্তরিত করিতে অনুরোধ করিলে সে সম্মত হইবে না। তুমি যদি কাহারও দ্রব্য অবৈধরূপে গ্রহণ কর, তুমিই নিজে তাহার জন্য দায়ী হইবে। তোমারই তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, দ্রব্যাধিকারী অন্যের নিকট সে দ্রব্যের প্রতিদান চাহিবে না। তুমি যদি প্রাতরুত্থায়ী না হও, তোমার দিন প্রাতরুত্থায়ীর দিন অপেক্ষা অবশ্যই হ্রস্ব হইবে; তুমি অতি-নিদ্রী হও, তোমার কার্য্য করিবার সময় সংক্ষিপ্ত হইবে। তুমি অব্যয়ী বা অপব্যয়ী হও, তজ্জন্য তোমাকেই কষ্ট পাইতে বা অনুতপ্ত হইতে হইবে।

পারিবারিক কর্ত্তব্য শিক্ষা কখনও সাম্য-নীতি বোধ ব্যতিরেকে হইতে পারে না। সাম্যনীতির মানে ইহা নহে যে, এক পরিবার ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির শুক্ল বা গৌরবর্ণ হইতে হইবে কিম্বা ক্ষুদ্র বা দীর্ঘকায় হইতে হইবে। যে বিষয় তোমার ইচ্ছার অপেক্ষা করে নাই, তাহার অসাম্য ধর্ত্তবের মধ্যে নহে। সাম্যনীতির মানে ইহাও নহে যে, সকলকে ঠিক তুল্য গৃহে বাস করিতে হইবে, তুল্য পাত্রে আহার করিতে হইবে বা তুল্য রকমের কাপড় পরিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, এক পরিবারের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুসারে পরিশ্রম করিবে ও সকলেই শ্রমফল কৃত কর্ম্মের পরিমাণানুসারে নহে, আপনাপন আবশ্যকের পরিমাণানুসারে ভোগ করিবে। নারী নারীর কার্য্য করিবে, পুরুষ পুরুষের কার্য্য করিবে; যদি কেহ তোমার পরিচর্য্যা করে, তুমিও তাহার পরিচর্য্যা করিবে, সে ভক্তিভাবে করিয়া থাকিলে, তুমি স্নেহের ভাবে করিতে বাধ্য। যদি কোন ভাই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কোন ভাই কেরাণী হয়, কার্য্যস্থলে তাহাদিগের ব্যবসায় গত পরিচ্ছেদাদি পৃথক রকমের হইবে, কিন্তু যখন তাহারা এক পরিবার ভুক্ত ভাই ভাই, তখন কোন পার্থক্য থাকিবে না।

কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় পরি-বর্ত্তের যে তরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছে, তাহাতে প্রায়ই দেখা যায়, এক পরিবারভুক্ত ব্যক্তিরা সাম্যনীতি মানিয়া চলিতে পারেন না, এজন্য আমি বিবেচনা করি যে, কোনও দুই জন উপার্জ্জনক্ষম বিবাহিত পুরুষদিগের একান্ন; ভুক্ত থাকা উচিত নহে। সদ্ভাবে পৃথক হইয়া সদ্ব্যবহার দ্বারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে সমাজের যথেষ্ট

উন্নতি হইতে পারে। হিংসাবৃত্তির পশুভাব আমরা বহুকাল ধরিয়া প্রাণপণে চালাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু তাহাতে কেবল আত্মহানি ভিন্ন কখনও কোন শুভ ফল পাই নাই; এজন্য আমি বলি, এক্ষণ উহাতে ইতি দেওয়া যাউক, আইস আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুগের আবির্ভাব করি; ইহা করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে আপনা হইতেই সহানুভূতির কাল আসিয়া পড়িবে। আপনারা ইহাতে সম্মত হইবেন কি?

সম্প্রতি একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে যে, স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হইয়া পুরুষের ন্যায় উপার্জ্জনক্ষম হইবে না কেন? আমি জানি, এ বিষয়ের আপত্তি করিতে হইলে গালি খাইতে হইবে, কিন্তু তথাপি এ মতের পক্ষপাতী হইতে পারিতেছি না, কারণ প্রাচীন কাল হইতে একটা কার্য্য-বিভাগ চলিয়া আসিয়াছে, তাহাতে নারীরা অন্তঃপুরে অধিষ্টাত্রী দেবতা হইয়া সাংসারিক আভ্যন্তরীণ বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিবার অধিকারিনী; পুরুষেরা বহিস্থ সমস্ত কার্য্য সম্পাদনের অধিকারী। নারীদিগকে সুশিক্ষা দেওয়া উচিত, কারণ সুশিক্ষা ব্যতিরেকে মানুষের পশুত্ব দূর হয় না, বিশেষতঃ সুশিক্ষিত পুরুষের ঔরসে অশিক্ষিত নারীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান অংশত মূর্খতা ধাতুদ্বারা গঠিত বলিয়া তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্ব হইতে পারে না; আরও বিস্তার করিয়া বলি, শিক্ষিত পুরুষের অরা ১০০ ও তদীয় স্ত্রীর শিক্ষার অরা ০ শূন্য হইলে তাহাদিগের সন্তানের অরা উভয়ের সমষ্টির অর্দ্ধাংশ $\frac{১০০+০}{২}=৫০$ হইতে পারে, কিন্তু পিতা মাতা উভয়ের শিক্ষার অরা ১০০একশত পরিমাণ হইলে, সন্তানও ১০০ অরা বিশিষ্ট হইবে।

কিন্তু শিক্ষা দেওয়া বিধেয় বলিয়া নারীদিগকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, কারণ তাহাদিগের প্রকৃতি স্বভাবতঃ কোমল। স্বাতন্ত্র্য দিলে রাক্ষসদিগের মধ্যে তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। আরও দেখা যাইতেছে, তাহাদিগের গর্ভ, প্রসবাদি কতকগুলি কঠোর প্রাকৃতিক বাধ্যতা আছে, তাহাতে সময় সময় তাহাদিগের শ্রম-যোগ্যতা থাকে না। প্রচলিত শ্রমবিভাগের নীতিটা ভঙ্গ করিলে সংসার গঠন হয় না। যাহাতে কেবল উপার্জ্জন আছে, রক্ষণ নাই, সে আবার সংসার কিসের? মানব জীবনের অর্দ্ধেক সুখ সাংসারিক সুশৃঙ্খলতার উপর নির্ভর করে; যে মনুষ্যের উত্তম সংসার নাই, সে সন্ন্যাসী। বুনা, বাগ্দী, সাঁওতাল ও অন্যান্য যে সকল জাতিরা স্ত্রীদিগকে আংশিক বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অপবিত্রতার পূতিগন্ধ সর্ব্বদাই প্রতীয়মান হয় এবং তাহাদিগের সন্তান গুলিও দুর্ব্বল, কাপুরুষ ও পশু সদৃশ। পাশ্চাত্যেরা নারীদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেন নাই, যে একটু দিয়াছেন, তাহাতেই এই ফল দাঁড়াইয়াছে যে, শ্বেত পুরুষেরা এক্ষণ অনেকেই বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক। এ অনিচ্ছা কখনই তাহাদিগের জিতেন্দ্রিয়তা হইতে নিস্থত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-ঔদাস্যও কখনও ইহার কারণ নহে, তাহা বিশেষরূপে জানিয়াছি; কেবল নারীদিগের স্বেচ্ছাচারিতাই এ অনিচ্ছার উৎপাদক। সুবা খাইতে না ধরিয়াই খাল কাটিয়া লোনা জল আনিয়াছ, আবার সার-শূন্য স্বাধীনতা দিয়া যদি নারী প্রকৃতির দেবোপম সৌন্দর্য্য টুকু বিনষ্ট কর; স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিবে।

এ দেশের মধ্যবর্ত্তীদিগের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে স্ত্রীনীতির কোন ব্যতিক্রম করিলে এই শ্রেণীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহার কারণ এই যে, মধ্যবর্ত্তীর এক্ষণ সংসার আছে, কেবল নারীদিগের গুণে। অক্ষম অলস পুরুষ ঘরের চালের খড় যোগাইয়া উঠিতে পারেন নাই। বৃষ্টি পড়িয়া মেজে ডোয়া গলিয়া যায়, প্রত্যেক প্রত্যূষে গৃহ-দেবী লেপিয়া তাহার সৌন্দর্য্য রক্ষা করেন, যে দর্শক চালের দিকে চাহিয়া পুরুষটিকে অবজ্ঞা করে, সেই আবার মেজে ডোয়ার দিকে তাকাইযা পত্নীকে সম্মান না করিয়া পারে না, সুতরাং ইহাতে বাড়ীটের একটু সম্মান রক্ষা হয়, এবং আগন্তুকের বসিবার অশ্রদ্ধা থাকে না।

প্রভুরা ধোপার পয়সা দিয়া কাপড় কাচাইতে পারেন না, অথচ ময়লা কাপড় পরিয়া প্রকাশ্য স্থানে যাইতে যথেষ্ট লজ্জা বোধ করেন, এরূপ স্থলে গৃহ লক্ষ্মীরা ক্ষারের দ্বারা কাপড় কাচিয়া স্বামীর সম্মান রক্ষা করেন। রিপু করিবার জন্য দরজীর পয়সা না জুটিলেও স্বামীরা নারীদিগের সাহায্য লন; ঘরের আরশুলা, মাকড়সাও নারীদিগের মারিতে হয়, পুরুষগণ তাহাতেও অশক্ত।

আবার দেখুন, অলস অপদার্থ হইলে কত দোষ ঘটে, তাহার অবধি নাই। পুরুষেরা ভাল খাবার কিছু (ভাল মাচ, তরকারী, দুদ, ঘি) আনিতে পারেন না, অথচ মন্দ খাইতেও চাহেন না; নারীরা ইহাতেও বিরক্ত না হইয়া নিজহাতে বন হইতে শাক সবজী তুলিয়া তাহার ভাজা চড়চড়ী, টক করিয়া পরিতোষ পূর্ব্বক কেবল পতিদেবতাকে নহে, অতিথিকে পর্য্যাপ্ত ভোজন করান।

সামাজিক ব্যবস্থার গুণে, নারীরা এই সকল অসাধারণ গুণের অধিকারিনী হইয়াছেন; স্বাধীনতা পাইলে তাঁহারা অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, একথা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু সে-সকল জ্ঞান সুক্ষদৃষ্টিতে ততটা সুখজনক হইবে না, আর সংসার নামে যে একটা সুখের বস্তু পূর্ব্বে উজ্জলভাবে ছিল, বর্ব্বর পুরুষদিগের দোষে নষ্ট হইয়াও নারীদিগের গুণে এক্ষণও যাহার ভগ্নাবশেষ আছে, তাহা একবারে লোপ পাইবে, তখন কাঁদিয়াও পাপের স্রোত ফেরান যাইবে না।

যদি রমণীরা মনে করেন, আমি স্বজাতির (পুরুষদিগের) সুখের পক্ষপাতী হইয়া নারীদিগের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহা হইলে আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে, কারণ আমার ইহা অটল বিশ্বাস যে, সংসারটা স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই এজমালী সম্পত্তি, একজন ভিতরে ও একজন বাহিরের ভার না লইলে কদাচ সংসার হইতে পারে না। যদি আমার স্বদেশীদিগের উদ্ভট বুদ্ধিতে এ সংসার ধ্বংস হইয়া যায়, অসুখী কেবল পুরুষেরা হইবে না, নারীরাও হইবেন, এই জন্য আমি ব্যগ্র হইয়াছি।

যে সকল উন্নতমনা পুরুষেরা স্বাধীনতা দিয়া নারীদিগের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা যে, দেশের কি প্রকারের হিতৈষী, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যে নারীর গৃহ-পারিপাট্যে সুখে কাল কাটাইতেছ, যে নারীর স্বহস্ত-রচিত কাথায় শুইয়া মানুষ হইয়াছ, যে নারীর পাক খাইয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছ, তাহাদিগকে আজ মানুষের হাটে বেচিবার চেষ্টা কেন? যদি মনুষ্যত্ব থাকে, পরিশ্রমী হইতে চেষ্টা কর; যাহাতে

ঘরে জল না পড়ে, ছেড়া কাপড় না পরিতে হয়, নারীর সংগৃহীত শাক খাইয়া না জীবন ধারণ করিতে হয়, তাহার চেষ্টা দেখ। তুমি অক্ষম দরিদ্র বলিয়া তোমার স্ত্রীর মনে যে দুঃখ, তাহা জ্বলন্ত দীপ শিখার ন্যায় তাহার কোমল হৃদয়ে অহর্নিশি জ্বলিতেছে, ভূয়া স্বাধীনতার একটা দিল্লীর লাড্ডু দিলে সে দুঃখ কদাচ অপনীত হইবে না। যদি পুরুষত্ব পদবীর উপযুক্ত হইতে চাও, শ্রমশীল হইয়া নারীর মনোদুঃখের নিরাকরণ কর। ঘরের ভিতরে এরূপ বিস্তর কাজ আছে, যাহার সুচালন ও সুপর্য্যবেক্ষণের দ্বারা নারীরা সমাজে পূজনীয় হইতে পারেন।

যে সকল দুঃখের কথা বলিলাম, ইহা মধ্যবর্ত্তী সাধারণের অবস্থা, যদি সংস্কারক মহোদয়গণ এরূপ অক্ষম দরিদ্র না হন, তাহা হইলে শতকরা হিসাবে তাহারা নগণ্য হইলেও, তাঁহাদিগের নিকটে আমি এই নিবেদন করিতে পারি যে, সমাজ-সংস্কারটা একটা ব্যাঙ্গাচি খেলা নহে; যদি শ্রীমতীদিগের প্রতি তাহাদিগের বিশেষ অনুকম্পা হইয়া থাকে, সুশিক্ষা দিউন; সুশিক্ষা সমাপ্ত হইলে সুন্দররূপে সংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা দিউন। আমাদের সামাজিক আচার ব্যবহারগুলি এরূপ বাতুল বুদ্ধি প্রসূত নহে যে, ইহার যে কোনটী ভাঙ্গিলেই অমনি খরতর বেগে মঙ্গলের স্রোত প্রবাহিত হইবে। আমি বলি, সর্ব্বাগ্রে নিজেরা ভাল হও, তারপর সমাজে হাত দিও। সংস্কার করিতে হইলে প্রথমে লঘু বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, মানুষের সামাজিক কর্ত্তব্য শিক্ষার প্রয়োজন। আত্মকার্য্য শিক্ষার বেলা মানুষকে কতকটা আত্মম্ভরী হইতে হয়, সাংসারিকতায় তাহার অনেকাংশ বিসর্জ্জন দেওয়া আবশ্যক, কিন্তু সামাজিকতা শিক্ষার সময় আত্মকে একেবারে বলিদান দিতে হয়। পরিবারিক সাম্যনীতি অপেক্ষা সামাজিক সাম্যনীতিটা অত্যন্ত উচ্চ ক্ষেত্রের উপর সংস্থাপিত। যে সেই লোকোত্তর সাম্যের উজ্জ্বল ভাব পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে ক্ষুৎ পিপাসাদি সামান্য দৈহিক অভাব সকলের বশবর্ত্তী, থাকিলেও জনসমূহের নিকট দেবতার ন্যায় পূজ্য হইতে সমর্থ। যদি কেহ সম্পূর্ণ অস্মোৎসর্গে না হইয়া কিয়ৎ পরিমাণে হইয়া থাকে, সে সেই পরিমাণে পূজা পাইবার অধিকারী।

মিল প্রভৃতি বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমাজ তত্ত্ববিৎদিগের বিবেচনায় ব্যক্তিগত বিষয়ের সহিত সামাজিক বিষয়ের সহিত সংঘর্ষটা একবারে পরিত্যাগ করা উচিত। তাঁহারা বলেন, ব্যক্তিগত বিষয়গুলি পরিমাণে বিপুল ও প্রকৃতিতে জটিল, কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে তাহার ইষ্টানিষ্টকারিতা সামান্য, সুতরাং এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইলে সমাজের অমূল্য পরিদর্শন শক্তির একটা প্রধান অংশ এই বিষয়ই গ্রাস করিয়া ফেলিবে; কিন্তু যদি ঐ বিষয়গুলিকে ব্যক্তিগত, অতএব স্বল্প হিতাহিত মূলীভূত বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে সমাজের জাতীয় বিষয় চিন্তার যথেষ্ট সময় মিলে এবং ব্যক্তিরাও ক্রমে ক্রমে দোষের দূষ্যতা পরিগ্রহ করিয়া সংশোধিত হইতে পারে।

ভাব, একজন হিন্দু পলাণ্ডু ব্যবহার করেন; পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মতে ইহাতে হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ করা উচিত নহে, কারণ ইহা ভোক্তার ব্যক্তিগত বিষয়। যদি সমাজ ইহাকে ধরেন, অনেক চক্ষু লজ্জায়

বিসর্জ্জন দিয়া একটী লোককে শত্রু করিতে হইবে, অবশেষে হয়ত বিষয়টি প্রমাণ হইবে না; কিম্বা যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে সেই লোকটীকে শাস্তি দিতে পার, কিন্তু তাহাকে সমাজের একটা প্রতিশ্রুত বৈরি না করিয়াও পারিবে না এবং দোষ গোপনে চলিবে ভিন্ন তাহাকে একেবারে দোষ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না; কাজেকাজেই এবিষয়ের হস্তক্ষেপে সমাজের শাসন শক্তির অপচয় হয় মাত্র। আবার পক্ষান্তরে ভাব, এক ব্যক্তি একখানা জাল খত প্রস্তুত করিল, ইহা কখনই ব্যক্তিগত দোষ নহে, সামাজিক দোষ, কারণ ইহাতে কার্য্যকারক ব্যক্তি একাকী সংস্পৃষ্ট নহে, অন্য ব্যক্তির ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং ইহাতে সমাজের বিপক্ষ হওয়া আবশ্যক।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ বলেন যে, এই উদারনীতির অনুসরণ ব্যতিরেকে কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না, আমিও এই নীতিটা অত্যন্ত সত্য ও সঙ্গত বিবেচনা করি, এজন্য আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমার স্বদেশীয়গণ ক্রমে ক্রমে এই নীতিটা সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেন। এই নীতিটাকে কার্য্যতঃ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত স্বেচ্ছাচারিতার যে স্বর্গ মর্ত্ত্য পার্থক্য, তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। স্বেচ্ছাচারিতা হইতে স্বাধীনতাকে চিনিয়া লইবার এই এক উপায় আছে যে, স্বাধীনতা সর্ব্বদাই সমাজের পরিণাম শুভকর, এবং স্বেচ্ছাচারিতা অনিষ্টের উৎপাদক। যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সৃষ্টি সাধন করিতে যাইয়া আমরা স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দিয়া বসি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমরা অধঃপাতে যাইব। মানুষের ৩ প্রকারের উন্নতির আবশ্যক আছে, যথা—দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক; যে ব্যবহার এই তিনের একতমেরও পরিপোষক; আমরা নির্ভয়ে তাহার সমর্থন করিতে পারি।

রাজনীতি শিক্ষা, সমাজনীতি শিক্ষার অন্তর্গত! যে জনসমাজের সুখ-শান্তির বিষয় পরিগ্রহে পটু, সে নিশ্চয়ই রাজনীতিজ্ঞ। প্রত্যেক দেশের ও প্রত্যেক জাতির রাজনৈতিক অবস্থা তত্তৎ দেশ বা জাতির সামাজিক অবস্থার অদ্বিতীয় ফলস্বরূপ। তোমার সমাজ যদি নিমগাছ হয়, তাহাতে নিম ফল অবশ্যই ধরিবে, যদি অম্রগাছ হয়, তাহাতে অম্রফল ধরা কেহ রোধ করিতে পারিবে না। পরিশ্রমিতা, সত্যবাদিতা ও সচ্চরিত্রতাই স্বাধীনতার জীবাণু। যে জাতির ব্যক্তি বিশেষের চরিত্রে স্বাধীনতার জীবাণু সকল না লক্ষিত হয়, সে জাতি কখনও স্বাধীন হইতে পারিবে না। যে জাতির অনুপূরক ব্যক্তিরা শ্রমশীল হইতে পারিয়াছে, সত্যবাদী হইতে তাহাদিগের কষ্টবোধ হইবে না; এবং সত্যবাদী হইলে পর, সচ্চরিত্র হইতে আর কোন বাধা থাকিবে না। পরিশ্রমের এরূপ জাজ্বল্যমান মহিমা আছে যে, তাহার ফল তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; মানুষের যেরূপ ফল-লিপ্সা আছে, সেইরূপ শ্রম লিপ্সা থাকিলে এ জগতে কেহই হাহাকার করিত না। যে মিতাচারী নহে, অর্থাৎ পরিমিত আহার নিদ্রাদিযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় নহে, সে অবিলম্বে রুগ্ন, শীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে; সুতরাং পরিশ্রমের প্রয়োজনবত্তা অবধারণ হইবামাত্র মানুষ পরিমিত হইতে বাধ্য হইয়া থাকে। ক্ষুধা পরিশ্র-

মীর কুটীরে উঁকি দেয়, কিন্তু প্রবেশ করিতে সাহস করে না, কারণ প্রচুরতা সর্ব্বদাই পরিশ্রমের অনুগামী। প্রচুরতা থাকিলে মিথ্যা বলিবার আবশ্যকতা থাকে না, সুতরাং পরিশ্রমী হইতে পারিলে সত্যবাদী হওয়াটা অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়ে, আবার সত্যবাদী হইতে পারিলে লোককে বাধ্য হইয়া সচ্চরিত্র হইতে হয়।

একবার উচ্চজাতি ও শ্রমজীবিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, লম্বোদর উপবেশন-বিশারদ ধনীদিগের অপেক্ষা শ্রমজীবী সমাজে সত্য অধিক পরিমাণে বিরাজিত। অলস ধনীর জীবনের অধিকাংশ সময় এরূপ জঘন্য চিন্তায় অতিবাহিত হয় যে, তাহা কোন প্রকারে যদি ব্যক্ত হইত, তাহা হইলে লোকে তাহাদিগের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিত। অলস ব্যক্তিরা পরিশ্রমীদিগের ভার্য্যাস্থানীয়; যেমন উপবৃক্ষ সকল মূলবৃক্ষদিগের স্কন্ধে উপবেশন করিয়া তদীয় রসে আত্ম-পোষণ করে, অসল ব্যক্তিরাও সেইরূপ পরিশ্রমী-দিগের মস্তকে বসিয়া শ্রমফলভোগ করে, কিন্তু বিনিময়ে কিছুই দেয় না। এজন্য অলস লোক সকল পরিশ্রমীদিগের গলগ্রহ। তাহারা অনর্থক বাঁচিয়া থাকিয়া কেবল পৃথিবীর ভার বাড়াইতেছে, তাহারা মরিলে ভার পাতলা হইয়া যেমন বসুমতী ত্রাণ পাইত, তেমনি কতকগুলি অন্নস্তূপ বাঁচিয়া যাওয়াতে, পরিশ্রমীরা পূর্ণ আহার পাইতে পারিত। যে জাতির মধ্যে পরিশ্রমী লোক অল্প, কিন্তু অলস ভোগদক্ষ লোক অধিক, সে জাতির পতন অনিবার্য্য; সুতরাং যে জাতির উন্নতি করিবার ইচ্ছা হয়, তাহাব ব্যক্তিদিগের সর্ব্বাগ্রে আলস্য পরিত্যাগ করিয়া ঘোর পরিশ্রমী হওয়া আবশ্যক। যদি তুমি আমাকে বল, অমুক জাতি অপেক্ষা অমুক জাতি উন্নত, তাহা হইলে আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিব যে, প্রথম অপেক্ষা দ্বিতীয় জাতি অধিক পরিশ্রমশীল।

আমরা পরাধীন হইয়াছি আমাদিগের জাতি সাধারণের দুরাচারের দোষে, কিন্তু শ্রেণী বিশেষের দোষের অংশ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহা শ্রমজীবিদিগের দোষে ঘটে নাই, মধ্যবর্ত্তীদিগের দোষে ঘটিয়াছে। এদেশের শ্রমফলের লোভে ইংরেজ, ফরাসী উভয়েই আমাদিগের উপকূলে ঘুরিতেছিল, এমত সময়ে এদেশের দ্বারপাল মধ্যবর্ত্তীগণ ধনজনের দ্বারা সাহায্য করিয়া ইংরাজদিগকে প্রবেশ করাইয়াছেন। সেই কলঙ্কী মধ্যবর্ত্তীগণ এক্ষণও আলস্যের সাগরে নিমগ্ন। সাঁই সাঁই করিয়া তাস খেলিতেছেন, শ্রম করিবার আবশ্যকতা বোধও নাই, ক্ষেত্রও খুঁজিয়া পান না। আজ কাল শুনিতেছি, কেহ কেহ গভর্ণমেণ্টের নিকট "আমাদিগকে ব্যবহারিক শিল্প শিখাও, আমাদিগকে ব্যবহার শিল্প শিখাও" বলিয়া এক একবার বিকট চীৎকার করিতেছিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সে চীৎকার অনন্ত আকাশে মিশিয়া যাইতেছে। কতদিনে এ পোড়া হাড়ে আত্মগ্লানি জাগিয়া উঠিবে, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

তুমি পরিশ্রমের ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাও না! ঘরের চালে এক লক্ষ মাকড়সার বাসা, থুপথাপ করিয়া গুঁড়া পড়িতেছে, আরসুলায় (তৈলপায়ী) বাক্স, পেটরা বোঝাই, সমস্ত জিনিস নষ্ট করিতেছে; বাড়ীর উঠান, চতুঃপার্শ্ব ঘাসে জঙ্গলে আকীর্ণ, জোঁক সকল পিল পিল করিয়া বেড়াইতেছে;

ঘরে বেড়ায়. উই ধরিয়াছে, দিবানিশি মচ মচ করিয়া খাইতেছে; ইহাতে তোমার ভ্রূক্ষেপ নাই! শ্রমশীলতা স্বতঃই কাহারও ঘাড়ে চড়িয়া বসে না, উহা অতি কঠোর অভ্যাসের ফল। শরীরকে দৃঢ় ও শ্রম-সহিষ্ণু করিয়া প্রস্তুত করা, জীবনের পক্ষে অত্যন্ত উপকারজনক। একজন পাশ্চাত্য ধর্ম্ম-যাজক বলিয়াছেন "কেবল ভারতবাসীই জগতের একমাত্র জাতি, যে ভ্রমণ অপেক্ষা দণ্ডায়মান থাকা, দণ্ডায়মান থাকা অপেক্ষা উপবেশন করা এবং উপবেশন করা অপেক্ষা শয়ন করা প্রিয়তর মনে করে"। এ অপ-বাদের কি' কখনও ক্ষালন হইবে না? আমরা কি ক্রীড়া কৌতুক করিয়া যাত্রার দলের সং সাজিয়া জীবন অতিবাহিত করি-বার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছি? শয়নাশন ও সন্তানোৎপাদন কখনই মনুষ্যের প্রধান কর্ম্ম নহে, ইহার দ্বারা কখনও কোন মনুষ্য গৌরবান্বিত হইতে পারে নাই। কে কত বৎসর বাঁচিয়া থাকে, তাই ধরিয়া জীবনের গুরুত্ব পরিমিত হয় না; কে কতগুলি কার্য্য করিয়াছে, তাহার দ্বারা জীবনের মূল্য অব-ধারিত হয়।

যদি তোমরা এই বিষ্ঠার কীটত্বেই তৃপ্ত, তবে আমার কিছুই বক্তব্য নাই, আর যদি মানুষ হইবার অভিপ্রায় থাকে, তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার আছে। পরদিনের কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি পূর্ব্বদিনে শয়নকালে তালিকা দ্বারা স্থির কর; নিদ্রা হইতে প্রত্যুষে উঠিয়া একটী যন্ত্রের ন্যায় একে একে সেই কর্ম্মগুলি সম্পন্ন কর; হাসিয়া খেলিয়া গল্প করিয়া দিন কাটাইও না। স্থিরীকৃত কার্য্য সমাধা করিতে যে বিশুদ্ধ ক্ষুধা উপস্থিত হইবে, তাহাতে আহারে উত্তম রুচি অনুভব করিবে, ভুক্ত বস্তু সুচারু রূপে পরিপাক হইবে এবং রাত্রিকালে নিদ্রায় অসাধারণ তৃপ্তি পাইবে। ইহাতে মনের প্রফুল্লতা, স্বাস্থ্য ও উন্নতি ক্রমে ক্রমে আপনা হইতে হস্তগত হইবে। কার্য্যের তালিকাটা খুব সতর্কতার সহিত প্রস্তুত করিবে, যেন তাহার মধ্যে কোন অনুপযুক্ত বিষয় না প্রবেশ করে।

যে সকল উন্নতিশীল লোকের জ্যোতিতে দশ দিক্ আলোকিত হয়, তাঁহারা সকলেই প্রাতরুত্থায়ী, অক্লান্ত কর্ম্মচারী ও মিতব্যয়ী। ভারতবর্ষে যে অধ্যবসায়ী লোক জন্মে না, একথা মিথ্যা, তবে প্রভেদ এই যে, ইংলণ্ডের অধ্যবসায়ী লোক উপযুক্ত জনসাধারণের শতকরা ৯৯ জন, আর এ দেশের শতকরা ৫ জন। জীবিকার সুলভতাবশতঃ ভারত-বাসী এত উপবেশন-লিপ্সু হইয়াছিল; উপবেশনের দ্বারা যাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত, জনসাধরণেও তাহাকে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী বলিয়া মান্য করিত, কিন্তু এক্ষণ সে জীবিকার সুলভতা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে; তথাপি আমা-দিগের বীরেরা আত্মচিন্তা পরিত্যাগ করিতেছেন না। সাধারণেও অলস অক্ষম-দিগকে উপেক্ষা করিতে শিখে নাই, কিন্তু প্রথম ফল এই দেখা যাইতেছে যে, মধ্যবর্ত্তীদিগের গৃহ দিন দিন শ্রীভ্রষ্ট হই-তেছে; ন্যূনাহারে শরীর বলহীন ও তেজো-হীন ও শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও দাসত্ব এই চারি প্রকারে প্রশস্ত জীবিকা লাভ হইতে পারে। স্কন্ধে হল লইয়া কৃষিকার্য্য করিতে মধ্য-বর্ত্তীকে বলি না; কিন্তু নারিকেল, সুপারি ও আম, কাঁঠালের বাগিচা করিতে যে

কৃষিকার্য্যের আবশ্যক, তাহা তাঁহাদিগের অস্বীকার করাটা কি সঙ্গত?

মধ্যবর্ত্তীদিগের শিল্প-স্কুলে প্রবেশ করা আবশ্যক, কারণ দেখা গিয়াছে, মধ্যবর্ত্তী যে কার্য্যে না প্রবেশ করে, তাহার উন্নতি রুদ্ধ হইয়া থাকে। পাল ও পটুয়াগণ মান্ধাতার আমল হইতে পট চিত্র করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু পরিশেষে মধ্যবর্ত্তীগণ আর্টস্কুলে প্রবেশ করিয়া চিত্র-বিদ্যাকে না সংস্কৃত করিলে অদ্যাপি পাল পটুয়ারা সেই শিরাপেশীশূন্য দেবচক্ষু বিশিষ্ট মূর্ত্তি আঁকিতে থাকিত। এজন্য বলি, যদি আমাদিগের কুম্ভকার, কর্ম্মকার ও সূত্রধর প্রভৃতির কার্য্যের সংস্কার করিতে হয়, তবে সে মধ্যবর্ত্তীর দ্বারা ভিন্ন হইবে না। ভাল করিয়া ছুরি, কাঁচি, আলপিন, স্ক্রু গড়িতে গড়িতে ছাতা ও কল কারখানার কার্য্যে পটুতা জন্মিবে। ভারতবর্ষে গত বৎসর পর্য্যন্ত ৯৭টা তুলার কল ও এতদ্ভিন্ন আরও ৩৬টা পাটের কল, ১০টা কাগজের কল ও অন্যান্য কল হইয়াছে; যদি শিল্পশিক্ষায় মধ্যবর্ত্তী প্রবেশ করে, তাহারা এই সকল কলের অনেক কার্য্য করিতে পারিবে এবং ক্রমে ক্রমে কলের প্রস্তুত-কর্ত্তা হইয়া উঠিবে।

বাণিজ্য মধ্যবর্ত্তীদিগের অতি প্রধান অবলম্বন। শ্রমজীবীকে মূলধন দাদন করা, তাহার নিকট হইতে শ্রমজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া সময়ানুসারে ভোগীদিগের নিকট পৌঁছিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত বাণিজ্য ব্যাপারের অন্তঃর্গত কার্য্য, কিন্তু মধ্যবর্ত্তীদিগের উদাসীনতা ও মূর্খতা প্রযুক্ত এ বিষয়ে এক্ষণ অন্য লোক প্রবেশ করিয়াছে। কত যে শ্রমজীবী ও বিদেশী এক্ষণ ব্যবসায়ী হইয়াছে, তাহার অবধি নাই, মধ্যবর্ত্তীর তাহাতে তাপ উত্তাপ নাই, হা করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছেন। ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে যে, শ্রমজীবী কখনও মধ্যবর্ত্তী হইবে না, কিম্বা মধ্যবর্ত্তী কখনও শ্রমজীবী হইবে না; কাহারও বিরুদ্ধে কোন জীবিকার দ্বার অবরুদ্ধ হইতে পারে না। আমি এই বলিতে চাহি যে, আপনাপন শ্রেণীর আত্মত্ব রক্ষার জন্য সকলেই কঠোর চেষ্টা করুক; কেহ যেন অন্যের আলস্যের ও অমনোযোগের ফলভোগ না করিতে পারে।

যৌথ-বাণিজ্য (Joint stock company) এদেশে চলিতে পারে না কেন? বাবু আনন্দমোহন বসু তাঁহার ব্যাঙ্কিং করপোরেসনের কার্য্য ঠিক সেইরূপ উৎসাহে ধরিয়াছিলেন, যেমন কোন ইউরোপীয় ধনী ধরিয়া থাকেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার চেষ্টা ফাঁসিয়া গেল কেন? ইহার কারণ এই যে, আমরা এক্ষণও এরূপ কার্য্যের যোগ্য হইতে পারি নাই। আমি জানি, আমাদের সমাজের নৈতিক অবস্থা অতিশয় হেয়, কিন্তু তথাপি ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ পা ছাঁদিয়া, গোরু দুইবার মত করিয়া, আমাদিগের নিকট হইতে যে ভাবে ভাল কাজ আদায় করিতেছে, কাজ জানিলে আনন্দমোহন বাবুও তাহা পারিতেন। শিক্ষিত ও সদুদ্দেশ্যশীল হইলেই কার্য্যসম্পাদিকা শক্তি জন্মে না, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। আমার মতে কার্য্যজ্ঞ তস্কর অপেক্ষা কার্য্য-মূর্খ সাধু আরও ভয়ঙ্কর। কিন্তু ঐ কার্য্য কেবল আনন্দমোহন বাবুর দোষেই যায় নাই। যাহাদিগের বিবেকের মূল্য এক কড়া কড়ী নহে, এরূপ ঘড়ী, চেন, চস্‌মা-ওয়ালা, ত্যাড়াকাটা রবাহুতেরা অনুরোধ

উপরোধের নানা প্রকার কৌশলে কত ক্ষুধার্ত্ত চিহ্নিত চোরকে ঐ হতভাগা ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিল, তাহার অবধি নাই; শেষে যখন কিস্তী মাত হইল, সব বদ্‌মায়েস দাড়ী ভাসাইয়া 'ছাউথছি ববেলের তামাসা মনে' করিয়া সরিয়া পড়িল।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই ব্যাঙ্কের ধ্বংস সাধনে একদিকে ব্যক্তি বিশেষের কার্য্যানভিজ্ঞতা ও অপরদিকে আমাদিগের পাশব্ দুর্নীতি এক যোগে কার্য্য করিয়াছে। দেশের যত যৌথকার্য্য ধরাশায়ী হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকেরই কারণ এই। দেশ এমনই দুরাচারে আচ্ছন্ন হইয়াছে যে, কেহ কুকার্য্য করিতে থাকিলে অন্যে তাহা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকে। দোষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হওয়াকে যাহারা সৌজন্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাহে, তাহারা মূর্খ। যাহারা দোষের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে দোষীর কোন সাহায্যের প্রত্যাশা করে, সুতরাং তাহারা কাপুরুষ; এরূপ লোকের সংখ্যা সমাজে যত কমিবে, ততই দেশ উজ্জ্বল হইবে।

দাসত্ব মূলক জীবনটা এদেশের একান্ত অবদান বিরুদ্ধ। পিতামহেরা উহাকে ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে কুক্কর বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপবাসীরা যেরূপ শাসনপ্রণালীর অবতারণা করিয়াছেন, (আমি অবশ্যই প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর কথা বলিতেছি) তাহাতে দাসত্বে এক্ষণ অনুমাত্রও হেয়তা বিদ্যমান নাই। পূর্ব্বে একজন রাজা (চোদ্দপোয়া মানুষ) শাসনকার্য্য চালাইতেন, তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতে হইলে তদীয় স্বেচ্ছাচারিতার অনুবর্ত্তন করিতে হইত, সুতরাং সে দাসত্ব ঘৃণিত গোলামত্ব ছিল, কিন্তু এক্ষণ প্রায় প্রত্যেক সভ্য দেশেই জনসাধারণ দেশের শাসনকর্ত্তা, এক্ষণ দাসত্ব করিতে হইলে প্রজা সাধারণের সুচিন্তাবিহিত নিয়মাবলী অনুসারে চলিতে হয়, সুতরাং এ প্রকারের দাসত্বকে স্ববৃত্তি বলা বিধেয় নহে, ইহা কর্ম্মচারীত্ব এবং মহত্বে দেবসেবার তুল্য, এজন্য আমার বিবেচনায় জনসাধারণের উপযুক্ত ভৃত্য হইতে পারাটা তুচ্ছ মানবজীবনের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। ভারতবর্ষ যদিও ভারতবাসী সাধারণের দ্বারা শাসিত নহে, তথাপি ইংরেজ গবর্ণমেন্টের শাসনপ্রণালীতে এরূপ অনেক বিষয় আছে, যাহা জাতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত, অতএব আমার স্বদেশীগণ সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে যে সম্মান করেন, তাহা সর্ব্বথা সুনীতি-সম্মত।

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

---o---

আমারি কি দোষ?

১

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যে দিয়েছ দেখা, দাঁড়াইয়া একা একা
হৃদয় দুয়ার দিয়া সহস্র সন্তোষ!
তুমি যে রয়েছ চেয়ে, নিরালা একেলা পেয়ে
ফুটিয়া পদ্মের মত—প্রভাত প্রদোষ!
আমারি কি দোষ খালি? মিছে দেও গালাগালি—

ঠাকুরাণি! ঠেকাইয়া বৃথা কর রোষ।
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

২

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যে এলা'য়ে চুল, হেলাইয়া বক ফুল
দাঁড়া'তে নিকটে আসি—বিভল—বেহোস্—
আদরে লইতে আনি, হাতে টেনে হাত খানি;
বলনা কেমনে জানি শেষে আপ্‌শোষ?
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৩

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যে লিখিলে ছাই, সে কি আর মনে নাই?
"তোমারি—তোমারি আমি"—কথা দেল্‌-খোস্!
সেত গো ফেলিনি ছিঁড়ে, তোমারে দিয়েছি ফিরে
এখনো পরাণে বাজে নীরব নির্ঘোষ!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৪

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যে চুমিলে ঠোঁটে, আজো শিরা বেয়ে ওঠে
আজিও তেমনি প্রাণ করে পরিতোষ!
তুমি যে দিয়েছ স্পর্শ, শত সুখ শত হর্ষ,
গত আজ চারিবর্ষ ভরা হৃদ্ কোষ!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৫

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যা করেছ—পুণ্য, সব গুলি দোষ শূন্য,
আমার সকলি পাপ—এত কি আক্রোশ?
আগে ত বলনি পাপ, আজ কর অভিশাপ,
দংশিয়া ফণীর মত শেষে ফোঁস্ ফোঁস্!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৬

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
এবুদ্ধি কোথায় থু'য়ে, চুমা খে'লে বুকে শু'য়ে?
এখন বিবাদ বটে—তখন আপোষ!
রমণীর মত আর, দেখি নাই জানোয়ার,
কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী—নাহি মানে পোষ!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৭

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
আমি ত বাসিতে পারি, তুমি যে—তুমি যে নারী—
তুমিই কি এত দিন আছিলে উপোস্?
আজি বা হয়েছ পর, শত মৃত্যু দূরতর,
গেছে সে উৎকণ্ঠা নয় গেছে কণ্ঠশোষ।
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

৮

আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?
তুমি যে রয়েছ চেয়ে, নিরালা একেলা পেয়ে,
অমন আঁখির ঠারে কার থাকে হোস্!
অমন চাঁদের হাসি, অধরে অমৃত রাশি,
কে না বল বাসে ভাল, কে না পরিতোষ?
গোলাপী দুইটী গালে, কেনা ভোলে? লালে লালে
একত্রে হাসিতে দেখে প্রভাত প্রদোষ!!
আমারি কি দোষ খালি? মিছে দেও গালাগালি,
ঠাকুরাণি! ঠেকাইয়া বৃথা কর রোষ!
আমি যে বেসেছি ভাল, আমারি কি দোষ?

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গণনা।

ঊনবিংশ শতাব্দী উন্নতির যুগ। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম হইয়াছে বলিয়াই কত ব্যক্তির কত অহঙ্কার, কত আনন্দ। যাহা পূর্ব্বে লোকের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, যাহার বিষয় আলোচনা করিলে পূর্ব্বে লোক সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইত, যাহার কল্পনা করিলে লোক বায়ুরোগগ্রস্ত বিবেচনা করিত; স্থূল কথা, যাহা এতদিন অসম্ভব বলিয়া লোকের ধারণা ও প্রতীতি ছিল, তাহা আর এযুগে অসম্ভব নহে। চারিদিকের সর্ব্বশাস্ত্রের সর্ব্ববিদ্যার বিষয় স্মরণ করিলে মানবজাতির পরাক্রম ও অধ্যবসায়ের শক্তিতে বিস্মিত হইতে হয়। আরও অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এই সমুদায় উন্নতি ও আবিষ্কার করিতে বেশী দিন লাগে নাই। কত পুরাতন ও ভ্রমাত্মক সংস্কার সংশোধিত হইয়াছে, কত পুরাতন গণনা পুনর্গণিত হইয়া খাঁটি দাঁড়াইয়াছে; কত অভাবনীয় ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এসমুদায় ঘটিতে অধিক দিন লাগে নাই। বস্তুতঃ আমারা ঊনবিংশ শতাব্দীর যে গৌরব করি, সেটা সমুদায় শতাব্দীর পক্ষে খাটে না। এখনও ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হইতে দশ বৎসর বাকী। এই দশ বৎসর ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে, বিগত ৩০।৪০ বৎসরেই অধিকাংশ প্রাকৃতিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অল্পকাল মধ্যে যেরূপ ভাবে ও যে হারে নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে; এবং সেই সেই তত্ত্ব দৈনিক কার্য্যের উপযোগী হইয়া মানবের করায়ত্ত হইয়াছে, যদি সেই ভাবে এবং সেই হারে আরও ৩০।৪০ বৎসর কার্য্য চলে, তবে কি যে হইবে, কি যে হইবে না, এখন তাহার আভাষ দেওয়াও নিতান্ত দুরূহ।

যে আবিষ্কার দ্বারা মানবের শারীরিক পরিশ্রমের লাঘব হয়, যদ্দ্বারা তাহার সুখ সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয়, তৎসমুদায় জানিতেই সাধারণ লোকের ব্যগ্রতা সমধিক দেখা যায়। মার্কিন দেশীয় এডিসন সাহেব শারীরিক সুখভোগের কত পন্থা বাহির করিয়াছেন যে, তাঁহার নাম করিলেই আনন্দে মন নৃত্য করিয়া উঠে। তিনি এবৎসর কি নূতন আবিষ্কার করিয়াছেন, বা কি নূতন কল বাহির করিয়াছেন, অথবা কি নূতন ব্যাপারে তিনি সম্প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; মোট কথা, তিনি মাসে মাসে, দিনে দিনে, কি কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াছেন, এরূপ একখানি পঞ্জিকা ক্রয় করিতে বোধ হয়, বিস্তর লোকের আকাঙ্খা। বিলাতের অমুক সাহেব কি করিয়াছেন, অমুক সাহেব যে কল নির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিলেন, তাহা কতদূর সম্পন্ন হইয়াছে, প্রভৃতি প্রশ্ন অনেকের মুখে শুনা যায়। বস্তুতঃ এক তাড়িতের ক্রিয়াতেই অধিকাংশ লোকের চক্ষু ঝলসিয়া গিয়াছে। তাহার উপর আবার পদার্থ বিজ্ঞানের ও অন্যান্য রসায়নের কত অসংখ্য অমূল্য সামগ্রী দেখাইবার আছে।

টেলিফোন, টেলিফারেজ, ফনোগ্রাফ, ফটোফোন প্রভৃতি ট ও ফ বর্গের আবিষ্কার সাধারণ লোকের চিত্তকে আকৃষ্ট ও বদ্ধ রাখিয়াছে। 'ভৌতিক'

ব্যাপারে সহজেই লোকের মন আকৃষ্ট হয়। এই সমস্ত প্রধান প্রধান কল নির্ম্মাণে ও প্রাকৃতিক তত্ত্বের কার্য্যোপযোগিতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর খুব গৌরব আছে বটে, কিন্তু গৌরবের বিষয় ইহাতেই পর্য্যবসিত নয়। এই শতাব্দীর শাসনকালে মহা মহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ যে সকল গূঢ় সত্যানুসন্ধানে ব্যস্ত রহিয়াছেন এবং যে সকল তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধির পথে তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে অগ্রসর হইয়াছেন, যে সকল সত্যের বলে ভবিষ্যতের আবিষ্কার সম্ভবপর হইতেছে, এবং সুখসমৃদ্ধির সম্যক পরিণতি ও আরাম উপভোগের উপযোগী কল কারখানার অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে, বোধ হয়, সেই সকল তত্ত্বের অনুশীলন ও কথঞ্চিৎ জয় লাভই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এত গৌরবান্বিত করিয়াছে।

বোধ হয়, দশ বিশ বৎসরের মধ্যে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের রাজ্যের আভ্যন্তরীন পরিদর্শনে বৈজ্ঞানিক জনগণ সমধিক লাভবান হইতেন। বস্তুতঃ অচিন্ত্যনীয় ও অজ্ঞেয় জড়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে উক্ত দুই বিজ্ঞানের কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। আজকাল পদার্থ বিজ্ঞানে, সূক্ষ্ম পরিমাণের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। স্থান (space) ও কাল পরিমাণার্থ যেরূপ সূক্ষ্ম উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। উহাদিগের গণনা ও পরিমাণ আপাততঃ অবিশ্বাস্য ও প্রলাপ বলিয়া বোধ হইলেও, তৎসমুদায় যে সত্য, তাহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই এবিষয়টি বুঝা যাইবে। ঈথর * অণুর কম্পনেই আলোক। ঈথরের কম্পন বা পরিদোলনেই নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট আলোকের উৎপত্তি। আলোক-বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, বেগুণিয়া বর্ণের আলোক উৎপত্তি কালে সেই অদৃশ্য ঈথর পরমাণুর প্রতি সেকেণ্ডে ৮×১০^{১৪} অর্থাৎ ৮০০০০০০০০০০০০০০) টি এবং লাল বর্ণের আলোক উৎপত্তিকালে ৪×১০^{১৪} টি কম্পন হইয়া থাকে। সম্প্রতি বইস্ সাহেব কোয়ার্টজ নামক প্রস্তরের এত সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত করিয়াছেন যে, তাহা এক ইঞ্চির পঞ্চ সহস্রাংশের একাংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। অর্থাৎ মাকড়সার সূক্ষ্মতম তন্তু অপেক্ষাও সহস্রাধিকগুণ সূক্ষ্ম। কেবল, তাহাই নহে, তিনি পরীক্ষার নিমিত্ত তাহা সুচারুরূপে ব্যবহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হুটেষ্টোন ও টেট্ সাহেবদ্বয় কিছু দিন হইল দেখাইয়াছেন যে, আকাশমার্গে যে বিদ্যুৎ দেখা যায়, তাহা এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ কাল অপেক্ষাও অল্পকাল স্থায়ী।

বিজ্ঞানের যাবতীয় ক্রিয়া জড়ের উপর সম্পাদিত হয়। সেই জড়ের মূল গঠন আমাদিগের নিকট এখনও অজ্ঞেয় রহিয়াছে। উহার বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান হইলেই যাবতীয় অদ্ভুত ব্যাপার আর বিচিত্র বলিয়া বোধ হইবে না। অতীব প্রাচীন কাল হইতে পণ্ডিত ও ঋষিগণের মন জড়ের তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত দেখা যায়। কনাদ,

* আজ কাল ঈথরকে অনেকে আমাদিগের আকাশ বলিতেছেন। ঈথর ও আকাশ একই পদার্থ জ্ঞাপক কি না, তাহার প্রমাণ প্রয়োগসহ একটা মীমাংসা হইলে ভাল হয়।

গৌতম প্রভৃতি ইহার বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। দিমোক্রিটাস্, এপিকিউরস্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ ইহার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। জড়জগৎ যে অতীব সূক্ষ্ম অণুর সমষ্টিমাত্র, তাহা উক্ত পণ্ডিতগণ ব্যক্তকরিয়া গেলেও, এই মত সমর্থনের সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব ছিল। Dalton দাল্‌তন নামক পণ্ডিত সেই পুরাতন মতকে সমর্থন করিয়া নিজের নামে প্রচার করিয়াছেন। তদবধি খ্যাতনামা বহু রসায়নবেত্তাগণ অসংখ্য পরীক্ষা করিয়া উক্ত মতকে বৈজ্ঞানিক সত্যের সীমায় উপস্থিত করিয়াছেন।

জড়ের আণবিক গঠন, রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ দৃঢ়রূপে সমর্থন করিবার পর, পদার্থবিজ্ঞানবেত্তারা বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা তদ্বিষয় আরও অগ্রসর হইয়াছেন। কঠিন ও তরল পদার্থের ভিতর দিয়া আলোকের গতি অনুসন্ধানপূর্ব্বক গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ফরাসী কচি সাহেব বিবেচনা করেন যে, জড় কখনও সমবস্থ (Homogenous) হইতে পারে না; এবং তিনি বলেন যে, অণুর বিস্তৃতি এক ইঞ্চির চল্লিশ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ইংলণ্ডে সার উইলিয়ম টমসন অন্য পথ দিয়া জড়ের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি তাড়িত সম্বন্ধে বহুবিধ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দস্তা ও তাম্রের এক একটি অণু এক ইঞ্চির সত্তর কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র।

ক্লসিয়ান ও ক্লার্ক ম্যাকসয়েল উক্ত প্রশ্ন অন্যপথ দিয়া মীমাংসা করিতে গিয়াছেন। নানাবিধ অবস্থায় বায়বীয় পদার্থের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া বিবেচনা করেন যে, এক একটি অণু এক ইঞ্চির পঞ্চাশ কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র।

অণুদিগের আকৃতি ব্যতীত উহাদিগের মধ্যস্থিত অন্তর কতখানি, তাহার বিষয়ও কিছু জানা গিয়াছে। অণুর আকৃতি ও আণবিক অন্তর বিচার করিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সাধারণতঃ এক ঘন ইঞ্চ গ্যাসে ৩×১০^{২০} গুলি (অর্থাৎ তিনের পর কুড়িটি শূন্য) অণু বর্ত্তমান থাকে। বায়বীয় অবস্থায় অণুগুলি সর্ব্বদিকে সকল ভাবে গতিবিশিষ্ট থাকে। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা আঘাত প্রতিঘাত ঘটিতেছে। ম্যাকসয়েল বিবেচনা করেন যে, জলজনক গ্যাসের এক একটি অণু অপর অণুগুলিকে প্রতি সেকেণ্ডে সতের অর্ব্বুদ সত্তর কোটি বার আঘাত করিতেছে। অণুর আকৃতি বুঝাইবার জন্য সার উইলিয়ম টমসন সাহেব একটি বেশ উপমা দিয়াছেন। একটি ফোঁটা বৃষ্টির জলকে পৃথিবীর মত বৃহৎ করিলে, এবং সেই জলের এক একটি অণুও সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ বৃহৎ করিলে, ঐ অণুগুলি একটি ক্রিকেট খেলাইবার বল অপেক্ষা কিছু ক্ষুদ্র হইবে।

উপরের কয়েক পঙক্তি পাঠ করিয়া হয়ত অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যে অণু প্রায় অজ্ঞেয় বলিলেই হয়, এবং যাঁহার বিষয় প্রায় কিছুই বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না, তৎসম্বন্ধে আবার মানবগণ স্থির ভাবে কখনও কিছু বিচার ও মীমাংসা করিতে পারে কি? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এরূপ গণনা অসম্ভবপর নহে। জ্যোতিষেও অনেক গ্রহ ধূমকেতু প্রভৃতির অস্তিত্ব ও গতি, তাহাদিগকে দেখিবার পূর্ব্বেই নিরূপিত হইয়াছে।

পুনশ্চ তাড়িতাকর্ষণ, চুম্বকার্ষণ ও মাধ্যা-

কর্ষণ প্রভৃতির মূল সম্বন্ধে মানবের কোন জ্ঞানই নাই; অথচ উহারা যে নিয়মের বশবর্ত্তী, তৎসমুদায় জ্ঞাত হইয়া মানব সমাজের কত প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছে।

কিছু দিন হইল বিখ্যাত টমসন সাহেব জড়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে এক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে ঈথর দ্বারা চরাচর জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই ঈথরের বিশেষ রূপে কুণ্ডলীকৃত আবর্ত্ত ভিন্ন পরমাণু অপর কিছু নহে। ঈথর আমাদিগের অদৃশ্য; সুতরাং আলোক ও তাড়িত প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের যেমন জ্ঞান, জগতের প্রকৃতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ জ্ঞান থাকিবে। বিচক্ষণ-পণ্ডিতগণ জড়ের আদি গঠন সম্বন্ধে বহুবিধ মত প্রকাশ করিলেও তাহার একটিও সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। মাধ্যাকর্ষণ-প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি সমুদায় যতদিন বুঝিতে পারা যাইতেছে না, তত দিন বোধ হয়, জড়ের প্রকৃতি অজ্ঞাত রহিবে।

প্রকৃতির রাজ্যের গূঢ়তম সত্য সকল আবিষ্কার করিতে বহুবিঘ্ন বিপত্তি থাকিলে বৈজ্ঞানিকগণ পশ্চাৎপদ হইবার নহেন। বরং যাহাতে যত বিঘ্ন, তাহাতেই যেন তাঁহারা তত অদম্য উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প। কয়েক শতাব্দী অগ্রে কতটুকু জানা ছিল, ও কয়েক বৎসরের মধ্যে কত জানা গিয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বোধ হয়, তাঁহারা এক দিন না এক দিন প্রকৃতির গুপ্তধন অপহরণ করিতে পারিবেন। বিশ্বস্রষ্টা কীটাণু সদৃশ মনুষ্যকে কত ক্ষমতা দিয়াছেন, কিন্তু সেই শক্তি লইয়াও বিশ্বেরএক কণিকা জানিতে মানব অসমর্থ। বিশ্বরচয়িতার শক্তি অসীম।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।

তত্ত্ব কথা।

(কোরাণ, হাফেজ, মোছ্‌নবী, এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত)

মহম্মদ বলিয়াছেন,—

১। যে পাপের প্রারম্ভে ভয়, পশ্চাতে ক্ষমা প্রার্থনা, তাহা সাধককে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করে। যে তপস্যার প্রারম্ভে নিঃশঙ্কতা; পশ্চাৎ আত্ম গৌরব, সেই তপস্যা তপস্বীকে ঈশ্বর হইতে দূরে রাখে।

২। যে সাধকের সহিষ্ণুতা ও কৃতজ্ঞতা আছে, সেই ধনী। অহঙ্কারী সাধককে সাধক বলা যায় না; সে অপরাধী।

৩। যে ব্যক্তি জীবনের জন্য জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করেন, তিনি ঈশ্বরের মহিমা বুঝিতে পারেন। যিনি ঈশ্বরের জন্য জীবনের সহিত সংগ্রাম করেন, তিনিই ঈশ্বরকে পাইতে পারেন।

৪। তুমি যদি বিশ্বাসহীন হইয়া স্বর্গস্থ ও পৃথিবীস্থ সাধকগণের উপাসনা প্রণালীর অনুরূপ উপসনা কর, ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিবেন না।

৫। তুমি এই তিনটী বিষয় হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে। সুখাদ্য বস্তু ভক্ষণ, উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান এবং ধনী লোকের সহবাস। এই ত্রিবিধ অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইলে কেহই সাধক হইতে পারে না। নরক তাহার নিকটবর্ত্তী।

৬। হৃদয়কে হস্তগত রাখিবে। অসদিচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিবে। তাহাহইলে সয়তান (কুপ্রবৃত্তি) তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

৭। উন্নতি অন্বেষণ করিলে তাহা বিনয়ে পাওয়া যাইবে। পুরুষকার তল্লাস করিলে তাহা সত্যে মিলিবে। গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা করিলে ঈশ্বর ভয়ে পাইতে পারিবে। যদি মহৎ হইতে চাও, তবে ধৈর্য্যশীল হও। যদি শান্তি অন্বেষণ করিতে বাসনা থাকে, বৈরাগ্যবান্ হইতে চেষ্টা কর। যদি সম্পদ্ চাও, ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিক্ষা কর।

৮। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মহান্ ঈশ্বরকে প্রতিপালক ও অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তোমার সমস্ত গৌরব তাঁহাতে বিসর্জ্জন দিলে তুমি সাধু হইতে পারিবে।

৯। যিনি করুণাময়ের করুণার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নরকাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবেন, মনে করেন, তিনি কদাপি নিরাপদ হইতে পারেন না।

১০। সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বহু সাধু সঙ্গ করিলেই সাধু হওয়া যায় না; আত্ম শাসন চাই। যিনি সেবা ও সহ-বাসের নীতি শিক্ষা না করেন, নিষিদ্ধ বিষয় হইতে নিবৃত্ত না থাকেন, দুষ্ক্রিয়ার মন্দ ফল জ্ঞাত নহেন এবং ইন্দ্রিয়ের কুহক বুঝিতে না পারেন, তাঁহার অনুসরণ শ্রেয়ঃ নহে! মূল শুদ্ধ না হইলে সেই মূলের প্রকাশ শুদ্ধ হয় কি?

১১। তুমি স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধ, ও সত্যে নির্ভর করিবে, তবে সাধু হইতে পারিবে।

১২। যে নিজকেই চিনিতে অক্ষম, সে ঈশ্বরকে কিরূপে চিনিবে?

১৩। তুমি যাহা জান, তাহা ভুলিয়া যাও। যাহা না জান, তাহারাই অন্বেষণ কর, তুমি শুদ্ধ তাঁহাতেই লিপ্ত থাক, তাহা হইলে তোমার আপনাকে এবং তাঁহাকে চিনিতে পারিবে।

১৪। মান, অপমান, অনুগ্রহ, নিগ্রহ, তুল্য মনে না করিলে মানুষের পূর্ণতা হয় না।

১৫। এই কয়েকটী বিষয়কে হৃদয়ের কল্যাণকর জানিবে। ঈশ্বরে দীনতা, ভোগ্য পদার্থে নিস্পৃহা, ধ্যান, বিনয়, তাঁহার বিচার হইতে ভয়, করুণা হইতে আশা, সংসার হইতে নিবৃত্তি, বিশেষ ভয় বর্ত্তমানে, সাধারণ ভয় ভবিষ্যতে, অন্ন বস্ত্রের জন্য সাধারণ কৃতজ্ঞতা, বিশেষ কৃতজ্ঞতা তত্ত্ব জ্ঞানে। তত্ত্ব জ্ঞান আত্মায় স্ফুরিত হইয়া দিব্য চক্ষু বিকশিত হয়।

হাফেজ বলিয়াছেন—

১৬। যদি তুমি স্বীয় আত্মাকে দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমার শত্রু শয়তানের (কুপ্রবৃত্তির) প্রদত্ত যে দশটী বিষয় তোমার আত্মাকে কলুষিত করিয়া আছে, তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেও; তবে তুমি ধনী ও সাধু হইতে সমর্থ হইবে। তাহা এই—হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, অত্যাচার, আত্মশত্রুতা, পরশত্রুতা, আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া জ্ঞান, অন্যকে অধার্ম্মিক বলিয়া ঘৃণা, ক্রোধ এবং কাম। যে পর্য্যন্ত না তুমি এগুলি পরিত্যাগ করিতে পারিবে, সে পর্য্যন্ত তোমার মনও মলিন থাকিবে, ঈশ্বরকেও পাইবে না।

মহাপুরুষ মহম্মদ বলিয়াছেন—

১৭। মনের অবস্থা চারি প্রকার—সুস্থ, অলস, রুগ্ন এবং মৃত। যাঁহারা সতত সাধন ভজনায় লিপ্ত থাকেন, সংসারে

থাকিয়াও অনাসক্ত চিত্ত, সুখ দুঃখে যাঁহাদের মনোবিকার জন্মাইতে পারে না, তাঁহাদেরই মন সুস্থ। লোভী ও ঔদরিকদিগের মন অসুস্থ। কেননা তাহাদের মন কখনই পার্থিব চিন্তা ছাড়াইতে পারে না। ঈশ্বর আরাধনা তাহাদিগের নিকট আগ্রহের বিষয় নয়। পাপীর মন রুগ্ন। পাপকার্য্য তাহার সতত অভ্যস্ত হইলেও সে সর্ব্বদা ভীত। তাহার মন নিতান্ত দুর্ব্বল। অবিশ্বাসীর মন মৃত। অবিশ্বাসী নিরন্তর সন্দিগ্ধ, তাহার মনের সজীবতা নাই।

১৮। তুমি স্বীয় মনকে সুস্থ রাখিও, তাহা হইলে পরম পিতার প্রিয়পাত্র হইতে পারিবে। তুমি যখন যাহা করিবে, তখন মনে রাখিবে যে, তোমার কার্য্যের প্রতি ঈশ্বরের অনন্ত দৃষ্টি প্রসারিত রহিয়াছে। সৎকার্য্যে সাহস ও অসৎ কার্য্যে ভয় রাখিবে। শ্রবণ, কথন এবং মননাদি প্রত্যেক কার্য্যে স্মরণ রাখিবে যে, সেই অন্তর্যামী তোমার সমস্ত ইজানিতেছেন।

১৯। সাধুতার প্রথমাবস্থাই বিশ্বাস। ঈশ্বর যে অদ্বিতীয়, তাহা তোমার বিশ্বাস ভিত্তিতে সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত রাখিও।

২০। যদি তুমি ভগবানের প্রিয়পাত্র হইতে চাও, তবে তাঁহার প্রত্যেক আদেশ শিরোধার্য্য করিবে। তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য মনেও আনিও না।

২১। কোরাণে ভগবদুক্তিতে বর্ণিত আছে—যে আমার ইচ্ছার বিপরীতে চলিবে, সে আমার সৃষ্টির বহির্গত হউক। যদি তাহার দ্বিতীয় ঈশ্বর কেহ থাকে, তবে সে তাহারই অনুসন্ধান করুক।

২২। তুমি নিজ প্রভুকে স্মরণ রাখিবে, মনুষ্যকে ছাড়িয়া দেও।

২৩। তোমার যাত্রার সময় উপস্থিত হইতেছে। ঈশ্বর তোমার জন্য চারিটী সুসজ্জিত বাহন রাখিয়াছেন। তুমি তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিবে। সম্পদ উপস্থিত হইলে কৃতজ্ঞতার বাহনে, উপাসনার সময় প্রেমের বাহনে, বিপদ সময়ে সহিষ্ণুতার বাহনে এবং পাপ করিলে অনুতাপের বাহনে আরোহণ করিবে। তবে তুমি শ্রেষ্ঠধামে উপস্থিত হইতে পারিবে।

২৪। যদি কেহ তোমার সহিত শত্রুতাচরণ করে, যদি কেহ পরোক্ষে তোমার নিন্দা চর্চ্চা করে, তবে তাহাদিগকে তোমার হিতকারী বলিয়া জানিও। তাহারা উভয়েই তোমার নিকটে স্বর্ণ রৌপ্য উপহার পাইবার যোগ্য।

২৫। ভগবানকে প্রীতি মিশ্রিত ভয় করিবে। তাঁহাকে যেমন তোমার পুত্র কলত্রাদি হইতে, এমন কি তোমার প্রাণ হইতে প্রিয়তম মনে করিবে, তেমনি ভয়ানক হইতেও ভয়ানক বস্তু বলিয়া স্মরণ রাখিবে।

২৬। সতর্ক থাকিও, সংসার তোমার পূর্ব্বতন লোকদিগকে যেমন প্রতারণা করিয়াছে, তোমাকেও সেইরূপ প্রতারণা জালে নিক্ষেপ করিয়া বিপদগ্রস্ত করিতে না পারে।

কবি মৌলানা রুম বলিয়াছেন—

২৭। সংসারকে কুলটা স্ত্রীরূপে জানিও। এই কুলটা অবিশ্বাসিনী তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে যেমন বিনষ্ট করিয়াছে, অসাবধান হইলে তোমাকেও সেই রূপ বিনষ্ট করিবে। যে ব্যক্তি এই মায়াবিনীর প্রার্থী, সে ইহাকে বেশ ভূষায় সজ্জিত করে। যিনি বিরাগী, তিনি ইহার কেশ উৎপাটন করিয়া মুখে কালী চুণ প্রদান করেন।

১৮। সংসারাসক্ত ব্যক্তির সংসারে শোক ও চিন্তা, পরলোকে শান্তি ভোগ।

২৯। যিনি এই স্থির-যৌবনার কুহক-মুগ্ধ হইয়া ইহাকে আলিঙ্গন করিতে বাসনা করেন, তাঁহারই অধোগতি। যিনি ঈশ্বর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারই উন্নতি।

৩০। স্থূলদর্শী প্রজ্ঞা বিহীন লোক আপাত মধুর সুখের প্রয়াসী হয়। পরিণাম-দর্শী বিবেকবান্ লোক নিত্য সুখের অন্বেষণ করে।

৩১। তুমি ইচ্ছা করিলে সহজেই সংসারকে লাভ করিতে পার, কিন্তু সে তোমাকে ঈশ্বর হইতে অতি দূরে লইয়া যাইবে।

৩২। পৃথিবীতে এই তিন জন বুদ্ধি-মান ;—যে সংসারকে ত্যাগ করিয়াছে, যে ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে এবং যে সমাধিস্থ হওয়ার পূর্ব্বে নিজ সমাধিস্থান (গোর) নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

৩৩। যখন তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হইবে, তখন জানিতে পারিবে যে, পৃথিবী তোমার সম্পূর্ণ আজ্ঞাকারিণী হইয়াছে।

৩৪। যখন তুমি কেবল সেই অদ্বি-তীয় ভগবানকে জগন্ময় দেখিতে পাইবে, তখন তোমার প্রকৃতরূপ ঈশ্বর জ্ঞান লাভ হইবে।

মোছ্‌নবীতে উক্ত হইয়াছে—

৩৫। যখন তুমি পার্থিব চিন্তারূপ অগ্নিকে আত্মা রূপ তন্দুরে * জ্বালিতেছ, তখন তুমি কোন অংশেই সেই জ্যোতির্ম্ময় পরম মহান ঈশ্বরের আরাধনা করিতে সক্ষম হইবে না। যখন তুমি সাংসারিক চিন্তায় লিপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে সুখোপভোগ শিক্ষা দিতেছ, তখন সেই পরম পবিত্র ঈশ্বরকে কখনই চিনিতে বা লাভ করিতে পারিবে না।

৩৬। যখন তোমার চক্ষুকে সুরাপানের পাত্রের ন্যায় করিয়া সুরার ন্যায় চক্ষুর জল বর্ষণ করিবে এবং তোমার আত্মাতে ভগব-চ্চিন্তারূপ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে তোমার অনিত্য দেহের রক্ত মাসাদি দগ্ধ করিবে, তখন তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিবে না। তিনি তোমার আত্মা অধিকার করিয়া বিরাজ করিতে থাকিবেন। ইহা তোমার পক্ষে কঠিন ব্যাপার নহে। যিনি তাঁহাকে পাইতে চেষ্টা করেন, তিনি আপ-নিই তাহার সহায় হইয়া মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি করেন।

কোরাণে উক্ত আছে—

৩৭। আমি তোমাদিগের পিতা মাতা হইতেও ভাল বাসি। সতত তোমা-দেরই নিকটে অবস্থান করি। চেষ্টা করিলেই আমাকে পাইতে পার।

অবাধ্য পুত্রকে পিতা ত্যাগ করিয়া থাকেন। রাজা অপরাধী প্রজাকে নির্ব্বাসন দণ্ড করেন। প্রভু ভৃত্যকে পদচ্যুত করেন। পরম দয়ালু পরমেশ্বর কাহাকেও পরি-ত্যাগ করেন না। সহস্র অপরাধীকেও তাঁহার ক্রোড়ে স্থান দান করেন। তুমি জড় মাত্র ছিলে, যিনি তোমাকে কৃপা করিয়া জ্ঞান দান করিয়াছেন, যিনি সকল ইন্দ্রিয়কে তোমার সহায় করিয়াছেন, তাঁহাকে কখনই ভুলিও না। তুমি হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ভাল বাসিবে।

৩৮। আমি হৃদয়ের অন্বেষণ করি, কাহারও বাহ্যিক অবস্থা দেখি না। তুমি যদি ঋষিদিগেব পরিচ্ছদ পরিলেই ঋষি হইতে

* তন্দুর একরূপ চুলা।

পারিতে, তবে স্ত্রী লোকে পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিলেই পুরুষ হইতে পারিত। বাহ্য আকৃতিরই যদি গৌরব হইতে পারে, তবে সুমার্জ্জিত পিত্তলকেও স্বর্ণ বলা যায়।

৩৯। তুমি যদি ঝাউ বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহাতে জলের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ ও মধু সিঞ্চন কর, কদাপি তাহার ফল ভোগ করিতে পারিবে না। ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ না করিলে, সুধু সাধু সঙ্গে থাকিয়া কদাপি সাধু হইতে পারিবে না।

৪০। তুমি আত্মাকে দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার রাখিবে, তবে তাহাতে ভগবান নিরন্তর প্রতিবিম্বিত থাকিবেন।

৪১। তুমি জ্ঞানের জন্য তাঁহারই নিকট প্রার্থনা করিবে, তবে তুমি জ্ঞানী হইতে পারিবে। যিনি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া হৃদয় প্রাপ্ত হন, তিনিই প্রকৃত ধনী।

৪২। তুমি যদি স্বয়ং প্রায়শ্চিত্ত কর, তোমার পাপের শান্তি হইবে না। তোমার অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হইবে। সেই ভগবানই তোমার প্রায়শ্চিত্ত করাইবেন, এবং তিনিই তাহা গ্রাহ্য করিবেন। তবে তোমার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

৪৩। পাপকে অগ্নির ন্যায় মনে করিবে, কদাপি তাহাতে হাত দিবে না।

৪৪। তুমি মাটী হইয়া চলিবে, কেন না মাটীর দেহ লইয়াই বাস কর।

৪৫। তুমি দেহ ধারণের পূর্ব্বে যেমন ঈশ্বরের ছিলে, তেমনি তাঁহারই হইয়া থাকিবে।

৪৬। তুমি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর রাখিবে। জীবিকার জন্য কোন চিন্তা নাই। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমাকে জ্ঞানের অধিকারী করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকিলে তিনিই তোমার নিকটে তোমার জীবিকা উপস্থিত করিবেন।

৪৭। তুমি সর্ব্বদা মনে সন্তোষ রাখিবে। নিজের কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ এবং বিপদকে সম্পদ বলিয়া গণ্য করাই সন্তোষ। যিনি এই সন্তোষ ধনের অধিকারী, তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্ল-চিত্ত।

কোরাণে আয়ুবকে সম্বোধন করিয়া উক্ত হইয়াছে—

৫৮। যে বিপদ্‌কে সম্পদ্ মনে করিয়া সহিষ্ণুতার বাহনে আরোহণ করিবে, আমি তাহাতে ও সে আমাতে। মহাত্মা এব্রাহিম এই উপদেশের সারবত্তা বুঝিয়াছিলেন জন্যই নমরুদের অগ্নিকাণ্ড হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখেও স্পৃহা-শূন্য, শত্রুতে তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই সেই নিত্যধাম লাভ করিতে সমর্থ হন। তুমি এব্রাহিমের ন্যায় সংসারাশক্তি-শূন্য এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে তৎপর হও। এস্‌মাইলের ন্যায় তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ শিক্ষা কর। দাউদের ন্যায় পাপের জন্য অনুতাপ, মুষার ন্যায় অনুরাগ অভ্যাস কর। মহম্মদের ন্যায় প্রেমিক হইতে চেষ্টা কর। তবে তোমার সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে; তুমি ভক্ত হইতে পারিবে। পাপ করিলে ঈশ্বর হইতে শাস্তি পাইবার ভয় রাখিও। অবৈধ চিন্তা করিও না। অবৈধ দর্শনে বিরত থাকিও। অসত্য বাক্য শ্রবণ করিও না। নিষিদ্ধ বস্তু গ্রহণ করিও না। নিষিদ্ধ স্থানে গমন করিও না। ঈশ্বরের গুণানুবাদ ভিন্ন অন্য কথা বলিও না। তোমার শ্বাস প্রশ্বাস

যেন তাঁহার নামের সহিত চলাচল করে। যখন তোমাতে এই অভ্যাস বদ্ধমূল হইবে, তখন তোমাকে জিতেন্দ্রিয় বলা যাইবে।

কোরাণে উক্ত আছে—

৪৯। যখন আমার দাস আমার প্রেম লাভ করে, তখন আমিই তাহার কর্ণ হই, সে আমা দ্বারা শ্রবণ করে। আমিই তাহার চক্ষু হই, সে আমাদ্বারা দর্শন করে। আমিই তাহার রসনা হই, সে আমাদ্বারা কথা বলে। আমিই তাহার হস্ত হই, সে আমাদ্বারা গ্রহণ করে। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় আমারই অনুগত থাকিয়া, আমারই কার্য্য করে।

৫০। নিকৃষ্ট শরীরের সহিত শত্রুতা করিয়া কেবল ঈশ্বরের সহিতই বন্ধুতা করিবে। তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়া কদাপি অস্থায়ী দেহের সহিত বন্ধুতা করিও না। নিজকে সকল অপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে করিবে। অন্তরটী ঈশ্বরে অর্পণ করিও, বহিঃশরীর নরনারীগণকে অর্পণ করিও।

৫১। ভূত ও ভবিষ্যৎ ভাবিবার আবশ্যক নাই। বর্ত্তমানে যাহা উপস্থিত আছে, তাহাই লইয়া ঈশ্বরের উপাসনায় নিবিষ্ট চিত্ত থাক।

তাপস বায়ে জিদ্ বলিয়াছেন—

৫২। যে চক্ষু ঈশ্বরের শাসনাধীন হইয়া দৃষ্টি করে না, তাহার অন্ধ হওয়াই উচিত। যে জিহ্বা ঈশ্বরের গুণানুবাদে রত নহে, তাহার কথন-শক্তিহীন হওয়াই কর্ত্তব্য। যে কর্ণ সত্য শ্রবণ-বিমুখ, তাহার বধির হওয়াই শ্রেয়ঃ। যে দেহ ঈশ্বরের সেবায় আসিল না, তাহার পতনই মঙ্গল।

৫৩। তুমি সতত ঈশ্বর সেবা করিবে। তাহাতে তোমার প্রাণকে উৎসর্গ করিবে, তবে তাঁহার প্রেম লাভ করিতে পারিবে। প্রেম বিনা প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।

মছ্নবীতে উক্ত আছে—

৫৪। বিনা প্রেমে উপাসনা (নমাজ) হয় না। করিলে, সে কেবল উষ্ট্রের ন্যায় উঠাবসা মাত্র। হাজি লোকেরা মক্কার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং মক্কা বাসের আকাঙ্ক্ষা করেন। প্রেমিকগণ অন্তর দ্বারা স্বর্গলোক প্রদক্ষিণ করেন এবং মনশ্চক্ষু দ্বারাই ঈশ্বর দর্শন অভিলাষ করেন।

কোন হিন্দুসাধক বলিয়াছেন—

৫৫। যদি হরি আরাধিত হন, তবে তপস্যায় কি প্রয়োজন? যদি তিনি আরাধিত না হন, তবেই বা তপস্যায় কি প্রয়োজন? হরি যদি অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান, তবে তপস্যার দ্বারা কি লাভ? যদি তিনি অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান না থাকেন, তবেই বা তপস্যায় কি লাভ? ফল কথা যিনি ভগবানকে জানিয়াছেন, তিনি সর্ব্বদা অন্তরে বাহিরে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করেন। তাঁহার তপস্যায় কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তাঁহার তীর্থ পর্য্যটনাদিরও আবশ্যকতা নাই।

ভক্ত কবির বলিয়াছেন—

৫৬। মালা জপিতেই তোমার দিন গত হইল, কিন্তু তোমার মনের মলিনতা দূর হইল কৈ? তুমি মালা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়কে মালা করিয়া জপিতে থাক।

৫৭। হৃদয়ের সহিত ভালবাসাই প্রেম। কেহ কেহ রোমশ বস্ত্র পরিধান ও যব রোটিকা খাইয়া ঈশ্বর প্রেমিকের পরিচয় দেন, কিন্তু উহা কেবল ভণ্ডামি মাত্র। রোমশ বস্ত্র পরিধান করিলেই যদি ঈশ্বর

প্রেমিক হওয়া যায়, তবে পশুমাত্রেই ঈশ্বর প্রেমিক।

তুলসী দাস বলিয়াছেন—

৫৮। যদি পাথর পূজা করিলে হরি লাভ হয়, তবে আমি পাহাড় পূজা করি। যদি তৃণ খাইয়া থাকিলে হরিকে পাওয়া যায়, তবে গরু, ছাগল প্রভৃতি অনেক আছে। যদি ফলমূল ভক্ষণ করিয়া থাকিলে হরি মিলিতে পারে, তবে বাহুড় ও বানরদিগের পক্ষে হরি সুলভ। যদি দুধ পান করিয়া থাকিলে হরিকে পাওয়া যাইতে পারে, তবে গো-বৎসাদির পক্ষে সহজ। বস্তুতঃ প্রেম বিনা হরি লাভ হয় না। প্রেমই তাঁহাকে লাভ করার প্রধান সাধন।

মছ্নবীতে আছে—

৫৯। তুমি স্বীয় অঙ্গকে সুবর্ণের ন্যায় পরিষ্কার করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার হৃদয় যে লৌহাপেক্ষাও মলিন। তবে কিরূপে সুবর্ণের বিনিময়ে বিক্রীত হইতে পারিবে?

৬০। তুমি যখন অবিশ্বাসী এজিদের কুমন্ত্রণা গ্রহণ করিয়াছ, তখন তাপসবর বাএজিদের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেই বা তোমার কি লাভ?

শ্রীমির্জ্জা আমিন উদ্দিন আহাম্মদ।

—০—

তত্রৈব রমতে হরিঃ।

বিষ্ণুভক্তির্যথা সাক্ষাজ্জীবনিস্তারকারিণী।
গৃহিণী রাজতে যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১॥

সর্ব্বজীব নিস্তারিণী গৃহিণী যথায়,
বিরাজে সাক্ষাৎ যেন বিষ্ণুভক্তি প্রায়;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই পুণ্যনিকেতন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১।

পুণ্যব্রতো গৃহীযত্র গৃহিণী চ পতিব্রতা।
পিতৃভক্তাশ্চ সন্তানাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥২॥

যে গৃহে গৃহস্থ সদা পুণ্যকর্ম্মে রত,
পতিমাত্র গৃহিণীর জীবনের ব্রত;
পিতৃভক্ত গুণবান্ যে গৃহে সন্তান,
তথায় করেন হরি নিত্য অধিষ্ঠান।২।

আতিথ্যং গুরুভক্তিশ্চ পাতিব্রত্যং দয়ার্জ্জবম্।
সত্যং শৌচং ক্ষমা যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৩॥

সতীত্ব, আতিথ্য, দয়া, ভক্তি গুরুজনে,
সত্য, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা, যে ভবনে;
সে গৃহ ধর্ম্মের ক্ষেত্র শান্তির আধার,
শ্রীহরি তথায় নিত্য করেন বিহার।৩।

অরিষড়্বর্গদমনং দীনোপগত রক্ষণম্।
সর্ব্বভূতাভয়ং যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৪॥

যে ভবনে ছয় রিপু নিত্য বশে রয়,
অভ্যাগত দীন হীন লভয়ে আশ্রয়;
যথা আসি' সর্ব্বজীবে লভয়ে অভয়,
বিহরেন নিত্য তথা হরি দয়াময়।৪।

পিতা মাতা গুরুঃপত্নী জ্ঞাতয়ো বান্ধবাস্তথা।
যত্রৈতে নিত্যসন্তুষ্টাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৫॥

পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, পুলকিত মনে,
লভয়ে অতুল তৃপ্তি নিত্য যে ভবনে;
জ্ঞাতি বন্ধুগণে যথা সদানন্দে রয়,
বিহরেন হরি তথা সদানন্দময়।৫।

মোদন্তে শিশবো যত্র মোদন্তে চ গৃহেঽঙ্গনাঃ।
তির্য্যঞ্চোঽপি প্রমোদন্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৬॥

যে ভবনে শিশুগণ প্রফুল্ল বদন,
প্রফুল্ল বদন যথা কুলনারীগণ;
যে ভবনে পশু পক্ষী প্রফুল্ল বদন,
শ্রীহরি সদাই তথা করেন রমণ।৬।

শ্রদ্ধান্নং গৃহিণা দত্তং ভুঞ্জতে সর্ব্বজন্তবঃ।
প্রীত্যা যত্র গৃহে নিত্যং তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৭॥

যে গৃহে গৃহস্থ নিত্য ভক্তিপূর্ণ মনে,
অন্নদান মহাদান করে জীবগণে;
সকলে আনন্দে তাহা করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার।৭।

অহো তৃপ্তোঽস্মি জীবানামিতি নিত্যং প্রবর্ত্ততে।
যত্রানন্দরবো গেহে তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৮॥

'আহা! হইলাম তৃপ্ত'—এ আনন্দ-রবে,
যে গৃহ করয়ে পূর্ণ জীবগণ সবে;
জীবের শান্তির স্থান ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা শ্রীমধুসূদন।৮।

অদ্বৈত ভক্তিসূত্রেণ যত্র গৃহেজনাঃ।
সর্ব্বেঽভিন্নমনঃ প্রাণাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥৯॥

পতি, পত্নী, পুত্র, ভৃত্য আদি পরিজনে,
অদ্বৈত ভকতি-সূত্রে বদ্ধ যে ভবনে;
সবার একই মন, একই পরাণ,
শ্রীহরি করেন তথা নিত্য অধিষ্ঠান।৯।

যত্র নির্লিপ্তভাবেন সংসারে বর্ত্ততে গৃহী।
ধর্ম্মং চরতি নিষ্কামং তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১০॥

নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে গৃহস্থ যথায়,
সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মে জীবন কাটায়;
ধরাধামে একমাত্র ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১০।

গৃহী যত্রাখিলক্লেশান লীলয়া সহতে স্বয়ম্।
হরত্যাশ্রিতসন্তাপং তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১১॥

অশেষ ক্লেশের ভার গৃহী যে ভবনে,
আপনি করিয়া সহ্য অম্লানবদনে,
প্রাণপণে আশ্রিতের হরে দুঃখভার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার।১১।

পরিশ্রমো মিতাচারো যত্র ধর্ম্মেণ জীবিকা।
দেবাতিথি গুরুশ্রদ্ধা তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১২॥

পরিশ্রম, মিতাচার, ধর্ম্মপথে আয়,
দেবতা-অতিথি-গুরু-অর্চ্চনা যথায়;
পরম পবিত্র সেই গৃহস্থ ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ।১২।

প্রযত্নলালিতা যত্র ধেনবো নিত্য দুগ্ধদাঃ।
সুপুষ্পফলবা বৃক্ষাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১৩॥

যতনে লালিত হ'য়ে যথা ধেনুগণ,
সুধাসম ক্ষীরধারা করে বিতরণ;
দিব্য ফল পুষ্প যথা দেয় তরুগণ,
সে গৃহে সতত হরি করেন রমণ।১৩।

সুসংস্কৃতে সুসংমৃষ্টে যদগৃহে সর্ব্বতঃ শুচৌ।
বিশুদ্ধান্যন্নপানাদি তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১৪॥

পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন নিত্য যে ভবন,
পবিত্র পানীয় শয্যা অশন বসন;
অশুচি দ্রব্যের যথা নাম গন্ধ নাই,
বিহরেন সেই স্থানে শ্রীহরি সদাই।১৪।

সর্ব্বং যত্রান্নপানাদি গৃহী বিষ্ণুনিবেদিতম্।
পরিবারৈর্বৃতো ভুঙ্‌ক্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ॥১৫॥

অন্নপান সমস্তই গৃহী যে ভবনে,
ভক্তিভাবে নিবেদন করে নারায়ণে;
পশ্চাৎ সকলে মিলি করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার।১৫।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

মহারাষ্ট্র।

(১ম)

মনুষ্যদেহে যেমন অস্থি, পৃথিবীর স্থলভাগে সেইরূপ পর্ব্বত। এই জন্য পর্ব্বতের নাম ভূধর। ঘাটাখ্য পর্ব্বত অরঙ্গাবাদ হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বিশাল প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বোধ হয়, সমুদ্রকে ভারত প্লাবিত করিতে নিষেধ করিতেছে। এই পর্ব্বতের উত্তর ভাগকে সহ্যাদ্রি কহে। বদলাপুর অতিক্রান্ত হইলে পর্ব্বতের শোভা নয়নগোচর হইতে লাগিল। ভোরঘাট উত্তানপথে উঠিবার জন্য করজট নামক স্থানে যাইয়া বৃহৎ ইঞ্জিন লওয়া হইল এবং নামিবার কালে শকট শ্রেণী যদি গড়াইয়া পড়ে, সেই জন্য পশ্চাৎ হইতে আকর্ষণার্থ কয়েকখানি ব্রেক শকট যোজনা হইল। এখান হইতে লনৌলি পর্য্যন্ত ১৬ মাইল অদ্রিবক্ষে লৌহবর্ত্ম উন্নত এবং আনত ভাবে চলিয়াছে। ঘাট পর্ব্বতের পশ্চিম হইতে পূর্ব্বপারে যাওয়া আবশ্যক। অবশ্য প্রাকৃতিক ছেদ আছে, তাহার নাম ভোরঘাট। সেই সরণি অবলম্বন করিয়া সানু নির্ম্মাণ করতঃ গিরি কটক ভেদ করিয়া পথ গিয়াছে। চড়াই দুই সহস্র ফিট। এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে যাইবার জন্য বহু সেতু আছে। মৌহকীমলি সেতু ১৬৩ ফিট উচ্চ। সহ্যাদ্রির শোভা অবশ্য মোহজনক। তরুগুল্ম ও নির্ঝর, এ সকলের অপ্রতুল নাই, কিন্তু আমরা পর্ব্বত বলিলে, হিমবৎ স্মরণ করি। বড় বড় পাইন জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে ইচ্ছা হয়। চক্ষু নীহার মণ্ডিত শৃঙ্গ দেখিতে চায়। ভৈরব ভাব যদি না দেখিতে পাইলাম, তবে আর অদ্রির সৌন্দর্য্য কি? অনেক শৈল দেখিলাম, হিমালয়ের ছবি অন্যত্র মিলিল না। ঘাট পর্ব্বত, আর এক বিষয়ে বিশেষ আগ্রহের কারণ হইতেছে। এমন পর্ব্বতগাত্রে পথ (রেইল) কোথাও দেখি নাই। ভারতের মধ্যে ইহা একটী প্রধান দর্শনীয় স্থান। বাষ্পীয় যান এখনে ব্যোমযান স্বরূপ হইয়াছে। আকাশে গাড়ী ছুটিতেছে, মর্ত্ত্যলোকে গ্রাম, শস্যক্ষেত্র ও অবিরল বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী রাজপথ কঙ্কণ প্রদেশ শোভা করিয়া বিরাজ করিতেছে। যেস্থলে প্রভূত প্রস্তর কর্ত্তন করিত হইবে, সেখানে সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পথ হইয়াছে। দ্বিদশতি (বিংশতি) সংখ্যক বা ততোধিক টনেল হইবে। অন্ধকারে যখন ঐ পথে যাইতে হয়, আরোহীগণ "বিঠ্ঠল হরি" বলিয়া চিৎকার করিতে থাকে। রিভরসিং ষ্টেশনে যাইয়া দেখা গেল, আর সম্মুখে পথ নাই। যে পথ আসিয়াছি, তাহার উপর স্তর দিয়া চলিতে হইল। বহু উচ্চে খণ্ডালার বাঙলা দেখা যাইতেছে। ক্রমশঃ তথায় পৌঁছিলাম। এই স্থান মৃগয়াপ্রিয় মানবের বাঞ্ছনীয়। ব্যাঘ্র ও হরিণ প্রভৃতির অভাব নাই। এবনে বারশিঙ্গা পাওয়া যায়। বেলা দুইটার সময় পুণ্যপত্তনের গণেশ খিন্দ প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইল। মহারাষ্ট্র রাজধনী পুনানগরে অবতরণ করিয়া এক ব্রাউহাম ভাড়া করিয়া "রাজমান্য রাজেশ্বরী" অর্থাৎ শ্রীল শ্রীযুক্ত সাঠে মহাশয়ের বাটীতে যাত্রা করিলাম। পথি মধ্যে কয়েকখানি মাড়য়ারির মুদিখানার দোকান দৃষ্ট হইল। ইহারা দেখিতেছি সর্ব্বত্র আছে। সকলেই ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, কিন্তু ইহারা নহিলেও চলে না।

সর্ব্বপ্রথমে পর্ব্বতী (পার্ব্বতী) দর্শন করিতে যাওয়া হইল। পর্ব্বতের উপর এই পার্ব্বতীর মন্দির সাতারা রাজের স্মরণার্থ বালাজী বাজীরাও কর্ত্তৃক পাণিপথের যুদ্ধের পূর্ব্বে নির্ম্মিত। মহারাষ্ট্র গৌরব চিরদিনের জন্য পাণিপথের যুদ্ধস্থলে বিসর্জ্জন দিয়া বালাজী ভগ্নমনে প্রত্যাগমন করিয়া রোগ শয্যায় শয়ন করিলেন এবং এইশৈলে প্রাণত্যাগ করিলেন। হরিগোবিন্দ আমাদিগকে দেবালয় প্রভৃতি দেখাইয়া একটী বাতায়নের নিকট লইয়া গেলেন ও ইংরাজি ভাষায় কহিতে লাগিলেন,—এই স্থান হইতে পেশোয়া বংশের শেষ ভূপতি, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে, দুই সহস্র আটশত সৈন্য কর্ত্তৃক তাঁহার অষ্টাদশ সহস্র যোদ্ধাকে খিরকি নামক স্থানে পরাজিত হইতে দেখিয়াছিলেন। যে বৎসর বাজীরাওর রাজ্য ইংরাজ গ্রহণ করিলেন, সেই বৎসরেই বজ্রাঘাতে এই বাটী ভগ্ন হইয়া যায়। মন্দিরজীবী অনাথগণের সাহায্যের নাম করিয়া প্রদর্শক ঠাকুর আমাদের নিকট কিঞ্চিৎ সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এখান হইতে অবতরণ করিয়া মূলামুতা তটিনী উপরে বন্দ উদ্যান ভূমিতে বিচরণ করিবার সঙ্কল্প হইল। পুনার নরনারী সন্ধ্যাকালে এই প্রদেশে ভ্রমণার্থ উপস্থিত হন। ইংরাজি বাদ্য উদ্যম হয়। উদ্যানের নূতনত্ব এই যে, টবে বসান গাছ দ্বারা উপবন রচিত। একটী প্রস্রবণে ছত্রের আকারে বারিধারা উত্থিত হইতেছে! বন্দ জল প্রপাত অতি সুন্দর দৃশ্য। কিছু ক্ষণের জন্য অভিভূত হইলাম। প্রভূত জলরাশি মহাবেগে সশব্দে পতিত হইয়া ফেণিল ভাবে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া ধাবমান হইয়াছে। বাঁধ ছাপাইয়া ধারাগুলি স্ফটিক রেখার মত নিপতিত হইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে প্রপাতের সৌন্দর্য্য আর একরূপ দেখিলাম। আলোক ক্ষীণ বলিয়া বাঁধ বা জল দেখা যাইতেছে না। কেবল জলের যে ভাগ ক্ষুব্ধ হইয়া শ্বেত হইয়াছে, তাহাই চন্দ্রিকা মাখিয়া নয়ন পথগামী হইতেছে। দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব।

চতুঃশিঙ্গি দেবীর মন্দির "ডোঙ্গরের" (পাহাড়) উপর। সোপানাবলির উভয় পার্শ্বে সানুদেশে ইতস্তত কুনবীমরঠগণ আহারান্তে কাদম্বরী সেবা ও তাস ক্রীড়া করিতেছে। সেদিন দেবীর পর্ব্বাহ। দেবালয়ের অভ্যন্তরে যাইয়া মদিরার গন্ধ পাইতে লাগিলাম। এটি বীরমার্গ অনুবর্ত্তীদের স্থান। দেবীর গলদেশে তাম্বুলবল্লির মালা। ভাত, লুচি ও মদ্য দিয়া নৈবেদ্য হইয়া থাকে। একটি স্ত্রীলোকের উপর দেব আবির্ভাব হইয়াছে, সে নানা প্রশ্নের উত্তরে দুই একটি শব্দ উচ্চারণ করিতেছে। দেব পূজা করিয়া পূজারি রমণীর নিকট একখণ্ড নারিকেল প্রসাদ পাইলাম। পর্ব্বতের নিম্নে এক চত্বর আছে, উহাতে বলিদান হয়। নানা ফরণবিশ কৃত দেবায়তনের নাম বেলবাগ। প্রাতঃকালে মৃদঙ্গ ও বীণা সহযোগে নারায়ণ সমক্ষে স্তুতি গীত হয়। একাদশীর দিন অপরাহ্ণে বিপুল জনতা দৃষ্ট হয়। চন্দ্রাতপতলে অসংখ্য নরনারী উপবেশন করিয়া কথকতা শ্রবণ করিতেছেন। কথক দণ্ডায়মান হইয়া মহাভারত কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গীতের সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন করতাল ও মৃদঙ্গ লইয়া পশ্চাৎ রহিয়াছে। কথক যদি ব্রাহ্মণ হন, তাহা হইলে কীর্ত্তন অন্তে ব্যক্তি বিবে-

চনায় আলিঙ্গন ও প্রণাম গ্রহণ করেন। শ্রোতৃবর্গ দেবতার কিছু প্রসাদ লইয়া বিদায় হন। কীর্ত্তন সরস করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে টুকারামের অভঙ্গ নামক কবিতা ব্যবহার করেন। (টুকারামের ইষ্টদেবতা বিঠোবা পানঢর পুরে অবস্থিত। সম্প্রতি তত্রত্য মহা উৎসব উপস্থিত। বিসূচিকা রোগ প্রাদুর্ভূত হওয়ায় শান্তিরক্ষক কর্ত্তৃক গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে।) তুলশিবাগ পুনার মধ্যে প্রধান দেবালয়। একজন "সাউকার" কয়েক বর্ষ হইল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মন্দিরের আকার—রাজসিংহাসনের ন্যায় কতক গুলি তোরণ (থিলান) উপর্য্যুপরি গ্রথিত হইয়াছে। মন্দির উচ্চ হওয়ায় সেইরূপ আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়া শিখর দেশ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়াছে। মঙ্গল চিহ্ন স্বরূপ আলিপনা প্রত্যহ মন্দিরের তাবৎ প্রকোষ্ঠে দেওয়া হয়। ইহা সুখসাধ্য করিবার জন্য ছিদ্রযুক্ত "রোলর" মধ্যে চূর্ণ রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাতে চিত্র অঙ্কিত হইয়া যায়। গর্ভগৃহে রাম লক্ষ্মণ জানকী বিরাজ করিতেছেন। অবশ্য তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয় পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছেন। প্রাঙ্গণের প্রাচীরে রামায়ণ প্রতিপাদক চিত্র অঙ্কিত আছে ও ইহার নিম্নে লীলার নাম লিখিত হইয়াছে। যে দেবালয়ে সমারোহ আছে, আগন্তুক ব্যক্তি সে স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিলে অর্দ্ধেক নগর দেখার ফললাভ করিতে পারেন। এই স্থান ও বাঁধসন্নিহিত উদ্যান এখানকার মধ্যে ভ্রমণের বিলাস ভূমি।

বোম্বাইয়ের অনেক প্রধান ব্যক্তি এখানে বাস করেন। প্রাবিটকালে গবর্ণরের পুনায় নিবাস হয়। বোম্বাই অপেক্ষা এখানকার জলবায়ু উত্তম। বোম্বাই প্রদেশের ইংরাজি-সৈন্য এখানে অবস্থিতি করেন। সহরে বিজাতীয় হর্ম্ম্যনির্ম্মাণ প্রণালী প্রবেশ করে নাই। অবশ্য একথা ইংরাজপল্লি সম্বন্ধে প্রযুজ্য নহে। জোশী হল বা সার্ব্বজনিক সভাগৃহ ও স্বাস্থ্যরক্ষকের কার্য্যালয়টি বোম্বাই প্রণালীর কাচের সার্শিমণ্ডিত। অধিবাসীগণের পরিচ্ছদেরও সেইরূপ কোন পরিবর্ত্তন নাই। তবে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোট পেণ্টুলেন পরিধান করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে,পরিধান দেখিলে,যে ইংরাজি নবিশ নহে, তাহাকে চিনা যায়। এখানে "সুধারণে আলাকে" ও (সংস্কারক) মস্তক মণ্ডিত করিয়া দীর্ঘ শিখা রাখিতে হয়। পায়ে দেশীয় উপানৎ। পরিধেয় রজকালয় দর্শন করে নাই। এইরূপ পুরস্ত্রীধৌত প্রশস্ত রক্তকূল বস্ত্র ও উত্তরীয়। দীর্ঘ অঙ্গরক্ষাটী কিন্তু পরের বাড়ী দিতে হয়। মস্তকে রথচক্রের মত শির বেষ্টন। স্ত্রীলোকে কাছা কোঁচা দিয়া গাত্র আবৃত করিয়া যে দেশী রঙ্গিন সাড়ি পরিধান করে, তাহার অন্যথা হইবার নহে। আমরা পারসি মহিলার সাড়ি দেখিয়া মোহিত হইয়া আপনার গৃহিণীর জন্য ক্রয় করিতে পারি, কিন্তু মরাঠী অঙ্গনা কদাপি তাহা ব্যবহার করিবেন না। শ্লথ পাদুকা ব্যবহার স্ত্রীলোকের পক্ষে দূষ্য নহে। বাঙ্গালার ন্যায় ছত্রদণ্ডের বহুল ব্যবহার আর কোথাও নাই। সুদরিদ্র কৃষাণ সজ্জা করিয়া কোন স্থানে যাইতে হইলে ছাতাটী লইবে। এ বিষয়ে কলিকাতা-বাসিদের এক কৌতুকাবহ ব্যবহার আছে। রৌদ্র বা বৃষ্টিতে পারগ পক্ষে আতপত্র লইয়া যাইবেন না, যদি লইলেন বৃষ্টি রৌদ্র না থাকিলে

মাথায় দিয়া যাইতে হইবে। কলের জল লইবার জন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পৃথক কুণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে। লিখিত আছে "ব্রাহ্মনাচা হৌজ" "শূদ্রাচা হৌজ"। যখন এপথে প্রবেশ করিয়াছি, বস্ত্র প্রক্ষেপের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। বোধ হইতেছে, ব্রাহ্মণ জাতি এখানকার আদিম অধিবাসী নহেন, নতুবা যে মরঠ জাতির বাস বলিয়া দেশের নাম মাহারাষ্ট্র বা মরঠ্ঠা হইয়াছে, সে মরঠ শব্দে কেবল শূদ্র বুঝাইবে কেন? একদা শ্মশান দেখিতে যাওয়া হইল—এখানে (ঘুঁটে) দ্বারা চিতাপ্রস্তুত হয়। ডাল ও রুটি দ্বারা পুরুক পিণ্ড প্রদত্ত হইয়া থাকে।

গবর্ণরের কাউন্সিল হল অতি বৃহৎ গৃহ। এখানে অনেক গুলি তৈল মিশ্র রঙ্গের চিত্র আলম্বিত আছে। দেশের খ্যাতিবান ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিবার কার্য্য ইহাতে নির্ব্বাহ হইল। যাঁহাদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম যথা—খান বাহাদুর পদমজী পেসতনজী, খান বাহাদুর নৌশির ওয়ানজী, পেসতন্‌জী, সোরাবজী, ফ্রামজী পটেল, ত্রিবাঙ্কুরের যুবরাজ, সরমঙ্গল দাস নাথুভাই, ডাক্তার ভাউদাজি, কোচিনের রাজা, সর সালারজঙ্গ, ভাউনগরের ঠাকুর, মোরভীর ঠাকুর, খণ্ডেরাও গায়কয়াড় এবং সর ত্র্যম্বক মাধব রাও, ও শঙ্কর শেট। এই বিপুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন প্রাসাদ অবলোকন করিয়া যদি পেশয়ার ভবন দর্শন করিতে যাওয়া হয়, তাহা হইলে জগতের বৈচিত্র্য চমৎকার অনুভূত হইবে। শনিবার পেট আমাদের বাটীর অতি নিকটে অবস্থিতি, এখানে একটী প্রাকার বেষ্টিত বাটীতে মহারাজ পেশয়া বাস করিতেন। প্রহরীর অনুমতি লইয়া সিংহদ্বার অতিক্রম করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, কাল সমস্ত গ্রাস করিয়াছে। দুর্ভেদ্য প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরের মধ্যে কেবল পতিতভূমি অবশিষ্ট রহিয়াছে। আর সকল আগুণ লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে। এই স্থানে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে অক্টোবর প্রাতঃকালে তরুণ পেশয়া মধুরাও অট্টালিকার উপর হইতে পতিত হইয়া আত্ম হত্যা করিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রী নানা ফারনাবিষ রাজকীয় তাবৎ ক্ষমতা ধারণ করিতেন। তিনি পেশয়ার ভ্রাতাকে বন্দী করায় মধুরাও অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং আপনাকে কর্ম্মচারীর অধীন দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া সভায় আসা ত্যাগ করিলেন। শয়ন গৃহের বাহির হইতেন না। বিজয়াদশমীর দিন না হইলে নয় বলিয়া সৈন্যগণের সমক্ষে দেখা দিলেন। এবং রাত্রে দরবারে সরদার ও দূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন শান্তি লাভ করিতে পারিল না। দুই দিন পরে ইহলোক ত্যাগ করিবার জন্য ছাদের উপর হইতে পতিত হন। ফুহারার উপর পড়ায় অতিশয় ক্ষত হইল ও দুই খানি অস্থি ভগ্ন হইয়া গেল। তারপর দুই দিন গত হইলে প্রাণ বহির্গত হইল। তাহার অতি প্রিয় বাবারাও ফড়কের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মরিবার সময় বলিয়াছিলেন, নানার শত্রু বাজীরাও মস্‌নদের উত্তরাধিকারী হইবেন। আর এই "জুনাবাড়া" তেই ১৭৭৩ খ্রীঃ ওঃ ৩০শে আগষ্ট ঊনবিংশ বয়সে নয় মাস মাত্র রাজ্যকালে নারায়ণ রাও তাঁহার রক্ষক সোমর সিং ও এলিয়া কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। নারায়ণ তদীয় পিতৃব্য রঘুনাথ রাওকে এই বাটীর এক দেশে বন্দী দশায় রাখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি আপন মুক্তি

কামনায় ঐ ঘাতকদ্বয় দ্বারা পেশয়াকে ধৃত করিবার জন্য আজ্ঞা লিপি দেন। রঘুনাথের পত্নী আনন্দী বাই গোপনে সেই লিপির ধৃত শব্দ হত শব্দে পরিবর্ত্তিত করিলেন, নারায়ণ পিতৃব্যকে জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি নিষেধ করিলেও সোমর সিং অনুমতি পত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে অস্ত্রাঘাত করিল। এই সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আগমন করিলাম। এই বাটীর চতুর্দ্দিক বাজার, সেই জন্য এই স্থানে অপর নাম মণ্ডি। সম্মুখে তরকারি ও বিবিধ ফল এবং লঙ্কা মরিচ ও পলাণ্ডু, সকল বস্তুই অপরিমিত ভাবে বিক্রয় হইতেছে। এক পার্শ্বে কুম্ভকারের দ্রব্যজাত, অন্য পার্শ্বে ইন্ধন বিক্রয়ের স্থান। বাড়ীর পশ্চাৎভাগে শুষ্ক মৎস্য বিক্রয় হয়। লিমজীর হোটেল এই দিকে। অধিক রাত্রে এখানে আসিলে বিলক্ষণ কৌতুক দেখিতে পাওয়া যায়। লিমজী পরিহাস করিয়া বলেন, আমার হোটেল কেবল ব্রাহ্মণ জাতির জন্য স্থাপিত। অন্যকে মদ্য মাংস বিক্রয় করি না; ফলতঃ ইংরাজি-শিক্ষিত নিরামিষ-ভোজী পুনার ব্রাহ্মণ এক্ষণে গোপনে মদ্য মাংস ব্যবহার করা অন্যায় বিবেচনা করেন না।

পুনানগরে তিন খানি নাট্যশালা আছে। টিকিট বাজারে বিক্রয় হয়। আমরা এক জন মহারাষ্ট্রীয় সহচরের সহিত কর্ণপর্ব্ব অভিনয় দর্শন করিতে গেলাম। নিয়মিত সময়ে নাট্য আরম্ভ না হওয়ায় কিয়ৎকাল বহির্দ্দেশে থাকা হইল। পার্শ্ববর্ত্তী ভবন হইতে ঘরট্ট সঞ্চালিনীর কোকিল কণ্ঠ গীতি নিস্বন আগমন করিয়া কর্ণ-পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। রঙ্গভূমির মুখপটের চিত্রের দৃশ্য অতি ভয়ানক। দশভুজা অসুর সংহার করিতেছেন। প্রথমতঃ শংখ ঘণ্টা বাজাইয়া গণপতির পূজা হইল। তাহার পর সরস্বতী বন্দনা করায় তিনি স্বয়ং কটিদেশে বাহনের অবয়ব সংলগ্ন করিয়া আগমন করতঃ মহানৃত্য করিতে লাগিলেন। এক জন ইংরাজ সাজিয়া আসিয়া ব্রাহ্মীর সহিত পরিহাস কবিতে লাগিল। সরস্বতী পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, আমরা দেবতা, আমার সহিত এ ব্যবহার করিও না। এইরূপ ভাবে প্রস্তাবনা আরম্ভ ও শেষ হইয়া কাব্য আরম্ভ হইল। পাত্রের গেয় গান্ গুলি পটের বাহিরে মহারাষ্ট্রীয় কীর্ত্তনের প্রণালীতে মুরজ ও মন্দিরা সহযোগে অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক গীত হইতে লাগিল। অভিনেতাদের অঙ্গবিক্ষেপ এমন প্রবল যে, আলোকের একটী কাচনালী পতিত হইল। এ দলে দুই একটী স্ত্রী অভিনেত্রী আছেন। এতদ্দেশে অবরোধ প্রথা না থাকায় কুলবতীর দ্বারা অভিনয় হওয়ার প্রতিবন্ধক নাই। তথাপি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে দেখা যাইতেছে না। বাঙ্গালায় যাঁহারা বারস্ত্রী কর্ত্তৃক অভিনয়ের বিরোধী, তাঁহারা এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিবেন। বিশেষতঃ কলিকাতার মত স্থান, যেস্থানের রুচিতে বেশ্যাবৃত্তি-নিরতা ঠিকে চাকরাণী পুরস্ত্রীগণের সহিত থাকিতে পায়, সেখানে নটী কুলটা হইলে নীতি-বিরুদ্ধ হইবে না। স্ত্রীচরিত্র পুরুষে অভিনয় করিলে দৃশ্য অস্বাভাবিক হয় বলিয়া স্ত্রীলোক গ্রহণ করা হইয়াছিল। অধুনা কলিকাতার রঙ্গভূমিতে স্ত্রীলোকে পুরুষ সাজে; এ কুদর্শন সহ্য হইতেছে। রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত আমরা থাকিতে অক্ষম হওয়ায় কুঞ্চিকা আনাইয়া দ্বারের তালকোদ্ঘাটন করত বিদায় লইতে হইল।

এদেশের প্রাকৃত লোক মল্লযুদ্ধকে অতিমাত্র প্রিয় জ্ঞান করে। তাহারা নাটক অভিনয় দেখিতে যায় না। কুস্তি অবশ্য দেখিবে। রঙ্গস্থলে প্রবেশের মূল্য এক আনা বা দুই আনা। প্রবর্ত্তক জয়ীকে কিঞ্চিৎ অর্থ পুরস্কার দিয়া থাকেন।

নাট্যশালার দ্বারে নিবিড় জনতার মধ্য দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া অসংখ্য দর্শকের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল। একজন পঞ্জাবীর শিষ্যের সহিত এক মরহঠ্ঠার শিষ্য ক্রীড়া করিল। শেষোক্ত ব্যক্তি জয়লাভ করিবামাত্র তাহার ওস্তাদ সাগ্‌রিদকে লুফিয়া লইলেন ও গুম্ফে চাড়া দিতে লাগিলেন। আত্মীয় লোকেব সহিত অভিবাদন ও করমর্দ্দন হইতে লাগিল। কেহ জয়ীকে ব্যজন করিতেছে, কেহ বা অঙ্গের ধূলা মুছাইতেছে, তাহার আজ আহ্লাদের সীমা নাই। যে পরাভূত হইয়াছে, সে কোথায় লুকাইল, দেখিতে পাওয়া যাইতেছেনা। যখন উভয়ে মল্লভূমিতে অবতরণ করিয়া করস্পর্শ করিয়াছিল, তখন তাহদের হৃদয়ে বৈরভাব ছিল না। কিন্তু অবস্থা ব্যতিক্রমে একের পৃষ্টে পতিত হইয়া মুখে ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছে ও মনিবন্ধ দ্বারা প্রহার করিতেছে। দেখিলে জ্ঞান হয়, অনিচ্ছা সত্বেও ঘটনাচক্র মনুষ্যকে বিপথে লইয়া যায়। জেতার বন্ধুগণ তাহাকে সুপরিচ্ছদ ও জরির পাগড়ী পরিধান করাইযা বাদ্যোদ্যম সহকারে পুর মধ্যে লইয়া চলিল। এক্ষেত্রে কোনও উচ্চবর্ণের লোক দেখিলাম না। এই মহাপুরুষেরা বাঙ্গালায় যাইয়া বর্গির হেঙ্গাম করিতেন। ইহাদিগকে দলবদ্ধ দেখিলে রঘুজী ভোঁসলে ও ভাস্কর পণ্ডিতকে (১৭৪৩—৫১ খ্রীষ্টাব্দ) স্মরণ হয়। এই কুস্তি দেখার দিন প্রাতেঃ অত্যত্র প্রার্থনা সমাজে যাওয়া হইয়াছিল। অনারেবল রাও-সাহের মহাদেবগোবিন্দ রানড়ে আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। আমার পরিচিত একটি বাঙ্গালা ব্রহ্মসঙ্গীত মরাঠীতে গীত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম বাঙ্গালার বস্তু বলিয়া আমি প্রার্থনা সমাজে বসিয়া আত্ম গৌরব অনুভব করিলাম।

দাদোবা পাণ্ডরঙ্গ জাতিভেদ প্রভৃতি নিবারণ উদ্দেশে ১২ বার জন ছাত্রকে লইয়া পরম হংস সভা স্থাপন করেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার পর সামাজিক বিষয়ে তর্ক বিতর্ক হইত। পাঁউরুটি ভক্ষণ ও মুসলমানের হস্তে জল গ্রহণ করিতে হইত। ঐ সভার ভগ্নাবশেষ হইতে বোম্বাইয়ে প্রার্থনাসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে সভ্যেরা বিবেচনা করিয়াছেন, সামাজিক নিয়মে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। ধর্ম্মোন্নতি সাধন হইলে সমাজসংস্কার আপনি হইতে পারে। তাঁহারা বলেন, ধর্ম্মোৎকর্ষ, বিদ্যাবিস্তার, স্ত্রী শিক্ষা, গার্হস্থ্য প্রণালী সংশোধন হইলে, জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, চিরবৈধব্য প্রভৃতি আপনি উঠিয়া যাইবে। ইদানীং যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করিয়া থাকেন, নাসিক যাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করত তাঁহারা হিন্দুসমাজে গৃহীত হন। দুই একটি ব্রাহ্মণ বিধবা বিবাহ করিয়াছে, কিন্তু সমাজে তাহারা স্থগিত আছে। মহাদেব গোবিন্দ রানড়ের স্ত্রীবিয়োগ হইলে অনেকে আশা করিয়াছিলেন, ইনি কুমারী বিবাহ করিবেন না, কিন্তু সমাজ ভয়ে বিধবা বিবাহ করিতে পারিলেন না। রাজনৈতিক শিক্ষায় পুনা বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। যে মহাশয় সার্বজনিক সভার প্রাণ, সভ্য শ্রেণীতে

তাঁহার নাম নাই। রাজসদনে উক্ত সভা হইতে যে সকল আবেদনপত্র পাঠান হয়, তাহা উঁহার লিখিত। দেশ হিতকর কোন সমিতি বা অপর কার্য্যে যাইয়া যদি ইংলিশ রাজপুরুষ দেখিতে পান, তাহা হইলে অদৃশ্য হন। মনে করিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া সংস্কৃতের বিলক্ষণ চর্চ্চা দেখিতে পাইব। বেদ ধ্বনিতে কর্ণ পবিত্র হইবে। যজ্ঞীয় ধূমের দর্শনলাভ হইবে। ইংরাজ অধিকারে সে সমস্ত লোপ পাইয়াছে। "বেদত্তেজনী সভাকে" বেদপাঠীদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া পাঠানুরাগ বৃদ্ধি করিতে হইতেছে। সময়ে সময়ে এক এক জন বৈদিক ভ্রমণ করিতে আসিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া যান।

প্রভুজাতি এদেশের কায়স্থ। মদ্য মাংস ভক্ষণ ইঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কুক্কুট মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে। লেখা পড়া দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। শেনেবি ব্রাহ্মণও মৎস্য মাংস ভোজী। এদেশের বিদ্যাসাগর মহাশয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকর ও মৃত ভাউদাজী এই শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। চিত পাবন ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ক্যাম্বেল কহেন, মনুষ্যজাতির আদিম জন্মস্থান হইতে সরস্বতী ও সিন্ধু নদ বহিয়া সমুদ্রপথে এই জাতি কঙ্কন ভূভাগে আসিয়া আবাস স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের মধ্যে বাস না করায় অনার্য্য রক্ত সংমিশ্রণ হয় নাই। দেশস্থ প্রভৃতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা চিতপাবনদিগকে অধম বিবেচনা করেন। পেশয়া এই শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করায় কোকনস্থ ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। সহ্যাদ্রিখণ্ড নামক গ্রন্থে চিত পাবনদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু অপকর্ষ বর্ণিত থাকায়, বাজিরাও ঐ পুস্তকের তাবৎ খণ্ড নষ্ট করেন। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী চানক্য কোকনস্থ ছিলেন। কল্যাণ নামক স্থানে তাঁহার বাটী ছিল। রাজনীতিতে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ অত্যন্ত পটু। রাজা যে জাতির হউন, তরবারি তাঁহার হস্তে থাকুক, কিন্তু ব্রাহ্মণ মেধা ও লেখনীর বলে রাজ্যের শাসন কার্য্য গ্রহণ করিবেন। ইদানীং বোম্বাই রাজ্যে তাবৎ না হইলেও অধিকাংশ লিখাপড়ার কার্য্য এই জাতি দ্বারা সম্পন্ন হয়। শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্তা "লিওয়ার্নর" আজ্ঞা করিয়াছেন, পারদর্শিতা অনুসারে আর, না দেখিয়া নির্দ্দিষ্ট বৃত্তির এক ভাগ বিদ্যোপার্জ্জনবিমুখ কুনবি প্রভৃতি জাতির ছাত্রকে দেওয়া হইবে। সার্ব্বজনিক সভা অতি কঠোর ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই প্রতিবাদের উত্তর আরো কর্কশ হইয়াছে। ডিরেক্টর বলেন, সমস্ত লিখন পঠনের কর্ম্ম ব্রাহ্মণেরা একচেটিয়া করিয়া রাখিতে চায়। উহাতে হস্তক্ষেপ হইলেই ব্রাহ্মণ জাতির যন্ত্র পুনার দেশীয় সংবাদপত্রগুলি তার স্বরে চিৎকার আরম্ভ করে। সার্ব্বজনিক সভারও ঐ কর্ম্ম। হাই স্কুল নাম দিয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন হইয়াছে। প্রথম হইতে শেষ শ্রেণী পর্য্যন্তের সকল শিক্ষক গ্রাজুয়েট্। তাহাদের সংকল্প গবর্ণমেণ্টে চাকরি করিবেন না। এই বিদ্যালয়ে যাহা লাভ হইবে, তুল্যাংশ করিয়া গ্রহণ করিবেন। স্ত্রীজাতির কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা পূর্ব্বাপর প্রচলিত আছে। পণ্ডিতের ঘরের কন্যা হইলে অল্প সংস্কৃত পঠন অভ্যাস হয়। বোধ হয় এক বৎসর পূর্ণ হয় নাই, ইংরাজী শিক্ষার জন্য ফিমেল হাই স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক

বিতরণ উপলক্ষে মহা আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই সময় সয়াজীরাও গায়কয়াড় এখানে আগমন করেন। তাঁহার অভ্যর্থনা জন্য রেলওয়ে ষ্টেশন সজ্জিত করা, সার্ব্বজনিক সভা হইতে পান শুপারি দেওয়া প্রভৃতি নানা আয়োজন হইয়াছিল। ইংরাজগণ তাঁহাকে অধিকক্ষণ পান নাই। উক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভায় মাহারাষ্ট্র ভূপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, স্থিরীকৃত হইল। ইতি পূর্ব্বে স্কুল ইন্‌স্পেক্টর কর্ত্তৃক সে দিনকার সভায় কি কার্য্য হইবে, তাহার অনুষ্ঠানপত্র মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। ছাত্রিগণ কর্ত্তৃক ন্যাসনেল অ্যান্‌থম্ গীত হইবে লিখিত ছিল। ডিরেক্টর বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে কহেন, উক্ত সঙ্গীতের সময় সভাস্থ সকলকে ইংরাজী প্রথা অনুসারে মহারাণীর প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। তাহাতে অধ্যক্ষগণ কহিলেন, দর্শকদের মধ্যে বহুবৃদ্ধ ও স্ত্রীলোক হইতে পারে, তাহাদিগকে দণ্ডায়মান থাকিতে হইলে অত্যন্ত কষ্ট হইবে, সুতরাং "জয়শ্রী ভিক্টোরয়া" গান হইয়া কাজ নাই। নিয়মিত সময়ে সভায় যে অনুষ্টান-পত্র দেওয়া হইল, তাহাতে যে স্থানে সঙ্গীতের নাম ছিল, তাহা কাটিয়া দেওয়া হইলে। লিওয়ার্ণর তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উক্ত সঙ্গীতের এক অংশ গাওয়াইয়া তবে ছাড়িলেন, এবং গভর্ণমেণ্টে এসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ঋগ্বেদের মরঠী অনুবাদক (বেদার্থযত্ন সম্পাদক) ও হাই কোর্টের অনুবাদক শঙ্কর পাণ্ডারঙ্গ পণ্ডিত ন্যাশনল আন্‌থম্ গীত হইবার কথা মসিদ্বারা কর্ত্তিত করিয়াছেন বলিয়া রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন। লিওয়ার্ণর কহিলেন, গায়কবাড়কে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এই কর্ম্ম করিয়াছ। মহারাষ্ট্রীয়েরা কহিলেন, "জয়শ্রী ভিক্টোরিয়া" গীত ন্যাশনেল অ্যানথমের অনুবাদ নহে। উহা দিল্লীর দরবার উপলক্ষে রচিত হইরাছে, অতএব সে স্থলে দণ্ডায়মান হইবার প্রথা রক্ষা না করা দূষ্য হইতে পারে না। গুজরাতিরাও কহিলেন "রাণী জীনো ছন্দ" গাইবার কালে শ্রোতৃবর্গকে দাঁড়াইতে হয় না। এই বিতণ্ডা সমাধানের জন্য বিক্টোরিয়া গীতিকা ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বোধ হওয়ায় কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এ বিষয়ে বহু বাদানুবাদ হইল, তথাপি শঙ্কর পাণ্ডারঙ্গ কর্ম্ম পাইলেন না।

শ্রীদুর্গাচরণ ভূতি।

যাহোক্ বিধান।

"I embrace the purpose of God, and the doom assigned."

—*Tennyson.*

(১)

যে জগতে জীব-গোষ্ঠি কোটি পরিমিত,
জগৎ যেখানে অণু, সৃষ্টি তুলনায় ;
সে বিশ্বে, হে নারায়ণ,
আমার কি প্রয়োজন ?
দাঁড়ায়ে সৃষ্টির কূলে হৃদয় স্তম্ভিত,
আমি কারে চাই প্রভু, কে আমারে চায় ?
কাহার সেবার তরে,
হৃদে অনুরাগ ঝরে ?
এত প্রীতি ভালবাসা কাহার আশায় ?
আমি কারে চাই হরি, কে আমারে চায় ?

(২)

কিবা মোহ মেখে বুকে,
বেঁচে থাকি কিবা সুখে,
কেন হাসি কেন কাঁদি বুঝিতে না পাই।
জীবনের মহোৎসবে,
কোথা হোতে এলো সবে ?
আমিতো কাহারে প্রভু, ডেকে আনি নাই ?
কে সাজায় এসংসার,
কে সাজায় পরিবার ?
কি ছার সুখের আশে বল সদা ধাই ?
কেন হাসি কেন কাঁদি বুঝিতে না পাই।

(৩)

জীবনের এ আহবে,
শেষ ফল কিবা হবে ?
শেষ মৃত্যু ;—তার পর কি রবে আমার ?
দীক্ষিত কর্ত্তব্য পথে,
শিক্ষিত জীবন ব্রতে,
এ মোর হৃদয়, প্রভু, কিবা হবে তার ?
ফুরাবে কি কান্না হাসি,
নিবিবে আলোক রাশি,
যাবে সুখ যাবে দুঃখ, আলোক আঁধার ?
শেষ মৃত্যু—তারপর কি রবে আমার ?

(৪)

স্বপ্ন যদি সুখ ভোগ,
স্বপ্ন যদি পরলোক,
স্বপ্ন যদি, স্বপ্নরাজ্য করিছে বিস্তার ;
কেন তবে ভুলে থাকি,
কেন বা জীবন রাখি ?
কেননা আপনি করি আপনা সংহার ?
হাসি বিসর্জ্জিব হেসে ?
স্নেহ প্রীতি যাবে ভেসে ?
যাবে ডুবে হৃদয়ের কামনা আমার ;
স্বপ্ন যদি, স্বপ্ন রাজ্য করিছে বিস্তার ?

(৫)

হোক্ স্বপ্ন, হোক্ মায়া,
হোক্ ভ্রান্তি, হোক্ ছায়া,
তবুও বাঁচিতে চিতে অপার বাসনা।
চক্ষু জলে গণ্ড ভাসে,
বক্ষ কাঁপে দুঃখ ত্রাসে,
তবুও ঘোচেনা যেন প্রাণ উপাসনা।
কর্ম্ম অন্তে অনুতাপ
পাদক্ষেপে বাড়ে পাপ
প্রতারিত আশায় সে লোলুপ রসনা ;
তবুও বাঁচিতে চিতে অপার বাসনা।

(৬)

ইচ্ছা তব ইচ্ছাময়,
ক্ষুদ্র কীট (ও) বেঁচে রয় ;
হোক্ তব ইচ্ছা পূর্ণ আমিও বাঁচিব।
কিন্তু প্রভু, কিবা লক্ষ্যে,
রয়েছি ধরণি-বক্ষে ?
একবার সেই কথা কহগো শুনিব।
নতুবা জীবন ব্রতে,
গুরু কর্ত্তব্যের পথে,
আঁধারে হারায়ে পথ কেমনে চলিব ?
হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ আমিও বাঁচিব।

(৭)

দুঃখ শোক যত হোক্,
নাই থাক্ পরলোক,
যা হোক্ তা হোক্ বিধি তোমার বিধান ;
তাই মাথা পেতে লই,
দুঃখেই বাঁচিয়া রই,
নাই বুঝি, কি লক্ষ্যের করিছি সন্ধান ;
তোমারি, তোমারি রাজ্যে,
আছি প্রভু তব কার্য্যে,
হোক্ মৃত্যু, হোক ক্লেশ, বিনাশ, নির্ব্বাণ,
যা হোক্ তা হোক্ বিধি তোমার বিধান।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

ভারত কন্‌গ্রেস্‌ ইংলণ্ডের ক্রোড়ে।

"Well begun is half won.'

১৪ই এপ্রেল ১৮৯০, ভারত ও ইংলণ্ড উভয় দেশের পক্ষে বিশেষ আনন্দ ও গৌরবের দিন।" পৃথিবীর ইতিহাস লেখকগণ স্বর্ণাক্ষরে লিখুন যে, এই শুভদিনে ভারতের হৃদয়রাজ্যে ইংলণ্ডের উজ্জ্বল সিংহাসন চিরদিনের জন্য স্থাপিত হইবার সূত্রপাত হয়। আমাদের জাতীয় কন্‌গ্রেস এতদিন গর্ভাবস্থায় হাত পা নাড়িতেছিল, আজ প্রসূত হইয়া সংসারের আলোক দেখিল।" গর্ভ মধ্যে ভ্রূণজীবন নষ্ট হইবার অনেক আশঙ্কা থাকায় আমরা সর্ব্বদা সশঙ্কিত ছিলাম; এখন আর ভয় নাই; স্বাধীনতার জননী শ্বেতদ্বীপ স্বয়ং ধাত্রীরূপে নব প্রসূত শিশুর পোষণের ভার গ্রহণ করিলেন। এস ভাই ভারতবাসি, আজ এই মহানন্দের দিনে প্রাণ ভরিয়া কোলাকুলি করি, এবং অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া সুগভীর রবে তিনবার বলি, "জয় দয়াময়!" "জয় দয়াময়!" "জয় দয়াময়!" ঘরে বাহিরে প্রবল শত্রু সত্ত্বেও যাঁহার কৃপায় প্রাণের কন্‌গ্রেস ইংলণ্ডের নগর সুপটুও পালনক্ষম হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তাঁহার করুণার সীমা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করে সাধ্য কাহার? বিধাতার অনন্ত দয়ার প্রভাব আমাদের ন্যায় হতভাগা জীবগণের একমাত্র সম্বল ও ভরসাস্থল। তাই বলি ভাই, "দুর্ব্বলে সবলে যাঁর, অবারিত কৃপাদ্বার, নিরাশ না হবে কেহ, রাখরে নির্ভর তাঁতে।" ভারতের দুঃখ বিমোচন জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহ করিতে পারেন না।

"ভগবান বিচার করিবেন," এই গভীর মর্ম্মভেদী জীবন্ত নির্ভরশীলতা ভিন্ন কাঙ্গাল অসহায় ভারতবাসী আর কোন উপায় জানে না। রাজপুরুষের উৎপীড়ন, জমীদারের উৎপীড়ন, গ্রামের ভদ্র লোকদের উৎপীড়ন, উৎপীড়নের উপর উৎপীড়ন সহ্য করিয়া 'রাইয়ত' চলিয়া যাইতেছে, একটী শব্দ নাই, প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা নাই; ভারতে গরিব দুঃখী "চাষাভুষোর" সহিষ্ণুতার নিকট মেষশিশুও সময়ে সময়ে পরাস্ত হয়। চারি কোটী জীব, যাহারা আমাদের ভরণপোষণ, সুখ সচ্ছন্দতা, আরাম আমোদের জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও দিনান্তে একবার বই দুই বারকার শাকান্ন জুটাইতে পারে না; সহস্র অত্যাচারেও যাহাদের মুখে রা নাই; দুর্ভিক্ষ কালে অন্নাভাবে সপরিবারে প্রাণ দিবার পূর্ব্বেও একবার রাজা জমীদার বা মহাজনকে অভিসম্পাত করিতে জানে না, কেবল মাত্র বিধাতার বিধানের দিকে তাকাইয়া দুর্লভ মানবজীবন বিসর্জ্জন করে; আমরা তাহাদের প্রতি উদাসীন,—একথা শুনিয়া ইংরেজ শিহরিয়া উঠেন, "shame" "shame" ধ্বনি দ্বারা ধিক্কার দেন। বাস্তবিক যে দেশে এত অধিক সংখ্যক নিরীহ, শান্ত-সেবক শ্রমজীবীর এরূপ দুর্দ্দশা, সে দেশ রসাতলে যায় না কেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। মহারাজা! রাজা! রায় বাহাদুর! বাবুগণ! ক্ষীর-সর-নবনীত ভোজনে মেদবৃদ্ধিকরত আলস্যের ক্রীতদাস হইয়া সুগন্ধচর্চ্চিত সুকোমল শয্যায় সুখে নিদ্রা যাইতেছ; একবার ভাব না যে,

তোমাদের ভীষণ অত্যাচারে ভিত্তি ক্রমে ফোঁপ্‌রা হইয়া আসিতেছে; কোন দিন সপ্ততল অট্টালিকা হীরা-মাণিক-মুক্তা-কোম্পানির কাগজভরা লোহার সিন্দুক সহ ঝুপ্ করিয়া তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়া পড়িবে। আর্য্যানার্য্য প্রভেদের কাল নাই, কলিযুগের আর্য্য ইংরেজ, আর তোমরা সবাই সমান অনার্য্য, সুতরাং গরিব, দুঃখী, চাসা, শ্রমজীবী সকলকে আপনার জাত্‌ভাই মনে করিয়া নিজের কল্যাণের ন্যায় তাহাদের কল্যাণে যত্নবান হও; নচেৎ ভদ্রত্ব নাই। উল্লিখিত নির্ব্বাক আত্মত্যাগীদিগের (Martyrs) অন্তর্বেদনা বিশ্বেশ্বরের সিংহাসন পার্শ্বে পৌঁছিয়াছে; ইহাদের দুঃখ ক্লেশ দূরীকরণ জন্যই কন্‌গ্রেসের আবির্ভাব; হোমরা চোম্‌রা বাবুদের রাজদরবারে বিপুল ক্ষমতা হইয়া নিরক্ষর শ্যালক পুত্রকে ডিপুটিগিরি জোগাড় করিয়া দিবার জন্য নয়। ভাই সরল কৃষক! তোমার জন্য চক্ষের জল ফেলে, তোমার প্রকাণ্ড দেশে এমন কেহ নাই, কিন্তু এখানে আছে; সহ্য কর, ভগবান্ অবশ্য দিন দিবেন। ভারতোদ্ধার-ব্রতধারী মহামনা কন্‌গ্রেসাবতার দয়াল হিউম যখন দেশের চারি কোটী ব্রিটীশ প্রজার অন্নবস্ত্রাভাবের কথা ইংরেজমণ্ডলীর গোচর করিলেন, সাধারণ মজুর পর্য্যন্ত "ছি! ছি! ছি! ছি!" করিয়া উঠিল।

কনগ্রেসের সাহার্য্যার্থে ইংলণ্ডে প্রথম সভা।—বিগত ১৪ই এপ্রেল সোমবার দিবস লণ্ডনের অন্তর্গত Clerkenwell পল্লিস্থ Foresters' Hall গৃহে রাত্রি ৮৷৷০ সাড়ে আট ঘটিকার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভাপতি Sir William Wedderburn আন্দাশীর ভাবে যথাবিহিত মিষ্ট কোমল স্বরে এই কয়েকটী কথা "The humblest Roman citizen had the right of appeal to Cæsar, and in India a considerably larger population than that of the Roman Empire now desire to appeal to their Cæsar, the sovereign British people." * দ্বারা ভূমিকা করিয়া সংক্ষেপে ভারতের অভাব, কনগ্রেসের মহৎ উদ্দেশ্য ও তৎপ্রেরিত উপস্থিত প্রতিনিধির পরিচয় দিয়া দিলে বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথাসাধ্য পরিস্ফুট ভাষায় তাঁহার কর্ত্তব্য সাধন করিলেন। "Righteousness exalteth a nation":—কেবল পুণ্য প্রতাপ জাতীয় উন্নতির কারণ। এবং "No taxation without representation.":—প্রজা প্রতিনিধির সদ্ভাব ব্যতীত কর নির্দ্ধারণ অন্যায়।—এই দুইটী মৌলিক সূত্রের উপর দাঁড়াইয়া শ্রোতৃবর্গের সাহায্য যাচিত হইল। প্রথমটী "বলং বলং ব্রহ্ম বলং," ধর্ম্ম রাজ্যের কঠোর সত্য; জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিহাস তাহার জীবন্ত সাক্ষী। জনবুল এই মহা সত্য বিলক্ষণ জানেন ও বুঝেন। সভা ভঙ্গের পর জনৈক প্রবীণ ইঙ্গ-বঙ্গু স্পষ্ট বলিলেন, "It is not policy, or extent of dominion, or supremacy on land

* অতি সামান্য রোমান প্রজাও তাহাদের সম্রাট সিজারের নিকট আবেদন করিতে অধিকারী ছিল। রোমান সাম্রাজ্য অপেক্ষা বহু পরিমাণে অধিকসংখ্যক ভারতবর্ষীয় প্রজা আজ তাহাদের সিজার, সর্ব্বময় কর্ত্তা, ব্রিটনবাসীর নিকট দুঃখ জানাইয়া অভিযোগ করিতে উপস্থিত।

and on sea, that is the stability of a nation; but righteousness." :—কল কৌশল, রাজ্য বিস্তার, বা জলে স্থলে একাধিপত্য জাতীয় সমৃদ্ধি অটুট রাখিতে না, কেবল পুণ্যবল পারে। আর একজন বলিলেন, "It is only in righteousness that the throne of kings is established." :—কেবল মাত্র পুণ্য তেজে রাজার সিংহাসন দৃঢ়রূপে স্থাপিত হইয়া থাকে।

বন্দ্যো মহাশয়ের পরে সুবিখ্যাত দেশ-হিতৈষী বৃদ্ধ দাদা ভাই নাওরোজি শান্ত সমাহিত ভাবে কিছুক্ষণ বলিলেন। ক্রমান্বয়ে পাঁচ ছয় জন ইংরেজ ও অবশেষে প্রসন্ন বদন প্রশস্তাত্মা মহামতি হিউম দুই চারি কথায় হৃদয়ের গভীর সহানুভূতি প্রকাশানন্তর দুঃখ-প্রপীড়িত ভারতের প্রকৃত অবস্থা ও অভাব সভার গোচর করিতে চেষ্টা পাইলেন। বক্তৃতাদির মধ্যে "Black man" কথা লইয়া সচিব প্রধান সল্‌সবারি (Marquis of Salisbury) মহাপ্রভুকে অনেকবার বিদ্রূপ করা হয়; এক জন বলিলেন, "Perhaps the noble Marquis has not used a looking-glass for the last ten years, as otherwise he would have known which of them is the darker." (বোধ হয় মারকুইস মহাত্মা দশবৎসর হইতে দর্পণ ব্যবহার করেন নাই, নতুবা দেখিতে পাইতেন, উভয়ের মধ্যে কে অপেক্ষাকৃত শ্যামবর্ণ।)। বাস্তবিক দাদা ভাইকে ইউরোপীয় বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। অনেক ইংরাজকেও একথা বলিতে শুনিয়াছি। যাহা হউক, পল্লিস্থ প্রজাবর্গের উঁহার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ পাইল। ইহা আমাদের সুখের বিষয়।

প্রচণ্ড উৎসাহ ও বিশেষ আনন্দের সহিত সভা দ্বারা নিম্নলিখিত নির্দ্ধারণ স্থিরীকৃত হইল। ইহা পরম শুভ চিহ্ন জানিতে হইবে। কৃপা ভগবানের।

RESOLVED

"That this meeting of the inhabitants of the Finsbury Division and its neighbourhood, having heard the grievances of the Indian people stated by representative Indians and by others, and having had laid before it the reforms put forward by the Indian National Congress, declares that in its opinion the grievances from which our Indian fellow subjects are suffering should be removed, and believes that the reforms advocated by the Congress will be greatly helpful to this end. This meeting therefore expresses its most cordial sympathy with the efforts which, by its constitutional means, the Indian people are making to obtain the redress of their grievances through the good will and help of the British people; and those present pledge themselves, by every means in their power, to move the British Parliament to grant the reforms so temperately and so forcibly advocated.

That this meeting authorises the chairman to sign a petition for presentation to the House of Commons, praying that House to allow of the insertion in the Indian Councils' Bill of a section permitting the election of one half of the members of the Supreme and Provincial Legislative Councils, and of a large increase in the numbers of the respective Councils."

অর্থাৎ সভাস্থ প্রজাবর্গ ভারতের দুঃখ মোচন জন্য পার্লামেণ্টে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে বাক্‌বদ্ধ হইলেন। আমাদের দগ্ধ অদৃষ্টের পক্ষে ইহা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে; এবং প্রথম উদ্যোগে এরূপ আশা পাওয়া, প্রবল উৎসাহের কথা সন্দেহ নাই।

ইহাতে সুলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে, জানিতে হইবে।

যত লোকের সহিত এবিষয়ে আলোচনা হইয়াছে, দুই জন ভিন্ন কাহাকেও কোন আপত্তি করিতে শুনি নাইঃ—এক ব্যক্তি জড়বুদ্ধি বৃদ্ধ রক্ষণশীল (conservative), অপর ভারত-ফেরত বোম্বাই প্রদেশের জনৈক ভূতপূর্ব্ব কমিশনর। প্রথমের আপত্তি, ভারতে নানা জাতি ও নানা ধর্ম্ম সত্বে পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব অনিবার্য্য; এক্ষেত্রে প্রজার হস্তে কোন প্রকারের কোন ক্ষমতা বা ভার দেওয়া অসঙ্গত, অন্যায় ও অহিতকর, মুসলমান সম্প্রদায়ের বিপক্ষতা বিশেষ বিবেচ্য; সুতরাং বর্ত্তমান ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকাই বিধেয়। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলেন, অতি সামান্য সংখ্যক শিক্ষিত লোক ব্যতীত সমস্ত প্রজা পশু (brute) বলিলে দোষ হয় না; তাহাদের পক্ষে "নির্ব্বাচন" "ভোট" ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝিতে এখনও বহুকাল বাকী। উদাহরণ স্বরূপ বলিলেন, কয় বৎসর হইল সুরাটের লোকাল বোর্ড (Local Board) নির্ব্বাচনের সময় ভোটের জন্য গরুতাড়া করিয়া মামলতদারগণকে প্রজা (voter) একত্র করিতে হয়; সে দৃশ্য মনে পড়িলে এখনও হাসি পায়। উভয়ের আপত্তিই প্রবল; সম্যক খণ্ডন করা সহজ নয়। এ অবস্থায় ঘর ঠিক করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। যদি কেহ বলেন, যদি ঘরই ঠিক করা যাইবে, তবে বিদেশীয়ের মুখাপেক্ষার প্রয়োজন কি? ইহারও উত্তর দেওয়া কঠিন। সুতরাং এই খানে বিজ্ঞ পণ্ডিতের মত উল্লেখ করিয়া নিস্তব্ধ হইতে হইল।

"It is the beginning of a movement which our generation will not see the end of, but which must be fraught with momentous consequences for England and India alike. Whether they shall prove alike happy for both lands, or shall be disastrous to either or to both, depends upon the wisdom, patience, and forbearance, which are mutually practised.

* * * *

We English people have now such an opportunity as no other people has ever had of setting to the world an example of high minded, disinterested, straight dealing. Upon the way in which we meet the demands of India, upon the plan we adopt for the future government of the Empire, upon our justice, patience, and temperance, during the next few short years, not only the future of India but that of England herself, and, in no small measure, of the civilized world, depends. In this matter our national honour is deeply pledged. Our lot is in our own hands. God grant that we may be wise and just whilst yet there is time!"

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

ভুলি।

অনেকেই জানেন, আমাদের মধ্যে বাঘভুলি শব্দ দ্বারা কি বুঝাইয়া থাকে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি বিড়াল জাতীয় জীবের লোম যে অধিক পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন, তাহাও বোধ হয় বিজ্ঞান শিক্ষার্থী মাত্রেই অবগত আছেন। এই বিপুল বৈদ্যুতিক শক্তি দ্বারা হিংস্র জন্তুগণ তাহাদের ভক্ষ্যজীবগণকে আচ্ছন্ন করিয়া আয়ত্তাধীন করে, বা

অন্য কোন অজ্ঞাত শক্তি তাহার কারণ, সে বিষয়ের বিচার বা অনুসন্ধান, এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়। বৈজ্ঞানিক সুপণ্ডিত মহোদয়গণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ কতকগুলি প্রকৃত ঘটনা পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা বৃত্তির উত্তেজনা করাই অভিপ্রায়।

ডাক্তার বার্ড (Dr. Bird) বলেন ঃ— আমেরিকায় দুইটী বালক বনে ভ্রমণ করিতে করিতে একটা বৃহৎ কৃষ্ণসর্প দেখিতে পায়। উক্ত বিষধরের বিখ্যাত মোহিনী শক্তি পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে এক জন তদ্দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া উহার পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। বালককে ঐ অবস্থায় দেখিয়া সর্প সতেজে মস্তকোত্তোলন করিয়া তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। বালকের বর্ণনানুসারে, রৌদ্রে আরসি ধরিলে যেমন একটা তীব্র আলোক প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ ঝকমকে একটা জ্যোতি যেন তাহার চক্ষে পড়ে। * তদ্দ্বারা তাহার চক্ষু ঝলসাইয়া গেলেও সঙ্গে সঙ্গে এমন মনোহর বর্ণ সমূহের সমাবেশ সম্মুখে শোভমান হয় যে, সে সৌন্দর্য্য-বিমুগ্ধ ভাবে অজ্ঞাতসারে নাগের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে, এবং প্রত্যেক পাকে তাহার নিকটতর হইতে থাকে। এই ব্যাপার দেখিয়া দুরন্ত মানুষ দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে ধরে ও সর্পকে গুলি করিয়া মারে।

পণ্ডিতবর কাম (Professor Kalm) বলেন, উত্তর আমেরিকার ঝুনঝুনি সর্প (rattle snake),গাছের তলা হইতে শাখাস্থ কাষ্টমার্জ্জারকে আচ্ছন্ন করে। সর্প উহার দিকে দৃষ্টি স্থির করিলে আর উহার পলাইবার ক্ষমতা থাকে না ; শোক-সূচক চিৎকার করিতে করিতে গাছের উপর দিকে কিছু দূর উঠিয়া আবার নীচে নামে ; ক্রমাগত এইরূপ করিতে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকবার কিছু কিছু করিয়া নীচের দিকে অগ্রসর হয়। এ যাবৎকাল সর্প আপন আসন ও শিকারের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া এরূপ সংযত (concentrated) চিত্তাবস্থায় থাকে যে, মানুষ কাছে দাঁড়াইয়া ভয়ানক শব্দ করিলেও তাহাকে এক তিল বিচলিত করিতে পারে না। অবশেষে কাঠ বিড়াল লাফাইয়া নীচে পড়ে এবং আর একবার মর্ম্মভেদী চিৎকার করিয়া দ্রুতগতিতে সর্পের ব্যাদনীকৃত মুখের ভিতর প্রবেশ করে।

ফরাসি প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কাতেস্বি (Mark Catesby) তৎপ্রণীত কারলিনা প্রভৃতি দেশের বৃত্তান্তে বহু শ্রেণীর পর্য্যটকের প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, নানাবিধ ক্ষুদ্র জীব বিশেষ পক্ষী ও কাঠবিড়াল অনেকস্থলে উল্লিখিত রূপে সর্প দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। ইহার বহু পরে সুইডেন দেশীয় সর্প বিদ্যাবিশারদ আক্রেল (John Gust of Acrell) তাঁহার Morsura Serpentum নামক গ্রন্থে উক্ত বিষয় সম্যক সমর্থন করিয়া একটী নূতন উদাহরণ দিয়াছেন। একটা

* এডিনবরা (Edinburgh) বিশ্বদ্যিালয়ের ভূতপূর্ব্ব রসায়ণ শাস্ত্রাধ্যাপক ডাক্তর গ্রেগরি (William Gregory M. D. F. R. S. E) বলেন, জর্ম্মন পণ্ডিত রাইখেন বাখের (Professor Reichenbach) সুপ্রসিদ্ধ গবেষণার বহুপূর্ব্বে সংসার জানিত যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় দেহগত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এরূপ জ্যোতি (Mesmeric or Odylic light) বাহির হয়। সম্ভবতঃ সর্প তাহার দ্বারা

ঝুনঝুনি সর্পের লৌহ পিঞ্জর মধ্যে একটী মূষিককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহা প্রথমে সর্পের বিপরীত দিকের কোণে আশ্রয় গ্রহণ করে। পরে সর্প ভয়ঙ্কর তেজের সহিত তাহার উপর দৃষ্টি স্থির করিলে কম্পমান ইঁদুর লম্ফ প্রদান করত ফণীর মুখ মধ্যে আত্ম বিসর্জ্জন করে। লসন (John Lawson, Surveyor General of North Carolina) উত্তর কারলিনার বিবরণে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঝুনঝুনি সর্পের দ্বারা কাঠবিড়ালকে বিমুগ্ধ ভাবে আকৃষ্ট. হইতে তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

ফর্ব্‌স্ (Captain Forbes) Dahomey and the Dahomans গ্রন্থে বলেন:— আফ্রিকার অন্তর্গত আহোমী প্রদেশের ঘাসের জঙ্গলে তাঁহার পায়ের একেবারে নিকটে একটা গিরগিটীর ন্যায় সরীসৃপ মন্ত্রমুগ্ধ ভাবে স্থির দৃষ্টিতে স্থিত দেখিতে পান; এরূপ সংজ্ঞাহীন যে তিনি অতি নিকটে যাওয়াতেও একটু মাত্র নড়িল না। সেই মুহূর্ত্তেই একটা গোখুরা সাপ তাহাকে ছোবল মারিয়া লইয়া গেল।

পাদ্‌রি ইলিস(Ellis)তাঁহার Three visits to Madagascar নামক গ্রন্থে পুলেন সাহেবের (Farmor Mr. Pollen, ইনি অনেক দিন মাদাগাস্কার দ্বীপে কাটাইয়াছিলেন) বর্ণনানুসারে প্রকাশ করিয়াছেন,—তাঁহার ক্ষেত্রে একদা একটী মূষিক অনতিদূরে একটা বিষধর সর্প দেখিতে পায়; দৃষ্টিমাত্র স্থির হয় এবং সর্প তাহার দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিলে কাঁপিতে কাঁপিতে ও চিৎকার করিতে করিতে তদ্দিকে ধীরে ধীরে চলিতে থাকে; পরে একেবারে নিকটে উপস্থিত হইয়া অবসন্নভাবে অচল হয়, এই সময় সর্প তাহাকে গ্রাস করে। আর এক সময়, এইরূপ গ্রস্ত একটী ইঁদুরকে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রাস করিবামাত্র যষ্টি দ্বারা সর্পপৃষ্ঠে আঘাত করিলে ফণী মুখব্যাদন করত আহারকে ত্যাগ করে; শত্রুমুখ হইতে নির্গত মূষিক কিছুদূর দৌড়িয়া গিয়া অবসন্ন হয়, কিন্তু এক মিনিট কাল পরেই সুস্থ হইয়া পলায়ন করে। সুদ্ধ ভয়ে আচ্ছন্ন হইলে এরূপ নির্গমন ও পলায়ন অসম্ভব।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিৎ ডাক্তার স্মিথ(Dr. Andrew Smith) বলেন, তিনি নিজে এরূপ অনেক ব্যাপার প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা রীতিমত গবেষণা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, কোন অবর্ণনীয় শক্তি দ্বারা এক জীব আর এক জীবকে আচ্ছন্ন করত আকর্ষণ করিতে পারে। তাহার একটী উদাহরণ এই:— (Bucephalus capensis) পাখী ধরিবার জন্য সচারচর বৃক্ষারোহণ করে, উহাকে দেখিবামাত্র বৃক্ষস্থ বিহঙ্গ সমূহ তাহার চারিদিকে জড় হইয়া ব্যস্ততা প্রকাশ ও চিৎকার করিতে থাকে এবং দলমধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আচ্ছন্ন, সেইটী সর্পের মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। এযাবতকাল ভুজঙ্গ সমস্ত শরীর ডাল জড়াইয়া, আধ হাত, তিনপোয়া মস্তক উন্নত করত মুখব্যাদন করিয়া স্ফীতকণ্ঠে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে থাকে।

তাঁহার Zoology of South Africa তে ডাক্তার স্মিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষীকৃত এই পক্ষী-সর্প ব্যাপার ব্যতীত মৃগাদি চতুষ্পদ জন্তুগণকে কুম্ভীর দ্বারা এই প্রকারে আচ্ছন্ন ও বিনিষ্ট হইতে শুনিয়াছিলেন। ফরাসি পণ্ডিত Le Vaillant তাঁহার Disc-

aux d' Afrique পুস্তকে সর্পদ্বারা এবম্প্রকারে মূষিক ও পক্ষী নাশের কতিশয় উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডন নগরস্থ জুওলাজিকাল বাগানে একটী বিষয় ঔষধীর পরীক্ষা হেতু ইবান্স সাহেব (D. F. Evans) দ্বারা কতকগুলি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতে যতদূর যত্ন ও সতর্কতা আবশ্যক, তাহা অবলম্বন করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার রিপোর্টে জানা যায় যে, শিকারের পলাইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা না থাকিলেও সর্প উন্নত-শির-গ্রীবায় আসন স্থির ও ফণা বিস্তার পূর্ব্বক দণ্ডেক কাল তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দ্বারা আহারীয় জীবকে নিস্পন্দ না করিলে আঘাত করেনা। আর শিকার (ছোট ছোট গিনিশূকর, খরগোশ, ইঁদুর প্রভৃতি ; তন্মধ্যে কেহ কেহ হয়ত ইতি পূর্ব্বে সর্প কখন দেখে নাই) খাঁচার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দুঃখব্যঞ্জক চিৎকার ও চঞ্চলতা প্রকাশ করে ; পরে সর্প দৃষ্টির অধীন হইলে জড়বৎ নিস্পন্দভাব অবলম্বন দ্বারা আত্মত্যাগ করে। Zoologist পত্রে সর্প সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত আছে। অন্যান্য জন্তুর বিষয় কিরূপ প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, দেখা আবশ্যক।

১৮৩৬ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসের Bengal Sporting Magazine পত্রে উত্তর পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত গোরক্ষপুর হইতে একজন সাহেব লেখেন,—বাঙ্গালায় একটা মধ্যমাকৃতির গিরগিটি কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া একটী প্রজাপতি ক্রমে ক্রমে তাহার মুখ মধ্যে প্রবেশ করে। যে ভাবে সরীসৃপ স্থির দৃষ্টি দ্বারা উড্ডীয়মান পতঙ্গকে আপন আয়ত্তাধীনে আনিয়াছিল, তাহাতে লেখকের মনে সেই অবধি ভুলি সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ থাকে নাই। আমরাও দেশে অনেকবার দেখিয়াছি, ঘরের দেয়ালে টিকটিকির দ্বারা মাছি এই রূপে আক্রান্ত হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশস্থ নাগপুর নগরে ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে হণ্টর সাহেব (Robert Hunter) ও তাঁহার বন্ধু পাদরি হিস্লপ (Rev. His lop) দ্বারা পরিদৃষ্ট একটী ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ Zoolozist পত্রিকায় প্রকাশ হয়। তাহাতে বিচ্ছুর (কর্কট) দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া তিন চারিবার পতন ও উত্থানের পর একটী প্রকাণ্ড ডাঁশ মক্ষিকা শত্রু গ্রাসে আত্ম সমর্পণ করে।

অর্মিন (Ermine- উদ্‌বিড়ালের মত জীব) কর্ত্তৃক খরগোশাদি ও খেঁকশেয়ালি কর্ত্তৃক কুক্কুটাদি এরূপ প্রকারে বিনষ্ট হওয়ার বৃত্তান্ত অনেক আছে। বণ্ড সাহেব (Henry Bond) Zoologist পত্রিকায় প্রকাশ করেন ;—একদা ইংলণ্ডের অন্তর্গত সোমারসেট শায়ারস্থ পেনবেক (Penbeck) গ্রামে বিচরণ করিতে করিতে (১৮৬০ অব্দে) কোন ক্ষুদ্র জন্তুর চিৎকার শুনিতে পান এবং শব্দের অনুগমন করিয়া দেখেন, অর্মিন কর্ত্তৃক আচ্ছন্ন হইয়া বিকৃত ধ্বনি করত একটী রাবিট (rabbit) তাহার চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে ; এবং প্রত্যেক পাকে নিকটতর হইতেছে ; এবং উহার গতির সঙ্গে সঙ্গে অর্মিনও মাথা ঘুরাইয়া শিকারের প্রতি দৃষ্টি ঠিক রাখিতেছে। সাহেব হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা সজোরে মৃত্তিকায় আঘাত করাতে যাদুকরের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়া যাদুভঙ্গ হওয়ায় রাবিট বেচারি তৎক্ষণাৎ সোজা দৌড় মারিয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

উক্ত পত্রিকায় গর্ণি সাহেব (J. H. Gurney)প্রকাশ করেন;—কোন সময়ে স্বর্ণ ইগল (Golden eagle) পক্ষীর খাঁচার মধ্যে একটী রাবিট ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রবেশ মাত্র ইগল তাহার প্রতি দৃষ্টি স্থির করিলে রাবিট পক্ষীর প্রতি চক্ষু রাখিয়া চারিদিকে ঘুরিতে থাকে ও ক্রমে নিকটস্থ হয়। ইগলও আপন আসনে ঠিক থাকিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে। একেবারে সম্মুখে উপস্থিত হইলে রাবিট পশ্চাৎপদে দাঁড়াইয়া পক্ষীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এই সময়ে লোভপরবশ ইগল তাহার উপর ঝম্প প্রদান করিলে যাদু ভঙ্গ হয় ও রাবিট প্রাণ ভয়ে বিপরীতদিকে দৌড়ে; কিন্তু খাচায় আবদ্ধ, সুতরাং ইগল হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।

পতঙ্গের অনলে পতন কাহারও অবিদিত নাই। অগ্নির শোভা যে পতঙ্গকে আচ্ছন্ন করিয়া আকৃষ্ট করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরোক্ত ঘটনাবলীর সহিত আলোক বা বহ্নি-ভুলির কোন সংশ্রব আছে কি না, বলা যায় না; কিন্তু ক্ষুদ্র টিট মাউস (Titmouse) পক্ষী ও বৃহৎ হেরিংগল (Herring-gull)আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়াছে, এদেশের পত্রাদিতে এরূপ প্রকাশ আছে। স্কটলণ্ড দেশের সমুদ্র তীরস্থ বেলরক (Bellrock) বাতিঘরের (Light house) দীপ একদা হেরিংগল কর্ত্তৃক চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, এবং এক খণ্ড বেলওয়ার গলায় প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহার মৃত্যু হয়।

যে ভাবেই আচ্ছন্ন হইয়া এক জীব অন্যের মুখে পতিত হউক, হিংস্র জন্তু দ্বারা আক্রান্ত হইলে মৃত্যু কালীন যে কোনরূপ দুঃখ উপস্থিত না হইয়া বরং এক প্রকার আমোদদায়ক অবসন্ন ভাব ("pleasurable paralysis of the animal powers") শরীর মনকে অধিকার করে, এবং কি প্রকারে গ্রস্ত হইবে এ সম্বন্ধে এক অভিনব ঔৎসুক্যের প্রফুল্লতা উপস্থত হয়, সে বিষয়ে বিস্তারিতরূপে বিশেষ সাক্ষী দিয়াছেন দুইজন;—আফ্রিকার সিংহ কবল হইতে মুক্ত বিখ্যাত ডাক্তার লিভিংষ্টোন এবং সুন্দরবনের ব্যাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত, নীত ও পরিশেষে ত্যক্ত আর একজন সাহেব। মহাত্মা লিভংষ্টোনের একটী হস্ত ও স্কন্ধ সিংহ দন্ত দ্বারা বিলক্ষণ আহত হয়, দ্বিতীয় ব্যক্তি বিনা আঁচড়ে রক্ষা পান; কিন্তু উভয়েই, নেশার ঘোরের প্রফুল্ল চিত্ততার মত, ক্লোরেফরম দ্বারা অর্দ্ধ অচেতনীকৃত অবস্থার ভাব ব্যাখ্যা করেন।

শ্রী চন্দ্রশেখর সেন।

——০——

বঙ্গবাসী ও অনাচরণীয় হিন্দু।

ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় যে সকল সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে "বঙ্গবাসী" অপেক্ষা কাহারও কাট্‌তি অধিক আছে কি না, জানি না। যদি বঙ্গ-বাসীর নিজের কথা বিশ্বাস করা যায়, তবে তাহার গ্রাহক সংখ্যা ৩০,০০০ হাজারের কম নহে, এবং ন্যূনকল্পে গড়ে একখানি কাগজ ৪ জনে পাঠ করিলে, পাঠকের সংখ্যা লক্ষাধিক হইবে।

সুশিক্ষিত সমাজে বঙ্গ-বাসীর প্রবেশ

ও প্রতিষ্ঠা অল্প হইলেও যে সমাজে "বিদ্যা-সুন্দর" ও "কালাচাঁদ" উপাদেয় জিনিষ, সে সমাজে বঙ্গ-বাসীর প্রভুত্ব দেখে কে? বিশেষতঃ বঙ্গবাসী অপেক্ষা বঙ্গ-বাসীর "কাণ্ড" অধিক; এই কাণ্ড-প্রিয় দেশে সে আকর্ষণ বড় নহে। তার পর, বঙ্গ-বাসীর মধ্যে একটুক জিনিষ আছে, তাহা বড় খাটী—সেটুকু প্রাচীন বয়সের আফিঙের তুল্য—তাহার ঝোঁকেও বঙ্গ-বাসীর আড্ডায় অনেক সেকেলে রকমের উকীল মোক্তার ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গড়াগড়ি হইয়া থাকে। সেই আফিঙটুকু ধর্ম্মচ্ছলে বাবু নিন্দা। বাবুগণ ত'নিন্দার পাত্রই বটে; কেন না, অবাবুগণ দেশে যত কীর্ত্তিকর কার্য্য করিয়াছেন; বাবুগণ তাহার কিছুই করিতে পারেন নাই!

কিন্তু কেবল নব্যভারতের বাবুগণকে বঙ্গবাসীর করালকবল হইতে রক্ষা করার জন্য এ প্রবন্ধ নহে। বঙ্গ-দেশের বৈদিক ও কোরাণী হিন্দুর লক্ষাধিক লোকে যে কি খাদ্য খায় এবং তাহাতে তাহাদের ইষ্টা-নিষ্ঠের সম্ভাবনা আছে কি না, এ প্রবন্ধে তাহাই প্রদর্শন করার যত্ন করা যাইবে।

অনেকের বিশ্বাস আছে, বঙ্গ-বাসী "হিন্দুর মুখপাত্র।' বঙ্গ-বাসী নিজেও ইহা ঘোষণা করিয়া থাকেন। তারকেশ্বরের মোহন্তের বিরুদ্ধে ব্যর্থ চীৎকারেই যদি "হিন্দুধর্ম্মের মুখপাত্র" হওয়া যায়, তবে হিন্দুব মুখপাত্র হওয়া বড় কষ্টকর ব্যাপার নহে। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুজাতি যে প্রকার না-ওয়ারিশ মাল হইয়াছে, তাহাতে যে সে ইহার মুখপাত্র হইবে, ইহা বড় বিস্ময়জনক নহে।

আমরা ভ্রান্ত হই আর যাহাই হই, বঙ্গ-দেশের মুসলমানগণকে আমরা হিন্দু ভিন্ন অন্য মনে করি না। তবে আমরা যদি বেদের অন্তর্গত হই, তাহার কোরাণের অন্তর্গত, এই মাত্র বিভিন্ন। এই সূত্রানুসারে খাস-বঙ্গে অর্থাৎ যে স্থানে বাঙ্গলা-ভাষা প্রচলিত আছে, তথায়

১।	বৈদিক হিন্দু	১,৭২,৫৪০০০
২।	কোরাণী হিন্দু	২,১৭,০৪০০০
	মোট	৩,৮৯,৫৮০০০

এই প্রায় ৪ চারি কোটী লোকের মধ্যে ১০,৭৬০০০ ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে বোধ হয় ৪০০০০০ লক্ষ অনাচরণীয় হিন্দুর ব্রাহ্মণ, যথা শুড়ীর ব্রাহ্মণ, নবশূদ্রের ব্রাহ্মণ, কাপালীর ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। অবশিষ্ট পৌণে সাত লক্ষ আচরণীয় হিন্দুর ব্রাহ্মণ। বঙ্গ-বাসী যদি কাহার মুখ-পাত্র হয়, তবে এই পৌণে সাত লক্ষ ব্রাহ্মণের মুখ-পাত্র বটে। ইহাদের স্বার্থই তাহার কাম্য পদার্থ এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রচার মাত্র। কিন্তু বঙ্গ-দেশে এমন ভ্রান্তি অদ্যাপি আছে যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া অনেকের বিশ্বাস আছে। এই ভ্রান্ত-বিশ্বাসের উপরই বঙ্গ-বাসীর ব্যবসায় চলিতেছে। কিন্তু বিপুল হিন্দু সংখ্যার মনোগতি যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন এবং সাধারণ শিক্ষার এই লৌকিক প্রবৃত্তি কোন্ পথে ধাবিত হইতেছে, ইহা যাঁহাদের অভ্রান্তরূপে জানিবার সুবিধা আছে, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যে প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্ম নহে, এ বিশ্বাস ক্রমেই বিস্তারিত হইতেছে।

যাঁহারা বঙ্গ-বাসী মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, তাঁহারা দেখিবেন, বঙ্গ-বাসীর মৌলিক নীতি নিম্নলিখিত প্রকারের;—

১। বঙ্গ-বাসী আচরণীয় ব্রাহ্মণের স্বার্থে অন্ধ।

২। বঙ্গবাসী কায়স্থের উন্নতির বিরুদ্ধ।

৩। বঙ্গ-বাসী সমুদায় অনাচরণীয় হিন্দুর উন্নতির বিরুদ্ধ।

৪। বঙ্গ-বাসী কোরাণী হিন্দুকে অস্পৃশ্য ও ঘৃণ্য মনে করে।

৫। বঙ্গবাসী জাতীয় একতা ও সমতার বিরুদ্ধ।

৬। বঙ্গ-বাসী সাধারণ-শিক্ষার-বিরুদ্ধ, সুতরাং সর্ব্ব-সাধারণের উন্নতির-বিরুদ্ধ।

৭। বঙ্গ-বাসী—স্বয়ত্ত-শাসনের-বিরুদ্ধ, কেননা তাহাতে "লঘুগুরুভেদ" থাকে না, অর্থাৎ বঙ্গবাসী হিন্দু ধর্ম্মের সাম্যবাদের-বিরুদ্ধ।

৮। বঙ্গ-বাসী জন্মগত-জাতিভেদের পক্ষপাতী; একজন "বেশ্যা সহচর" অন্নবিক্রয়ী-ব্রাহ্মণ বাবু চন্দ্র মাধব ঘোষের শিরোভূষণ, ইহাই তাহার বিশ্বাস।

৯। বঙ্গ-বাসী বিদেশ গমনের বিরুদ্ধ, সুতরাং আরব, গ্রীস, মিসর, ইতালী-প্রভৃতি দেশে হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ পূর্ব্বক তত্তৎ দেশের হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান বঙ্গবাসীর মতে হইতে পারে না।

১০। বঙ্গ-বাসী বেদ একচেটিয়া করার পক্ষপাতী।

বেদকে যদি হিন্দুধর্ম্মের আকর স্থল বলা যায় এবং বেদে যখন দেখা যায়, শূদ্রেও বেদের সুক্ত রচনা করিয়াছেন, এবং অনেক শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, যথা ব্যাস ইত্যাদি, তাহা হইলে বঙ্গ-বাসীর মতকে কি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের মত বলা যাইতে পারে? বঙ্গ-বাসী ভেদ-নীতির পরবশ হইয়া উপবর্ণ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। ইহারই অকৃত উদ্দেশ্য ব্রাহ্মণ প্রাধান্য সংস্থাপন। যদি তাহাই হয়, কথাটী স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত।

এই সকল সত্ত্বেও বঙ্গ-বাসীকে একেবারে সামাজিক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধ বলা যায় না। কুলীন ব্রাহ্মণের মেল-ভঙ্গ ও কন্যাপণ উঠাইয়া দিয়া যদি কেহ আচরণীয় ব্রাহ্মণগণের বিবাহ দায় উঠাইয়া দিতে পারেন, তবে বঙ্গ-বাসীর পরিচালকগণ লুচি মোণ্ডার ন্যায় এ পরিবর্ত্তনটুক গ্রহণ করিতে পারেন। আর যদি কেহ বলে যে, বঙ্গদেশে যে ১৫, ৬৪০০০ নবশূদ্র (চণ্ডাল) আছে, তাহাদিগকে সজল ব্যবহারের অন্তর্গত কর, এবং তাহাদের ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্র ক্রিয়া কর্ম্ম কর, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে কন্যাদায় উঠিয়া যাইবে, তখন বঙ্গবাসী উপবর্ণ ধর্ম্মের ঝুড়ি মাথায় করিয়া নাচিতে আরম্ভ করেন। বলি, এই স্বার্থপরতার নাম কি হিন্দু ধর্ম্মের মুখ-পাত্রতা? অহো হিন্দুধর্ম্ম! তুমি নিঃস্বার্থতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হইয়াও এইক্ষণ সম্পূর্ণ স্বার্থপরতার দুর্গন্ধময় কূপে ডুব দিয়া বসিয়া আছ?

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে একটী গোপ-সমিতি হইয়াছিল, গত সনের বঙ্গ-বাসীতে তাহার কার্য্য প্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে। এই সমিতিতে বঙ্গ-বাসীর এক জন পরিচালক, সম্পাদক কি না ঠিক স্মরণ হয় না, উপস্থিত ছিলেন। গোপগণ যে যে বিষয় স্থিরীকৃত করেন, তন্মধ্যে কায়স্থের বাড়ী ভৃত্য থাকা হইবে না, ইহা একটী বিষয়। সমিতির ধার্য্য বিষয় বঙ্গবাসীতে উল্লেখ করিয়া যখন মন্তব্য লেখা হয়, তাহাতে যে গোপ সকলের প্রতিজ্ঞার প্রশংসা করা হইয়াছিল, এমত নহে, ইহাও

বলা হইয়াছিল, অন্যান্য নিম্ন জাতি সকল এইরূপ করিলে (কায়স্থের বিরুদ্ধতা করিলে) ভাল হয়। আমরা বাস্তবিক পক্ষে কোন জাতির উর্দ্ধ গমনের বিরুদ্ধ নহি। গোপ-গণ এবং কোরাণী হিন্দুগণ যদি আপন অবস্থা উন্নত ও পরিবর্ত্তিত্ব করিয়া কায়স্থের সহিত অভিন্ন ভাবে মিশ্রিত হইতে পারেন, তবে কোন্ কায়স্থ অস্বীকার করিবেন? কিন্তু বঙ্গ-বাসী যে প্রকার ভেদনীতির বশবর্ত্তী হইয়া গোপ-জাতিকে কায়স্থের বিরুদ্ধতা করিতে পরামর্শ দিয়াছে, ইহাতে যদি কায়স্থ-গণের কিছু বুদ্ধি থাকে, তবে বঙ্গ-বাসী আর তাঁহাদের পাঠ করা উচিত হয় না। কিন্তু বলিব কি, কায়স্থগণ ক্ষত্র ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া এমন হীনবীর্য্য হইয়াছে যে, তৃণ তুল্য প্রলোভনেও তাঁহাদের কর্ণ ধরিয়া টানিতেছে। হে কায়স্থগণ! তোমাদের পতনেই দেশের এই পতন হইয়াছে, তোমরা একবার পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ কর।

ঢাকার শৌণ্ডিককুলতিলক বাবু রূপলাল রঘুনাথ দাসের জাত্যংশ লইয়া যে মোকদ্দমা হাইকোর্টে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত দাস মহাশয়েরা জয়ী হইয়াছিলেন! যদি তাঁহাদের যশোহানি ও মান হানি ঘটিত, তবে বঙ্গ-বাসী যতদূর সন্তুষ্ট হইত, তাঁহাদের মান রক্ষায় সেইরূপ হয় নাই। আমি অনাচরণীয় হিন্দুর যাহাতে সজল ব্যবহার হইয়া উচ্চ শ্রেণীর সহিত একতা ও সমতা হয়, তৎসম্বন্ধে একাধিক পত্র বঙ্গ বাসীর নিকট প্রেরণ করিয়াছি এবং মাগু-রার সমাজ-উন্নতি সভা হইতে "জল-চল" নামধেয় এক পুস্তিকাও প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু বঙ্গ-বাসী এমনই হিন্দুর মুখ-পাত্র যে, মাত্র পৌণে সাত লক্ষ ব্রাহ্মণের ভ্রান্ত স্বার্থের অনুরোধে কোটী কোটী লোকের কল্পিত উন্নতির প্রস্তাবও প্রকাশিত করিতে সাহস বা ইচ্ছা করেন নাই। অনাচরণীয় হিন্দুবর্গ, বঙ্গ-বাসীকে তাঁহাদের হিন্দু ধর্ম্মের ধ্বজা-বাহক বিবেচনা করার পূর্ব্বে, বঙ্গবাসীর এই সকল কুটিলনীতি হৃদয়ঙ্গম করুন। বঙ্গ-বাসী তাঁহাদের ধাম্মিক ও সামাজিক উন্নতির একেবারে বিরুদ্ধ। অথচ শৌণ্ডিক প্রভৃতি অনাচরণীয় হিন্দুর মধ্যে যদি কোন কাগজের কাটতি থাকে, তাহা বঙ্গ-বাসীর। ইহাতেই বোধ হয়, বঙ্গ-বাসীর কৃতজ্ঞতাও যেমন, অনাচরণীয় হিন্দুর বুদ্ধিমত্তাও তেমন।

৩য় হইতে ৯ম নীতির অনুকূলে প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক বারের বঙ্গ-বাসীই তাহার প্রমাণ। কিন্তু বেদ একচেটিয়া বিষয়িণী ১০ম নীতি সম্বন্ধে দু একটী কথা বলা আবশ্যক।

বঙ্গ-দেশের গত চারি শতাব্দীর ব্যর্থ-মনোরথ প্রচারক সম্বন্ধে আমরা একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বলিতে বড় বেশী সাহস করি না, বঙ্গ-দেশে একজন নির্ব্বাক প্রচারক আছেন, আমরা যত দূর বুঝি, তাঁহারই প্রচার বোধ হয় কালে টিকিয়া যাইবে। পাঠকেরা বোধ হয় অনুভব করিতে পারি-য়াছেন, আমি বাবু রমেশ চন্দ্র দত্তের কথা উল্লেখ করিতেছি। সত্য বটে, সেণ্টপল গির্জ্জাঘর, তাঁহার বাক্ যন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হয় নাই, সত্য বটে, তিনি কোন নূতন ধর্ম্মের ধূঁয়া লইয়া সহরে ভ্রমণ করেন নাই, কিন্তু তিনি বাঙ্গলা ভাষায় বেদ অনুবাদিত করিয়া, হিন্দুর মূলধর্ম্ম গ্রন্থ সর্ব্ব সাধারণের নয়নগোচর করিয়া যে প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করি-য়াছেন, তাহাতে দেশে, এপুরুষে না হইলেও, পরপুরুষে বিষম ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত

করিবে। লুথারের ধর্ম্মান্দোলনের মূল কারণ, রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে ইংরেজীতে বাইবেল অনুবাদ। কথিত ভাষায় মূল-ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদ জাতীয় জীবনের প্রথম উন্মেষ। বঙ্গ-বাসী রমেশ বাবুকে যতই গালি বর্ষণ করুক না, তাঁহার বেদানুবাদ ও ইতিহাস সংগ্রহ যে কি পদার্থ, তাহাতে লৌকিক প্রবৃত্তিকে যে কোন্ পথে প্রধাবিত করিতেছে, তাহা যদি বঙ্গ-বাসী সম্যক রূপে ভাবিতে শিখে, তবে তাহার জিহ্বা শুকাইয়া যাইবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জেলায় জেলায় বৈদিক স্কুল ও রাজ-ধানীতে বৈদিক কলেজ বাঙ্গলা ভাষায় স্থাপিত হইয়া বৈদিক ও কোরাণী হিন্দু নির্ব্বিশেষে এবং সর্ব্বজাতি নির্ব্বিশেষে বেদা-লোচনা হইবে। ইহাই সভ্য যুগের পূর্ব্ব লক্ষণ, বারণ করে সাধ্য কার? ফল কথা, নির্ব্বাক প্রচারকের যত্ন, কালোচিত, এবং তাঁহার ইতিহাস কুসংস্কার-বিনাশী। কিন্তু বঙ্গ-বাসী কুসংস্কার হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করেন না। তাহার মতে জনমেজয়ের সর্প যজ্ঞে সহস্র সর্প ভিন্ন কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নাই। সুতবাং বাবু রমেশ দত্ত বঙ্গ-বাসীর চক্ষের শূল। তিনি বেদ একচেটিয়া করার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, তাঁহার হিন্দু ধর্ম্ম সমালোচনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মূল ভিত্তি বিলোড়িত হইয়াছে। তিনি প্রকৃতই সভ্য যুগের লক্ষণ আশ্রয় করিয়া নির্ব্বাক প্রচার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন। নরকে আশ্রয় করিয়া যে দেবতা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, সেই লৌকিক দেবতার অর্চ্চনায় তিনি আসক্ত। তাঁহার সত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কুসংস্কারের কথা টিকিবে না। এই কুসংস্কার সম্বন্ধে বঙ্গ-বাসীর পৃষ্ঠপোষক হোপ (Hope) যাহা বলেন, শুনুন ;—

"But so far as our experience goes we must confess to the impression that if the teachings of our contemporary (Bangabasi) in regard to Hinduism have any effect on the people it addresses, that effect cannot but be towards hardening the prejudies of a far from liberal minded mass and in widening those differences which are the peculiar disadvantage of such a system as caste. The danger of the Bangabasi's religious teachings proceeds, we believe, from the fact that it presses upon the attention of its readers *forms* and *observances* of Hinduism more than its *Spirit*. Whether it means or no, to its average reader Hinduism appears to consist more in observing a set of rules about eating and social intercourse, in performing Sandhya and keeping the tonsure than in leading a life of simpliciy and usefulness of unselfish service to fellowmen and sincere devotion to God. We are pretty regular reader of the Bangabasi and appreciator of its practical sense in the discussion of public topics, but we must confess that if there be no other essence of Hinduism than what can be got from its pages and what can be so readily utilized for the purposes of malice and selfishness in the manner alluded to, then surely Hinduism is doomed to death and will deserve its fate. For in that case it is a religion of the most heartless formalities without a spark of humanity or divinity to soften its cold blooded tyranny. Hinduism that appears in the columns of our contemporary need not teach men to be pure in life, noble in pursuits, unselfish in desires and loving in their relations to others. It is not calculated to make men look down upon hypocrisy with scorn, shun vice no matter how sanctimoniously dressed and em-

-brace honorable poverty rather than attain to wealth and social eminence by means whose propriety is questionable. On the contrary it would seem to put up with many a slip of duty, much depravity of character and perversity of heart if only external forms of piety are observed" &c.. Hope, dated the 14th April 1889.

আমরা যদিও হোপ সম্পাদক অমৃত বাবুর ন্যায় বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের বিরোধী না হই, তথাচ 'সহৃদয়তা-শূন্য হিন্দু ধর্ম্মের সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মতদ্বৈধ নাই। বঙ্গ-বাসীর হিন্দুধর্ম্ম সহৃদয়তা-শূন্য, সুতরাং প্রকৃত হিন্দু ধর্ম্মের বিপরীত ভাব। ইহাই সাধারণকে জ্ঞাত করার জন্য আমাদের এত যত্ন। লক্ষাধিক লোকে যদি অখাদ্য খায়, তাহা দেখিব কি প্রকারে? ক্রমশঃ

শ্রীমধুসূদন সরকার।

সাহিত্য-বাজার। (৪)

সংবাদপত্র।

আমরা গতবারে যে সকল কথা অভিব্যক্ত করিয়াছি, তাহাতেই একরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বর্ত্তমান সময়ে সাময়িক ও সংবাদপত্রের অবস্থা মোটের উপর আশাপ্রদ নয়। এ সম্বন্ধে গ্রাহকগণেরও দোষ আছে, সম্পাদকগণেরও দোষ আছে। একদিকে সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাবে পত্রিকাগুলি অসময়ে প্রাণত্যাগ করিতেছে; অন্য দিকে সম্পাদকগণের দোষে সহানুভূতি ও সাহায্যের দ্বার ক্রমেই রুদ্ধ হইতেছে। উপহারের বুজরুকি ও ভেল্কি দেখাইয়া এবং গ্রাহকগণকে ঠকাইয়া কতিপয় অর্থলোভী সম্পাদক ও পুস্তক-প্রণেতা সাধারণকে সাহিত্যের বাজারের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দিতেছেন। এ দেশের এ কলঙ্ক না ঘুচিলে, সংবাদ বা সাময়িক পত্রের আর মঙ্গল নাই।

অল্প মূল্যের পত্রিকায় অন্য দেশের অশেষ মঙ্গল হইয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশে মঙ্গলাপেক্ষা দারুণ অমঙ্গল উৎপন্ন করিয়াছে। মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন "সুলভ সমাচার" প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়া এই পথ মুক্ত করেন। এক সময়ে সুলভ সমাচারের অবস্থা ভাল ছিল, তাহা দ্বারা এদেশেরও কতক মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন, সস্তার ভিড়ে পড়িয়া আপনাকে কলেবর ত্যাগ করিতে হইল! সস্তার তিন অবস্থা। এক দিকে, নিজের চলে না। অন্য দিকে, ভাল জিনিসের বাজার মাটী হয়, অর্থাৎ আদর কমিয়া যায়, অপর দিকে দেশের লোক ভাল জিনিসের পরিবর্ত্তে মন্দের আদর করিতে শিখে, অর্থাৎ রুচি-বিকৃতি জন্মে।

আমাদের দেশের একটা প্রধান দোষ এই—একপথে একবার যে যায়, শতজন তার অনুসরণ করে। সুলভ সমাচারের সময়ে একবার বঙ্গে অল্প মূল্যের কাগজের ঢেউ উঠিয়াছিল। কিন্তু অল্পেই সে ঢেউ প্রশমিত হইয়াছিল বলিয়া দেশের বড় একটা অনিষ্ট করিতে পারে নাই। এই সময়ে যে সকল কাগজ প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সাপ্তাহিক সমাচার একটু বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অন্যান্যগুলি জলবুদ্‌বুদের মত কাল-সাগরে অল্প দিনের মধ্যেই মিলাইয়া যায়। সেই সময়ে বাজারটা কতক মাটী হইয়াছিল; সুলভ পত্রের সেই ঢেউ

বঙ্গের অন্তঃসলিলা হৃদয়-স্রোতস্বতীতে অল্পে অল্পে বহিতেছিল, ১২৮৯ ও ১২৯০ সালে আবার প্রবল তরঙ্গ উত্থিত করিল। বঙ্গ-বাসী সঞ্জীবনী, সময়, ভারতবাসী, পতাকা প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ১৷৷০ ও ২৲ টাকা মূল্যের পত্রিকা এই সময়ে বহু প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকা এদেশে সংবাদপত্র-বাজারে যুগান্তর উপস্থিত করে। লোকের উৎসাহে, ভিড়ে, কিছুদিন এবাজারে চলাফেরা করা দায় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘকাল রহিল না। দেখিতে দেখিতে অনেক পত্রিকাই উঠিয়া গেল। ভারতবাসী গেল, পতাকা সুরভির সহিত মিলিল, কতকগুলি মৃতপ্রায় হইয়া রহিল, কতকগুলি উঠিয়া গেল। এখনও সস্তার দিকে অনেকের ঝোঁক আছে, সেই জন্য দেখিতে পাই, মধ্যে মধ্যে এক একখান সুলভপত্র বাহির হয়, এবং দুই দশ দিন পরই অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুলভপত্রে এদেশের কি অমঙ্গল সাধন করিয়াছে, এখন তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

প্রথমতঃ এদেশের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা গুলির পরিণাম ডুবাইয়া দিয়াছে। সোমপ্রকাশের পর, নববিভাকর ও সাধারণী দুই খানি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা ছিল, সস্তার ধাক্কায় পৃথকভাবে মাথা তুলিতে সমর্থ না হইয়া দুই একত্রে মিলিল, তারপর ১২৯৬ সালের তিরোধানের সহিত একেবারে বিলোপ হইয়াছে। সুরভি ও পতাকা-আর দুইখানি প্রথম শ্রেণীর কাগজ—দেখিতে না দেখিতে—উভয় একত্রে সম্মিলিত হইল,—এখন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গোন্দলপাড়া যাইয়া রূপ, ভাষা পরিত্যাগ করিয়া জীর্ণ দেহ ধারণ করিতেছে! বলা অধিকন্তু যে, ইনি এখন মৃত্যু শয্যায়। সোমপ্রকাশ গ্রহ-বৈগুণ্যে এখনও আছেন—কিন্তু যেরূপ ভাবে আছেন, এরূপ ভাবে না থাকিলেই ভাল হয়। অধিক দিন যে থাকিতে পারিবেন, এমনও বোধ হয় না। এখন প্রথম শ্রেণীর পত্রের মধ্যে একমাত্র সহচর আছেন। সহচরের অবস্থা, লেখা, সংবাদ-সংগ্রহ—এ সকলই আশাপ্রদ, কিন্তু যে সস্তার বাজার, যে উপহারের বুজরুকি এখনও চলিয়াছে, কখন কি হয়, বলা যায় না। তবে প্রবর্ত্তকগণ অধ্যবসায়ী, সহিষ্ণু, বিচক্ষণ ও ধীর; বোধ হয়, তাঁহারা অল্পে ছাড়িবেন না। দেখা যাঁক। ভারতমিহির মফঃস্বল হইতে বাহির হইলেও, একখানি প্রথম শ্রেণীর সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। সস্তার লীলা খেলিতে মৈমনসিংহ হইতে কলিকাতা আসিয়া গঙ্গা লাভ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গলা সংবাদপত্র সকলের অবস্থা যে, এই সকল সুলভ পত্রিকা দ্বারা নিতান্ত হীন হইয়া গিয়াছে, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দেশের লোকের মন এত দূর সস্তার দিকে ঝুকিয়াছে যে, আর দশ বিশ বৎসরের মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর পত্র এদেশে জন্ম গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করিতে পারিতেছি না। লোক কেবল সস্তা চায়, ভাল মন্দ বিচার শক্তি লোপ পায় পায় হইয়াছে। সুরভি, পতাকা, সোমপ্রকাশ, সাধারণী, নববিভাকর, ভারতমিহির যে দেশে আদর, সাহায্য ও সহানুভূতি অভাবে মারা গেল, বা মারা যাইতে বসিল, সে দেশের শোচনীয় অবস্থার কথা ভাবিতে বসিলে চক্ষের জল ধরে না।

যে সকল সস্তা পত্রিকার জন্য দেশের এই

রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, সে সকলের অবস্থা কেমন? যে অসংখ্য সুলভ পত্রিকা মরিয়াছে, তাহাদের কথা তুলিলাম না। ভারতবাসী-কেও বাদ দিলাম। বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, সময়—ইহাদের অবস্থা কি ভাল? সময় সম্প্রতি বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছেন, সুলক্ষণ কি কুলক্ষণ, জানি না। ঢাকার সারস্বত পত্রও মৃত্যুর পূর্ব্বে এইরূপ বর্দ্ধিত কলেবর লাভ করিয়াছিলেন! এই জন্য ভয় হয়। যাহা হউক, "সময়" এ সময়ের খুব উপযোগী পত্রিকা, সন্দেহ নাই। "সময়" নিরপেক্ষ সংস্কারক—খুব উন্নতিরও না, খুব অবনতিরও না,; অত্যুদার নৈতিকও না, অনুদার নৈতিকও না। বঙ্গ-বাসী ও সঞ্জীবনীর মধ্যে এরূপ একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, নিরপেক্ষ, বিবেচক পত্রের নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যেরূপ সস্তা দরে বিক্রয় হয়, হিসাব ধরিলে কাগজের মূল্যও উঠে কিনা, সন্দেহ। বড় ঘরে জন্ম, দীর্ঘ কাল থাকিলেও থাকিতে পারেন। এখন বঙ্গ-বাসী ও সঞ্জীবনীর কথা। বঙ্গবাসীর দিগ্বিজয়ী নাম, দিগ্বিজয়ী গ্রাহক সংখ্যা, কাণ্ড কারখানা সব অলৌকিক রকমের। এতবড় কারখানা বাঙ্গলা সংবাদপত্রের ভাগ্যে আর দেখা যায় নাই। এ সকল ভাবিলে, চমৎকৃত হইতে হয়। প্রবর্ত্তক-দিগকে বার বার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, প্রসিদ্ধি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ-বাসী এত মত পরিবর্ত্তন করিতে-ছেন যে, বঙ্গ-বাসীকে সময়-সেবক বলিতে সঙ্কোচ হয় না। সমাজের উপর আধিপত্য আছে বলিয়া বঙ্গবাসী বলেন, কিন্তু দেশ বলে, নাই। দেশের উপর সময়-সেবকের আধিপত্য থাকিতে পারে কি-না, সে বিষয়েও গভীর সন্দেহ বিদ্যমান। তবে একথা অম্লান চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে সুলভ জ্ঞান বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়া বঙ্গ-বাসী এদেশের অনেকের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। আর এক বিষয়ে বঙ্গ-বাসীর অসাধারণ শক্তি। বাঙ্গালা ভাষাকে সরল, সুললিত, মধুর করিয়া বঙ্গ-বাসী সাহিত্যের অনেক উন্নতি করিয়াছেন। এইগুণ থাকা সত্বেও, বঙ্গ-বাসী এদেশে স্থায়ী হইবে কি না, সন্দেহ। রাজনীতি সম্বন্ধে বঙ্গ-বাসীর কোন কোন মত সারগর্ভ ও বিচক্ষণ হইলেও, বঙ্গ-বাসী সকল উন্ন-তির প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া, আপন অস্তি-ত্বের অনাবশ্যকতাই প্রতিপাদন করি-তেছেন। এ দেশের পূর্ব্বের প্রথাই সকল ভাল, একথা যদি সত্য হয়, তবে সংবাদপত্র এদেশে চালান যায় না। কেননা, পূর্ব্বে এদেশে সংবাদপত্র ছিল না। বঙ্গ-বাসী প্রকা-রান্তরে আপন অস্তিত্বের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া আপনাকে ক্রমে ক্রমে এত দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছেন যে, সময়ের গর্ভে ইহার পরি-ণাম যে কি, বুঝিতে বা বলিতে ভয় হয়। বঙ্গ-বাসী আজ কাল উপহার দিতে-ছেন, ইহাতে ভিতরের অবস্থার অবনতির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গ-বাসী ঋণজালে জড়িত বলিয়া শুনিয়াছি, সত্য হইলে ইহাপেক্ষা আর শোচনীয় অবস্থা কি হইতে পারে! এ দেশে বঙ্গ-বাসীর কাল ফুরাইয়াছে, ইহাতে ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু জোর করিয়া বঙ্গ-বাসী যত দিন থাকিবেন, তত দিন মারেই বা কে? বঙ্গ-বাসী বলেন, তিনি হিন্দু সমাজের মুখপাত্র, কিন্তু সাহিত্য জগতে হিন্দু সমাজের যে সকল লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৃতী ব্যক্তি আছেন,

আমরা যত দূর জানি, বঙ্কিম চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া অক্ষয় চন্দ্র পর্য্যন্ত কেহই ইহাকে সম্মানের চক্ষে দেখেন না। এরূপ অবস্থায়ও বঙ্গ-বাসী আপনাকে বড় বলিয়া অন্যকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন ও তীব্র কটাক্ষ করেন। এত অহঙ্কার, এত আস্পর্দ্ধা, এত লজ্জাহীনতা কি দীর্ঘকাল মনুষ্যের সহ্য হইবে?

বঙ্গ-বাসী যেমন হিন্দু সমাজের মুখপাত্র, সঞ্জীবনী সেই রূপ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মুখপাত্র বলিয়া, ব্যবহার দ্বারা, ঘোষণা করিয়া থাকেন। বঙ্গ-বাসীকে যেমন হিন্দু সমাজ মানে না, সঞ্জীবনীকে এদেশের ব্রাহ্মসাধারণ সেইরূপ মানে না। বঙ্গ-বাসীর দল বিগ্‌ড়ানের ফলেই সঞ্জীবনী ও পতকার জন্ম। সঞ্জীবনী উন্নতি ও সংস্কার পিপাসু, সন্দেহ নাই; কিন্তু বড় সাহেব-বিরোধী, বড় হিন্দু-বিদ্বেষী। সঞ্জীবনী ও বঙ্গবাসী এক সময়ে কবির আসরে নামিয়া দেশ মাতাইয়াছিলেন, কিছু দিন হইতে সে ভাব আর নাই। এই যুগে, সংবাদপত্রে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত কুৎসা-প্রচার এই উভয় পত্রিকা হইতে এদেশে আবির্ভূত হইয়াছে। বঙ্গ-বাসীর লেখা সতেজ, সরল, সুললিত, সঞ্জীবনীর লেখা রূঢ়, জটিল, কর্কশ। বঙ্গ-বাসী বাবু-নিন্দা ও ব্রাহ্ম কুৎসা লইয়া ব্যতিব্যস্ত, সঞ্জীবনী সাহেব ও হিন্দু নিন্দা লইয়া ব্যতিব্যস্ত। নিজ জাতির নিন্দা বরং ভাল, তাহাতে স্বজাতির উপকার হয়। সাহেব নিন্দার ফল মোটেই ভাল নয়। ভারতের উন্নতির জন্য বাবু ও সাহেব, ব্রাহ্ম ও হিন্দু, সকলের গাঢ় মিলন যে নিতান্ত প্রয়োজন, উভয়ই বুঝেন না। হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেই বঙ্গ-বাসী চটেন, ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলেই সঞ্জীবনী বিরক্ত হন। সঞ্জীবনী ব্রাহ্মবিরোধী পত্রকে "নগণ্য" শব্দে অভিহিত করিয়া আপন সম্মান ঘোষণায় ব্যাপৃত, বঙ্গ-বাসী হিন্দু ভাব-বিরোধীদিগকে "বাবু" বলিয়া আপনাকে তদতিরিক্ত ভাবিয়া মোহিত! আপন দোষ, জগতের লোক বড় একটা দেখিতে পায় না। সুতরাং ইঁহাদেরও সেই রূপই ঘটিতেছে। কেহ ইঁহাদিগের দোষ প্রদর্শন করিলে, চটিয়া উভয়ই লাল হন।

বঙ্গবাসী সাধারণের মধ্যে জ্ঞান প্রচার করিয়া এদেশের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন, সঞ্জীবনী কুলির অত্যাচার নিবারণে বদ্ধ-পরিকর হইয়া এদেশের সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। সঞ্জীবনীর ভাষা যদি মধুর হইত, যদি কর্কশ না হইত; ভাব যদি ব্যঙ্গোক্তি পূর্ণ না হইত; অহঙ্কারের ছটা যদি লেখায় না ফুটিত, এবং মত যদি একটু সংযত হইত, তবে সঞ্জীবনী বঙ্গবাসীকে পশ্চাতে ফেলিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিতেন। সাম্য, স্বাধীনতার মধ্যে যে উগ্রমূর্ত্তি লুক্কায়িত, তার মধ্যে মৈত্রী ভাবের সমাবেশ থাকিলে সঞ্জীবনী দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিতেন। বেত্র হস্তে লইয়া অন্যকে শাসন করিতে ধাববান হইবার পূর্ব্বে নিজের দিকে একবার তাকাইয়া দেখা উচিত। বঙ্গ-বাসীর "বাবু নিন্দা" যে কারণে নিন্দিত, সঞ্জীবনীর "সাহেব নিন্দা" ততোধিক কারণেই উপেক্ষার জিনিস। সম্পাদকের প্রধান গুণ হওয়া উচিত, নিরপেক্ষতা; অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, নিরপেক্ষতা এতদ্-

ভয়ের মধ্যেই অবিদ্যমান। এদেশে যদি সঞ্জীবনী ও বঙ্গ-বাসী স্থায়ী না হয়, তবে এই কারণেই হইবে।

দৈনিক সম্বন্ধে কোন কথা লিখিলাম না, কেননা, দৈনিক বঙ্গ-বাসীর ছায়া, অথবা বঙ্গ-বাসী দৈনিকের ছায়া লইয়া লিখিত।

প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের কথা বলা হইল, অবশিষ্টের স্বাধীন মতামত বড় একটা দেখা যায় না। উপরোক্ত প্রধান পত্রিকা সকলে যে সকল কথার আলোচনা হয়, কলিকাতার অন্যান্য পত্রিকা তাহারই ছায়া অবলম্বনে লিখিত। স্বাধীন মত অতি অল্প পত্রিকার মধ্যেই দেখা যায়। একজন যে দিকে ধায়,—অন্য শত শত তার পশ্চাৎবর্ত্তী হয়। ইহাই সকলের বিশেষত্ব। কিন্তু অন্যকে নিন্দা করিবার সময় সকলেই স্বাধীন, সকলেই বড় লোক হন। যার চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে এক জনকেও সাহিত্য জগতে বিচরণ করিতে দেখা যায় না, সম্পাদক হইয়া তিনিও অন্যকে গালি দিবার সময় বড় হইয়া বসেন। এই দুর্দ্দশা দেখিয়া দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গিয়াছি। কর্ত্তব্য-বোধহীনতা, দায়িত্ব-বোধ-হীনতাই অন্যান্য পত্রিকার প্রধান গুণ! কেহ দুমাস, কেহ এক বৎসর, কেহ দুই বৎসর, কেহ বা তিন বৎসর এইরূপ বাহাদুরী করেন, তারপর জলের বিম্ব জলে মিশায়, আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় না।

মফঃস্বলের পত্রিকার মধ্যে এখন এডুকেশন গেজেটই প্রধান। আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ প্রভৃতি যে সকল প্রবন্ধের সূচনা ইহাতে হইয়া থাকে, সে সকল অতি উচ্চদরের। বহরমপুরের প্রতিকারের মত ভাল। উলুবেড়ের গ্রামবাসী উদার। ঢাকা গেজেট ঢাকার মধ্যে সারগর্ভ প্রধান পত্রিকা, কিন্তু কাগজখানি কদর্য্য। মৈমনসিংহের চারুবার্ত্তা, কাকীনিয়ার রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ, রাজসাহীর হিন্দুরঞ্জিকা প্রভৃতি ব্যক্তি বিশেষের কাগজ, মুখ চাহিয়া সম্পাদকগণকে চলিতে হয়, সুতরাং ভাল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। চারুবার্ত্তার বেশ ভাল, হিন্দুরঞ্জিকা ও দিক প্রকাশ কদর্য্য। ঢাকার আত্মাভিমানী শক্তি, যশহরের সম্মিলনী, বরিশালের সহযোগী, কুষ্টিয়ার হিতকরী, টাঙ্গাইলের আহম্মদী, কলিকাতার সুধাকর, উলুবেড়িয়ার দর্পণ, গরিবপুরের সমাজ ও সাহিত্য, এগুলি নূতন পত্রিকা,—আজও আছেন, কিন্তু কে কত দিন থাকিবেন, জানি না। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিন খানির বেশভূষা ভাল, ছাপা পরিষ্কার, কিন্তু কৃতী লোক ইহাদের মধ্যে আছেন বলিয়া বোধ হয় না। অন্যান্য অধিকাংশ পত্রিকাই বিদ্বেষ ভাবে পরিপূর্ণ, অধিকাংশেরই পরনিন্দা কণ্ঠভূষণ। হাম বড় ভাব ষোল আনা সকলের মধ্যে বর্ত্তমান। এইরূপ পত্রিকা সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া মোটেই আশা নাই। স্থায়ী না হইলেও দেশের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে গরিবপুরের "সমাজ ও সাহিত্য"কে নির্ভীক ও উন্নতি-পিপাসু বলিয়া আশা হইতেছে, স্থায়ী হইলে দেশের অনেক অভাব দূর হইবে। মুসলমান ভ্রাতাগণ সাহিত্যের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের কথা। এতদ্ভিন্ন আর যে সকল পত্রিকা আছে, সে সকল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই। সাময়িক পত্র সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

—

আমাদের ভদ্রাসন।

যে গৃহে নিরন্তর বাস করা যায়, অর্থাৎ যাহা আমাদের প্রাণপ্রিয় সংসারের লীলা-ক্ষেত্র হৃদ্য বাস্তুভিটা, তাহার চৌহদ্দি, ইতিহাস, দলিল দস্তাবেজ প্রভৃতি আদ্যোপান্ত বিবরণ না জানেন, এমন লোক অতি বিরল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমগ্র মানব পরিবারের সাধারণ গৃহ পৃথিবী সম্বন্ধে আমরা অতি অল্পই জানি ও জানিতে চেষ্টা করি। যথার্থ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে আত্মার অবলম্বন জড়দেহের আশ্রয়স্থান পৃথিবী অখণ্ডিত ভাবে একদেশগত "বাস্তুভিটা" অপেক্ষা অনেক গুণে প্রকৃত গৃহপদ বাচ্য। ভদ্রাসন ছাড়িয়া আজ দিল্লী, কাল বোম্বাই, পরশ্ব লণ্ডন, তরশ্ব ইয়র্ক, তৎপর দিবস টেরাডেলফিউগো দ্বীপের হরণ অন্তরীপে থাকিতে পারি, কিন্তু পৃথিবী-বাড়ী ত্যাগ করিয়া তিলার্দ্ধ তিষ্টিবার যো কোথায়? "সুতরাং আমাদের বাড়ী" বলিতে গেলে শ্যামপুকুরের গলিস্থিত খোলার ঘর, বাঙ্গালার গ্রাম, নগর, ভারতের প্রদেশ বা ইয়োরোপের রাজ্য না বুঝাইয়া, সুদরাজ পাকা মোকাম জীবন স্বত্ব পৃথিবী বুঝান উচিত। পরম পিতা হইতে প্রাপ্ত এজমালী সম্পত্তি এই বাড়ীর কোন খবর না রাখা বড় দোষের কথা; তাই এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা দ্বারা কতক চিত্তবিস্তার বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। চিরকাল সংকীর্ণ পৈতৃক ভিটার কথা ভাবিয়া হৃদয় অতি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ হইয়াছে এবং দিন দিন অধিকতর সঙ্কুচিত হইতেছে; ক্ষণকালের জন্য আপনাকে অন্ততঃ পৃথিবী টুকুতে ছড়াইয়া ফেলিতে পারিলে অনেক আরাম পাওয়া যাইবে।

অন্যান্য গ্রহাদির সহিত তুলনায় আমাদের আবাস ভূমি এই পৃথিবী অতিশয় ক্ষুদ্র, এমন কি, যদি অন্য গ্রহ হইতে এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ অনন্তকায়ের পরিদর্শনে প্রবৃত্ত হন, ক্ষুদ্রতা বশতঃ আমাদের বড় আদরের সামগ্রী মেদিনীমণ্ডল তাঁহার দৃষ্টিগোচর না হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। আমাদের সৌর-জগতের বিরাট আয়তনের নিকট পৃথিবী সিন্ধুতে বিন্দুমাত্র। আবার জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিশারদ মহাত্মা হর্শেল কর্তৃক আবিষ্কৃত ছায়াপথান্তর্গত এককোটী আশীলক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে পড়িলে সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ আমাদের হর্ত্তা কর্ত্তা সূর্য্যদেবকে খুঁজিয়া পাওয়া ভার;—এখানে বিরাট মূর্ত্তিতে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ, কিন্তু সে দেশে উহা অপেক্ষা দুই চারি হাজার গুণ বড় ও ততোধিক উজ্জ্বল বিস্তর অরুণ ঘুরিতেছে। পুনরপি ঐ মুলুক ঘেরিয়া বিস্তৃত ছায়াপথ, যাহা আপাততঃ বোধ হয় সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অনন্ত দেশের কাছে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ বই আর কিছুই নয়। দশ দিকে অসংখ্য অগণ্য গ্রহ তারা নক্ষত্র সমাকীর্ণ আকাশের পর আকাশ, তার পর আকাশ;—অগম্য অপার, অসীম, অনন্ত বিশ্ব-কারখানা! কোন দিকে কূল কিনারা নাই, সর্ব্বত্রই কেন্দ্র, পরিধি কোথাও নির্দ্দেশ করা অসম্ভব; এই অকূল দেশ সমুদ্রে ছায়াপথ একটী অতি ক্ষুদ্র বালির চড়া মাত্র। তুলনায়

কল্পনা পরাস্ত হয়, মন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ফিরিয়া আইসে। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল, তাহাও অনন্তকাল দৌড়িয়া কোন এক দিকের সীমায় পৌঁছিতে পারে না, আমাদের ক্ষুদ্র মনের অপরাধ কি ?

এখন দেখা যাউক, এই অসীম বিশ্ব ভুবনের মধ্যে পৃথিবীর কোন খোঁজ পাওয়া যায় কি না। আমাদের ক্ষুদ্র সসীমতার পক্ষে পৃথিবী যথেষ্ট বিশাল, কারণ আজও আমরা ইহার উপরিভাগ মাত্রের বিষয়েও পরিস্ফুট জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হই নাই। পরিদৃশ্যমান নাক্ষত্রিক জগতের নিকট ইহা হিমালয়ের পাদদেশস্থ বালুকাকণাও না হইতে পারে, দূরবীক্ষণ দ্বারা ছায়াপথ পর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্বেত্তা ইহাকে সামান্য তুচ্ছ গ্রহাধম বলিয়া অবজ্ঞা করিতে পারেন, তবুও ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ গবেষণার বিষয়। যদিও আয়তনে ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর, তত্রাচ ইহার ভিতরে ও বাহিরে নিয়ত যেরূপ অসংখ্য প্রকারের কাণ্ড কারখানা হইতেছে, মানব মস্তিষ্কের সাধ্য নাই যে, তাহার অতি সামান্য অংশও কোন কালে আয়ত্তাধীন করিতে পারে। সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানের কথা দূরে থাকুক, পার্থিব-বিজ্ঞান যে হাজার হাজার বিভাগোপবিভাগে বিভক্ত, পণ্ডিতের পক্ষে তাহার প্রত্যেকটী অফুরণ অনুসন্ধানের ভূমি।

আমাদের দৃষ্টি পথের সীমান্তর্গত বিশ্বাংশটুকুর যেরূপ অত্যদ্ভুত সুচারু ব্যবস্থা, তাহাতে ইহাকে বাস্তবিক একটী ক্ষুদ্র বিশ্ব বলিলে দোষ হয় না। এক প্রকারে দেখিতে গেলে, শুদ্ধ এই পৃথিবীকে বিশ্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বলা যাইতে পারে। সমগ্র সৃষ্টি বিশ্বনিয়ন্তার যে অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে চলিতেছে, এই নূনকায় মেদিনীমণ্ডল ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যমান্ জগতও সমান ভাবে সেই নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। পৃথিবীর ভ্রমণপথ, ধুবস্তু লাটিমের মত দুই প্রকার গতি, মাধ্যাকর্ষণশক্তির নানাবিধ ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে ইহা আমাদের নিকট অন্যান্য গ্রহাদির স্বরূপ ও ব্যবস্থা প্রকাশ করে; সুতরাং ইহাকে জানিলে অনেককে জানা যায়। এই জন্য পৈতৃক বাস্তু বসুন্ধরার আকৃতি প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পৃথিবীর আকার ঠিক গোল নহে;—* দুই কেন্দ্র খাড়াই হিসাবে আন্দাজ ১৩ মাইল চাপা, এবং পেট মোটা, অর্থাৎ কেন্দ্র হইতে বিষুব রেখার দিকে ক্রমেই অধিকতর স্ফীত ভাব; সুতরাং উত্তর দক্ষিণে রেখা চালাইয়া বৃত্ত আঁকিতে গেলে উহা গোল না হইয়া ডিম্বাকার হইবে। উভয় কেন্দ্র যে ঠিক সমান পরিমাণে চাপা তাহা নিশ্চয় বলা যায় না; এবং যে দিকে কাট, দুই গোলার্দ্ধ যে আকৃতিতে এক প্রকার, সে বিষয়েও বিলক্ষণ সন্দেহ; ইহা প্রমাণ

* এই সময়ে একটী হাসির কথা মনে পড়িল; ২।৩ বৎসর হইল কোন ব্রাহ্মণ মুহুরি আমাদের নিকট নালিশ করিয়াছিলেন, "মহাশয়, বালকদের কথা শুনিয়াছেন? বলে কি না, পৃথিবী গোল, আবার কমলালেবুর মত দুই দিকে চাপা।" এ প্রদেশেও অনেক নিরক্ষর শ্রমজীবী এরূপ বিষয়ে অজ্ঞ থাকিতে পারে; কিন্তু খাতা সম্মুখে, কলম হাতে এরূপ প্রলাপ বকিলে নিশ্চয় পাগলাগারদে লইয়া যায়। মুহুরি ঠাকুর ভাস্করাচার্য্যের দেশের উপযুক্ত অধিবাসী: হয়ত বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদের সহিত সম্পর্কেরও দাবী রাখেন।

হইয়াছে যে. কেন্দ্র হইতে সমদূরবর্ত্তী দুই স্থানের বক্রতার ঐক্য নাই। রুশিয়ার অন্তর্গত পুলকোবা (Pulkowa) মানমন্দিরের (Astronomical Observatory) অধ্যক্ষ (Director) ষ্ট্রুব সাহেব (Fredrich Georg Wilhelm Struve) খ্রীষ্টাব্দ ১৮১৬ হইতে ১৮৫২ ব্যাপী বরফ সমুদ্র (Frozen Ocean) হইতে দানুব নদী (Danube) পর্য্যন্ত যে ত্রিকোণমেতিক জরিপ (Trigonometrical Survey) করেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ঐ অংশের ভূপৃষ্ঠ কোন প্রকার নিয়মাধীন ভাবে স্ফীত নয়। ইউরোপ খণ্ডের মধ্যে ইংলণ্ড ও ইটালী তাহাদের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি হইতে বিশেষ রূপে নিম্ন।

জ্যোতির্ব্বিদগণ আলোকগতির হিসাবে নাক্ষত্রিক জগতের দূরতাদি নিরূপণ করিয়া থাকেন; আর আমরা ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীবগণ আঙুল, বিগত, হাত, বাঁউ, ইঞ্চ, ফুট, মিটর প্রভৃতি দ্বারা আমাদের ঘরকন্নার মাপ জোক করিয়া থাকি এবং দূরতা পরিমাণের জন্য ক্রোশ, যোজন, পারাসাং (প্রাচীন পারস্য), ষ্টাডিয়ম (গ্রীক), মাইল, লিগ, রি (জাপানীয়), কীরাত (মিসরি), ইত্যাদি ব্যবহার করি। জমা সময়, আলোকের দৌড় ধরিলে আমাদের চলে কৈ, সে হিসাবে ছুটিলে এক সেকেণ্ডে ৭ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা যায়। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদগণের হিসাবানুযায়ী উল্‌ফর্স্ (Wolfers) সাহেবের গণনা দ্বারা ভূপৃষ্ঠের মাপ ১৯৭-১২৪০০০ বর্গ মাইল নিরূপিত হইয়াছে। জর্ম্মণ জ্যোতির্ব্বিদ এঙ্ক (Johann Franz Encke) ভিতর বাহির সমস্তের (Planeary mass) মাপ করিয়া বলিয়াছেন, উহা ২৫৬০০০০০০০০০ ঘন মাইল। বহুদিন হইল ধরণীর ওজন ১৬৮০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ মোন নির্ণীত হয়,কিন্তু আজ কাল তৌল করিলে কিছু বেশী হইবার কথা, কারণ প্রতিদিন স্থূলতা বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা; তেমন পাল্লা পাইলে আমরাই না হয় একবার দেখি। আমাদের দ্বারা ওজন যদি অসম্ভব বোধ হয়, শুবেয়ার সাহেবের (Von Schubert) সঙ্গে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে বাহির হইয়া সোজা এক বৎসর কাল দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসা অসঙ্গত হয় কি?

বাসগৃহের অন্যান্য সম্বাদ ক্রমশ প্রকাশ্য।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (৩৬শ)

নীলাচল পথে।

শ্রীচৈতন্য পথিমধ্যে আসিয়াই সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার সঙ্গে কি আছে বল, বন্ধুগণ কাহাকে কি পথের সম্বল দিয়াছেন?" সকলেই উত্তর করিলেন, কাহারও সঙ্গে কিছু নাই। আপনার আদেশ ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই,কোন দ্রব্য আনিতে। উত্তর, "বেশ করিয়াছ; বৈরাগীর সঙ্গে কি কিছু রাখিতে আছে? আহারের ভাবনা কি? ভগবান্ দিলে বিজন বনেও আপনা হইতে আসিয়া উপনীত হয়; নির্ব্বান্ধব স্থানেও সুখস্বচ্ছন্দে কাটিয়া যায়। আর যদি তাঁহার ইচ্ছা না হয়; তবে নানা রত্নে ভাণ্ডার পূর্ণ থাকি-

সেও এক মুষ্টি মিলে না; রাজপুত্র হইলেও তাঁহারা উপবাসে দিন যায়। মনে কর অন্ন ব্যঞ্জন সকলই প্রস্তুত, এমন সময় স্ত্রীপুত্রদিগের সঙ্গে কলহ লাগিল। রাগ করিয়া গৃহস্থের সমস্ত দিন উপবাসে কাটিয়া গেল; অথবা ভোজনে বসিয়া হঠাৎ জ্বর আসিল। আর মুখের ভাতে ছাই পড়িল। তাই বলিতেছি, ভগবান না দিলে কেহ খাইতে পায় না, আর তিনি দিলে কেহই বঞ্চিত করিতে পারে না। দেখিতেছ না, সমস্ত সংসারে শ্রীকৃষ্ণ অন্নছত্র দিয়াছেন। কে কোথা হইতে আনিতেছে, কে কাহাকে দিতেছে, মনুষ্যের তো কথাই নাই, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত অবাদে কতই খাইতেছে, কতই পাইতেছে। কেবলই দীয়তাং ভোজ্যতাং বই আর নাই। এমন অন্নছত্র থাকিতে খাওয়া পরার চিন্তা কি? যাঁহারা খাওয়া পরার সকল চিন্তা চিন্তামণিকে অর্পণ করিতে পারিয়াছেন, তাহারাই সুখী। বন্ধুগণ, আমরাও যেন সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া বৈরাগ্য শিক্ষা করিতে পারি।" সমস্ত পথে এই রূপ তত্ত্ব কথা কহিতে কহিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের যাত্রীদল সন্ধ্যার সময় আঠিসারা নামক গ্রামে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। সেই গ্রামে অনন্ত পণ্ডিত নামে একজন বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। যাত্রীদল তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করত সমস্ত রজনী হরিসঙ্কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গে রাত্রি যাপন করিলেন এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া ভাগীরথির কূলে কূলে গমন করত যথাকালে ছত্রভোগ নামক গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলেন। চৈতন্যদেব যখন ছত্রভোগ দেখিয়া ছিলেন, তখন সেখানে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সাগর সঙ্গমে গমন করিতেছেন। অম্বুলিঙ্গ নামে এক জলময় শিবলিঙ্গ ছিল, তাঁহার নামে অম্বুলিঙ্গ ঘাট সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অম্বুলিঙ্গ শিবসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাইয়াছিলেন।

ভগীরথ সগরবংশ উদ্ধারের জন্য অবনীতে গঙ্গা আনয়ন করিলে, শিব গঙ্গার বিরহে আকুল হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন ও ছত্রভোগে আসিয়া জলময়ী গঙ্গা দর্শনে অনুরাগে বিহ্বল হওত আপনিও জলময় হইয়া গঙ্গাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পাঠক মহাশয়, এই আখ্যায়িকাটী পৌরাণিক হইলেও, ইহার ভাবের মূলে একবার প্রবেশ করুন। জলময়ী গঙ্গা তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া শতমুখী হইয়া সাগরসঙ্গমে চলিয়াছে; জলোচ্ছ্বাসে দিঙ্মণ্ডল উচ্ছ্বসিত হইতেছে, ইহা দেখিলে কোন্ ভাবুকের হৃদয়োচ্ছ্বাস না জন্মে, নয়ন জলে সর্ব্বাঙ্গ না জলময় হয়? এই ভাব মূলে রাখিয়াই মহাযোগী শিবের জলময়ত্ব। সে যাহা হউক, শ্রীচৈতন্য অম্বুলিঙ্গ ঘাটে উপনীত হইয়া গঙ্গার শোভা দর্শন করিয়া অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন ও নৃত্য কীর্ত্তন হুঙ্কার করিতে করিতে সবান্ধবে জলাবগাহন করিলেন। একদিকে গঙ্গার শতমুখী ধারা, অপরদিকে গৌরের নয়ন দিয়া শতমুখী ধারা, উভয় ধারা মিশ্রণে প্রেমানন্দের মহা তুফান উঠিয়া গেল। হরিনাম কীর্ত্তনে, আলাপনে, ধ্যানে, মহাভাবে গৌরের জলাভিষেক স্বর্গীয় শ্রী ধারণ করিল। জুড়িয়ার বিজন বনে পবিত্র জর্দ্দন ধারায় একদিন দেবনন্দনও এমনি করিয়া স্নান করিয়াছিলেন। ভক্তের স্নানেও ভাবের জমাট। কে বুঝে, এ ভক্তি লীলা!

জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ড হারবার সবডিবিসনে মথুরাপুর নামে থানা আছে। ঐ থানার মধ্যে জয়নগর গ্রামের ৩ ক্রোশ দূরে খাড়ী নামে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম আছে। ঐ খাড়ী গ্রামই প্রাচীন ছত্রভোগ। এক্ষণে তথায় গঙ্গা শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু অম্বুলিঙ্গ শিবমন্দির ও চক্রতীর্থ পুষ্করিণী আছে। প্রাচীন অম্বুলিঙ্গ ঘাট যে সেই খানে অবস্থিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত শিব গঙ্গার পৌরাণিক আখ্যায়িকানুসারে অতি প্রাচীন কাল হইতে এখানে চৈত্রকৃষ্ণা দ্বাদশীতে এক মেলা হইয়া থাকে। এই স্থান একটী তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। কালের কি বিচিত্র গতি! যেখানে গঙ্গাসাগরসঙ্গম ছিল, ৪০০ বৎসর পরে সেস্থান শুষ্ক। সে যাহা হউক, গৌর চন্দ্র স্নানান্তে আর্দ্র বসনে তীরে উঠিয়াও কৃষ্ণপ্রেমে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিকের তেজঃপুঞ্জ ভাব ও ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া আগন্তুক নরনারী চারিদিকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিল, দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য হইয়া পড়িল। এমন সময় দোলায় চড়িয়া এক সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং যান হইতে অবতরণ করিয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া গৌরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসীর প্রেমোচ্ছ্বাস দেখিয়া ধনীর প্রাণ গলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' আগন্তুক উত্তর করিলেন 'আমি আপনার দাস।' তখন পার্শ্বস্থ লোকে বলিয়া দিল 'তিনি দক্ষিণ রাজ্যের অধিকারী, নাম রামচন্দ্র খান।' গৌর বলিলেন "আপনি এদেশের রাজা বেশ হয়েছে; আমরা কিরূপে নীলাচলে গমন করি, বলুন দেখি?" রামচন্দ্র খান বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, 'আপনার আজ্ঞা আমার পালনীয়, তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু বর্ত্তমান সময় বড় বিষম, উৎকল ও বঙ্গরাজ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছে। সে দেশে এ দেশে যাইবার আসিবার কেহ পথ পাইতেছে না। রাজাজ্ঞায় পথিমধ্যে স্থানে স্থানে ত্রিশূল পোঁতা হইয়াছে, আগন্তুক দেখিলে প্রাণ বধ করিতেছে। তাইতো ভাবিতেছি, কোন্ দিক দিয়া আপনাদের গোপনে পাঠাইয়া দি। আবার আমিই এদেশের শান্তি রক্ষক, কোন স্থানে কিছু গোলযোগ বাধিলে যবন রাজ আমাকে রাখিবেন না। ধন, প্রাণ, ইজ্জত সব যাইবে। তাহাতে মনে বড় ভয়ও হয়। সে যাহা হউক, কপালে যাহা থাকে হইবে, আমি আজ রাত্রিতে নিশ্চয়ই আপনাদের পাঠাইয়া দিব, কোন চিন্তা করিবেন না। এক্ষণে আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে লইয়া গিয়া রামচন্দ্র খান অতিথি-দিগের সেবার আযোজন করিয়া দিলেন। গৌরচন্দ্র নীলাচলচন্দ্র দেখিবার জন্য মহা উৎকণ্ঠিত; ভাল করিয়া ভোজন করিতে পারিলেন না। ভোজনান্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মৃদঙ্গ করতাল যোগে মুকুন্দ দত্ত যখন সুস্বরে হরিগুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন এক মহাভাবের তরঙ্গ উঠিয়া গেল। গৌরচন্দ্র নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। ছত্রভোগবাসী দেখিয়া কৃতার্থ হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে সংকীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে রামচন্দ্র খান বলিলেন "ঘাটে নৌকা প্রস্তুত, গমন করিলেই হয়।" তখন শ্রীচৈতন্য হরি-

নাম স্মরিয়া সশিষ্যে তরণী আরোহণ করিয়া উড়িষ্যা রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নৌকায় উঠিয়া সেই গভীর নিশীথে মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি হরিগুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নির্ব্বোধ নাবিকগণ তাহা শুনিয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে বলিতে লাগিল "হায়! হায়! আজ বুঝি প্রাণ বাঁচিবে না। জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ, নৌকা ডুবিলে কিছুতেই রক্ষা নাই। বিশেষত এদেশে জল দস্যুর ভয়ে নৌকা বাইচ করা মহা বিপদজনক। যে পর্য্যন্ত উড়িয়ার দেশে না যাই, গোঁসাই মহাশয়েরা সে পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকুন।" তাহা শুনিয়া গায়কগণ নীরব হইলেন। তখন গৌরচন্দ্র হুঙ্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি? বৈষ্ণবের" আবার ভয়? কাহাকে ভয় করিব? তোমরা কি দেখিতেছো না সম্মুখে সুদর্শন-চক্র আমাদের রক্ষার জন্য নিয়ত ঘুরিতেছে। কাহার সাধ্য আমাদের অনিষ্ট করে? ভাই সব, বিশ্বাস চক্ষু উন্মীলন কর; ভয় ভাবনা ছাড়, নাম সঙ্কীর্ত্তন ছাড়িও না।" তখন ভক্তগণ আশ্বস্ত হইলেন। নৈশ গগণে আবার সংকীর্ত্তনের মধুর নিনাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সুদর্শন লাভ না হইলে সুদর্শনের লীলা দর্শন করা অসম্ভব। সঙ্গীগণ তাই নাবিকের ভয়সূচক বাক্যে ভীত হইয়াছিলেন।

সমস্ত পথ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে অতিবাহিত করিয়া ভক্তদল অবশেষে উৎকল রাজ্যের প্রয়াগ ঘাট নামক স্থানে আসিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন। গৌরচন্দ্র উড় দেশকে নমস্কার করিয়া সেই স্থানে গঙ্গাঘাট নামক ঘাটে স্নান করিলেন, এবং যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহাদেব দর্শন করিয়া তট পন্থায় গমন করিতে লাগিলেন। প্রয়াগ ঘাট কোন স্থানে অবস্থিত জানি না, অনুমান করি, হিজলীকাঁথি প্রদেশের স্থান বিশেষ, হইবে। মধ্যাহ্ন উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্য সঙ্গীদিগকে বলিলেন, তোমরা এই স্থানে বিশ্রাম কর, আমি ভিক্ষায় চলিলাম। এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে যাইয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার্থী হইলেন। তাঁহার অপরূপ রূপ মাধুরী দেখিয়া সকলেই সন্তোষের সহিত তণ্ডুল ও অন্যান্য উত্তম খাদ্য প্রদান করিল। সঙ্গীদিগের আহারের উপযুক্ত পরিমাণ সংগ্রহ হইলেই গৌরচন্দ্র প্রতিনিবৃত্ত হইয়া বন্ধুদিগের নিকটে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ ভিক্ষাদ্রব্য দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হুঁ, বোধ হচ্ছে পুসিতে পারিবে।' জগদানন্দ এক বৃক্ষমুলে পাক করিলে গৌরচন্দ্র সবান্ধবে মহানন্দে ভোজন করিলেন, ও হরিনামানন্দে সেই বৃক্ষমুলে যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যুষে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথের মধ্যে এক দান ঘাট; দান না পাইলে দানী নদী পার করে না। সন্ন্যাসী দেখিয়া দানী বলিল, "আপনার সঙ্গে কয় জন লোক?" গৌরচন্দ্র তখন মহাভাবে নিমগ্ন। সেই ভাবে উত্তর করিলেন, "জগতে আমার কেহ নাই, আমিও কাহারও নই। আমি একই, তুই নই, কিন্তু সকলই আমার।" বলিতে বলিতে গৌরের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। দানী বুঝিতে না পারিয়া বলিল "গোসাই! আপনি নৌকায় উঠুন, এ সকল লোকের কড়ি না পাইলে পার করিব না। গৌরচন্দ্র

নিমগ্নচিত্তে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নৌকায় উঠিয়া পর পারে যাইয়া মাথা হেট করিয়া বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। দানী এই স্বর্গীয় ছবি দেখিয়া প্রথম পারে প্রত্যাগমন করিয়া নিত্যানন্দাদিকে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা কে? কাহার লোক? আর ঐ সন্ন্যাসী ঠাকুরই বা কে? আমাকে ভাঙ্গিয়া বলুন।" নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন, "উনি জগদ্বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর; আমরা উহাঁর কিঙ্কর।"

দানী। তবে উনি আপনাদের অস্বীকার করিলেন কেন?

নিতাই। তাঁর লীলা কে বুঝিবে? তখন দানী তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিয়া ব্যাকুল প্রাণে গৌরের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল ও অপরাধ ক্ষমা চাহিল। শ্রীচৈতন্য দানীকে কৃপা করিয়া চলিতে লাগিলেন এবং কতক দূরে স্বুবর্ণ রেখা নদী পার হইয়া নদীজলে অবগাহন করিলেন ও অতিব্যস্ত সমস্ত হইয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিলেন। নিত্যানন্দ ও জগদানন্দ পাছে পড়িয়া রহিলেন। কতক দূরে যাইয়া গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জন্য এক বৃক্ষমূলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এ দিকে জগদানন্দ নিত্যানন্দকে এক স্থানে বসিতে বলিয়া ভিক্ষান্বেষণে গ্রামে চলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ড গাছটী জগদানন্দ বহন করিয়া আসিতেছিলেন। ভিক্ষায় যাইবার সময় জগদানন্দ তাহা নিত্যানন্দের কাছে রাখিয়া গেলেন। নিতাই দণ্ড পাইয়া বসিয়া চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং দণ্ডকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওহে দণ্ড, আমি যাহাকে সদা হৃদয়ে বহিয়া বেড়াইতেছি, তিনি যে তোমাকে বহিবেন, এ তো ভাল নয়। এই বলিয়া বিরক্তি সহকারে নিতাই দণ্ডখানি তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া হাসিতে লাগিলেন। জগদানন্দ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভগ্ন দণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি এ" প্রভুর দণ্ড কে ভাঙ্গিল? নিতাই উত্তর করিলেন, "তাঁহার দণ্ড তিনিই ভাঙ্গিয়াছেন, আর কাহার সাধ্য তাহা ভাঙ্গিতে?" জগদানন্দ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ভাঙ্গা দণ্ড তিন খানি কুড়াইয়া লইয়া কিছু বিষণ্ণ অন্তরে যেখানে গৌর তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সেইখানে তাঁহার অগ্রে খণ্ডগুলিকে ফেলাইয়া দিলেন। গৌর বলিলেন, আমার দণ্ড ভাঙ্গিল কে? তোমরা পথে কি কাহারও সঙ্গে কলহ করিয়াছ? জগদানন্দ উত্তর করিল, নিত্যানন্দ বিহ্বল চিত্তে এই কুকার্য্য করিয়াছেন। গৌর একটু ক্রুদ্ধ ভাবে নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য তুমি আমার দণ্ড ভাঙ্গিলে? নিতাই বলিলেন, হাঁ, এক খান বাঁশ ভাঙ্গিয়াছি; যদি ক্ষমা করিতে না পার, যে সাস্তি উচিত মনে কর দাও। গৌর বলিলেন, "যাহাতে সর্ব্বদেব অধিষ্ঠিত, তাহা তোমার মতে বাঁশ নাম হলো; আচ্ছা হলো হলো আমার এক মাত্র সঙ্গী দণ্ড খানি ছিল, তাহা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন আমার আর কেহ সঙ্গী নাই। হয় তোমরা আগে যাও, না হয় আমাকে যাইতে দাও।" মুকুন্দ গতিক বুঝিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমিই তবে আগে যাও, আমরা পিছে যাচ্ছি। ভাল, তাহাই হউক, বলিয়া গৌরচন্দ্র আগে আগে ছুটিয়া চলিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, দণ্ডভঙ্গ লীলার গূঢ় তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু জাগা গোড়া

বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই মনে হয় যে, লৌকিক সন্ন্যাসের আড়ম্বরে ধর্ম্ম হয় না, তাহাই প্রতিপাদন করা গৌর ও নিতাই-য়ের মনের উদ্দেশ্য ছিল। নিত্যানন্দের উপর যে গৌরের কোপ, সে কৃত্রিম ক্রোধ মাত্র।

চৈতন্যচন্দ্র একাকী পদ ব্রজে যখন জলেশ্বর নামক গ্রামে উপনীত হইলেন, তখন দেব স্থানে জলেশ্বর মহাদেবের মহা-ধুম ধামে পূজা হইতেছে। বহুবিধ বাদ্য কোলাহল শুনিয়া তিনি মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন এবং পূজার ব্যাপার দেখিয়া ও বাদ্য নিনাদ শুনিয়া পূর্ব্ব সঞ্চিত ক্রোধ ভুলিয়া গেলেন এবং প্রেমাবেগ উচ্ছ্বসিত হওয়ায় বাদ্যের তালে তালে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ জলেশ্বরে আসিয়া দেখিলেন যে, গৌরাঙ্গ মত্ত মাত-ঙ্গের ন্যায় তখন মহা নৃত্যে বিভোর। মুকুন্দ কীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহা শুনিয়া গৌরের নৃত্য দ্বিগুণ মাত্রায় চড়িয়া উঠিল। অনেকক্ষণ পরে ভাবাবেগ শমিত হইলে, গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের উপর ক্রোধ করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। নিতাইকে বলিলেন, কোথায় তুমি আমাকে ধৈর্য্য শিক্ষা দিবে ও আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম যাহাতে বজায় থাকে, তাহা করিবে, না আরও আমাকে পাগল করিয়া তোলো; নিতাই, ভাই, আর যদি তেমন কর, তবে আমার মাথা খাও। সে রাত্রি জলেশ্বরে অবস্থিতি করিয়া যাত্রীদল প্রাতে পথ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমানে জলেশ্বর গ্রাম অতিবাহিত করিয়া স্বুবর্ণ রেখা পার হইতে হয়; কিন্তু চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রাম স্বুবর্ণরেখার অপর পারে থাকা, এই বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে।

পথি মধ্যে বাঁশদহ গ্রামে এক মদ্যপায়ী শাক্তকে কৃপা করিয়া গৌরচন্দ্র রেমুণা নগরে আসিয়া ক্ষীরচোরা গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। বালেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে রেমুণা অবস্থিত। এখানে গোপীনাথ বিগ্রহের মহিমায় ফাল্গুন মাসে এক মেলা বসিয়া থাকে। পূর্ব্বে মাধবেন্দ্র পুরী গোবর্দ্ধনে গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার আদেশে নীলাচলে মলয়জ চন্দন আনিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে রেমুণায় আসিয়া গোপীনাথের অমৃত কেলি নামক ক্ষীর প্রসাদ দেখিয়া, পুরীর তাহা নিজে আস্বাদ করিয়া গোপালকে ভোগ দিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু পুরীর অযাচিত বৃত্তি; কেহ চেষ্টা করিয়া খাইতে দিলে ভোজন করেন, নতুবা উপবাসী থাকেন। ক্ষীর প্রসাদ খাইবার বাসনা জাগ্রত হওয়ায় পুরী মনে মনে লজ্জিত হইলেন এবং বিষ্ণু স্মরণ করিয়া অন্যত্র যাইয়া রজনী যাপন করিলেন। এ দিকে গোপীনাথ পূজারীকে স্বপ্নযোগে বলিলেন যে, ১২ খানি ক্ষীরের মধ্যে তিনি এক খানি পুরীকে খাওয়াইবেন বলিয়া ধড়ার অঞ্চলে লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা লইয়া গিয়া পুরীকে দেওয়া হউক। পূজারী সেই নিশীথ সময়ে বাজার যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন "কাহার নাম মাধবেন্দ্রপুরী:—তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন, আসিয়া ভোজন কর।" সেই হইতে গোপীনাথের নাম ক্ষীরচোরা গোপীনাথ হইল। মাধবপুরীর এই প্রেম-কাহিনী পূর্ব্বে গৌরচন্দ্র স্বীয়াভীষ্ট দেব

ঈশ্বরপুরীর নিকট শুনিয়াছিলেন। সঙ্গীগণকে তাহাই বিস্তৃত আকারে বলিয়া প্রেমে গদগদ হইলেন এবং পূজারী প্রদত্ত ক্ষীর প্রসাদ ভোজন করিয়া উষাকালে গন্তব্য পথে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে যাত্রীদল যাজপুরে বিরজাক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইল। এখানে বৈতরণী নদী প্রবাহিত এবং অসংখ্য দেবালয় অবস্থিত। কিছু-দূরে নাভিগয়া ও বিরজা-মন্দির। একে যাজপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর; তাহাতে আবার অসংখ্য দেবালয়ে দেবা-র্চ্চনার সময় যুগপৎ শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর শব্দে দিঙ্মণ্ডল আন্দোলিত হইলে আপনা হই-তেই প্রাণে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে লইয়া প্রথমে দশা-শ্বমেধ ঘাটে স্নানাবগাহন করিয়া আদি বরাহ মন্দিরে যাইয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। যাজপুরের দৃশ্যে গৌরচন্দ্র বড়ই আনন্দা-নুভব করিতে লাগিলেন এবং নির্জ্জন বিহারের জন্য ব্যাকুল হইয়া সঙ্গীদিগকে ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন। সঙ্গীগণ সোদ্বেগে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন বিষণ্ণ চিত্তে এক বৃক্ষতলে রজনী যাপন করিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্য যাজপুরের দ্রষ্টব্য সকল স্থান দেখিয়া এক নির্জ্জন স্থানে যাইয়া ধ্যান সমাধিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে বন্ধুদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে আনন্দে হরি ধ্বনি করিয়া রাজপথে বাহির হইলেন এবং যথাসময়ে কটকনগরে পুণ্য-সলিলা মহানদীতে স্নান করিয়া সাক্ষী গোপাল মন্দিরে আগমন করিলেন। এই-খানে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ মুখে সাক্ষী গোপালের বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রেমে গদ্গদ হইয়াছিলেন। *

নিত্যানন্দ পূর্ব্বে তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া এই বৃত্তান্ত লোক মুখে শুনিয়া গিয়া-ছিলেন। আজ সুযোগ পাইয়া তাহাই শ্রীচৈতন্যের নিকট বিবৃত করিলেন। এখান হইতে যাত্রীদল ভুবনেশ্বর তীর্থে গমন করিলেন। ভুবনেশ্বর শিবধাম ও মহাতীর্থ; পুরীর ১১।১২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ভুবনেশ্বরের মন্দির এক আশ্চর্য্য শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় স্থল। কোটী ক্ষুদ্রায়তন শিবমন্দির দ্বারা ইহা সুবেষ্টিত। কুণ্ডিত

* বিদ্যানগরের দুইটী ব্রাহ্মণ তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়া কোন সময়ে বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া ছিলেন। ইঁহাদের একজন বয়োবৃদ্ধ ও সৎকুলীন; অপর জন যুবক এবং জাত্যংশহীন। যুবকের সেবায় তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোবিন্দ দেবালয়ে গোপাল বিগ্রহের সম্মুখে তাঁহাকে স্বীয় কন্যা দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশে প্রত্যাগত হইলে স্বজন দিগের প্রেরণায় ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা পালনে অসম্মত হইলেন এবং কবে কি বলিয়াছেন, স্মরণ নাই বলিয়া যুবকের কথা উড়াইয়া দিলেন। তাহাতে সেই যুবা বৃন্দাবনে যাইয়া গোপাল বিগ্রহকে প্রসন্ন করিয়া সঙ্গে আনিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে সাক্ষী দেওয়াইলে বৃদ্ধ বিপ্র তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন। তদবধি দেবতার নাম সাক্ষী গোপাল হইল ও বিদ্যানগরে তাঁহার সেবা প্রতিষ্ঠিত হইল। পরবর্ত্তী সময়ে উৎকল রাজ পুরুষোত্তম দেব ঐ দেশ জয় করিয়া গোপালকে কটকে আনিয়া মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং রাজ সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার মহিষীকে গোপাল স্বপ্নে বহুমূল্য মুক্তা নোলক চাহিয়া লইয়া নাসাতে পরিয়া ছিলেন। এক্ষণে সাক্ষী গোপাল মন্দির কটক হইতে প্রায় দিন মানের পথ ব্যবধানে, পুরী যাইবার পথে অবস্থিত।

আছে, কেশরী বংশের সুবিখ্যাত রাজা যযাতি কেশরী ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন; আর ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রপৌত্র রাজা ললাটেন্দু কেশরীর সময়ই ইহা সম্পূর্ণ হয়। ক্রমাগত ১৫৭ বৎসর ধরিয়া এই বিশাল দেবমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিয়াছিল। ভুবনেশ্বরে বিন্দু সরোবর নামে পূতসলিলা প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আছে। কথিত আছে, ভগবান্ মহেশ্বর সর্ব্বতীর্থের জল বিন্দু বিন্দু আনিয়া এই সরোবর সৃজন করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর গুপ্ত বারাণসী। স্কন্দ পুরাণে ভুবনেশ্বরের উৎপত্তি বিষয়ে লিখিত আছে যে, কাশীরাজ নামে বারাণসীর রাজা কোন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে জয় করিবার ইচ্ছায় কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া তল্লব্ধ বরে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে সমরযাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমরে আপনি নিহত হইলেন ও তাঁহার রাজধানী বারাণসীও ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র মহা বিক্রমে শিবের দিকে ধাবিত হইলে, মহাদেব ভয়ে ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন ও অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় বাসস্থান বারাণসী নগরী ভস্মীভূত হওয়ায় বাস করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান ভিক্ষা করিলেন। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ সদয় হইয়া শ্রীক্ষেত্রের উত্তরে একাম্রক নামক বনভূমি তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এই স্থানই কালে ভুবনেশ্বর বলিয়া বিখ্যাত হইল। এই আখ্যায়িকার মূলে কি সত্য আছে, জানি না, কিন্তু ইহা যে শৈব ধর্ম্মের উপর বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয় কালে রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভুবনেশ্বরের অন্ন প্রসাদ শ্রীক্ষেত্রের মহাপ্রসাদের ন্যায় জাতি নির্ব্বিশেষে স্পর্শ ও ভোজন করিতে পারে, কিন্তু অন্যত্র লইয়া যাইতে পারে না।

শ্রীচৈতন্য ভুবনেশ্বর দর্শনে মহাসুখী হইলেন এবং বিন্দু সরোবরে অবগাহন করিয়া শিবভাবে বিভোর হইয়া কতই নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। সঙ্গীগণ সঙ্গে প্রত্যেক শিবমন্দির পরিক্রম করিয়া মহোল্লাসে নাচিতে নাচিতে তিনি কোপিলেশ্বর শিবস্থানে উপনীত হইলেন। ভুবনেশ্বরের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে কিঞ্চিৎ ন্যূন এক মাইল ব্যবধানে কোপিলেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এ মন্দির ভুবনেশ্বরের ন্যায় জমকাল না হইলেও একটি বিখ্যাত তীর্থ।

বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে কোপিলেশ্বরকে কপোতেশ্বর নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কেন এইরূপ নামান্তর কথিত হইল বলিতে পারা যায় না, কিন্তু উভয় নামই যে এক স্থান নির্দ্দেশক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোপিলেশ্বর হইতে গৌরচন্দ্র কমলপুরে আসিয়া ভার্গবী নদীতে স্নান করিলেন। মহানদী হইতে কৈয়াকই নামে যে শাখা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাই আবার কিছু দূরে আসিয়া দয়া ও ভার্গবী নামে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃতের মতে গৌরের কোপিলেশ্বরের শিব দর্শনে অনুপস্থিতি সময়ে কমলপুরে নিত্যানন্দ দণ্ড ভঙ্গ করিয়া ভগ্নখণ্ডত্রয় ভার্গবীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। কমলপুর হইতে জগন্নাথের দেউলধ্বজা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্য ধ্বজা দর্শনে প্রেমে অস্থির ও বিহ্বল হইয়া পশ্চাদুদ্ধৃত অর্দ্ধ শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে পাগলের ন্যায় চলিতে লাগিলেন:—

প্রাসাদাগ্রেনিবসতি পুরঃস্মেরবক্ত্রারবিন্দে।
মামালোক্য সস্মিতবদনোবালগোপালমূর্ত্তিঃ।

অর্থ—"প্রাসাদের অগ্রমূলে ভগবান বালগোপাল মুর্ত্তিতে আমাকে দেখিয়া কতই হাসিতেছেন।"

গৌরের হৃদয় ভাবময়। মন্দির ধ্বজা দেখিয়া কত ভাবতরঙ্গই তাঁহার প্রাণে উঠিতে লাগিল, কে বলিবে। এইরূপে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে, আছাড় খাইতে খাইতে তিনি চারিদণ্ডের পথ তিন প্রহরে অতিবাহিত করিয়া আঠার নালায় আসিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। চরিতামৃতের মতে, এই স্থানে আসিয়া নিত্যানন্দের নিকট দণ্ড চাহিলেন। তাহা তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন শুনিয়া, পূর্ব্বের বর্ণনানুসারে নিত্যানন্দাদির সহিত কলহ করিয়া তিনি তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে অগ্রগামী হইয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য ভাগবতকার বলেন যে, আঠার নালায় আসিয়া শ্রীচৈতন্য বন্ধুদিগকে বলিলেন "প্রিয় সুহৃদগণ! তোমরা আমাকে নীলাচলে আনিয়া জগন্ননাথ দর্শন করাইয়া প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিলে, এক্ষণে নিবেদন যে, আমি একাকী যাইয়া শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিব, হয় তোমরা অগ্রগামী হও, না হয় আমাকে আগে যাইতে দাও," মুকুন্দ বলিলেন, তুমি অগ্রগামী হও, আমরা প্রাতঃকৃত্য সারিয়া পশ্চাৎবর্ত্তী হইব। তাহা শুনিয়া চৈতন্য গোঁসাই মহানন্দে একাকী অগ্রবর্ত্তী হইলেন এবং অচিরে জগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া জগমোহনে দাঁড়াইয়া নীলাচলনাথকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণে কতই প্রেম, কতই ভাব, কতই উচ্ছ্বাস হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। সেই সময়ে উৎকল রাজসভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। প্রথমে তিনি নবাগত সন্ন্যাসীর দিকে বড় একটা লক্ষ্য করেন নাই। দর্শন করিতে করিতে গৌরের ভাব সিন্ধু উথলিয়া উঠিল, তিনি আত্মসংযম করিতে পারিলেন না। প্রেমাবেগের সঙ্গে সঙ্গে জগন্নাথ বিগ্রহকে কোলে করিবার জন্য তাঁহার মনে দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছার উদ্রেক হইল; আর তিনি মন্দিরের মধ্যে যাইতে উদ্যত হইয়া এক উল্লম্ফ প্রদান করিলেন। পরিহারিগণ ছড়ি হাতে তাঁহাকে মারিবার জন্য চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল। তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে পড়িয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ইহা দেখিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য সমাগত হইয়া হা হা করিয়া পড়িলেন। ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়া পরিহারিগণ প্রহারে ক্ষান্ত হইল। সার্ব্বভৌম অপরূপ মূরতি সন্ন্যাসী দেখিয়া, তাঁহার যৌবনের সৌন্দর্য্য ও ভাবের প্রগাঢ়তা দেখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন যে, ইনি কোন মহাপুরুষ হইবেন। তখন তিনি নানা প্রকারে আগন্তুকের চৈতন্য সম্পাদনার্থে যত্ন করিলেন এবং কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ও ভোগের সময় উপস্থিত দেখিয়া, তিনি পরিহারিদিগের দ্বারা মূর্চ্ছিত গৌরচন্দ্রকে হাতাহাতি করিয়া বহাইয়া স্বভবনে আনাইলেন এবং এক নিভৃত কক্ষে শয়ন করাইয়া রাখিলেন। গৌরের মূর্চ্ছার ভাব গতিক দেখিয়া ভট্টাচার্য্য একটু উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন; কিন্তু যখন নাসিকার নিকট তুলা ধরিয়া দেখিলেন যে, তুলা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে, তখন ভয়ের কারণ নাই জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ব্রহ্মজ্ঞান ও পৌত্তলিকতা।

(২)

আমরা বলিয়াছি যে, জ্ঞানের দিক হইতে দেখিলে, সাকার ও নিরাকারে বড় একটা বিবাদ বিসম্বাদ থাকে না; কেন না, জ্ঞানের একপীঠ যেমন সাকার, অন্য পীঠ তেমনি নিরাকার। যে জ্ঞানের এই দুইটী পীঠ নাই, সে জ্ঞান জ্ঞানই নয়। সাকার বর্জ্জিত জ্ঞান, অথবা নিরাকারের সংশ্রব রহিত জ্ঞান, সম্ভব হইলেও তাহা অজ্ঞেয়। সাকার ও নিরাকারের মধ্যে এই রকম ভাবে যদি সখ্যতা স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান ও পৌত্তলিকতার মধ্যে যে চিরশক্রতা আছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা ঘুচাইবার পক্ষে আমাদিগের কতটুকু সুবিধা হইয়া উঠে, তাহা দেখা যাউক।

দেখিতে গেলে বড় একটা সুবিধা বিবেচনা হয় না। আমরা যে জ্ঞানের কথা লইয়া এক্ষণে নাড়াচাড়া করিতেছি, তাহার গোটাটাই ত বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত। এমন বৈষয়িক পরিবর্ত্তনশীল জ্ঞানের সহিত পারমার্থিক নিত্য জ্ঞানের তুলনা কোথায়? বুঝিলাম যে, আমাদিগের জ্ঞানের এক পীঠ সাকার, অন্যপীঠ নিরাকার, এক পীঠে ভাব, অপর পীঠে অভাব; কিন্তু তাহাতে আর বেশী ফল কি হইল? এই-রকম জ্ঞানকে ব্রহ্মজ্ঞান কে বলিবে? তা' যদি হয়, তাহা হইলে সকল জ্ঞানকেই ত ব্রহ্মজ্ঞান বলিতে হয়। যদি বল বৈষয়িক জ্ঞানের তলাতেই কি অসীম ভাব নাই? আছে, কিন্তু তথাপি এরূপ অসীম ভাব, পারমার্থিক জ্ঞানের বিষয় নহে ও হইতে পারে না। কেন—তাহা বলিতেছি।

অসীম ও সসীম, সাকার ও নিরাকার আদি করিয়া ভাবাভাব ভেদে জ্ঞানের যে দুইটী অংশ পাওয়া যায়, তাহার এক অংশ ছাঁটিয়া ফেলিলে, জ্ঞান স্বয়ং অজ্ঞেয়ত্বে পরিণত হয়, কিছু নাই অথচ জ্ঞান স্বয়ং শূন্যে ভাসিতেছে, এমন নির্ব্বিষয়ী নিরপেক্ষ জ্ঞানই যদি পারমার্থিক জ্ঞানের সার অর্থ হয়, তাহা হইলে পারমার্থিক জ্ঞান থাকা না থাকা এক প্রকার সমান কথা হইয়া দাঁড়ায়। অতএব যাঁহারা এইরূপ কহেন যে, বৈষয়িক জ্ঞানের ভিতর হইতে সাকার মাত্রাবিশিষ্ট যাবদীয় পদার্থ বাদ দিতে দিতে, সাকার সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হইয়া আসিলে, তবে ছাঁকা খাঁটি ব্রহ্মজ্ঞান পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের মতে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণ একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার—তাহা আমাদিগের জ্ঞানের সম্পূর্ণ অগম্য। জ্ঞান বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার ভিতর উপরোক্ত দুইটি ভাব থাকিবেই থাকিবে। অতএব কি বৈষয়িক জ্ঞান, আর কি পারমার্থিক জ্ঞান, কোন জ্ঞানই জ্ঞানের মূল স্বরূপকে এড়াইয়া যাইতে পারে না। তবে উক্ত দ্বিবিধ জ্ঞানের মধ্যে বিভিন্নতা এই যে, বৈষয়িক জ্ঞানে যে অসীম ভাব পাওয়া যায়, তাহা অভাবাত্মক; সে অসীম ছায়ার ন্যায় সসীমের অনুবর্ত্তী; এই জ্ঞানে সসীম ও সাকারই জাগ্রত, অসীম ও নিরাকার ঘোর নিদ্রিত। পারমার্থিক জ্ঞানে ঠিক

তাহার বিপরীত লক্ষণই প্রকাশ পায়। এই খানে সসীম বা সাকার, ছায়ার ন্যায়, কলের পুত্তলিকার ন্যায়, অসীম ও নিরাকার ভাবের অনুসরণ করে। বৈষয়িক জ্ঞানের ন্যায় পারমার্থিক জ্ঞানে অসীম ভাব নাস্তির সহিত, অভাব বা অন্ধকারের সহিত, তুলনীয় নহে। এখানে অসীম ও নিরাকার ভাবই একমাত্র আলোক স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হয়।

একই জ্ঞানে এমন বিপরীত ও বিরোধী লক্ষণাপন্ন প্রকার ভেদ জন্মায় কিসে? আমরা বলি আশ্রয় ভেদে ও লক্ষ্য ভেদে। আশ্রয় ও লক্ষ্য ভেদে বলিবার মানে এই যে, আশ্রয়ীভূত বিষয় গতিশীল হইলেও নিশ্চল বলিয়া বোধ হয়; আর তৎকালে নিশ্চল পদার্থ সমূহে লক্ষ্য স্থির করিলে, তাহারা নিশ্চল হইলেও আমাদিগের নিকট সচল বলিয়া বোধ হয়। যখন আমরা জড় জগতে অবস্থিত হইয়া, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়িক বিষয়াদিকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞানালোচনা করিতে যাই, তখন তাহারাই জ্ঞানের আসল বিষয় হইয়া উঠে; সুতরাং তাহার তুলনায়, নিরাকারের ভাব নিতান্তই অস্থির ক্ষণভঙ্গুর দুর্ব্বোধ্য স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়;—হইবারই কথা। এমন আশ্রয় যদি বদলাইয়া যায়, জড় জগত হইতে আসন গুটাইয়া লইয়া আপনাতে যদি আসন পাতিয়া বসা যায়, আর সেখান হইতে জড় জগতের দিকে তাকান যায়, তাহা হইলে বোধ হইতে থাকে যে, 'আমিত্ব' যাহা, তাহার আর নড়-চড় নাই; ধ্রুব নক্ষত্রের মত চিরস্থির; আর এই যে সসীম ও সাকার জগত—ইহা অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল, এই আছে এই নাই; সুতরাং ইহা অভাব অবিদ্যা মায়ার একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থল। অতএব আশ্রয় ও লক্ষ্য ভেদে জ্ঞানের উক্ত দ্বিবিধ অংশের সত্যতা সমান ভাবে সকল সময় বোধ হয় না।

পারমার্থিক জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদিগের আর একটু বলিবার আছে। বৈষয়িক জ্ঞান বাহ্য বিষয়ের অন্বেষণে প্রবৃত্ত থাকিয়া বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে, পারমার্থিক জ্ঞানে তাহা আর ঘটে না। আমি স্বয়ং ইহার আলোচ্য বিষয় বিধায়, সহজেই ইহা অন্তর্ম্মুখী হইয়া উঠে। বৈষয়িক জ্ঞান যেমন একদিকে, বাহ্যজগতের মূল তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া দেখিতে চায়; পারমার্থিক জ্ঞানও ঠিক সেই প্রকার অপর দিক হইতে, অন্তর্জগতের বা সাদা কথায়—আপনার নিজের গোড়া কোথায়—তাহা আবিষ্কার করিয়া ফেলিতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু বৃথা চেষ্টা; উভয় দিকেই সেই মূল অজ্ঞেয়। সে একটা এমন জায়গা, যে সেখানে ডগা গোড়া কিছুই পাওয়া যায় না; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকার পাওয়াই আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

আসল কথা—জগতে ও আমাতে এমনি একটা বাঁধাবাঁধি আছে যে, সে বাঁধন ছিঁড়িলে দুইটাই অকূল অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধময় জগতে যদি শব্দস্পর্শাদি বোধসমূহের কোন বোধ না থাকা উচিত, তাহা হইলে কে বলিত, এ জগত ব্যক্ত? আর জগত যদি ব্যক্ত না হইত, ত কোথায় থাকিত আমাদিগের জ্ঞান? জগত অব্যক্ত হইলেই জ্ঞান সুষুপ্ত হয়; আর জ্ঞান সুষুপ্ত হইলেই জগতে প্রলয় উপস্থিত হয়। অব্যক্তের মানে ইন্দ্রিয়াতীত অজ্ঞেয়; আর ব্যক্তের মানে ইন্দ্রিয়াধীন—জ্ঞেয়। এখন যদি বিচার করিয়া দেখা যায় যে, জগত ইন্দ্রিয় প্রভব, না ইন্দ্রিয়ই জগত প্রভব, রূপ

কোথায়—আমার চক্ষুর স্নায়ু গোলকের ভিতর, না এই দৃশ্য পদার্থের ভিতর; তাহা হইলে বলিতে হয় যে, যিনি বলেন রূপ আমার চক্ষুর ভিতর; আর যিনি কহেন তাহা নহে, রূপ এই দৃশ্যমান পদার্থের মধ্যে, তাঁহাদের উভয়েরই উত্তর ঠিক। দ্রষ্টা দর্শন ও দৃশ্যের মধ্যে ও জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে এমন একটা অপরিহার্য্য সম্বন্ধ আছে যে, একটির উদয় হইলে অপরগুলি যুগপৎ আপনা হইতেই আসিয়া উদয় হয়।

অতএব আমি যেমন জগতের ছাঁচে ঢালা 'কিছু,' জগতও তেমনি আমার ছাচে ঢালা 'কিছু'। আমি যেমন জগতের নিকট স্বরূপ লাভ করি, জগতও তেমনি আমার নিকট হইতে তাহার স্বরূপ লাভ করে। ফলতঃ জগত যদি না থাকিত, এ পাঞ্চভৌতিক দেহ যদি না পাইতাম, তাহা হইলে আমার দশা কি হইত? যে দশা হইত, তাহা কি আমার ভাবিয়া ঠিক করিবার কোন উপায় আছে? চারিদিক হইতে পাঞ্চভৌতিক অনুভব প্রবাহে, চিন্তা প্রবাহ উত্থিত হইয়া, আমাকে চেতনা দিয়াছে ও দিতেছে; আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে, এই স্রোত যদি বন্ধ হয়, তাহা হইলে আমার জায়গায় আমার পরিবর্ত্তে, কার্য্যহীন শক্তিবৎ, জন্মান্ধের দর্শন শক্তিবৎ, অজ্ঞান ও অচেতনবৎ যাহা একটি থাকে, তাহাকে অজ্ঞেয় অননুভাব্য 'কিছু' ছাড়া, আমাদিগের আর কিছুই বলিবার অধিকার থাকে না। আর অন্যদিকে আমি নিজে যদি, না থাকিতাম, তাহা হইলে এই জগতকে অনুভব করিত কে? শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—ইহারা কি? আমারই ত ইন্দ্রিয়ের খেলা। স্থান কাল—ইহারাই বা কি? আমারই ত মনের ক্রিয়া। স্থান কাল য না থাকিত, রূপ রস গন্ধ আদি যদি থাকিত, তাহা হইলে এই জগত কোথা থাকিত? এক অর্থে জগত মানে কি—ইন্দ্রিয়ের বিকার। এই সকল ইন্দ্রিয় গোড়ায় যদি না থাকে, তাহা হইলে, জগতের উপর যে একটা ঘোর অন্ধকার যবনিকা আসিয়া পড়ে, তাহা সরাইবার আর কোন উপায় থাকে না। অতএব জগতে ও আমাতে যে বাধ্য বাধকতারূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা কদাপি বিচ্ছিন্ন হইবার নহে।

অতএব সেই পারমার্থিক জ্ঞানই ঠিক, যাহা সাকার হইতে নিরাকারকে, অথবা নিরাকার হইতে সাকারকে, টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া সাকারকে বজায় রাখিয়া, জগতকে জীবন্ত রাখিয়া আপনার মূলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। এই স্থলে একটি মহা আপত্তি উঠিতে পারে এই যে, আত্মমূলই যদি পারমার্থিক জ্ঞানের আলোচ্য হয়, আর সেই আত্মমূলকেই যদি প্রকৃত অসীমতত্ত্ব বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেই বা তৎ অজ্ঞেয়ত্ব খণ্ডন হয় কই? সাকার ও নিরাকার যে আকারে খণ্ডতা প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানের জ্ঞানত্ব সংসাধিত হয়, মুলে উক্ত দ্বিবিধ ভাবের তদাকারত্ব কদাচ প্রযুক্ত্য হইতে পারে না; সুতরাং মুল অজ্ঞেয় হইয়া পড়ে। সাকার ভেদে ও সাকারের তারতম্যে, জ্ঞানের বহুবিধ রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। স্থুল সাকারবেষ্টিত জ্ঞানে সূক্ষ্ম জ্ঞান উপলব্ধি হয় না; গভীর নিদ্রায় যে স্বপ্ন দেখা যায়, জাগিয়া উঠিলে তাহা মনে থাকে না; গর্ভাবস্থায় যখন ছিলাম, তখন এই জ্ঞান কি আকারে ছিল, সাকার পদার্থে

গঠিত কোন্ কোন্ অলঙ্কার তাহার অঙ্গে শোভা পাইত, সবই ভুলিয়া গিয়াছি, কিছুই মনে নাই। এতটুকু আগেকার জ্ঞান, যদি এখনকার জ্ঞানে উপলব্ধি না হয়, তাহা হইলে মূলে জ্ঞানের যে স্বরূপ ছিল, তাহা অনুভব হইবে কিরূপে? আমাদিগের জ্ঞানের বর্ত্তমান রূপ পঞ্চে-ন্দ্রিয় দ্বারা অঙ্কিত; সুতরাং তাহা সওয়ায় অপর একটি ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের কল্পনাও আমরা এক্ষণে করিতে অক্ষম; কিন্তু এমন যদি জীব কোন জগতে থাকে, যাহার শতাধিক ইন্দ্রিয়, তাহা হইলে সেই জীব সেই শতাধিক ইন্দ্রিয় দ্বারা, শতাধিক দিক হইতে, যে জ্ঞান পায়: আমরা কি তাহার কোন কল্পনা করিতে পারি? এমন যদি হয় যে, আজ আমাদিগের যে জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি বই নয়, জ্ঞানের ঔৎকর্ষক্রমে অথবা কোন অজ্ঞাত কারণে, যদি ইহার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, দলে পুষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাদিগের কালিকার জ্ঞান আজিকার জ্ঞানের সম্পূর্ণ অগম্য হইয়া পড়ে। অতএব আমার আপনার গোড়া যদি আমার নিকটে অজ্ঞেয়ই রহিয়া গেল, তবে আর হইল কি? সকল দিকেইত সমান অন্ধকার, সমান গোলযোগ। কেবল যুক্তির চরণে রাশি রাশি ফুলচন্দন ডালি দিলে কি হইবে, ওদিকে যে আকাঙ্ক্ষার মুখে স্তূপাকার ছাইভস্ম পড়িতেছে। আকাঙ্ক্ষা যে চায়, আয়ও করি, তাহার কি হয়?

এবম্বিধ আপত্তিতে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, আত্মমূলকে যদি অসীমতত্ত্ব বা ব্রহ্মরূপে নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে ইহাকে অপর দিকের মত সমান অন্ধকার বলা যাইতে পারে না। আত্মমূলও অজ্ঞেয় বটে, কিন্তু এই অজ্ঞেয়ত্বে কিছু বিশেষত্ব আছে। সে বিশেষত্ব এই—অজ্ঞেয় শব্দের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে; এক অর্থে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞান সমতুল্য, যাহা কোন উপায়ে, কোন আকারে, কোন অবস্থায় কোন কালে জ্ঞানগম্য হয় নাই ও হইতে পারে না ও হইবে না, এক অর্থে অজ্ঞেয় বলিতে তাই বুঝায়; জ্ঞান নহে বলিয়া যাহা অজ্ঞেয় হয়, তাহা আর কদাচ জ্ঞেয় হইতে পারে না। এবম্বিধ অজ্ঞেয় তত্ত্বের আলোচনায় কিছুই ফল নাই, কিন্তু অজ্ঞেয় শব্দের আর এক প্রকার অর্থ আছে, তাহাতে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত, এক কথা বলিয়া বোধ হয়। এমন কালী আছে, যা দিয়া লিখিলে কাগজের উপর কোন দাগ লক্ষিত হয় না, কাগজ খানি যেমন সাদা তেমনি থাকিয়া যায়; কিন্তু সেই কাগজ খানি অগ্নির উত্তাপে ধরিলে, অথবা তাহার উপর এক পোঁছ অন্য কোন জিনিস মাখাইলে, রাসায়নিক প্রকরণ বিশেষে, তাহাতে সুস্পষ্ট লেখা সমস্ত ফুটিয়া উঠে। কাগজ খানি যতক্ষণ না আগুনে ধরা হইয়াছিল, অথবা তাহাতে অপর কোন জিনিস মাখান না হইয়াছিল, ততক্ষণ কে জানিত যে, এমন সাদা কাগজের অঙ্কে, এতগুলি অক্ষর লুকাইয়া আছে। অতএব গোড়ায় যাহা অজ্ঞেয় থাকে, তাহা কোন না কোন একটি আকার লইয়া পরে ব্যক্ত হইলেও হইতে পারে, ইহাই হইল অজ্ঞেয় শব্দের আর এক প্রকার অর্থ। এবম্বিধ অর্থে অজ্ঞেয়তত্ত্বের আলোচনা নিষ্ফল নহে। কস্মিন্‌কালে কখন, কোন আকারে, জ্ঞানে কিনা

সেই আত্মমূলের বা অসীমতত্ত্বের, কোন প্রকার অভিব্যক্তি ঘটিবে না—তাহা ত আর নহে; লুপ্ত অদৃশ্য অঙ্কর ফুটিয়া উঠিতে পারে; অজ্ঞেয় আবার কোন আকারে জ্ঞেয় হইতে পারে; যুক্তি ও আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় ঘটিতে পারে। তা' যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে আত্মমূলকে জ্ঞানোন্মুখী অজ্ঞেয় বলিতে হানি কি? ভাল, জ্ঞানে ইহার পরিণতি ও বিকাশ সম্ভবপর কি না, তাহা দেখা যাউক।

কার্য্যের কারণরূপে শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা। কার্য্যের প্রকাশ না ঘটিলে, শক্তির অস্তিত্ব-কল্পনা অসম্ভব হইয়া উঠে। কার্য্যাভাবে শক্তি চিরকাল ধরিয়া অজ্ঞেয় মাত্রায় পড়িয়া থাকে। বীজ হইতে যদি অঙ্কুর না উঠিত, তাহা হইলে বীজের বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তির কথা লইয়া কেহ নাড়াচাড়া করিত না। অতএব জ্ঞেয় শক্তির মানে কিনা কার্য্য, আর অজ্ঞেয় কার্য্যের নাম কি, না শক্তি। বৃক্ষ বীজাকারে পরিণত হইলে পর তাহার নাশ হয়; সেইরূপ কার্য্য কারণে পরিণত হইলেই তাহা লয় হইয়া থাকে। বীজে বৃক্ষ অজ্ঞেয়; অথচ তাহাতে বৃক্ষ আছে স্বীকার করিতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে বৃক্ষ হয় কোথা হইতে? ঐ যে বালুকাকণাবৎ অশ্বত্থবীজ, উহাতে গোটা বৃক্ষটি অতি সূক্ষ্ম ভাবে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত আছে কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু উহার ভিতরে সমুদয় বৃক্ষের এমন একটা ঘনীভূত নির্য্যাস আছে, যাহা সময় পাইলে, মাটী জল ছায়া ও আতপ পাইলে, সময়ে ক্রমে ক্রমে একটি নূতন প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইবে। ঐ ঘনীভূত নির্যাস পদার্থে এমন একটি জীবনী শক্তির গূঢ় ভাব অবস্থিতি কল্পনা করিয়া লওয়া হয়, যাহার বিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্তির ফল কি—না বৃক্ষ। অভিব্যক্তিবাদিরা কহেন, এইরূপে জগত ও তদন্তর্গত সমস্ত পদার্থ অব্যক্ত হইতে ক্রমশঃ ব্যক্ত হইতেছে; শক্তি ক্রমশঃ কার্য্যে পরিণত হইতেছে; গোড়ায় যাহা অদৃশ্য ও লুপ্ত ছিল, ক্রমে পরদায় পরদায় তাহা ফুটিয়া উঠিতেছে। বার বার আলোক ও অন্ধকার, সুষুপ্তি ও জাগরণ, সৃষ্টি ও প্রলয়ের ভিতর হইতে, মূল পদার্থের অধিক হইতে অধিকতর শক্তি প্রকাশ হইতে থাকে। যত অধিক আবর্ত্তন তত অধিক শক্তিপ্রকাশ—ইহাই হইল অভিব্যক্তি।

বৃক্ষের মধ্যে যে জীবনী শক্তি আছে, তাহাই হইল বৃক্ষের ধর্ম্ম ও স্বভাব। সেই ধর্ম্ম বা স্বভাব হইতে যদি বৃক্ষ এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিচ্যুত হয়, তাহা হইলে বৃক্ষের অস্তিত্ব থাকে না ও থাকিতে পারে না। কিন্তু উদ্ভিদ জগতের ধর্ম্ম এক, জীব জগতের ধর্ম্ম আর। আবার উদ্ভিদই বল, আর জীবই বল, এতদুভয় জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক উদ্ভিদের, প্রত্যেক জীবের, ধর্ম্ম বা স্বভাব স্বতন্ত্র। যাহা একের পক্ষে অমৃত, অন্যের পক্ষে তাহা বিষ হইলেও হইতে পারে। শীতের ফসল গ্রীষ্মে জন্মায় না। পাহাড় জাত লতাগুল্ম সমতল উর্ব্বরক্ষেত্রে অনেক খুঁজিলেও পাওয়া যায় না। জীব জগতের সম্বন্ধেও তাই। মানুষের সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যত্যয় নাই। যে আশ্চর্য্য সম্বন্ধে এই বাহির, আর এই অন্তর, উভয়ে সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার সঠিক নিরূপণ অতীব সুকঠিন। বাহিরের নানাবিধ ঘটনার নানা রকম সংমিশ্রণে, অন্তরে

কিরূপ ঘাত প্রতিঘাত উঠে, তাহা প্রায় ঠিক গণিয়া বলা যায় না। মানুষের বেলাতেও দেখা যায় যে, দুইজন লোক যদি ঠিক একই রকম ঘটনা চক্রে পতিত হয়, তথাপি তাহাদের পরস্পরের মনের গতি বিধি সমান ধারা হয় না। ফরাসী বিপ্লবে অনেকেই যোগ দান করিয়াছিল, কিন্তু নেপোলিয়ন হইতে পারিয়াছিল কয়জন? অন্তঃকরণ মধ্যে যে বীজ নিহিত থাকে, অনুকূল অবস্থা চক্রে না পড়িলে তাহা হইতে ফলের প্রত্যাশা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যে ঘটনা চক্রের ভিতর পড়িয়া নেপোলিয়নের স্বভাবের বিকাশ ঘটিয়াছিল, অপর সকলের পক্ষে যে তাহা ঘটিতেই হইবে, এমন ধরা বাঁধা কিছু নাই। অতএব কার্য্যের বৈচিত্র্য দর্শনে শক্তির বৈচিত্র্য, অবশ্য মানিয়া লইতে হয়। এমন হইতে পারে যে, মূলে সকল শক্তিই এক সাধারণ মূল শক্তির প্রকার ভেদ মাত্র। যদি এমন এক সর্ব্বসাধারণ মূল শক্তি থাকে, তবে তাহা আমাদিগের উপলব্ধি করিবার কোন উপায় নাই। আমাদিগের স্বীয় অন্তঃকরণ মধ্যে সেই শক্তির যেরূপ বিকাশ ঘটে, আমরা তদ্দ্বারা জগতের সকল পদার্থকে রঞ্জিত করিয়া লই। কোন একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, কোন বন্য মহিষের যদি ঈশ্বর বোধ থাকে, তাহা হইলে সে তাহার আপনার ঈশ্বরকে এক প্রকাণ্ড বন্য মহিষের মত বলিয়া বুঝিয়া লইবে। ব্যক্তিগত বিকাশের সহিত, তৎসমশ্রেণীস্থ অপরাপর লোকের বিকাশের অনেকটা সামঞ্জস্য থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু তা বলিয়া তাহার সহিত, কীটাণু হইতে যাবদীয় জীবের বিকাশের তুলনা ও সম্মিলন করিতে যাওয়া, অনেকটা দুরাশা বলিয়া বোধ হয়।

বীজ নিহিত স্বভাব বা আদর্শ শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া বৃক্ষের যেমন সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটে, জীবের সম্বন্ধেও সেই নিয়ম বুঝিতে হইবে। ঊর্ণনাভকে কেহ শিখাইতে আসে না, অথচ সে আপনা হইতে এমন সুন্দর, এমন আশ্চর্য্য জাল প্রস্তুত করে যে, মানুষের সকল কারুকার্য্য তাহার কাছে হার মানিয়া যায়। এক প্রকার বৃক্ষ আছে, কীট পতঙ্গের শরীরের রসে তাহার শরীর পুষ্ট হয়। কেমন আশ্চর্য্য উপায়ে কীট পতঙ্গ ধরিয়া তাহাদের রস শোষণ করে। বৃক্ষকে কিছু কেহ এ বিষয় শিখাইতে আসে নাই। ঐ সমস্তই সেই আদর্শ শক্তির ক্রিয়া; সকলি সেই অব্যক্ত শক্তির অভিব্যক্তি। আপন আদর্শ বা স্বভাবকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। যন্ত্রের ন্যায়, পুত্তলিকার ন্যায়, ছায়া বাজীর ছায়ার ন্যায় সকলেই এই মূল আদর্শ শক্তির অধীনে থাকিয়া, সংসার রঙ্গ-ক্ষেত্রে অভিনয় করিয়া চলিয়া যায়; অথচ কেহ অধীনতা শৃঙ্খলের দুঃসহ যন্ত্রণা ভার তিলমাত্রও অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। তাহার মানে এই যে,আদর্শ শক্তির অধীন হওয়াও যাহা,স্বাধীন হওয়াও তাই। 'স্ব' বলিতে স্বভাব ও আদর্শই বুঝাইয়া থাকে।

এই খানে পারমার্থিক জ্ঞানের আর একটি সোপানে আমরা উঠিলাম। বৈষয়িক জ্ঞানে সাকার ও নিরাকার বোধ, ভাবাভাব বোধের ন্যায়, বৈপরীত্য হিসাবে প্রকাশ পায়। পরস্পর বড়ই বিরোধী লক্ষণাপন্ন, অথচ একত্রে না থাকিলে জ্ঞানের ঘর ভাঙ্গিয়া যায়; কাজেই কি করে, বকাবকি

দম্পতির মত একত্রে এক রকম করিয়া, মিলিয়া মিশিয়া, ঘরকন্না করে। পারমার্থিক জ্ঞানে এমন কলহের কোলাহল শুনা যায় না; পরম প্রীতি রূপ ভিত্তির উপর তাহাদিগকে মিলিয়া থাকিতে দেখা যায়। আত্মমূলকে শক্তিরূপে কল্পনা করিতে গিয়া যে নিরাকার বোধের উৎপত্তি হয়, সসীম ও সাকার আসিয়া তাহার উদ্বোধন করে। এখানে অসীম ও সসীমে, নিরাকার ও সাকারে, মিশিয়া এমন হয় যে, তাহাতে অসীম যেন ঠিক সসীম হয়, আর সসীম যেন ঠিক অসীম হইয়া যায়। পারমার্থিক জ্ঞান স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া রাগ বা ভাব মার্গে যাইতে চাহে, যুক্তি ও আকাঙ্খার সমাবেশ ও সমন্বয় করিতে চাহে।

আমরা সংসারের সকল ঘটনার ভিতরেই, সসীমে অসীম, অথবা অসীমে সসীম দেখিতে চাই, না বুঝিলেও আপনা হইতে আমরা স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, সজনে নির্জ্জনে, সম্পদে বিপদে, সকল স্থলে, সকল অবস্থায়, সাকার ও নিরাকারের অভেদাত্মিক যোগ দেখিতে চাই। একটি সামান্য ঘটনা লইয়া এ বিষয়ে ইমারসন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা যতদূর মনে আছে বলিতেছি,—একটি বালক ও বালিকা আশৈশব একত্রে থাকিয়া খেলা করিতে ভালবাসিত; ক্রমে তাহারা উভয়েই যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল; হঠাৎ তাহাদের মনে কি হইল, তাহারা নিজেও তাহা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার ফল হইল এই যে, উভয়েই উভয়ের একটু দূরে থাকিতে চায়; আর সে পূর্ব্বের নিঃসঙ্কোচ ভাব নাই, এখন উভয়েই পরস্পরের সম্মুখীন হইতে সঙ্কোচ বোধ করে, লজ্জা পায়, অথচ একজন আর একজনকে দেখিতে না পাইলে বড়ই ম্রিয়মান হয়। উভয়ের মধ্যে এমন ধারা ভাব কেন? যখন একজন আর একজনকে দেখিতে পাইলে স্বর্গের চাঁদ হাতে পায়, তখন আবার তাহাকে নিকটে পাইলে দূরে পলাইতে যায় কেন? প্রকৃত প্রণয়ের প্রথম সূত্রপাতে কেন এই প্রকার আশ্চর্য্য হৃদয়ের আবেগ উপস্থিত হয়? আর তাহাতে কেনবা এত মাধুর্য্য বোধ হয়? তাহার উত্তর এই যে, মানব হৃদয়ে তদবস্থায় সসীম ও অসীম ভাবের যুগপৎ স্ফূর্ত্তির ছায়া আসিয়া পড়ে; আর তাই মানুষ প্রকৃত প্রণয়ে এতাধিক চরিতার্থতা লাভ করে। একদিকে প্রণয়ের পাত্রকে যেমন হৃদয়ে পূরিবার নিমিত্ত হৃদয়ের একটা স্বাভাবিক গতি হয়, অন্য দিকে সেইরূপ তাহাকে দূরে—অতি দূরে—রাখিতে, তাহাকে স্বর্গের দেবতা জ্ঞানে পূজা ও সম্মান করিতেও হৃদয়ের স্বাভাবিক চেষ্টা উপস্থিত হয়। হৃদয়ের এই দ্বিবিধ ভাবের মধ্যে, একটি ভাব যদি কোন গতিকে নষ্ট হয়, তাহা হইলে আর প্রকৃত প্রণয়ের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। যখন ভালবাসার মধ্যে একটা মধুর শ্রদ্ধার ভাব দেখা দেয়, অতিমাত্র নম্রতা ও কোমলতার উদয় হয়, যখন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেই একই মুখ নূতন নূতন বলিয়া বোধ হয়, যখন হৃদয়ের মধ্যে পাইয়াও হৃদয়ের অতৃপ্তি, অনন্ত থাকিয়া যায় বলিয়া বোধ হয়, তখনই তাহার নাম প্রণয়। এই খানে সসীম ও অসীমের, সাকার ও নিরাকারের অভেদাত্মিক যোগের একটি ছায়া মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, আমরা এ বিষয়ে একটি মাত্র উদাহরণ দিয়া ক্ষান্ত হইলাম। চিন্তাশীল ব্যক্তি জীবনের অনেক

ঘটনার ভিতর, অন্তঃকরণের অনেক চিন্তার ভিতর, ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারেন।

অতএব পারমার্থিক জ্ঞানের বিধান এই যে, শক্তি যেমন কার্য্যের সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিতি করে, এক কথায় কার্য্য যেমন শক্তির রূপান্তর মাত্র, অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ শক্তি প্রত্যক্ষ হইলেই যেমন কার্য্যের প্রকাশ হয়; সেই রূপ সেই মূল আত্ম-শক্তি বা স্বভাব নিরাকার হইয়াও আদর্শ-রূপে সাকারের সহিত অভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। তাহাতে মীমাংসা এই দাঁড়ায় যে, সাকার যাহা, তাহা নিরাকারের অবস্থা পরিবর্ত্তন মাত্র—সাদা কথায় সাকার বলিতে বুঝি কি—না প্রত্যক্ষ নিরাকার। অতএব সাকার পূজা কর ত, নিরাকারের পূজা করিতেই হইবে; আর নিরাকারের পূজা কর ত সাকার পূজা করিতেই হইবে। সাকার ভাবাবলম্বনে অন্তরে যে আদর্শ গঠিত হয়, তাহাই সেই অব্যক্ত মূল স্বভাবের একমাত্র অভিব্যক্তি; সুতরাং তাহা আমরা কোন ক্রমে কোন উপায়ে এড়াইয়া যাইতে পারি না। কথাটা যথা সাধ্য পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকার ভেদ ব্যতি-রেকে, বাহ্য প্রত্যক্ষ সাকার রূপের ভিন্নতা উৎপাদিত হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। প্রকৃতিগত ভিন্নতা না থাকিলে, দৈহিক মানসিক ভিন্নতা হইবে কোথা হইতে? জড় জগতই বল, আর উদ্ভিদ জগতই বল, আর প্রাণী জগতই বল, সকলেই স্ব স্ব অন্ত-র্নিহিত নিগূঢ় প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশের পথে ধাবমান। মনুষ্যও এই নিয়মের অধীন। প্রকৃতিগত যে পার্থক্য বলে মানুষ—মানুষ হইয়াছে, যতদিন না সেই প্রকৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের প্রাণ ইহ জগতে শান্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। যিনি আপন প্রকৃতির বা স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় পাইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অথবা ব্রহ্মজ্ঞান যে কি জিনিষ, তাহা বুঝিয়াছেন।

এই খানে একটুক গোলযোগ উঠিতে পারে, স্বভাবের গোড়াও যেমন অজ্ঞেয়, ডগাও তেমনি অজ্ঞেয়; গোড়ায় কি ছিলাম তা যেমন মনে পড়ে না, সকলের শেষে কি হইব, তাহাও তেমনি মনে আসে না; তা যদি হয়, তাহা হইলে আর স্বভাবের পরিচয় লই কেমন করিয়া? বাস্তবিক কথাও তাই। আমাদিগের জ্ঞানের দুই ধারে যে পরদা খাটান আছে, তাহা সরাইয়া দেখিতে গেলে, জ্ঞান এমন একটা জায়গায় গিয়া পড়ে, যেখানে কোন কূল কিনারা পাওয়া যায় না; কাজেই জ্ঞান সেখানে নিস্তব্ধ মারিয়া যায়। সুতরাং গোড়ার খবর বলবার অধিকার আমাদিগের কি আছে? আমাদিগের যা কিছু নাড়া চাড়া, এই মাঝখানকার কথা লইয়া। এই মাঝ-খানে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, এক একটি বিশেষ ভাব হৃদয়ের সমুদায় জায়গা অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আর তাহারই উত্তেজনা বশে মানুষ মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় ছুটিয়া ইহ জগতে নানা প্রকার আত্ম বিকাশ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। যে বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া, ভিতরের সেই অজ্ঞেয় স্বভাব জ্ঞেয়াকারে প্রথম প্রস্ফুটিত হয়, তাহাকে রস ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। এই যে রস, ইহাতে স্বভাব ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত, জ্ঞেয় অথচ অজ্ঞেয়; ইহাই স্থূল সাকার ভাবাবলম্বনে পরিশেষে আদর্শে পরিণত হয়। ক্রমশঃ—

শ্রীবিপিন বিহারী সেন।]

ইন্দ্র-চন্দ্র সংবাদ।

(৯ম)

১লা মে—লণ্ডন সেতু (The London Bridge)। শতাব্দী পূর্ব্বে লণ্ডন রাজধানীতে একটী মাত্র সেতু ছিল; সেটী এই। ১১৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় হেনরির সময়ে আরম্ভ হইয়া ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জনের আমলে সমাপ্ত হয়। সাধারণ রাজপথের ন্যায় ইহার উপরে একটী গির্জ্জা, দুই ধারে রীতিমত বাস গৃহাদি ও দুই মুখে দুইটী দুইটী প্রকাণ্ড দুর্গ-ফটক নির্ম্মিত হয়। এই ফটকদ্বয়ের উপরে লোক-শিক্ষার্থ রাজদ্রোহী প্রভৃতি গুরুতর অপরাধীগণের ছিন্নমুণ্ড রাখা হইত। পুরাতন স্থান হইতে ৬৬ হাত দূরে, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে, এই নূতন সেতু অস্তুহিত করা যায়। এখন আর গির্জ্জাগৃহাদি কিছু নাই। ইহা ৯২৮ ফুট দীর্ঘ ও ৫৪ ফুট প্রস্থ; পাঁচটী গ্রানিট পাথরের খিলানের উপর স্থাপিত, নিজ মধ্যবর্ত্তী খিলানের পরিসর (Span) ১৫২ ফুট। নেপোলিয়নের সময়ের স্পেনীয় যুদ্ধে (Peninsular war) হৃত ফরাসি কামানের ধাতুতে দুধারের বাতি স্তম্ভগুলি (Lamp posts) ঢালা হয়। গণনা দ্বারা সংখ্যা করা হইয়াছে, প্রত্যহ গড়ে পঞ্চদশ সহস্র গাড়ী ও একলক্ষ লোক পদব্রজে সেতু পার হয়।

৮ই মে—মনুমেন্ট (The Monument), ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা হইতে ৭ই মে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত লণ্ডন নগরে একটী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয় (The great Fire of London)। এই অনলে ৪৬০টী রাজপথ, ৮৯টী গির্জ্জা ও ১৩২০০ গৃহ, একুনে প্রায় দশ কোটী টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হয়। এই স্তম্ভ তাহারই স্মরণার্থ চিহ্ন; এই স্থানের নিকটে পুডিং গলিতে (Pudding Lane) অগ্নি আরম্ভ হয় বলিয়া এখানে নির্ম্মিত। ইহা ২০২ ফুট উচ্চ, কথিত আছে, যে গৃহ হইতে আগুন উঠে, তাহা হইতে ইহার দূরতা ও উচ্চতা ঠিক সমান। ৩৪৫টী ধাপের গোল সোপান দ্বারা উপরে উঠিতে হয়। বহু লোক উপর হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করার দরুণ এখন প্লাটফরমটী (Platform) লৌহপিঞ্জরে আবৃত।

১০ই মে ভিক্টোরিয়া পার্ক (Victoria Park)। ইহা পূর্ব্বাংশস্থ দরিদ্র পল্লির জন্য, প্রায় নয়শত বিঘা জমির উপর, ১৭ লক্ষটাকা ব্যয়ে স্থাপিত। ইহার পূর্ব্বদিক খোলা ময়দান, ক্রীড়াদি ব্যায়াম জন্য নির্দ্দিষ্ট। পশ্চিমাংশে বেড়াইবার স্থান, ফুলের কেয়ারি ও দুইটী জলাশয়। এখানকার ফুলের বাহার কোন কালে ভুলিবার নয়। এক এক স্থান এমন সুন্দর ভাবে সাজান যে, অতি বিচিত্র ফুলতোলা কারপেট তাহার নিকট তুচ্ছ, অগ্রাহ্য। প্রকৃতিকে শিল্পের অধীনে আনিয়া সংসারের শোভা বর্দ্ধন ও সুবিধা করিতে ইহারা যে অতুল ক্ষমতা ধরে, এই সকল তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তৃণ, পত্র, লতা, পুষ্প এক এক স্থানে এরূপ প্রণালীতে সাজাইয়া রাখিয়াছে যে, সুখ শয্যা বলিয়া তাহার উপর গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছা হয়। এখানে চক্ষু সার্থক হইল।

১৫ই মে—ওয়েষ্টমিনিষ্টর আবি (Westminister Abbey) "The spaciousness and gloom of this edifice produce a profound and mysterious awe. We stop cautiously and softly about as if fearful of disturbing the hallowed silence of the tomb; while every footfall whispers along the walls, and chatters among the sepulchres, making us more sensible of the quiet we have interrupted. It seems as if the awful nature of the place presses down upon the soul, and hushes the beholder into noiseless reverence. We feel that we are surrounded by the congregated bones of the great men of past times, who have filled history with their deeds, and the earth with their renown."—Washington Irving. বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা আর উত্তম বর্ণনা হয় না। সুবিস্তৃত আয়তন, চারিদিগের গাম্ভীর্য্য, দর্শকগণের ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ, সামান্য শব্দের মৃদু প্রতিধ্বনি, এই সকল একত্র হইয়া বিরাট সমাধিমন্দিরের চিরনিদ্রায় নিদ্রিত অধিবাসিগণের পবিত্র অমরাত্মার প্রতি যেন শোকসন্তপ্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ের সরল সম্মান প্রদান করিতেছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মন্ত্রীবর পিট (William Pitt, Lord Chatham died 1778)।

ভারত লাট মহাত্মা ক্যানিং (Charles John Viscount Canning died 1862)।

ব্রাইট-বন্ধু উন্নত মনা বার্ত্তাশাস্ত্রবিদ কবডেন (Richard Cobden, champion of Free trade, died 1865)। নবাবী আমলের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নৌসেনা নায়ক ওয়াটসন (Admiral Watson died 1757):—টোগা (Toga) গায়ে তালবৃন্ত হস্তে উপবিষ্ট; দক্ষিণে কলিকাতা নগরী জানুপাতিয়া জেতার নিকট দরখাস্ত দিতেছে, বামে শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দী চন্দননগররূপী ভারতীয় পুরুষ।

গোলামী বিমোচনের জনৈক প্রধান উদ্যোগী উইলবারফোর্স (William Wilberforce died 1833)।

জগদ্বিখ্যাত নিউটন (Sir Isaac Newton died 1726):—মাধ্যাকর্ষণাবতারের দুই পার্শ্বে দুই দেবযোনি জ্ঞানের জড়ান কাগজ (Scroll) এলাইতেছে, ঊর্দ্ধে প্রকাণ্ড গোলকের উপর জ্যোতির্ব্বিদ্যার মূর্ত্তি, নিম্নে মর্ম্মর ফলকে (Relief) সুধীবরের গবেষণাদি প্রদর্শিত।

বিবর্ত্তনবাদ প্রচার দ্বারা জ্ঞান রাজ্যে যুগ পরিবর্ত্তনকারী মহর্ষি দার্বীন (Charles Darwin died 1882)

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ হর্শেল (Sir John Herschel died 1871)

সভ্য জগতের নববিকাশের মূলীভূত কারণ, রেল গাড়ীর সৃষ্টিকর্ত্তা ভুবনবিখ্যাত ষ্টিফেন্‌সন্ (Robert Stephenson, The Engineer died, 1859)

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতবর লায়েল(Sir Charles Lyell, the geologist died 1855)

সুপ্রসিদ্ধ রাজ মন্ত্রী পিট (William Pitt died 1806) চান্সেলরের (Chancellor of the Exchequer) পোশাকে উচ্চাসনে দণ্ডায়মান সচিববর বক্তৃতা করিতেছেন; নীচে দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ইতিহাস নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছে, বামদিকে অরাজকতারূপী দুর্ব্বৃত্ত পুরুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ।

ভারতবন্ধু অমায়িক লাট লরেন্স (Lord Lawrence died 1879)

সিপাহী বিদ্রোহানল নির্ব্বাপক মহাবীর ঔটরাম (Sir James Outram, General died 1863) :—নিম্ন দেশে, মধ্যে হ্যাবলককে রাখিয়া ঔটরাম ও লর্ড ক্লাইভ হস্ত মিলাইতেছেন ; উভয় পার্শ্বে ভারতের নানা জাতীয় লোকের শোকার্ত্ত মূর্ত্তি।

আফ্রিকার সুবিখ্যাত প্রচারক ও পর্য্যটক ধর্ম্মবীর লিভিংষ্টোন (Dr. David Livingstone died 1873) :—দুই জন কাফ্রি ভৃত্য অতি কষ্টে বিপদসঙ্কুল মধ্যে আফ্রিকার পর্ণকুটীর হইতে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের পবিত্র দেহ এখানে আনয়ন করে। নিগ্রোদের কৃতজ্ঞতা-জনিত প্রেম ও আত্মত্যাগী মহাসেবক পরম ভক্তের সম্মানদাতা দয়াল হরির কৃপা ও প্রত্যক্ষ শক্তি দ্বারা সাহায্য ব্যতীত এরূপ দুরূহ ব্যাপার কিছুতেই সাধিত হইবার নয়।

কবিবর গে (John Gay, the poet d. 1732) ইহাঁর নিজের রচিত একটী শ্লোক সমাধি প্রস্তরে অঙ্কিত।

"Life is a jist; and all things show it:
I thought so once, but now I know it."

সুদীর্ঘ জীবী পার (Thomas Parr, a husbandman of Shroffshire died, 1635); ইনি ১২০ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ দ্বারা সন্তানাদি রাখিয়া ১৫২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। শেষ পর্য্যন্ত বেশ সবল ও সুস্থ ছিলেন।

এই প্রকারে চসর, সেক্সপীর, মিল্টন, মেকলে প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের ও রাজা রাজড়া আমীর ওমরা স্ত্রী পুরুষের সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিন শত মর্ম্মর সমাধি ও মূর্ত্তি এবং স্মরণচিহ্ন এই গৃহে স্থাপিত।

একাংশে গির্জ্জা, তথায় যথানিয়মে উপাসনাদি হইয়া থাকে। দেওয়ালে মুসা, দাউদ, পল ও পিটরের খোদিত মূর্ত্তি এই গির্জ্জায় ইংলণ্ডের রাজা রাজ্ঞীর অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নরপতি হারল্ড (King Harold) হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয় পর্য্যন্ত এইস্থানে সবাই অভিষিক্ত হইয়াছেন। অভিষেকের জন্য দুইখানি সিংহাসন আছে, চারিটী সিংহ মূর্ত্তির উপর চারিটী পাদ রক্ষিত। প্রথমখানি ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম এড্‌ওয়ার্ড (Edward I) কর্তৃক স্কটলণ্ড হইতে আনীত হয়; ঐ সঙ্গে পিঁড়ির মত একখণ্ড প্রস্তর আসে, তাহার পূর্ব্ব নাম "যাকুবের বালিশ" (Jacob's Pillow) ; কিন্তু সেই অবধি বরাবর অভিষেক কালে সিংহাসনের নীচে রাখা হইয়া আসিতেছে বলিয়া ক্রমে "অভিষেক প্রস্তর" (Coronation Stone) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় মেরি (Mary II) ও তাঁহার স্বামী তৃতীয় উইলিয়ম (William III) একত্রে অভিষিক্ত হন; সেই সময়ে দ্বিতীয় সিংহাসন খানি প্রস্তুত হয়।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন তারিখে, রাজ্যভার গ্রহণের এক বৎসর পরে, বিশেষ জাঁক জমকের সহিত বর্ত্তমান ব্রিটনেশ্বরীর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অতি বাহুল্য ব্যাপার, যজ্ঞের অনেক গুলি অঙ্গ ; সুতরাং এখানে বর্ণনার স্থানাভাব। কেবল মাত্র অভিষেক কার্য্যের মন্ত্রটী দিলাম। অর্দ্ধসের সোণার বাইট ও এক খানি মোহর অভিষেক দক্ষিণার নিয়ম।

"Be thou anointed with holy oil, as kings, priests, and prophets were anointed. And as Solomon was anointed king by Zodak the priest and Nathan the prophet, so be

you anointed, blessed and consecrated Queen over this people, whom the Lord your God hath given you to rule and govern, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Amen"

মহাবীর নেপোলিয়নের সহকারী ওয়াটারলু প্রভৃতি বহু সমর-ক্ষেত্রে ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী সেনাপতি স্যুল্ (Marshal Soult) এই সভায় নিমন্ত্রণে আসিয়া উৎসবে সোৎসাহে যোগ দেওয়ায় ব্রিটীশ গৌরবের বিশেষ প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল। অভিষেক কাল হইতে এ পর্য্যন্ত সেই প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ভাবে উজ্জল থাকিয়া ক্রমেই অধিকতর দীপ্তিমান হইতেছে।

আবার অন্যান্যাংশে রাজপুরোহিতের বাসস্থান (Deanery); অনেক গুলি চক (Cloisters); সভাগৃহ (Chapter house), কলেজ স্কুল প্রভৃতি দশ বারটী অন্তর্ব্যবস্থানোপযোগী (Institutions) গৃহাদি আছে। সমস্ত ব্যাপার প্রায় ৫ বিঘা ব্যাপিয়া। গির্জ্জার উচ্চতা ১০২ ফুট, চূড়া ২২৫ ফুট উচ্চ।

৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সিবর্ট (King Sebert) কর্ত্তৃক টামসের ধারে চারিদিকে জলা বেষ্টিত এক খণ্ড ভিজা জমির উপর সেন্ট পিটরের উদ্দেশে একটী ছোট গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। জলাভূমি, কালে বসিয়া যাইবার সম্ভাবনা; এই জন্য নেল্‌সন নিজের সমাধি এখানে নিষেধ করিয়াছিলেন। নির্ম্মাতা নরপতি সিবর্ট এই স্থানে সমাহিত। দিনামারগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নৃপতি এড্‌গার (King Edgar) দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন রাজগণের অধীনে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে বর্ত্তমান বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

রাজ্য মধ্যে এরূপ সমাধি মন্দিরের বিশেষ উপযোগিতা। ওয়েষ্টমিনিষ্টর আবিতে সমাধিস্থ হওয়া [illegible] উচ্চাশার কথা। মর্ত্ত্য জী[illegible]র; কিন্তু এই নশ্বর দেহ সম্ম[illegible]প স্থানে স্থাপিত হইলে স[illegible]াত হয়, সন্দেহ নাই। এই [illegible]গারবের জন্য অনেকে দৌড়িতেছেন [illegible] তদ্দ্বারা সংসারের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। মানব জীবনের উচ্চতর আদর্শ পৃথিবীতে প্রচারিত ও নিঃস্বার্থ সেবার জলন্ত জ্যোতিঃ জগতে বিকীর্ণ হইয়া অশেষবিধ কল্যাণ সাধন হইতেছে।

রামায়ণ বিষয়ে কথোপকথন।

রামধন। হরিহর বাবু, আপনাদের কাছে আমাদের আসিতে লজ্জা করে: আপনারা কৃতবিদ্য, জ্ঞানী, আমরা নিরক্ষর মূর্খ।

হরিহর। (সগর্ব্বে) তা কেন, তা কেন বলি রামধন, বেশ ভাল আছ ত?

রামধন। আমাদের আর ভালমন্দ কি? যে দিন কাল পড়েছে, তাতে ইংরাজি না

আনলে তো ছু পয়সা রোজগারের প্রত্যাশা নেই, সর্ব্বদাই অর্থ চিন্তায় বিব্রত।

হরিহর। এক অর্থে অর্থ চিন্তা সকলেরই আছে। তোমরা না হয়, টাকা কড়ি রূপ অর্থের কথা ভাব, আমরাও পদের অর্থ নিয়ে অনেক সময়েই চিন্তাগ্রস্ত। কাল একটা সমস্যার হাতে পড়ে সারারাত্রি ঘুম হয় নি।

রামধন। (হাসিয়া) মহাশয়, সেতো সুখের চিন্তা। পেটে যদি ক্ষুধা না থাকে, তবে অমন চিন্তা কর্ত্তে ভাবনাটা কি?

হরিহর। বল কি, এই যে সমস্যাটার কথা বল্‌ছিলাম, অনেক কষ্টে তার মীমাংসা হওয়ায় আজ একটু ভাল আছি।

রামধন। অ [illegible] বসিলে যাহোক কিছু [illegible] রা যায়। আপনি যে সম[illegible]ছেন, সেটা বলিলে আমরা বু[illegible]ক?

হরিহর। তা অন[illegible]; আমি খুব সহজে বুঝিয়ে দেবো। কথাটার এখন মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। আর গোল নাই। কিন্তু এতাবৎকাল সমস্ত পৃথিবীর লোক, সেই ছোট কথাটার ভ্রান্তিতে পড়িয়াছিল; কি আশ্চর্য্য?

রামধন। বলুন, শোনা যাক্; দেখি আমারও যদি ভ্রান্তিটা ঘোচে।

হরিহর। কথাটা এই যে, এ পর্য্যন্ত লোকে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিল যে, বাল্মীকি নামে একজন কবি রামায়ণ নামে একখানা গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। কি ভ্রান্তি দেখ দেখি?

রামধন। ইহার ভ্রান্তি কোন্ কথাটায়? বাল্মীকি বলিযা যে কেহ কবি ছিলেন, সেইটি ভুল; না, তিনিই যে রামায়ণ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন, সেইটীই ভুল?

হরিহর। কি বল্‌ব রামধন, উহার আগাগোড়াই ভুল। রাম ভুল, রামায়ণ ভুল, বাল্মীকিও ভুল।

রামধন। কি বলেন মহাশয়, আমি কাল যে এত দুঃখেও পাঁচ সিকা খরচ করিয়া একখানা রামায়ণ কিনিয়াছি।

হরিহর। You have paid for your foolishness, যা হবার তা হোয়েছে। উঃ, কাল যদি আমার চিন্তায় এ প্রহেলিকার রহস্যোদ্ভেদ না হ'ত, তা হলে আরও না জানি কত লোকের কত কাল এই ভ্রমের দণ্ড ভোগ করিতে হইত।

রামধন। আপনি যে এত দিনের এত বড় কথাটাকে ভুল বলিয়া বসিলেন, তা, কি রকম কি বলুন দেখি?

হরিহর। এর আবার রকম সকম কি? যা ভুল, তা ভুল, অর্থাৎ কোন ক্রমেই সত্য নয়। সেটা বুঝলেত? না হয়, আর একটু খুলে বলি। এই মনে কর, চারি দিকে চারিটি অক্ষর A, I, E, O; এখন যদি E সত্য হয়, তবে A ভুল। কারণ উহারা সম্পূর্ণ বিপরীত বা Contradictory। সুতরাং যখন বলা গেল যে একটি সম্পূর্ণ ভুল, তখন আর সেটী আদৌ সত্য হইতে পারে না।

রামধন। (কাতর দৃষ্টিতে) কিছুই বুঝিলাম না।

রামধন। আর, ওইত বিপদ, Logic পড়া না থাক্‌লে বড় গোল! তা, A, I, E, O, র পরিবর্ত্তে ক, খ, গ, ঘ, ভাবিয়া লইলেও চলে।

হরিহর। (সম্পূর্ণ নিরাশভাবে) হুঁ

তা ঐ গোড়ার কথাটা আগে বুঝাইয়া দিন যে রামায়ণটা ভুল; তার পরে না হয় আপনার এ কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

হরিহর। কি জান, Foundation টা ঠিক করা চাই; তা যাক, তোমাকে না হয় একটু উল্টাপদ্ধতিতেই বুঝান যাক্।

রামধন। (সাগ্রহে) সেই বেশ্।

হরিহর। প্রথম দেখ রামায়ণটাই ভুল; অর্থাৎ রামায়ণ বলিয়া কোন পুস্তক রচিত হইয়াছিল, ইহার সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব।

রামধন। অ্যাঁ বলেন কি? তবে আমি যেখানা কাল কিনিলাম, সেখানা কি শনির পাঁচালী?

হরিহর। তা কেন, তোমরা এখন যে বই দেখিতে পাও সে খানা সম্পূর্ণ জাল; Spurious Copy.

রামধন। আসল থাকিলে তো তার নকল হয়? গোড়ায় যাহা নেই, তাহার আবার জাল হইল কি প্রকারে?

হরিহর। What a tedious fool! গোড়ায় যে একখান রামায়ণ ছিল, তাহার যে কোন প্রমাণ নাই, সেটা বোঝ না কেন?

রামধন। মহাশয়, গোড়া বলিতে আপনি কি বুঝিলেন, তা ত বুঝিলাম না। যখন সেই জাল হউক নকল হউক, একখানা হইল, সেই সময়েই ত একখানা হইল বুঝিব?

হরিহর। তোমার এত মোটা বুদ্ধি কেন বল দেখি? যখন গোড়ায় ছিল না, তুমি স্বীকার কচ্চ, তখন যা হল, সেটা জাল। যেটা জাল, সেটা যে আর ঠিক নয়, এটা বুঝতে আর গোল কর কেন?

(গদাধরের প্রবেশ)

ওহে গদাধর বাবু, শোন শোন, রামধনকে এই সোজা কথাটা বুঝাতে পাচ্চিনে যে, যেটা "জাল" সেটা আসল নয়।

গদাধর। (হাসিয়া) এর আবার একটা কথাই কি!

হরিহর। তাইত ভাই দেখ দেখি, What an egregious ass!

গদাধর। কিহে রামধন, "জাল" ও "আসল" এর প্রভেদ বুঝ্‌তে পাচ্চ না? "জাল" অর্থ যে ধীবরের মৎস্য ধরিবার যন্ত্র বিশেষ তা নয়। "জাল" অর্থ———

রামধন। (সবিনয়ে) আজ্ঞে এবারে বুঝিছি (স্বগতঃ) কি আপদ! এই এদের বিদ্যা বুদ্ধি! ভগবান করুন মূর্খ হইয়াই থাকি।

হরিহর। (সদর্পে) আচ্ছা ও Proposition এই পর্য্যন্ত। এখন দেখ; সেই জালের মধ্যে আবার কত জাল!

রামধন। (হাল ছাড়িয়া দিয়া) আজ্ঞে বলুন।

হরিহর। প্রথমে তো দেখান গেল যে, রামায়ণ বলিয়া এখন যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, সেখানা জাল। তারপর সেই জাল গ্রন্থেরও প্রথম সংস্করণ যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সহিত একালের গুলির মিল নাই।

গদাধর। (না বুঝিয়া) ওহো, তুমি বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের Difference টা establish কচ্চ? কর, আমি যাই।

(প্রস্থান)

হরিহর। (গদাধরের কথা না শুনিয়া) প্রথম সংস্করণের যে বই অর্থাৎ যেখানা ৩০২ সালে আলেক্‌জণ্ডর প্রথম প্রাপ্ত হন; আর এসিয়াটিক সোসাইটীতে যেখানা এখনো কীটদষ্ট অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহাতে রাম বলিয়া কাহারও নামই নাই

রামধন। হরিবল হরি! আমার ঠাকুর অনেক সাধে আমার নাম রাখিয়াছিলেন, "রামধন"। তা মরুকগে; মহাশয়, রাম বলিয়া কেহ ছিল না অথচ বই খানার নাম হইয়াছিল "রামায়ণ"। মাথা ছিল না কিন্তু মাথার ব্যথা ছিল। তাওকি কথন হয়?

হরিহর। হয় নাকি? এর সব Researches অর্থাৎ অনুসন্ধান হযে গিয়েছে। তুমি কি Sir. W. Jones, Prinseps প্রভৃতির কথা মানিতে চাও না?

রামধন। আজ্ঞে তাঁহারা কে জানি না; তবে তাঁহারা কি এত বড় কথাটা বলিয়া গিয়াছেন?

হরিহর। (হাসিয়া) Here it is রামধন, here it is! তুমি যদি ইংরাজি জানিতে, তবে বুঝিতে। (এই বলিয়া কতকগুলি এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণাল সহ ছেড়া কাগজ পত্র রামধনের সমক্ষে স্থাপন)।

রামধন। (নিতান্ত পরাভূত চিত্তে) আজ্ঞে সাহেবেরা———

হরিহর। কি বল্‌চ বল না? তুমি সাহেবদের কথা মানিতে চাও না? আচ্ছা R. C. Dutt লিখিয়াছেন যে, রামায়ণটা কল্পিত উপন্যাস, এটা প্রত্যয় হয় কি না?

রামধন। আজ্ঞে ও নামটাও যে ইংরাজি হ'ল।

হরিহর। ভাল আপদেই পড়িচি। তিনি যে বাঙ্গালী, এ বুদ্ধিটুকুও নাই? তা যাক্‌, তোমার যদি একটু জ্ঞান থাক্‌তো, তবে Solar Myth এর ব্যাপারটা দিয়া বুঝাইয়া দিতাম যে, রামটাম সব কল্পনা।

রামধন। (স্বগতঃ) এ সংসারে এত রঙ্গও আছে, এদের কথা দু চারিটি শুনিতে বড়ই কৌতুহল হইতেছে বটে। (প্রকাশ্যে) সে আবার কি?

হরিহর। বল্‌ছি দাড়াও; সূর্য্য সম্বন্ধীয় বা সূর্য্য বিষয়ক ইহার কি একটা এক কথার পদ আছে, স্মরণ করিয়া লই।

রামধন। সৌর?

হরিহর। হাঁ হাঁ—Solar Myth কে সৌর পুরাণ বলা যাইতে পারে।

রামধন। ইংরাজিতেও পুরাণ আছে নাকি?

হরিহর। তা নাই; তবে ঐ পুরাণটার নূতন আবিষ্কার হইয়াছে।

রামধন। যদি ছিল না, তবে আবিষ্কার হইল কি প্রকারে? তবে নূতন করিয়া বিলাতে সকলে পুরাণ মানিতে বসিয়াছেন বলুন।

হরিহর। তুমি অত আগ বাড়াইয়া কথা কও কেন? সৌর পুরাণ কিছু ছিল, তা নয়; এখন কেহ নূতন পুরাণ মানিতেছে তাও নয়, তবে ঐ পুরাণের কথা দ্বারা অনেক প্রাচীন কুসংস্কার ধরা পড়িতেছে।

রামধন। সৌর পুরাণ ছিলও না, নূতন সৃষ্টিও হয় নাই; অথচ সেই সৌর পুরাণ, কুসংস্কার তিরোহিত করিতেছে? আপনি বলিয়া যান, আমি শুনি।

হরিহর। নাহে রামধন ওটা কি বল্‌ব ছাই, একটা Theory অর্থাৎ মত—তা যাক্‌; আমি তোমাকে মোদ্দাটা বলিতেছি। Max Muller বা মোক্ষমুলর বুঝাইয়াছেন যে, সকল দেশেই সূর্য্য লইয়া গোড়ায় দেবতা গড়িয়াছে। ধাতুর অর্থে সেগুলি ধরা পড়ে যথা "দিবস ও উষস্‌" একই ধাতু মূলক। সুতরাং অহন শব্দের "অহ" ধাতুর অর্থ উষ শব্দ মূলক। সেই অহ আবার দেশ গ্রীক্‌

Daphne অর্থাৎ Dawn অর্থাৎ উষা শব্দের ঠিক অনুরূপ। আবার—

রামধন। মহাশয় কিঞ্চিৎ স্থির হউন। আপনার সেই ইংরাজি পণ্ডিতটীর সংস্কৃত জ্ঞানে কিঞ্চিৎ গোল আছে দেখিতেছি। অহন শব্দ ও উষা শব্দ এক ধাতু মূলক কখনই নহে। ইংরাজীর কথা লইয়া আপনারা যথেচ্ছা ব্যবহার করুন; কিন্তু সংস্কৃত ভাষাটা আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ৫টা সিদ্ধ হইতেছে না।

হরিহর। (কিঞ্চিৎ গোলে পড়িয়া) তা নাই বা হোক্: কিন্তু সূর্য্য দেখিয়া যে সর্ব্ব ধর্ম্মের উৎপত্তি, ইহার আর ভুল নাই। তাহা তুমি বুঝিতে পার?

রামধন। সে বিদ্যা আমার নাই—আপনি বলিতে থাকুন।

হরিহর। সূর্য্য পূর্ব্বে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্ত যান; অন্ধকার তাঁহার আলোক হরণ করে; এই সকল দেখিয়া সূর্য্যবংশ, সূর্য্যবংশের রাজা, রাক্ষস কর্ত্তৃক তাহার সুন্দরী পত্নীর হরণ, ইত্যাদি কথার সৃষ্টি হইয়াছে। হোমরের ইলিয়দেরও এইরূপ উৎপত্তি।

রামধন। (স্বগতঃ) লোকটা ক্ষেপিয়া না যায়। (প্রকাশ্যে) এ কথার প্রমাণ কি?

হরিহর। কেন ঐত বলিতেছিলাম যে, সমগ্র দেবতাদিগের নাম সূর্য্য শব্দ মূলক।

রামধন। তাত বলিতে পারেন না; সূর্য্য হিন্দুদিগের দেবতা বটে; কিন্তু অন্য দেবতার গায়ে "সূর্য্য" নামের সম্বন্ধও নাই। এ আপনার ইংরাজী নয়, সংস্কৃত। এখানে আপনার কথা মানিতে প্রস্তুত হইব না।

হরিহর। যিনি বেদের বঙ্গানুবাদ করিতে পারেন, তাঁহার কথা মানিবে কি না?

রামধন। কোন সংস্কৃতজ্ঞ এরূপ বলিতে পারেন না।

হরিহর। (একটু চটিয়া) রামধন, তুমি অর্ব্বাচীন, তুমি মূর্খ, তুমি মোক্ষমূলর মান না, R. C. Dutt মান না?

রামধন। আজ্ঞে এঁরাত হালের মানুষ, আপনি যে প্রাচীন বাল্মীকিকে মানেন না? সংস্কৃত অনভিজ্ঞের সংস্কৃত ধাতুর ব্যাখ্যা না মানা সহজ, না এত কালের রামায়ণ-খানা না মানা সহজ?

হরিহর। (অত্যন্ত চটিয়া) রামধন, তুমি দূর হও; সত্যের অবমাননাকারীর মুখ দেখিলেও পাপ আছে।

রামধন। আজ্ঞে ঠিক বোলেছেন; সে কথা মনে পড়িলে আরও দু দণ্ড পূর্ব্বেই বিদায় হইতাম। (প্রস্থান)

নেপথ্যস্থিত শ্রোতা।

আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ।

(সপ্তম খণ্ড ৭৫ পৃষ্ঠার পর।)

১০। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, পঞ্চ কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন। সুতরাং দেখা উচিত, তৎকালে কান্যকুব্জ দেশে কায়স্থগণ কিরূপ সম্মান লাভ করিতেছিলেন। রাটোড় বংশীয় কান্যকুব্জের শেষ হিন্দু নরপতিকুলের অনেকগুলি তাম্রশাসন আমরা পাঠ করিয়াছি, তন্মধ্যে যে সকল শাসন-পত্রে কায়স্থ কর্ম্মচারীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সকল গুলিতেই সেই সকল কর্ম্মচারীর নামের সহিত "কায়স্থ ঠক্কুর," "করণ ঠক্কুর," 'লেখক ঠক্কুর'

প্রভৃতি বিশেষণ সংযুক্ত রহিয়াছে। এমত স্থলে ইহা কিরূপ সম্ভবপর হইতে পারে যে,সেই "ঠাকুর" কুলের পঞ্চ ব্যক্তি অনার্য্য-ভূমি বাঙ্গালায় আসিয়াই "দাস" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও যাঁহারা পঞ্চ কায়স্থকে দাস-বংশজ বলেন, বিধাতা তাঁহাদিগকে বিবেক শক্তি প্রদান করেন নাই বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে কৃপার পাত্র বিবেচনা করি।

"বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয়" নামক একখানা পুস্তক সম্প্রতি আমাদের নেত্রগোচর হইয়াছে। এই গ্রন্থ-প্রণেতা বোধ হয় কোন ইতর জাতির পুরুহিত কিম্বা গুরুবংশীয় হইবেন। বঙ্গদেশীয় কৃষক অর্থাৎ সদ্‌গোপ-দিগের উপকারর্থ এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এবং কৃষক-কুলতিলক অশেষগুণালঙ্কৃত ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়কে এই গ্রন্থ উপহার অর্পণ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত বাঙ্গলার কায়স্থ-দিগের প্রতি "গোলাম" শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, এবং গ্রন্থকার মহাশয়, আদি-শূরের সভায় পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় বৃত্তান্তটি অলঙ্কারপূর্ণ মিথ্যা বাক্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ঘটকগণ যে মিথ্যা-বাদী, ইহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনার কোন্ অংশ সত্য এবং কোন্ অংশ কাল্পনিক, তাহা নির্ণয় করা ইতর জাতির পুরুহিতের স্থূলবুদ্ধির কার্য্য নহে।

আমাদের প্রবন্ধ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বাবু গোপীচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া "কায়স্থবিচার" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রতীত হইতেছে যে, গোপী বাবু আমাদের অভিপ্রায় ও লেখার স্থূল মর্ম্ম কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কৈলাস বাবু পুরাণ শাস্ত্র হইতে কায়স্থ জাতির যে সকল উৎপত্তি বিবরণ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন, তাহা পরস্পর এত অনৈক্য যে, সে সমুদয় কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।" (৭ম খণ্ড,১৫৭পৃঃ)

আমরা গোপী বাবুর বুদ্ধির অভাবদর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। কারণ আমরা ইচ্ছা-পূর্ব্বক পরস্পর অনৈক্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছি, "এবম্প্রকার বচন সমূহ আলোচনা করিয়া বোধ হইতেছে যে, যখন যে গ্রন্থকার কায়স্থের প্রতি সদয় হইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া প্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছেন, আবার যখন কোন প্রভু উশনার ন্যায় বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন, তখনই তিনি তাঁহাদিগকে নরকে নিক্ষেপ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এমতাবস্থায় তাহা-দিগের বাক্যের প্রতি কতদূর নির্ভর করা যাইতে পারে, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।" (ষষ্ঠখণ্ড, ৪৩২ পৃষ্ঠা।)

এবার বোধ হয় গোপী বাবু স্বয়ংই বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি আমাদের অভিপ্রায় না বুঝিতে পারিয়াই আমাদের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত বাক বিতণ্ডা করা আমাদের পোষায় না। লেখনী ধারণ করিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজন। মাতৃক্রোড়ে বসিয়া দুই চারি খানা পুস্তকের পাতা উলটাইলেই অভিজ্ঞতা লাভ হয় না।

ব্যবস্থাদর্পণ প্রণেতা ৺শ্যামাচরণ

সরকার মহাশয় ইহা অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে বিশুদ্ধ আর্য্য বংশজ, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহারা বহু কাল হইতে উপবীত ও গায়িত্রী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শূদ্র ভাবাপন্ন হইয়াছেন।"

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার কোষগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,—এবং চিত্রগুপ্ত বংশ্যানাং চন্দ্রসেন বংশ্যানাঞ্চ ক্ষত্রিয়বৎ উপনয়ন বেদাধিকারস্থিতেকালবশাৎ তদ-ন্বয়জাতানামুপনয়নাদি লোপাৎব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্বং ব্রাত্যানাঞ্চকৃত পায়শ্চিত্তানামুপনয়নাদি রাহিত্যাৎ শূদ্রধর্ম্মত্বং।"

মনু বলিয়াছেনঃ—নিচ্ছিবি, করণপ্রভৃতি জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় (১০ম অধ্যায়, ২২শ্লোক।) পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, এই নিচ্ছিবিবংশে অন্তিম জিন মহাবীর স্বামী জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভগবান শাক্যসিংহের অভ্যুদয় কালে প্রবল পরাক্রমশালী নিচ্ছিবি ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের অসীম প্রভুত্বের শীর্ষে কুঠারাঘাত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সুতরাং এহেন নিচ্ছিবি ক্ষত্রিয়দিগের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদিগের লেখনী শাণিত কুঠারের ন্যায় প্রয়োগ না হইবে কেন? সেই নিচ্ছিবি ক্ষত্রিয়দিগের সহিত করণদিগকে ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় শ্রেণীতে নিবিষ্ট করা হইয়াছে। সুতরাং করণকায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। আমরা এরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি যে, মহারাজ অশোকের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতে দীর্ঘ কাল বাঙ্গালায় জৈনধর্ম্ম প্রবল ছিল। তৎপর সেনবংশীয় রাজাদিগের অত্যাচারে বাঙ্গালায় জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মের অবনতি সংসাধিত হইয়াছিল। সেই সকল ধর্ম্মাবলম্বী বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহল প্রভৃতি দেশে চির কালের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা আমাদের অনুমান মাত্র নহে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। *

* সিংহলাধিপতি পরাক্রম বাহুর শাসনকালে (১১৫৩—৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) গৌড়দেশের অন্তর্গত রাঢ়মণ্ডলান্তঃপাতী "বারেন্দ্র" জনপদ নিবাসী কাত্যায়ন গোত্রজ রামচন্দ্র "কবি ভারতী" নামক জনৈক ব্রাহ্মণ এই ধর্ম্মের জন্য—রাজার অত্যাচারে—সমাজের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া সিংহল দ্বীপে গমন করেন। মহারাজ পরাক্রমবাহু তাঁহাকে সাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিদেশে বসিয়া ভক্তিশতক নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে ধর্ম্ম-বিগলিত হৃদয়ে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—"রাজা আমাকে দণ্ড দিন, পণ্ডিত মণ্ডলী আমাকে উপহাস করুন, আত্মীয় কুটুম্বগণ আমাকে পরিত্যাগ করুন, হে পিতঃ জিন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে পারি না।"

রামচন্দ্র কবি ভারতী প্রণীত ভক্তিশতক ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলে মুদ্রিত হইয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এক খানি ভক্তিশতক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া, কিঞ্চিদান সার্দ্ধ সপ্ত শতাব্দী পূর্ব্বে যিনি ধর্ম্মের জন্য জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ (P. A S. B. Feb. 90) প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু আমরা এস্থলে বিনীত ভাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী ভ্রম প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, ভরসা করি, তিনি এজন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

শাস্ত্রী মহাশয় রামচন্দ্র কবি ভারতীর সময়াবধারণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন "This settles the question of the age of Ramachandra,

যাঁহারা সেই সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের পদানত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই নিরুদ্বেগে দেশে বাস করিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং বোধ হইতেছে যে, বঙ্গীয় কায়স্থগণ পূর্ব্বে জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই জন্যই তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা এরূপ অপমানিত হইয়াছেন। আমাদের এই মন্তব্যের প্রতি যদি কেহ আপত্তি করেন, তবে তাঁহাকে আমাদের জিজ্ঞাস্য যে, বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ লোক যে জৈন ছিলেন, তাহাদের বংশাবলী এক্ষণে কি হইল? মাড়োয়াড়ী জৈনগণ অল্পদিন হইল আমাদের দেশে আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত প্রাচীন ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নাই।

পূর্ব্বে কেবল বঙ্গীয় বৈদ্যগণ কায়স্থদিগেব প্রতিপক্ষ ছিলেন। অধুনা ক্রমে ক্রমে সদ্‌গোপ, সুবর্ণবণিক, জুগী, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিগণও আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মানসে গ্রন্থ প্রচার করিতে স্বতঃ পরত অগ্রসর হইয়াছে। সদ্‌গোপগণ প্রাচীন গোপজাতির একটি শাখা মাত্র। সুবর্ণবণিকগণ অস্পৃশ্য জাতি, ধনবলে উন্নতি লাভ করিয়া এক্ষণ বৈশ্যবর্ণে অনুপ্রবিষ্ট হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে যদি বঙ্গে কোন জাতির বৈশ্য বংশীয় বলিয়া পরিচিত হইবার বিন্দু মাত্রও অধিকার থাকে, তবে কেবল গন্ধবণিকদিগেরই তাহা থাকিতে পারে। জুগী ও চণ্ডাল উভয়ই অনার্য্য হিন্দু। যাঁহারা যোগী ও জুগীকে এক জাতি বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। চণ্ডালেরা অনার্য্য সবর জাতির একটি শাখা মাত্র। বঙ্গীয় চর্ম্মকার জাতিরাও আপনাদিগকে ঋষি বংশজ বলিয়া পরিচয় দিতেছে। কালে আরও কত দেখিব;—"রাজ্য পেলে সেখে, যার যা খুসি লেখে"। †

পাঠক, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থদিগের কুলজী গ্রন্থগুলি পরিত্যাগ করিয়া একবার হিমালয় হইতে কুমারিকা, ও পূর্ব্ব সাগরের নীল জল-বিধৌত পবিত্র পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে পশ্চিম সাগরের তরঙ্গ কলাপ-চুম্বিত গুর্জ্জরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া দেখ, কোনস্থানেই বঙ্গ-

because Parakram Bahu reigned about the middle of the eleventh century (A. D.) and his was a long reign." মহারাজ পরাক্রম বাহু (প্রথম) একজন বিশেষ পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। প্রামাণ্য ইতিহাস সমূহে ও ক্ষোদিত লিপিতে তাহার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তিনি সাগর শাখা অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথে বিজয়ী বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। পরাক্রম বাহু ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করত যশের মালা শিরে ধারণ পূর্ব্বক ৩৩ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। (Turnour's Mahawansa. Vol I. P, LXVI.) Prinseps · Useful Tablese P, 130)

শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে রামচন্দ্র বল্লাল সেনের সমসাময়িক, কিন্তু আমাদের মতে ইনি শেষ হিন্দু গৌড়েশ্বর (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণ সেন দেবের সমসাময়িক, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে সময়ে স্বদেশীয় নরপতি কর্ত্তৃক অসাধারণ সম্মানলাভ করত হলায়ুধ বঙ্গদেশে বসিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব রচনা করিতেছিলেন, সেই সময় রামচন্দ্র স্বদেশীয় নরপতি দ্বারা নির্ব্বাসিত হইয়া সিংহলেশ্বর অপ্রতিমল্ল নিঃশঙ্কমল্ল কলিঙ্গলঙ্কেশ্বর পরাক্রম বাহু চক্রবর্ত্তী'র সভায় সম্মানিত আসনে আসীন থাকিয়া ভক্তিশতক রচনা করিয়াছিলেন।

† আমরা ইতর জাতি সমূহের উন্নতির বিপক্ষ নহি। কিন্তু তাহারা যে পন্থা অবলম্বন করিয়া উন্নতি শিখরের সানুদেশে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, আমরা তাহাকে ঘৃণা করি। কতকগুলি মিথ্যাবচন প্রমাণ সৃষ্টি না করিয়া ক্ষমতা দ্বারা উন্নতি লাভের চেষ্টা করাই তাহাদের কর্ত্তব্য।

দেশের ন্যায় কায়স্থগণ এরূপ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয় নাই। ভারতের যে কোন প্রদেশে গমন করিবে, সেই স্থানেই দেখিতে পাইবে যে, হিন্দুদিগের শ্রেণী বিভাগ কালে কায়স্থদিগকে তৃতীয়স্থান প্রদত্ত হইয়া থাকে, কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় (রাজ পুত্র) জাতি কায়স্থদিগের উর্দ্ধে স্থান প্রাপ্ত হন। সর্ব্বত্রই বৈশ্যগণ কায়স্থদিগের নিম্নে আসন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে কায়স্থের প্রতি কেহ "শূদ্র" কিম্বা "দাস" শব্দ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হয় নাই। বেইন সাহেব বোম্বে প্রেসিডেন্সি-নিবাসী হিন্দুদিগের জাতীয় ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করত লিখিয়াছেন, "হিন্দু সমাজের তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ কায়স্থদিগের শিরায় শিরায় যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি।" এইরূপে ভারতের যে কোন প্রদেশের কায়স্থদিগের বৃত্তান্ত আমরা অনুসন্ধান করিয়াছি, আমরা কোন স্থানেই তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যতীত নিকৃষ্টত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই।

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কায়স্থ ও বৈদ্য জাতিকে বর্ণশঙ্কর স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন; "The *improved* position of the mixed races appears from the importance, which is attached to the Kayasthas and Vaidyas. The former as writers and the latter as physicians are undoubtedly reckoned as gentlemen. They occupy in Bengal a rank second only to Brahmans. The priests look up to them as the Rishis of yore looked up to the Kshetriyas."

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণের নিম্নেই কায়স্থ ও বৈদ্য। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গীয় কায়স্থ ও বৈদ্য উভয়ই এক মূল হইতে উৎপন্ন। আমাদের এই সিদ্ধান্ত গোঁড়া কায়স্থ ও গোঁড়া বৈদ্যগণের অপ্রীতিকর হইয়া থাকিলেও অনেকেই ইহা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

বৈদ্যদিগের প্রতি আমাদের সানুনয় নিবেদন যে, তাঁহারা যতকাল কায়স্থদিগকে শূদ্রবংশজ বলিয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন মানসে লেখনী সঞ্চালন করিবেন, ততকাল এই জাতীয় হিংসা ও কলহ চলিতে থাকিবে। এ রাবণের চিতা নির্ব্বাণ হইবে না। তাই সবিনয়ে বলিতেছি, এস কলহ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করি। একবার স্মরণ করিয়া দেখ, আমরা সাতশত বৎসর যাবত কত অস্পৃশ্য জাতির পাদুকা মস্তকে বহন করিতেছি, ইহা কি আমাদের ভ্রাতৃ-বিরোধের সময়! এস, পরস্পরের সাহায্যে আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হই। যাহাতে পুনর্ব্বার জগতে আমরা আত্ম প্রাধান্য সংস্থাপন করিতে পারি, সেই চেষ্টা করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। নচেৎ আত্ম কলহ করিয়া অধঃপাতে গেলে কি হইবে? হা বিধাত! এরূপ অসংখ্য বর্ণ ও সম্প্রদায়-প্লাবিত দেশে কি একতা সংস্থাপিত হইবে!

আমাদের পূর্ব্ব প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর কায়স্থ জাতির ইতিবৃত্ত মূলক দুই খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থানে তাহার পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক হইতেছে।

১। ঢাকুর অর্থাৎ কায়স্থ জাতি ও বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ইতিবৃত্ত। সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত রায় গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ বারিধি মহাশয় দ্বারা এই গ্রন্থ সঙ্কলিত। রায় মহাশয় বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে গ্রন্থের প্রথমাংশে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া কায়স্থদিগকে ক্ষত্রিয় বংশজ অবধারণ করিয়াছেন, গ্রন্থের শেষাংশে বারেন্দ্র কায়স্থদিগের ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, বারেন্দ্র কায়স্থদিগের "ঢাকুর" নামে প্রাচীন কুলজী গ্রন্থ আছে। রায় মহাশয় সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন বলিয়াই ইহাকে ঢাকুর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

২। ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রণীত কায়স্থকারিকা। চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত শাণ্ডিল্য গোত্রজ বন্দ্যবংশীয় ঘটক ধ্রুবানন্দ সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থের বয়ক্রম প্রায় ২০০ বৎসর হইবে। এই গ্রন্থে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি, পঞ্চকায়স্থের বাঙ্গলায় আগমন ও বঙ্গজ কায়স্থদিগের বংশাবলী ও বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ নন্দী মহাশয় বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত মূলগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মূল্য ।।০ আনা মাত্র। বঙ্গীয় কায়স্থগণের সকলেরই এই উপাদেয় গ্রন্থ পাঠ করা উচিত। রায় মহাশয় ও নন্দী মহাশয় উভয়ই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহাদের প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় দ্বারা বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের যথোচিত উপকার সংসাধিত হইবে

আমরা শ্রুত হইলাম, ময়মনসিংহের অন্তর্গত সন্তোষের খ্যাতনামা ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী দ্বারা একখণ্ড "কায়স্থ বংশাবলী প্রকাশিত" হইয়াছে। এই গ্রন্থ আমরা দর্শন করি নাই, সুতরাং তৎ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এজন্য আমরা দুঃখিত আছি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।

বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল।

বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল সূর্য্য বস্‌লো পাটে;
সোণার বরণ রোদের কিরণ নাইক পথে ঘাটে।
মাটী ছেড়ে গাছ পাহাড়ে উঠ্‌লো গিয়ে তারা,
বরের মতন, দেখ্‌তে কেমন, মাথায় টোপর পরা!
ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে যাচ্ছে গরুর পাল,
পাঁচন হাতে, সাথে সাথে, তাড়িয়ে যায় রাখাল।
উড়িয়ে ধূলা বাছুর গুলা কর্চ্ছে কত খেলা;
সবার চিত হরষিত বাড়ী যাবার বেলা।
পাতের তাড়ি লয়ে বাড়ী যাচ্ছে প'ড়োগণ,
যেতে যেতে, পথে পথে, পড়্‌ছে গণ্ডা পণ।
রক্ত উঠে খেটে খুটে উদয় অস্ত ধ'রে,
লাঙ্গল কাঁধে, কাস্তে হাতে চাষা যায় ঘরে।
বাজার ক'রে এলেন ফিরে মেছুনী কাবারী,
হাট বাজারে বিক্রী ক'রে মৎস্য তরকারী।
বলদেগণে বলদ্ সনে কিনে বেচে এলো,
'বাবা' ব'লে ছেলে পিলে কোলে উঠতে গেল।
ঢিপি থেকে মোরক ডাকে মুসলমান বাড়ী;
কাছা খোলা মিঞা মোল্লা ধুচ্ছে গোঁফ দাড়ী।
দর্গা তলে সবাই মিলে পড়্‌তেছে নামাজ;
বাড়ীর ভিতর গন্ধে বিভোর রঁাধাদের শুন পাঁজ।

সারি সারি বউ ঝিয়ারি জল আনতে যায়,
নোলক নাকে, কলসী কাঁকে, আলতা পরা পায়;
বাজ্‌ছে কেমন, ঠনম্ ঠনন্, তাবীজ লঙ্গফুল!
রসিক পবন উড়িয়ে বসন কর্চ্ছে লজ্জাকুল।
পুকুর ঘাটে ঘুটে পুটে কনে বউ গুলি,
মনের ব্যথা, কত কথা কর্চ্ছে বলাবলি।
বনে বাদাড়ে, ঘোঁজ পাঁদাড়ে ছিল অন্ধকার,
দিল দেখা, কালি মাখা, ভূতের আকার।
পায়রা ঘরে, চড়ুই বাইরে, কার্ণিশেতে কাক,
সন্ধ্যা দেখে, থেকে থেকে ডাকছে আপন ডাক।
অন্য পাখী আঁধার দেখি উড়ে উড়ে যায়,
দলে দলে, সবাই মিলে, গাছ, পালা, বাসায়।
কোটর থেকে পেঁচা ডাকে এক একটি বার,
ভাব্‌ছে মনে এতক্ষণে উড়ে হবে বা'র।
নদীর ধারে বিষাদ ভরে ভাব্‌ছে চকা চকী—
কেমন করে রাত্রি ধ'রে রইবে একাকী।
একটি তারা, দুটি তারা, তারা ঝিক্ মিক্ করে,
বধূ যেমন খোলে বদন ঘোম্‌টা তুলে ধ'রে।
বাসর ঘরে বরকে ঘেরে নারী যেমন ধারা,
চাঁদের পাশে তেমনি এসে বস্‌লো সব তারা।
ঝিঁ ঝিঁ রবে ঝিঁ ঝিঁ সবে ডাক্‌ছে গর্ত্ত থেকে;
বেতের বনে শিয়ালগণে উঠছে ডেকে ডেকে।
ছোট মেয়ে শুচী হয়ে কর্চ্ছে সেঁজুতি;
ঝিউড়ী যারা, জ্বালছে তারা, সাঁজের দীপবাতি।
তুলসী তলে প্রদীপ জ্বেলে কর্চ্ছে নমস্কার,
জ্বেলে ধূনা আনাগনা কর্চ্ছে ঘর দ্বার।
বউ রাঁধছে, ছেলে কাঁদ্‌ছে, গিন্নি জপে যায়;
দাওয়ায় বসে, কেশে কেশে, কর্ত্তা তামাক খায়।
ঠাকুর ঘরে মধুর স্বরে বাজ্‌ছে ঘণ্টা শাঁক,
ঘড়ী কাঁশর, বাজ্‌ছে ঝাঝর, সানাই ঢোল ঢাক।
জ্বেলে আলো জনাক্ গুলো, এদিক ওদিক ধায়
খোঁজে যাকে, পায় না তাকে, ফের খুঁজ্‌তে যায়।
বৃক্ষ তলে কাষ্ঠ জ্বেলে সন্ন্যাসী গোঁসাই,
গাচ্ছে ভজন, কর্চ্ছে পূজন অঙ্গে মেখে ছাই।
শ্মশান ধারে শ্যাল কুকুরে কচ্ছে গণ্ডগোল,
বক্ষ শুকায় পীলা চমকায় শুন্‌লে বিষম রোল!
ভাঙ্গা দোকানে পথিকগণে বাসা ল'তে যায়,
কেউ গান গায়, কেউ বা ঘুমায়, কেউ বা
রাঁধে খায়।
নৌকাগুলি বাদাম তুলি যাচ্ছে পাল ভরে,
উড়্‌ছে যেন শকুন শেন ডানা বা'র ক'রে।
এমন সময় ধীরি ধীরি বয় দক্ষিণে বাতাস
সন্ধ্যাসনে শীতল প্রাণে সবারই উল্লাস।
ফুল বাগানে, নবীন প্রাণে, ফুট্‌লো কত ফুল,
দেখ্‌তে যেমন, গন্ধে তেমন কর্চ্ছে প্রাণাকুল।
পথে ঘাটে, মাঠে হাটে, নাইক জন মানব,
ক্রমে হ'ল কোলাহল সকলই নীরব।
সন্ধ্যা হ'ল, সবাই গেল নিজ নিজ ঘরে;
ভাব্‌ছি ব'সে, যাব কিসে ভব-নদী পারে।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

জর্জ মুলারের নবজীবন।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুলারের বিংশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইল। এই বয়সে নভেম্বর মাসে এক দিন তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বেটা নামক জনৈক ছাত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বেটা পূর্ব্বে গম্ভীর ও শান্ত ছিলেন। পাঠশালায় শিক্ষার সময়ে তাঁহার দিব্য পাপ-বোধ এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিবার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া নূতন নূতন সংসর্গে মিলিত হইয়া তাঁহার উপাসনায় ঔদাসিন্য ও অনাস্থা জন্মিয়াছিল।

আমাদের মুলার এই যুবকের পূর্ব্বকার সতত্তা, চিন্তাশীলতা এবং ঈশ্বর-ভক্তি স্মরণ করিয়া, তাঁহার সঙ্গে থাকিলে তাঁহার নিজের উপকার হইতে পাবে, এই আশা করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যে মুলার বেটার মত পরিবর্ত্তনের কথা বুঝিলেন। এরূপ মত পরিবর্ত্তন সত্বেও কিন্তু বেটার এখনও ভাল বিষয়ের দিকে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ এবং সৎ ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার অভিলাষ ছিল। মুলারের দশাও বেটার ন্যায় হইল। সেই হেতু মুলারের সহিত বেটার অন্তরের মিল হইল। বেটা কয়েকটী বন্ধুর সহিত, একজন খ্রীষ্ট-ভক্তের বাটীতে, উপাসনায় ও বাইবেল পাঠে যোগ দিবার নিমিত্ত প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় একত্রিত হইতেন। এই কথা জ্ঞাত হইয়া জর্জ তথায় যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তিনি বেটার প্রমুখাৎ শুনিলেন যে, এই সভায় ধর্ম্মপুস্তক, একটী সঙ্গীত ও একটী মুদ্রিত ধর্ম্মোপদেশ পাঠ করা হয়। এই কথা শুনিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, তিনি যাহার জন্য এ পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তাহা পাইলেন। শনিবার রাত্রে বেটার সহিত তিনি ঐ সভায় গমন করিলেন। যাঁহার বাটীতে এই সভা হইত, তিনি এক জন ব্যবসায়ী ও ধার্ম্মিক লোক। তাঁহার নাম ওয়েগনার।

এইসভা হইতেই মুলারের জীবনের নবযুগের অভ্যুদয় আরম্ভ হইল। এখানে কেবল উপাসনা, স্তুতি এবং উপদেশ পাঠ হইত। কিন্তু ইহার দ্বারাই তিনি তাঁহার অসৎ চরিত্র বুঝিতে পারিলেন এবং মুক্তিরজন্য অনাদ্যন্ত পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করিলেন। সেদিন একটী যুবা ধর্ম্ম পুস্তকের একটী অধ্যায় এবং উপদেশ পাঠ করিয়াছিল। উক্ত উপদেশ মুলারের মনে এরূপ বদ্ধমুল হইয়াছিল যে, তিনি তথায় তিন চারি শনিবার উপর্য্যুপরি ওয়েগনারের সহিত ধর্ম্মপুস্তক সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে মুলার নিজের ভাষায় এইরূপ বলেন,—"এখন আমার জীবন সম্পূর্ণ নূতন; কারণ আমি একেবারে সমস্ত পাপ দূর করিতে না পারিলেও অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগ ও ক্রীড়া ভবনে গমন একেবারে বর্জ্জন করিয়াছি। পূর্ব্বের ন্যায় স্বাভাবিক অসত্যকথন অনেক পরিমাণে ত্যাগ করিয়াছি; কিন্তু ইহার পরও দুই একবার মিথ্যা কথা বলিয়াছি। এই সময়ে আমি ফরাসী ভাষা হইতে এক খানি উপন্যাস জর্ম্মনভাষায় অনুবাদ করিতে ব্যাপৃত ছিলাম। এই পুস্তক মুদ্রিত করিয়া পারিস নগরে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। অবশেষে, পুস্তকখানির আদ্যন্ত ভ্রমে পরিপূর্ণ হইয়াছে দেখিয়া বিক্রয়ের আশা পরিত্যাগ করিলাম।" মুলারের চরিত্রের এই পরিবর্ত্তনে তাঁহার সমপাঠীগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত; কিন্তু তিনি সে সকলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তিনি ঈশ্বরকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতেন, কারণ তিনি তাঁহাকে অসৎপথ হইতে সৎপথে আসিবার মতি প্রদান করিয়াছেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকায় তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উৎসাহশীল হইয়াছিলেন। তিনি পরমেশ্বরের জন্য অম্লানচিত্তে সমুদয় কষ্ট সহ্য করিতেন এবং তাঁহার জন্য অতি কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন।

এইরূপে মুলার যখন মুক্তিরপথ দেখিলেন,

তখন তিনি অপরকেও মুক্তির উপায় দেখাইয়া দিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি অলস খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন না। কেমন করিয়া অন্যকে উপদেশ দিবেন ও অন্যের উপকার করিবেন, তিনি সর্ব্বদাই তদ্বিষয়ে বিশেষ মনযোগী ছিলেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্যে প্রবেশ করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে ডাক্তার থোলক নামক এক সরল ও সৎ খ্রীষ্টিয়ান হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মাধ্যাপক হইয়া আসিলেন। এই ঘটনায় মুলারের মনে অভূতপূর্ব্ব আশার সঞ্চার হইল।

এই সময়ে মুলার তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতাকে আপন মত পরিবর্ত্তনের বিষয় উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পত্রের প্রত্যুত্তরে সন্তোষের পরিবর্ত্তে অত্যন্ত বিরক্তি উপহার পাইলেন। প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইবার প্রস্তাবে উৎসাহ ও অনুমতি পাওয়া দূরে থাকুক, বরং তিনি বিশেষ বাধাই প্রাপ্ত হইলেন। মুলার বলেন;—"আমার পিতা আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন এবং যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন; কারণ তিনি আমাকে যজন ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া আমার সহিত বৃদ্ধাবস্থায় সুখে কালাতিপাত করিবেন, এই আশায় আমার শিক্ষার নিমিত্ত প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই আশা আজ বিফল হইতে চলিল দেখিয়া তিনি অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া লিখিলেন, "আমি তোমাকে আর পুত্র বলিয়া স্বীকার করিব না"। আমি প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলাম, বিচলিত হইলাম না। আমার মত পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা হইল; অনেক বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইল। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই কঠিনতর পরীক্ষা হইতেওআমি উত্তীর্ণ হইলাম। পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট বিদায় লইবার সময় ভ্রাতাকে কহিলাম যে, জগদীশ্বরের অনুগ্রহে আমার উদ্ধার হইয়াছে, আমি অবশ্যই তাঁহার পরিচর্য্যায় জীবনাতিবাহিত করিব। আমাকে ইহার পরও দুই বৎসরকাল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অর্থের অধিকতর প্রয়োজন হইলেও, আমি পিতার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিলাম না ভাবিয়া, তাঁহার নিকট আর কিছু মাত্র অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিব না, প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছিল।"*

এই সময় আমেরিকা হইতে কয়েক জন লোক হল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আসিলেন। অধ্যাপক থোলক মুলারকে উপযুক্ত ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে জর্ম্মান্ ভাষা শিক্ষা দিতে নিযুক্ত করিলেন। ইহাঁরা, মুলারকে যথোচিত অর্থ সাহায্য করিলেন। এইরূপে মুলারের আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ হইল।

ইহার পরও কেহ কেহ তাঁহাকে প্রচারকপদ গ্রহণের অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহা পারেন নাই। এ সম্বন্ধে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে, তাঁহার, ভগবানের উপর সরল বিশ্বাস ও বালকের ন্যায় নির্ভর করিবার প্রকৃতি জন্মিল।

তিনি অন্যের উপকার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রোগীর সেবা

করা, এই সময়ে তাহার জীবনের প্রধান কাজ হইল। ক্রমে তিনি সমবেত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন। একবিংশ বর্ষে পদাপণ করিবার অনতিপূর্ব্বে তিনি প্রথম বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয়বার, বক্তৃতা লিখিয়া তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া দুই জন শ্রোতার সম্মুখে বলেন। তৃতীয় বার এরূপ বক্তৃতা কণ্ঠস্থ না করিয়া ধর্ম্মপুস্তকের কোন এক অধ্যায় ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইলেন। ক্রমে তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোকের সম্মুখে উল্লিখিত উপায়ে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, যেগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া বলিতেন, লোকে সে গুলির বিশেষ প্রসংশা করিত বটে, কিন্তু যেগুলি মন হইতে উপস্থিত বলিতেন, তাহাতে লোকের অধিক উপকার হইত। সুতরাং তিনি শেষোক্ত উপায় অবলম্বন কলিলেন।

এই সময়ে মুলার হলের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে ছিলেন। এখানে সভাসমিতিতে যোগ দান, ও বাইবেল পাঠ করিয়া সাধারণ সমক্ষে ধর্ম্মোপদেশ দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেন। এই সকল কার্য্যে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত। সময়ে সময়ে তিনি ১৫ মাইল দূরে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মযাজকগণের উপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেন।

এই রূপে এক বৎসর চলিয়া গেল। মহাপ্রদেশের প্রচার সমাজের (Continental Missionary Society) অধীনে বুখারষ্ট নগরে একটী কার্য্যে যাইবার জন্য পিতার অনুমতি চাহিয়া পাঠাইলেন। মুলারের জন্মভূমি হইতে বুখারষ্ট নগর সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত থাকিলেও, তিনি পিতার অনুমতি পাইলেন। কিন্তু কোন বিশেষ কারণ নিবন্ধন তাঁহার তথায় যাওয়া হইল না। এই সুযোগ অপসৃত হইলে, অধ্যাপক থোলাক, ইহুদি সমাজের ধর্ম্ম প্রচারকের ভারগ্রহণে মুলার সম্মত কি না, জানিতে চাহিলেন। মুলার ইহুদিজাতিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং তাঁহাদের ভাসার অতিশয় আদর করিতেন, সুতরাং তাঁহার সম্মতি জানাইলেন। সম্মতি পাইয়া অধ্যাপক মহাশয় লণ্ডন সোসাইটীতে পত্র লিখিলেন। তাঁহারা, ছয় মাস কাল কার্য্য শিক্ষার পর একটী কার্য্য দিতে সম্মত হইলেন। মুলার ইহাতে সম্মত হইলেন। বিলাত যাত্রা করিবার আয়োজন হইল। কিন্তু এক ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। প্রুসিয়ার প্রত্যেক সুস্থকায় পুরুষকেই তিন বৎসর কাল সৈনিকের কার্য্য করিতে হয়। যাঁহারা নিয়মিত রূপ গ্রীক্, ল্যাটীন ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কেবল এক বৎসর সেনা দলে থাকিতে হইত। যখন জর্জের বিংশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া সৈনিক কার্য্যের উপযুক্ত বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আরও তিন বৎসর অপেক্ষা করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন ত্রয়োবিংশ বৎসর, তখন সৈনিক কার্য্য না করিয়া দেশ হইতে যাইবার অনুমতি পাইলেন না। রাজা স্বয়ং ইচ্ছা করিলে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। যাঁহারা প্রচারকার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে অনেকবার যাইতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং তিনি মনে করিলেন তিনিও অনুমতি পাইবেন। এই রূপ সিদ্ধান্তের পর রাজাকে এবিষয় জানান

হইল কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন যে, "এবিষয় মন্ত্রী মণ্ডলীর আয়ত্তাধীন।"

মুলার বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনি দেশ ছাড়িয়া যাইতে সাহস করিলেন না, অথচ প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হৃদয়ের একান্ত বাসনা। ভাবিয়া ভাবিয়া পীড়া জন্মিল। আরোগ্য লাভের পর পূর্ব্বোক্ত উপকারী অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট হইতে এক খানি পত্র পাইলেন। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে শিক্ষকের কাজ দিবেন বলিয়া বার্লিনে যাইতে লিখিয়াছিলেন। তিনি পত্রে আরও লিখিয়াছিলেন যে, রাজধানীতে বিচারালয়ের নিকট থাকিলে সৈনিকপুরুষের কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা।

১৮২৯ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে জর্জ চতুর্ব্বিংশবর্ষে পদার্পণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সৈনিকদলে প্রবেশ ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। তাঁহাকে অতিশয় দুর্ব্বল দেখিয়া জনৈক কর্ম্মচারী তাঁহাকে এই অবস্থায় শিবিরে প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিলেন। আবেদনানুসারে মুলার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে পরীক্ষিত হইলেন। এই পরীক্ষায় তিনি সৈনিক পদের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন। ডাক্তারের নিকট এক খানি প্রশংসা পত্র গ্রহণ করিয়া মুলার প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি জর্জকে পুনঃ পরীক্ষার জন্য আর এক জন ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন। ইনিও পূর্ব্ব ব্যক্তির ন্যায় মত প্রকাশ করিলেন; সুতরাং মুলার বিনা কষ্টে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। সেনাপতি মহাশয় নিজ হস্তে মুলারের মুক্তি পত্র লিখিয়া দিয়া কহিলেন, "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি ইহুদি সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইবে।" লণ্ডন যাত্রা করিবার পূর্ব্বে যে কয় দিবস তিনি বার্লিনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সে সময় তিনি দীন দরিদ্রের বাটীতে ও কারাগৃহে গমন করত তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন এবং সুযোগ পাইলেই পরোপকারে ব্রতী হইতেন।

তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মার্চ্চ মাসে বিলাত যাত্রা করিলেন। বিলাতে গিয়া পরিশ্রম সহকারে ক্যাল্‌ডি হিব্রু এবং ইহুদিদিগের ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যাহাতে এই সমস্ত ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারেন, তিনি তজ্জন্য বিধাতার নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন। কিছুকাল অধ্যয়ন এবং ইহুদিদিগের জন্য পরিশ্রম করিয়া তিনি আরো মহৎ কার্য্যের জন্য এই সোসাইটীর সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ডিভনসায়ারে গমন করত তথাকার লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি টেমথের এক মন্দিরের পুরোহিত হইলেন।

কিয়দ্দিবস এখানে থাকার পর তিনি প্রচার করিলেন যে, তিনি এই ধর্ম্মশালার পৌরহিত্য কার্য্যের নিমিত্ত কোনও নির্দ্ধারিত বেতন লইবেন না; কিন্তু প্রত্যেক শ্রোতা তাঁহার ভরণপোষণের জন্য যাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দান করিবে, তাহাই আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবেন। এই সময়ে তিনি বিবাহ করিলেন। এখন তাঁহার বাৎসরিক আয় ৫৫ পাউণ্ড মাত্র। *

* ৫৫ পাউণ্ড বাৎসরিক আয় আমাদের দেশের পক্ষে প্রচুর হইলেও বিলাতের পক্ষে অতি অল্প।

এই আয়েই স্বামী স্ত্রী উভয়ের ভরণ পোষণ অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। অতঃপর পিউ-রেন্ট (Pew-rent) কম কর রহিত করিলেন। ইহাতে তাঁহার বাৎসরিক বেতনের ৩০পাউণ্ড হ্রাস হইল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে খ্রীষ্টভক্তগণ তাঁহার পোষণার্থে যাহা প্রদান করিতেন, তিনি তাহাই গ্রহণ করিতেন।

এই অবস্থায় তাঁহাকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত কষ্টে পতিত হইতে হইয়াছিল। এক এক সময়ে মুলার ও তদীয় সহধর্ম্মিণী এরূপ অবস্থায় পতিত হইতেন যে, একটি মাত্র পেনী, অথবা একবারের খাদ্য মাত্র অবশিষ্ট থাকিত। কিন্তু তাঁহাদের প্রার্থনার বলে অতি অল্পকাল মধ্যেই খাদ্য সামগ্রী আসিয়া উপস্থিত হইত। একবার একখণ্ড পনির ব্যতীত গৃহে আহারীয় সামগ্রী আর কিছুই ছিলনা; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, মন্দিরের "শ্রদ্ধয়াদেয়ম্"নামক বাক্স হইতে এক পাউণ্ড আট শিলিং সাড়ে দশপেন্স বাহির হইল; তাহাতেই তাঁহার কয়েকদিন চলিয়া গেল। এই সমস্ত কষ্টের কথা সম্বন্ধে মুলার স্বয়ং এইরূপ বলিয়াছেন;—"আমরা কখন কখন এরূপ বিপদে পতিত হইয়াছিলাম যে, এক পেনিও হস্তে ছিলনা; কিন্তু ধন্য ভগবানের মহিমা! আমাদের একটী দিনও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হয় নাই।" কোন কোন দিন তিনি প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় অর্থ, আহারীয় দ্রব্য কিম্বা পরিধেয় বস্ত্র আসিয়া উপস্থিত হইত। তিনি ঋণ অপেক্ষা অনাহারে জীবন ধারণ করাও শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিতেন। সেই হেতু তিনি কখনও অর্থ কর্জ্জ করেন নাই। যখন তাঁহাদের খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিবার অর্থ থাকিত না, তখনি তাঁহারা ভগবানের উপর নির্ভর করিতেন—তিনিই তাঁহাদের অভাব মোচন করিতেন।

এইরূপ প্রার্থনায় জীবন আরম্ভ করিয়া তিনি প্রতি বৎসর ১০০ একশত মুদ্রা দানাদি সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতেন। এই সকল অনুষ্ঠানের ফল স্বরূপ প্রথম বর্ষে ১৩১ পাউণ্ড, দ্বিতীয় বর্ষে ১৫১ পাউণ্ড, তৃতীয় বর্ষে ১৯১ ও চতুর্থ বর্ষে ১৬১ পাউণ্ড ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগদীশ্বর কেবল যে তাঁহার অভাব মোচন করিয়াছিলেন, এরূপ নহে, তিনি তাঁহার সেবকের বিশেষ সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি পূর্ব্বের মত নির্দ্ধারিত বেতনের উপর নির্ভর না করিয়া উপরোক্ত উপায়ে বেশ স্বচ্ছন্দে ও নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

টেমথে প্রায় সার্দ্ধদ্বিবৎর কাল অতি-বাহিত করিয়া, ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া ব্রিষ্টলে গমন ককিলেন। তথায় শ্রীযুক্ত হেন্‌রি, প্রেফের সহযোগে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। ডিবনসায়ারে অবস্থিতির সময় তাঁহার সহিত আলাপ হয়। ইঁহারা দুই জনে গিডন (Gideon) এবং বেথ্‌সডা (Bhethesda) ধর্ম্ম-মন্দিরে আসন গ্রহণ করিলেন। প্রেফের সহিত পরামর্শ করিয়া পিউরেন্ট নামক কর উঠাইয়া দিলেন।

তাঁহাদের এখানে অবস্থানের কিঞ্চিৎ পরেই ব্রিষ্টলে বিসূচিকার ভয়ানক প্রকোপ আরম্ভ হইল। এইরূপ সময়ে জর্জ মুলার নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক নহেন। তিনি যাহাতে চতুপার্শ্বস্থ জনগণের উপকার করিতে পারেন, তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

শত শত অসহায় বালক বালিকা যন্ত্রাভাবে ভ্রমণ করিতেছে দেখিয়া, হলের একটি অনাথাশ্রমের কথা তাঁহার মনে উদয় হইল। তিনি ইহাদের নিমিত্ত সেইরূপ একটি আশ্রম করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি জানিতেন, সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট অভাব জানাইলে তন্মুহূর্ত্তেই ভক্তবৎসল ভক্তের অভাব মোচন করিবেন। যাহাকে নিজের ভরণ পোষণের নিমিত্ত ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর প্রতিক্ষণ নির্ভর করিতে হয়, তাঁহার পক্ষে অসংখ্য বালকবালিকাকে প্রতিপালন ও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। তিনি ভাবিলেন, অসহায় বালকবালিকাদিগের প্রতিপালন ভার ভগবানের উপর ন্যস্ত করিয়া পৃথিবীর নিকট এই অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেখাইবেন যে, পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানগণের প্রতিপালন জন্য এবং যাহারা তাঁহার উপর নির্ভর করে, তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিবার জন্য অনুক্ষণ ব্যস্ত। জর্জ মুলারের অনাথাশ্রম ঈশ্বর বিশ্বাসের জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থল।

শ্রীরাখাল চন্দ্র মিত্র।

বিষাদ।*

যে মন্ত্রে বিল্বমঙ্গলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, বিষাদ সেই মন্ত্রে সঞ্জীবিত। অথবা সেই মন্ত্রেরই নাম বিষাদ। নয়নজলের অধিত্যকা অতিক্রম না করিলে দেখা যায় না—"মোহন ধাম ভবজলধির পারে পরম সুন্দর।"

বিষাদ বৈষ্ণব গ্রন্থ -গিরিশচন্দ্র বৈষ্ণব কবি,আধুনিক একটু ফের ফার ভাল বাসেন। সোজা কথার ঝড়ে এক দাপটে প্রাণটা দখল করিতে রাজী নন। অথবা ফের ফার না করিলে নাটক হয় না, মৃণালে কণ্টক না দিলে পদ্মের সৌরভ বাড়ে না।

শাক্যসিংহ বিষাদে জীবনের পরিণতি নির্দ্দেশ করেন। যাহা কিছু দুঃখময়, সুখ নাই,—সুখের চেষ্টায় অসুখের বৃদ্ধি। সুখ নাই, দুঃখই সার, সুখের চেষ্টাই বিড়ম্বনা। এই বৌদ্ধধর্ম্ম। বাসনা হইতে উৎপত্তি, উৎপত্তি হইতে জরা মৃত্যু দুঃখ। বাসনার নিবৃত্তি করিলে দুঃখের নির্ব্বাণ হয়—এইপন্থা। শাক্য বুঝিয়াছিলেন,বুদ্ধি মার্গে অনেকে তাঁহার যুক্তির অনুসরণ করিতে পারিবে না। এজন্য যাহা তিনি বলিয়াছিলেন, তাহা অল্প; যাহা বলেন নাই, তাহা অনেক।

বিষাদ বিরহ। চৈতন্য, বিষাদ হইতে প্রেমের সমাবেশ সম্ভাবনা করিতেন। শাক্য প্রেম আমলে আনিতেন না, চৈতন্যের প্রেম সর্ব্বস্ব। অহেতুকী প্রেম যাহার নাই, তাহাকে হয় জ্ঞান মার্গে বৈরাগ্য দিয়া প্রেমে পৌঁছিতে হইবে, নতুবা সুখ বিলাসে আনন্দ নাই, পরীক্ষা করিয়া পরিহার পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়া, ভোগ বিলাসের পরিণাম পর্য্যাপ্ত করিয়া, রাগ মার্গে বৈরাগ্য অবলম্বন বৈষ্ণব ধর্ম্মের সম্মত মার্গ।

অলর্ক রাজপুত্র ভোগ বিলাসী। মাধবের ইচ্ছা লালসার পরিতৃপ্তি করিয়া

---

* শ্রীগিরিশ চন্দ্র ঘোষ প্রণীত।

রাগ মার্গে তাঁহার বৈরাগ্য সম্পাদন করিবেন। বৈষ্ণবের দর্শনের পন্থানুসরণে দার্শনিক কাব্য বিষাদের জন্ম।

বিল্বমঙ্গল যে পথে হরি লাভ করেন, অলর্ক সেই পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, অলর্কের হরিলাভ হয় নাই, তিনি নারী-প্রেম সিদ্ধ করিয়াছিলেন। মাধব বলিতেছেন ;—

বিপদে কাণ্ডারী জেন শ্রীমধুসূদন।
তাপ দূর হবে সাব কর শ্রীচরণ।

অলর্কের তখন তাপে শান্তি। বিষাদে আনন্দ। ভ্রাতৃ উপদেশ, মাতৃ অনুরোধ, সকলি বিফল হইল। জননীর আদরের দান মধুসূদনের শ্রীচরণ সলিলসাৎ হইল। যে নারী প্রেমে হরিকে জলাঞ্জলী দেয়, তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে।

মাধবের শিক্ষা সফল হইল। মাধব শিখাইয়াছিলেন, ভাল বাসিলে নর নারী জ্ঞান থাকে না। মাধব শিখান নাই যে, ভাল বাসার দেবতা নারীর নিকট পরাস্ত।

"সখি নাহি জানিনু সোহি পুরুখ কি নারী —
রূপ লাগইগে হৃদয় হামারি!
না বুঝিনু কাহে পরাণ চাহে,
তাহে নিরখিব সাধ, সখি॥
পিয়ারা বিন প্রাণ কাঁদে, সখি,
পিয়াসী সখি মেরি আঁখিরে!
কাঁহা মিলব বনে বনে ঢুঁরব—
মনচোরা বনচারী!"

মাধব শিখাইয়াছিলেন, প্রেমিকের দুঃখ সুখ সকল অবস্থাতেই আমোদ। অলর্ক শিখিয়াছিলেন যে, দুঃখে এত আনন্দ যে তাহার পৃষ্ঠা পরিবর্ত্তন করিয়া অপর পৃষ্ঠায় কি আছে, দেখিবার অবসর নাই।

হেরি চম্পক কলি পড়ে ঢলি ঢলি
আমা বিনে সে কি জানে?
চাঁদ নিরখি ভাসে দুটি আঁখি
ফিরে ফিরে চায় চাঁদের পানে।

কনক চম্পক-দাম গৌরী সরস্বতীর চাঁদ মুখ ইহকাল পরকাল ঢাকিয়া ফেলিল, অলর্ক আর কাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না।

অন্ধ বিল্বমঙ্গল পরের নিকট চক্ষু ধার করিয়াছিলেন। অলর্ক সাধনায় সিদ্ধ করেন—আম্রপল্লবে একটী পাখীর চোখ—অসীম সংসারে কেবল এক খানি মুখ।

গিরিশ চন্দ্রের কল্পনা দিগন্ত-প্রসারিণী। এমন সাধু চরিত্র আঁকিবার ক্ষমতা যাঁহার আছে, তিনিও সাধু। সোমনাথের মত আমরাও পাঠককে বলিতে পারি "তুমিও সন্ন্যাসীর হৃদয় জান না। উঠ, তুমি কি জান, কি নিমিত্ত সন্ন্যাসী হয়? তুমি কি জান, সংসার শূন্য দেখে তার পর এ পথ অবলম্বন করে? তুমি কি জান মর্ম্ম বেদনা মর্ম্মে লুকাইতে হয়? তুমি কি জান জীবন্মৃত হইতে হয়? সন্ন্যাসীর অবস্থা জান না।"

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী

মহাদেব বা মহেশের পাশ্চাত্য অবতার।

পৃথিবীতে প্রাচীন কালের যে সমস্ত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে ঋগ্বেদ সর্ব্ব প্রাচীন। একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিতের মতে ঋগ্বেদানুসারে অতি আদিম কালে দ্বিবিধ মানবের উল্লেখ পাওয়া যায়। (১) পশু-পালন-নিরত ও মৃগয়াশীল মানব বা ব্যাধ (২) কৃষক।

কৃষি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে উভয় সম্প্রদায়ই মৃগয়ালব্ধ এবং পালিত জীবের মাংসাহারে জীবিত থাকিত, কিন্তু কৃষির উন্নতির সঙ্গে তাহাদের আহারীয় কিছু বিভিন্ন হইতে লাগিল এবং কালক্রমে মতভেদ উপস্থিত হইলে সম্প্রদায়দ্বয় পৃথক হইল।

এই বিবরণ যেমন বেদে, তেমন বাইবেলে পাওয়া যায়। আদমের ঈভ নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে আবেল ও কেন নামে দুই পুত্র জন্মে। আবেল পশু পালনে ও কেন কৃষিতে নিযুক্ত হইয়াছিল* এবং দুই ভায়ে বিবাদ হইলে যুদ্ধে আবেল হত হইয়াছিল। কোরাণে অনেক দূর পর্য্যন্ত মহেশ (Moses) দেববিৎ (David) ঈশ (Jesus) এই পেগম্বর বা প্রচারক ত্রয়ের কথা বিশ্বাস্য বলিয়া কথিত আছে এবং উহাদের ধর্ম্ম পুস্তক ত্রয় বিশ্বাস্য † এমন উল্লেখও আছে। সুতরাং বৈদিক, বিব্লিক ও কোরাণিক উপাসকত্রয়ের নিকটে (১) ব্যাধ (২) কৃষক এই দুই আদিম বিভাগ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই।

কৃষকগণ ইদন (নন্দন) কাননের পূর্ব্বদিকে নদ (Nod) তীরে বাস করিত (বাইবেল)। কেহ উক্ত নদকে (Oxus), কেহবা সিন্ধুনদ বলেন। পার্ব্বত্য শীত-প্রধান দেশে যে কৃষক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বা প্রাধান্য প্রথমে সূচিত হয়; ইহার বিস্তর প্রমাণ আছে। ব্যাধগণ যেমন পর্ব্বতে তেমন সমভূমিতে, যেমন মরুভূমিতে তেমন সমুদ্রতীরে, সর্ব্বত্র বাস করিত। ফলে কৃষকগণ নব সম্প্রদায়, ব্যাধগণ মৌলিক সম্প্রদায়। কৃষক অল্প, ব্যাধ বহুল।

এই কৃষক ও ব্যাধ, বিবিধ হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থে দেব ও দানব, মানব ও রাক্ষস, নর ও বানর এবং ব্রাহ্মণ ও শূদ্র নামে পরিচিত। ইহারাই বাইবেলে খ্রীষ্টীয় ও ইহুদীয় এবং কোরাণে মস্লেম ও কাফের।

যখন মানব জাতি উক্ত দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয় নাই, তখন হইতে তাহারা প্রকৃতির উপাসক ছিল। যদি জ্ঞান ও নয়নের সম্মুখে কোন বিশ্বাস্য পূজার্হ পদার্থ রাখিতে হয়, তবে প্রকৃতি ভিন্ন আর কি আছে?

প্রাকৃত পূজ্য পদার্থের মধ্যে চন্দ্রই প্রথমে প্রাধান্য লাভ করে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের

* "And Abel was a keeper of sheep but Cain was a tiller of the ground." *Genecis, chapter IV.*

† "The Pentateuch, the Psalms, the Gospel successively delivered to Moses, David, and Jesus." *Sale's Koran, page 57, the preliminary discourse.*

অঙ্কুরোদয় কালে এই প্রাধান্য সূচিত হয়। চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সময়ের গণনা এবং নক্ষত্রগণের অবস্থান অনুসারে ঋতু কাল নির্দ্ধারণ করবার সুবিধা হইল এবং মানবের কৃতজ্ঞতা বৃত্তি উত্তেজিত করিল। যে সপ্তর্ষির বংশ• পরম্পরার উপর হিন্দুর মহাভারত স্থাপিত হইয়াছে, সেই সপ্তর্ষি একদা আরবেও পূজিত হইত।* এই প্রকারে তখন তারাবৃত চন্দ্রের প্রাধান্য বাড়িতে থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ব্যাধ-গণের প্রাধান্য থাকাতে চন্দ্র ও নক্ষত্রা-লোক তাহাদের যেমন রমণীয় ও রাত্রি কালে গতি বিধির সুবিধাজনক, আর কিছুই তেমন নয়। এজন্যও চন্দ্র-প্রাধান্য বদ্ধমূল হইল।

এ সময়ে শিব সকলেরই উপাস্য দেবতা; কেন না, তিনি পঞ্চভূতাত্মক পদার্থ-জ্ঞানের দ্বারা সর্ব্বত্র ঐশী শক্তির সঞ্চারের বিষয় জগতে প্রচার করেন এবং মহা মান্য প্রাপ্ত হন। তদানীন্তন সময়োচিত পূজা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিলে, উপাসকেরা তাঁহাকে চন্দ্রমৌলী ও তারাসতী সেবিত মনে করিল। যদি স্বর্গে ঈশ্বরের স্থান হয়, তবে সুধাকর ও নক্ষত্র নিকরই সেই স্থানের চিহ্ন, সন্দেহ নাই।

কৃষি-প্রণালীর সহিত সূর্য্য-প্রাধান্য সূচিত ও সভ্যতার বিকাশ হয়। সূর্য্যালোক কৃষিকার্য্যের জীবন, সুতরাং কৃষক সম্প্রদায় সৌর। কৃষি-উৎপন্ন শস্যের পাক-প্রণালীর সহিত অগ্নি উপাসনার সৃষ্টি। এই প্রকারে কালক্রমে মানব জাতির কৃষক শাখা সাগ্নিক সৌর সম্প্রদায়ে পরিণত হইল। যজ্ঞ ও গায়ত্রী ইহার প্রমাণ। কৃষকগণের গত্যভিমুখী জলন্ত সূর্য্যদেব সমধিক সংপূজিত হইতে লাগিলে, আত্মাবাদ প্রকটিত হইয়া তৎসহ সাদৃশ্য স্থাপন হইল। এই আত্মাবাদ হইতে প্রবেশার্থে বিষ্ণু (বিশ+স্ণুক) সূর্য্যের এক নামান্তরা-বলম্বনে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি।

এই প্রকারে ব্যাধ ও কৃষক সম্প্রদায় পূর্ব্বে চন্দ্র সূর্য্য, পরে শিব বিষ্ণুর উপাসক ভাবে দাঁড়াইল। শিব যেমন বিজ্ঞান বলে সকল পদার্থে এক ঐশী শক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, বিষ্ণুকে যাহারা শিবের স্থলে বা বিরুদ্ধে দাঁড় করিতে চেষ্টা করিল, তাহারা বিষ্ণুতেও সেইরূপ ঐশপ্রভাব আরোপিত করিল। এই স্থলে উভয় সম্প্রদায়ের মূল প্রকৃতি ঐশী শক্তি স্থিরীকৃত হইল। কিন্তু তথাচ একবৃন্তে দুই ফুলের ন্যায় চন্দ্র সূর্য্য, শৈব বৈষ্ণব দুই শাখা থাকিয়া গেল। ঋকে শিব প্রাগুক্ত ও আদ্য ভাবে বর্ণিত, বিষ্ণু সূর্য্যের নামন্তর ভাবে সেবিত।

কেহ কেহ ব্যাধ ও কৃষককে অনার্য্য ও আর্য্য নামে অভিহিত করেন। ইহাদের অবলম্বনেই চন্দ্র সূর্য্যবংশ কল্পিত হইয়াছে।

শিব জগতের আদি ধর্ম্ম-প্রচারক এবং স্বয়ং ঈশ্বর (Personal God) ঈশ্বর, ঈশ, ঈশান, মহেশ শব্দ ভিন্ন অন্যে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে পৃথিবীতে শিব মতাবলম্বী যে সকল মহাত্মা জন্ম গ্রহণ

*"The ancient Arabians and Indians between which two nations there was a great conformity of religions had seven celebrated temples dedicated to seven planets."
Sale's preliminary discourse on the Koran.

করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে শিবোঽহং বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

চন্দ্র সূর্য্য, শিব বিষ্ণু বা জড়াজড় উপাসক দলদ্বয় পৃথিবীতে বিস্তর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়াছে ও করিতেছে। তজ্জন্য সময়ে সময়ে মহাপুরুষ সকলের আগমন আবশ্যক হইয়াছে। ইঁহারা স্থানে স্থানে একতা সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন এবং কার্য্য-ক্ষেত্রের বিস্তৃতি অনুসারে জগতে মান, প্রতিষ্ঠা ও পূজা পাইয়াছেন। এই একতা সংস্থাপনকালে সকল সময়েই শিব-প্রবর্ত্তিত পথে তাঁহাদিগকে চলিতে হইয়াছে। ইহার প্রমাণ হিন্দু শাস্ত্রে অনেক। রাম সীতা ধর্ম্ম প্রচারার্থে দাক্ষিণাত্যে ও লঙ্কায় গমন করিয়া মহেশের আশ্রয়েই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ, উপমন্যু মুনির আশ্রমে শিব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। (১) পরম বক্তা ও অমিত ধর্ম্ম প্রচারক অর্জ্জুন কিরাতরূপী শিবের অনুগৃহীত। বঙ্গবাসী দলের উপধর্ম্মিগণের নিকট এ কথাগুলি নূতন বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহার কিছুই নূতন নহে। আমরা মহাভারত ও তৎশাখা রামায়ণ পাঠে রাজকীয় ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য ভিন্ন আর কিছুরই প্রাধান্য দেখিতে পাই না। কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম প্রচার, সেই খানেই একতা, কারণ একতাই ধর্ম্ম। কিন্তু এই একতা সংস্থাপন, যখন মানবজাতি এক ছিল, তখনকার উপাস্য ঈশ্বর শিবের কৃপা ভিন্ন কোন স্থানে কোন কালে সিদ্ধ হয় নাই।

বিষ্ণুভক্তগণ ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে অনেক সময় পর্য্যন্ত নিরাকারবাদী ছিল। এবং পরেও বহু কাল নিরাকারবাদের প্রভুত্ব চলিয়াছে। উৎনিষৎ তাহার সাক্ষী।

এই সময়ে একদল আফ্‌গানবাসী আর্য্য সম্প্রদায় শিরিয়া দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের সঙ্গে নিরাকার বিষ্ণুবাদ তথায় গমন করে।* প্রাকৃত পদার্থের অর্চ্চনার সহিত শৈববাদ ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ছিল। একটুক নিরাকারবাদের ধূয়া বশতঃ, বাইবেলে ইহুদী জাতির নিকট প্রথম ঈশ্বর বাক্য প্রচারিত হয়, এই ঘোষণা আছে। কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে একবিন্দু জলের ন্যায় সেই নিরাকারবাদ তথায় টিকিল না, এজন্যই আবার ঐ ইহুদী জাতি খ্রীষ্টানগণের নিকট এত ঘৃণ্য। যাহারা নিরাকারবাদ প্রচারক, তাহারাই নিরাকার-বাদ-নিবারক, এই অসামঞ্জস্যতা পরিহার মানসে ইহুদীজাতির প্রতি ঈশ্বরের কত শাপ, শাস্তির কথা লেখা আছে।

যে সকল অবতার একতা সংস্থাপনের

---

(১) "বৎস মহারাজ! পূর্ব্বে আমি পুত্রের নিমিত্ত যখন সুমেরুপর্ব্বতে তপস্যা করি, তৎকালে এই স্তব (শিবের সহস্রনাম বিষয়ক স্তব) কীর্ত্তন করিয়াছিলাম। হে পাণ্ডুনন্দন, আমি সেই স্তোত্র পাঠ করিয়া অভিলষিত বিষয় সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তদ্রূপে তুমিও শঙ্কর হইতে কামনা প্রাপ্ত হইবে।" ১৮শ অনুশাসন পর্ব্ব, মহাভারত।

* Asiatic Researches গ্রন্থে Sir William Jones আফগান ভূমে Jews ইহুদী জাতির উপনিবেশের কথা বলেন। কারণ আফগান-বাসীতে ও ইহুদীতে যে দৃশ্যমান ও শাস্ত্রোক্ত সাদৃশ্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। আমরা বুঝি, শিরিয়াতে হিন্দুকুশ-নিবাসী আর্য্যগণ উপনিবেশিত হইয়াছিল। টেলর সাহেবের মতে মিসরে হিন্দু উপনিবেশ ছিল, তবে শিরিয়াতে থাকিবে না কেন? খ্রীষ্টান লেখকগণ বাইবেলের প্রাধান্য ও আদিমত্ব রক্ষা করার জন্য মাতৃদেশ ও উপনিবেশিত দেশ উলটা করিয়া বলেন।

জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত, আজ পর্য্যন্ত, শেষ অবতার বুদ্ধদেব। ইনি পরম শৈব ও কৈবল্যবাদী। ইনি জন্মান্তর পরিগ্রহ উঠাইয়া দিয়া নির্ব্বাণ মুক্তির উপদেষ্টা। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্কিম বাবুও নির্ব্বাণমুক্তির পক্ষপাতী। সে কথা যা'ক।

বহুশতাব্দীর বৈদিকধর্ম্মবাদের বিরুদ্ধে যখন নির্ব্বাণ মুক্তির কথাটা উঠিল, তখন লোকগুলি ক্ষেপিয়া গেল। শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণগণের দাসত্ব হইতে সকলকে মোচন করিতে লাগিলেন, তাহার উপর অসংখ্য জন্মান্তর পরিগ্রহ নিবারণ করিয়া দিলেন, যুগযুগান্তরের গর্ভ যন্ত্রনা উঠিয়া গেল, লোকে আর চাহিবে কি? ক্রিয়া কর্ম্ম উঠাইয়া দিলেন, ইহা ত আরও সুবিধা। রাজা প্রজা উন্মত্ত হইয়া সমুদায় দেশ বৌদ্ধ হইল।

৫০০ হইতে ১০০০ বৎসরের মধ্যে একএক অবতার আবশ্যক। অতিপূর্ব্বে ২০০০ বৎসরেও ধর্ম্ম-শিথিলতা জন্মিত না। সুতরাং অবতারগণও একটুকু বিলম্ব করিয়া আসিতেন। অনুষ্ঠানের লোপ নিবন্ধন, সত্বর সত্বর অবতারের আগমন পথ, বুদ্ধদেব কর্ত্তৃক প্রশস্ত হইল। কারণ ধর্ম্ম-শিথিলতা জন্মিতে আর গৌণ থাকিল না।

৫০০, ৬০০ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই কৈবল্যবাদের কৃত্রিম নকল নির্ব্বাণ মুক্তিবাদ লোকের নিকট হেয় বোধ হইতে লাগিল। যাগযজ্ঞ তপস্যা দ্বারা যে কৈবল্য লাভ করা যায় না, কিছু না করিয়াই, "খাই বেড়াই সুখে থাকি" মতাবলম্বনে সেই কৈবল্য লাভ হইবে, ইহা লোকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহারা দেখিল, নির্ব্বাণ মুক্তিবাদ কেবল নাস্তিকতা বাদ মাত্র।

শৈবদিগের ৭টী প্রধান ধর্ম্মালয় বা প্রচার-কেন্দ্র ছিল। পাঠক তাহার আভাস পাইয়াছেন, তন্মধ্যে কৈবল্যধাম কৈলাস তিব্বতে, কেবলা (Kebla) ইহুদীয় প্রদেশে এবং কায়াবা Kaaba আরবে *। অন্য ৪টা কোথায়, তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই, এ প্রসঙ্গে উল্লেখেরও আবশ্যক নাই। কেবলার অন্যনাম জেরুজেলম। বৌদ্ধধর্ম্মের তরঙ্গ শৈবধর্ম্মের শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়াছিল, সুতরাং জেরুজেলমে তাহার আঘাত লাগিল। ধর্ম্ম-শিথিলতা জন্মিল। যুক্ত অবতার ঈশকৃষ্ণ (হরহরি) জন্মগ্রহণ করিলেন। Jesus Christ কে কোরাণে ঈশ পেগম্বর বলে। এজন্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি, Jesus Christ এর হিন্দুকৃত নাম ঈশকৃষ্ণ।

ঈশকৃষ্ণের প্রকৃত নাম লুপ্ত। কয়জন লোকে বিশ্বম্ভর মিশ্র ও সিদ্ধার্থের নাম জানে? অথচ চৈতন্য ও বুদ্ধদেবের নাম সকলেই জানে।

মেরী পুত্র কৃষ্ণ ও বুদ্ধের প্রণালী অবলম্বন করিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিবালয় কৈবল্য ধাম (Kebla) জেরুজেলমে শিবাদেশ ভিন্ন তাঁহার কথা শুনে কে? বিশেষত সে সময়ে পৃথিবীর লোক ৮০ ॥০ আন্দাজ শৈব বৈষ্ণব হইয়াছে, সুতরাং তিনি যুক্ত অবতারের আরোপ করিয়া আপনাকে পরিচয় দিলেন।

তবে ঈশকৃষ্ণ, ঈশের মহত্ত্ব ও কৃষ্ণের চতুরতা, উভয়েই দক্ষ ছিলেন। বুদ্ধদেবের দোষ পরিহার করিয়া চলিতেও ত্রুটী করেন নাই। নির্ব্বাণ মুক্তিবাদ ও জন্মান্তরবাদের সামঞ্জস্য

* হিন্দুদিগের যে বদ্ধমূল বিশ্বাস আছে, কায়াবাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা মিথ্যা নহে। উহা শুক্র প্রতিষ্ঠিত।

মানসে তিনি পুনর্জীবন ও বিচারের কথা প্রচারিত করিলেন। ইহাতে পাপপুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকিল, অথচ পুনঃ পুনঃ জন্মের কেলেঙ্কারী থাকিল না। প্রচারের ভাব কৃষ্ণের প্রচারের মত হইয়া দাঁড়াইল। ইহা এক প্রকার বৌদ্ধপ্রচারের প্রতিক্রিয়ার সূচনা (Reaction)।

কিন্তু তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী Messiah (মহেশের) নামে বাজিত। উক্ত হিব্রুশব্দ আরবী ভাষায় Masih। পাঠক সহজেই বুঝিবেন, হ, শ স্থানে উল্টে যাওয়ায় মহেশ শব্দ ঐ আকার ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারে দ্বিতীয়ান্ত হরিম্ রহিম্ হইয়াছে, রুদ্র পদ লুদ হইয়াছে। Saviour শব্দও শৈবর (শৈবঃ) হইতে হইয়াছে।

যদি এদেশে কোন মোক্ষমূলর জন্মিতেন, আরবী ও হিব্রুর সহিত আদি সংস্কৃতভাষার অনেক সামঞ্জস্য করিতে পারিতেন। আমাদের কথা কে শুনিবে?

মহেশানুগত ঈশকৃষ্ণ, ঈশ নাম ধারণে, মহেশের সহিত পিতা পুত্র ভাব প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদক যোগ্য শিশির বাবু জন রবার্টসন্ সাহেবের কৃষ্ণ খ্রীষ্ট অভিন্নবাদের কথায় মোহিত হইবার পূর্ব্বে একবার স্মরণ করিতে পারেন, এই প্রবন্ধ-লেখক বৎসরাধিক পর্য্যন্ত হোপ ও নব্যভারতে ঐ কথাই প্রচার করিতেছেন। তবে Jesus Christ এর ধর্ম্মপ্রচারে ॥৵০ আনা যে শৈব ভাব আছে, সে কথা আমরা ভুলিতে পারি না। এজন্য ঈশকৃষ্ণ, মহাদেবের সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, অধিকাংশে অবতার, একথা বলিতেই হইবে।

মহেশের দ্বিতীয় এবং অপেক্ষাকৃত পূর্ণ অবতার মহাযোগী মহম্মদ। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে যে প্রতিক্রিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আরম্ভ হয়, তদনুসারেই মহম্মদীয়-ধর্ম্মে তাহা চলিতে থাকে। মহেশে বিশ্বাসের ত্রুটীবশতঃ, বৌদ্ধধর্ম্ম, দর্শনশাস্ত্রের এমন সুন্দর লীলাক্ষেত্র হইয়াও, অধিকারচ্যুত হইতে থাকিল। ঈশকৃষ্ণ সে বিশ্বাস আংশিক স্থাপিত করিতে পারিয়াছিলেন। মহম্মদ তাহা পূর্ণমাত্রায় বদ্ধমূল করার মানসে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন ও কৃতকার্য্য হইয়াছেন, জগতে কোন ধর্ম্মপ্রচারক সেরূপ হইয়াছে কিনা, সন্দেহ। অথচ ইহার মধ্যে একটুকু প্রতিক্রিয়ার ভাব আছে। যে শৈব ও বৈষ্ণব ভাব ঈশকৃষ্ণে যুক্ত হয়, মহম্মদে তাহা বিযুক্ত হইয়া আদি শৈবভাব থাকে। পাঠককে বলিয়াছি, জড়পদার্থের উপাসনাতে ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত আদি শৈবমত, এবং মহম্মদের মত ও Unity of God অর্থাৎ একতাবাদ। ঈশ্বর ভিন্ন কোন দেবতাই নাই। (১) কিন্তু পার্থিব রাজ্য বিস্তারের সহিত কতকগুলি পার্থিব স্পৃহা জন্মে। তদনুসারে তিনি কোন কোন দেবালয় ধ্বংস করেন। কিন্তু তাঁহার দেবভাব শৈবভাব। এমন কি, কোরাণের আদ্য অধ্যায় শৈব যুধিষ্ঠিরের (২) বাক্যের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। নিম্নে তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল।

জয় জয় ঈশ সর্ব্বজীব অধিপতি!
বিচার দিনের পতি দয়াময় অতি।
তোমারে আমরা ভজি হইয়া সহায়
চালাও সেপথে, যে পথে হয় ন্যায়;

"(১) "There is no God but God."
(*Sale's Koran.*)

(২) যে অর্থে অর্জ্জুন শৈব, সে অর্থে যুধিষ্ঠিরও শৈব। যে ধর্ম্মযক্ষের সঙ্গে কথোপকথন হয়, সে যক্ষ শিব ভিন্ন আর কেহই নহে। যক্ষাধিপতি কুবের শিবের অনুগৃহী।

সে পথে, যেপথে গত তব প্রিয়জন (১)
কিন্তু সেই পথে নহে যেপথে দুর্জ্জন।

এতদপেক্ষা সুন্দর ও যোগ্য প্রার্থনা বাক্য হইতে পারে না। ইহা মক্কায় আখ্যাত।

"মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা।"

এই সমীচীন বাক্যও ইহা হইতে ভিন্ন নহে।

কিন্তু মহাম্মদও জন্মান্তরবাদের বিরুদ্ধ। ঈশকৃষ্ণের পুনর্জীবন ও বিচার দিন (রোজ কেযামৎ) মত তিনিও বিধিবদ্ধ করেন। পাঠকগণ অনুভব করিবেন, ভরসা করি, শিবের কৈবল্যবাদ হইতেই বুদ্ধের নির্ব্বাণ, ঈশকৃষ্ণের resurrection এবং মহম্মদের রোজকেয়ামৎ হইয়াছে। তবে বিভিন্নতা এই, কৈবল্য, জন্মান্তরবাদকে ধ্বংস করে নাই, অপর তিনটা মতে করিয়াছে।

কৈবল্যবাদে জড় বহুজন্মে অজড়ে (আত্মায়) পরিণত হইবে। Matter spirit হইবে। (২) এবং বিশ্বব্যাপী আত্মার অবস্থাই নিত্য সুখময় (perpetual felicity); ইহাই কৈবল্য বা কেবল সুখ। বোধ হয়, বহুকাল হইতে প্রকৃতি পুরুষবাদের মতে পুরুষ হইতে প্রকৃতি উৎপন্ন যাঁহারা মনে করেন, সেই বৈষ্ণবগণ স্বীয় মতকে তর্ক শাস্ত্রদ্বারা নির্ব্বোধ জনসংখ্যার মনে বদ্ধমূল করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধ, ঈশকৃষ্ণ, এবং মহাম্মদ কেহই যে ইহার খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এরূপ আমাদের ধারণা নহে। তবে সহজে যতদূর বুঝি, তাহাতে প্রকৃতি হইতে পুরুষের উৎপত্তিই বা কেন না হইবে, ইহার কারণ দেখি না।

যাহা হউক, মহম্মদের অন্যান্য কার্য্যে ও প্রচারে বহু পরিমাণে শৈবভাব রহিয়াছে। এমন কি, বহুশতাব্দী পূর্ব্বে শিবলিঙ্গ উপাসকগণকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য যে চর্ম্মচ্ছেদ সংস্কারের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও মহাম্মদ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বর্ত্তমান সময়ে বৈদিক ও কোরাণিক সম্প্রদায় এমন কুসংস্কারাবৃত যে, শাস্ত্রেও প্রচারে সহস্র ঐক্যভাব সত্বেও তাঁহারা অনৈক্যভাব চক্ষে দেখেন। বৈদিকগণ কোরাণিকগণের জলস্পর্শ পর্য্যন্ত বর্জ্জিত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের মনের দূষিত ভাবের সহিত শাস্ত্রের নির্দ্দোষ অবস্থাকেও দূষিত মনে করেন এবং যেখানে গভীর ভ্রাতৃত্ব রহিয়াছে, সেখানে গভীর শত্রুতার কারণ সৃষ্টি করিয়া বৈদিকগণ বৃথা সামাজিকতায় মত্ত হন। কাল নিকট হইয়াছে, যেদিন স্পর্শ দোষ উঠাইয়া বৈদিক ও কোরাণিকে, হিন্দু মুসলমানে অপূর্ব্ব মিশ্রণ সম্পাদিত হইবে। ভগবান সত্বর সেইকাল আনয়ন করুন।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

(১) Sale সাহেবের ইংরাজী অনুবাদের অনুবাদ।

(২) নিউটন সাহেবও বলেন God is a Substance ইহারই অর্থ ঐশ ভাব জড়ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

তত্ত্বকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৬১। তুমি তাপসবর জনিদের (করিযের) খেড়কা অঙ্গে পরিধান করিয়াছ, কিন্তু বোধ হয় সয়তাম তোমা হইতেই শিক্ষা পাইয়াছে। অন্তরকে নির্ম্মল করিতে চেষ্টা পাও, বাহ্য ভেক ধারণে কিছুই হইবে না! মাকাল ফল দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু তাহার ভিতরে অঙ্গার।

৬২। তুমি মিষ্ট কথার উপদেশ দানে সকলকে মুগ্ধ করিতেছ, কিন্তু তুমি নিজেই যে সংসার-সুখান্বেষণে কুকুরের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছ! তুমি প্রকাশ্য ধার্ম্মিকতা দেখাইতেছ, কিন্তু তোমার হৃদয় যে অত্যাচারে পরিপূর্ণ। হৃদয়কে পবিত্র কর। সংসারের সহিত সন্ধি করিয়া সেই করুণানিধি প্রাণেশ্বরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না।

৬৩। যিনি দয়া করিয়া তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তোমার কার্য্যক্ষেত্রের সহায় করিয়াছেন, যিনি তোমাকে তোমার দেহ ও মনোরাজ্যের সম্রাট করিয়াছেন, সেই পরম কারুণিকের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইতে কি তোমার লজ্জা হয় না?

৬৪। তুমি জ্ঞান দৃষ্টিতে ভাল মন্দ বাছিয়া লও। অহং ভাব ছাড়িয়া সম্পূর্ণ তাঁহার অনুগত হও, তবে তাঁহাকে পাইবে।

পারসিক নুরি বলিয়াছেন,—

৬৫। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেম-সাগরে নিমজ্জিত হন, তিনি দিন দিন অধিকতর প্রেম-পিপাসু হইতে থাকেন।

৬৬। সর্ব্বাবস্থায় প্রভুর দাস হইয়া থাকাই স্বাধীনতা। সখাকে মনন করিতে যাহা কিছু প্রতিবন্ধক, তাহা হইতে দূরে থাকাই প্রেমের লক্ষণ।

৬৭। নিভৃতে প্রেম করা এবং সাধনাকে গুপ্ত রাখাই সাধকের লক্ষণ।

৬৮। যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরকে মনে করেন, তাঁহাদের মনে অন্য কোন পদার্থেরই স্থান হয় না।

৬৯। তুমি ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে লোকের অপ্রিয় হইতে পার, শারীরিক ক্লেশও পাইতে পার, কিন্তু তাহাতে ভীত হইও না। মনুসুরের কথা স্মরণ করিলে তোমার সকল ভয় নিরাকৃত হইবে। কারাগারে তাঁহার প্রতি ভীষণ পাশব অত্যাচার হইয়াছিল। সেই বীরাত্মা অম্লানবদনে তৎসমস্ত সহ্য করিয়া সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। খলিফা তাঁহার বধের জন্য শূল আনাইলেন। মনুসুর শূল চুম্বন করিয়া বলিলেন, বীর পুরুষেরা স্বর্গীয় শূলে আরোহণ করিয়াই স্বর্গারোহণ করিয়া থাকেন। খলিফার আদেশে তাহার হস্ত ছিন্ন হইল। তখন তিনি সহাস্যে বলিলেন, তুমি আমার মানবীয় হস্ত ছেদন করিলে, কিন্তু আধ্যাত্মিক হস্ত, যাহা স্বর্গের চূড়া হইতে গৌরবের মুকুট আকর্ষণ করিতেছে, তাহা কিরূপে ছেদন করিবে? খলিফা তাঁহার পদদ্বয় ছেদন করাইলেন। তখন ধর্ম্মবীর মনুসুর বলিলেন, এরূপ ছেদন করা সহজ বটে, কিন্তু আমি যে পদ দ্বারা স্বর্গলোক ভ্রমণ করিব, তাহা আমার এখনও অছিন্ন রহিয়াছে।

অনন্তর মনুশুর শরীর-নিঃসৃত শোণিত দ্বারা অজু করিয়া বলিলেন, প্রেমের অজু শোণিত ভিন্ন বিশুদ্ধ হয় না। খলিফা তাঁহার চক্ষু-দ্বয় উৎপাটন করাইলেন। তখন সেই ধর্ম্মপ্রাণ মনুশুর বলিলেন, হে ঈশ্বর! ইহারা আমাকে এত যন্ত্রণা দিতেছে, কিন্তু তুমি ইহাদিগকে পরম সম্পদ হইতে নিরাশ ও বঞ্চিত করিও না। আমার হস্ত পদ তোমার পথেই ছিন্ন হইয়াছে। ইহাদের কোন অপরাধই নাই। যখন আমার মস্তক দেহ হইতে বিচ্যুত হইবে, তখন সে তোমাকেই দর্শন করিবে।

৭০। সংসারের প্রতি যাঁহার ঘৃণা, ঈশ্বরের প্রতি যাঁহার দৃষ্টি, তিনিই ধনী। লোকের অত্যাচারে যিনি অক্ষুণ্ন, তিনিই মহাজন।

৭১। তুমি বিশ্বাসের চক্ষে বুলবুল ও পতঙ্গের প্রতি দৃষ্টিকর, দেখিবে পতঙ্গ অগ্নি দর্শন মাত্র আনন্দে মুগ্ধ হইয়া প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতেছে। বুলবুল বসন্তাগমে প্রফুল্ল চিত্তে উদ্যানভূমিস্থিত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে মধুর কূজন ধ্বনি বিস্তার করিয়া বেড়াইতেছে। প্রস্ফুটিত কুসুমরাজির কোলে কোলে বসিতেছে, কিন্তু মধুর স্বাদ গ্রহণে বিমুখ। তাহার আনন্দে অনুরাগের চিহ্ন মাত্র নাই। ঈশ্বরে যাঁহার প্রকৃত অনুরাগ আছে, সে পতঙ্গের ন্যায়। যাহার অনুরাগের চিহ্ন বাহ্য আড়ম্বরে পর্য্যবসিত, সে বুলবুলের ন্যায়।

৭২। তুমি সংসার-কুহকিনীর কুহকে কখনই মুগ্ধ হইও না। সে তোমাকে ব্যাধের ন্যায় লোভ দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিতে চেষ্টা করিতেছে।

৭৩। তুমি লোভ বাহনে আরোহণ করিয়া কখনই পৃথিবী রূপ রেকাবে পা রাখিও না। যদি রাখ, তবে তোমাকে কলুর বলদের ন্যায় ঘুরাইয়া ২ তোমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করিবে।

৭৪। তুমি কাকের ন্যায় লোভাকৃষ্টচিত্তে পর্ব্বতের শিখরে শিখরে উড়িতেছ, কখনই বুলবুলের ন্যায় স্থায়ী উদ্যান বিহার করিতে সমর্থ হইবে না।

মছনবীতে উক্ত হইয়াছে—

৭৫। ধিক্ সে জীবনে, যে স্থায়ী সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া অস্থায়ী সম্পত্তি লাভ লালসায় ব্যগ্র। যে উদ্যান কণ্টকাকীর্ণ, তাহাতে পুষ্পান্বেষণ করিতে গেলে সর্পের হস্তে পড়িতে হইবে।

৭৬। যদি তুমি বুলবুলের ন্যায় উদ্যান বৃক্ষে পুষ্পান্বেষণ করিতে চেষ্টা কর, বিষ্টাস্থিত কীট ভিন্ন কোন সুগন্ধ পুষ্প তোমার ভোগে আসিবে না।

কোরাণে উক্ত আছে—

৭৭। সংসারকে মৃত শব রূপে সৃষ্টি করিয়াছি, যে তাহার অন্বেষণ করিবে, তাহাকে কুকুর ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

৭৮। জ্ঞানীগণ পরম বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া পরম শত্রুর সহিত প্রীতি করেন না। তুমি কদাপি শত্রু মিত্র নির্ব্বাচনে বিমূঢ় হইও না।

৭৯। ভগবানের দর্শনলাভ জন্য নিরন্তর চেষ্টা চাই, দেওয়ালের পশ্চাৎ পেঁচকের ন্যায় বসিয়া থাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

মছনবীতে লিখিত আছে—

৮০। তাঁহার সহিত বন্ধুতা করিতে

গেলে তিনটী গুণ থাকা চাই। নদীর ন্যায় বদান্যতা, সূর্য্যের ন্যায় ঔদার্য্য এবং পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণুতা।

হাফেজ বলিয়াছেন,

৮১। ঈশ্বরে বন্ধুতার প্রাচুর্য্য সংখ্যানুসারে নয়, হৃদয়ের যোগে প্রত্যক্ষ।

৮২। এই দুইটী ব্যাপার মনুষ্যের পক্ষে তুল্য গর্হিত—নরনারীর অবমাননা করা, এবং ঈশ্বরের আনুগত্য অস্বীকার করা।

৮৩। তুমি অনন্য চিত্তে ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে, তবে অন্য পদার্থকে ভুলিতে পারিবে; তবে তাঁহাকে বন্ধু সম্বোধন করিতে পারিবে। যদি তুমি তাহা পার, তবে ঈশ্বর তোমার সকল পদার্থের স্বরূপ হইবেন।

মছনবীতে আছে,—

৮৪। তুমি প্রতিদিন সহস্রবার মরিবে, তবে জীবিত হইতে পারিবে। তাহাতে তুমি এমন একটী জীবন লাভ করিবে, যাহার মৃত্যু নাই। যখন তুমি তাঁহাকে জীবন অর্পণ করিবে, তখন তুমি মরিবে, কিন্তু তিনি তাঁহার জীবন তোমাকে অর্পণ করিবেন। তখন তিনি তোমার সম্মুখে যে পথ উপস্থিত করিবেন, তাহাতে তোমাকে তোমার নিকট প্রকাশ করিবেন। তাহাতে দর্শন, অলৌকিকতা এবং তত্ত্ব-জ্ঞান প্রকাশিত হইবে। তখন সমুদয় জগৎ ভুলিয়া উজ্জ্বল রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তখন তুমি কিছুই থাকিবে না, সম্পূর্ণ তিনিই থাকিবেন। মনে কর, যখন লৌহ অগ্নি সন্তপ্ত হইয়া অগ্নির আকার ধারণ করে, তখন কি লৌহ ও অগ্নিতে কোন প্রভেদ থাকে?

৮৫। তুমি জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিলে দেখিতে পাইবে; যেমন সূর্য্যোদয় হইলে রাত্রির অন্ধকার থাকেনা, কেবল আলোকই প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ তোমার আঁধার হৃদয়ে তাঁহার উদয় হইলে কেবল জ্যোতিই থাকিবে। তুমি ও তোমার হৃদয় থাকিবে না, কেবল তিনি! কেবল তিনি!!

৮৬। তুমি সাবধান হইও, নিজের হস্তকে কদাপি ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচরণে নিযুক্ত করিও না। জিহ্বাকে অসত্য ও পরদোষ কথনে ও তোমার ইন্দ্রিয়গণকে অবশীভূত হইতে দিও না। তাঁহার চিন্তা যেন তোমার অন্তরাকাশে সূর্য্যের ন্যায় উদিত থাকে।

৮৭। [যাহারা তোমার] নিকট অন্য লোককে অগ্রাহ্য করে, তাহাদের প্রতারণা বাক্যে ভুলিও না। উহা মহা বিপদ-সকলের মধ্যে প্রধানতম বিপদ।

৮৮। তুমি কাহারও প্রতি অসদাচরণ করিও না। যদি কেহ কাহারও প্রতি দুর্ব্যবহার করে, ঈশ্বর অপরকে দিয়া কৌশলে তাহার প্রতিবিধান করেন।

৮৯। তুমি কেবল সেই ঈশ্বরকেই ভয় ও কেবল তাঁহারই সহিত বন্ধুতা করিবে। সংসার বা সাংসারিক পদার্থকে ভয় ও তাহার সহিত বন্ধুতা করিও না।

৯০। ঈশ্বরের নিকটেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে; জনক জননী, তাপস ও রাজার নিকটে সাধারণ।

৯১। যখন কোন রোগীকে দেখিতে যাইবে, খালি হাতে কখনই যাইও না।

৯২। ধর্ম্ম-বিরোধী লোকদিগের সহিত কদাপি বন্ধুতা করিও না।

৯৩। ঈশ্বরের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে তাহাই তোমার দীনতা।

৯৪। তুমি কখনও কুচিন্তা করিও না। যাহারা কুচিন্তাকে মনে স্থান দেয়, তাহারা ঈশ্বর হইতে বহু দূরে থাকে। তুমি কেবল সেই ঈশ্বরকেই হৃদয়ে স্থান দিবে ও তাঁহাকেই স্নেহ করিবে। এক হৃদয়ে দুই বস্তুর স্থান হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গল্প বলা যাইতেছে।

কোন নগরে রূপগুণ সম্পন্না এক ষোড়শী যুবতী বাস করিতেন। তিনি কোন যুবাপুরুষের উজ্জ্বলরূপে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। যুবাপুরুষও রমণী-রত্ন লাভে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিলেন। পরস্পর প্রগাঢ় প্রণয়ের সহিত কিছু দিন সুখে অবস্থিতি করিলে পর, একদিন যুবক একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্পের আঘ্রাণ লইতে লইতে ঐ যুবতীর সমীপস্থ হইলেন। যুবতী যুবকের হস্তে গোলাপ পুষ্পটী দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, ওরে অপ্রেমিক! অদ্য হইতে তুমি আর আমার নিকটে আসিও না। আমিও তোমার নিকট যাইব না। মক্ষিকা কি পতঙ্গের ন্যায় প্রেমিক হইতে পারে? চিল কি কখনও বাজকে ধরিতে পারে? কাক কি কবুতরের ন্যায় চলিতে পারে? যে বনে জঙ্গলে উড়িয়া বেড়াইবে, সেকি কখনও উদ্যান-বিহার-সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয়? বাজ যেরূপ অন্যের শরীর-নিঃসৃত শোণিত অঙ্গে মাখাইয়া সহিদের গোরে শুইলে সহিদ হইতে পারে না, তদ্রূপ মৌখিক প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ করিলেই কেহ প্রেমিক হইতে পারে না। প্রেমিকের হৃদয়ে দুইটী ভালবাসার স্থান হয় না। এক সিংহাসনে এককালীন কি দুই সম্রাট রাজ্য শাসন করিতে পারেন? তুমি যখন গোলাপ পুষ্পকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছ, তখন তোমার হৃদয়ে আমার স্থান নাই।

প্রেমিক ইয়াহিয়ার কথা শুনিয়া থাকিবে। তিনি অত্যন্ত প্রেমিক ও বৈরাগী লোক ছিলেন। এক দিন তিনি পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখ চুম্বন ও মুখাবলোকন করিতেছেন, এমন সময় সেই পুত্র বলিল, পিতঃ! আপনি কি আমাকে ভাল বাসেন? ইয়াহিয়া বলিলেন, হাঁ। পুত্র বলিল, আপনার ঈশ্বরকেও ভালবাসেন? পিতা বলিলেন, তাঁহাকেও ভালবাসি। তখন পুত্র বলিল, পিতঃ, এক হৃদয়ে দুই ভালবাসা তিষ্টিতে পারে না। ইয়াহিয়া শিশু পুত্রের মুখনিঃসৃত অমৃতময় উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞান লাভ করিলেন। তিনি তদ্দণ্ডে পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত নির্জ্জন বাস করেন। তুমি যখন গোলাপ পুষ্প ভালবাসিয়াছ, তখন আমাকে ভালবাসিতে পারিবে না। অদ্য হইতে আমাকে পরিত্যাগ কর। আমিও তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম।

৯৫। তুমি সতর্ক থাক, দস্যু সয়তান (কুবৃত্তি) তোমার হৃদয়-গৃহে প্রবেশ করিয়া যেন বিশ্বাস রূপ মূল ধন চুরি করিতে না পারে।

মছনবীতে উক্ত আছে;

৯৬। তোমার হৃদয়-গৃহে চক্ষু ও কর্ণ রূপ যে দুইটী দ্বার আছে, সয়তান ঐ দ্বার দিয়া হৃদয়-গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমার মূলধন বিশ্বাসকে অপহরণ করত জিহ্বারূপ দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া যাইবে। অতএব তুমি জ্ঞানরূপ দ্বারবানকে উপদেশ দেও

যে সে যেন সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত দ্বার রক্ষা করে।

কবিবর সেখ সাদি বলিয়াছেন —

৯৭। যিনি চক্ষু, কর্ণ ও জিহ্বারূপ তিন দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া সয়তানের হস্ত হইতে বিশ্বাসরূপ ধন রক্ষা করিতে সমর্থ, তিনিই ধনী।

৯৮। তোমার মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইতেছে। মুমূর্ষু সময়ে জ্ঞান শূন্য হইবে। জীবিত থাকিতে থাকিতে ঈশ্বরকে সাধিয়া লও।

৯৯। তুমি জ্ঞানরূপ চক্ষুকে উন্মীলিত রাখ, মরণান্তে তোমার কি হইবে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে।

১০০। তুমি যাহাদের জন্য সর্ব্বদা কুচিন্তা বিষে জর্জ্জরিত, তাহারা সে বিষের একটুও ঔষধ দিতে পারে না। মরণ সময়ে তাহারাই তোমার গাত্রচ্ছাদন উন্মোচন পূর্ব্বক তোমাকে মৃত্তিকায় সমাহিত করিবে। তোমার নিজের বলিবার একটী বস্তুও তোমার সঙ্গে যাইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীমির্জ্জা আমিনউদ্দিন আহাম্মদ।

বঙ্গবাসী ও অনাচরণীয় হিন্দু।

(২)

এখন কথা এই, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এত অনুদার ভাব লইয়া বঙ্গ-বাসী মাথা তুলিতেছে কেন? অনেকে বলেন, বঙ্গ-দেশের অপকৃষ্ট শ্রেণীর পাঠকবৃন্দ, বঙ্গবাসী যে খাদ্য যোগায়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্য পরিপাক করিতে অসমর্থ। ইহা আংশিক সত্য হইতে পারে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। আমাদের বিবেচনায়, বাঙ্গালী যে প্রকার ধর্ম্ম ও সামাজিক ভাব-প্রধান জীব, বঙ্গ-বাসীও তেমন ঐ সকল ভাব-উদ্দীপক ব্রতে লিপ্ত। ধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা না হইলে অবশ্য দেশের এ বিকৃত অবস্থা হয় নাই: সুতরাং ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা যাহা বলা যায়, তাহাতে বাঙ্গালীর মন আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। "সুসংবাদের ঝুটাও ভাল," বঙ্গ-বাসীর উন্নতির মূল মন্ত্রও তাই। হিন্দু-ধর্ম্মের উন্নতির কথা বলিয়া, হিন্দু ধর্ম্মের মাথা খাইলেও সংজ্ঞাহীন হিন্দুজাতি নয়ন তুলিয়া দেখিবে না। তাহা না হইলে ৫।৬ লক্ষ ব্রাহ্মণের স্বার্থে পরিচালিত হইয়া ৪ কোটি হিন্দুর স্বার্থ-ধ্বংস-কারককে অম্লান বদনে দেশের লোকে হিন্দু ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া স্বীকার করিবে কেন? সত্য বটে, বঙ্গ-বাসীর প্রবর্ত্তনায় রাজসাহীর ধর্ম্ম-সভা বরিশালের ধর্ম্ম সভা, কুমিল্লার ধর্ম্ম-সভা প্রভৃতি কতকগুলি হিন্দু ধর্ম্মের সংরক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, এগুলি কি হিন্দু ধর্ম্মের সভা, না ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সভা? এই সকল সভায় অনাচরণীয় হিন্দুর প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা হয় এবং তাহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মোন্নতি সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা আছে কিনা? পাথুরিয়াঘাটার শৌণ্ডিক বংশ, দিবলহাটীর রাজা, ঢাকার শৌণ্ডিকগণ, চাঁদসীর ডাক্তার পরিবার, মাধবপাশার জমীদারগণ, বাবু উমাচরণ দাস প্রভৃতি আরও লক্ষ লক্ষ অনাচরণীয় হিন্দু এই সকল ধর্ম্মসভায় হিন্দু ধর্ম্মের সাম্যবাদের সুবিধা সফল প্রাপ্ত হন কি না, এ কথা কে বলিবে? যদি তাহা না হয়, তবে কাহাকে লইয়া হিন্দু ধর্ম্ম?

জন কতক স্বার্থপর ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ও জন কতক অপরিণামদর্শী কায়স্থ, ইহারাই কি হিন্দু জাতি সকলের কর্ত্তা? ইহা যে ভাবে, সে পাগল। হিন্দু ধর্ম্মের সমুদ্রে যে একটুক একটুক বাতাস উঠিতেছে, তাহার যে পরিণাম-ফল ভয়ানক তরঙ্গসংঘাত, একথা ধারণা করা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। সাধারণ শিক্ষা, প্রজাসত্ব আইন এবং অনুবাদিত বেদ ও কোরাণ যখন কার্য্যকারী মান্ত্রিকের হস্তে পড়িয়া সমুদায় নিম্ন শ্রেণীকে উর্দ্ধে প্রধাবিত করিবে, যখন দেশের ৩/৪ ভাগ লোক, অর্থাৎ শূদ্রজাতি তাহাদের স্বত্ব ও অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য অকুতোভয়ে অভ্যুত্থান করিবে, তখন বৌদ্ধদেবের উত্তরাধিকারী কল্কিদেব স্বীয় হিন্দু ধর্ম্মের সাম্যবাদের কশাঘাতে এই হিজিবিজি ধর্ম্মসভা গুলিকে উঠাইয়া দিয়া নব হিন্দু ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবেন। তাহার ভিত্তি বৈদিক সাম্যবাদ, তাহার বাহ্য শোভা পৌত্তলিকারূপ ধর্ম্মজগতের অপূর্ব্ব কাব্য, তাহাতে জাতিভেদের সৌন্দর্য্যও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার কদর্য্য ভাব স্পর্শদোষ থাকিবে না।

বঙ্গ-বাসীর কৃতকার্য্যতার দ্বিতীয় কারণ, বাঙ্গালী জাতি যায় কোথা? সঞ্জীবনী একখানি উৎকৃষ্ট কাগজ বটে, হিন্দুগণ তাহার উপর আস্থা প্রদর্শন করিতে পারে না। সঞ্জীবনী নিজেও হিন্দু ধর্ম্মের সমালোচনার জন্য অগ্রসর নহে। "সময়" ও "সহচর" প্রভৃতি সংবাদপত্র হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজ পরিত্যাগ করিয়া নানা বিষয়ের গণ্ডগোল লইয়া ব্যস্ত। সুতরাং হিন্দু সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে অযথা বাক্য ও কুসংস্কার সম্পন্ন মত প্রকাশ করিলেও বঙ্গ-বাসী করে। বঙ্গ-বাসী যদি আচরণীয় ও অনাচরণীয় হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, ধনী ও দরিদ্রের প্রতি অপক্ষপাতে হিন্দুধর্ম্মের সাম্যবাদ শিক্ষা দিত, বঙ্গ-বাসী দেশের উপযুক্ত কাগজ হইত। বঙ্গ-বাসীর ভূতপূর্ব্ব লেখকগণ এই নীতি বলেই বঙ্গবাসীকে দেশীয় কাগজের শীর্ষস্থানে আনিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ-বাসী ব্রাহ্মণের হস্তে পড়িয়া সে নীতি ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিয়া গেলেও, যে পাঠকগণ বঙ্গ-বাসী পড়েন, তাঁহারা বঙ্গ-বাসীর নীতি পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা যে পর্য্যন্ত বঙ্গ-বাসীকে নিরপেক্ষ না দেখিব, যে পর্য্যন্ত বঙ্গ-বাসী অনাচরণীয় হিন্দুর সামাজিক উন্নতির জন্য অগ্রসর না হইবে, সে পর্য্যন্ত বঙ্গ-বাসীর কুটিলতা ঘোষণা না করিয়া থাকিতে পারিব না। এরূপ ব্রতে আমাদের কষ্ট না আছে, এমত নহে, কিন্তু সমস্ত হিন্দু জাতির সংঘটন অপেক্ষা জনকতক ব্রাহ্মণের স্বার্থপরতা প্রকাশিত করা তত অনভীপ্সিত হইতে পারে না। নিজের দোষ নিজে দেখা প্রায়ই ঘটেনা। এজন্য বঙ্গ-বাসীর দোষ প্রদর্শনেই এই প্রবন্ধ লেখা হইল। রাজনীতি ও বাণিজ্য নীতি সম্বন্ধে বঙ্গ-বাসীর মত, আমাদের বিবেচনায় তত অন্যায় নহে।

বঙ্গবাসী যদি সঙ্কর জলচল অর্থাৎ অনাচরণীয় হিন্দুর সজল ব্যবহারের পক্ষ সমর্থন না করে, তবে অনাচরণীয় হিন্দু বঙ্গ-বাসীর হাত ছাড়া হইবে। ৩/৪ ভাগ হিন্দু সংখ্যার স্বার্থের জন্য দ্বিতীয় বঙ্গ-বাসী প্রকাশিত হইতে আজ কালকার দিনে বড় অধিক বিলম্ব হইবে না। বঙ্গ-বাসীর প্রতি অদ্যাপি আমাদের শ্রদ্ধা ভক্তি আছে বলিয়াই এই সাবধানতার প্রবন্ধ লিখিত হইল। আশা করি, আমাদের উদ্দেশ্যের অন্যায় অর্থ করা না হয়।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

জন বুল ও রাজা বাহাদুর।

রাজা ক্ষুদীরাম জমীদার বাহাদুর, ঘটিরাম ডিপুটী ও জলধর মুন্সেফের সম্মুখে ভয়ে কাঁপেন; হ্যাট্‌কোটধারী সবডিপুটী ইক্রস্‌ সাহেবকে দেখিলে ত কথাই নাই। একজন সাম্যবাদী ইংরেজের পক্ষে ইহা বিষম প্রহেলিকা। ইউরোপে লালিত পালিত শিক্ষিত জন্‌বুল বুঝিতে পারেন না, কি কারণে মানুষ এত হীনহৃদয় হইতে পারে। রাজা বাহাদুরের সঙ্গে জন্‌বুলের যদি শারীরিক (Anatomically) কোনপ্রকার পার্থক্য থাকিত, জন্তুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সভাতে (Zoological society) জানাইয়া প্রাণীবিদ্যার (Natural History) নূতন সংস্করণে রাজা বাহাদুর ও তাঁহার স্বজাতিবর্গকে, নাম খারিজ করত, দার্ব্বিনের হারাধনের (Missing link) শ্রেণীতে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। অনুবীক্ষণ দ্বারা পরীক্ষা (Histologically) করিয়াও কোন প্রভেদ পান নাই, সুতরাং শ্বেতাঙ্গ ভায়ার অত্যন্ত ধাঁধা লাগিয়াছে। "In what category can this curious featherless biped be placed; A human body presupposes a human soul, it cannot reasonably carry any thing less dignified in it." অনেক চিন্তার পর, এই বলিয়া টেবিলে এক ঘুসি মারিলেন।

বন্ধু জনবুল! সব দেশ ইউরোপ নয়; একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখ, ক্রমাগত বিংশতি পুরুষের আলস্য ও মূর্খতা (সুতরাং নিকৃষ্ট ক্ষুদ্রহৃদয়তার জননী ঘোর স্বার্থপরতা) একত্র করিলে কি এরূপ একটী অভিনব জীব প্রস্তুত হইতে পারে না? তোমাতে উঁহাতে কেন এত তফাৎ, ভাল করিয়া বুঝাইয়া তৎসঙ্গে কিছু উপদেশ দিলে শাদার উপর একটু কালীর আঁচড় পড়া অসম্ভব নয়, যৎ কিঞ্চিৎ কণিকামাত্র শুভফলের আশা করা যাইতে পারে। ভারত উদ্ধারের জন্য ভগবান যখন তোমাদের হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিয়াছেন, চেষ্টা করিয়া দেখ; তবে, একদিনে সাগর বন্ধন হয় না, সাতশত বৎসরের কলঙ্ক সহসা মোচনের আশা, বাতুলতা।

শুভমাত্র মহামনা ইংরেজ লোকাচার্য্যরূপে রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া প্রেমের সহিত আরম্ভ করিলেন:—

"রাজা বাহাদুর! তুমি যে আমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া সম্ভাষণ কর, উহা আমি ভালবাসি না; এবং কোন বিষয়ে তোমার মত জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি যে উত্তর দাও, "হুজুরের যাহা মত, আমারও তাহাই," ইহাতেও আমি বিশেষ দুঃখিত; প্রথম, আমার মত জানিবার পূর্ব্বে তুমি তাহাতে সায় দাও, এ কিরূপ অসঙ্গত ও অনৈসর্গিক ব্যাপার! তারপর, সর্ব্বদা আমার বা অন্য কাহারও (সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর সম্রাট হউন না কেন?) সহিত তোমার মতের ঐক্য হইবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। বহুকাল মুসলমান দৌরাত্ম্যের অধীনে থাকিয়া এই সকল কু অভ্যাস চরিত্রগত হইয়া পড়িয়াছে। "Fatherhood of God and

brotherhood of man." আমাদের ধর্ম্ম, সুতরাং সমদৃষ্টি আমাদের স্বভাব; ইতর বিশেষ ভাব জোর করিয়া অনেককে অবলম্বন করিতে হয়, কেবল তোমাদের দোষে। তোমাদের যে সকল লোক আমাদের দেশে গিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিতে পারেন, জাতি নির্ব্বিশেষে সকল ব্রিটীশ নরনারী তাঁহাদের প্রত্যেকের সহিত কিরূপ সুন্দর, সুমিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন, মানুষমাত্রের প্রতি আমাদের দেশে কিরূপ সম্মান। যে সকল দৃশ্য জন্মে কখন সহ্য করি নাই, তোমাদের জন্য তাহাও চুপ করিয়া দেখিতে হইতেছে:—যদি দেশে কেহ তোমার মত সেলাম করে, অপ্রকৃতিস্থ পাগল বলিয়া তাহাকে পুলিশের জেম্মা করিয়া দিতে হয়; এইরূপ কত সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত বিসদৃশ ব্যাপার সর্ব্বদা সম্মুখে অবাধে ঘটিতেছে, দেখিতে দেখিতে চক্ষু অসাড় ও হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এখন কিসে ভাল হয়, এ সম্বন্ধে দুই এক কথা তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি।

জ্ঞান পশুকে মানুষ করে, মানুষকে দেবতা করে, সুতরাং জ্ঞানলাভ তোমাদের প্রথম প্রয়োজন; এই অমূল্যধন অধিকৃত হইলে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সহজ হয়। জ্ঞানোপার্জ্জন হইলে জীবন সম্বন্ধে মনে এক নূতন ভাব দাঁড়াইবে। এখন 'পারিবারিক সম্ভ্রম' 'বংশ মর্য্যাদা' প্রভৃতি দানবগণের সেবার্থ ক্রমাগত অর্থসংগ্রহ করিয়া ভাবিতেছ, পুত্র পৌত্রাদির প্রতি কর্ত্তব্যসাধন হইতেছে; কিন্তু জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে দেখিতে পাইবে, পুঞ্জীকৃত অর্থ রাশীকৃত রোগের কারণ; এইরূপ উত্তরাধিকারের সাহায্যে, সকল প্রকার অনর্থের মূল আলস দ্বারা আক্রান্ত সন্তান সন্ততি, নিজেদের এবং সংসারের দারুণ অকল্যাণের হেতু হইয়া থাকে। আমাদের দেশে বলে, 'Idlers are the worst thieves that plague and infect the community.' পুরুষ পুরুষানুক্রমে এইরূপ আলস্যের স্রোত চলিলে শারীরিক ও মানসিক প্রাণশূন্যতা অনিবার্য্য। হৃদয়ের বলাভাব হেতু ওরূপ অস্বাভাবিক "হাকিমভীতি," শারীরিক হীনতার প্রমাণ পৌষ্যপুত্র গ্রহণ। দত্তক দ্বারা বংশরক্ষার চেষ্টা যে নিতান্ত জঘন্য শ্রেণীর অর্ব্বাচীনতা, এরূপ সোজা কথাও তোমাদের বুদ্ধিস্থ হয় না, ভাবিয়া দেখ, কতদূর শোচনীয় তোমাদের অবস্থা। একজন গরিবের ছেলেকে মূর্খতা, আলস্য, ভোগ বিলাস, এবং দুরন্ত ছয় রিপুর ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদল মধ্যে হাত পা বাঁধিয়া নিক্ষেপ করাতে যে মহাপাপ হয়, বুঝিবার বোধ হয় শক্তি নাই। আমাদের দেশে কত কুবের সম ধনী, অপুত্রক অবস্থায় ইহ সংসার ত্যাগ করিবার সময়, সমস্ত সম্পত্তি লোক-সেবার্থ দান করিয়া যান। এরূপ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে; কোটী কোটী টাকা এই প্রকারে সাধারণের কাজে লাগিতেছে।

ত্রিভুবন-পালক পরমপিতা পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্ট জীবগণকে প্রত্যেকের প্রয়োজনানুরূপ শক্তি দিয়াছেন, যাহা দ্বারা তাহারা অতিসুখে, সুস্থশরীরে, সচ্ছন্দমনে আপনাপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে সক্ষম হয়। সেই সকল শক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীন ভাব অবলম্বন জীবের ধর্ম্ম। অতএব পৈতৃক ধন সম্পত্তি পান নাই বলিয়া যিনি আপনাকে

দুর্ভাগ্য মনে করেন, তিনি ঈশ্বরের অকৃতজ্ঞ বিদ্রোহী সন্তান। ঈশ্বরপ্রদত্ত শক্তির অপব্যবহারে উহা নাশ প্রাপ্ত হয় এবং জীবকে পরাধীন করিয়া দুঃখ আনয়ন করে।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ দুঃখয়োঃ।

ইহা তোমাদের শাস্ত্রের কথা, অথচ তোমরা এরূপ সুন্দর বাক্য সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া চল। সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় সকল কাজে ষোল আনা পরের উপর নির্ভর করিয়া অকর্ম্মণ্য জড় পিণ্ডের ন্যায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা ঘোর বিড়ম্বনা তাহা তোমরা অনুভব করিয়াও আমলে আনিতে চাও না; ঔষধাদি দ্বারা কোন প্রকারে তালি তুলি দিয়া নিস্তেজ * আত্মা ও দুর্ব্বল শরীর যেন কেনচিৎ একত্র রাখিয়া চিকিৎসক-পালনী বৃত্তি চরিতার্থ করত বাহাদুরী দেখাইতেছ। আর আমাদের দেশে ব্রিটীশ সম্রাজ্যের ভাবী সম্রাট প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের মত লোক বাল্যাবধি জাহাজের খালাসিদের সঙ্গে পরিশ্রম দ্বারা শরীর এরূপ সবল ও সুস্থ রাখিয়াছেন যে, কোন কালে তাঁহাকে কাহারও উপর নির্ভর না করিলেও চলে। সতেজে তিনি তোমাদের দেশ পর্য্যটন করিয়া গেলেন; স্বচক্ষে দেখিলে, আমি আর কি বলিব।

নামের জন্য তোমরা সর্ব্বদা ব্যস্ত, সুতরাং এই মোটা কথা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে;—বর্ত্তমানে, বিশেষ ভবিষ্যতে দশজনে যাহাতে নাম করে, এমন কাজ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। এখন ভাবিয়া দেখ, কি করিলে শত সহস্র মুখে প্রকৃত সুখ্যাতি লাভের সম্ভাবনা। তোমরা যে সকল মহাপুরুষকে প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি বল, তাঁহারা কি বহু অর্থ সঞ্চয় দ্বারা এবম্বিধ নাম রাখিয়া গিয়াছেন? না; তোমাদের শাস্ত্রের শাসন-বাক্যানুসারে স্বার্থপর কৃপণের নামগ্রহণ নিষেধ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই এক নিয়ম। স্বার্থপরতা ন্যায়ের মস্তকে কুঠারাঘাত করে; যাহা কিছু ন্যায় ও কর্ত্তব্যের বিরোধী, তাহা ক্ষণস্থায়ী জানিবে। স্বার্থপর কৃপণের সম্মুখে যে যাহাই বলুক, অসাক্ষাতে তাহাকে শাপ না দিয়া জল গ্রহণ করে না; জীবিত কালে এই দশা; তারপর তনুত্যাগান্তে নিকৃষ্ট জন্তুর ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে সমগ্র সংসারের দ্বারা সম্যক রূপে বিস্মৃত। যাঁহারা এ সংসারে কোটী কোটী জীবের পূজা পাইয়াছেন, পাইতেছেন ও যাবচ্চন্দ্র দিবাকর পাইতে থাকিবেন, তাঁহারা সমকালিক ও ভবিষ্যদ্বংশের প্রকৃত মহত্ত্ব সংস্থাপনোদ্দেশে জ্ঞান ধর্ম্মোন্নতি জন্য বিপুল ত্যাগ স্বীকার ও দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিয়া, কেহ কেহ সয়তান শত্রু হস্তে প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়া, উন্নত চরিত্রের মহোচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের মূল মন্ত্র "My nation first, myself second;" সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁহারা লিপ্ত ছিলেন না, মর্ত্ত্যব্যাপারে কেবলমাত্র যথা প্রয়োজন মনোযোগ দিয়া, কীট-বহ্নি তস্করশক্তির অতীত, অক্ষয়, অজর, অমর ভাববস্তু প্রচারের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। কেবল এই সকল ব্যক্তি, যাঁহাদের কার্য্যকলাপ দ্বারা জাতীয়

* দেশের ডাক্তার কবিরাজ ভায়ারাও এমনি যে, কখন তাঁহাদিগকে কোন অর্থশালী রোগীর জন্য ব্যায়ামাদির ব্যবস্থা করিতে দেখা যায় না; কেবল রিপুকর্ম্ম দ্বারা লোহার সিন্ধুক বোঝাই করিয়া যাইতেছেন; বাবুর মন যোগান হইতেছে অথচ উপার্জ্জনের দ্বার উন্মুক্ত রহিতেছে এমন সুবিধা কি ছাড়া যায়?

আধ্যাত্মিক বল বৃদ্ধি পাইয়াছে, কেবল তাঁহারাই নরলোকে নাম রাখিয়া যাইবার যোগ্য ;—আর তোমার আমার নাম এখনই লুপ্ত, পরে আর কি থাকিবে। অতএব "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা," স্মরণপূর্ব্বক পূর্ব্ববর্ত্তী সাধু মহাত্মাগণের পথানুসরণ দ্বারা জ্ঞান ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে পরহিতে রত হও, ইহকালে বিমল সুখ পরকালে স্বর্গ, এবং সংসারে অনন্তকাল স্থায়ী নাম রাখিয়া পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করত দুর্ল্লভ মানবজীবন সার্থক কর ; চতুর্ব্বর্গ ফলের অধিকারী হইবে।

যদি-ঐতিহাসিক মহাপুরুষদিগের বৃত্তান্ত কল্পনা বলিয়া মনে কর, আমাদের দেশে চল,প্রত্যক্ষ পরার্থপর জীবন দেখাইব। এক মহাত্মার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলি। ইঁহার নাম জর্জ্জস্মিথ (George Smith), বয়স প্রায় ৬০ বৎসর, খুব সবল সুস্থ শরীরী, যুবার ন্যায় পরিশ্রমে রত। দরিদ্রের সন্তান ; সুতরাং বাল্যকালেই ইট্‌খোলায় মজুরি আরম্ভ করেন। ক্রমে একটী প্রকাণ্ড ইট্-কারখানায় প্রায় ১০০০৲ টাকা বেতনে প্রধান কর্ম্মচারীর (Manager) পদ প্রাপ্ত হন। কিছুকাল ঐ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কথঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করত উহা পরিত্যাগ করেন। উদ্দেশ্য মহৎ। পরদুঃখকাতর স্মিথের প্রথম সংগ্রাম ইট্‌খোলার প্রপীড়িত বালক বালিকাদের উদ্ধারের জন্য এই কর্ত্তব্যসাধন ব্রতে সত্যসন্ধ বীরকে মহা প্রলোভন পদদলিত করিতে হয় ; শেষে প্রাণ লইয়া টানাটানি। সমস্ত ইট্‌খোলার অধিকারী একত্র হইয়া বিপুল অর্থ, উচ্চপদ ও সম্পত্তির অংশ দ্বারা তাঁহাকে সঙ্কল্প ভ্রষ্ট করিতে না পারিয়া অবশেষে গোপনে প্রাণ সংহারের চেষ্টা পায়। ঈশ্বর যাঁহার সহায়, মানুষ তাঁহার কি করিতে পারে। ইট-খোলার শিশুগণের রোদন (The cry of the children from the Brickyards of England) নামে গ্রন্থ প্রচার দ্বারা দেশের চিত্তাকর্ষণ করত পরিণামে সফল-মনোরথ হইলেন। যে রাত্রিতে পার্লামেণ্ট মহাসভায় (House of Commons) তাঁহার প্রভূত চেষ্টার ফল ইট্‌খোলার শিশু মজুর উঠাইবার আইন বিধিবদ্ধ হয়, আনন্দে গদগদ চিত্তে প্রেমের জয়পতাকা উড়াইয়া বাহির হইলেন ; কিন্তু পকেটে একটী পয়সা নাই যে, কিছু কিনিয়া খান, উপবাসে রাত্রি কাটাইতে হইল। তখন বিলের পশ্চাতে স্মিথের নিজের প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা (সমস্ত পূর্ব্বসঞ্চিত ধন) ব্যয় হইয়া গিয়াছে। ধন্য হে স্মিথ! ধন্য তোমার জীবন! ইহ পরলোকে তোমার উন্নত আত্মার পোষণ জন্য নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে ; শারীরিক ক্ষুধা তোমার তুচ্ছ। উক্ত সম্বাদ যখন প্রথম একখানি সাময়িক পত্রিকায় পড়ি ; দশমিনিট শিশুর মত কাঁদিয়াছিলাম, (তখন উঁহার সঙ্গে পরিচয় ছিল না) এখনও মনে হইলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না। ঐ জয়লাভাবধি ধর্ম্মবীর দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। সে দিন খালের বালক বালিকাদের শিক্ষার্থ বিধি ব্যবস্থাপিত করিয়াছেন ; আজকাল জিপ্সি সন্তানগণের উদ্ধার চেষ্টায় প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। দেশের সমস্ত সংবাদ পত্রে এই ভাবে আন্দোলন হইতেছে।

"What Mr. George Smith did for the brickyard and Canal children

is now a matter of history, and many will be interested in the effort he has been making to bring gypsy children within reach of legislation. We wish Mr. Smith's Bill all success."

স্মিথ্ এখন ভিখারী, নিজের ও পরিবারের প্রতিপালন ভার দেশের লোকের উপর; বেনামী পত্রে দশ বিশ পাউণ্ড প্রায়ই আসে। স্ত্রী ও পুত্র কন্যা গুলি অতি সুন্দর ও সুখী। সুখী স্মিথ্ মধ্যে মধ্যে পরিবার মধ্যে গিয়া আরাম করেন, নতুবা প্রায়ই দরিদ্র সেবার্থ লণ্ডনে ও চারিদিকে ঘুরিতেছেন। স্মিথ্ সশরীরে স্বর্গভোগ করিতেছেন; কখন অপ্রফুল্ল দেখি নাই। সর্ব্বদা ভগবানের নাম, বিধাতার প্রতি চিরনির্ভর, এবং দুঃখীর সেবা, এই কাজ। প্রেমের সহিত স্মিথের নাম দেশে না করে, এমন লোক খুব কম। রাজরাজেশ্বরী পর্য্যন্ত জর্জকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছেন :—

Buckingham Palace,
January 17th, 1876.

Sir,

I am desired to acknowledge your letter to the Queen and to say that Her Majesty takes much interest in the endeavours which you make to ameliorate the condition of this class of the laboring population.

I have &
Thos. Biddulph.

বহু লোক স্মিথের জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; অনেকগুলি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। স্মিথের নিজের কয়েকখানি সুন্দর গ্রন্থ আছে।

স্মিথ আর একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার করিয়াছেন। শিক্ষা, ধর্ম্মোপদেশ, পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতির কর্ষণ ইত্যাদি স্থায়ী উপায় দ্বারা দুঃখ দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টায় "প্রেমের দল" (Band of love) সংস্থাপন করিয়াছেন। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার কন্যা রাজকুমারী বিয়েট্রিস এই দলভুক্ত। সম্রাট ও মজুর এক দলভুক্ত, এরূপ দল বোধ হয় পৃথিবীতে এই প্রথম।

স্মিথের জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার ভিতর দিয়া বিধাতার বিশেষ কৃপা ইঁহাকে এতদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম করিয়াছে। এস্থলে সে সকল আলোচনার প্রয়োজন নাই; এখানে কেবল এই মাত্র বক্তব্য যে, প্রকৃত জীবন কাহাকে বলে, স্মিথ তাহার এক জীবন্ত উদাহরণ। স্মিথের পথ অনুসরণ করিতে পারিলে আমাদের আত্মার বিশেষ কল্যাণ হয়। ভরসা করি, তুমি এই সকল বিষয় আলোচনা দ্বারা "ক্ষুদীরাম" নাম পরিহার পূর্ব্বক "মহৎরাম" নাম গ্রহণে অধিকারী হইবার জন্য যত্ন পাইবে।"

এই বলিয়া জনবুল নিবৃত্ত হইলেন। রাজাবাহাদুরের ফাঁপা প্রাণে কোন ছাপ পড়িল কিনা, জানি না; ভবিষ্যত সে বিষয়ে সাক্ষী দিবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

মহারাষ্ট্র।

(২)

কলিকাতার প্রথানুসারে আমরা পার্শ্বের বাটীর লোকের সহিত আলাপ করিতাম না, এবং তাঁহাদের সংবাদ রাখিতাম না। ধারণা ছিল, এ নগরে বুঝি বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। একদিন পথিমধ্যে একজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আলাপ হয় নাই কি করিয়া সম্ভাষণ করিব, এ বিলাতী ভাব, প্রবাসে মনে উদয় হইতে পারে না; অথবা পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কেবল মাত্র দন্ত বিকাশ করিয়া সম্ভাষণ করিলে চলে না। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র রেইল পথ প্রস্তুত উপলক্ষে দশ বার জন বাঙ্গালী এখানে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে এক-জনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এদেশের বৈচিত্র্য কি? তিনি স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিধান প্রণালীর কথা বলিলেন। কাশীতে অনেক দক্ষিণী আছেন। সুতরাং আমার চক্ষে এ দৃশ্য অভ্যস্ত হইয়াছে। সেরিং সাহেব কাশীকে Type of India কহিয়াছেন।

অনাবৃত মুখে সর্ব্বসমক্ষে বহির্গত হওয়াকে যদি স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে, তাহা দক্ষিণাপথে আছে। এতদ্ভিন্ন আর কিছুতে নাই। স্ত্রীলোক সকল বিষয়ে পরাধীন, বাস্তবিক প্রকৃত স্ত্রী-স্বাধীনতা কোনও দেশে হইতে পারে না। দুর্ব্বল বলবানের অধীন হইবে, এই প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষ যখন ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, তখন একবারে সকল বিষয়ে অন্যের অধীন হইতে পারে না। বাঙ্গালীর গৃহে কি স্ত্রী স্ব—অধীন নহে? সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার-বর্জ্জিত গৃহস্থকে স্বামিনীর অনুরোধে পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতে হয়। বাল্যবিবাহ যে রহিত হইতেছে না, তাহার মূল স্ত্রীলোকের অমত। মহারাষ্ট্র সধবার চিহ্ন "কুঙ্কু" ও "বাঙ্গড়ি"। অবশ্য কুমারিতেও তাহা ব্যবহার করে। বিধবা দর্পণে মুখাবলোকন করিতে পারে না। ভোজে যায় না। বরযাত্রী প্রভৃতির দলে যাইতে পারিবে না। কুঙ্কু অর্থাৎ টিপ না পরিয়া সধবার পক্ষে মুখ দেখান নিষিদ্ধ। প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়াই করণ্ডি হইতে উপকরণ বাহির করিয়া তিলক করা আবশ্যক। বিলাসিনী রমণী অতি ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ পরে। কিন্তু অন্যে অঙ্গুলি পরিমাণের পর্য্যন্ত পরিয়া থাকে। সন্তান হইলে ৪০ দিন অশৌচান্তে নূতন চূড়ী পরা আবশ্যক। তাহাকে বালন্ত চূড়া কহে। চাউল পান গুপারি একটা নারিকেল এবং কয়েকটা পয়সা দিয়া সিধা সাজাইয়া চূড়ী বিক্রেতার সম্মুখে রাখিয়া হাত যোড় করত নারী অভিবাদন করে। বাঙ্গড়ি-বিক্রেতা বলে, জন্ম এয়োতি হইয়া থাক। অন্য সময় প্রকৃত মূল্য দিয়া চুড়ী পরিবার কালেও অভিবাদন করিতে হয়। হাতের চুড়ী যে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছে, এ কথা বলিতে নাই। কারণ চুড়ি যে এয়োতি। স্বামীর জন্য যদি কাহারও নিকট অনুরোধ করিতে হয়; তবে কহে আমার হাতের চুড়ী রক্ষা কর। স্বামী মরিলে শব বাটী হইতে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে বাঙ্গড়ি ভাঙ্গিয়া মাথার চুল

মুড়াইয়া একত্র করিয়া "চোলিতে" বাঁধিয়া দেয়। কুঙ্কু মুছিয়া এক অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। অন্যের সে মুখ নিরীক্ষণ করা দূষ্য। বাটীতে অপর কোন বিধবা থাকিলে সেই ঘরে খাবার দিয়া আসে, নতুবা পুরুষে দেয়। সধবা বা কুমারী সেই ঘরে যায় না।

গণেশ বাসুদেব জোশী প্রভৃতি যে লওযাদ অর্থাৎ সালিসী আদালত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদ পাইলাম না। যে সময়ে বাঙ্গালায় পাবনার প্রজা বিদ্রোহ ঘটে, তাহার কিছু পূর্ব্বে এ দেশে মহাজনদের বিরুদ্ধে রায়তেরা উপদ্রব করিয়াছিল। হাটের দিন মাড়ওয়ারি ও মহারাষ্ট্রীয় বণিকের দোকান লুণ্ঠন আরম্ভ হইল। খাতা পত্র, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী একত্রিত করিয়া অগ্নি সংযোগ করিয়া দিত। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের বিজ্ঞাপনী দৃষ্টে বৃটিশরাজ দক্ষিণী কৃষকের কষ্ট-নিবারিণী বিধি প্রচার করিলেন। এই আইন অনুসারে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বাদীকে মধ্যস্থের নিকট যাইতে হয়। তিনি আপসে না মিটাইতে পারিলে বিচারালয়ে যাইবার অনুমতি দেন, তাহার পর আদালতে আবেদন গ্রহণ হইতে পারে। সুদের সুদ কিম্বা অতিরিক্ত হারে সুদ, চুক্তিসম্মত হইলেও গ্রাহ্য নহে। রায়তের ভূমি সম্পত্তি বন্ধক না থাকিলে দেনার জন্য বিক্রয় হইবে না। দেনার ডিক্রীজারীজনিত কারাবাস নিষিদ্ধ। অন্যূন পঞ্চাশ টাকার ঋণ পীড়িত কৃষিজীবী ইন্‌সল্‌ভেন্সি লইতে পারে। মহাজন সম্বন্ধে যে রূপ প্রজার কল্যাণকর বিধান হইল, গবর্ণমেণ্ট আপন রাজস্ব আদায় ব্যাপারে তদ্রূপ উদার আইন করিতে পারেন না।

ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত অস্থায়ী। রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত ত্রিংশত বৎসর ব্যাপী। সুখের জন্য মনুষ্য শ্রম স্বীকার করে। ইহাতে যে সুবিধা ঘটে, তাহাতে সে ব্যক্তির স্বত্ব জন্মান উচিত। সে সুবিধা টুকু যদি বলপূর্ব্বক অন্যে অধিকার করিতে চায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি আবার অপরের দ্বারা অন্য বিষয় হইতে বঞ্চিত হইতে পারে। সুতরাং কেহ সুখী হইতে পারে না। এজন্য অন্যের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করা মনুষ্য সমাজে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এতাবতা ভূমির উপর প্রজার চিরস্থায়ী স্বত্ব হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম। ভূমির উৎকর্ষ হইলে যদি খাজনা বৃদ্ধি হয়, তবে প্রজার স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রহিল না। প্রজার জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া সেই কার্য্যের বেতন স্বরূপ রাজা কর পাইতে পারেন। তাই বলিয়া রাজা ভূম্যধিকারী নহেন। যে ভূমি আবাদ করিয়াছে, সে-ই ভূমির অধিকারী। অদ্যাপি তাতার জাতি যে ভূমিখণ্ড দখল করিয়া কৃষিকার্য্য করে, তাহার শস্য গৃহীত হইলেই অন্য লোকে সে জমি ব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু তাহারা এক স্থানে স্থায়ী হয় না বলিয়া স্বামিত্ব হারায়। ভূমি অধিকারের মূলে বল প্রয়োগ না হইয়া শ্রমশীলতা দেখা যায়, পরিশ্রম করিলে স্বাভাবিক স্বত্ব জন্মে। সাঁওতাল পরগণায় কমিশনর সাহেবের নিকট কতকগুলি সাঁওতাল একখানি থালে একটু মৃত্তিকা ধান্য ও টাকা রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমরা খাটিয়া ভূমিতে শস্য উৎপাদন করি, তবে সে জন্য টাকা লন কেন?

ভারতের অপর স্থানের ন্যায় পুরাকালে মহারাষ্ট্র রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরস্পর সম্পর্কশূন্য ছিল। মহারাষ্ট্র ইতিহাস-লেখক গ্রাণ্টডফ কহেন, সম্ভবতঃ গোদাবরীর তীরে আধুনিক ভীর নগরের সমীপে টগর নামক রাজধানীতে রাজপুত ভূপতি বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার পর কুম্ভার বা কুনবী জাতীয় শালিবাহন সেই রাজাকে বধ করিয়া গোদাবরী তীরস্থ বর্ত্তমান মুঙ্গী পাটন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর দেব গিরী অর্থাৎ দৌলতাবাদের দেবগড়ে মহারাষ্ট্র রাজধানী স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষভাবে যখন মুসলমান দেখা দেয়, তখন দেবগিরিতে যাদব রাম দেবরাও রাজত্ব করিতেছিলেন। ইংরাজের মত মুসলমানী রাজ-প্রণালী সর্ব্ব-সংহারক ছিল না। দেশীয় লোকে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিত, কেবল মুসলমান সর্ব্বোপরি কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। গ্রাম্য কর্ম্মচারীর মধ্যে মহার বা পেড় সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। সে পথ-প্রদর্শক, চৌকিদার ও চরের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভ্রমণকারীর অশ্বের জবস আনয়ন প্রভৃতি করিতে হয়। যদি অন্য উপায় না থাকে, ভ্রমণকারীর দ্রব্যজাত তাহাকে বহন করিয়া আপন সীমার বাহিরে দিয়া আসিতে হইত। গ্রামাধিকারীর অপর নাম মকদম, পটেল বা দেশমুখ। কৃষি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ, চৌকিদার নিয়োগ ও বিবাদ ভঞ্জন প্রভৃতি কার্য্য ইহার দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। যে বিরোধ পটেল দ্বারা না মিটিত, তাহা তিনি পঞ্চায়তের হস্তে মীমাংসা করিতে দিতেন। ফৌজদারি ব্যাপার উপরিতন কর্ম্মচারিকে দিতে হইত। গ্রামলেখকের অপর নাম কানুন গো, দেশ পণ্ডা বা কুলকরণী। পটেল, কুলকরণী ও চৌগুলাতে গ্রামের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ ভূমি নিষ্কর ভোগ করিতে পাইত। বার্ষিক হিসাব রাখাই কুলকরণীর কাজ। তাহার পুস্তিকায় ভূমি সম্বন্ধীয় তাবৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকিত। গ্রামাধিকারী ও গ্রামলেখক কর্ম্মচারীর উপর কোনও সময়ে দেশাধিকারী ও দেশলেখক কর্ম্মচারীর পদ ছিল। উক্ত সকল পদই পুরুষানুক্রমে চলিত। গ্রামাধিকারীর ক্ষমতা ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া দেশাধিকারী রূপে পরিণত হইতে পারিত। অধিরাজের ক্ষমতা দুর্ব্বল হইলে সেই দেশাধিকারী স্থায়ী হইয়া রাজা হইয়া পড়িতেন।

মুসলমান সাম্রাজ্য এমন হীন হইয়া গিয়াছিল যে, সপ্তদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দিতে সেই অধীন মহারাষ্ট্রীয়েরা পার্ব্বত্য ভূমি হইতে যখন বহির্গত হইয়া মস্তক উন্নত করিতে লাগিল, তখন লোকে তাহাদিগকে এক অপরিচিত নূতন জাতি বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিউনেরী দুর্গে শিবাজী ভোঁসলে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি আপন নাম পর্য্যন্ত স্বাক্ষর করিতে পারিতেন না। অল্প বয়সেই অস্ত্র শস্ত্র চালনায় নিপুণতা লাভ করেন। ধনুর্ব্বিদ্যা বিলক্ষণ শিখেন। কুরুপাণ্ডব ও রাম রাবণের যুদ্ধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় উত্তেজিত হইতেন। কেহ বলে, সেই উত্তেজনায় ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমে এক দস্যু দলে মিলিত হন। বিজাপুরের নিজামশাহি রাজ্যে তাঁহার পিতা চাকরি করিতেন।

শিবজী নানা প্রতারণা ও অপকর্ম্ম করিয়া রাজ্য উপার্জ্জন করেন। সকল রাজ্যেরই মূলে ছলনা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি আছে। রাজ্য সুশাসন জন্য প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রজা আপন ক্ষমতা রাজাকে দিয়াছে ও রাজা প্রকৃতিবর্গের সেবক স্বরূপ আপনাকে জ্ঞান করেন, এমন দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রজা একটি নরহত্যা করিলে প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হয়, কিন্তু রাজা সহস্র মানবকে যুদ্ধ স্থলে বিনাশ করিলেও অপরাধী নহেন। তাহার কারণ, উক্ত যুদ্ধ দেশের হিত সাধন জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কথিত হয়। এই সকল কারণে শিবজী নিন্দনীয় না হইয়া প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। তিনি আপনাকে রাজপুতবংশীয় বলিয়া নির্ণয় করিতে উদ্যোগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি মরঠ। তাঁহার চিত্র দেখিলে কোন বন্যরাজা বা দস্যুপতি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শিবজীর গূঢ়চর হাইয়াজী ভবানী দেবী কর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে, এমন বাক্য প্রচার জন্য নানা কাহিনী গ্রন্থন করিতেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে ছত্রপতি শিবজী যবন মর্দ্দন ব্রত সমাপ্ত করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। কোকনে রায়গড়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া চিতাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। স্বদেশবৎসল শিক্ষিত নব্য মরট্টা অধুনা উক্ত মহাত্মার দেহাবশেষ পুনায় স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির দেহ সমাধি উত্তোলন করিয়া ফরাসি ভূমিতে নীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা নির্ব্বাসনে ছিল বলিয়াই আনীত হইয়াছে। ছত্রপতি শিবজী রায়গড়ে বাস করিতেন এবং তাঁহার মহৎ কার্য্য কলাপ ঐ স্থান হইতে অনুষ্ঠিত হয়, সুতরাং সে মহাপুরুষের স্মৃতি চিহ্ন ঐ স্থানে থাকাই উচিত বলিয়া বিবেচিত হইল। রায়গড় বিজন স্থানে অবস্থিত হওয়ায় পুনায় আনায়নের প্রস্তাব হইয়াছিল। শিবজী অতিশয় দক্ষ ও অনলস পুরুষ ছিলেন। সেই সকলগুণে উত্তরাধিকারীরা কেহই তুল্য হন নাই। শাম্বজী ওরঙ্গজেবের নিকট প্রেরিত হইলে, সম্রাট তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কহিলেন। তাহাতে বিদ্রূপ করায় নরাধম শিরশ্ছেদ করিতে আজ্ঞা করিল। শাহুর সময়ে মহারাষ্ট্রীয় মন্ত্রি-সমাজে এই কয় ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিনিধি—পরশুরাম ত্র্যম্বক। অষ্ট প্রধান মুখ্য প্রধান-বালাজী বিশ্বনাথ; (অন্য উপাধি পেশয়া)। অমাত্য অম্বারাও বাপুরাও হনবন্তি সচিব নারুশঙ্কর। মন্ত্রী—নারু রাম শেনবী। সেনাপতি—মানসিং মেরে। সমন্ত—আনন্দ রাও। ন্যায়াধীশ—হোনজী অনন্ত। পণ্ডিত রাও মুদ্গলভট্ট উপাধ্যায়। রাজ প্রতিনিধির বল খর্ব্ব করিয়া মুখ্যপ্রধান অর্থাৎ পেশয়া ক্রমশঃ রাজ্যের বিধাতা হইয়া উঠিলেন। রাজা জগদীশ্বরের ন্যায় সাক্ষী স্বরূপ রহিলেন। তাহার পর যাহা হইবার কথা, তাহাই হইল। পেশয়া রাজ্যের স্বামী হইলেন। হোলকর সিন্ধিয়া তাঁহার পাদুকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া মহত্ত্ব লাভ করিল। জন্ম গুণে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ায় কিছু গৌরব নাই। ক্ষমতা না থাকিলে বা ঘটনা চক্র (যাহাকে অদৃষ্ট কহে) অনুকূল না হইলে সে বিত্ত রক্ষা হয় না। মহারাষ্ট্র রাজ্যে শিবজী ভোঁসল ও বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় তৃতীয় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিল না। বাজীরাও পেশয়া হোলকরকে শাসন করণার্থ বৃটিশ রাজ্যের সহায়তা যাচিঞা

করিলেন। অবশেসে সেই মহাবলে ক্ষুদ্র বল লীন হইয়া গেল। হায়! মহারাষ্ট্র রাজ্য কয় দিন থাকিল! ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র রাজ্যের সংস্থাপক শিবাজী রাজোপাধি গ্রহণ করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও হইতে ইংরাজ সে রাজ্য আত্মসাৎ করিলেন। ১৫৪ বৎসর মাত্র সময়। কেহ কেহ কহেন, ভারতে বৃটনবাসী প্রবেশ না করিলে, মুসলমানের পর মহারাষ্ট্রীয়েরা সম্রাট হইতে পারিতেন। দিল্লী হইতে বহু অন্তর হওয়ায় দক্ষিণাপথে মুসলমান পরাক্রম দৃঢ় হইতে পারে না; এই সুযোগে শিবজী দেশীয় ছিন্ন ভিন্ন দল একত্রিত করিতে সমর্থ হওয়ায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। তাঁহা হইতে কিছু বা বালাজী বিশ্বনাথের দ্বারা উক্ত রাজ্যের সমুন্নতি হইয়াছিল। তদানীন্তন রাজনীতি অনুসারে তাবৎ সেনাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূপতি প্রতিপালন করিতেন না; কর্ম্মচারিদিগকে নিরূপিত সংখ্যক বল পোসণের জন্য ভূসম্পত্তির অধিকার দিয়া রাখিতেন। রাজা ক্ষীণ হইলে উক্ত সেনাপতিরা স্বয়ং সেই প্রদেশাধিকারী হইতে পারিতেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের এই একটি কারণ। যে কারণে উক্ত রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই কারণেই অবনতি হইল। নেতার ক্ষমতা বিসদৃশ হওয়ায় বিভিন্ন ফল উৎপন্ন হইল। শেষ পেশয়া এমন ক্ষমতাবান হইয়াছিলেন যে, ভদ্রলোকে তাঁহার বাটীতে স্ত্রী পাঠাইতে সাহস করিতেন না।

মহারাষ্ট্রীয়দের বখর নামক জাতীয় ইতিহাসে "সিংঘ" গড় পুনরধিকারের শৌর্য্য বৃত্তান্ত অতি শ্লাঘার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ইষ্ট উইক্ কৃত বোম্বাই প্রদেশের বিবরণ পুস্তকে সিংহগড় পুনার সন্নিহিত জানিয়া,উক্ত স্থানে অবশ্য যাওয়া উচিত, স্থির করিলাম। সহ্যাদ্রি ও তাহার সমুদয় প্রত্যন্ত শৈলের ভাগ প্রায় সমতল, কিন্তু অত্যন্ত দুরারোহ। এদেশে তাহার উপর অসংখ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। এটী তাহার অন্যতর। পুনা, সিংহগড় হইতে ৬ ক্রোশ ব্যবহিত। ৪ ক্রোশ যাইয়া খড়কবাসলা জলাশয় দেখিতে পাওয়া গেল। পুনার নালোত্থিত জল এইখান হইতে যায়। একটী স্রোতস্বতীর মুখে পর্ব্বতাকার বাঁধ দিয়া হ্রদ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বাঁধটি অর্দ্ধক্রোশ হইবে। উহার গাত্রে অপূর্ব্ব কৌশলসম্পন্ন বারি মধ্যস্থ ছিদ্র পরম্পরা দ্বারা জল বাহির হইতেছে, যেন পর্ব্বতের গাত্র ভেদ করিয়া উৎসবগুলি হইতে স্রোত নির্গত হইয়াছে। কেবল খড়ক বাসলার স্থাপত্য কৌশল দেখিবার জন্য একজন বাঙ্গালী ইঞ্জিনিয়ার এদেশে আসিযাছিলেন। সিংহগড়ের পাদদেশে যাইয়া শকট ত্যাগ করত চেয়রবাহিদের সাহায্যে শৈলে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৪১৬২ ফিট্। কিন্তু এখানে ভূমির উচ্চতা স্বভাবতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮২৫ ফিট্ হইবে, সুতরাং ২৩৩৭ ফিট্ ক্রোশ উর্দ্ধে যাইতে হইবে। পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইবার জন্য এখনও দুর্গের প্রাচীর রহিয়াছে। দুইটী তোরণের মধ্য দিয়া যাইয়া অবতরণ করা হইল। শিবাজীর সিংহগড়ে এক্ষণে ইংরাজের গ্রীষ্ম অপনোদন জন্য কয়েকখানি বাঙ্‌লা পরিদৃশ্যমান হইতেছে। আমরা আহারীয় সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলাম, প্রথমতঃ তাহার সৎকার্য্য করিবার জন্য এখানে 'জিতাপানি" পাওয়

যায় কিনা, জিজ্ঞাসা করিলাম। ঘাটিরা একটি কুণ্ডের নিকট লইয়া গেল। তাহার জল অত্যন্ত স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ। সেই "ঘাট মাথায়" প্রস্রবন জলে মৎস্য ফর ফর করিতেছে। দুই একটী প্রাচীন মন্দির দেখিলাম, তাহাতে বিগ্রহ নাই। রাম-রাজার (শিবজীর পৌত্র) মন্দির ভাল অবস্থায় আছে। ছত্রপতির পাদুকা (খড়ম) শিবলিঙ্গের নিকট রক্ষিত হইয়াছে। গ্রান্ট ডফ বগর পুস্তক হইতে এই স্থানের সংগ্রাম বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন;—"মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথিতে (১৬৭০ খ্রী) রজনী সমাগত হইলে রায়গড় হইতে একদল মাওলী সৈন্য লইয়া তন্নাজী মালুশ্রে সিংহগড় লক্ষ্য করিয়া অভিযান করিলেন। সেনা দুইভাগে বিভক্ত করিয়া কিছু দূরে একদল রাখিয়া অপরগুলি পর্ব্বতের পাদ-মূলে স্থাপন করিলেন। যে ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা বন্ধুর ও দুর্গম, সেদিকে হটাৎ প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই বলিয়া একজন যোদ্ধা সেই দিক দিয়া অদ্রি শিখরে আরোহণ করিয়া রজ্জু নির্ম্মিত অধিরোহিণী বাঁধিয়া দিল। তদবলম্বনে একে একে সকলে উঠিয়া রজ্জু নিম্নে নিক্ষেপ করিল। দুর্গ মধ্যে তিনশত লোক প্রবেশ করিতে না করিতে তত্রত্য রক্ষিরাজপুত সৈন্য সন্ধান পাইল। একজন ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য অগ্রসর হইল, অমনি একটা শাণিত বান ধানুকীর হস্ত মুক্ত হইয়া নীরবে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল। অস্ত্র-নিঃস্বন ও কোলাহল শুনিয়া তন্নাজী তাহাদিগকে স্তম্ভিত করিবার জন্য আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শব্দ লক্ষ্য করিয়া বান ত্যাগ করা হইতে লাগিল। শীঘ্রই মশালের আলোকে উভয় পক্ষই প্রকাশিত হইলেন। মরিয়া হইয়া যুদ্ধ চলিল। মাওলিরা সম্পূর্ণ সজ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল, এজন্য সংখ্যায় অধিক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তন্নাজী মালুশ্রে হত হইলেন। তাহাতে যোদ্ধৃবর্গ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া রজ্জুময়ী অধিরোহিণীর দিকে ধাবমান হইলেন। এমন সময়ে তন্নাজীর ভ্রাতা সূর্য্যাজী সসৈন্য প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি ব্যাপার দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, "বীরগণ! তোমাদের মধ্যে কে আপন পিতার শব মাহার কর্ত্তৃক গর্ত্তে নিহিত হওয়া দেখিতে পারে।" * "সকলকে কহ, [illegible]তরণের সোপান বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহারা যে শিবজীর প্রকৃত মাওলী সৈন্য, তাহা প্রমাণিত করিবার অবসর উপস্থিত।" এই উৎসাহ বাক্য, তন্নাজীর শোক, নূতন সেনার আগমন ও সেনা-নায়কের উপস্থিতি এই কয়েকটা কারণে তাহারা এমন স্থির-সংকল্প হইল যে; আর কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহে। তাহাদের "হর হর মহাদেব" রবে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনতিবিলম্বে জয়লাভ হইল। দূরস্থ শিবাজীকে সে বার্ত্তা জানাইবার জন্য একখানি তৃণ-নির্ম্মিত গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া

---

* মহারাষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধে পতিত হইলে যদি সম্ভব হয়, তবে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য শব সঙ্গে লইয়া যায়। সেনাপতির মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া যাওয়া অতি নীচতার কাজ বলিয়া গণ্য। বাপ শব্দ ভারতীয় সৈন্য মধ্যে সম্মান ও উৎসাহ প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হয়। ইংরাজ সেনাপতি যুদ্ধকালে "চলো মেরা বাপ" বলিয়া দেশীয় সিপাহিগণকে আহ্বান করেন। ইংরাজীতে Come on my boys বাক্য ব্যবহৃত হয়।

সঙ্কেত করা হইল। মাওলীদের হতাহতের সংখ্যা তিনশত। সূর্য্য উদয় হইলে দেখা গেল, পাঁচ শত খাসপুরু তাহাদের অধ্যক্ষ উদয় নামা যোদ্ধের সহিত নিহত হইয়া বীর শয্যায় শয়ান রহিয়াছে। কয়েকজন মাত্র ধৃত হইয়া আত্ম সমর্পণ করিল। অনন্যো-পায় শত শত লোক পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে যাইয়া পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছিল। শিবাজী কহিয়াছিলেন, আমার আর কি লাভ হইল, তন্নাজী মালুশে মরিয়াছেন। সিংহ হত হইয়াছে, আমাকে কেবল তাহার গহ্বর অধিকার করিতে হইল।

জিজুরি জনপদ পুনা হইতে ১৪ চৌদ্দ ক্রোশ। যাতায়াতের ফিটন ভাড়া ১০৲ দশ টাকা। প্রত্যাসে ছাড়িয়া ১১ টা বাজে বাটী আনিয়া দিবে কহিল। ডেকানি অশ্বের পরাক্রম অদ্ভুত। পথ দূর হইতে দেখিলে তাহার তরঙ্গায়িত আকার দৃষ্ট হয়। অনেক স্থানে পার্ব্বতা সরিৎ পথের উপর দিয়া পথ করিয়াছে। সকল কথা বক্তব্য না হইলেও যাহাতে অতিশয় আরাম লাভ করা গিয়াছে, তাহা উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সেই পাষাণময়ী ভূমির উচ্ছ্বাসময়ী ক্ষুদ্র তরঙ্গিনী তটে প্রাতঃকৃত্য করিয়া মন বড় প্রীত হইল। মধ্যাহ্নকালে "পার্ব্বতীর" ন্যায় শৈলোপরি খণ্ডবার দেবালয় পরিদৃশ্যমান হইল। তীর্থস্থানে পাণ্ডার অভাব হয় না। আমরা তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সোপান শ্রেণী অধিরোহণ করিতে লাগিলাম। ভক্ত-গণ মানসিক পূর্ণ হওয়ায় দেব উদ্দেশে পর্ব্বতের নানা স্থানে সোপান, তোরণ ও দীপদান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। খণ্ডবা মহারাষ্ট্রীয়দের কুলস্বামী অর্থাৎ গ্রাম্যদেবতা। ইনি শিবের অবতার বিশেষ। খণ্ডেরাও ঠাকুরের মন্দির হোলকর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সেবার নিয়ম রাজোচিত ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সোমবতী অমাবশ্যায় সাসওয়াড় গ্রামের নিকট করানদীতটে মেলা হইয়া থাকে। খণ্ডবার সওয়ারি সে সময় তথায় উপস্থিত হয়। মন্দিরের বাহিরে খণ্ডবার মহা অসি রক্ষিত আছে। তাহা কোস নিষ্কাসিত করিয়া রক্ষি কহিল, ইহা দ্বারা মহাদেব দানব সংহার করিয়াছিলেন। আমি কহিলাম, অসুর বধের জন্য কি তাঁহাকে শস্ত্রের সহায্য লইতে হয়?

এই খড়্গের সহিত মুরলিগণের বিবাহ হইয়া থাকে। হরিদ্রা প্রদান করিয়া কার্য্য সম্পূর্ণ করা হয়। কুনাবি প্রভৃতি অশিক্ষিত জাতির সন্তান না হইলে মানিয়া থাকে, আমার সন্তান হইলে প্রথমটি খণ্ডবাকে দান করিব। মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে কন্যাটী আনিয়া মহাদেবের সহিত বিবাহ দেওয়াইয়া তাহার গলদেশে তাগা বাঁধিয়া বাটী লইয়া যায়। তাহার আর অপর পুরুষের সহিত বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দেবতার সেবার জন্য পিতা মাতা তাহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। পুত্র সন্তানও দেবতাকে দান করিয়া বিদায় করিয়া থাকে। ঐরূপ স্ত্রীর নাম মুরলী ও পুরুষের নাম বঘা অথবা বাঘিয়া। জিজুরিতে অনুমান ১৫০ মুরলী আছে। অনেকে ভিক্ষা করিবার জন্য স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। ব্যভিচার তাহাদিগকে অবশ্যই করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন নৃত্য গীতের ব্যবসায় করে। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, এখন আর কেহ মুরলী ছাড়ে না।

সংবাদদাতা কহিল, তাহার জ্ঞানে বার বৎসর হইল শেষ একজনকে মুরলী করিতে দেখিয়াছে। অপ্রত্যক্ষ-মূলক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ যে কত ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মানুষ কেহ কল্পনা-প্রধান, কেহ বা সন্দেহ-প্রধান। এজন্য, অতি বিদ্বান লোকও কুসংস্কারাপন্ন হয়। প্রথম হইতে যাহা বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপরীত ভাবনা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সাসওয়াড় গ্রামের মধ্যদিয়া পথ, একারণ উক্ত গ্রাম দর্শন করণার্থ গাড়ী হইতে অবতরণ করা হইল। এদেশে দেখিতেছি, গ্রাম ও নগর একই ভাবে গঠিত। সহরে খোলার ঘর, গ্রামেও তাই। গ্রামে ভূমি সুলভ, কিন্তু বাটীগুলি সহরের মত একস্থানে সন্নিবেশিত। পথ সঙ্কীর্ণ। গৃহস্থের ফল মূলের বৃক্ষ নাই। সুতরাং গ্রাম শোভা রহিত। পেশয়াদের পারিবারিক বাটী এই গ্রামে। এখানে অবস্থান কালে পেশয়া পুরন্দরের দুর্গ উপহার পান। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলক্ষ্মী তাঁহার করায়ত্ত হন। অদ্যাপি তাঁহার সেই বাটী ধরাশায়ী হয় নাই। পুনায় পেশয়ার স্মৃতিচিহ্ন সমুদায় অগ্নিকর্ত্তৃক লোপ পাইয়াছে। যাহা হউক, আমি এখানে আসায় কিঞ্চিৎ দেখিতে পাইলাম। বাটীর প্রাচীর প্রস্তর গ্রথিত। লক্ষ্ণৌনগরে দেশীয়দের দৌরাত্ম্য-চিহ্ন চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ভগ্ন বাটী রক্ষা করা হইতেছে দেখিয়া আসিয়াছি। আর এখানে পেশয়ার-প্রাসাদে ইংরাজের গুলি গোলার চিহ্ন দেখিলাম। সিংহদ্বারের কবাট তীক্ষ্ণ-শির কিলক জালে আচ্ছন্ন ; প্রদর্শক কহিল, শত্রুপক্ষীয় হস্তিতে যেন ভগ্ন করিতে না পারে, একারণ এরূপ কীলক দেওয়া হইয়াছে। তখন বেলা নাই, তথাপি বাটীর মধ্যে যাইয়া উপরে উঠিলাম। সেই বাটীতে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত দেখিয়া সেই সঙ্গে পেশয়ার পরাক্রম অস্তমিত হওয়ার ভাব মনে উঠিল। তথায় জন মাত্র নাই, পেশয়ার কুলেও কেহ নাই। বাটী চারি মহল ; দ্বিতল। মেরামত শূন্য। সময় হইয়াছে, ভাঙ্গিয়া পড়িলেই হইল। মানুষের শক্তি কি ক্ষণভঙ্গুর! হে কাল, তুমিই বলবত্তর !

শ্রীদুর্গাচরণ ভুক্তি।

কোথায় যাই ?

আর ত পারিনা আমি নিতে !
করুণার মমতার, এত বোঝা—এত ভার,
আর আমি পারি না বহিতে !
এত দয়া অনুগ্রহ, কেমনে সহিব কহ,
আর না কুলায় শকতিতে !
হৃদয় গিয়েছে ভ'রে; নয়নে উছ'লে পড়ে,
ধরেনা ধরেনা অঞ্জলিতে !
ভাসিয়া যেতেছি হায়, করুণায় মমতায়;
অলস অবশ সাঁতারিতে !

১

আমারে দিওনা কেহ, আর ঐ মমতা স্নেহ,
আর অশ্রু পারি না মুছিতে !
এত স্নেহ, মমতায়, কত যে যাতনা হায়;
যে না পায়,—পারে না বুঝিতে !

জীবনে করেছি শিক্ষা, শুধু ভিক্ষা শুধু ভিক্ষা
একটু শিখিনি কারে দিতে !
কত ভাবি দিব যেয়ে, দিতে চেয়ে বসি চেয়ে,
যেত গো জানেনা ফিরাইতে !

২

সে জানে না কণা বিন্দু, সে দেয় ঢালিয়া সিন্ধু
ছোট বুকে পারি না রাখিতে !
আরো বলে দিবে কত, জন্ম জন্ম অবিরত,
রয়েছে অনন্ত আরো দিতে !
শুনিয়া লেগেছে ত্রাস, সর্ব্বনাশ ! সর্ব্বনাশ !
এত দিলে পারি কি বাঁচিতে ?
চাহি না তাহার প্রেম, হোক হীরা হোক হেম,
হউক অমৃত পৃথিবীতে !
কিন্তু গো তুমিও যদি, ভালবাস নিরবধি,
তবেই ত হইবে ঠেকিতে।
সেত আছে দেবভূমি, জগৎ যুড়িয়া তুমি,
কোথা আমি যা'ব পলাইতে ?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রাহ্মধর্ম্ম। (৩)

ভক্তি।

ভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশে বঙ্কিম বাবুর ঘনীভূত ধর্ম্ম চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্ব দুই প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি, সাধারণতঃ বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মমত ও ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা প্রচারিত ধর্ম্মমত একই রূপ। কিন্তু ভক্তি তত্ত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু যে সকল অমূল্য কথা বলিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজে তাহার অতি অস্ফুট ব্যাখ্যা মাত্র শুনিয়াছি। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যায়, তাঁহার প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ, সূক্ষ্ম দর্শন, গভীর চিন্তা ও গবেষণার উজ্জ্বল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভক্তি-তত্ত্বের এমন বিশদ ব্যাখ্যা আর কোথাও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ভক্তিকে তিনি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ;—মনুষ্যে ভক্তি ও ঈশ্বরে ভক্তি। তিনি বলেন, মনুষ্যে ভক্তি তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা, (৩) সমাজ-শিক্ষক। এতদ্ভিন্ন ধার্ম্মিক, রাজকর্ম্মচারী, বয়োজ্যেষ্ঠ বা গুণী ব্যক্তি ও সমাজ, এ সকলকেও ভক্তি করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশ একরূপ ভক্তিহীন হইয়াছে, বলিতে হইবে ; এমন কি, পিতা মাতার প্রতিও এমন লোকের ভক্তি নাই। এই সময়ে এই পুস্তক দ্বারা দেশের প্রভূত উপকার হইবে। বঙ্কিম বাবু অযথা ভক্তি প্রয়োগের খুব বিরোধী। ব্রাহ্মণজাতির ন্যায় প্রতিভাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক জাতি পৃথিবীর মধ্যে দুর্লভ। পরহিতে এই জাতির জীবন উৎসর্গ হইয়াছিল। কিন্তু এখন সে দিন আর নাই। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটীও বেচেন, কালী খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে ?'

"গুরু বলেন।—কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন ? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারত-বর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে

গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।" এই কথায়, বঙ্কিম বাবু যে অযথা ভক্তি প্রযোগের বিরোধী, তাহা উত্তম রূপ বুঝা যাইতেছে। এই সুখ শোভা এই স্ত্রী পুত্র কন্যা,ও ভাই বন্ধুপূর্ণ সংসার একটী বিদ্যালয় বিশেষ। এখানকার নরনারীকে যে ভক্তির চক্ষে না দেখিতে পারে, সে ভগবানকে ভক্তি করিতে পারে না। অযথা ভক্তি প্রযোগ নীতি-বিরুদ্ধ কথা, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে ভক্তি অর্পিত না হইলে মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। এখন লোকে গুরু-জনকে অবহেলা করে, রাজাকে ভয় করে, ভক্তি করে না, সমাজ শিক্ষককে তুচ্ছ জ্ঞান করে। বঙ্কিম বাবু দেশের অবস্থা এই রূপ চিত্র করিয়াছেন—"ভক্তি, যাহা মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন বলিয়া তাহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন "My dear Father"—অথবা বুড়ো বেটা। মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত, চাল কলা লোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন,—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র—কেহবা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মী-স্বরূপা মনে করিতে পারি না, কেননা, লক্ষ্মীই আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজ-পুরুষ, অত্যাচারকারী রাক্ষস। সমাজ-শিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল—গালি ও বিদ্রূপের স্থান। ধার্ম্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধার্ম্মিককে "গো বেচারা" বলিয়া দয়া করি—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই।" ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশের এই শোচনীয় অবস্থা যতদিন, ততদিন এ দেশের মঙ্গল নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহা স্বাধীনতার লক্ষণ। যে স্বাধীনতায় পূজ্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে নিষেধ করে, সে স্বাধীনতা যত শীঘ্র কর্ম্মনাশার জলে প্রক্ষিপ্ত হয়,ততই মঙ্গল। গুণী ও মহৎ লোককে পূজা করিতে না শিখিলে কখনও কোন জাতি মহৎ হয় না। মহাপুরুষের আদর যে দেশে নাই, সে দেশ ঘোরতর স্বেচ্ছাচারিতা ও স্বার্থপরতায় নিমগ্ন। ইংলণ্ড বড় কিসে, যদি কেহ উত্তরে জিজ্ঞাসা করেন, এক কথায় এই বলিতে পারি, মহৎ লোকের ভক্তি ও পূজাতে ইংলণ্ড বড়। ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া সব সময়ে মানুষ জীবন পথে অগ্রসর হইতে পারে না, এই জন্য মহাপুরুষের সৃষ্টি। মহাপুরুষদিগের পদানুসরণ না করিলে, সাধারণ মানুষ, কি নীতিতে,কি ধর্ম্মে,মহত্ত্ব লাভ করিয়া কখনও বড় হইতে পারে না। খ্রীষ্ট বা মহাম্মদ, চৈতন্য বা বুদ্ধ, কবীর বা নানক, হাওয়াড বা ম্যাটসিনি,—ইঁহাদের জীবনের উচ্চ আদর্শ যদি পৃথিবীর সম্মুখে না থাকিত, তবে পৃথিবী কখনও এত উন্নত হইতে পারিত না। ইঁহাদের জীবন-ছায়া সমাজে, ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হইয়া কত মানুষকে দেবত্বে লইয়া যাইতেছে। আমাদের দেশ এখন স্বাধীনতা চায়,—তাই

নাকি আপন আপন মহত্ত্ব লইয়াই সকলে ব্যতিব্যস্ত। যে ইংলণ্ডের স্বাধীনতার ধুয়া এ দেশকে এই হীনাবস্থায় উপস্থিত করিতেছে, সেই ইংলণ্ডের লোকেরা বড় লোককে কি রূপ সম্মান করে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। 'আমি গ্লাড্‌ষ্টোন সাহেবের দলভুক্ত' এই কথা বলিতেও লোকেরা গৌরব মনে করে। জুব্বিলিতে গ্লাডোষ্টোন সাহেবের অশীতি জন্মোৎসব উপলক্ষে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী-সমাজের অন্যতর সভ্য মহাত্মা স্যার ডবলিউ হারকোর্ট সাহেব গৌরবের সহিত বলিয়াছিলেন :—

"That is the man and that is the spirit in which we are led; that is the man, and that is the spirit in which we will follow him to the end. Whilst life remains with him we will follow in his steps, and when he is no more we will endeavour to follow his example."

"যতদিন তিনি জীবিত আছেন, ততদিন তাঁহার পদানুসরণ করিব; এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আদর্শ ধরিয়া চলিতে চেষ্টা করিব।" মহাত্মা হারকোর্টের ন্যায় একজন স্বনাম-খ্যাত ব্যক্তিও গ্লাডোষ্টোন সাহেবকে তত মান্য করেন! বিলাতে এই রূপ যে কত দৃষ্টান্ত আছে, তাহার শেষ নাই। বিলাত স্বাধীন, না ভারত স্বাধীন?

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ মহত্তের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু নব সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ মহাপুরুষের বিরোধী, অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লীলাস্থল। কেশবচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া, সাধারণ সমাজের অধিকাংশ সভ্য, ঘৃণার চক্ষে না দেখেন, এখন মহাপুরুষ জন্মেন নাই। দেশের বড় লোকেরা সকলেই কৃপার পাত্র। কালেজের ছাত্রগণও প্রপিতামহদিগের শ্রাদ্ধের পিণ্ড সমালোচনার খরতর স্রোতে অকুতোভয়ে ভাসাইয়া দিয়া বাহাদুরি দেখাইতেছেন! "আমি ভিন্ন আর কেহ বড় নাই, আর সকলই মূর্খ," এই কথাই যেন এখন সকলের প্রাণগত ভাব। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মানুষকে ভক্তির চক্ষে দেখা, সাধারণের ব্রত নয়; ঘৃণা করাই যেন ব্রত। প্রেম নামক যে একটা অতি পূজ্য জিনিসের কথা এ জগতে শুনা গিয়াছে, তাহা দিন দিন সমাজে দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে। বঙ্কিম বাবু এ দেশের ভক্তি-হীনতার যে ছবি আঁকিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের ছবিও ঠিক তাহার অনুরূপ। দেশের আশা কোথায়, কে বলিতে পারে?

মানুষকে বাইবেলে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বলা হইয়াছে। একথা সকলে অভ্রান্ত রূপে বিশ্বাস নাও করিতে পারেন, কিন্তু মানুষ যে ঈশ্বরের হাতের জিনিস, ইহাতে আর সন্দেহ কি? ঈশ্বরের হাতের জিনিসকে ভক্তি না করিয়া, ভাল না বাসিয়া যে ঈশ্বরকে ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে প্রয়াসী হয়, তাঁহার সে কামনা যে কখনও পূর্ণ হইবে না, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মানুষ সাকারকে ভক্তি করিতে পারিল না, নিরাকারকে ভক্তি করিবে?—ইহা আকাশ-কুসুমের ন্যায় কল্পনার ভেল্কি মাত্র।

ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে, বঙ্কিম বাবু এই উপদেশ দিয়াছেন—"যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা

ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।" সংক্ষেপে ইহাপেক্ষা ভক্তির আর উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হইতে পারে না। মানুষের সকল বৃত্তির অনুশীলনই যে ভক্তির অন্তর্গত, ইহা অতি পরিষ্কার রূপে বঙ্কিম বাবু বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্মে যে ভক্তি নাই একথা বুঝাইয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে একটী বচন উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, উপনিষদে একটু মাত্র ভক্তির আভাস পাওয়া যায়। ভক্তিমার্গের প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য কি শ্রীকৃষ্ণ, এ বিষয়ে তিনি স্থির মীমাংসা করিতে পারেন নাই। ভগবদ্গীতা হইতে তিনি ভক্তি যোগ সুন্দররূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতা, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্যের উজ্জ্বল গ্রন্থ। গীতা যুদ্ধ শাস্ত্রের নীতি, ধর্ম্মনীতি নহে, এ সম্বন্ধে প্রচলিত যে একটা কুসংস্কারপূর্ণ মত আছে, সেটাকে খণ্ডন করিয়া বঙ্কিম বাবু কর্ম্ম ও জ্ঞান যোগ বুঝাইয়াছেন। ভক্তির প্রথম সোপান নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার উপদেশ অতি উদার, অতি উচ্চ।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি। ২।৭

অর্থাৎ "তোমার কর্ম্মেই অধিকার কদাচ কর্ম্মফলে যেন না হয়। কর্ম্মের ফলার্থী হইও না, কর্ম্ম ত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক।"

"অর্থাৎ, কর্ম্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্খা করিবে না।

এ সম্বন্ধে গীতার পর চরণে উক্ত হইয়াছে—

'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।'

"কর্ম্ম করিবে, কিন্তু কর্ম্ম সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে। তোমার যতদূর কর্ত্তব্য, তাহা তুমি করিবে। তাতে তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধাসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকে ভগবান যোগ বলিতেছেন। এই রূপ যোগস্থ হইয়া, কর্ম্মে আসক্তি শূন্য হইয়া কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান।"

কি উদার মত! কোন্ কর্ম্ম সৎ, কোন্ কর্ম্ম অসৎ, এ প্রশ্ন সততই মনে উঠিতে পারে। এ সম্বন্ধে গীতায় উক্ত আছে—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশী নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।"

অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিতে কর্ম্ম সকল আমাতে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও বিকার শূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিবে। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে, অর্থাৎ কর্ম্ম তাঁহার, আমি তাঁহার ভৃত্য স্বরূপ কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবে। ইহা করিতে গেলে কার্য্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে, অতএব কর্ম্মযোগই ভক্তিযোগ।"

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, ভক্তি যোগ সাধন করিতে হইলে কর্ম্মযোগ পরিহার করিতে হয়, গীতাতে এভ্রমের নিরসন হইয়াছে। কর্ম্ম ভিন্ন যে ভক্তি—সে অলস লোকের কল্পনা-মিশ্রিত ভাব মাত্র।

ভক্তির দ্বিতীয় সোপান জ্ঞান। জ্ঞান ভিন্ন আপন ও ঈশ্বরের তত্ত্বে মানুষের বোধ জন্মে না। আমাকে জানা ও ঈশ্বরকে জানা—ভক্তি সাধনের জন্য, এ দুইই প্রয়োজন। জানিতে হইবে—আমি সসীম,

আমরা আশা করিতেছিলাম,জুরি আইন পরিবর্ত্তের কারণ বিচারপতিকে সম্বোধন করিবেন। তাঁহারা তাহা করেন নাই। ক্ষতি নাই, কারণ সর্ব্বসাধারণ জুরিস্বরূপ গবর্ণমেণ্টকে বলিতেছেন যে, সম্মতির বয়েস বৃদ্ধি করা উচিত। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পুনর্ব্বার বলিতেছি, দ্বাদশ বৎসরে ফল হইবে না। এই বালিকাটীর দ্বাদশ বৎসরের কয়েক মাস মাত্র বাকী ছিল। দশ ও বারর মধ্যে প্রভেদ এই, বার বৎসরে বিপদের সম্ভাবনা কিঞ্চিৎ,—কিঞ্চিৎমাত্র কমে। কিন্তু সে কোথায়? স্বামীর বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইলে। কার্য্যতঃ এই দুই বয়সের প্রভেদ নাই। যথার্থ যৌবন চতুর্দ্দশ বৎসরের পূর্ব্বে আরম্ভ হয় না। অতএব যদি যথার্থ কাজ করা ব্যবস্থাপক সভার ইচ্ছা থাকে, তবে সম্মতির বয়েসের ঐ সীমা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট সমাজের উপরে হস্তক্ষেপণ করিতেছেন। তথাপি পরম্পরা সম্বন্ধে বাল্য-বিবাহ কু প্রথার মূলে আঘাত লাগিবে। লাগাও উচিত। আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য অবহেলার জিনিস নহে, কারণ ইহার উপর জাতীয় স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে। বাঙ্গালি-দিগকে কতকাংশে প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। সহচর।

কাহারও কষ্ট হইবে না। এপ্রকার লোকের শাস্তি পাওয়াই উচিত। পশুদিগের কাল জ্ঞান আছে। ঐ প্রকার মকদ্দমা শীঘ্র আদালতে আইসে নাই। দণ্ড বিধির পূর্ব্বে পূর্ব্বতন নিজাম আদালতের রিপোর্টে এপ্রকার মকদ্দমা দেখা যায়। তথাপি প্রশ্ন এই উঠিতে পারে, ফুলমণি যাহাতে মরিল,সে ঘটনা কি ঘটে না? আমাদিগের আশঙ্কা হইতেছে, এ প্রকার ঘটনা ঘটিলে কেহ তাহা প্রকাশ করে না। মৃত্যু কম হয়; কিন্তু অকালে স্বামী গৃহে গমন নিবন্ধন যে অনিষ্টের সম্ভাবনা যে রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার কর বৃথা। সকল শ্রেণীর বালিকাগণকে অকালে স্বামীর শয্যায় যাইতে হয়। অধিকাংশ বালিকা অনিচ্ছা প্রকাশ করে; কিন্তু বাটীর অন্য অন্য স্ত্রীলোকগণের উপদেশ,—তাড়না নিবন্ধন বালিকাকে সম্মত হইতে হয়। সত্য গোপন করা উচিত নহে। এটী আমা-দিগের সামাজিক প্রথা দাঁড়াইয়াছে। অবশ্যই হিন্দু শাস্ত্রে পৃথক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শাস্ত্র এক্ষণে খিচুড়ি হইয়াছেন। "মেয়েলী মত" জিনিসটী কি? তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু অনিষ্ট নিবারণের কাল উপনীত হইয়াছে।

উৎকল-ভ্রমণ।

(পুরীর বাহ্যিক অবস্থা।)

এক মতে, আঠার নালা (যাহাতে ১৯টী খিলান বিদ্যমান) মহারাষ্ট্রীয়দের পূর্ব্বে,(১০৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) মৎস্য কেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। পুরীর নীচ দিয়া ভার্গবী নদী প্রবাহিত হইয়া চিল্কা অভিমুখে গিয়াছে। আঠার নালা পুরীর

সিংহদ্বার। এইখানে উপস্থিত হইলে সাধকের জীবন সার্থক মনে হয়, ভ্রমণকারীর মনে এক অভূতপূর্ব্ব চিন্তাস্রোত উদিত হয়, অধার্ম্মিক লজ্জায় মুখ অবনত করিতে বাধ্য হয়। পুরীর কথা আজীবন ভাবা যায়, কিন্তু লেখা যায় অতি অল্প।

পুরীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিম অংশে ভার্গবী নদী, উত্তরে পুরীর রাস্তা। কটক হইতে পুরী ৫১ মাইল, পুরী হইতে চিলকা হ্রদ ২৮ মাইল এবং কণারক ১৯ মাইল ব্যবধান। এই বহুবিস্তৃত ক্ষেত্র ধর্ম্ম-ইতিহাসের উজ্জ্বল ছবিতে পরিপূর্ণ। ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, কোপিলেশ্বর, ধউলি প্রভৃতি সমস্ত এই ক্ষেত্রের মধ্যে। দুই সহস্র বৎসর যাবত উড়িষ্যা ধর্ম্মের পবিত্র লীলাভূমি হইয়াছে। এই দুই সহস্র বৎসর কত অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, নয়ন হইতে অশ্রু ঝরে। এই দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, এক কথায়, যাঁহারা ভারতের গৌরব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, রামানন্দ, জয়দেব, কবীর সকলেই এই ভূমি স্পর্শ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এমন পূত ক্ষেত্র আর কোথায় মিলে?

উড়িষ্যা সৌভাগ্যশালী, কেননা, অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া কেশরীবংশ, গঙ্গাবংশ, সূর্য্যবংশ, ভুইবংশ, যাঁহারা উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছেন। উড়িষ্যার ধর্ম্ম-বিপ্লবের ইতিহাস অসংখ্য অলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা পরিপূরিত। এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম পঞ্চম শতাব্দীতে শৈব ধর্ম্মে পরিণত হয়, অর্থাৎ বৌদ্ধ রাজত্বের পর কেশরী বংশ ভুবনেশ্বরের শিব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শৈবধর্ম্মের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। শৈব ধর্ম্ম দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণু ধর্ম্মে পরিণত হয়। গঙ্গাবংশাবতংস অনঙ্গভীমদেব ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণু-মন্দির বা পুরীর শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করেন। এই মন্দির সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা পরে বিবৃত করিব। ১১০৭—১১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার দারুণ দুর্ভিক্ষ। উড়িষ্যার ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নয়। তাহা সাধারণের পক্ষে তত তৃপ্তিকর হইবে না।

পুরীর গৃহ সংখ্যা ৬৩৬৩, জনসংখ্যা ২৫০০০, যাত্রীর ঘর ৫০০০। ইহার মধ্যে পুরীতে ৩৬০ মঠ আছে। মঠের ইতিহাস এইরূপ। পূর্ব্বে যে সকল সাধক পুরীতে আগমন করিতেন, তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য তদনীন্তনের রাজন্যবর্গ বিপুল বিষয় সম্পত্তি দান করিতেন। মঠধারী ব্যক্তিগণ অবিবাহিত থাকিয়া ধর্ম্ম-চর্চ্চা, এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি পরোপকার করিবেন, এই উদ্দেশ্যে এই সকল বিষয় দেওয়া হইত। বর্ত্তমান সময়ে মঠধারী ব্যক্তিগণ, সাধারণত নাম মাত্র ধর্ম্ম-চর্চ্চা ও অতিথি-সৎকার করেন। এই সকল বৃত্তি-ধারী মঠের বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে। হণ্টার সাহেব বলেন, মঠসমূহের বার্ষিক আয় ৫০,০০০ পাউণ্ড। মহারাষ্ট্রীয়দের সময়ে পুরীর মন্দিরে যাত্রীদের নিকট হইতে টেক্স আদায় হইত। এক পাউণ্ড ৯ সিলিং করিয়া প্রত্যেকের নিকট কর আদায় হইত, ইংরাজেরা তাহা রহিত করে। * ১৮৬৭

* Calcutta review, Vol X. p 218

খ্রীষ্টাব্দে লাট সাহেবের আদেশে মন্দিরের কর উঠিয়া যায়। পুরীর দেবোত্তরের আয়, হণ্টারের মতে, ১০১০০০ পাউণ্ড হইবে। পুরীতে প্রতিবৎসর ৫০০০০ হইতে ৩০০০০০ যাত্রী উপস্থিত হয়। মৃত্যুসংখ্যা বৎসর ১০০০০ হইতে ৫০০০০। ৩০০০ পাণ্ডা যাত্রী আনয়ন করিতে প্রতি বৎসর মফঃস্বল গমন করে।

ইংরাজ শাসনে পুরী একটী জেলায় পরিণত হইয়াছে: খোর্দ্দা ইহার একমাত্র সবডিবিসন। পুরীতে গবর্ণমেণ্টের কাছারী, জেলখানা, ডাক্তারখানা, গবর্ণমেণ্ট স্কুল, বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় সমস্তই আছে। কাছারী, ডাক বাঙ্গলা, সাহেবের বাড়ী প্রভৃতি সমুদ্র উপকূলে সংস্থাপিত। পুরী সহর সমুদ্রের গর্ভে স্থাপিত বলিয়া বোধ হয়। ৬০। ৭০ ফিট পর্য্যন্ত ভূমি খনন করিলেও বিশাল বিস্তৃত বালুরাশি দেখা যায়। কথিত আছে, নীলাচলে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এ নীলাচল বালুময় অচল ভিন্ন আর কিছুই নয়। কথিত আছে, প্রথম যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বালুরাশির গর্ভে প্রোথিত হইয়াছে। পুরীর পথ ঘাট সব সৈকতময়। কাছারীর চতুর্দ্দিক যেন সৈকতময় মরুভূমি তরঙ্গায়িত, মেঘের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন,—বায়ুর প্রকোপে মেঘ যেমন, সমুদ্রের তরঙ্গের প্রকোপে এই বালুরাশি তেমনই। যে রাস্তাদিয়া জগন্নাথ দেবের রথ গমন করে, সেটী অতি প্রশস্ত পথ। এই রাস্তাটী প্রায় এক মাইল ব্যবধান হইবে। এতবড় প্রশস্ত পথ কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় নগরেও নাই।

পুরীতে পদার্পণ করিয়া আমাদের প্রথম দৃশ্য বস্তু—সাগর। প্রধান কাজ—সেই অসহায়া রমণী চতুষ্টয়ের অনুসন্ধান। ধীরে ধীরে আমাদের শকট পোষ্টাফিসের সম্মুখে, আমাদের বন্ধু বাবু বিজয় চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইল। তখন প্রায় ১১টা বাজিয়াছে। বিজয় বাবুর বাসা, বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে, পোষ্টাফিসের সম্মুখে, সমুদ্রের অতি নিকটে। এত নিকটে, বোধ হইত যে, সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন নিস্তব্ধ রজনীতে যেন আমাদের শিয়রে জাগিয়া অমৃত ধারা ঢালিয়া দিতেছে। পীড়িত বন্ধুকে বিজয় বাবুর বাসায় রাখিয়া আমি একটু স্ফূর্ত্তি পাইলাম। পূর্ব্বে জানিতাম, বিজয় বাবু আড়ম্বরশূন্য লোক—তাঁহার ভালবাসা মুখে ভাসিয়া বেড়ায় না—তাহা হৃদয়ের গভীরতম স্তরের মধ্যে লুক্কায়িত। কিন্তু বিজয় বাবু আমাদিগকে পাইয়া যেন কেমন হইয়া গেলেন। তাঁর আনন্দ বাহিরে প্রকাশ পাইবার নয়,—কিন্তু এবার তাহা প্রকাশ পাইল। এত দূর দেশে, বহুকাল পরে—বন্ধুর সম্মিলন, অপূর্ব্ব সম্মিলন। আহারান্তে বিজয় বাবু ও আমি সাগর তীরে গমন করিলাম, তখন অপরাহ্ণ ২টা বাজিয়াছে। সূর্য্যের তীব্রতা সে সাগর তীরে নিস্তেজ—অনন্ত-প্রবাহিত মুক্ত বায়ু সূর্য্যের অতি প্রখর তেজকেও মন্দীভূত করিয়াছে। সাগরের ঠিক ধারে একটী টালিময় রাস্তা;—কাছারীর প্রাঙ্গণাদিও টালি দ্বারা আবৃত। এ বালি সমুদ্রকে-আমাদের দেশের রাস্তার পাথর-কুচি বা খোয়া মন্থন করিতে পারে না। সেই টালি দ্বারা নির্ম্মিত রাস্তার ধারে, সাগরের ২০।৩০ হাত অনতিদূরে, মধ্যে মধ্যে বসিবার জন্য বেঞ্চ আছে। আমরা একখানি বেঞ্চের উপর বসিলাম। সাগরের ধারে যে সকল বৃক্ষ

দেখিলাম, যে সকলই দক্ষিণ দিকের প্রবল বায়ুর আঘাতে উত্তরমুখী হইয়া হেলিয়া দুলিয়া রহিয়াছে, প্রবল বায়ু-প্রবাহ বৃক্ষের পত্রগুলিকে যেন কাঁচি-ছাটা করিয়া দিয়াছে। সাগর তীর,—বন্ধুর মিলন,—জীবনে কি আনন্দ পাইলাম, বিধাতাই জানেন। এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখি নাই। যখনই ভাবি, ইচ্ছা হয়, পুরীতে ছুটিয়া যাই। কত দূর হইতে বায়ু আসিতেছে, কত-দূর হইতে সেই পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গ আসিতেছে, কেহ জানে না। পুরীর সাগরের দক্ষিণে যত যাও,—কেবল অনন্ত বারি রাশি,—পৃথিবীর দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত শুধুই জলরাশি। আকাশে অনন্ত নীলাকাশ, নিম্নে অনন্ত নীল-সাগর—আকাশে ও জলে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে,—কোথায় আকাশের শেষ, কোথায় জলের শেষ—ঠিক বুঝা যায় না। দূর হইতে বোধ হয় যেন, আকাশের মেঘ জলে অবগাহন করিতেছে, জলের ঢেউ আকাশে চড়িয়া মেঘ আকার ধরিতেছে। প্রকৃত ঘটনাও তাই। আকাশ সমুদ্রে ধায়, সমুদ্র আকাশে ধায়। বৃষ্টি বল, মেঘ বল, সমুদ্র হইতে সকলের জন্ম। বৃষ্টি বল, মেঘ বল, সব নদী নালা দিয়া সাগরে মিলিতেছে। এ এক দৃশ্য। কিন্তু এখানে, আকাশের মেঘ ও সাগরের ঢেউ যেন লোফালুফি করিতেছে, এক অপরকে আলিঙ্গন করিতেছে। কোন কোন তরঙ্গ পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াও মেঘ ধরিতে না পারিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া শেষে আমাদের পাদমূলে, সেই সৈকতময় প্রাচীরে আসিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতেছে। এত বাতাসই বা কেন, এত তরঙ্গই বা কেন? এত উচ্ছ্বাসই বা কেন? শুনিয়াছি, সাগর ৫।। মাইলের অধিক গভীর নাই, পর্ব্বত ৬ মাইলের অধিক উচ্চ নাই। এত জল কোথা হইতে আসে যে, জোয়ারের সময় সমস্ত তট প্লাবিত করিয়া দেশ ডুবাইয়া যায়? কোথা হইতে আসে, কোথায় যায়; কেন হাসে, কেন নাচে, কেহ উত্তর দিতে পারে না। বিশ্ব-সৃষ্টির গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিতে পারে, এমন বৈজ্ঞানিক, এমন দার্শনিক পণ্ডিতের আজও আবির্ভাব হয় নাই। কেবল কল্পনা ও 'থিওরি' লইয়া যাহাদের বিদ্যার চরম দৌড়, কি আস্পর্দ্ধা, তাহারা অনন্তের সীমা গণিতে ধায়!

পুরীর সাগর—এ জগতে অতুল সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার। জগতে অনেক সাগর আছে, কিন্তু পুরীর সাগরের ন্যায় বুঝিবা আর কোথাও এমন মিষ্ট নয়, এমন মধুর নয়। মান্দ্রাজে ঝড় হয়, সুন্দর বন বন্যা-প্লাবনে ডুবিয়া যায়, কিন্তু বহুকাল যাঁহারা পুরীতে আছেন, তাঁহারাও এখানে ঝড় বন্যার প্রবল প্রকোপ দেখেন নাই। শুনিলাম, একবার নাকি কেবল পুরী সাগর জলে প্লাবিত হইয়াছিল। পুরীর সাগরের শোভা অতুল। এই জন্যই বুঝি, কণারকের সূর্য্যমন্দির বহু অর্থ ব্যয়ে সাগর-তীরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরীর মন্দিরও বুঝি বা এই জন্যই। অতুল শোভা দেখিয়া প্রাণের সাগরে ডুবিলাম। সসীমে অসীম—সীমায় অসীমা—মিলিয়া পুরীতে যে অপূর্ব্ব জীবন্ত ভাগবত রচনা করিয়াছে, আমার প্রাণেও তাহার ছায়া পড়িল। এই ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত মহান যেন প্রতিভাত হইলেন। নয়ন হইতে জল পড়িল। আমি আপনা হারাইলাম। বন্ধু বলিলেন, সমুদ্রের ধারে বসিয়া আপনার বোধ হয় পীড়া হইয়াছে। বন্ধু বুঝিলেন না, আমি

কি হইয়া গিয়াছি! বসিয়া, বসিয়া, বসিয়া —দিন কাটিল। মুখ কথা বলিল, প্রাণ তাতে সায় দিল না। দিন কাটিল, সূর্য্যও ডুবিল, সাগর আরো গাঢ়তর হইল। জীবনে অন্তত এক দিন, এই দিন, আমাকে ভুলিয়া আমি অনন্তের অন্বেষণ করিয়া আসিয়াছি। আমার ন্যায় কেহ অনন্ত-পিপাসু থাক, ঐ পুরীর সাগর তীরে একবার অন্বেষণ করিয়া এসো।

ক্রমশঃ।

বিবাহ ও সমাজ।

কোন্ প্রকার বিবাহ উৎকৃষ্ট, ইহা যখন একটা বিতর্কের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার এ সম্বন্ধে যাহা চিন্তা করা আছে, তাহা সাধারণ সমীপে উপস্থিত করিলে হয়ত কোন উপকার দর্শিতে পারে।

দ্বিতীয় সংস্কারের পর কন্যাদিগের বিবাহ হওয়া সর্ব্বথা উচিত; কারণ তাহা না হইলে পুরুষ সংস্পর্শে তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকালে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষণকাল সুষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক অচিরাৎ লয় পায়; ইহাতে নারীদিগের স্বাস্থ্যনাশ, দেহক্ষয়, আয়ুহানি ও তাহাদিগের সন্তান সকল হীনবীর্য্য, রোগী ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। এজন্য বলি, প্রকৃতি যখন তাহাদিগের দেহের পূর্ণতা সম্পাদন করেন এবং সংস্কার দ্বারা তাহা অবিসম্বাদিত রূপে ঘোষিত হয়, সেই সময় প্রকৃত বিবাহ কাল, বোধ করি।

ইহাতে একটী আশঙ্কা এই আছে যে, বিবাহের পাত্র সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেখা গিয়াছে যে, ৬ মাস চেষ্টা করিয়াও পিতা কন্যার বিবাহ জন্য উপযুক্ত পাত্র স্থির করিতে পারেন নাই। এরূপ দীর্ঘকাল সংস্কারবতী কন্যাকে অবিবাহিত রাখা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। এজন্য আমি বিবেচনা করি, কন্যার দশমবর্ষ অতীত হইলেই অভিভাবকেরা তাহার জন্য পাত্র নির্ব্বাচন পূর্ব্বক বিবাহের পত্র করিবেন, কিন্তু যাবৎ কন্যার সংস্কার না উপস্থিত হইবে, তাবৎ সম্প্রদান হইবে না। এই নিয়মে কার্য্য করিলে নানাবিধ শুভফলের সম্ভাবনা আছে, পত্রান্তে পাত্রের অত্যয় হইলে পাত্রান্তরে বিবাহ দিবার বাধা নাই; বিবাহ হইলে কন্যার নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা হইবার আশঙ্কা অল্প।

পাত্র পাত্রী সমবয়স্ক হওয়া কদাচ যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কারণ যে বয়সে পুরুষের দেহের পূর্ণতা হয়, তাহার অনেক পূর্ব্বে নারীর হইয়া থাকে। ষোড়শবর্ষীয় পাত্রের সহিত তদ্বর্ষীয়া পাত্রী পরিণীতা হইলে পাত্রের অকালমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এরূপ বিবাহের অনুষ্ঠান করা ঘোরতর নিষ্ঠুরতা; আবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, ৫০ বৎসর বয়সের পর নারীর সন্তান জন্মে না, কিন্তু ৬০ বৎসরের পুরুষের জন্মিয়া থাকে, এজন্য আমি বিবেচনা করি, পাত্র ও পাত্রীর বয়সের পার্থক্য অন্যূন ৬ ও অনধিক দশ বৎসর হওয়া বিধেয়।

পাত্রের বয়োধিক্য পুত্র অপেক্ষা অধিক কন্যা উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আমি এ উক্তি অযৌক্তিক বিবেচনা করি। আমার এ বিশ্বাস অটল যে, সম বয়সে বিবাহ দিলেও কন্যা ভিন্ন পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, অথচ পুরুষের দেহ হানির আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। অধিক কন্যা জন্মিবার কারণ পুরুষের চরিত্র-শিথিলতা; অপরিসীম স্বাধীনতা প্রযুক্ত পুরুষ সততই স্বেচ্ছাচারী, সুতরাং তেজোহীন।

বিধবাদিগের বিবাহ যেমন শাস্ত্র নিষিদ্ধ, বিপত্নীক পুরুষদিগের পুনর্বিবাহের সেইরূপ নিষেধ করিলে নীতিগত সাম্য লাভ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করি না, বরং তাহা হইলে, পুরুষদিগের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হয়। শাস্ত্র প্রণয়নের ক্ষমতা হাতে ছিল বলিয়া বিধবাদিগকে থালিতে পুরিয়াছ, আজ যদি স্ব ইচ্ছায় সেই থালিতে উঠিতে পার, তাহা হইলে স্বীকার করি, তুমি প্রকৃত বীর। আমি তোমাতে ততটা আশা করি না, তুমি পারিলেও তাহাতে মঙ্গল হয় কিনা, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ; প্রথমতঃ জীব প্রবাহের বাধা হয়, তারপর ভারতবর্ষে যখন খ্রীষ্টান মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি নানা জাতির অবস্থিতি, সে স্থলে কোন একটী জাতি ওরূপ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলে, মন্দবৃদ্ধি প্রযুক্ত তাহার অপর দ্রুতবৃদ্ধি শ্রেণীর নিকট সংখ্যা বিষয়ে হীন হইবার আশঙ্কা আছে। শতকরা দুই একটী বাদে কোন বিধবা চরিত্র রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই, কখনও করিয়াছেন বলিয়াও বোধ হয় না। পিঞ্জর-বদ্ধা বিধবা সহায় সম্পত্তি শূন্যা হইয়াও যখন শাস্ত্রের গভীর অনুজ্ঞায় পদাঘাত করে, তখন সর্ব্ববন্ধন-মুক্ত সহায়-সম্পন্ন পুরুষ বিপত্নীক থাকিয়া যে পত্নী দেবীর অনুধ্যানে জীবনাতিবাহিত করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না, সুতরাং ও কঠিন ব্যবস্থার চরম ফল এই দাঁড়াইবে যে, গুপ্ত প্রণয়ের ক্ষেত্র আরও প্রচারিত হইবে এবং ভ্রূণ হত্যার পাপ এক হইতে শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে।

আমি এজন্য বলি যে, যে বিপত্নীক পুরুষ পুনরায় দার পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি করুন, তাহার বাধা দেওয়া উচিত নহে। তাহার যদি পূর্ব্ব সংসারের সন্তান থাকে, তাহা কোন বাধার কারণ নহে, কারণ, তাঁহার উৎপাদন-শক্তির সমস্তই জগতের হিতের জন্য ব্যয়িত হওয়া উচিত, সংসারের শান্তির জন্য তাঁহাকে শান্ত রাখা আবশ্যক। বিবাহের বাধা দিলে, প্রকৃতি আমাদিগের সহিত ঐক্য হইবেন না, পুরুষ ইন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য অসদুপায় অবলম্বন করিবেন, তাহাতে কত অনর্থ ঘটিতে পারে, সহজেই অনুমান করা যায়।

আমি বিধবাদিগকেও অবিকল উপরোক্ত প্রকারের স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছা করি, কারণ শাসন বা ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে সতী, সে সতী নহে, কৃত্রিম উপায় দ্বারা সতী সৃষ্ট হইতে পারে না। যে প্রকৃত সতী, তাঁহাকে পুনর্বিবাহের প্রলোভন দিতে চাহি না। সাধ্বীদিগকে পূজা করিবার প্রথা যে হিন্দু সমাজে প্রচলিত আছে, উহা বিধবা সাধ্বীদিগের জন্য কল্পিত। পুনরায় পতিগ্রহণে স্বাধীনতাবতী হইয়াও যে বিধবা টলিল না, অন্য পুরুষের মুখের দিকে চাহিল না, সে নারীরূপিণী দেবীকে পূজা করা জাতির গৌরব।

কিন্তু তাই বলিয়া পুনর্বিবাহিনী বিধবা-দিগকে অশ্রদ্ধা করা যাইতে পারে না, কারণ তাহারা পুনর্বিবাহী পুরুষের তুল্য; না শ্রদ্ধেয়, না অশ্রদ্ধেয়।

অনেকে অন্তঃবিবাহের পোষকতা করিয়া থাকেন, কিন্তু সে পোষকতা কথায়ই রহিয়া গেল, কার্য্যে পরিণত হইল না, হইবার আশাও দূরে। তাই বলি, একেবারে গাছের আগায় উঠিতে যাইও না, প্রথমে স্বজাতি-দিগের সমন্বয় সাধন কর, রাঢ়ী বারেন্দ্রের প্রভেদ ঘুচাও, উত্তররাঢ়ী দক্ষিণরাঢ়ী মিলাও; বিহারের ব্রাহ্মণদিগের সহিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের সামঞ্জস্য কর, এইরূপে অগ্রসর হইতে পারিলে প্রকৃত মঙ্গলের বীজ বপন হইবে। স্থূল রজ্জুর এক একটী তার না ছেদন করিলে ছিন্ন করা অসাধ্য। যদি এইরূপে সমন্বিত জাতি-দিগের বিবাহ চালাইতে পার, তাহা হইলে কল্যাণের সূত্রপাত হইবে।

সমাজ সংস্কার ভিন্ন যে ভারতবর্ষের এক পদও অগ্রসর হইবার জো নাই, ইহা একরূপ দেদীপ্যমান, কারণ স্পষ্টই দেখা যায় যে, সহস্র প্রকার বিভাগে জাতীয় বল বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক মহাপুরুষেরা, সামা-জিক দুর্গতিই আমাদিগের অধঃপতনের মুখ্য কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এজন্য আমি বিবেচনা করি, ইউরোপ কিংবা আমেরিকায় যাইয়া এ পতিত ও পরাভূত জাতির দুঃখ কাহিনী বিবৃত করা বা বাক্-শক্তির পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা, সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা করা দেশহিতৈষিতা।

সমাজ-সংস্কারের ভিত্তি যে বিবাহ প্রথার উপর সংস্থাপিত, সে বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নাই। স্ত্রীদিগকে স্বাধীনতা দিলেই যে সমাজ সংস্কার হয়, ইহা অযৌক্তিক উক্তি। সংসার রক্ষার যে গুরুতর ভার নারীদিগের উপর ন্যস্ত আছে, তাহা থাকাই উচিত, উভয়েই অর্থের চেষ্টায় ফিরিলে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। সুশিক্ষা দেও, শ্রমবিভাগে হস্তক্ষেপ করিও না।

ঋষিরা যে যুক্তিতে বর্ত্তমান অবয়বে সমাজ গড়িয়াছিলেন, সে সকল অবস্থা এক্ষণ বিদ্যমান নাই; তখন ভারতবর্ষ চীনের ন্যায় অন্য জাতির সংস্পর্শের বাহির ছিল। যদি ঋষিরা থাকিতেন, তাহা হইলে আজ কালকার অন্য শাস্ত্র ব্যবসায়ীদিগের ন্যায় পূর্ব্ব বিধির পোষকতা করিতেন না, নূতন ব্যবস্থা চালাইতেন। শাস্ত্রীদিগের চৈতন্য হইবে না, সুতরাং আমাদিগের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে।

পৃথিবীর সমস্ত সমাজ-নিয়ামকের মধ্যে মহম্মদ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মরূপে মানব প্রকৃতি বুঝিতেন। তাঁহার সমাজে গুপ্ত প্রণয় নাই, ভ্রূণ হত্যা নাই, বিবাহে পণ নাই। হিন্দুর গৃহ নানা পাপের আশ্রয়, তাহার পুত্র কন্যা নিশাচর, মুসলমানের গৃহ শান্তির নিকেতন। মহম্মদ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় নারীদিগকে স্বাধীনতা দেন নাই, হিন্দু-দিগের ন্যায় খাঁচায় পোরেণ নাই, অথচ সকল সুখের অধিকার দিয়াছেন, তাহাতে সমাজ এরূপ রমণীয় হইয়াছে যে, নম্রতা ও লজ্জাশীলতায় মুসলমান নারী হিন্দু নারী অপেক্ষা কোন অংশ ন্যূন নহে, পরুষেরা সকলেই শান্ত, সুস্থ, ও পরিশ্রমী।

শঙ্করাচার্য্য হিন্দু সমাজকে নানা জাতির সহিত সম্মিলিত করিয়া যে রূপ প্রশস্ত ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন,

তাহা এক্ষণ কয়জনে বুঝে? কুক্কুট গোমাংস-ভোজী বিধব বিবাহী, তাইভোগ পরায়ণ জাতিদিগকে তিনি অদ্বৈধচিত্তে বৈদিক জাতির পক্ষ মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিলেন। ত্যাগের বিষময় হানি ও গ্রহণের মধুময় সুফল তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন; জনসাধারণের রুচি অনুসারে যে সময়ে সময়ে সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা লোকদিগকে কোন প্রকারেই বিশ্বাস করান যায় না। বিলাত-প্রত্যাগত মহাপুরুষদিগের প্রত্যাখ্যান করিয়া যত মূর্খ অকর্ম্মণ্য লোক একদিকে হইতেছে, নিষেধ করিলে শুনিবে না। আজ কালকার পণ্ডিতের মধ্যে যদি শঙ্করাচার্য্যের একটা অপভ্রংস অবতংসও থাকিত, তাহা হইলে হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বয় লইয়া আমাদিগকে আজ বিষম সমস্যায় পড়িতে হইত না। যে ব্যক্তি কেবল ব্যাকরণ বা স্মৃতি অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিত হইতে চায়, তুমি কি তাহাকে পণ্ডিত বলিতে পার? গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, শিক্ষার আদ্যক্ষর, ইহা যে না জানে, সেও পণ্ডিত! ধিক দেশের শিক্ষাকে।

শ্রীগঙ্গেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

অপরাজিতা।

কেমনে রাখিব স্মৃতি শিশু বালিকার?
সে যে ছিল এক জনা, শত আগুনের কণা,
হাসি কান্না যত ছিল আগুন তাহার!
আগুন আছিল রূপে, প্রতি রোম কূপে কূপে
এমন আগুনে মেয়ে দেখি নাই আর!
যেখানে রাখিতে চাই, পুড়ে করে ভস্ম ছাই,
করেছে পরাণ মন পুড়ে ছারখার!
কে জানে অপরাজিতা, এমন জ্বলন্ত চিতা
আগুনে মিশিয়ে যাবে আগুন তাহার?
এ দগ্ধ হৃদয় ভিন্ন, না রহিবে অন্য চিহ্ন
বৃথা এই ঢালি অশ্রু বৃথা হাহাকার!
কেমনে রাখিব স্মৃতি শিশু বালিকার?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

মৃত্যু আবাহন।

(Walt Whitman এর একটি কবিতার অংশবিশেষ অবলম্বনে)

(১)

আয় রমণীয় মৃত্যু প্রাণের আরাম!
চৌদিক তরঙ্গে ভরি, শান্ত পদে অবতরি,
এস এস, ধরাধামে করগো বিশ্রাম!
একদিন আগে পাছে, যাবিতো সবারি কাছে,
দিনে হোক্, রেতে হোক্, যখন তখন;
আয়রে এখনি তবে কোমল মরণ!

(২)

মরিরে অতল এই সৃষ্টি চরাচর,
কতই জীবন তায়, কতই আনন্দ হায়,
ফুটিতেছে ছুটিতেছে দেখি নিরন্তর!
অদ্ভুত পদার্থ কত, কত জ্ঞান রাশি
কত প্রেম সুধা মাখা, প্রেম মাখা হাসি!
তাইবে জগৎ তোর গাইরে মহিমা।
কিন্তু কিবা অবিচল, সর্ব্বব্যাপী সুশীতল,
তব আলিঙ্গন মৃত্যু, ও তব গরিমা!

(৩)

তমোময়ি জগদম্বে, মৃদু পাদক্ষেপে,
ভ্রমিছ সতত কাছে; তবু কেহ নাহি যাচে
তোমার করুণা মৃত্যু; মরিরে আক্ষেপে,
কেহ নাহি গায় শুনি; তব শুভ আগমনী;
তাই আজি গাই আমি—কি বর্ণিব আর!
বরণীয়ে এ জগতে তুল্য কে তোমার?

(৪)

আজি আমি দিতেছি এ গীত উপহার;
যখন নিশ্চয় করে, আসিবে আমার ঘরে,
হয় যেন পাদক্ষেপ স্থির দুর্ণিবার!

(৫)

এস কাছে মুক্তিদাত্রি, লও উপহার!
আমি গো সঙ্গীত গাই প্রেমেতে তোমার।
তব কৃপা ধরি শিরে, তব প্রেম সিন্ধুনীরে,
আনন্দে মরণ গীতি গাই অনিবার!

(৬)

তারাময়ী নিশিথিনী নিস্তব্ধে চাহিছে;
নিস্তব্ধ সাগর বেলা, মৃদুল উর্ম্মির খেলা;
সকলি নিস্তব্ধ হোয়ে, তোরে নেহারিছে;
কানন, প্রান্তর, নদ, ব্যোম সিন্ধু, জনপদ,
ছাইয়ে ছাইয়ে গাই মহিমা তোমার;
জয় মৃত্যু তব জয়, তুমি দুর্ণিবার!

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

মায়ের কুটীর।

(১)

আয় তোরা যাদুধন,
দেখিনি রে কতক্ষণ,
ভিজিয়ে রেখেছি খুদ, ঘরে গুড় আছে;
বেশী না তো এক মুঠে',
ধর এই দুটো দুটো,
খাও দেখি সবে মিলি বসি মোর কাছে।

(২)

ধূলা মাখা সোণা গায়
মুছায়ে দি কোলে আয়,
মরি, মরি, কচি মুখ গেছে শুকাইয়া,
আমার কপাল পোড়া,
কত দুখ পেলি তোরা
দুখিনী "মায়ের" পেটে জনম পাইয়া!

(৩)

তিনটী এ শিশু ছেলে,
পতি গিযাছেন ফেলে,
বাছাদের ভাবনায় পরাণ শুকায়;
অবোধ বোঝেনা কথা,
অভাগী কি পাবে কোথা,
সকালে ভাঙিলে ঘুম আগে খেতে চায়!

(৪)

এমনি বিধির বাদ,
এসব সোণার চাঁদ,
দুবেলা না পায় দুটো উদর ভরিয়া!
এ বুকে যে কত আছে
কব তা কাহার কাছে,
আঁধারে কামনা কত, গেল মিলাইয়া!

(৫)

থাকি এই কুঁড়ে ঘরে
তথাপি বাসনা করে,
ভাল মন্দ দেই কিছু বাছাদের মুখে,
ঘুঁটে ভাঙি কাটি ঘাস
তবুও পরাণে আশ,
হেসে খেলে খেয়ে মেখে, ওরা থাকে সুখে!

(৬)

হায়!
হেন জন নাই ভবে
মিঠে দুটো কথা কবে,
কেন আমাদের হেন নিঠুর সংসার,
পাড়া প্রতিবাসী হায়,
দেখিলে সরিয়া যায়,
আমি তো করি নি কভু কোন ক্ষতি কার?

(৭)

ধনীর দুযারে গেলে,
খেপায় তাদের ছেলে,
ছেঁড়া বাস দেখি দেছে, রুখ্ রুখ্ চুল,
ক্ষীর সর যাহা পায়
দেখায়ে দেখায়ে খায়,
আমার বাছারা যবে ক্ষুধায় আকুল!

(৮)

হেরি সে ক্ষুধিত মুখ,
শত বাজে ভাঙ্গে বুক!
জগতে কি ছেলে বুড়ো মায়াহীন হায়,
কা'র হায় পৌষ মাস
কা'র হায় সর্ব্বনাশ,
তাহারা আমোদ তরে ওদের কাঁদায়!

(৯)

আমার তো কত সয়
এ পরাণ লোহা ময়,
পারিনে ওদের ব্যথা দেখিবারে আর,
কেন তুমি নারায়ণ,
দিলে মোরে হেন ধন,
এ রাক্ষস-পুরে কেন বাছারা আমার?

(১০)

শত উপবাস করি,
কি বা অনাহারে মরি,
সংসার করে না কভু মুখের জিজ্ঞাসা,
তবু এই তুচ্ছ প্রাণ
কতই মায়ার টান!—
আমি ম'লে বাছাদের কি হবেরে দশা!
না গো না সকলি স'ব
এই সয়ে বেঁচে র'ব,
শুকাব এ অশ্রু জল ওদেরি হাসিতে;
তোমার চরণে হরি,
এই নিবেদন করি,
নিতি যেন পাই কিছু চাঁদ মুখে দিতে।

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। [৩৭শ]

সার্ব্বভৌমোদ্ধার।

নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্য অচৈতন্যাবস্থায় সার্ব্বভৌমভবনে নীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া লোকমুখে ঐ বৃত্তান্তের কথক কথক আভাস যাহা শুনিতে পাইলেন, তাহাতে আর বুঝিতে বাকী থাকিলনা যে, মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই লোকে ঐসব কথা বলিতেছিল। তাঁহারা সার্ব্বভৌমের বাড়ীর উদ্দেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মুকুন্দদত্ত সেই পথে গোপীনাথ আচার্য্যকে আসিতে দেখিতে পাইলেন। গোপীনাথ নবদ্বীপের বিশারদের জামাতা ও সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। ইনি মহাপ্রভুর এক জন ভক্ত ও তত্বজ্ঞ, মুকুন্দের সহিত পরিচয় ছিল। মুকুন্দকে দেখিতে পাইয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন "বা! তুমি এখানে কবে এলে? প্রভু কোথায়"? মুকুন্দ উত্তর করিলেন, "প্রভু সন্ন্যাস করিয়া আমাদের লইয়া নীলাচলে আসিয়াছেন এবং আমাদের পাছে ফেলিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন। লোক মুখে শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তিনি জগন্নাথ দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়াছেন। এখন অন্য কথা কহিবার অবসর নাই, শীঘ্র তুমি আমাদের ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দেখাইয়া দাও।" গোপীনাথ তাঁহাদিগকে লইয়া সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে গেলেন, যাইতে যাইতে পথে মুকুন্দ নিত্যানন্দাদির সহিত গোপীনাথের পরিচয় করিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম-ভবনে মহাপ্রভুকে অজ্ঞানাবস্থায় শয়ান দেখিয়া সকলে দুঃখিত হইলেন। সার্ব্বভৌম আগন্তুকদিগের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয়পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া জগন্নাথ দর্শনে পাঠাইলেন। দর্শনান্তর সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মুকুন্দ মহাপ্রভুর কর্ণমূলে সুস্বরে হরিসংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, তিন প্রহরকাল পরে গৌর সিংহ হরি নাম শ্রবণে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তখন বেলাবসান হইয়াছে। সকলে মহানন্দে সমুদ্র-স্নান করিয়া আসিলে সার্ব্বভৌম মহাপ্রসাদ আনাইয়া সকলকে পরিতোষ রূপে ভোজন করাইলেন। খাইতে খাইতে গৌরচন্দ্র আনন্দোল্লাসে বলিতে লাগিলেন, 'আমাকে অনেক করিয়া লাফরা তরকারী দাও, আর সকলকে তুমি যথেষ্ট পিঠাপানা ও ছানাবড়াদি দাও।' সার্ব্বভৌম সেকথা না শুনিয়া তাঁহাকে সকল প্রকার প্রসাদ অতি যত্নের সহিত ভোজন করাইলেন। ভোজনের সময় অনেক কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। গৌর নিতাইকে বলিলেন, "তোমাদের ছাড়িয়া আসিয়া আমি জগন্নাথ দর্শন করিলাম; জগন্নাথ দেখিয়া আমার মনে ইচ্ছা হইল, ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে রাখি, এই ভাবিয়া ধরিতে গিয়াছিলাম, তাহার পর কি হইয়াছে, জানিনা।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "সৌভাগ্য ক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

সেখানে ছিলেন, তোমাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় তুলিয়া এখানে আনিয়াছিলেন। তাই তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে।" সার্ব্বভৌম বলিলেন, আর আপনি একাকী দর্শনে যাইবেন না; গোপীনাথ, তুমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ দর্শন করাইয়া আনিও।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন,"আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জগন্নাথ দর্শনে আমি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইবনা; বাহিরে গরুড় স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিব।" আচমনান্তে গৌরকে বিশ্রামস্থানে উপবিষ্ট করাইলে সার্ব্বভৌম গোপীনাথের সহিত নিকটে যাইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। "গোঁসাইর পূর্ব্বাশ্রম কোথায়?" সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন "নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের ইনি কনিষ্ঠ পুত্র, ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, নাম বিশ্বম্ভর।" ভট্টাচার্য্য গৌরকে বলিলেন "নীলাম্বর আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী। জগন্নাথও তাঁহার মান্য ছিলেন; যেসম্বন্ধে আপনি আমার গৌরবের পাত্র, বিশেষতঃ যখন আপনি সন্ন্যাস লইয়াছেন, তখন বিশেষ পূজনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।" শ্রীচৈতন্য বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে এরূপ বলিবেন না, আপনি জগৎ গুরু, বেদান্তাধ্যাপক, মহা পূজনীয় ব্যক্তি। আমি বালক সন্ন্যাসী, সদসৎ জ্ঞান হীন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনার নিকট আমার কত শিখিবার আছে; আজ হইতে আমি আপনকে গুরুস্থানে বরণ করিলাম, আমাকে শিষ্যজ্ঞানে উপদেশ দিবেন।

সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি?

গৌর উত্তর করিলেন, বাহিরের উদ্দেশ্য জগন্নাথ দর্শন; কিন্তু জগন্নাথ তো আর আমার সঙ্গে কথা কহিবেন না। আমার আসিবার মূল উদ্দেশ্য, আপনি এখানে আছেন বলিয়া। আপনাতে ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে অবস্থিত। আমি আপনার সংসর্গে থাকিয়া উপকৃত হইব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। কিরূপ আচরণ করিলে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম বজায় থাকিবে, আর সংসার মায়ায় না পড়িতে হয়, কি খাইব কি অধ্যয়ন করিব? এই সব বিষয় আমাকে শিক্ষা দিতে হইবে।

সার্ব্বভৌম গৌরের মধুর সম্ভাষণে মুগ্ধ হইয়া অধিক আত্মীয়তা করিয়া বলিতে লাগিলেন "তুমি আমার বয়ঃ কনিষ্ঠ, তোমাকে তুমি সম্বোধন করিতে পারি। কিন্তু তথাচ তুমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহীদিগের বন্দনীয়, ভয় হয় এরূপ করিলে দাসকে অপরাধী হইতে হয়।"

গৌর বলিলেন, তাতো পারিবেনই। তাহা না করিলে মনে করিব আপনি আমাকে ভাল বাসিতেছেন না।

সার্ব্বভৌম।—তোমার সকলই মিষ্ট লাগিতেছে। তোমাতে আজ যে ভক্তির উদয় দেখিলাম, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমাতে ভগবানের বিশেষ কৃপা অবতীর্ণ হইয়াছে। অচিরে যে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি পরম সুবুদ্ধি হইয়া একটী অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্য। কি বিষয়, নিঃসঙ্কোচ চিত্তে বলুন।

সার্ব্বভৌম।—সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ, মাথা মুড়াইয়া স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলে কি লাভ; লাভের মধ্যে আর কিছু হউক আর না হউক, প্রথমেই

অহঙ্কারটা বিলক্ষণ হইয়া থাকে! সন্ন্যাসী কাহারও নিকট মাথা হেঁট করেনা, অথচ মহাসম্মানিত ভক্তগনেরও প্রণাম লইতে ভয় করেনা। যদি বল মাধবেন্দ্রাদির ন্যায় মহা মহা ভক্তগণও তো সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাহারা তো কই অহঙ্কৃত হন নাই। তাহার উত্তর এই যে, তাঁহারা জীবনের শেষ ভাগে গ্রাম্যরস ভোগ করিয়া ও ঔদ্ধত্যকে বিনাশ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে আসিয়াছিলেন। তোমার নবীন যৌবন. এ বয়সে তো সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়।

শ্রীচৈতন্য বিনীত ভাবে বলিলেন, "মহাশয়! আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিবেন না, বাস্তবিক আমি সেরূপ কোন অভিপ্রায় লইয়া সন্ন্যাসী হই নাই। কৃষ্ণের বিরহে অস্থির হইয়া শিখা সূত্র ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়াছি। অহঙ্কার বিনাশের জন্যই আমার শিখা সূত্র ত্যাগ। এখন আপনার নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে, যাহাতে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম বজায় থাকে, সেরূপ উপদেশ দিবেন।

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আমাদের বাড়ীতে প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ হইয়া থাকে, তুমি তাহা শুনিবে। সন্ন্যাসীর বেদান্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। আর আমার বাড়ীতে তোমাদের থাকিবার বড় সুবিধা হইবে না। আমার মাতৃস্বসার বাড়ী খুব নির্জ্জন স্থান, সেই খানে তোমাদের বাসা করিয়া দিব।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য গোপীনাথকে গৌরের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, কিন্তু ভক্তি রাজ্যের কিছুই জানিতেন না। তাই তিনি গৌরের প্রকৃত মহত্ব বুঝিতে না পারিয়া বাৎসল্য ভাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এত উপদেশ দিলেন। গোপীনাথ নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতেন। তিনি কিছু না বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন এবং ভট্টাচার্য্যের মাসীর বাড়ীতে গৌরের বাসস্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া কালের গতি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইযাছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে আসিয়া দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য বেদান্ত পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাঁহার ছাত্রবৃন্দ মণ্ডলাকারে বসিয়া মনোযোগের সহিত শুনিতেছে। শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন, "ভাল হইয়াছে, তুমি আসিয়াছ; সন্ন্যাসীর পক্ষে বেদান্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, তুমি সাবহিতে বেদান্ত শ্রবণ. কর, আর প্রতি দিন এই সময়ে পারায়ণ হইয়া থাকে, আমার অনুরোধ, তুমি প্রত্যহ আসিবে।" শ্রীচৈতন্য অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন " আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, তাহাতে আপনি যাহা বলিবেন, আমার পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া মনোযোগ সহকারে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল; চৈতন্যদেব প্রত্যহ নীরবে বেদান্ত শুনিলেন, অথচ ভাল মন্দ কিছুই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। অষ্টম দিনে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন "সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত শুনিলে, কই কিছুই তো জিজ্ঞাসা করিলে না, কিছু বুঝিতে পারিতেছ কি না জানিতে পারিলাম না।"

গৌর উত্তর করিলেন, আপনার আজ্ঞায় সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া শুনিতেছি;

আমার বেদান্ত অধ্যয়ন নাই। সুতরাং আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্ব্বভৌম বলিলেন "যে বুঝিতে পারে না, তাহার তো জিজ্ঞাসা করা উচিত? তুমি সাত দিন পর্য্যন্ত শুনিলে, অথচ কোন প্রশ্নই করিলে না, কি জানি তোমার মনে কি আছে।"

গৌর এবারে লৌকিক বিনয় ছাড়িয়া কহিলেন "ব্যাসসূত্রের অর্থ অতি পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যায় সে অর্থ প্রকাশ পায় না। সূত্রের অর্থ সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশের জন্য ভাষ্যের প্রয়োজন; যদি সেই ভাষ্যে সূত্রার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে ভাষ্যের প্রয়োজন কি? আপনার ভাষ্যে মুখ্যার্থ ছাড়িয়া দিয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছে।"

সার্ব্বভৌম অতীব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি প্রকারে?" গৌর বলিতে লাগিলেন "বেদান্তের উদ্দেশ্য ব্রহ্ম নিরূপণ করা। সেই ব্রহ্ম অতি বৃহৎ বস্তু; তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জীবের জ্ঞানাতীত। তবে সৃষ্টিরাজ্যে তিনি যত টুকু আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাঁহার কৃপায় তাহারই অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পরি। কিন্তু যে অনন্ত শক্তি, শুদ্ধ মুক্ত অনাবৃত অবস্থায় সৃষ্টাতীত হইয়া আছে, তাহারই নাম নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার ব্রহ্ম, তাঁহার আমরা কি বুঝি?" সার্ব্বভৌম বাধাদিয়া বলিলেন, "সৃষ্টি তো মিথ্যা, অবিদ্যা বা মায়া বিজৃম্ভিত; মায়া ছুটিয়া গেলে জীব ও ব্রহ্ম একই। তিনি ভিন্ন কি জগতে আর কিছু আছে?"

গৌর। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছায় এই সৃষ্টি লীলা; এই হৃদয়-নিহিত আত্মজ্ঞান। কে বলিল, সৃষ্টি মিথ্যা বা কল্পিত জ্ঞান মূলক; সৃষ্টি কল্পনা নহে, তবে তাহা নশ্বর মাত্র।

সার্ব্বভৌম। তিনি ভিন্ন যদি জগতে আর কিছু নাই, তবে বল দেখি, সৃষ্টি জ্ঞান কল্পিত হয় কি না?

গৌর। কার কল্পনা, সকল কল্পনার অতীত যিনি, তাঁহাকে কি মিথ্যা জ্ঞানের আকর ভূমি বলিবেন?

সা। কখনই নয়।

গৌর। তাহা যদি না হইল, তবে একটু চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, এই কল্পনা জ্ঞান যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় কি না? আমরা তাহাকেই জীব বলি। এবং এই জীব সৃষ্টি রাজ্যে ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ।

সার্ব্বভৌম বিচক্ষণ পণ্ডিত। গৌরের এই সুযুক্তি পূর্ণ কথায় জীবতত্ত্ব যে ঈশ্বর তত্ত্বের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্নাত্মক, তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "আচ্ছা তাহাই না হয় হইল। কিন্তু তাহাতেও তো প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। তুমি যাহাকে সৃষ্টি লীলা বলিতেছ, কে বলিল, তাহা সত্য"?

গৌর। আত্মজ্ঞানই তাহার সাক্ষী। নানা বৈচিত্র্য পূর্ণ এই ব্রহ্মলীলা আত্মতত্ত্বেই নিহিত। ব্রহ্ম আপনিই লীলা রূপে বাহিরে, আত্মারূপে অন্তরে এবং ব্রহ্মরূপে সকলের মূলে। একের মধ্যে কি সুন্দর বৈচিত্র্যময় দ্বৈত ভাব ও দ্বৈত্যের মধ্যে কি অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জসীভূত একত্ব। বলুন দেখি, ইহাতে কার না প্রাণমন গলিয়া যায়। এহেন ঐশ্বর্য্যময়, পরিপূর্ণ ভগবান্‌কে আপনি কোন্ সাহসে শুষ্ক নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চান্।

সার্ব্বভৌম গৌরের ব্যাখ্যাতে মুগ্ধ হই-

লেন, কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তবে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষ বাদ কেন শিক্ষা দিলেন?"

গৌর। কেন শিক্ষা দিলেন, জানি না, শুনিয়াছি, তিনি নাকি বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া মায়া-বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের মত অন্যরূপ ছিল। এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য শঙ্করাচার্য্যের রচিত নিম্নোদ্ধৃত বচনটী ব্যাখ্যা করিলেন।

"যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীয় স্তম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রোর্ন তরঙ্গে।"

"হে নাথ! ভেদজ্ঞান অবগত হইলে যদিও সৃষ্টিতে ও তোমাতে প্রভেদ থাকেনা, তথাচ আমি তোমারই রচিত, তুমি কখনও আমার রচিত নও। সমুদ্রেরই তরঙ্গ হইয়া থাকে, তরঙ্গের কখন সমুদ্র হয় না।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, তাহাই যেন হইল। কিন্তু শ্রুতিতেও নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ রহিয়াছে।

গৌর উত্তর করিলেন, যেমন নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তেমনি সবিশেষ তত্ত্বের কথাও আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ধরিয়া বুঝিতে গেলে, শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না। সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায় বুঝাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, হস্ত পদাদি শূন্য, তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, নাম রূপ উপাধি বিহীন, নীল লোহিতাদি বর্ণ বিহীন, শুদ্ধ সত্ত্বা চৈতন্য ময়, তেমনি অনেক স্থানে বলিয়াছেন, তিনি তেজোময়, অমৃতময়, রসস্বরূপ, পরমসুন্দর, সহস্র সহস্র তাঁহার মস্তক, সহস্র সহস্র তাঁহার হস্ত পদ? তিনি সর্ব্বত্রগামী, সকলই গ্রহণ, দর্শন ও শ্রবণ করেন। সচ্চিদানন্দরূপ, ন্যায় বান্ বিধাতা, পরম পুরুষ, পরমাত্মা, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এই বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্ট্যতীতে তিনি নির্গুণ নির্ব্বিশেষ, আর সৃষ্টি সম্বন্ধে সবিশেষ সগুণ, পরম পুরুষ ভগবান্। আমরা সৃষ্টি সম্বন্ধীয় জীব, সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকাশিত ব্রহ্ম স্বরূপেই আমাদের বিশেষ অধিকার।

সার্ব্বভৌম গৌরের তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা অনুভব করিয়া, পূর্ব্বে তাঁহাকে বালক সন্ন্যাসী জ্ঞানে যেরূপ উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সেভাব আর রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হইল। ভট্টাচার্য্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি সৃষ্টিকার্য্যের সহিত ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতিই সব করিতেছে, তবে আর তাঁহার বিধাতৃত্ব মানিবার প্রয়োজন কি?"

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, বিধাতৃত্ব না মানিলে চলিবে কেন? সৃষ্টি লীলার মূলেই তো বিধাতৃত্ব, "যাঁহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাদ্বারা সুরক্ষিত হয় এবং অবশেষে যাহাতে লয় হইয়া যায়," এই যে ব্রহ্ম লক্ষণ বেদে নিরূপিত হইয়াছে, ইহাতেই তো তাঁহার বিধাতৃ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন পালন লয় যিনি করিতেছেন, তাঁহাকে বিধাতা বলিবেন না কেন?

সার্ব্বভৌম এরূপ তর্ক যুক্তি পূর্ব্বে আর কখন শুনেন নাই। তিনি আজন্ম মায়াবাদী, ভাষ্য পড়িয়া মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদকেই ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণে চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, অন্যদিকে তাঁহার চিন্তা

স্রোত কখন আকৃষ্টই হয় নাই। এক্ষণে গৌরের নিকট এই কথা শুনিয়া, তাঁহার অন্তরে আর এক চিদ্রাজ্য খুলিয়া গেল ও নানা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা তাঁহাকে না হয় বিধাতা বলিয়াই মানিলাম, কিন্তু তাঁহার শক্তি অনন্ত, কোথায় কোন্ ভাবে কি প্রকারে তাঁহার শক্তি কার্য্য করিতেছে, আমরা তাহার কি জানি? দয়া, করুণা, শান্তি, পবিত্রতা, কামক্রোধাদি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, ইচ্ছা, ভৌতিক, জৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আরও কত অজ্ঞেয় শক্ত্যাদি সকলই তো তাঁহার শক্তি, ইহাদিগের আবার অনন্ত বৈচিত্র্য, অনন্ত বিভেদ, অনন্ত সমাবেশ, এ সব ভাবিতে গেলে আত্মহারা হইতে হয়, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারা যায়না। সে অবস্থায় শক্তিমানের পার্থক্য কিরূপে বুঝিব; শক্তি হইতে কি তিনি ভিন্ন?

গৌর বলিলেন, শক্তিতত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ, কিন্তু শক্তি ও তিনি এক নহেন। শক্তি হইতে তাঁহাকে অভিন্নাত্মক মানিতে গেলে আবার নির্ব্বিশেষ তত্ত্বেই আসাগেল, প্রশ্নের মীমাংসা কিছুই হইলনা। প্রথমে আপনি যে নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সে না হয় সত্ত্বা নির্ব্বিশেষ, আর এ শক্তি নির্ব্বিশেষ। ফল একই রূপ, উপাসনা তত্ত্ব কি কর্ম্মের দায়িত্ব, ইহার কোনটাই সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু তাঁহাকে যদি সকল শক্তির কেন্দ্র স্থান বলিতে পারা যায়, তবে মীমাংসার বিষয় সুখসাধ্য হয়। সূর্য্যের একটী একটী কিরণকে যেমন সূর্য্য বলা যায় না, তাহা সূর্য্যের অত্যল্প প্রকাশ মাত্র; তেমনি ব্রহ্মের এক একটী শক্তিকে ব্রহ্ম বলা অযৌক্তিক, সে সব শক্তিতে ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র।

সার্ব্বভৌম। তাহাকে তবে কোন শক্তি কিরূপে লীলা করিতেছে, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

চৈতন্য। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, অনন্তের অনন্তশক্তি জীবের বোধাতীত, সৃষ্টি রাজ্যে তাঁহার যত শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও কেহ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তবে আত্ম-তত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ; যাহার যেমন জ্ঞান ও অধিকার, শাস্ত্র ও গুরু উপদেশে যে যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, সে তত টুকুই জনিতে পারে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধানা চিচ্ছক্তির বিষয় আমরা জানিতে পারি। তিনি যে সৎবস্তু অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমানাবস্থায় নিত্য কাল আছেন, এই শক্তির নাম সন্ধিনী, ইহাতেই দিকদেশকাল সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশিত। তিনি কিছু অচৈতন্য জড় বস্তু নহেন, চিরজীবন্ত জাগ্রত পুরুষ, এই শক্তিকে সম্বিত শক্তি বলা যাইতে পারে। আর ব্রহ্মের যে শক্তিতে প্রেম, আনন্দ আশ্রিত, তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই তিন শক্তিকেই অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বলা যায়। উহা ব্রহ্ম স্বরূপে চির প্রকাশিত। আর জীব শক্তি তটস্থা, উহা কেবল সৃষ্টি কালেই ব্রহ্ম স্বরূপে প্রকাশিতা হইয়া থাকে, সৃষ্ট্যন্তে নিদ্রিতাবস্থায় থাকে। অবশেষে মায়া শক্তি বহিরঙ্গা, তাহা ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্ম রূপকে স্পর্শ অথাৎ ব্রহ্ম স্বরূপের উপর আধিপত্য বিস্তার না করিয়া দূরে থাকে। সৃষ্টি লীলার উপরই ইহার প্রভাব। ইহার অর্থ এই যে, সচ্চিদানন্দ পুরুষের সৎ, চিৎ, আনন্দ শক্তি তাঁহার ইচ্ছায় অতি অপূর্ণ রূপে সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়াছে; এই অপূর্ণ শক্তি হইতে অপূর্ণ জ্ঞান, আবার অপূর্ণ জ্ঞানেই ভ্রান্তি বুদ্ধি। ইহারই নাম মায়া। সুতরাং মায়ার প্রভাব

ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতেই পারে না। মায়াবাদ ভাষ্যে মায়াকে অবস্তু বলা হইয়াছে; প্রকৃত পক্ষে ইহা অবস্তু নয়, অসম্পূর্ণ জ্ঞান মূলক মাত্র। এমন যে ঐশ্বর্য্যময় ভগবত্তত্ত্ব, ইহাকে আপনি কোন্ সাহসে নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চাহেন? যে প্রভুর ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই, প্রেমের অন্ত নাই, জ্ঞানের অন্ত নাই, যাঁর চিচ্ছক্তিবিলাস ভক্ত হৃদয়ে কত সুখ-তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, যিনি মায়া কল্পনার অতীত, আপনি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে মায়ামুগ্ধ জীবের সহিত অভেদ বলিতে সাহস করেন?

সার্ব্বভৌম। তবে তাঁহার রূপ কি?

চৈতন্য। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়, লীলাবিলাসী। পূর্ণানন্দ বিগ্রহ কল্পনার বিষয় নয়; প্রত্যক্ষ-সাধ্য। শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী। বুদ্ধ বেদ মানে নাই বলিয়া তাহাকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন, আর শ্রীবিগ্রহ না মানিলে যে ভাষণতর নাস্তিকতায় লইয়া যায়, তাহা দেখিতেছেন না কেন? এক আপত্তি করিতে পারেন যে, বিকার না হইলে সৃষ্টি হয় না; ঈশ্বর কি তবে বিকারী হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? এ আপত্তি অতি অকর্ম্মণ্য। অচিন্ত্য অভাবনীয় শক্তি যাঁহার, তিনি কি সৃষ্টি করিয়াও অবিকারী থাকিতে পারেন না? মণির কথা কি শুনেন নাই, স্বর্ণ প্রসব করিয়াও যেমন মণি তেমনি অবস্থায় যদি থাকিতে পারে, তবে বিচিত্র কর্ম্মা ভগবান্ কি সৃষ্টি সত্ত্বেও মায়াতীত থাকিতে পারেন না। ভ্রান্তি জ্ঞান মূলক বিবর্ত্তবাদ মত কোন মতেই টিকিতে পারে না।

সার্ব্বভৌম অনেক বিচার বিতণ্ডা করিয়াও গৌরের সূক্ষ্ম যুক্তির নিকট পরাস্ত হইলেন। শ্রীচৈতন্য অবশেষে ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভগবানের সহিত আমাদের চিরসম্বন্ধ, ভক্তি সেই সম্বন্ধ জ্ঞান বুঝাইয়া দেয়, আর প্রেমই প্রয়োজন, অর্থাৎ মানবজীবনের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের যদি কিছু উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা প্রেম। বেদ বাক্যে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন দেখিয়া গৌর বলিলেন "ভট্টাচার্য্য, বিস্মিত হইও না; ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ; আত্মারাম মুনিগণও ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন। এই বলিয়া তিনি ভাগবতের পশ্চাল্লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে,
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীংভক্তিমিত্থংভূত গুণোহরিঃ।"

ভগবানের এতাদৃশ গুণ যে, যাঁহারা আত্মারাম ঋষি ও মৌনব্রতাবলম্বী; যাঁহাদের সমস্ত হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহারাও তাঁহাকে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই শ্লোক শুনিয়া বলিলেন "এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে আমার বড় বাঞ্ছা, কৃপা করিয়া আপনি এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করুন্।"

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, আপনি মহাপণ্ডিত, আপনি আগে ব্যাখ্যা করুন্ শুনি, পরে আমি যা জানি, বলিব।

সার্ব্বভৌম তখন আপনার পাণ্ডিত্য বলে শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলে চৈতন্য প্রভু, "আপনার এ ব্যাখ্যা ব্যতীত শ্লোকের আরও অভিপ্রায় আছে" বলিয়া শ্লোকের একাদশ পদের সহিত আত্মারাম শব্দ মিলাইয়া অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার একটীও ছুইলেন না। গৌরের ব্যাখ্যা

মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের শক্তি ও গুণের অচিন্ত্য প্রভাবে শুকসনকাদি সিদ্ধসাধকগণও মুগ্ধ হইয়া যান; অন্যের কি কথা। তখন ভট্টাচার্য্য পরম বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বে চৈতন্য প্রভুকে বালক বলিয়া যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য মর্ম্ম বেদনা পাইলেন এবং আপনার মূর্খতাকে ধিক্কার দিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বোধে স্তবস্তুতি করিয়া শরণাপন্ন হইলেন। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব তখন ভট্টাচার্য্যের প্রতি কৃপা করিয়া প্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ ও পরে দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সার্ব্বভৌমের তখন দিব্য জ্ঞান লাভ হইল এবং নাম, প্রেম ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বুঝিতে পারিয়া এক দণ্ডের মধ্যে এক শত শ্লোকে চৈতন্যস্তব রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে নাচিতে শ্রীচৈতন্যের পদ ধরিয়া বলিলেন, "প্রভো! ধন্য তোমার শক্তি; তর্ক শাস্ত্র পড়িয়া পড়িয়া আমার হৃদয় লৌহ পিণ্ডের ন্যায় কঠিন ছিল; তাহাতেও যখন প্রেমভক্তি দিয়া গলাইয়া দিলে; তখন জগৎ উদ্ধার করা তোমার পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার বলিতে হইবে। গোপীনাথ আচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন; এক্ষণে সুযোগ পাইয়া মহাপ্রভুকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কি অবস্থা করিলে?" গৌর বলিলেন "তুমি ভক্ত; তোমার সঙ্গ গুণে জগন্নাথ দেব ইঁহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন।"

পরদিন অরুণোদয়কালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জগন্নাথ দর্শন করিয়া ও পূজারী প্রদত্ত মালা মহাপ্রসাদ লইয়া সার্ব্বভৌম ভবনে আসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর আগমন বার্ত্তা পাইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহার বন্দনা করিয়া বসাইলে গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের হাতে মহাপ্রসাদান্ন দিলেন; ভট্টাচার্য্যের তখন স্নান, সন্ধ্যা, দন্ত ধাবনাদি প্রাতঃকৃত্য না হইলেও তৎক্ষণাৎ সেই প্রসান্ন ভক্ষণ করিয়া বলিলেন "শুষ্কই হউক, আর পর্য্যুসিতই হউক, অথবা বহুদূর দেশ হইতে আনীতই হউক; মহাপ্রসাদ পাইলেই ভোজন করিবে, কালাকাল বিবেচনা করিবে না।" এই কথা শুনিয়া গৌরের আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ভট্টাচার্য্যকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বেদ, কম্প, অশ্রুতে উভয়েই ভাসিতে লাগিলেন।

তখন প্রেমাবিষ্ট গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি ত্রিভুবন জয় করিলাম; আজ আমার নিকট বৈকুণ্ঠের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল; আজ আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইল। ভট্টাচার্য্য বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ খাইলে; ইহার চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? আজ তুমি নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় করিলে; আজ তোমার ভববন্ধন ছিন্ন হইল, মায়া বিদূরিত হইল। না হ'বে কেন? যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবচ্চরণাশ্রয় করেন, স্বয়ং ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদের মায়া হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।" সেই হইতে ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যাভিমান দূরে গেল, শুদ্ধাভক্তির উদয় হইল। তিনি এখন হইতে ভক্তি শাস্ত্র বিনা অন্য শাস্ত্রের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নাম সংকীর্ত্তনই পরম সাধন উপদেশ দিয়া বলিলেন, "আপনাকে

তৃণ হইতেও নীচ বিবেচনা করিয়া ও তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া নাম সাধন করিতে হইবে, নইলে নাম গুণ স্ফুরিবে না। মান, অভিমান, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, বুদ্ধি, ধন, জন সম্পদ সকলই প্রভুর চরণে অর্পণ করিয়া নাম সাধন করিতে হইবে।” সার্ব্বভৌম ভাগবতের একটী শ্লোকের শেষ পদে 'মুক্তিপদ' স্থানে 'ভক্তিপদ' পাঠ ফিরাইয়া আবৃত্তি করিলেনঃ—

'তত্তেঽনু কম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো,
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং ;
হৃদ্ বাগ্বপুর্ভির্ব্বিদধন্নমস্তে
জীবেতয়ো ভক্তিপদে সদায়ভাক্, ॥

হে প্রভো! তোমার কৃপা কবে হইবে? এই আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি অনাসক্ত চিত্তে স্বীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করেন, তিনিই উত্তরাধিকারের ন্যায় তোমার ভক্তি পদে দায়াধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'মুক্তিপদ' পাঠ পরিত্যাগ করিয়া 'ভক্তিপদ' বসাইলে কেন?

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন “ভগবদ্ভক্তি বিমুখের মুক্তি তো পুরস্কার নয়; দণ্ড স্বরূপ। কারণ সে ঈশ্বরের সাযুজ্য পাইয়া লীন হইয়া যায়, সেবা সুখাদির অধিকার পায় না। ভক্ত সেবা ব্যতীত মুক্তি চাহেন না। ব্রহ্ম সাযুজ্য তাঁর নিকট ঘৃণার সামগ্রী। সুতরাং এমন হেয় মুক্তিকে দায়াধিকার করিলে ভক্তের প্রতি অন্যায় করা হয় কিনা?

চৈতন্য বলিলেন, মুক্তি পদের যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহা ছাড়া উহার অবান্তর অর্থ আছে। মুক্তিপদ, বলিতে স্বয়ং ভগবান্‌কে বুঝায়। বহুব্রীহি সমাস কর না কেন?

সার্ব্বভৌম। তবু ও পাঠ লইতে পারি না। কারণ উহা দ্ব্যর্থ দোষযুক্ত। মুক্তি শব্দটা শুনিতেই ভক্তের ঘৃণা ও ত্রাস জন্মে। ভক্তি শব্দ বলিলে কেমন আনন্দ হয়।”

চৈতন্য দেব এই কথায় আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, মায়াবাদী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্য কৃপায় পরম ভক্ত হইয়াছেন। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, “লোহাকে স্পর্শ না করাইলে স্পর্শ মণির গুণ টের পাওয়া যায় না। যখন কঠোর জ্ঞানী সার্ব্বভৌমের ভক্তি লাভ হইল, তখন ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সন্দেহ নাই।” সেই হইতে উৎকল রাজের অভীষ্ট দেব কাশীমিশ্র ও নীলাচলের প্রধান প্রধান লোক শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হইল। তাঁহার যশে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিতকে নিজ বাটীতে ডাকিয়া মহাপ্রভুর জন্য উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ দিলেন এবং স্বরচিত দুইটী শ্লোক একখানি তালপত্রে লিখিয়া জগদানন্দের হাতে দিয়া বলিলেন “প্রভুকে দিও”। দুই জনে প্রসাদ ও পত্রী লইয়া বাসায় প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, মুকুন্দ দত্ত দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জগদানন্দের হাত হইতে পত্রীখানি লইয়া পাঠান্তে বাহিরের ভিতের গায়ে শ্লোক দুইটী লিখিয়া রাখিলেন। পরে জগদানন্দ পত্রী লইয়া মহাপ্রভুকে দিলে তিনি পাঠ করিয়া বিরক্তি সহকারে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন; তাহারা ভিত্তির লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কণ্ঠস্থ করিলেন, ও সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। শ্লোক দুইটী এই :—

"বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তি যোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ;
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী
কৃপাম্বুধি র্য স্তমহং প্রপদ্যে।"
"কালান্নষ্টং ভক্তি যোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণ চৈতন্য নামা
আবির্ভূত স্তস্য পদারবিন্দে,
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।"

যে অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ, বৈরাগ্য বিদ্যা ও ভক্তি যোগ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে দেহধারী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই কৃপানিধির আমি শরণাপন্ন হই।

কাল দোষে নষ্ট নিজ ভক্তি যোগ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম ধারী হইয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন; তাঁহার পদারবিন্দে চিত্তভৃঙ্গ গাঢ় রূপে অধিষ্ঠান করুক্।

কথা কিছু অসংলগ্ন হইয়া উঠিল। গৌরের অসামান্য প্রতিভা ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানময়ী শাস্ত্র ব্যাখা শুনিয়া পরাজিত ও মুগ্ধ হইয়া যিনি ষড়্ভুজ দেখিতে পাইলেন ও ঈশ্বর জ্ঞানে শত শ্লোকে গৌরচন্দ্রের কতই স্তব করিলেন; তাঁহার রচিত উপরোক্ত শ্লোক দুইটী দেখিয়া চৈতন্য দেব বিরক্তি সহকারে কেন ছিঁড়িয়া ফেলাইলেন, তাহা বুঝা যায় না। পত্র ছিঁড়িয়া ফেলার যদি কিছু অর্থ থাকে ত সে এই যে, উহাতে গৌরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। গৌরচন্দ্র আপনাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণা করেন। কিন্তু যদি তিনি ঘৃণা করিয়া পত্রই ছিঁড়িয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বে শত শ্লোকে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতে অনুমোদন করা সম্ভব হয় না। আর যিনি ঈশ্বরাবতার রূপে বর্ণিত হইতে সঙ্কুচিত হন, তিনি ঈশ্বর পরিচায়ক ষড়্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন, ইহাও অসম্ভব কথা।

তাইতে মনে হয়, ষড়্ভুজ রূপ প্রদর্শন ও ঠিক্ সেই সময়ে সার্ব্বভৌমকৃত শতক রচনা অতিরিক্ত বর্ণনা। পরবর্ত্তী কালে সার্ব্বভৌম শতক রচিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। যাহা হউক, চৈতন্য ভক্তগণ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দুইটী ভক্তের কণ্ঠমণিহার; ইহাতে সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঢক্কা বাদ্যের ন্যায় বিঘোষিত হইয়াছে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ইউরোপীয় মহাদেশ। [১]

(Continent)

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৮৯। আমরা তিন জন ভারতবাসী বেলা ১টার সময় রেলযোগে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া ডোভারাভিমুখে (Dover) যাত্রা করিলাম। অনেক বিখ্যাত পর্য্যটক বলেন, লণ্ডন ও ডোভারের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের ন্যায় সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক, অসমতল শস্য-শোভিত ক্ষেত্র, উদ্যান ও হরিত বর্ণ তৃণাচ্ছাদিত মখমলের ন্যায় কোমল ও পরিষ্কার ভূমিখণ্ড, এরূপ অবিচ্ছিন্ন একটানা ভাবে আর কোথাও দেখি নাই। নিয়মিত সময়ে ডোভরে পঁহুছিয়া তথায় ৭।৮ ঘণ্টা কাল অব-

স্থিতি করত রাত্রি ১০টার পর প্রণালী (Strait of Dover) পার হইবার জন্য জাহাজে উঠি। ডোভর (Dover) ও ক্যালের (Calais) মধ্যে সমুদ্র ২৫ মাইল মাত্র পরিসর। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে সুবিখ্যাত সন্তরক ওয়েব সাহেব (Captain Webb) পূর্ব্বাহ্ন ১০টা ৪ মিনিটের সময় আরম্ভ করিয়া ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এই ১২॥ ক্রোশ সাঁতরাইয়া পার হন।

প্রায় ২ ঘণ্টাকাল জাহাজে কাটাইয়া রাত্রি দুই প্রহরের পর ক্যালে বন্দরে পঁহুছিলাম। ডোভার হইতে ক্যালে উপস্থিত হইলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের বায়ুতে কত খানি প্রভেদ। ঐ টুকু প্রণালী, দুই প্রতিবেশী জাতিকে বিভিন্ন প্রকৃতি করিয়া রাখিয়াছে। ধীর শান্ত অবিচলিত ইংরেজ সমাজ হইতে ঝুপ করিয়া সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, শিথিল ভাবাপন্ন, কোলাহলময় ফরাসি রাজ্যে উপনীত হইলে, সহজেই তারতম্য উপলব্ধি হইবার কথা। লাটিন জাতি মাত্রে (পোর্ত্তুগিজ, স্পেনীয়, ফরাসি, ইতালীয়) অনেকটা আমাদের মত উচ্ছ্বাসাধীন (emotionally effusive)। ডোভরে যেমন চুপচাপ, ক্যালেতে তেমনি হট্টগোল। এমন কি, নবাগত জন বুল পর্য্যন্ত মাটীর গুণে কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত। আট্লাণ্টিক সাগরে ভাসমান এই ক্ষুদ্র দ্বীপ টুকুর যে কি মহিমা, প্রত্যক্ষ না দেখিলে বুঝা কঠিন।

গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, দুই কোণে দুই জন ফরাসি ভদ্রলোক চারি জনের জায়গা জুড়িয়া হাত পা ছড়াইয়া নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। গাড়ী ছাড়িল। গাড়ীতে দুই জন মাত্র ইংরেজ, আর কেহ বুঝিতে না পারে, এই জন্য এক জন ঘুমন্ত ফরাসিকে লক্ষ্য করিয়া অপর ব্যক্তিকে হিন্দিতে বলিলেন, "জারা উন্‌কো তো দেখিয়ে যো কি কোণে মে বয়ঠে হাঁয়।" এই কথায় আমরা তিন জনে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিলে, সম্বোধিত সাহেব, আমাদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। তখন আমরা পাঁচ জন যে এক দেশের লোক, পরস্পরের মধ্যে এই ভাব সংস্থাপিত হইল। কথাবার্ত্তায় জানা গেল, তিনি ব্রহ্ম দেশে জঙ্গল বিভাগে চাকরি করেন, অন্য জন ভারতে কাজ করেন; বোধ হইল সিবিলিয়ান, কারণ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর প্রকৃতি, কেবল ফ্রান্সের হাওয়ায় ও আমাদিগেকে ঠিক চিনিতে না পারিয়া ওরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেন। কোন প্রকারে রাত্রি যাপন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে পারিসে (Paris) উপস্থিত হইলাম। মাসাধিক পারিসে বাস করিয়া প্রদর্শনী (Universelle Exposition) ও নগরের যাহা দেখিলাম, তাহা সম্যক দূরে থাকুক, কিয়ৎপরিমাণে বর্ণনা করাও আমার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। যাহা হউক, যতটুকু পারি, নিম্নে ব্যক্ত করিতেছি।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পারিস নগরে স্থানীয় দ্রব্য জাতের প্রথম প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর ফ্রান্সে ১২টী প্রদর্শনীর ক্রমান্বয়ে অধিষ্ঠানের পর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে সমগ্র পৃথিবীর সামগ্রী প্রথম একত্রিত হয়। ২৩ বৎসর পরে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সুবৃহৎ ট্রোকাডেয়ারো গোল ঘর (Trocadero) নির্ম্মাণ সহ আর একটী উচ্চ শ্রেণীর প্রদর্শনীর পরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ এই মহামহা প্রদর্শনী। বিগত শত বৎসরে ফ্রান্স, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভ্য জগৎ সর্ব্ববিধ উন্নতির সোপানে কতদূর উঠিয়াছে, ইহা তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে

নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া ১৪ই জুলাই তারিখে অদম্য হৃদ্বলের (moral strength) বিপুল তেজের সহিত পারিসের দুর্ভেদ্য খাশ রাজ কারাগার, ভুবন-বিখ্যাত বাস্তীল (Bastille) ধ্বংস পূর্ব্বক, জীবন্ত ভাবে প্রকাশ পাইয়া, ইউরোপীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক জগতে মৌলিক পরিবর্ত্তন আনয়ন দ্বারা নবজীবন সঞ্চারকারী ফরাসি বিপ্লব যথেচ্ছাচার রাজশক্তির মূলে দারুণ কুঠারাঘাত করে। সেই চিরস্মরনীয় ঘটনার শত বার্ষিক উৎসব এই সার্ব্বজনীন প্রদর্শনী, এবং তাহার স্মরণ চিহ্ন উহার শিরোভূষণ এই বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ 'লা তুর এফেল' (La Tour Eiffel)। ৬ খণ্ডে বিভক্ত সমগ্র প্রদর্শনী ২২টী ফটক সহ ১৭৩ একর জমি ব্যাপিয়া বিরাজমান; উত্তরাংশে এফেল স্তম্ভ।

এফেল স্তম্ভ।

এফেল স্তম্ভঃ—ইহার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের উত্তুঙ্গ স্তম্ভহর্ম্ম্যাদির তুলনাই হয় না। নিম্নের তালিকার দ্বারা উহার ভয়নাক উচ্চতা কতক উপলব্ধি হইবে।

পারিসের	এফেল স্তম্ভ	(Eiffel Tower)	৬৫৭	হাত উচ্চ।
আমেরিকার	ওয়াশিংটন স্তম্ভ	(Washington Column)	৩৭০	" "
জর্ম্মণির	কোলোন গির্জ্জা	(Cologne Cathedral)	৩৪৮	" "
ফ্রান্সের	রোয়েন গির্জ্জা	(Rouen Cathedral)	৩৩২	" "
মিসরের	প্রধান পিরামিড	(Great Pyramid)	৩১৯	" "
জর্ম্মণির	ষ্ট্রাসবর্গ গির্জ্জা	(Strasburgh Cathedral)	৩১০	" "
রোমের	সেণ্ট পিটর	(St. Peter's Church)	২৯০	" "
লণ্ডনের	সেণ্ট পল গির্জ্জা	(St. Paul's Church)	২৬৯	" "
পারিসের	ইন্‌ভালিড্‌স্	(Invalides)	২৩১	" "
দিল্লীর	কুতুব মিনার	(Kutub Minar)	১৫৯	" "
পারিসের	নটর ডাম গির্জ্জা	(Notre-Dame)	১৫০	" "
"	পান্থিয়ন	(Pantheon)	১১৬	" "
কলিকাতার	মনুমেণ্ট	(Ochterlony Monument)	১১০	" "

পারিসের এফেল স্তম্ভ কুতুব মিনার অপেক্ষা চারিগুণ ও কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষা ছয়গুণ উচ্চ; কি ভয়ানক ব্যাপার। ইহার নির্ম্মাণে ১৮২০০০ মণ লৌহ, আড়াই লক্ষ পাউণ্ড অর্থ, বিপুলমস্তিষ্ক মহাত্মা এফেলের অঙ্কবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারি, এবং কত শত লোকের নিয়ত আড়াই বৎসর কাল-ব্যাপী মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম ব্যয় হইয়াছে। (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি ভিত্তিস্থাপন হয়, এবং ১লা মে ১৮৮৯ সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হয়)। ভিন্ন মাপ ও গঠনের ১২ হাজার খণ্ড লৌহ ৭০ লক্ষ ছিদ্রে ২৫ লক্ষ পেরেক দ্বারা জোড়া হইয়াছে। পরস্পরের সহিত ঋজু ও পরিমাণ মত ছিদ্র গুলি করিতে এবং ঠিক উহাদের প্রমাণ পেরেক, স্ক্রূপ গজালাদি গড়িতে যে কিরূপ উচ্চশ্রেণীর কারিগরি ও হিসাব কিতাব আবশ্যক হইয়াছে, তাহা অব্যবসায়ী দর্শক সহজে বুঝিতে পারেন

না। তার পর, ঝড় বাতাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য এমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইয়া গাঁথিয়া তুলিতে হইয়াছে যে, দশ দিকের যে দিক হইতে তুমুল তুফান আসুক না কেন, কোন অংশে একটুও ধাক্কা না লাগাইয়া কেবলমাত্র গায়ে হাত বুলাইয়া চলিয়া যাইবে। যতগুলি পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে, এক থোকে বিন্যস্ত করিতে পারিলে মাটী হইতে চূড়ায় গিয়া ঠেকে। সুতরাং সব রকমে সুধীবর এফেল মহাত্মা একটী সুবর্ণ স্তম্ভ খাড়া করিয়াছেন।

গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ১৭৯২ ধাপের গোলসিঁড়ি। অনেকে পদ ব্রজে উঠিতেছেন, কিন্তু অধিকাংশ কলের (lift) দ্বারা উন্নীত হইয়া দুই প্রকার আমোদ সম্ভোগ করিতেছেন। তিন থাকে তিনটী কল, সুতরাং তিনবার তিন স্থানে প্রবেশ ও বাহির হইতে হয়। এত ভিড় যে প্রত্যেক স্থানে দেড়, দুই ঘণ্টা উমেদারী না করিলে কলে প্রবেশ করিতে পাওয়া দুষ্কর।

মাটী হইতে ১২২ হাত উচ্চে ১১০ হাত পরিসরের ৪টী প্রকাণ্ড থিলানের উপর প্রথম তালা * স্থাপিত। প্রথম তালা একখানি গণ্ডগ্রাম বলিলে চলে ;—৪টী হোটেল (Restaurant), প্রত্যেকটীতে ৪০০ লোক বসিয়া খাইতে পারে, এমন ব্যবস্থা। ৪টী বাহিরের খণ্ডে (Gallery) এক হাজার করিয়া লোক বেড়াইতে পারে। দুই হোটেলের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক খণ্ডে ৪০০ লোক ধরে। এই হিসাবে প্রথম তালায় অনায়াসে ৬৪০০ লোকের সমাবেশ হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন মল মূত্র ত্যাগের স্থান, অনেক গুলি দোকান এবং ডাকঘর ও তার আপিস এই থাকে স্থাপিত। এখান হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম, বিশেষ সন্ধ্যার পর দক্ষিণদিকস্থ নীচেকার ভূমি খণ্ডের ছবির নিকট পরীস্থান পরাস্ত মানে ;—নানা বর্ণের মনোহর পুষ্পাদি শোভিত, উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ, সুকোমল তৃনাচ্ছাদিত মাটীতে ঘাসের উপর খুব কাছে কাছে সাজান বৈদ্যুতিক আলোক মালা-পরিবেষ্টিত, নবীন শয্যার ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছক-কাটা ভূমি ; চারিদিকে বহুবিধ বহু সংখ্যক, প্রকাণ্ড, মধ্যম, ছোট পুত্তল সুরুচি অনুযায়ী স্থাপিত, তন্মধ্যে আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সহচর, সহচরী, সাজ সরঞ্জম সহ রমণীরূপে বিরাজমানা ; দীপ্তিমান (chemically illuminated) শ্বেত, পীত, লোহিত, সবুজ নানা রঙ্গের জল প্রস্রবনী বিবিধ প্রকারের ফোয়ারার ক্রীড়া ; চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শ্বেতকায় নরনারীর নিবিড় জনতা ও সুসজ্জিত বৈদ্যুতিক প্রভাযুক্ত প্রদর্শনী গৃহাদি ; এবং ঠিক সম্মুখে যাদুময় ভূমিখণ্ডের অপর প্রান্তে অত্যল্প দূরে, অট্টালিকা সমূহের মধ্যস্থলে তাড়িত আলোকমালা দ্বারা বিশিষ্টরূপে পরিশোভিত কেন্দ্রস্থগৃহ দোম্‌সান্ত্রাল (Dome Centrale) ; বিপরীতদিকে ৫।৬ রশি তফাতে অগণ্য আলোকিত নৌকা, ষ্টিমার, ভাসমান বিহার-ভবন, হোটেল ও স্নানাগার এবং সেতু সমূহ বক্ষে করিয়া আঁকাবাঁকা সেইন নদী (La Seine) প্রবাহিত ; পরপারে ঠিক সম্মুখে, কিঞ্চিৎ দূরে, প্রদর্শনীর অন্তর্গত,

* ইহার গায়ে চারিদিকে বড় বড় উচ্চ অক্ষরে (নীচে দাঁড়াইয়া বেশ পড়া যায়) ব্রোকা (Broca)), ভলটেয়ার (Voltaire), কুবীর (Cuvier), রোসো (Rousseau) প্রভৃতি (৭২ জন) মহামহোপাধ্যায় ফরাসি পণ্ডিতগণের নাম অঙ্কিত। একটীও রাজা, বাদশাহ, উজীর, আমীরের নাম নাই।

ফোয়ারা ঝরণা ও তাড়িত দীপমালা শোভিত ট্রোকাডেয়ারো গোলঘর বিশাল মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান ;— উল্লিখিত সমস্ত দৃশ্য বহু আনুষঙ্গিক (যাহার বর্ণনা এ ক্ষুদ্র কলমে বাহির হইল না) সহ এই ১২২ হাত উচ্চ স্থান হইতে যে কি এক অভূতপূর্ব্ব, অপার্থিব, অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করিতেছিল, তাহা "বাক্যে নাহি বলা যায়", স্মরণে প্রাণ পাগল হয়। ফরাসিদিগের সতেজ, সুপরিস্ফুট, সৌন্দর্য্যানুভব বৃত্তি (wonderfully developed æsthetic faculty) ও শোভাপ্রিয়তার বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারেন, সুন্দর জিনিস মনোহর ভাবে সাজাইয়া দর্শকের চিত্ত হরণ করিতে উঁহারা কেমন পটু। ফরাসি হিসাবে সাজাইবার তারিফের কিঞ্চিৎ পরিচয় জুবেয়ার মহাশয় (M. Joubert) ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের কলিকাতা প্রদর্শনীতে দিয়া আসিয়াছেন। বিদেশীয়ের ব্যাপারে এক জন সাধারণ সাজ-শিল্পী যেরূপ হাত দেখাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা পাঠক মহোদয় কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন, বহু বড় বড় শিল্পকুশল বিখ্যাত কারিকর দ্বারা নিজের দেশে নিজেদের সর্ব্বপ্রধান ব্যাপারে কতদূর উচ্চশ্রেণীর নিপুণতা ব্যবহার দ্বারা অনুপম শোভা সম্পাদন করত চূড়ান্ত বাহাদুরী প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাদের হাতে যেমন তেমন জিনিষ কেবল সাজানের গুণে বিলক্ষণ সৌষ্টব প্রকাশ করে; এখানে ত সবই সুন্দর, আবার যথাসাধ্য সুন্দরভাবে সাজান। যে বন্ধুচয় সহ একত্রে এই মহাব্যাপার পরিদর্শন করিয়াছি, তাঁহারা এই দুর্ব্বল লেখনী প্রসূত বর্ণনা পাঠে বেশ বুঝিতে পারিবেন, ক্ষমতার অভাব হেতু শতাংশের একাংশও বর্ণনা করিতে পারিলাম না। সেই অনুপম লাবণ্যের ভাব হৃদয়ে প্রস্তরাঙ্কিত রহিয়াছে, বাহিরে দেখাইবার শক্তি নাই; কি করিব? কবি কন্‌গ্রিবের (Congrieve) সঙ্গে এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইতে হয়।

"Hard is the task, and hold the advent'rous flight,
"Of him, who dares in praise of beauty write;
"For when to that high theme our thoughts ascend,
"'Tis to detract, too poorly to commend."

আপশোষ এই যে ভারতের শতাধিক লোকও দেখিতে পাইল না। যাঁহারা ইংলণ্ডে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ যান নাই। হায়! হায়! এ জীবনে আর ওরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইব না, এই দুঃখ। আমেরিকানেরা ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে টক্কর দিয়া মহামেলা করিবে, কিন্তু আট্‌লাণ্টিক পারে ফরাসি বাহার কোথায়, এবং ওরূপ সাজাইবে কে? ফরাসিদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, "সংসারে একটীমাত্র পারিস," (Il n'y a qu'un Paris dans le monde) দ্বিতীয় অসম্ভব।

—Qun a vis Paris
A ren vis.

অর্থাৎ যে পারিস দেখে নাই, সে কিছুই দেখে নাই। ইহা পক্ষপাতের কথা নয়, প্রকৃত পক্ষেই তাই। ইংরেজ ও মার্কিন পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া স্বীকার করেন "Paris is the pleasure garden of the world":—পারিস পৃথিবীর প্রমোদ-কানন *। তাই বলি, আবার যদি কখন ফরাসিরা "এক্স্‌পোজিসিওঁ" দেখায়, তবেই জগতের লোক পুনরায় নয়ন মন তৃপ্ত করিয়া সুখী হইবে।

* ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বহুদেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মধ্যে মধ্যে পারিসে আমোদ করিতে আসেন। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স প্রত্যেক বৎসর যান।

প্রথম তালা হইতে আর একটী কলে উঠিয়া দ্বিতীয় তালায় যাইতে হয়। দ্বিতীয় তালা ২৫০ হাত উচ্চে। এখানেও অনেক গুলি পানাহারের ঘর (refreshment bars) ও ফিগারো (figaro) নামক সচিত্র সংবাদ-পত্রের(Illustrated Newspaper)ছাপাখানা, এবং কতকগুলি দোকান। এই স্থানে ১৫০০ লোকের সহাবস্থানের ব্যবস্থা। এখান হইতে চারি দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, কিন্তু অস্পষ্ট; নীচেকার দৃশ্য অদ্ভুত, অবর্ণনীয়।

ত্রিতল ৫৭৬ হাত উচ্চে। এখানে ৫০০ লোকের স্থান হয়।* ডাকঘর তার আপিস ও কয়খানি দোকান আছে। এখান হইতে চারি দিকে ৪০ ক্রোশ নজর যায়, কিন্তু নিতান্ত অস্ফুট। ইহার উপর ৮১ হাত উচ্চে চূড়া (campanile)। সেখান পর্য্যন্ত উঠিতে গেলে এফেল সাহেবের অনুমতি লইতে হয়। এই ৮১ হাতের মধ্যে ৪র্থ স্তবকে তাঁহার আপিস ও তিনটী বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রকোষ্ঠ (laboratory)। একটী জ্যোতিষের (Astronomy); অপরটী চিকিৎসা শাস্ত্র (Physic) ও আকাশতত্ত্ব (Meteorology); তৃতীয়টী জীবতত্ত্ব (Biology) ও বায়ুবিজ্ঞান (Micrografic study of the air) সম্বন্ধীয়। আকাশ ও বায়ু পরীক্ষার এমন উপযোগী স্থান এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই; এ যাবত যত উচ্চে প্রক্রিয়াদি হইয়াছে, কোথাও সম্পূর্ণ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যায় নাই; মহোচ্চ পর্ব্বত শিখরেও উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা সমুদ্ভূত বাষ্প সংশ্রব দোষ এড়াইতে পারা যায় না।

চূড়াখণ্ড বা কাম্পানিলের শিরোদেশে ও অভ্যন্তরে দুইটী প্রকাণ্ড তাড়িত দীপ। এই আলোক** ২০ ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহাতে ৭ মাইল দূরস্থিত সঁজার্মাঁ-অঁ-লা (Saint Germain-en-Laye) নগরের রাজপথে সংবাদপত্র পড়িতে পারা যায়। প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার পর বেশ অন্ধকার হইলে ১৫ মিনিটের জন্য সমস্ত স্তম্ভ রক্তবর্ণ বহ্নি (Bengal Lights) দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয়।

সর্ব্বোপরি স্তম্ভ শিখরে ফরাসি সাধারণ তন্ত্রের (Republique Francaise) স্বাধীনতা (Liberte), সাম্য (Egalite), ও ভ্রাতৃভাব (Fraternite) ব্যঞ্জক ত্রিবর্ণ (tricolor) পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান। ইহা লক্ষ্য করিয়া ফরাসি বিজ্ঞান সভার (Academie Francaise) সভ্য কবিবর সলি-প্রুধোম (Sully-Prudhomme) বিজ্ঞান সমিতির ভোজের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক ফরাসির গৌরব বোধ করা উচিত যে, পৃথিবীর সকল দেশের পতাকা অপেক্ষা ফরাসি পতাকা বহু উচ্চে উড্ডীয়মান। ইহা দ্বারা আমাদের শৌর্য্য বীর্য্যের না হউক, অদম্য উচ্চাশার পরিচয় দেয়, সন্দেহ নাই।"

এফেল স্তম্ভ হইতে দেশ সম্বন্ধে চর্ম্ম চক্ষুতে যেমন বহুদূর দেখিতে পাওয়া যায়, কাল সম্বন্ধেও তদ্রূপ মানসনয়নে পশ্চাতের শতাব্দিব্যাপী ভূত-তমসাবৃত্ত জ্বলন্ত ব্যাপার সকল দৃষ্ট হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাস্তীল

* সুতরাং উঠন্ত মানুষ ও কর্ম্মচারী পরিচারকাদির সংখ্যা (২০০০) শুদ্ধ একত্রে দশ হাজার লোক স্তম্ভে বিচরণ করেন। একটী ছোট খাট নগর বলিলেই চলে।

"** It represents the transmuted energy of engines of 500 horse power." Stead.

ধ্বংসের সঙ্গে "৮৯র সাম্যনীতির" (Le-principes de'89) অভ্যুত্থান, জাতীয় সভা (L'assemblee National) সংস্থাপন, সকল মনুষ্যের সমান সত্ব সম্বন্ধীয় বিস্তারিত ঘোষণা (Declaration des droits de C'homme); ১৭৯০ :—সমাজের উচ্চ-নীচ বিভাগ নিরসন (Abolition de la noblesse); ১৭৯১ :—রাজপ্রস্থান ও বন্দীভাবে পুনরাগমন; ১৭৯২ :—দাঁতঁ (Danton), মারা (Marat) ও রোব্স্পিয়রের (Robespierre) অভ্যুদয় ও প্রাধান্য, রাজপদের প্রত্যাখ্যান (Abolition de la royante), বিখ্যাত সেপ্টেম্বর হত্যা, ১৩০০ সহস্র নরবলি; ১৭৯৩ :—সিংহাসনচ্যুত রাজা ষোড়শ লুইয়ের বিচার ও প্রাণদণ্ড, নররাক্ষস মারাবধ এবং তৎসঙ্গে অনুপম রূপ যৌবন ও সুমহোচ্চ হৃদয়-বিশিষ্টা মারাহন্তা দেবী কুমারী কর্দের (Charlotte Corday) বিচার ও প্রাণদণ্ড, নিরাশ্রয়া বিধবা রাজমহিষীর মেম্বর হেবেয়ার (Nebert) কর্ত্তৃক অপমান, অন্যায় বিচার ও প্রাণদণ্ড, প্রকৃত দেশহিতৈষী প্রধান দ্বাবিংশতি *(Girondins) নিধন, অতুল রূপলাবণ্যসম্পন্না, বিদ্যাবতী, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা সাধ্বী রোলাণ্ড-পত্নীর (Madame Roland) প্রতি অন্যায় অত্যাচার ও প্রাণদণ্ড; ১৭৯৪ :—ভ্রাতৃ-শোণিতপিপাসু দুরাত্মা হেবেয়ার, দাঁতঁ ও রোবস্পিয়রের ক্রমান্বয়ে প্রাণদণ্ড ও বিপ্লবের বলহ্রাস; ১৭৯৫-৯৭ :—নেপোলিয়নের ক্রমোন্নতি :—১৭৯৮, আলী † বোনাপার্টের মিসর লীলা;—১৮০৪ নেপোলিয়ন সম্রাট; ১৮১২ মস্কো (Moscow) বিভ্রাটের পর সিংহাসনচ্যুতি ও এল্‌বা (Elba) প্রয়াণ; ১৮১৫ :—পুনরাগমন, শত দিবসব্যাপী (The Hundred day) ব্যাপার ও নেপোলিয়ন রবির চির অস্ত; অষ্টাদশ] লুইর পুনরাবির্ভাব; ১৮৪৮ :—দ্বিতীয় বিপ্লব ও লুই নেপোলিয়নের অধীনে দ্বিতীয়বার সাধারণ তন্ত্র স্থাপন; ১৮৫২ :—জ্যেষ্ঠতাতের পদানুসরণ দ্বারা ক্রমে তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে সিংহাসনাধিকার; ১৮৭০ :—জর্ম্মানদের সহিত যুদ্ধ ও আত্মসমর্পণ; ইহার ৪ দিন পরে তৃতীয় সাধারণ তন্ত্র স্থাপন; ১৮৭০-৭১ :—দুই বারে ৫ মাস ব্যাপী জর্ম্মান সৈন্য কর্তৃক পারিস বেষ্টন (seige) ও অধিবাসীগণের নানা প্রকারে দারুণ অভাব ও ক্লেশ; সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপন; মোসিও টিয়ার্সের (M. Thiers) শাসন হইতে আরম্ভ করিয়া মাক মেহন (Mac Mahon) গাম্বোটাদির (Gambetta) প্রাধান্য ও বর্ত্তমান সময়ের মহাত্মা কার্ণোর (M. Carnot) সভাপতিত্ব;—এই সকল ঘটনা জীবন্তভাবে মানসিক দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আনয়ন করে। বাস্তবিক কলিযুগে বিধাতার বিশেষ বিধান স্বরূপ ফরাসিবিপ্লব তুমুলকাণ্ড যেমন সভ্য জগতের ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় ব্যাপার, তৎ স্মরণ চিহ্ন অতুল কীর্ত্তিস্তম্ভ, অভ্রভেদী এফেল টাওয়ারও তেমনই তাহার উপযুক্ত।

* ইঁহারা বলিদানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশের হিতকামনায় প্রফুল্লচিত্তে সমস্বরে গান গাইয়াছিলেন।

†মুসলমানদের প্রীত্যর্থ এই নাম গ্রহণ করা হয়; উঁহাদের হৃদয়াধিকার উদ্দেশে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের নিন্দা করিতেও ত্রুটি করিতেন না।

মহারাজা দলীপসিংহ।

এফেল স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী একটী হোটেলে দৈবসংযোগে বিখ্যাত সোবরাঁও সমরক্ষেত্রের সজীব ধ্বংসাবশেষ পঞ্জাবকেশরী প্রবল

পরাক্রান্ত নরপতি রণজিৎ সিংহের পুত্র 'মহারাজা' দলীপসিংহের সহিত পরিচয় হইল। ইঁহাকে প্রদর্শনীর অন্তর্গত করিয়া লওয়া, কোনরূপে অসঙ্গত হয় না। যে প্রদর্শনী বিশ্বসংসারের জড়, চেতন, স্থাবর, জঙ্গম, উদ্ভিদাদি নানা প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার একত্রিত করিয়া বহুবিধ বিষয়ে অসংখ্য উপায়ে পৃথিবীকে বিবিধ জ্ঞান বিতরণ করিতেছে, তাহাতে সিংহাসনচ্যুত শিখরাজকে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অস্থৈর্য্য-বিজ্ঞাপক জীবন্ত বিদ্যমান সাক্ষীরূপে জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিলে বিশেষ শিক্ষা লাভেরই কথা। সুতরাং একজিবিশনের সকল দৃশ্যের মধ্যে ইঁহাকে একটী প্রধান দৃশ্য গণ্য করিতে হয়। ইনিও প্রতিষ্ঠাবধি নিয়মিতরূপে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই নির্দ্দিষ্ট হোটেলের (Spiers and Pond's Grillroom) বারাণ্ডায় সস্ত্রীক বা বন্ধুবান্ধব সহ আরামের সহিত বসিয়া আহারাদি করেন। এটী ইংরেজের হোটেল, এখানে ভারতীয় বাটিকায় (Le pavillon Indien) নিযুক্ত কলিকাতার খানসামা দ্বারা প্রস্তুত পোলাও প্রভৃতি ইচ্ছা করিলে পাওয়া যায়; তাই রোজ এই খানেই আহার করেন। সাক্ষাতের পর দিন আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ দ্রব্যাদি দ্বারা পরিতোষ করত থিয়েটারে লইয়া যান। আরও কয়দিন দেখা হয়, এবং এক দিন বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ করি; সেই দিন ভারতেশ্বরীর নিকট পত্র এবং শিখদিগের প্রতি ঘোষণাপত্রের (manifesto) মুদ্রিত নকল ও তাঁহার হীরামাণিকমুক্তা-শোভিত রাজবেশের ফটোগ্রাফ দেন। প্রথম স্ত্রীর বিয়োগে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন; ইনিও ইংরেজ মহিলা। 'মহারাণী'র কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, উঁহার মত নয় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পুনর্ম্মিলিত হন।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে ইংলণ্ডে ফিরিতে পরামর্শ দেওয়ায় দলীপসিংহ বলিলেন "আল্‌জিয়র্স (Algiers) দেশে এক পয়সার একখানা রুটি খাইয়া অজ্ঞাতবাসে দিন যাপন করিব, তবু ইংরেজের অর্থ আর গ্রহণ করিব না।" এ সকল বাতুলের কথা, এরূপ "চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া", দারুণ পাগলামি বই কি? তাঁহার পঞ্জাব পুনঃ প্রাপ্তির প্রয়াস, "মুণ্ডমালার দন্তবিকাশ, খেলারামের ভারত উদ্ধার," বামনের চাঁদে হাত দিবার প্রয়াস মাত্র। এরূপ জাগন্ত স্বপ্ন যেন কোন মানুষকে আচ্ছন্ন না করে। পশ্চিমের সূর্য্য পূর্ব্বে গেলেও বর্ত্তমান রাজদণ্ড টলিবার নয়। নিজেও বলিলেন, রুশিয়া, ফ্রান্স তাঁহাকে কণিকামাত্র আশা ভরসা দেওয়া দূরে থাকুক, ইঙ্গিতে ব্রিটিশ সিংহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের পরম মঙ্গল হেতু বিধাতার বিশেষ বিধানে জন বুল ভারত অধিকার করিয়াছে, এবং এখনও বহুকাল অক্ষুণ্ণভাবে ভোগ করিবে। বিধিলিপি মনুষ্য কি প্রকারে খণ্ডন করিতে পারে! পাঠক মহোদয়, ভাবিয়া দেখুন, ভারতীয় রাজার অধীন হইয়া পুনরায় দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চাদ্‌গমনাপেক্ষা ভীষণতর নরকভোগ আমাদের পক্ষে আর কি হইতে পারে! চারি লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি রণজিৎ পুত্রের পক্ষে যৎসামান্য হইতে পারে, কিন্তু যখন এই ৩৭।৩৮ বৎসর কাল উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কাটাইয়াছেন, এখন আপত্তি করিলে ফল কি? উপযুক্ত পুত্রদ্বয় ত তাঁহার অনুগামী হয় নাই; মাতৃহীন কন্যা দুইটী অল্প বয়স্কা, অবলা,

কাজেই পিতার সঙ্গে রহিয়াছে। মহারাজের বাল্যকালের অভিভাবিকা সহৃদয়া উচ্চমনা লেডি লোগিন (Lady Login) বলেন, তাঁহার প্রতি ন্যায় ব্যবহার হয় নাই, এবং তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত। আমরাও কোমল হৃদয়া দয়াবতীর সঙ্গে সন্তপ্ত; কিন্তু উপায় কি? তাঁহার বর্ত্তমান উদ্যোগের সহিত সহানুভূতি কেহই প্রকাশ করেন না; আমরাও উহাকে সম্পূর্ণ বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ বলি। যে শাসন প্রণালীতে "রাজার মা" বাস্তবিকই "ভিক্ষা মাগে",—স্বয়ং ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অধীশ্বরীকে পুত্র পৌত্রের ভরণ পোষণের জন্য "Honorable Guardians of the National purse" "জাতীয় ধনভাণ্ডারের মান্যবর অভিভাবকগণ সমীপেষু" বলিয়া কমন্স সভায় আবেদন করিতে হয়, এবং বহু ওজর আপত্তি তর্ক বিতর্কের পরে অতি কষ্টে প্রার্থনা খণ্ডিত ভাবে (conditionally) গ্রাহ্য, সেখানে আমাদের বাতীল 'মহারাজের' তামাদী দাবী কি আশা করিতে পারে, সহজেই বুঝা যায়। দশ জনের পেট কাটিয়া এক জনের ভুঁড়ি পূরণ, আর অধিক দিন চলিতে পারে না। "Laborare est orare" (শ্রমই পূজা) মহামন্ত্রে সংসারের আপাদমস্তক সকলের দীক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

যাহা হউক, মহারাজের নিকট একটা বিশেষ বিষয়ের পরিচয় পাইয়া বড় সুখী হইয়াছি। ১২ বৎসর বয়সে পঞ্জাবের রত্নসিংহাসন হইতে নামিয়া ইংলণ্ডের স্কুল-ছাত্র হন; এখন বয়স ৫০।৫১; এ যাবতকাল প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি বড় বড় লোকের সংসর্গে বরাবর ইংরেজ মহলেই ফিরিয়াছেন; সুতরাং মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার অবকাশ খুব কম পাইয়াছেন; অথচ পরিষ্কার হিন্দীতে কথা কহেন, এমন কি "ফলান ঢেকান" পর্য্যন্ত বিস্মৃত হন নাই। আর আমাদের দেশীয় ভ্রাতারা তিন দিন তাপসের জল খাইয়া মাতৃভাষা সম্বন্ধে একেবারে তমসাচ্ছন্ন হন। বড় দুঃখের বিষয়, বড় লজ্জার কথা। স্বদেশ ও মাতৃভাষা সহজে ভুলিবার সামগ্রী নয়। যিনি সহজে এই দুইটি বিস্মৃত হন, তাঁহাকে ঘোর বিকারগ্রস্ত জানিতে হইবে। [ক্রমশঃ]

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

আজ কারে মনে হয়?

(১)

আজ কারে মনে হয়?
মেঘে মাথা দশ দিশি, ভেদ নাই দিবানিশি
অবিরল ঝরে জল অন্ধকারময়!
আজ কারে মনে হয়?

(২)

চপলা চমকে ঘন,
ঘন ঘন গরজন,
কে জানে আমার কেন আঁখি জলময়!
আজ কারে মনে হয়?

(৩)

ভিজিতেছে তরুলতা,
কাঁপিতেছে ফুল পাতা,
নীরব নিঝুম এই উপবনময় !
আজ কারে মনে হয় ?

(৪)

পিছনে ধানের খেত্;
বেঙ্ ডাকে গেঁত্ গেঁত্,
ভাসিয়া যেতেছে মাঠ জলে জলময় !
আজ কারে মনে হয় ?

(৫)

সমুখে পুকুরে জল,
কুমুদ কহ্লার দল,
ভাসিয়া রয়েছে তাহে রক্ত কুবলয় !
আজ কারে মনে হয় ?

(৬)

বাগানের এক পাশে,
কেতকী কুসুম হাসে,
ভাদরে বিদেশী যেন বিদরে হৃদয় !
আজ কারে মনে হয় ?

(৭)

'মেউয়া' ডাকে 'পিপী' ডাকে,
বক উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
দিক্‌বালা পরিয়াছে রজত বলয় !
আজ কারে মনে হয় ?

(৮)

একটু দেখিনা আলো,
আকাশ তরল কালো,
অনন্ত গলিয়া যেন গেল সমুদয় !
আজ কারে মনে হয় ?

(৯)

ভিজা বুক ভিজা মন,
ভিজে গেছে দু'নয়ন,
সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ ভিজা সমুদয় !
আজ কারে মনে হয় ?

(১০)

—বনবাসে,
ভাদর মাসে,
বরষা দিনে একা এ সময় ?
আজ কারে মনে হয় ?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস

সুখ ও দুঃখ।

পৃথিবীর যে দিকে চাই, সে দিকেই আমরা দুইটী অবস্থা দেখিতে পাই। চঞ্চল পৃথিবীর পরিবর্ত্তন নিয়তই চলিতেছে;—এক দিকে ভাঙ্গিতেছে, আর একদিকে গড়িতেছে। সমুদ্র মধ্য হইতে দৈবাৎ পর্ব্বত উৎপন্ন হইতেছে, আবার দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ ফল পুষ্প সমন্বিত ভূমিখণ্ড জলগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। যখন গোধুলিকালে আকাশের দিকে সমুদ্রবক্ষ হইতে দৃষ্টিপাত করি, তখন একটীর পর একটী করিয়া নানা রঙ্গে রঞ্জিত কত প্রকার সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাই। সে সকল কবিরাও বর্ণনা করিতে পরাস্ত হইয়া যান। আবার যখন সেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঘোর ঘনঘটায় পূর্ণ হয়; সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ সকল ক্রীড়া করিতে থাকে এবং প্রবল বেগে বহিয়া উহাদের মধ্যে ভীষণ রূপ

আনয়ন করে, তখন সেই সকল পরিবর্ত্তন কি বিস্ময়কর বোধ হয়! বাহ্য প্রকৃতির সহিত আমাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া আমরা এই সকল পরিবর্ত্তনে কখন সুখ, কখন দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। এই সুখ দুঃখ মনুষ্যের শিক্ষা ও মনের গঠনের ইতর বিশেষের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। সাধারণত লোকে আলোক ও সুন্দর দৃশ্য হইতে সুখ পাইয়া থাকে, কিন্তু চিন্তাশীল মনুষ্যেরা অন্ধকার ও পৃথিবীর ভীষণ পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহাদের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া এক প্রকার সুখ সম্ভোগ করেন। সুখের অর্থ অমিশ্র সুখ নহে, কেননা পৃথিবীতে তাহা মনুষ্যের ভাগ্যে ঘটেনা। অবস্থা বিশেষে এক জনের সু[illegible] এক জনের দুঃখে এবং এক জ[illegible] জনের সুখে পরিণত হয়। [illegible] যন্ত্রণার অংশ অল্প হইলেই আ[illegible] অবস্থা বলি। সন্তোষকর সুখপ্রদ সা[illegible] সঞ্চয় ও অসন্তোষকর দুঃখজনক সামগ্রী দূরীকরণে মনুষ্য সর্ব্বদা ধাবিত হইতেছে। আমাদের মনোমধ্যে সুখ-দুঃখ-বোধ নামে যে দুইটী বৃত্তি আছে তাহার একটী অর্থাৎ সুখ-বোধ বৃত্তিকে আমরা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে চরিতার্থ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং দুঃখ-বোধ বৃত্তিকে একেবারে বিনাশ কবিতে এবং উহার উত্তেজক পদার্থ অপসারিত করিতে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকি।

সুখ দুঃখকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, —শারিরীক ও মানসিক, কতকগুলি নিবার্য্য, কতকগুলি অনিবার্য্য। কতকগুলি আমরা স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া থাকি; কতকগুলি আমাদের জীবন ধারণের আনুষঙ্গিক নিয়ম বলিলেই হয়. কেন না, সেই সকল ভিন্ন আমাদের জীবন রক্ষা কখন সম্ভবে না। মানসিক উন্নতি ও অবনতিতে যে সুখ ও দুঃখ, তাহা আমাদের সৃষ্ট; সদ্‌গ্রন্থ পাঠে যে সুখ এবং তাহার অভাবে যে দুঃখ, তাহা এই শ্রেণীর। ক্ষুৎপিপাসার পরিতৃপ্তিতে যে সুখ এবং তাহার অতৃপ্তিতে যে দুঃখ, তাহা আমাদের জীবন ধারণের আনুষঙ্গিক নিয়ম। সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া আমরা অনেক প্রকার কৃত্রিম সুখ দুঃখের সৃজন করিয়াছি। সাধারণত নিম্নলিখিত অবস্থায় আমরা সুখ পাই, যথা—পেশী সঞ্চালন, পরিশ্রমের পর বিশ্রাম, ইন্দ্রিয় সকলের সুস্থ অবস্থা, পরিমিত ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ; ক্ষুৎপিপাসার পরিতৃপ্তি, মিষ্ট আস্বাদ, সুগন্ধ আঘ্রাণ, কোমল ও ঈষদুষ্ণ বস্তুর স্পর্শ; তাল মান সমন্বিত শ্রুতিমধুর শব্দ, নানা বর্ণে রঞ্জিত দৃশ্য সকল, আলোক, [illegible]দ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ, আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন, কোমল বৃত্তি সকলের পরিচালনা, দাম্পত্য প্রণয়, মাতৃ ও পিতৃ স্নেহ, বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা ভক্তি, আত্ম প্রসাদ, প্রশংসা, শক্তি, প্রভুত্ব, আধিপত্য, প্রতিশোধ পাইবার ক্ষমতা, জ্ঞান, মানসিক শক্তি সঞ্চালন, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, কবিতা, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, সহানুভূতি, নীতি ও জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, সমাজ, জীবন ধারণ ইত্যাদি। নিম্নলিখিত অবস্থায় আমরা ক্লেশ, দুঃখ বা যন্ত্রণা পাইয়া থাকি, যথা, পেশীর ক্লান্তি, শরীরের কোন যন্ত্রের বিকার এবং রোগসমূহ; শীতলতা, বিস্বাদ, দুর্গন্ধ, অন্ধকার, অত্যন্ত আলোক, ইন্দ্রিয় সুখের অতৃপ্তি; স্বাধীনতার পর রুদ্ধ অবস্থা, সকল প্রকার ভয়, শোক, স্নেহ ও ভালবাসার সামগ্রী হইতে বিচ্ছেদ, লজ্জা প্রাপ্তি, অবিচ্ছেদে এক রূপ অবস্থায় থাকা, আত্ম অবনতি ও অপমান,

শক্তিহীনতা, দাসত্ব স্বীকার, প্রতিশোধ লইতে অপারগ হওয়া, অজ্ঞানতা, কদর্য্যতা, অসুস্থতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মূর্খতা, নীচতা, মৃত্যু ইত্যাদি। এই সুখ দুঃখের অবস্থা হইতে কেহ ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ রূপে উহাদের অতীত হইতে পারেন না। ইচ্ছা করিলে আজীবন কেহ দুঃখ ভোগ করিয়া কাটাইতে পারে না; তাহাকে কিছু না কিছু সুখের অংশ লইতেই হইবে। সেই রূপ দুঃখও মনুষ্যের অনিবার্য্য ঘটনা। অসম্পূর্ণ মনুষ্য, কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন না! পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় দুঃখ যন্ত্রণার অতীত হওয়া মনুষ্যের পক্ষে প্রার্থনীয় কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। অনেকে হয়ত এ কথা শুনিয়া হাসিতেছেন; অথবা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদিগের ইহা প্রলাপবাক্য বলিয়া উপহাস করিতেছেন। এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা পৃথিবীতে এই দুঃখের অস্তিত্ব আছে বলিয়া ঈশ্বরের তিনটী স্বরূপে সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর একাধারে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময় হইতে পারেন না। তিনি দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান হইলে কেন জীবের দুঃখ দেখিয়া মোচন করেন না? আর সর্ব্বজ্ঞ হইলে তিনি কেন পৃথিবীকে এরূপ ভাবে সৃজন করিলেন না, যাহাতে জীবগণ দুঃখের অতীত হইত? ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, হয় তিনি নির্দ্দয়, নয় তিনি জীবের দুঃখের প্রতি উদাসীন। পৃথিবীর গঠন প্রণালী যেরূপ দেখা যায়, তাহা হইতে অন্যরূপ ঈশ্বর কেন করিলেন না, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। তবে আমরা এ কথা বলিতে পারি যে, পৃথিবী যেরূপ সৃজিত হইয়াছে ও ক্রমান্বয়ে সৃজিত হইয়া আসিতেছে, (আমরা এরূপ বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর সৃজন ক্রিয়া প্রত্যহ চলিতেছে) তাহাতে বর্ত্তমান সুখ দুঃখের অবস্থা জীবন রক্ষার্থে নিতান্ত প্রয়োজন।

উক্ত মতাবলম্বীদের মধ্যে জনষ্টুয়ার্ট মিল এক জন প্রধান। মনে করা যাউক, আমরা সর্ব্বশক্তিমান, দয়াশীল ঈশ্বরের সহিত জগতের সুখ দুঃখের অস্তিত্বের সমন্বয় করিতে আপাতত অক্ষম। কিন্তু সেই জন্য কি ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইবে যে, পৃথিবীতে এমন কোন সত্য নাই, যদ্দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময় স্বরূপের সহিত সুখ দুঃখের অস্তিত্বের কোন সমন্বয় আদৌ হইতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমানের অর্থ কি? যে শক্তি দ্বারা সকল বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, অথবা সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাকে সর্ব্বশক্তিমান ক্তি বলা যায়। এবং যাহা কিছু চিন্তার সম্ভব হয়, তাহাই বস্তু বা কার্য্য বলা যায়। কিন্তু পানদোষ-শূন্য মাতাল, সাধু চোর, চতুর্ভুজ সমন্বিত পঞ্চভুজ, দুই পার্শ্বের পর্ব্বত শূন্য উপত্যকা, ইত্যাদি আমাদের চিন্তায় সম্ভব হয় না। যদি কেহ বলেন, ঈশ্বর একটী ত্রিভুজ দুইটী সরল রেখার দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি শক্তিহীন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অজ্ঞান বা বাতুল ভিন্ন অন্য কিছু মনে করি না। যেমন দুইটী সরল রেখার দ্বারা একটী ত্রিভুজ নির্ম্মাণ সম্ভব নহে, সেইরূপ সুখোৎপত্তির উপাদান যে দুঃখ হইতে পারে না, এ কথা কে সপৎ করিয়া বলিতে সাহসী হইবেন? সুখ দুঃখের সহিত এরূপ সম্বন্ধ থাকা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমানতা স্বরূপ তাঁহার দয়ার ন্যায় অন্য স্বরূপ দ্বারা বিধিবদ্ধ নহে, তাহা কে বলিতে পারে? ইহা ধ্রুব সত্য যে,

ঈশ্বর তাঁহার বৃত্তের পরিধির সকল স্থানেই সৎ।

স্কোপেনহার, হার্টম্যান ও লিওপারডাই প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পৃথিবী কেবল দুঃখের আগার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। দুঃখ ও নৈরাশ্যের প্রাদুর্ভাব, রোগের আধিক্য এবং যন্ত্রণার সর্ব্বব্যাপিত্ব দেখিয়া পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি প্রায় সকলেই অসন্তুষ্ট, সুতরাং দুঃখই পৃথিবীর আদি ও অন্ত, এই মত প্রচারিত হইয়াছে। দুঃখবাদীদের অন্তত একটী মত ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা যে সকল দুঃখ, যন্ত্রণা ও অশুভ ঘটনার উপর আপনাদের ভিত্তিস্থাপন করেন, সেই সকলই অনেক সময় মানবের হিত সাধন করিয়া থাকে, ইহা কেবল কথার কথা নহে, অথবা ঈশ্বরানুরাগী ধার্ম্মিকদের হৃদয়ের ভাব নহে। যতই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা ও চিন্তা করি, ততই আমরা দেখিতে পাই যে, অমিশ্র অশুভের অস্তিত্ব নাই। ঘোর বিপদের মধ্যে আমরা কিছু না কিছু শুভ দেখিতে পাই। এবং ইচ্ছা করিলে দুঃখকে আমরা সময়ে সময়ে সুখে পরিণত করিতে পারি। স্পেন্সার তাঁহার First Principles of Riligion and Science নামক পুস্তকেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রবল ঝড়, ধ্বংশের অবতার। ইহার অনিষ্টকারী শক্তি সকলেই বিদিত আছেন। কিন্তু এই ঝড়ের আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে আমরা কতক শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। ইহার দ্বারা বায়ু পরিষ্কৃত হয়, রোগ নিবারিত হয়, এবং ফল সস্য উৎপাদনকারী বৃষ্টি হইয়া থাকে। যন্ত্রণা ও কষ্ট যদিও সর্ব্বব্যাপী, তথাচ ইহার মধ্যে আমরা কিছু না কিছু শুভ দেখিতে পাই।

প্রথমত বেদনা বা যন্ত্রণা, আমাদের জীবন রক্ষার্থে বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে। অগ্নির দহনে যদি আমরা জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব না করিতাম, অস্ত্রের দ্বারা আমাদের মাংসবিদ্ধ হইলে যদি আমরা কোন যন্ত্রণা বোধ না করিতাম এবং দুর্গন্ধে যদি আমাদের কোন কষ্ট অনুভব না হইত, তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমান শরীর গঠন লইয়া জীবিত থাকা অসম্ভব হইত। এরূপ অবস্থায় আমরা সর্ব্বদা মৃত্যু যাচিয়া লইতাম এবং আসন্ন বিপদও আমরা বুঝিতে পারিতাম না; অথবা যখন বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নাই, তখনই আমাদের চৈতন্য হইত। অজ্ঞান সন্তানেরা অগ্নিতে হস্ত পোড়াইয়া, অস্ত্রে হস্ত কাটিয়া, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া কষ্ট পাইতেছে, সত্যবটে, কিন্তু এই সকল দ্বারা তাহারা আত্ম রক্ষা শিক্ষা পাইয়া থাকে। আমাদের শিক্ষা তিন প্রকারে হয়, দেখিয়া, শুনিয়া ও ঠেকিয়া; কিন্তু শেষোক্ত প্রকারে যে শিক্ষা হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী। স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আমরা অনেক সময়ে অবিলম্বে শাস্তি পাই না বটে, কিন্তু অল্পে অল্পে স্বভাব আমাদের চৈতন্য করিয়া দেয়, যখন আমরা তাহার ইঙ্গিত গ্রহণ না করি এবং নিয়ম ভঙ্গ বিরত না হই, তখন উহা আমাদিগকে কর্কশস্বরে লাঞ্ছনা করে। ইহাতেও যদি আমরা উহার আদেশ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে শীঘ্র আমরা যথাবিহিত শাস্তি পাই। যদিও তাহার সতর্কতা ও শাস্তি আমাদের পক্ষে কষ্টদায়ক, তথাপি ইহারই দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন রক্ষা হইয়া থাকে। কষ্ট যন্ত্রণা, শোক ও দুঃখ যে কেবল দৈহিক বা শারিরীক নিয়ম রক্ষার্থে কার্য্য করে, তাহা নহে; কিন্তু ইহাদের দ্বারাই

মানসিক পরিবর্ত্তন ও চরিত্রের বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হইল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইতালীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। নগরবাসীরা সকলেই কোন না কোন দস্যু দলভুক্ত, অরাজকতার এক শেষ, আততায়ীরা অবাধে তাহাদের দুর্বৃত্তি চরিতার্থ করিত। আহত ব্যক্তিরা বিচারপ্রার্থী হইলে সফল হইত না। এই সময়ে ইতালীর দুইটী যুবক পরস্পরের কত আশা ও উন্নতির কথা বলিতে বলিতে এক দিন সন্ধ্যাকালে পথিমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন, দৈবাৎ জ্যেষ্ঠটি কনিষ্ঠকে রাখিয়া কোন কার্য্য বশত স্থানান্তরে গমন করিলেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রাতার শোণিত-সিক্ত মৃত শরীর ধূলায় লুণ্ঠিত রহিয়াছে। এই ঘটনায় তাঁহার জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্ত্তিত করিল। ইহাতে ইতালীর উদ্ধার-কর্ত্তার জন্ম হইল। সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রিয়াঞ্জি, তিনি বলিয়াছিলেন, "Will they not give us justice ; time shall show. So saying he bent his lead over the corpse, his lips muttered, as if with some prayer or invocation, and then rising, his face was as pale as the dead beside him, but it was no longer pale with grief.

From that bloody clay, and that inward prayer ; Cola De' Rienzi rose a new being. With his young brother died his own youth. But for that event, the future liberator of Rome might have been but a dreamer, a scholar or a poet, a man of thoughts not of deeds."

ইতিহাস হইতে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। স্বার্থত্যাগ, আত্মজ্ঞান, সাহস, বিক্রম, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্গুণ কোন কালে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভিন্ন সম্পূর্ণ বিকশিত হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাঁহারা কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বলবান। যাঁহারা নিজ শরীরে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা পর দুঃখ ও যন্ত্রণা নিবারণ করিতে ও তাঁহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে সক্ষম। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যক্তিগত দুঃখ ও যন্ত্রণাই পরস্পরের আনুকূল্যের প্রস্রবণ। অন্যের দুঃখ নিবারণ করিতে যাইয়া নিজের দুঃখ অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কষ্ট ও যন্ত্রণা হইতে অন্য প্রকার উপকারও হইয়া থাকে, ইহার দ্বারা কেবল যে দুঃখী ও যন্ত্রণাভোগীকে বল দেয় এবং তাহাকে পবিত্র করে, তাহা নহে, কিন্তু ইহার দ্বারা আশ্রয়দাতার হৃদয়ে সহানুভূতি ও পরোপকারের ভাব উদ্দীপন করিয়া দেয়। Oliver Wendell Holmes সুন্দর রূপে বলিয়াছেন যে, দীর্ঘকালব্যাপী রোগগ্রস্ত বন্ধুর সেবা শুশ্রূষা করিলে যেমন শ্বেত শ্মশ্রু ও কেশ আনয়ন করে, তেমনই ইহাতে হৃদয়কেও শুভ্র বা পবিত্র করে। মনুষ্য জীবনের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে, যাহাদের জন্য আমরা কষ্ট ভোগ করি, তাহাদের প্রতি আমরা অধিক অনুরক্ত হই। গর্ভধারণ, প্রসব কালীন বেদনা, এবং সন্তান লালন পালনে মাতার যে কষ্ট ও চিন্তা হইয়া থাকে, তাহাই সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের মূল। পূর্ব্বে যাহা কথিত হইল, তাহাতে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, দুঃখ কষ্টের সকল গুরুত্ব ভেদ করিতে আমরা স্পর্দ্ধা করিতেছি। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, উপযুক্ত চিন্তার দ্বারা আমরা ইহার অন্ধকারাচ্ছন্ন পথকে কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত করিতে সমর্থ হই। এই বিচারে আমরা নিম্নলিখিত উপসংহারে উপনীত হই।

১। পৃথিবী কেবল সুখের অথবা কেবল দুঃখের আগার নহে, সুখ দুঃখ দুইই সকল মনুষ্যের অনিবার্য্য ঘটনা।

২। যেমন আমরা জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্ম্মের আলোচনায় পৃথিবীর বাহ্যবস্তুর অতীত কত নূতন সুখের আগার সৃজন করিয়া থাকি, সেইরূপ নূতন প্রকার দুঃখও আমরা সৃজন করি।

৩। দুঃখকে যেরূপ অপ্রিয় বস্তু বলিয়া আমরা সাধারণত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকি, প্রকৃত পক্ষে উহা সেরূপ অহিতকর সামগ্রী নহে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর যেরূপ গঠন ও বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা অনুভব করিলে দুঃখ যন্ত্রণা আমাদের জীবন রক্ষার্থে কতক পরিমাণে আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়।

৪। দুঃখ কষ্ট হইতেই ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ, সাহস, বিক্রম, সাহানুভূতি, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ অধিক স্থলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ হ্রাস করিতে হইলে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য। যখন দেখিতেছি যে, দুঃখ অনিবার্য্য, যেখানে কেন আমরা যাইনা, যতই কেন আমরা সুখ অন্বেষণ করি না, আমাদের বিষয় কার্য্য যতই কেন ভাল রূপে নির্ব্বাহ করিনা, তথাচ অসম্পূর্ণ মনুষ্যের দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার নাই, শারিরীক বা মানসিক কষ্ট কতক পরিমাণে সহ্য করিতে হইবেই হইবে। অনেক সময় আমরা আমাদের নিজেদের উপর বিরক্ত হই। প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হইলে, আশানুযায়ী উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে, আত্মগ্লানি আসিয়া আমাদিগকে ম্রিয়মাণ করে। দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা চারি দিকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যদি আমরা উহাদিগকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বহন করি, ইহারা আমাদিগকে বহন করিবে এবং আমাদের ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইবে। যদি আমরা অনিচ্ছা পূর্ব্বক উহা বহন করি, উহা আমাদিগের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিবে এবং আমরা উহার ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িব, অথচ উহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। একটী অপ্রিয়কর অশুভ বস্তু আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া দেখিতে পাই যে, অপর একটী গুরুতর অশুভ আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা এ পর্য্যন্ত কোন মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহার হস্ত হইতে কেমন করিয়া আমরা পরিত্রাণ পাইব? এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। ধার্ম্মিক লোকদেরও দুঃখ অল্প নহে। যতই তাঁহারা উন্নতি লাভ করেন এবং ঈশ্বর প্রেমে অনুরক্ত হন, ততই তাঁহার বিচ্ছেদে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেন।

দুঃখের সময় ঈশ্বরেব প্রেম-মুখ যেরূপ সুমিষ্ট বোধ হয়, এমন আর কোন সময়ে নহে। যখন সমস্ত পৃথিবী আমাদের বিমুখ হয়, আমরা নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করি ও নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করি, তখন অনুতাপিত হৃদয় কত না সুখ পায়। তখনই বলি, দুঃখই পরিত্রাণের মূল মন্ত্র। যখন দুঃখ আসিয়া আমাদিগকে অধিকার করে, তখন শত্রুরা আর আমাদিগকে আক্রমণ করে না। দুঃখই মনুষ্যের হৃদয়ের বল বৃদ্ধি করে।

বেন (Bain) তাহার মেণ্টাল ও মরাল্ সায়েন্সে নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়ম, সুখ লাভের পক্ষে আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) কোন সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, সুখের কারণ সম্পূর্ণ নূতন হওয়া আবশ্যক। যথা জননীর প্রথম সন্তান। নূতন প্রেমের যে সুখ, তাহা পুনরায় লাভ করা যায় না।

(২) প্রত্যেক সুখের কিয়ৎ কাল নিবৃত্তি থাকা আবশ্যক, নতুবা উহা সুখ বলিয়া বোধ হইবে না। আমরা কোন আহ্লাদ বা সুখ কেবল কিছু কালের জন্য সম্ভোগ করিতে পারি, তাহার অতিরিক্ত আর পারি না। সুখোৎপত্তির কারণ কিছু কাল বিরাম থাকা আবশ্যক।

(৩) অনবরত সুখে থাকিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির নানা প্রকার সুখের বস্তু থাকা আবশ্যক, এই সকল বস্তু যত বিভিন্ন হইবে ও ক্রমান্বয়ে মনুষ্যের আয়ত্তাধীন হইবে, ততই সুখ বৃদ্ধি হইবে। কোন সুর যতই কেন সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য হউক না, উহা একাধিক্রমে শুনিলে কখনই সুখ লাভ হয় না। যন্ত্রণা হইতে মুক্তি অধিকন্তু সুখের একটী উপায়, যথা, রোগের পর সুস্থতা লাভ। মনের কোন উদ্বিগ্নতা বা ম্লানতার অবসান। মারিভয় হইতে মুক্তিলাভ। বহুকালের ঈপ্সিত অথচ অতৃপ্ত সুখ প্রাপ্তি। সুখ লাভ করিতে হইলে পূর্ব্বে কষ্ট বা দুঃখ ভোগ করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা নহে, কিয়ৎ ল সুখের বিরামই সুখভোগের পক্ষে যথেষ্ট। খাদ্য, শরীর সঞ্চালন, সমাজ ও সঙ্গীত প্রভৃতি হইতে আমরা যে সুখ পাই, তাহার মধ্যে মধ্যে বিরাম আবশ্যক। এইরূপ বিরামের পর সুখই যথার্থ নির্দ্দোষ সুখ। কিন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য যে, দুঃখ কষ্টের পর আমরা যে সুখ পাই, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং অত্যন্ত প্রখর।

(৫) পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য পরিবর্ত্তনও উপকারী। সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত না হইলে, এক প্রকার কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইলে, অন্য প্রকার কার্য্য করিতে আমরা সক্ষম হই। মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইলে, আমরা শারীরিক পরিশ্রমে সক্ষম হই। চিন্তাতে বিরত হইয়া, পাঠ বা কার্য্য করিতে পারি। বিজ্ঞান হইতে বিরত হইয়া, সাহিত্য বা চিত্রবিদ্যার আলোচনা করিতে সক্ষম হই। স্বয়ং কোন কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হইলে, অন্যের সাহায্যে কার্য্য করা যায়।

(৬) স্বভাবদত্ত সুখ ব্যতিরেকে আমরা সুখের স্থান বৃদ্ধি করিতে পারি। জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনা ও উৎকর্ষ লাভই এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান। প্রকৃতি ও মনুষ্য জীবনের গূঢ় তত্ত্ব জানাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য।

আমরা দেখিতেছি যে, সচরাচর যেরূপ মনে করিয়া থাকি, দুঃখ আমাদের সেরূপ অহিতকর সামগ্রী নহে। বরং আমরা অনেক সময় উহার ভিতর আমাদের হিতকর সামগ্রী লুক্কায়িত রহিয়াছে, দেখিতে পাই। সুতরাং সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদের সকল অবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। দুঃখের অবস্থায় হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিয়া নূতন উৎসাহ ও বীর্য্যের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে শ্রেয়। এবং সুখের সময় সাবধান পূর্ব্বক পদক্ষেপ করা উচিত। কেন না, সুখ দুঃখ উভয়ই আমাদের পরীক্ষার অবস্থা, উভয়ই আমাদের সহজে বিপথে লইয়া যাইতে পারে, এবং বোধ হয়, সুখের সে ক্ষমতা দুঃখের অপেক্ষা অধিক। সেই জন্য এক জন বিজ্ঞলোক বলিয়াছেন :—

"The trials of prosperity
As that of adversity
Must be guarded against."

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মিত্র।

মহারাষ্ট্র।

(৩)

থলঘাট দেখিতে হইবে বলিয়া প্রাতঃকালে পুনা হইতে রেল পথে যাত্রা করা হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কথিত স্থানে গাড়ী আসিল। বোরঘাটের ন্যায় থলঘাটে পর্ব্বতের উপর দিয়া লৌহ-পথ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বোরঘাট শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমান হইল। রাত্রি ১০টার সময় নাসিক রোড ষ্টেসন হইতে টাঙ্গাযোগে তিন ক্রোশ যাইয়া উপাধ্যায়ের বাটীতে বাসস্থান পরিকল্পিত হইল। এই নাসিক দক্ষিণবাসীদের কাশী। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্রানুজ এই স্থানে সূর্পনখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া জনস্থানের নাম নাসিক হইয়াছে। এখানে গোদাবরীকে গঙ্গা কহে। এই থান হইতে ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী চক্রতীর্থ হইতে গোদাবরী উৎপন্ন হইয়া মহারাষ্ট্র, নিজাম রাজ্য, সরকার প্রদেশ দিয়া বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ৪৫০ ক্রোশ হইবে। বাটীর জল যেমন পয়ঃপ্রণালী দিয়া বাহির হইয়া বাটী পরিষ্কার রাখে, পৃথিবীর জল নদী দিয়া বহিয়া সেইরূপ ধরা পবিত্র করে। উৎপত্তি স্থান নিকট বলিয়া এখানে গোদাবরীর পরিসর ও গভীরতা অল্প। সে জন্য স্নান প্রভৃতির সুবিধা করণার্থ কুণ্ড ও প্রণালী নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। স্থান বিশেষ উচ্চ নীচ হওয়ায় জলের পতন সুন্দর দেখায়। নদীর উভয় পারে বসতি ও দেবমন্দির, সুতরাং জল ভাঙ্গিয়া কুণ্ডের আলবালের সাহায্যে পার হইতে হয়। নানা স্থানের রাজগণ দেবালয় স্থাপন করিয়াছেন। মন্দিরের গঠন বহুবিধ। আমরা অতি আগ্রহের সহিত পঞ্চবটি দর্শন কবিতে গেলাম, সেখানকার দৃশ্য অতি অকিঞ্চিৎকর। অতি অল্প দিনের পাঁচটী বটবৃক্ষ সমীপে এক খানি খোলার ঘরে সীতাদেবীর গহ্বর আছে। রামচন্দ্র যে রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যা হইতে আসিয়াছিলেন, ভক্তগণ অদ্যাপি এখানে তাহা দেখিতে পান। নাসিকের গোদাবরী তীর অতি রমণীয়। নগরে দর্শনীয় কিছু নাই। অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, কাশীর ন্যায় মনোরম নদী তীর জগতে আর নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, নাসিক সে বিষয়ে হীন নহে। এখানে আমার চক্ষে কোনও কোনও বিষয় কাশীর গঙ্গাতীর অপেক্ষা সুন্দর দেখাইল। এখানকার গঙ্গার প্রবাহ সংকীর্ণ, সেজন্য উভয় পারে ঘট্ট ও মন্দির রচিত হইয়া বারাণসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময়ী মরাঠী ব্রাহ্মণ-ললনা সতত গোদাবরী কূল আলো করিয়া রহিয়াছেন। গৃহদেবীগণকে স্নানের পর পূজাদি করিতে প্রায় দেখা যায় না। গৃহকর্ম্মেই ব্যস্ত থাকেন। দিবাভাগে যে কোন সময়ে তীর্থ দর্শন করিতে যাও, দেখিবে, বাইরা বস্ত্র ধৌত করিতেছেন ও দূরে থাকিলে সোপানের উপর বস্ত্র-তাড়নের পট

পট শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। নদীর তট এক স্থানে পর্ব্বতময়, সেই খানে পাহাড় কাটিয়া সোপান খোদিত হইয়াছে। চন্দ্রমা-শালিনী সন্ধ্যাকালে তদুপরি উপবেশন করিয়া দেবালয়ের রৌশনচৌকি শুনিতে শুনিতে এবং রামকুণ্ডের উপর প্রদত্ত দীপমালার জল মধ্যে নিক্ষিপ্ত রশ্মি নিরীক্ষণ করিয়া কাশীর অহল্যা বাইয়ের ঘাট মনে আসিল। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধ করেন। তজ্জন্য গোদাবরী তট দীপ-আলিতে মণ্ডিত হইয়াছে ও দেওয়ালির উপঢৌকন দারুকাম অর্থাৎ পটাকা রমণী হস্তে পর্য্যন্ত শব্দায়মান হইয়া আনন্দলহরী তুলিতেছে। কপালেশ্বর রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির অদ্য রাত্রে শিঙ্গার বেশ হইয়াছে। বহু নরনারী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। রাম লক্ষ্মণের মন্দিরে দুইটী অশ্ব সজ্জিত করিয়া সেবার জন্য বিগ্রহেব সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বে রাখা হইয়াছে। নদী তীরে শিবলিঙ্গের উপর পিত্তলের শিবমূর্ত্তি বসাইয়া দিয়াছে। আতুর সন্ন্যাসীদের সমাধিস্থান মার্জ্জিত করিয়া সন্তানগণ দীপ দিয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন। পঞ্চ দ্রাবিড়দিগের মধ্যে প্রথা আছে, প্রাচীন গৃহস্থ মোক্ষ লাভ করিবার জন্য মৃত্যুকালে শঙ্করমার্গানুযায়ী সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেণ। সেই কারণে নাসিকে দুই চারি জন দণ্ডি থাকিলেও বহু সমাধি (গঙ্গাতীরে) দৃষ্ট হয়। কপুরথলার রাজার ইংলণ্ড যাইতে ইডন নগরে মৃত্যু হয়। তাঁহার শব গোদাবরী তীরে যে স্থানে দাহ করা হইয়াছে, তথায় একটী বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে ও অন্য স্থানে তাঁহার স্মরণার্থ ইংরাজী প্রথানুযায়ী মন্দির রচিত হইয়াছে। এই স্থানে ফল মূল বিক্রয়ের হট্ট সমাবেশ হইয়া থাকে। পর পারে সাপ্তাহিক হট্ট হয়। নদী তীরে আসিলে, সুতরাং, এ জনপদের সকল লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জন সংখ্যা ২২৪৩৬।

পাণ্ডুলেনা অবশ্য দর্শনীয়। প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইব না। বোধিসত্বের কৃপায় চটি জুতা পায়ে থাকিলেও উঠিতে পারিলাম। আমি যত গুলি পর্ব্বত-খোদিত দেবালয় দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোহ। ইহাতে অনেক গুলি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। তদ্ অভ্যন্তরে নানাবিধ বৌদ্ধ মূর্ত্তি অধুনা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেবতা হইয়াছেন। একটি কন্দরের বাহিরে পালি অক্ষরে অতি বিস্তৃত লিপি উৎকীর্ণ দেখিলাম। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকব তাহার অর্থ প্রচার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম কালে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই লিখনে ভূমি প্রভৃতি দানের উল্লেখ আছে এবং যে অব্দ আছে, তাহা খ্রীষ্টীয় ১১৮ হইতে ১২০ দৃষ্ট হয়। বিদেশীয় পণ্ডিত কহেন, অশোকের অনুশাসন লিপির পূর্ব্বে লিখন প্রথা দৃষ্ট হয় নাই। উক্ত অক্ষর আর্মেনিয়ম বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন। ভারতীয় সকল প্রকার অক্ষরই সেমেটিক বর্ণমালা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্মে ইহুদি, দর্শন শাস্ত্রে গ্রীক্, রাজনীতিতে রোমান ও নীতি শাস্ত্রে স্যাক্‌সন্ জাতিকে উত্তমর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় পরদ্রব্যগ্রাহী ব্যক্তি যদি কহেন, আমাদিগের জ্যোতিষ গ্রীকদিগের নিকট শিক্ষিত ও লিপিকার্য্য আর্‌মানিদের কাছে পাইয়াছি, তাহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পাণ্ডুলেনায় একজন "ঘাটির" সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি বোধ হয় প্রহরী, কিন্তু আমাদের

কাছে পাণ্ডার দাবি করিতে লাগিলেন। এ সকল মঠে আর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। কলিকাতায় একজন পীতবাসা যতিকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়াছিলাম। তিনি নেপালি বৌদ্ধ, তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, শাক্য বংশ স্বাতিধর্ম্ম-ভিক্ষু। তিনি প্রত্যহ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে স্নান পূজা করিতে আসেন। শেষগর্ভ নামক শালগ্রাম শিলার গাত্রে চন্দনের সহিত কুঙ্কুম কর্পূর প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি লেখনী দ্বারা অঙ্কিত করেন। তদনন্তর পুঞ্জিকা উদ্‌ঘাটন করত তিথি নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করা হইলে গন্ধপুষ্প অক্ষত সহকারে পূজা হইয়া থাকে। এক প্রকার সুগন্ধ চূর্ণের বর্ত্তি দ্বারা আরতি শেষ করিয়া " দেব লোকং গচ্ছ " প্রভৃতি কথিত হয়। ইত্যাকার অর্চ্চনাকে ভিক্ষু মহাশয় রত্নমণ্ডল সমাধি কহেন। শালগ্রামের গাত্রে বুদ্ধ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল দেখিয়া বোধিসত্ত্বকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জ্ঞান হইল। শালগ্রাম শিলা এক প্রকার ত্বগাধার দেহ (Mollusca), শিরঃপদী (Cephalo poda), বর্গের বহু কোষ্ঠী (ammoniteda) জীবের দেহাবশেষ মাত্র। গঙ্গাপুরা নামক স্থানে গোদাবরীর একটি জল প্রপাত দেখিতে যাত্রা করা হইল। পাহাড়ের উপর হইতে অনেক নীচে, সুতরাং প্রবলবেগে জলরাশি উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিয়া মহাশব্দে পতিত হইয়া ফেনিল হইয়া উঠিতেছে, সেই জন্য এই প্রপাতের নাম দুধস্থলি হইয়াছে। মন যদি অতি নীরসও হয়, তথাপি জলের এই উচ্ছ্বাসের সহিত হৃদয়কে উথলিয়া উঠিতে হইবে। বারিধারা ক্ষুব্ধ হইয়া যে স্থানে পতিত হইয়া নয়ন ভুলাইতেছে, সেখানে অবতরণ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে শিলাতলে উপবেশন করত ছবিখানি হৃদয়ে আঁকিতে চেষ্টা করিলাম। একজন জালিক জলের পতন-মুখে মৎস্য ধরিতে লাগিল।

ত্র্যম্বক ক্ষেত্র নাসিক হইতে ১০ ক্রোশ। এতদ্দেশীয় লোকের ভ্রম আছে যে, গোদাবরী শৈল-দুর্গোপরি উড়ুম্বরী মূলে উৎপন্না হইয়াছেন এবং সেই জন্য উক্ত স্থানের নাম গঙ্গা দ্বার ও তন্নিম্নে সেই অনুযায়ী কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থান তীর্থজীবিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে। বাস্তবিক গৌতমী গঙ্গা এস্থানে উদ্ভূতা হন নাই। এখান হইতে যে ধারা বহির্গত হইয়া পয়ঃপ্রণালী দিয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা নালার কঙ্কর সিক্ত হইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, এখানে গঙ্গা গুপ্তা হইয়া যাইতেছেন। আমরা যখন ত্রি-অম্বকে পৌছিলাম, তখনও কার্ত্তিকী পূর্ণিমার উৎসব শেষ হয় নাই। ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ এবং পট্ট বস্ত্র পরিহিত না হইলে ব্রাহ্মণগণও দেব সমীপে উপস্থিত হইতে পারে না। বাজিরাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ত্র্যম্বকেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দির দর্শন করিয়া, প্রকৃত প্রস্রবনের উপর শয়ান শেষশায়ী প্রভৃতি অনেক বিগ্রহ যুক্ত চৌদিকে মণ্ডপ বিশিষ্ট উৎসজল পূর্ণ কুশাবর্ত্ত নামক মনোহর কুণ্ডসমীপে মহামরী দেবীর বলি প্রেরণ দেখিতে উপস্থিত রহিলাম। এ গ্রামে তিন সহস্র লোকের বাস। প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট একমুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া অন্নপাক করা হইয়াছে। এক খানি গরুর গাড়ীতে ভাত বোঝাই দিয়া তাহার উপর রক্তবর্ণ চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া ইক্ষুদণ্ড ও প্রজ্জ্বলিত মশাল

প্রোথিত করিয়া দিলে, অগ্নিহোত্রী ও দেশমুখ সেই স্থানেই দেবিকে বলি [ভাতের গাড়ী] নিবেদন্ করিয়া দিলেন। যুগন্ধরের উপর একটী নারিকেল ভগ্ন করিয়া বাদ্যোদ্গমের সহিত শকট পরিচালন করা হইল। বলি গ্রামের বাহিরে দিয়া আসিয়া, তবে জানপদগণ অদ্য ভোজন করিতে পারিবেন। পাণ্ডা গণপতি শঙ্কর শুকূল মহাশয়ের বাটীতেই আমাদের আহার করা স্থির হইল। আমার সহচর বিদেশীয়ের অন্ন গ্রহণ করিবেন না বলিয়া "মুরমুরে"[মুড়ী] ও পেঁড়া খাইলেন। উপাধ্যায় পত্নীরা পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ পাতের উপর দুই তিন প্রকার চাটনি একটী বধূ দিয়া গেলেন। অন্য জনে প্রত্যেক পাত্রে একটি করিয়া দোনা রাখিয়া দিলেন। তৃতীয় যাতা অন্ন আনিলেন। ভাত অতি অল্প পরিমাণে দিতে দেখিয়া ভাবিলাম, এ দেশের লোকের আহার কি এত কম? আমাদের গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে ডাবু বলে, সেই হাতায় করিয়া চাপিয়া এক হাতা ভাত পাতের উপর উল্টাইয়া ঢালায় মাথাটী গোল হইয়া রহিল; যে দোনা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে তরল ঘৃত প্রদত্ত হইলে এবং অধিকাংশ ব্যঞ্জন দিলে পর ভোজন আরম্ভ হইল; যে উপকরণটি ওদনের সহিত মুখে দেওয়া যায়, হয় কটু নতুবা অম্ল। এত ঝাল যে কিছুতেই আমি গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইলাম না। পরিবেশন-কারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুপ" চাই। আমি বুঝিতে না পারায়, কি বস্তু প্রশ্ন করায়, তিনি কহিলেন, ঘৃত। ভোজনের প্রথম অবস্থায় ঘৃত আবশ্যক হয় জানি, সুতরাং কহিলাম, না। তাহার পর "পোলি" দিয়া গেল। সিদ্ধ বুটের ডাল শর্করা যোগে দলিয়া যে রুটিতে পুর দেওয়া হয়, তাহার নাম "পুরন্-চ্যা পোলি"। উষ্ণ ঘৃতে নিমজ্জিত করিয়া তাহা খাইতে হয়। পুনর্ব্বার ঘৃত আনিলে আমি ঘি চাহিয়া লইলাম, এবং পোলি দ্বারা উদর পূরণ করিলাম। যে পোলি পরিবেশন হইতেছিল, তাহাও উষ্ণ। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, রুটি মহারাষ্ট্রীয়দের প্রধান খাদ্য; এই জন্য ভাত অল্প করিয়া প্রথমে দিতে হয়। একটি বৌ ক্লান্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাইজি তুমি আহার করিতে কেন বস নাই। তিনি কেবল, না, কহিলেন। পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক আহার করিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, ইনি দেবরাণী, অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, কে অগ্রে উঁহাকে দিবে? পুনায় একদিন মরাঠী আহার করিয়াছি, তাহার উপস্কর ও চুক্র আমাদের পক্ষে অখাদ্য। সূপ ও শাক একত্রে—কচু শাক কুটিয়া দিয়া ডাল রন্ধন হইয়াছিল। তাহা এত ঝাল যে, দুই একবারের অধিক মুখে দেওয়া সম্ভব নহে। অকিঞ্চিৎকর কড়ী খাইয়া দেখিলাম। একটি চুক্রের অত্যন্ত গুণ শুনিলাম, তাহার নাম সার। পাচক কহিলেন, এদেশে সকলে ইহা পাক করিতে জানে না। ইহা কর্ণাট দেশীয় সামগ্রী। ইহাতে আবার ঔষধের কাজ হয়; জ্বর হইলে সার উপকারী। এই অমূল্য বস্তু জিহ্বায় প্রদান করিয়া দেখিলাম, পক্ক তিন্তিড়ী গুলিয়া লঙ্কা সহযোগে ধনিয়া শাক বাসিত করা হইয়াছে। সেদিন অম্ল ও কটু রস বিহীন ডাল ভাতে পাইয়াছিলাম. বলিয়া কিছু ওদন উদরস্থ করিতে পারিলাম। স্বাদ গ্রহণের জন্য একখানি জওয়ারা ও আর এক খানি গোধূমের রোটিকা দিয়াছিলেন। জওয়ারার রুটি দেখিতে মলিন, কিন্তু গোধূম অপেক্ষা

মিষ্ট। রুটি ঘি মাখা নহে, কিন্তু দুধে ফেলায় মগ্নানের ঘৃত ভাসিতে লাগিল। বাজরীর রুটি তৃতীয় স্থানীয়, কৃষাণ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকে তাহা দ্বারা জীবন ধারণ করে। চৌধরি নামক এদেশের এক তরকারি আমরা পুনা ও বোম্বাইতে রাঁধিয়া খাইয়াছি। শিখরেণ বড় প্রসিদ্ধ খাদ্য, দধি জলহীন করিয়া সর্করা, এলাফল এবং এবং কুঙ্কুম মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। আমরা বাজারে ক্রীত যে শিখরেণ খাইয়াছি, তাহা বিশেষ সুখাদ্য নহে। অনেক হিন্দুর চা ও কাফি-পানিয়ের দোকান বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে আছে। ত্র্যম্বকে গঙ্গাদ্বারের ৩২টী সোপান উঠিয়া "ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্মখ্যাতা চে মালক" রঘুনাথ বাপু শাস্ত্রী কবীশ্বর "ধর্ম্মপেটী" লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিনী কর্ত্তৃক প্রস্তুত চা পান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং বিদায় কালে কহিলেন, আমার বাটীতে পান গুপারি লইতে যাইও।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত।

প্রাচীন-বংশ-বিবরণ [৩য়]

[৭ খণ্ড, ১১ সংখ্যার পর]।

মরীচি ও কলা, পূর্ণমাস, বিরজ ও বিশ্বগা।

কোন কোন মতে ব্রহ্মার মানসানুসারে মরীচি প্রভৃতি, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রত্ব স্বীকার করেন, এই জন্য সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারের ন্যায় তাঁহারাও ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া খ্যাত। মহর্ষি মরীচি, কর্দ্দম মুনির ঔরসজাত ও দেবহূতির গর্ভোদ্ভূত কলার পাণিগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, কলার অপর নাম কলাবতী। কলার গর্ভে ও মরীচির ঔরসে কশ্যপ ঋষি ও পূর্ণমাস সঞ্জাত হন। পূর্ণমাসের বিরজ ও বিশ্বগা দুই সন্তান।

কশ্যপ ও নিধ্রুব-কন্যা।

কশ্যপ নামে এক অসাধারণ জ্যোতির্ব্বেদা ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিৎ কশ্যপ, ও মরীচিসুত কশ্যপ, দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি, কি এক ব্যক্তি নিঃসংশয় বলা কঠিন। অনেকের মতে মরীচিপুত্র কশ্যপই জ্যোতির্ব্বিদ্যা জানিতেন। অপর কাহার কাহারও মতে কশ্যপ-গোত্রীয় অন্য এক জন জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। শেষোক্ত মত সবিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। মহাভারতের বনপর্ব্বে বর্ণিত আছে, কৌশিকী-নাম্নী তটিনীর তীর-সান্নিধ্যে ভগবান্ কশ্যপ মুনি "পুণ্য" নামক আশ্রমে তপস্যা করিতেন। কৌশিকী নদী, গঙ্গার উপনদী; উহা প্রাচীন গৌড়দেশের সীমার অন্তর্গত। মহাভারতের রাজধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যখন পরশুরাম, কশ্যপকে তাঁহার অধিকৃত স্থান দান করেন, তখন ঋষিবর কশ্যপের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হয়। কেন না, তথায় তাঁহার বাসোপযোগী স্থান নাই। তদনুসারে পরশুরাম, দাক্ষিণাত্যের সমীপস্থ সমুদ্রতটে

গমন করেন (৭)। কশ্যপের আত্মজ কাশ্যপ; তাঁহার নামান্তর শাণ্ডিল। দ্বিতীয় পুত্র বিবস্বান্। বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু। বৈবস্বত মনু হইতেই চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশের উৎপত্তি। একমাত্র ঋষিপ্রবর কশ্যপ হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হন। কশ্যপের সংস্রবে কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভারদ্বাজ প্রভৃতি অনেক গোত্র সম্ভূত হইয়াছে। তিনি নৈধ্রুবসুতাকে ধর্ম্মপত্নীপদে গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি নৈধ্রুবাত্মজার প্রকৃত আখ্যা জানিতে পারা গেল না। নৈধ্রুব-তনয়া ব্যতিরিক্ত দক্ষের ঔরসোদ্ভূত ও প্রসূতির গর্ভজাত অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রভা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু, এই ১৩ তের পত্নী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন আর কোন বনিতার অস্তিত্ব জ্ঞাত নহি। কশ্যপনন্দন কাশ্যপই, সূর্য্য-সারথি বলিয়া বর্ণিত। অরুণ ও অনরু, তাঁহার নামান্তর। তিনি গরুড়ের জ্যেষ্ঠ।

জ্যেষ্ঠা পত্নী অদিতির গর্ভে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ পুত্র জন্মে। ইঁহারা সাধারণতঃ আদিত্যগণ নামে খ্যাত। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ত্বষ্টার পুত্র। দ্বিতীয়া বনিতা দিতির সন্তান হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাস্কল ৫ পাঁচ পুত্র। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি। বলির তনয় বাণ। ইঁহারাই দৈত্য বলিয়া খ্যাত। তৃতীয়া ভার্য্যা দনুর গর্ভজাত অপত্যেরা, দানব আখ্যায় সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত। চন্দ্র ও সূর্য্য নামে দনুর দুই আত্মজ ছিল। বাতাপি, দনুর পৌত্র। অগস্ত্য মুনি কর্ত্তৃক বাতাপির ধ্বংস হয়। কশ্যপের চতুর্থ বনিতা কালার বহু তনয়। সকলেই অসুর মধ্যে গণনীয়। কালার অপর নাম কাষ্ঠা। পঞ্চম পত্নী দনায়ুরও ৪ চারি সন্তান—বিক্ষর, বল, বীর ও বিত্র এবং পুলোমা-নাম্নী এক সুতা। ভৃগুর সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হয়। কশ্যপের ষষ্ঠ জায়া সিংহিকার রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা ও চন্দ্রপ্রমর্দ্দন ৪ চারি সন্ততি। সপ্তম ভার্য্যা ক্রোধা ও নবম ভার্য্যা বিশ্বার বিষয়ে বক্তব্য নাই। কশ্যপ ঋষির অষ্টমা প্রিয়তমা প্রভা। তাঁহার অপত্যের মধ্যে সুর, গন্ধর্ব্ব ও অসুরের উৎপত্তি দেখা যায়। বিশ্বাবসু ও ভানু এই পুত্রদ্বয়, দেবতা বলিয়া খ্যাতাপন্ন। গন্ধর্ব্বের ভিতর অপ্সরাও এক স্বতন্ত্র শ্রেণী। ইহার তাৎপর্য্য এই, পুরুষেরা গন্ধর্ব্ব ও স্ত্রীগণ (কেশিনী, রম্ভা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, অলম্বুষা ও মনোরমা ইঁহারা) অপ্সরা নামে পরিচিত। দশম সহধর্ম্মিণী বিনতার অরুণ ও গরুড় ২ দুই পুত্র। একাদশ ভার্য্যা কপিলা (৮) হইতে অমৃত, বিপ্রজাতি প্রভৃতি উৎপন্ন হন। দ্বাদশ প্রণয়িনী মুনির পুত্রেরা সর্পজাতি। ত্রয়োদশ জায়া কদ্রু। তিনি অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলার, কর্কট ও শঙ্খ, এই অষ্ট নাগের জননী।

(৭) গচ্ছ তীরং সমুদ্রস্য দক্ষিণস্য মহামুনে।
ন তে মদ্বিষয়ে রাম! বাস্তব্যমিহ কর্হিচিৎ ॥
ততঃ শূর্পারকং দেশং সাগরস্তস্য নির্ম্মমে,
সহসা জামদগ্ন্যস্য সোঽপরান্ত-মহীতলং ॥
শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্ম, ৪৯।—৬৬-৬৮।

(৮) কপিলা নাম্নী অপর এক মহিলা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি আসুরিক পত্নী। আসুরি, কপিলের শিষ্য। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ, কপিলার নিকট তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করেন।—শান্তিপর্ব্ব, ২১৮ অধ্যায়।

কশ্যপ ঋষি, বেদ-শাস্ত্রের কোন কোন অংশ প্রণয়ন করেন। চরণব্যূহ, শৌনক-প্রণীত প্রাতিশাখ্য, শৌনক-প্রণীত বৃহদ্দেবতা, আর্য্যবিদ্যাসুধাকর, মধুসূদন সরস্বতীর প্রস্থানভেদ প্রভৃতি গ্রন্থে বেদের বিশেষ বিশেষ বিভাগাদি পাঠে এবং ঋগ্বেদ সংহিতার "সর্ব্বানুক্রমণিকা", আশ্বলায়ন গৃহসূত্র ইত্যাদি ঋষি-বিরচিত গ্রন্থাধ্যয়নে ঋক্-প্রণেতা ঋষিবর্গের নামাদি জ্ঞাত হওয়া যায়। কশ্যপ ঋষি, বেদের যে যে ভাগ প্রণয়ন করেন, তত্তাবৎ বেদব্যাস-সংগৃহীত ঋগ্বেদ-সংহিতায় নিবদ্ধ আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত, ঋক্ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয়।

"মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত ও ঋক্ কাহাকে বলে, সহজ করিয়া না বলিলে, অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া, এস্থলে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে মূল বেদ পদার্থটি কি, বলা আবশ্যক। যখন লেখার সৃষ্টি হয় নাই, তাহার কত শত যুগ পূর্ব্বে যে, বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সাহেবেরা বেদের সময়-সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করুন না কেন, বেদ যে অতি প্রাচীন, তাহা আমাদের দেশের কোন কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিতে সাব্যস্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রথমাবস্থায় বেদশাস্ত্র, ঋষিগণের ও তাঁহাদিগের শিষ্য-পরম্পরার মুখে মুখে অভ্যস্ত হইত। এই জন্যই বেদবিদ্যার অন্য এক নাম শ্রুতি, অর্থাৎ শ্রবণ-পরম্পরায় আগত শাস্ত্র। এখন যেমন আমরা ৪ চারি বেদ বলিয়া জানিতেছি, ঐরূপ সময়ে এবং তাহার বহু পরেও বেদ, ঐ রূপে বিভক্ত ছিল না। তখন পদ্য, গদ্য ও গান, এই ৩ তিন মাত্র ভাগ ছিল। তাহাও সুশৃঙ্খলা-ক্রমে বিন্যস্ত থাকিত না। পদ্য-গদ্যকে তান-মান-লয়-স্বর-সংযোগে পাঠ করাতে, ১ একটী ভাগ হয়, তাহারই নাম গান। এই রূপ ভাবে বহুকাল গত হইলে পর, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সমস্ত শ্রুতি সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহা চারি অংশে বিভক্ত করেন। বেদকে ব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ) করাতেই, তাঁহার বেদব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ-বেদ-কর্ত্তা) আখ্যা হইয়াছে। তাবৎ পদ্য ভাগকে ঋক্, গদ্য ভাগকে যজুঃ কহে এবং পদ্য বা গদ্য ভাগকে স্বরে গীত করিলে, তাহাকে সাম বলে। অথর্ব্ব ঐ ৩ তিনের সমষ্টি। এইরূপে বেদ ৪ চারি খণ্ডে বিভক্ত হয়। * * * ঋগ্বেদের প্রত্যেক কবিতা বা শ্লোকের নাম ঋক্। কয়েকটী ঋক্ লইয়া একটী অনুবাক হয়। কয়েকটী অনুবাক লইয়া, এক একটী মণ্ডল হয়। সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা এইরূপ ১০ দশ মণ্ডলে বিভক্ত। মণ্ডলকে পরিচ্ছেদ, অনুবাককে অধ্যায়, সূক্তকে প্রকরণ এবং ঋককে শ্লোক বা কবিতা বলিয়া বুঝিলেও, কোন ক্ষতি নাই।" (৯)

কশ্যপ মুনি মহোদয়, ত্রিষ্টুপ্, দ্বিপদা, গায়ত্রী, পঙ্‌ক্তি, বৃহতী ও সতোবৃহতী, এই ছয় প্রকার ছন্দে অগ্নি, বিশ্বদেব ও পবমান (অর্থাৎ ক্ষরণশীল) সোমের বৃত্তান্ত ১০১ এক শত একটি ঋকে কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যাসদেব, কশ্যপের রচিত অংশ সমুদায়, ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম, অষ্টম ও নবম মণ্ডলে নিবেশিত করিয়াছেন। উল্লিখিত তালিকা-সম্বন্ধে ঐ স্থলে কিঞ্চিৎ বলা বিধেয়। ৮ অষ্টম মণ্ডলের ২৯ উনত্রিশ সূক্তের রচনা-বিষয়ে ঋষিদের মধ্যেই মতান্তর লক্ষিত হয়। কাহারও কাহারও মতে উক্ত সূক্ত, বৈবস্বতমনু-

(৯) মৎপ্রণীত প্রাচীন আর্য্য রমণীগণের ইতিবৃত্ত, ৮৯ ও ৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রণীত। ৯ নবম মণ্ডলের ১০৭ সপ্তাধিক শততম সূক্তটি কেবল কশ্যপ ঋষির নিজেরই সঙ্কলিত নয়, কশ্যপ, ভরদ্বাজাদি ৭ সপ্তর্ষি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

কশ্যপ মহোদয়ের বিরচিত বেদ-মন্ত্রের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

কোন্ মণ্ডল	কোন্ সূক্ত	ঋকের সংখ্যা	দেবতার নাম	ছন্দের নাম
১। প্রথম মণ্ডল	৯৯ সূক্ত	১ একটি	অগ্নি	ত্রিষ্টুপ
২। অষ্টম মণ্ডল	২৯ সূক্ত	১০ দশটি	বিশ্বদেব	দ্বিপদা
৩। নবম মণ্ডল	৬৪ সূক্ত	৩০ ত্রিশটি	পবমান সোম	গায়ত্রী
৪। ঐ	৬৭ সূক্ত	৩ তিনটি	ঐ	ঐ
৫। ঐ	৯১ সূক্ত	৬ ছয়টি	ঐ	ঐ
৬। ঐ	৯২ সূক্ত	৬ ছয়টি	ঐ	ত্রিষ্টুপ
৭। ঐ	১০৭ সূক্ত	২৬ ছাব্বিশটি	ঐ	বৃহতী, সতোবৃহতী, দ্বিপদা
৮। ঐ	১১৩ সূক্ত	১১ এগারটি	ঐ	পঙ্ক্তি
৯। ঐ	১১৪ সূক্ত	৪ চারিটি	ঐ	ঐ

১০১ একশ এক।

কশ্যপ-প্রণীত কতিপয় ঋকের বঙ্গানুবাদ পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

"সর্ব্বভূতজ্ঞ বহ্নির উদ্দেশে আমরা সোম অভিষব করিতেছি। আমাদের উপর যাহারা বিপক্ষবৎ ব্যবহার করে, বহ্নি। তাহাদের অর্থনাশ করুন। নৌকার সাহায্যে যেমন নদী উত্তীর্ণ হওয়া যায়, আপনি আমাদিগকে সমস্ত ক্লেশ হইতে নিস্তার করুন। আপনি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিন।
—[১ মণ্ডল, ৯৯ সূক্ত, ১ ঋক।]

"ক্ষরিত হইতেছে, এ প্রকার সোমের আধারে যিনি শুশ্রূষা করেন, য়িনি, তাঁহার মনোমত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই সৌভাগ্যবান্। হে সোম! ইন্দ্রের নিমিত্ত তোমার ক্ষরণ হউক।—[৯ মণ্ডল।]

"হে কশ্যপ ঋষি! মন্ত্র-রচয়িতারা যে সকল স্তোত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক তুমি স্বীয় বাক্য বর্দ্ধিত কর। সোম রাজাকে প্রণিপাত কর। তিনি যাবতীয় উদ্ভিদের মধ্যে প্রধান।"—[ঐ মণ্ডল।]

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২৪৩। ভক্ত, এক সুন্দর পুরুষ কিম্বা এক সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি দেখিলে বলেন যে, যেমন ইহার বাহিরে দেখিতেছি অনিত্য মনোহর দৃশ্য, তেমনি কবে ইহার অন্তরের নিত্য মনোহর শোভা প্রকাশিত হইয়া ইহার ব্যবহারে দীপ্তিমান হইবে!

২৪৪। লম্পট পাপী অপেক্ষা কুলটা পাপীয়সীর মূর্ত্তি অধিকতর জঘন্য ও ঘৃণিত, কারণ ঐরূপ পাপী অপেক্ষা ঐ রূপিণী পাপীয়সী জন সমাজের অধিকতব অনিষ্টোৎপাদন করে।

২৪৫। জ্ঞান চক্ষে ঈশ্বর নিবাকার ও ভক্তি চক্ষে তিনি সাকার রূপে দৃষ্ট হন। জ্ঞানী উপাসক ভোজনে বসিবার পূর্ব্বে মঙ্গলময়ের নিকট পশ্চাৎ লিখিত রূপে প্রার্থনা করেন; হে মঙ্গলময! তোমারই মঙ্গল বিধানে এই অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাইতেছি। তোমারি মঙ্গলময চবণে সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম কবিয়া উহা গ্রহণ করি।

ভক্ত উপাসক ঐ কালে যাহা বলিয়া প্রার্থনা করেন, তাহা এই;—মা গো, তুমি অন্নপূর্ণারূপ ধাবণ করিয়া নিজ হস্তে এই সকল অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত কবিয়া তোমাব এই পাপী সন্তানের ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তির জন্য এখানে অধিষ্ঠান হইয়াছ! মা গো, তোমার স্নেহময় চরণে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, বিশেষ নির্ভরতা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে প্রণাম করিয়া তব প্রদত্ত অন্ন পান গ্রহণ করি। আমায় রক্ষা কর। আমার শরীর, মন সুস্থ ও পবিত্র কর।

এই দুই প্রার্থনার মধ্যে প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিলে, প্রথম উল্লিখিত কথা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে।

২৪৬। প্রকৃত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম তিনি, যাঁহার জীবন নানা সদনুষ্ঠানে পবিত্র ও উন্নত হয়। এ প্রকার পবিত্রতা ও উন্নতি বিনা সামাজিক অনুষ্ঠানের কিছু মাত্র গৌরব নাই। নিত্য জীবনের উন্নতি অবহেলা করিয়া অনিত্য জীবনের উন্নতির জন্য লোকে সচরাচর বড়ই ব্যস্ত। ব্রাহ্মেরা সেই পথের পথিক হইলে তাঁহাদিগের নিশ্চয় প্রভূত অনিষ্ট ঘটিবে। নিত্য জীবনের উন্নতি অবহেলা কবিয়া যিনি অনিত্য জীবনের জন্য ব্যস্ত, তিনি অতি ভ্রান্ত ও মোহিত।

২৪৭। যিনি হন যত খাটি, তিনি হন তত খাঁটি।

২৪৮। যে উদ্দেশে যাহাব সৃষ্টি, তদন্যথাচরণই তদীয শ্রীহীনতা, তাহাই পাপ, তাহাই অপবিত্রতা।

২৪৯। যাহা ইহলোকে, পরলোকে, অনন্ত জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখের কারণ হয়, তাহাই পবিত্রতা। যাহা অনন্ত সুখাবহ, তাহাই পবিত্রতা।

২৫০। এ প্রদেশে বিবাহের পর বিবাহিত পুরুষ যে নারীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার পতি, স্বামী, ভর্ত্তা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। এই সকল শব্দের অর্থ প্রভু। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রভু তাঁহার স্বামী বিনা আর কেহ নাই। তিনি তাঁহার সেবায় কায়মনো-

বাক্যে যাবজ্জীবন নিযুক্ত থাকিবেন। তাহাই তাঁহার ব্রত। সে ব্রত পালনে তিনি পবিত্রতা ও কৃতার্থতা লাভ করিবেন। স্বামী-পূজা সম তাঁহার কোন ব্রত নাই।

২৫১। ব্রাহ্মধর্ম্ম মার্জ্জিত ও বুদ্ধি সম্পন্ন উন্নতমনা ও প্রেমিক হৃদয়বান ঋষিদিগেরই গ্রহণোপযোগী ধর্ম্ম। সর্ব্বসাধারণে ইহা গ্রহণে অসমর্থ। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম ঋষি-ধর্ম্ম নামে অভিহিত হওয়া উচিত। কবে যে সর্ব্বসাধারণে ইহা গ্রহণে যোগ্য হইবে, তাহা সেই পূর্ণ জ্ঞানময় ও অনন্ত মঙ্গলময়ই জানেন।

২৫২। মঙ্গলময় কত রূপে কত প্রকারে তাঁহার ভক্তদিগকে দর্শন দেন। তন্মধ্যে সচরাচর দুইটি দৃষ্ট হয়। একটি এই যে, তিনি তাঁহার রচনায় তাঁহার গুণ প্রকাশে দেখা দেন। অপরটি বড় দুর্ল্লভ। সেটি এই, তাঁহার ভক্তের প্রাণে তিনি তাঁহার জ্যোতি অত্যাশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ করেন। যে তাহা ভোগ করিয়াছে, সে তাহা জানে।

২৫৩। ভক্তজীবন পবিত্রতার ভিখারী। তিনি কেবল শব্দগত, শারীরিক, মানসিক, বাচনিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। তিনি এ সকল বিষয়ক পবিত্রতা লাভের জন্য তাঁহার বাসগৃহ ও তৎস্থিত দ্রব্যাদি ও পরিধেয় বস্ত্র অলঙ্কারাদির পবিত্রতা চাহেন। তিনি তাঁহার বাসস্থানের চতুর্দ্দিকের পথাদি ও প্রতিবেশীদিগের পবিত্রতার জন্য যত্নযুক্ত হন্। তিনি অর্থ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় ব্যবহারে পবিত্রতা রক্ষার জন্য বড়ই কাতর হন্। তিনি সামাজিক পবিত্রতা ভোগের জন্য সদাই চিন্তিত। তাঁহার আহার, পানীয় ও সেবনীয় বায়ুব পবিত্রতার জন্যও তিনি কাতর। পবিত্রতাময় তাঁহার জীবন। এরূপ জীবনই সার্থক।

২৫৪। ক্রোধ, ভক্ত জীবনের যেরূপ বিষম শত্রু, তাহাতে তাহার আক্রমণ হইতে ভক্তের আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। যে যে উপায়ে তাহা করিবার সম্ভাবনা, তন্মধ্যে পরম পবিত্র স্বরূপের বর্ত্তমানতা সর্ব্বক্ষণ অনুভব করা সর্ব্বপ্রধান। তাহার পর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও প্রশান্ত ভাব সর্ব্বদা ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ শরীর ও মনের সুস্থতা ও পবিত্রতা যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার উপযোগী অবস্থায় অবস্থিতি করিবার বিশেষ রূপে চেষ্টা করা উচিত। জীবন্ত ঈশ্বরের প্রেম সম ঐ শত্রু দমনের উপায় নাই।

২২৫। অহঙ্কার, অসত্য মূলক। সুতরাং উহা মানব হৃদয় মনকে অসত্যে, অন্ধকারে ও মৃত্যুতে লইয়া যায়। ধর্ম্ম সাধনের উহা বিষম শত্রু। অজ্ঞানান্ধকারাবৃত ক্ষুদ্র মনেতে উহা স্থান পায়।

২৫৬। অর্থলোলুপ ব্যক্তিই যথার্থ দরিদ্র। তাহার ধন থাকিতে ধন নাই। সে সর্ব্বদাই ধন লালাসার অধীন হইয়া ধনাগমের জন্য চিন্তিত ও ব্যস্ত। তাহার ধন তৃষ্ণার কিছুতেই শান্তি হয় না। সে কি সৎ কি অসৎ উপায়, যে কোন প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলেই সন্তোষ লাভ করে। এ প্রকার ব্যক্তির লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু হইবে, আশ্চর্য্য কি? সেই পাপাত্মাই দরিদ্র।

২৫৭। যখন তব ও মুখ হেরি
তখন সব দুঃখ পাশরি।

২৫৭। পরমাত্মাই মানব প্রাণের পরম ও নিত্য ভোগ্য। তিনিই তাহার পরম বাসস্থান। তাঁহারই পবিত্র সহবাসে মানবাত্মার

নিত্যানন্দ, নিত্য শান্তি ও নিত্য মঙ্গল। সেই অনাদি, অনন্ত, সত্য, নিত্য, একমেবাদ্বিতীয়ং, মঙ্গলপূর্ণ, স্বয়ম্ভু ও স্বপ্রকাশের পবিত্রতম ও শোভনতম চরণে মানব প্রাণ একীভূত ও বিলীন হইয়া নিরাপদে থাকিবে, নিত্যকাল ভোগ করিবে তাঁহার অজস্র ও অনন্ত মঙ্গলামৃত বর্ষণ। সেই অদ্বিতীয় বিনা নিত্য সত্য আর কিছুই নাই।

২৫৯। যে হয় পরের ভালর জন্য যত ছোট, সে হয় যথার্থত তত বড়।

২৬০। মানুষের নিকট সকল আশা হয় না পূরণ, প্রাণনাথের মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন কারণ।

২৬১। সরোবর তীরে ঘোর অন্ধকারে সজ্জীভূত আলোক মালা তদীয় জলে প্রতিবিম্বিত হইলে, যেমন তাহা অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হয়, সেই রূপ ভক্তি-সরোবরে ভক্তনাথের পবিত্রতার জ্যোতি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইলে, উহা পরম রমণীয় মনঃতৃপ্তিকর শোভা ধারণ করে।

২৬২। ধর্ম্মরাজ্যে সচরাচর দুই দল সুন্দর বেশধারী লোক দৃষ্ট হয়। এক দল গড়িতেছে ও অপর দল ভাঙ্গিতেছে। গড়া ও ভাঙ্গা, এই দুই কার্য্যের জন্য তাহাদিগের মধ্যে নিরন্তর দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মনু, ঈশা, মূষা, বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণ গঠন কার্য্যের জন্য ব্যস্ত ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের মত ঐ কার্য্যে যাঁহারা এখনও বহুযত্ন সহকারে নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহারাই দেব পদ বাচ্য, তাঁহাদিগের জীবনই ধন্য। আর যে সকল ভদ্র বেশধারী ভ্রান্ত মানব সন্তান দেবতাদিগের বহু আয়াসে গড়া সামগ্রী ভাঙ্গিবার জন্য সদাই চিন্তিত ও চেষ্টান্বিত, তাহারাই অসুরের নীচ পদে অবনত। তাহারাই ধর্ম্মরাজ্যের দস্যু, দানব, রাক্ষস, বানর। তাহারা আপনারা অবিশ্বাসী ও ঈশ্বর ভক্তিতে বঞ্চিত হইয়া দুর্ব্বল ও অর্ব্বাচীন ভক্তিরসপানার্থীদিগের নব কোমল বিশ্বাস ও ভক্তি-কলিকা অপহরণ ও তাহাদিগের হৃদয় মধুময় ভক্তি ও শান্তিবিহীন করিয়া থাকে। এই পাপাত্মাদিগকে মঙ্গলময় সুমতি দিন ও তাহাদিগের দুর্গতি নিবারণ করুন।

২৬৩। একমেবাদ্বিতীয়ং বিনা কেহই পারেন না, মানবাত্মাকে পাপ হইতে মুক্তি ও অনন্ত মঙ্গল দান করিতে। ইহা তাঁহার অদ্বিতীয় স্বরূপের উজ্জ্বল মহিমা। তিনি ভিন্ন মানবের নিত্য জীবনের ভোগ্য পরমানন্দ, পরমামৃত, পরম শান্তি, পরম পবিত্রতা প্রভৃতি পবিত্রতর রসবর্ষণ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। দেবপদ বাচ্য তাঁহার উন্নত সন্তানগণেরও তাহা করিবার ক্ষমতা নাই। যাহা নিত্য জীবনের ভোগ্য, তাহা মেলে কেবল সেই অদ্বিতীয় সত্য, নিত্য মঙ্গলময়ের অনুপম চরণ পূজায়। আর কোথাও তাহা পাওয়া যায় না।

২৬৪। আমি যেন সকলকে দেখি ভাল ;
কেবল আপনাকে দেখি কাল॥

২৬৫। যাহার জীবন জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলিত জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান, ভক্ত তাহারই নাম।

যে হয় ভক্তনাথের অনুপম চরণগত প্রাণ,
সেই পায় ভক্তের মধুময় নাম।

যে সেই জ্ঞানময়ের উজ্জ্বল জ্ঞানকিরণে ভক্তির মনোরম পবিত্র উদ্যানে করে সদা বাস, তাহারই জীবন হয় ভক্তিময়।

যে পায় মঙ্গলময়ের রচিত অগণ্য অতুল-

নীয় পদার্থ গুণে তাঁহার মঙ্গলপূর্ণ দর্শন, তাহারই হয় ভক্তিরসাভিষিক্ত সুখের জীবন।

যে জানে, সে নিজে কিছুই নয়, করে সে সকল সুখ ভোগ কেবল মঙ্গলময়ের কৃপায়, ভক্ত নামের যোগ্য সেই জন হয়।

মান, অভিমান, অহঙ্কার, অহংজ্ঞান যে করিয়াছে বিসর্জ্জন, তাহারই হয় সজ্জনগণের অভিলষিত ভক্তজীবন।

যে তৃণ সমঃবিনীত, যাহার বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুতা, তাহারই জীবনে রক্ষিত হয় ভক্তের যোগ্যতা। চিন্তা, বাক্য ও ব্যবহারে, যাহার প্রাণ সহিতে নাহি পারে ভক্তনাথের অবমাননা, সেই বুঝিয়াছে ভক্ত জীবনের গৌরব ও মর্য্যাদা।

নানা শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ক্লেশে যাহার মন প্রাণ থাকে মঙ্গলময়ের মঙ্গলপূর্ণ চরণতলে, অবাতকম্পিত দীপ শিখার ন্যায় স্থিরীভূত, তাহারই জীবন ভোগ করে ভক্তির অমৃতময় শান্তিপূর্ণ বিমল সুখ। সর্ব্বত্যাগী হইয়া যে করে মঙ্গলময়ের মঙ্গল পূর্ণ অমৃতময়, অভয় চরণে নিরন্তর বাস, তাহাতেই পূর্ণ হয় ভক্ত জীবনের সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ।

২৬৬। নিরাকার পূর্ণব্রহ্ম বাহ্য বস্তুতে যে রূপে হন দৃশ্যমান, তদপেক্ষা উচ্চতর রূপে তিনি মানব আত্মাতে দৃষ্ট হন। স্বরূপত তিনি মানব চিন্তার অতীত।

২৬৭। পূর্ণব্রহ্ম বিনা পূর্ণতা লাভের কাহার অধিকার নাই। মানব আত্মা চিরোন্নতিশীল। অনন্তকাল তাহার উন্নতির পর উন্নতি লাভ হইবে। উন্নতির শেষ কখনই হইবে না। পূর্ণ ও অদ্বিতীয় স্বরূপ চিরদিন তাহার সম্মুখে পূর্ণ অদ্বিতীয় রূপে দর্শন দিবেন।

২৬৮। পবিত্র স্বরূপের কৃপায় পবিত্র না হইলে কেহই তাঁহার শোভনতম রূপের পরমশোভা ভোগ করিতে পারে না।

২৬৯। যাহার চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে বিনয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তি না পায় প্রকাশ, তাহার হয় না ভক্ত জীবন্।

২৭০। ভক্ত দেখে তাহার পার্থিব পিতা ও মাতাকে, সেই নিত্য পিতা ও মাতার প্রতিনিধি স্বরূপ। সুতরাং তাঁহারাই তাহার পার্থিব পরম পূজনীয় গুরু।

২৭১। ভক্ত জানে যে, ভক্তনাথ করিবেন না তাহার পূজা গ্রহণ, যদি সে না করে তাঁহার প্রতিনিধিদিগের যথোচিত পূজা।

২৭২। ঈশ্বরেতে যাহার আছে ভক্তি, তাহারই হয় পিতা মাতায় ভক্তি। আবার যে করে তাহার পিতা মাতাকে ভক্তি, ঈশ্বরেতে তাহারই হয় ভক্তি। ভক্তির তৃপ্তি ঈশ্বরেতেই। যতদিন তাঁহাতে ভক্তি পরিচালিত না হয়, ততদিন তৎ প্রবৃত্তির তৃপ্তি কিছুতেই হয় না।

২৭৩। পাপ অতিশয় ঘৃণার্হ, কিন্তু পাপী অতি কৃপাপাত্র।

২৭৪। ভক্ত প্রতিদিন পিতা মাতার পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন ও তাঁহাদিগের পাদোদক পান করিবার পর আহারাদি করিয়া থাকেন।

২৭৫। ভক্ত গুরুজনদিগের কথার প্রতিবাদ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইলে বিনীতভাবে মৃদুস্বরে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি কখন তাঁহাদিগের নিকট অপ্রিয় বচন কহেন না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকানাইলাল পাইন

ঢাকার পুরাতন কাহিনী।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব।]

গৌড়েশ্বর পালরাজগণ।

প্রাচীন কালে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চল এবং পূর্ব্ব অঞ্চল বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। এরিয়ান, ডাইওডোরাস্ ও টলেমি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকারগণ বর্ত্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশকে গৌড় ও অনুগঙ্গ প্রদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেনবংশীয় মহারাজ বল্লাল সেনের সময়েও বর্ত্তমান বাঙ্গলাদেশের পূর্ব্বভাগ মাত্র 'বঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এক্ষণে বাঙ্গলার যে অংশ পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া কথিত হয়, তাহার নামানুসারে সমস্ত দেশের নাম বাঙ্গলা হইয়াছে। 'বাঙ্গলা' দেশের নামে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীনকালীয় প্রাধান্য ও গৌরব লক্ষিত হইতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় ভূপতিবর্গের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ কোন সংশ্রব ঘটিয়াছিল বলিয়া স্পষ্টরূপে বোধ হয় না। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের অধ্যবসায় ও গবেষণায় পালরাজগণের যে কয় খানি প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের গৌড়েশ্বর ও গৌড়াধিপ উপাধিই দেখা যায়। তাঁহাদের শাসনবিস্তৃতির পরিচায়ক কোনও তাম্রশাসনাদি চিহ্ন পূর্ব্ববঙ্গে এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গ তাহাদের শাসনদণ্ডের অধীন ছিল না, অথবা পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহাদের আধিপত্য সবিশেষ বদ্ধমূল হয় নাই।

পক্ষান্তরে বুদলগাছির প্রস্তরস্তম্ভের প্রতিলিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, পালবংশীয় রাজন্যবর্গ বঙ্গের বিষয় অনবগত ছিলেন না। নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরবমিশ্রের আদেশে এই প্রস্তরলিপি খোদিত হয়। তিনি বেদ-বেদাঙ্গ কাব্যজ্যোতিষাদি নানাবিধ হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া বঙ্গদেশে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন *। ভাগলপুরের তাম্রশাসন পূর্ব্ববঙ্গবাসী মদ্যদাস নামক শিল্পকর দ্বারা উৎকীর্ণ হয় বলিয়া বোধ হইতেছে। মদ্যদাস সমতটের অধিবাসী ছিলেন, উক্ত শাসনপত্রের শেষ শ্লোকে তাহা উল্লিখিত হই-

---

* প্রস্তরলিপির ২০-২২ শ্লোকে গুরবমিশ্র প্রশংসিত হইয়াছেন। বঙ্গ শব্দ দ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশ, কি পূর্ব্ববঙ্গকে বুঝাইতেছে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। শেষোক্ত অনুমান সত্য হইলে, পালরাজগণের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্ম্মের সবিশেষ চর্চ্চা ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আদিশূরের সময়ে এই পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘটে।

নানাকাব্যবসাগমেষ্বধিগমো, নীতৌ পরা নিষ্ঠতা
বেদোক্তানুগমাদশৌ প্রিয়তমো বঙ্গস্য সম্বন্ধিনাং।
আসক্তি গু'ণকীর্ত্তনেষু মহতাং, বিখ্যাতবিজ্জ্যোতিষো
যস্যানল্পমতেরমেয়যশসো ধর্ম্মাবতারো নদঃ ॥ ২০ ॥

আদিশূর ও তৎপরবর্ত্তী সেনরাজগণের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থিত হইয়া, বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ও পালরাজগণের আধিপত্য কালক্রমে বিলুপ্ত করে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

য়াছে *। এই উভয় লিপিই পালরাজগণের পূর্ব্ববঙ্গে শাসন প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তৃতির পরিচয় দিতেছে। এই অনুমান সত্য হইলে, পালরাজগণের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত ছিল, সংস্কৃত সাহিত্য ও শিল্পশাস্ত্রের উৎকর্ষতার নিমিত্তও পূর্ব্ববঙ্গ সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিল—ইহা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আদিশূর ও তাঁহার পরবর্ত্তী সেনরাজগণের আধিপত্য পূর্ব্ববঙ্গেই প্রথমত প্রতিষ্ঠিত হইয়া, হিন্দুধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে সমগ্র বঙ্গ ও গৌড়দেশে সংস্থাপিত হয়।

পালরাজগণের আধিপত্য অন্ততঃ কিছু কালের নিমিত্ত যে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, জনপ্রবাদও তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রবাদ আছে যে, পালবংশীয় যশপাল তালিপাবাদ পরগণার অন্তর্গত মাধবপুরে, শিশুপাল ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত কাপাসিয়াতে এবং হরিশ্চন্দ্র পাল বর্ত্তমান সাভারের সন্নিহিত কাঠীবাড়ীতে ‡ রাজত্ব করিতেন। এই তিনটী স্থানই বর্ত্তমান ঢাকা জিলার উত্তর অংশে অবস্থিত, ইহার কোন স্থানই ঢাকার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত নহে, কিম্বা আদিশূর ও সেনরাজগণের রাজধানী সমতট ও রামপালের নিকটবর্ত্তী নহে। ডাক্তার হাণ্টারের মতে ইহারা তিন জনেই পালবংশীয় ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা ছিলেন। জনশ্রুতি ও 'পাল' উপাধি ভিন্ন ইহাদিগকে পালবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার অন্য কোনও কারণ পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ না হইলেও, অন্ততঃ ঢাকার উত্তর ভাগ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ পালরাজগণের শাসনদণ্ডের অধীন ছিল। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এস্থলে পালরাজবংশের সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পালবংশীয় নৃপতিগণ সুপ্রাচীন মগধরাজ্যে প্রথমত রাজপাট সংস্থাপিত করিয়া, ক্রমে ক্রমে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ এবং পূর্ব্ব বঙ্গের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিয়া থাকিবেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়া মগধে উপনিবিষ্ট হইয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন, বা মগধই তাঁহাদের আদিম বাসস্থল, ইতিহাস তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। অঙ্গ (পূর্ব্ববিহার), গৌড় (পশ্চিম বঙ্গ), পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তরবঙ্গ) এবং তীরভুক্তি বা ত্রিহুত (উত্তর বিহার) লইয়া তাঁহাদের রাজ্য সংগঠিত হয়। পুর্ণিয়া, মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া তাঁহাদের শাসনাধীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন * রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত

* শ্রীমতা মদ্যাদাসেন শুভদাসস্য সূনুনা।
ইদং শাসনমুৎকীর্ণং সৎ-সামতটজন্মনা॥

‡ কাঠীবাড়ীতে একটী প্রাচীন দীর্ঘিকা ও উচ্চ মৃত্তিকাস্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। স্তম্ভটী প্রায় পঁচিশ হাত উচ্চ। প্রবাদ আছে যে, এই উভয়ই রাজা হরিশ্চন্দ্রের নির্ম্মিত।

* খ্রীষ্টীয় ৬২৯ অব্দের মধ্যভাগে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ্‌ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসূতি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা দর্শন ও সেই পবিত্র ধর্ম্মের উপদেশ শিক্ষা করিবার মানসে স্বীয় জন্মভূমি লিয়াংচু পরিত্যাগ করিয়া বহু আয়াসে নানা শঙ্কট অতিক্রম পূর্ব্বক স্থলপথে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ইহার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশীয় অপর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারতের নানা স্থান পরিদর্শন করেন। ৬৩৭ হইতে ৬৩৯ খ্রীষ্টীয়াব্দের আরম্ভ পর্য্যন্ত তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান বিহার প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া

ছিল। মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) তাঁহাদের প্রধান রাজধানী ছিল। তাঁহাদের প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসন হইতে এই সকল বিষয় জানা যাইতেছে। মুঙ্গেরে দেবপাল দেবের ও ভাগলপুরে নারায়ণপাল দেবের প্রদত্ত দুই খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুদ্দলগাছি ও আমগাছি নামক দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত দুইটী স্থানে পালরাজগণের নামাঙ্কিত দুই খানি শাসনপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই উভয় শাসনলিপিই পদ্মা নদীর উত্তর তীরে পালবংশীয় নরপতিদিগের আধিপত্য বিস্তৃতির পরিচয় স্পষ্টাক্ষরে প্রদান করিতেছে। দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুড়া জিলায় পালরাজগণের কীর্ত্তি ও ক্ষমতার পরিচায়ক বহুতর নিদর্শন অদ্য পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে বলিয়া বিজ্ঞবর ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রঙ্গপুরের মহীগঞ্জ,—দিনাজপুরের মহীপুর, মহীনগর, মহীসন্তোষ ও মহীপালদিঘী পালবংশীয় সর্ব্বপ্রধান নৃপতির নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। দিনাজপুরের নয়নগর মহারাজ নয়পালের শাসনপ্রভাব ঘোষিত করিতেছে। দিনাজপুর জিলায় বর্দ্ধনকোটি (প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানী) অবস্থিত আছে। এই বর্দ্ধনকোটির প্রায় ৭০ মাইল উত্তরে রাজা ধর্ম্মপালের নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাঁচবিবি থানার অন্তর্গত মহীপুরে মহীপালের এবং আটাপুরে উষাপালের আবাসবাটীর চিহ্ন লক্ষিত হয়। স্থানীয় অজ্ঞ লোকের নিকট ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব শুনিয়াছেন যে, যোগীঘোপায় রাজা দেবপালের প্রিয়তমা তনয়া বিমলাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। যোগীঘোপার নিকটস্থ অমারি নামক স্থানে রাজা দেবপালের আবাসবাটীর ভগ্নাবশেষ বহুতর ইষ্টকে পরিণত হইয়াছে। ইহার দুই মাইল দূরে চন্দিরা নামক স্থানে চন্দ্রপালের বাসস্থলীর চিহ্ন বিদ্যমান আছে। চন্দিরার সাত মাইল উত্তরে বুদলগাছির সুবিখ্যাত প্রস্তরস্তম্ভে নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরবমিশ্রের বংশাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণায় পালরাজগণের সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তরলিপি ও শাসনপত্র আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সময়ানুক্রমে প্রদান করা আবশ্যক। এই সকল শাসনলিপির কোন কোন কোনটীর অংশ বিশেষ বিলুপ্ত হইয়াছে, কোন কোনটীর স্থানবিশেষ অবোধ্য ও অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে, কোন কোনটীর আদিম লিপি দূরে থাকুক, তাহার প্রতিলিপি পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন এই সকল লিপি হইতে বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিৎগণ ভিন্ন ভিন্ন

বৌদ্ধগয়া, কুশাগারপুর, রাজগৃহ ও নালন্দা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করেন। নালন্দা হইতে হিরণ্য পর্ব্বত (মুঙ্গের ?), চম্পা, (পাটলীপুত্র ?) ও কজুঘির (রাজমহল ?) হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপনীত হন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তিনি ২০টী বৌদ্ধবিহার ও ১০০ বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পান। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বৌদ্ধ রাজার আশ্রয়ে কিয়ৎকাল বাস করিয়া, কামরূপের হিন্দুরাজা ভাস্করবর্ম্মার রাজধানীতে (গৌহাটী ?) উপনীত হন। কামরূপ হইতে সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কিরণসুবর্ণ হইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ভারতীতে 'হিয়াঙ্‌সাঙের বাঙ্গলা ভ্রমণ' নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হইতেছে। তাঁহার প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহের যথোচিত বিবরণ থাকা সম্ভবপর।

পূর্ব্বোক্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য কুশী হইতে ব্রহ্মপুত্র, এবং গঙ্গা হইতে হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজধানী বর্দ্ধনকুঠী (রাজবাড়ী) নামে পরিচিত, ইহা করতোয়া নদীর তীরবর্ত্তী গোবিন্দগঞ্জের নিকটে অবস্থিত।

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে বিষম মতভেদ সংঘটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত, বিনষ্ট, অবোধ্য ও অপাঠ্য শাসনলিপি হইতে তাহার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল লিপিই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়া, পালরাজগণের আধিপত্যকালেও বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের যে সবিশেষ চর্চ্চা ছিল, তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স সাহেব মুঙ্গেরে পালরাজগণের প্রদত্ত এক খানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন। ইতি পূর্ব্বে ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে বুদ্দলের প্রস্তরলিপি তাঁহার যত্নে আবিষ্কৃত হয়। এই শিল্পকুশল চিরস্মরণীয় মহাত্মা স্বহস্তে যে বাঙ্গলা অক্ষর সর্ব্ব প্রথম প্রস্তুত করেন, ঐ অক্ষরে ১৭৭৮ খ্রীঃ হল্‌হেড্‌ সাহেবের প্রণীত বাঙ্গলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ হুগলীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতবিৎ উইলকিন্স সাহেবের নিকট বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র যেমন অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ আছে, ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার ইতিহাসও সেইরূপ দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকাল আবদ্ধ থাকিবে। প্রস্তরলিপি, তাম্রশাসন, নামাঙ্কিত মুদ্রাদির সাহায্যে ভারতবর্ষেরইতিহাসের কত অপরিজ্ঞাত অংশ যে পুরাতত্ত্ববিৎগণের গবেষণায় প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। মহাত্মা উইলকিন্স সাহেবই এই বিষয়ে প্রথম পথ-প্রদর্শক বলিয়া ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ চিরকাল তাঁহার অবিনশ্বর নাম ও কীর্ত্তি স্মরণ পূর্ব্বক ভক্তি ও প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতার পরম পবিত্র পুষ্পাঞ্জলী তাঁহার উদ্দেশে প্রদান করিতে থাকিবে, সন্দেহ নাই।

মহাত্মা চার্লস উইলকিন্স মুঙ্গেরের তাম্রশাসনের অনুবাদ তাহার মর্ম্মালোচনার সহিত সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত করেন। এই শাসনপত্র দ্বারা মহারাজ দেবপাল দেব স্বকীয় রাজত্বের ৩৩ তম বর্ষের ২১শে মাঘ বোধ ভিক্ষুরত মিশ্রকে শ্রীনগরের (বর্ত্তমান পাটনা) অন্তর্গত মিসিক গ্রাম উপভোগার্থ নিষ্কর প্রদান করেন। দাতা ও গৃহীতা উভয়েই বিহার প্রদেশে বাস করিতেন, উভয়েই বৌদ্ধ ছিলেন। সেই সময়ে মুদ্‌গগিরিতে (বর্ত্তমান মুঙ্গেরে) পালরাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাতে রাজা দেবপালের পিতা ধর্ম্মপাল, মাতা রণ্না (কণ্না?) দেবী এবং পিতামহ গোপালের নাম উল্লিখিত আছে। ডাক্তার হারনলি বলেন, ইহাতে রাজ্যপাল দেবপালের পুত্র ও যুবরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

১৭৮৫ খ্রীঃ উইলকিন্স সাহেব বুদ্দলের সুপ্রসিদ্ধ প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপির অনুবাদ ও বিবরণ প্রকাশ করেন। বুদ্দলগাছি বর্ত্তমান দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত পত্নীতলা থানা হইতে ১০ মাইল দূরে পূর্ব্বোত্তর কোণে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে ইংরেজ কোম্পানির আমলে এক বাণিজ্যকুঠী বিদ্যমান ছিল। ১৭৮০ খ্রীষ্টীয়াব্দে বুদ্দলের প্রস্তরস্তম্ভ মহাত্মা চার্লশ উইলকিন্স কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই স্তম্ভ মহারাজ নারায়ণ পালের মন্ত্রী বেদ বেদাঙ্গবিৎ গুরব মিশ্রের আদেশে নির্ম্মিত ও লিখিত হয়। ইহাতে মন্ত্রীর বংশাবলী বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে পালবংশীয় তিন জন রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে বোধ হয় যে, জামদগ্ন্যগোত্রজ এই মিশ্রবংশ পুরুষানুক্রমে পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দের অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রস্তরলিপির শেষ ছয়টী (২৩-২৮) শ্লোকের নানা স্থানের

অক্ষর বিলুপ্ত হওয়াতে, এই ভাগের প্রকৃত ধর্ম্ম অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে, বীরদেবের পিতা শাণ্ডিল্য মিশ্রবংশের আদিপুরুষ। বীরদেবের পুত্র পাঞ্চাল। পাঞ্চালের পুত্র গর্গ। গর্গের পত্নীর নাম ইচ্ছা। গর্গের পুত্র দর্ভপাণিমিশ্র মহারাজ দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন। শর্করা দেবীর গর্ভে দর্ভপানির সোমেশ্বর নামে পুত্র জন্মে। সোমেশ্বরের পত্নীর নাম তরলা দেবী। ইহার পুত্র কেদার মিশ্র রাজা সুরপালের মন্ত্রী ছিলেন। গৌড়েশ্বর দেবপাল ভুজবলে উৎকল, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর ও হুন দেশে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। কেদার মিশ্র দেবগ্রামের বন্ধা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র গুরব মিশ্র সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া বঙ্গদেশে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি রাজা নারায়ণ পালেব মন্ত্রী ছিলেন।*

* পালরাজগণের সম্বন্ধে যে কয়টী শ্লোক আছে, তাহার মূল মাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত হইল। অনুবাদ দ্বারা অযথা প্রবন্ধের অঙ্গ বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া, তাহা প্রদান হইতে নিরস্ত রহিলাম।

খ্যাতঃ শাণ্ডিল্যবংশেকো, বীবদেবস্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালো নাম তদ্গোত্রে, গর্গস্তস্মাদজায়ত ॥ ১
পত্নীস্যা নাম তস্যাসীদ্ ইচ্ছয়াস্তর্বিবর্ত্তিনী।
... ... ॥ ৩
সুমুস্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ
শ্রীদর্ভপাণিরিতি নামনি সুপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৪
আরেবাজকোম্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলাসংহত
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ ॥ ৫
দিকচক্রায়াতভূভৃৎপরিকরবিসরদ্বাহিনো দুর্বিলোকং
প্রাপ্য শ্রীদেবপালো নৃপতি রবসতাপেক্ষয়া দ্বারি যস্য ॥৬
দত্বাপানল্পং উড়ুপচ্ছবিপীঠমস্মৈ
যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্রমুকুটাঙ্কিতপাদপাংশুঃ
সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসনাদ ॥ ৭

১৭৯৪ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ জোনাথান ডাঙ্কান সাহেব বারাণসীর নিকটস্থ সারনাথ নামক বিবিধ বৌদ্ধ কীর্ত্তিকলাপপূর্ণ স্থানে পালরাজগণের নামাঙ্কিত এক খানি প্রস্তরলিপি আবিষ্কৃত করেন। ইহাতে মহীপাল, স্থিরপাল, বসন্তপাল ও কুমারপাল—এই চারি জন পালবংশীয় রাজার নাম খোদিত আছে। এই প্রস্তরলিপি এক্ষণে কোথায় আছে, তাহা জানা যায় নাই। ইহার অনুবাদ দৃষ্টে জানা যায় যে, গৌড়েশ্বর মহীপাল বারাণসী ক্ষেত্রে ঈশান ও চিত্রঘণ্ট প্রভৃতি শত শত মন্দির নির্ম্মাণ করেন। স্থিরপাল ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তপাল বৌদ্ধধর্ম্মে সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের আদেশে ১০৮৩ সংবতাব্দের ১১ই পৌষ গর্ভকুঠী সহ তথায় এক বৌদ্ধশৈল নির্ম্মিত হয়। এই স্থিরপাল ও বসন্তপাল বিহার প্রদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন বলিয়া পুরাতত্ত্ববিৎগণ অনুমান করেন। বারাণসী পর্য্যন্ত গৌড়েশ্বর পালরাজগণের শাসন প্রভাব যে বিস্তৃত ছিল, তাহা এই প্রস্তরলিপি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছে গৌড়েশ্বর মহীপালের রাজত্বের মধ্যভাগে

উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূনগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃতদ্রবিড়গুর্জ্জররাজদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরসনাভরণং বুভোজ
গৌড়েশ্বব শ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং ॥ ১৩
যস্যাগ্রেষু বৃহস্পতিপ্রতিকৃতেঃ শ্রীসুরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব প্রজা ··· নতশিরা জগ্রাহ পূতপয়ঃ ॥ ১৫
কুশলো গুণান্ বিবেক্তুং বিজিতেষু যং নৃপঃ প্রপদং
স্থনমতি (?)
শ্রীনারায়ণ পালঃ প্রশস্তিরপরা কিয়ত্যস্তৈব ॥ ১৯

১৮৭৪ খৃঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় বুদ্দলের প্রস্তরলিপির যে মূল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত পংক্তিগুলি গৃহীত হইল।

এই প্রস্তরলিপি উৎকীর্ণ হয়, অনুমান করিয়া বহুমানাস্পদ ডাক্তার মিত্র ও কানিংহাম সাহেব প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎগণ পালরাজগণের সময় অবধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মূলের অভাবে এই লিপি হইতে পুরাতত্ত্ববিৎগণের কোন্ কথা কত দূর বিশ্বাস্য ও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইবে, বলিতে পারি না।

১৮০৬ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ কোলব্রুক সাহেবের প্রযত্নে দিনাজপুরের অন্তর্গত আমগাছিতে পালরাজগণের নামাঙ্কিত এক খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। কোলব্রুক সাহেব তাহার অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ডাক্তার হারনলি রোমান অক্ষরে তাহার মূল স্বীয় মন্তব্যের সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন।* ইহাতে পাল-রাজগণের বংশাবলি বিস্তারিত রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে একাদশ জন পাল বংশীয় নরপতির নাম জানা যাইতেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার নানা স্থানের অক্ষর বিলুপ্ত হওয়াতে, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহার যথোচিত অর্থ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে এক মত অবলম্বন করিতে পারেন নাই। এই মতভেদে পালরাজগণের পুরুষ-গণনা নিশ্চিত রূপে হইয়া উঠে নাই। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মিত্র মহোদয় ও বিজ্ঞবর ডাক্তার হারনলি সাহেবকে পরস্পর-বিরোধী দুই মতের প্রধান পরিপোষক বলিয়া স্বীকার করিলে অসঙ্গত হইবে না। আমরা ডাক্তার মিত্রের নির্দ্দেশকেই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আমগাছির শাসনপত্রের বিকৃত ও অস্পষ্ট মূল দৃষ্টে পাঠকবর্গ স্ব স্ব অভিমত নির্দ্ধারিত করিয়া লইবেন।

---

* আমগাছির সুপ্রসিদ্ধ তাম্রশাসনের প্রতিলিপি হইতে পালরাজগণের বিস্তীর্ণ বংশাবলী, ভাগলপুরের তাম্রশাসনের সহিত মিলাইয়া, নিম্নে প্রকাশিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। সংস্কৃতবিৎ পাঠকগণ ইহা হইতে স্ব স্ব অভিমত নির্দ্ধারিত করিয়া লইতে, এবং প্রবন্ধলিখিত মতের সারাসরবত্তা নিরূপণ করিতে পারিবেন। ডাক্তর হারনলির মত আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে না। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন কি না, স্মরণ নাই।

স্বস্তি।

মৈত্রীকারুণ্য-রত্ন-প্রমুদিত হৃদয়ঃ প্রেয়সীং সংদধানঃ
সম্যক্-সম্বোধিবিদ্যা-সরিদমলজল-ক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাশ্বতীং পাপ শান্তিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপাল দেবঃ॥ ১

লক্ষ্মীজন্মনিকেতনং সমকরোদ্ বোঢ়ুং ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং
পক্ষচ্ছেদভয়াদ্ উপস্থিতবতাং একাশ্রয়ো ভূভৃতাং।
মর্য্যাদা পরিপালনৈকনিরতঃ শৌর্য্যালয়োঽস্মাদভূদ্
দুগ্ধাম্ভোধি বিলাসহাসিমহিমা শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ॥

(জিজেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীন্
উপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থ পিত্রে
চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥)

রামস্যেব গৃহীতসত্যতপস স্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রেরুদয়াদিতুল্যমহিমা বাক্‌পাল-নামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্ নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রুপতাকিনীভিরকরোদ্ একাতপত্রা দিশঃ॥ ৩

তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পাল-নামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ॥ ৪

(যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্ বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাৎ উৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতো [illegible] মূর্দ্ধা
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণাং উপশমিতসমিৎশঙ্কয়া যস্য [illegible]॥)

আমগাছির তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, 'মহারাজাধিরাজ' নয়পাল দেবের পুত্র 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্' বিগ্রহপাল দেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত কোটীবর্ষ গ্রামে দুই দ্রোণ ভূমি খোভূত দেবশর্ম্মাকে প্রদান করেন। দানগৃহীতা খোভূত (?) সামবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যায়ী বেদান্তমীমাংসাব্যাকরণতর্কবিদ্যাবিৎ অক্কিবন দেবের পৌত্র ও অর্কদেবের পুত্র

শ্রীমান্ বিগ্রহপাল স্তৎসূনু-রজাতশত্রুরিব জাতঃ।
শত্রুবনিতাপ্রসাধনবিলোপিবিমলাসিজলধারঃ ॥ ৫

(রিপবো যেন গুর্ব্বীণাং বিপদাং আস্পদীকৃতাঃ।
পুরুষায়ুষদীর্ঘাণাং সুহৃদঃ সম্পদামপি ॥
লজ্জেতি তস্য জলধেরিব জহ্নুকন্যা
পত্নী বভূব কৃতহৈহয়বংশভূষা।
যস্যাঃ শুচীনি চরিতানি পিতুশ্চ বংশে
পত্যুশ্চ পাবনবিধিঃ পরমো বভূব ॥)

দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভক্তাঃ শ্রিয়ঃ
শ্রীমন্তং জনয়ত তনয়ং নারায়ণং স প্রভুং।
যঃ ক্ষৌণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টাঙ্ঘ্রি-পীঠোপলং
ন্যায়োপাত্তং অলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনং ॥ ৬

ভাগলপুরের তাম্রশাসন রাজা নারায়ণপাল দেবের প্রদত্ত বিধায়, অতঃপর ১১-১৭ শ্লোকে নারায়ণপালের প্রশংসাবাদ লিখিত হইয়াছে। এই ষষ্ঠ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ এই তাম্রশাসন অনুসারে 'শ্রীনারায়ণপালদেবম্ সৃজৎ তস্যাং স পুণ্যোত্তরং' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ( ) চিহ্নের অন্তর্গত চারিটী অতিরিক্ত শ্লোক ভাগলপুরের শাসনপত্র হইতে উর্দ্ধৃত হইল।

তাপা—জলধিমূলগভীরগর্ভে
দেবালয়ৈশ্চ কুলভূতরস্তস্য কক্ষেঃ।
বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবৎ তনয়শ্চ তস্য
শ্রীরাজ্যপাল ইত্যবনিলোকপালঃ ॥ ৭

তস্য—ব ক্ষিতি—ন নিধিরিব সহসা রাজাকূটা—পে—
পূজ্যস্যোত্তুঙ্গমৌলে দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেবা প্রসূতঃ।

শ্রীমান———ভব্য—স্নৈকরত্ন—
——তিখবিতবর্গঃ সি—বিগ্রাংস্থকয়োঃ ॥ ৮
যঃ স্বামিন রাজ্যগুণৈরনূমাসেবত
————প্রভুশক্তি লক্ষ্মী
পূর্ব্বীং সপত্নীমিব শিলপত্র ॥ ৯
তস্মাদ্ বভূব সবিতু র্বসুকোটিবর্ষী
কালেন চন্দ্র—ব বিগ্রহপালদেবঃ।

—পেন বিমলেন কলাৎপদেন
আবহিতেন পনিতো ভুবনস্য তাপঃ ॥ ১০
ভবসকলবিলক্ষং সঙ্গরে বা প্রদর্পাৎ
অনধিকৃতবিলগ্নং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
——————গসদ্ মা ভূৎ
———বনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥ ১১
তজ্জন্ তোষাসঙ্গং শিরসি কৃতপাদঃ
ক্ষিতিভূতা বিবর্ণে সর্ব্বনাঃ প্রসভ—রিব রবিঃ।
ভব—ন্নঃ স্নিগ্ধপ্রকৃতিরনুরাগো—বসতিস্ম
বাধন্যঃ প্রখোরজনি নয়পালো নরপতিঃ ॥ ১২
পিত' সঙ্গনলে বনৈঃ স্মরবিপোঃ পূজা
——বিশ্রামে –ধিকারভবন' কঃ কৃতে বিদ্বিষা'।
মস্তবাং দ্বয়মাশ্রয়ঃ শিবপাস—পেঙ্গণ—ন্দবন
শ্রীমদ্-বিগ্রহপালদেব নৃপতিঃ———— ॥ ১৩
কৃতাসান্দ্রেকরুপ্রজলতাপ্রীকরৈঃ———— ॥ ১৪

ইহা হইতে পালবংশীয় গোপালদেব, ধর্ম্মপাল ও বাকপাল, দেবপাল ও জয়পাল, বিগ্রহপাল, নারায়ণ পাল, রাজ্যপাল, শ্রী—পাল, বিগ্রহপাল, মহীপাল, নয়পাল ও বিগ্রহপাল—এই একাদশ জনের নাম যথাক্রমে উল্লিখিত দেখা যাইতেছে। নারায়ণপালের পরবর্ত্তী পালরাজগণ সম্বন্ধেই বিষম মতভেদ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ ডাক্তর হারনলি ৭—১৪ শ্লোকে উল্লিখিত নামাবলী পুনরুক্তি মাত্র বলিয়া রাজা নারায়ণ পালের উত্তর পুরুষ ছয় জন রাজার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপ করিতে চাহেন। তাঁহার মতে দেবপাল ও নয়পাল, বিগ্রহপাল ও সুরপাল, মহীপাল ও ভূপাল অভিন্ন ব্যক্তি। তিনি রাজ্যপালকে দেবপালের পুত্র, বিগ্রহপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মহীপালের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার অনুমান অনুসারে ৯০৬—১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২০ বৎসর কাল গোপাল হইতে নারায়ণপাল পর্য্যন্ত ছয় জন রাজা বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন।

ছিলেন। এই শাসনপত্র বিগ্রহ পালের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষের ৯ই চৈত্র তারিখে পোসলী গ্রামবাসী মহীধরের পুত্র শশীদেব কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হয়।

পোসলীগ্রামনির্য্যাত শ্রীমহীধরসূনুনা।
ইদং শাসনমুৎকীর্ণং শ্রীশশীদেবশর্ম্মণা॥

ইহা হইতে দেখা যায় যে, মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) বিগ্রহ পালের শাসিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই শাসন পত্রে বৌদ্ধ গোপাল দেব পাল বংশের আদিম পুরুষ ও প্রথম রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ধর্ম্মপাল ও বাক্পাল নামে গোপাল দেবের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতিকে পরাজয় করেন বলিয়া ভাগলপুরের শাসনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। কনিষ্ঠ বাক্পাল স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনাধীনে প্রধান সেনাপতির কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক নানা দেশ জয় করেন। অপুত্রক ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর বাক্পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবপাল স্বীয় পিতৃব্যের স্থলে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। দেবপাল পাল বংশীয় নরপতিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়পালের প্রতি রাজ্যশাসনের গুরুভার অর্পণ করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। মুঙ্গেরের তাম্রফলকে বর্ণিত আছে যে, দেবপাল হিমালয় পর্ব্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুদূর কাম্বোজ রাজ্য পর্য্যন্ত আপনার শাসন প্রভাব বিস্তার করেন। ভাগলপুরের শাসনপত্র অনুসারে তিনি উৎকল (উড়িষ্যা) ও প্রাগ্জ্যোতিষ (আসাম কি আলাহাবাদ?) রাজ্য আপনার শাসনাধীনে আনয়ন করেন। বুদ্দলের প্রস্তরলিপিতেও লিখিত আছে যে, গৌড়েশ্বর দেবপাল উৎকল, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর ও হুনদিগের দেশ ভুজবলে পদানত করেন। বুদ্দলের প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত সুরপাল ও দেবপাল এক অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। দেবপালের পর তাঁহার পুত্র বিগ্রহপাল (প্রথম) রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ভাগলপুরের শাসন পত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে জানা যায় যে, রাজা বিগ্রহপাল হৈহয় বংশীয় রাজকন্যা লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণ পাল রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে নারায়ণ পাল কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই বিধায়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্যকূটা (রাষ্ট্রকোটা?) পতির তনয়া ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করেন। রাজ্যপালের পর তাঁহার অজ্ঞাত নামা পুত্র এবং তদনন্তর তাঁহার পৌত্র বিগ্রহপাল, (দ্বিতীয়) রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পর তাহার পুত্র মহীপাল, তৎপর মহীপালের পুত্র নয়পাল, তদনন্তর নয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল (তৃতীয়) স্ব স্ব পিতৃ বিয়োগের পর পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। এই তৃতীয় বিগ্রহপালই আমগাছির শাসনপত্রে উল্লিখিত ভূমি খোভূত (?) দেবশর্ম্মাকে প্রদান করেন। এই শাসনপত্র হইতে পালবংশীয় একাদশ জন বিভিন্ন নৃপতির নাম জানা যাইতেছে। সুবিজ্ঞ ডাক্তার হারনলি সাহেবের মতে ইহা হইতে গোপাল হইতে নারায়ণ পাল পর্য্যন্ত মাত্র ছয় জন রাজার নাম পাওয়া যায়।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতবর রাজেন্দ্র লাল মিত্র ভাগলপুর হইতে রাজা নারায়ণ পালের প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন।

ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম ও দশম শ্লোক আমগাছির শাসন লিপিতে প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পালরাজগণের সম্বন্ধে যে কয়েক খান প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সম্পূর্ণ ও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই শাসনপত্রের দ্বারা বিগ্রহপালের পুত্র পরম সৌগত (বৌদ্ধ) রাজা নারায়ণ পাল তাঁহার রাজত্বকালের সপ্তদশতম বর্ষের ৯ই বৈশাখ তীরভুক্ত (ত্রিহুত)প্রদেশের অন্তর্গত মকুতিকা নামে গ্রাম পাশুপত আচার্য্যের শিষ্য শিব ভট্টারককে প্রদান করেন। নারায়ণ পালের মন্ত্রী বেদ বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ভট্ট গুরব মিশ্র ইহা রচনা করেন। সমতটবাসী শুভদাসের পুত্র সুলেখক মদাদাস কর্ত্তৃক ইহা লিখিত হয়। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, পাল রাজগণের শাসিত অঙ্গরাজ্য* পশ্চিমে ত্রিহুত ও পূর্ব্বভাগে সমতট (রামপাল) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রিহুত পূর্ব্বকালে তীরভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। মুদ্গগিরিতে (মুঙ্গের) পালরাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী থাকিলেও পালরাজগণ হিন্দু ও বৌদ্ধ সর্ব্ববিধ প্রজাবর্গকে সমভাবে পালন করিতেন। হিন্দু শাস্ত্র-বিৎ ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট সম্মাননা ও সমাদর করিতেন, এবং উপযুক্ততা প্রদর্শন করিতে পারিলে উচ্চতম রাজকার্য্যে পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না হিন্দুপ্রজাদিগকে ন্যায়ানুসারে শাসন করিতেন। হিন্দু-শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, বলি ও দেবপূজাদি বহুবিধ কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্ত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতবর্গকে ভূমি দান করিতেন, যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অধিকৃত রাজ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে জলাশয় খনন, অতিথিশালা ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া প্রজাবর্গের উপকার সাধন করিতেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

সুমুখী।

(নাট্য কবিতা।)

প্রথম অঙ্ক।

(স্থান স্বর্গ—কৈলাস ধাম)

উমা, জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ।

জয়া।—দেবিগো, আনন্দময়ি, জগত-জননি,
বল শুনি কেন আজি বিরস বদন ?
নয়ন-কৌমুদী ম্লান কেন ত্রিনয়নি ?
দীপ্তভালে চিন্তা কেন করে সন্তরণ ?

---

* ভঙ্গীক্রমে অঙ্গরাজ্যের নাম এই শাসনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

স্বীকৃতঃ সুজনমনোভিঃ, সত্যায়িতঃ সহবাহনৈঃ স্বীয়ৈঃ।
ত্যাগে ন যো স্তধত্তাশু, দেয়ং মেহঙ্গ রাজন্ কথাং ॥ ১২
শ্রীপতিরকৃষ্টকর্ম্মা বিদ্যাধরনায়কো মহাভোগী।
অনলসদৃশোহপি ধাম্না যশ্চিত্রং নলসমশ্চরিতৈঃ ॥ ১৫

রাজা নারায়ণ পাল বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিতগণের আশ্রয় স্থল ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী গুরব মিশ্র সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতা ভাগলপুর ও বুদ্দলের শাসন লিপিদ্বয়কে অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে।

বেদান্তৈরসুগমতমং বেদিতা ব্রহ্মতত্ত্বং
যঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু পরমঃ সার্দ্ধমঙ্গৈরধীতি।
যো যজ্ঞানাং সমুদিত মহাভূক্ষিণানাং প্রণেতা
ভট্টঃ শ্রীমানিহ স গুরবো দূতকঃ পুণ্যকীর্ত্তিঃ ॥

উছলিত সুধারাশি, শুষ্কায় অধরে ;
একি কীট, একি ছায়া, পশিল অন্তরে ?
উমা।—সখীরে, সুধাও কেন কি দুঃখ উমার,
দেবত্বের সুখ বুঝি ঘুচিল তাহার !
আহারে জনক যার, পাষাণ, অচল,—
নহিল পরাণ তার নির্ম্মম নিশ্চল ;
এই ক্ষোভ, এই দুঃখ উথলিছে বুকে ;
কি কাজ জিজ্ঞাসি আর? তোরা থাক্ সুখে।
জয়া।—আতঙ্কে কাঁপে যে প্রাণ ওগো মহেশ্বরী,
আতঙ্কে যে স্বর্গ মর্ত্ত্য করে টলমল ;
একবার ক্রোধে ধ্বংশ হল দক্ষপুরী,
যেতেছিল সুরপুরী প্রায় রসাতল ,
আবার কি ক্ষোভ আসি গ্রাসিছে পরাণী ?
সম্বর এ অভিমান, ত্রৈলোক্য-তারিণি !
বিজয়া। আহা মরি,মহেশ্বরী কি দুঃখ তোমার ?
ত্রিদিব পূজিতা তুমি ; ও রাঙ্গা চরণ,
কে আছে ত্রিলোকে যে না ধ্যায় অনিবার ?
সুরনর সবারি যে তুমিই শরণ !
হের ওই মর্ত্ত্যলোকে নররারী শত,
পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্পহারে পূজিছে তোমার ;
যুক্ত করে নম্রশিরে স্তুতি গায় কত ,
কতই দিতেছে ভক্তি প্রীতি উপহার !
ইন্দ্রের ধেয়ানে তুমি শচী তব পায় ;
চতুর্ম্মুখে চতুর্ম্মুখ তবগুণ গায়,
ওই শুন, ওই শুন, ডমরুর স্বরে,
তোমারি প্রেমের গীতি শিব গান করে।
উমা।—একি শ্লেষ,একি নিন্দা,একি অপমান !
এই কিরে প্রিয় সখি উচিত তোমার ?
চাইনা নরের পূজা, চাইনা সম্মান !
প্রসন্ন নরের ভাগ্য দুঃখ দেবতার !
মানুষীর প্রেম-ধ্যানে মত্ত মহেশ্বর ;
মহেশের মহেশ্বরী, উমা আর নয় !
আঁধার ছাইছে যেন কৈলাস শিখর ;
প্রদীপ্ত, অনন্দপূর্ণ, আজি লোকালয়।

তুচ্ছ ঘৃণ্য নরকের ধূলায় গঠিত,
ক্ষুদ্র মানুষীর শোভা এত মনোহর,
ভুলিয়ে দেবত্ব যাহে হ'ল বিমোহিত,
অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা পরম ঈশ্বর !
এরূপ যৌবনে মোর মোহ আর কই ?
নরত্বে দেবত্বে ভেদ ঘুচিয়াছে সই !
জয়া।—বিষাদে পূরিছে প্রাণ,উপজে বিস্ময় !
কে গো সে মানবী দেবি, এত রূপ কার ?
পেয়ে যারে, জগন্ময়ি, তোমার প্রণয়
তেজিয়ে, করেন শিব মরতে বিহার ?
উমা।—হের ওই মর্ত্ত্য-লোকে ভারত উত্তরে,
আমার পিতার নামে নামাঙ্কিত গিরি ;
ওরি পাদদেশে রাজা, "কোঁচ" নাম ধরে ; •
বহিতেছে ব্রহ্মপুত্র তিস্তা যারে ঘিরি।
জয়া।—আমরি কি চারুদেশ,সৌন্দর্য্যে অতুল !
মরতে নন্দন বলি মনে হয় ভুল ! •
ছোট খাট দেশ খানি বেষ্টিয়া হেথায়,
সুরম্য কানন রাজি কিবা শোভা পায় !
বিজয়া।—(জয়ার প্রতি)শোভার মাথায় বাজ,
কি দেখিছ ছাই ?
(উমার প্রতি) বল দেবি, একি দৃশ্য দেখিবারে
পাই ?
ওইযে কানন পারে সুন্দর নগরী,
দিবসে ও কেন ওরে ব্যাপিয়ে শর্ব্বরী ?
জয়া।—তাইতো,তাইতো সই,একিরে বিস্ময় !
নাজানি হবে বা হোথা কি মহাপ্রলয় !
রবির প্রদীপ্ত তেজে দীপ্ত ধরাতল,
কেন অন্ধকার হোথা ছেয়ে অবিরল ?
উমা।—দেখিতেছ যে নগরী অন্ধকারময়,
ওইতো গো সখি, কোঁচ-রাজ রাজধানী ;
হোথায় পাইছে শোভা রাজার আলয়,
সে আলয়ে আছে এক দ্বিতীয়া ভবানী।
সুমুখী রাজার মেয়ে, অনূঢ়া ষোড়শী.
তাহারি প্রণয়ে মত্ত দেব মহেশ্বর।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেহ নাই এ হেন রূপসী,
সৃষ্টির চরম নাকি ধরণী ভিতর।
পাছে কেহ স্বর্গপথে দেখিবারে পায়,
তাই দেব মায়াবল করিয়া বিস্তার;
ঢাকিয়া নগর খানি আঁধারের ছায়,
আনন্দে সদাই হোথা করেন বিহার!
আঁধার, প্রলয়-চিহ্ন নহে লো সজনি,
আছে হোথা চন্দ্র সূর্য্য দিবস রজনী।
বিজয়া।—জগৎ আরাধ্যা তুমি,সুর-নর-মাতা,
নরলোকে হবে দেবি, তব অপমান?
আজ্ঞা দেহ, পৃথ্বী বুকে বসাইয়া জাঁতা,
ধূলার ধরার করি বিনাশ বিধান।
কি ছার সে তুচ্ছ ধরা? তোমার ইঙ্গিতে,
ধূলি-চক্র-কেন্দ্র রবি, যাবে রসাতলে;
বুধ, গুরু, শনৈশ্চর নিবিবে চকিতে;
আজ্ঞা দেও সৃষ্টি ধ্বংশ করিব সবলে!
তোমারি বিনষ্ট রিপু অসুরের মেদে
জনমিল যে মেদিনী, তারি কীটগুলি,
—একিরে একিরে স্পর্দ্ধা মরে যাই খেদে—
তোমারে করিবে তুচ্ছ, গর্ব্বে মাথা তুলি?
ছিঁড়ি আকর্ষণ সূত্র, ফেলি পৃথ্বী ছুঁড়ি
অগ্নিময় সূর্য্যগর্ভে, যাক্ যাক্ পুড়ি!
তুমি যদি অপাঙ্গেতে চাহ ক্রোধভরে,
কার সাধ্য রাখে সৃষ্টি বলহে রুদ্রানি,
শিবের(ও) ত্রিশূল দেবি, টল মল করে;
তোমারি বলেতো বলী দেব শূলপানি।
উমা।—বিজয়ারে প্রিয় সই,ছিছি একি বাণী!
হলি কিরে আত্মহারা ক্রোধে অভিমানে?
ত্রিলোক পূজিত তিনি দেব শূলপাণি,
এ অনন্ত চারু সৃষ্টি যাঁহার বিধানে,
সর্ব্বলোকে পূজনীয় ত্রিশূল তাঁহাব,
রয়েছে অনন্ত লোক যাহার আশ্রয়ে,
ভ্রমেও তাহার নিন্দা করিস্‌নে আর
প্রবেশিবে মহাপাপ ত্রিদশ আলয়ে।
আমারি কপাল পোড়া নিন্দ মোরে সই,
শিবের হউক সুখ, মোরা দুঃখে রই।
বিজয়া।—সত্য দেবি,অপরাধ হয়েছে আমার,
কিন্তু কি গো করিব না কিছু প্রতীকার?
তোমারে করিয়া তুচ্ছ, হে দেবি সর্ব্বাণি,
কার সাধ্য হবে ভবে ভবের ভবানী?
উমা।—যাহা খুসী প্রিয় সই,কর্ তোরা তাই;
সন্ন্যাস কুটীরে আমি শিব ধ্যানে যাই।
ধন্যরে ধূলার ধূলা মানুষী সুমুখী,
যার রূপে, যার প্রেমে মহেশ্বর সুখী!

(প্রস্থান)

বিজয়া।—দেবীর সেবায় জয়া কর লো গমন!

(জয়ার প্রস্থান)

মর্ত্ত্যলোকে যাই আমি দেখি একবার;
দেখি সে কুঁচুনী মাগী রূপসী কেমন!
যাই যাই, সুমুখীর সাধিগে সংহার।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(সুমুখীর প্রমোদ ভবন)

সুমুখী।—এখনো কাঞ্চন শৃঙ্গ আলোকে ভাস্বর,
এখনো গেলোনা সূর্য্য অস্তাচল গায়!
এখন তো জনস্রোতে পূর্ণ এ নগর;
এখনো আকাশে—কই? দেখা নাহি যায়!
কি দীর্ঘ দিবস! ধৈর্য্য মানে না হৃদয়!
কার পদশব্দ শুনি! না না কিছু নয়।

(সুমুখীর প্রাচীনা ধাত্রীর বেশে বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া।—(স্বগত) পুড়ুক কপাল তোর; যাও ছারখার!
(প্রকাশ্যে) সুমুখি, চিনিতে মোরে পার কি এখন?
সুমুখী।—একি স্বপ্ন? ওমা একি, ধাই মা আমার?
তাইতো গো আয় আয় করি আলিঙ্গন

বিজয়া।—কবে মরি কবে বাঁচি, ভাবিলাম তাই,
একবার সুমুখিরে, তোরে দেখে যাই!
সুমুখী। ভালতো গো ছিলি তুই? দেশের মঙ্গল?
প্রাক্‌জ্যোতিষপুর হতে আসিলি কখন?
জানিতে কত কি কথা হৃদয় চঞ্চল!
বসিয়ে করগো আগে শ্রান্তি বিনোদন।
হয়েছিস্ বড় বুড়ী, ধাই মা আমার!
তাইতো গো একটীও দাঁত নাই আর?
বিজয়া।—কত দিন থাকে কার নবীন যৌবন?
চঞ্চল জগৎ, হেথা দুঃখ পরিণাম।
লাবণ্য, সুরূপ, সে তো দুদিনের ধন,
তার পড়ে ভেঙ্গে পড়ে এ দেহ সুঠাম।
শরতে অদ্রির শোভা ছিল কি সুন্দর!
এ শীতে সকলি হের হয়েছে অন্তর।
(হিমাচলকে লক্ষ্য করিয়া)
কাল দেখেছিনু ওর এলো চুলগুলি,
প্রেমের এলান কেশ গুচ্ছের মতন;
দীপ্ত নীলাকাশ তলে ছিল মাথা তুলি
যেনরে অক্ষয় বীর পুরুষ সুজন।
আজি গো মস্তক তার অমল ধবল,
ঝলিছে তুষার, শুভ্রতায় রৌপ্য জিনি;
এ জরা তাহার শিরে, ঝাড়িয়া অঞ্চল
দিয়াছে সে মৃত্যুময়ী হিম নিশিগিনী।
নিগূঢ় রহস্য মন্ত্রে বাঁধা এক সাথে,
আছে দুই জন তারা বার্দ্ধক্য যৌবন।
দিন বর্ষ আছে সবে ধরি হাতে হাতে,
ক্ষুদ্র এক স্বপ্ন মাত্র মধ্যে ব্যবধান।
সুমুখী।—আগেতো শুনিনি ধাই কখনো এমন?
এত তত্ত্ব কথা তুই শিখিলি কোথায়?
বিজয়া।—সুমুখিরে আছে তোর নবীন যৌবন,
তোর রূপে দেবতারো মন ভুলে যায়,
তাইতো এ তত্ত্ব কথা তিক্ত লাগে কাণে।
শিব শিব! সুখ, আশা, থাক্ তোর প্রাণে।
একি দেখি সুমুখীরে, শিব নাম শুনি,
গণ্ডে কেন ব্রীড়া তোর সঞ্চরে অমনি?
সুমুখী।—(স্বগত) একি দায়! পোড়া প্রাণ সামালিতে নারি!
(প্রকাশ্যে) থাক্ ছাই, এস ধাই অন্য কথা পাড়ি।
তোদের দেশের বল্ সব্‌তো মঙ্গল?
রাজা রাজপরিবার তাঁদের কুশল? [পুরে,
বিজয়া।—অতি বৃষ্টি মহামারী প্রাক্‌জ্যোতিষ-
আসে না বিদেশী কেহ থাকে দূরে দূরে।
বাণিজ্য ব্যবসা সব হল লুপ্ত প্রায়,
উঠেছে রোদন ধ্বনি দেশ যায় যায়!
নিশি দিন হোম যাগ শিব আরাধনা;
তবুও খণ্ডেনা গ্রহ বড় বিড়ম্বনা!
যাজক ব্রাহ্মণ শেষে কহিল রাজারে,
কোঁচরাজ্যে শিব নাকি, ফেলিয়া কান্তারে
বিহার করেন নিত্য; তাই নাকি আর
পৌঁছেনা কৈলাসে ভক্তি পূজা উপহার!
তাই মোরা আসিয়াছি পূজিতে হেথায়,
দেখি তাহে এ দুর্দ্দিন যায় কি না যায়!
সুমুখী। যাও সবে দেশে ফিরে শঙ্কা নাই আর,
নিরাপদ হবে দেশ কহিনু তোমার।
এই দণ্ডে প্রাক্‌জ্যোতিষ শিবের কৃপায়,
নিরাপদে পাবে স্থান শান্তির ছায়ায়।
বিজয়া।—তবে কিলো সত্য তাই, লোকে যাহা বলে?
ওকি লো ঢাক যে মুখ সহসা অঞ্চলে?
তোমারি প্রণয়ে শিব মজেছে সুমুখি?
সুখে থাক, সুখে থাক, শুনে হনু সুখী।
কিন্তু এক শঙ্কা মোর হতেছে পরাণে;
মহারুদ্র রূপ তাঁর পুরাণে বাখানে।
কেমনে মানুষী হয়ে তাঁহারে লইয়া
হয়েছ সুখিনী তুমি মরিলো ভাবিয়া! [ধাই!
সুমুখী।—শোন্ শোন্ তবে কথা কাহ তোরে
অমন মধুর রূপ চক্ষে দেখি নাই।

তরুণ যৌবন তাঁর কান্তি মনোহর,
নিয়ত ঊষার রাগ কপোল উপর!
প্রণয়-মদিরা বশে আঁখি ঢল ঢল,
সুধার তরঙ্গ যেন অধরে চঞ্চল।
হাসির জ্যোছনা খেলে শ্রীমুখে সদাই,
কি যে সে সুঠাম দেহ বর্ণিব কি ছাই!
সে অঙ্গ পরশ মাত্রে অবশ হৃদয়;
সে রূপ দেখিলে বল কার হয় ভয়?
বিজয়া।—মায়াময় মহেশ্বর; তাই তবে হবে,
ধরিয়ে মানব বেশ বিহরেন ভবে।
কিন্তু তিনি মহাদেব, জানিলে কেমনে?
প্রকাশ দেখেছ কিছু স্বরূপ লক্ষণে?
সুমুখী।—দেখি নিত্য ব্যোম পথে আসিতে হেথায়,
আসিবার পূর্ব্বে শুনি ডমরুনিনাদ;
অদৃশ্যে সতত নন্দী সঙ্গে তাঁর যায়,
শুনেছি হেরিলে তারে ঘটয়ে প্রমাদ।
আর (ও) শুন; আগমন করেন যখন,
পাদস্পর্শে ধরে ধরা, নব শোভা রাশি;
অন্ধকারে আলোকের করেন সৃজন,
জোছনায় অমানিশা ফুটে পড়ে ভাসি।
বিজয়া।— সুমুখি, বালিকা তুমি, জাননা বিশেষ;
সহসা মনেতে মোর শঙ্কা উপজিল!
মনিপুর রাজপুত্র ধরি ছদ্ম বেশ,
অবশেষে আসি হেথা তোরে কি ছলিল?
ভেল্কিবাজী জানে সে যে বড় যাদুকর,
শুনেছি তাহারো রূপ বড় মনোহর।
ছলেছে অনেক নারী প্রাক্‌জ্যোতিষ ধামে,
নারীর সতীত্বনাশ ব্যবসা তাহার।
শুনিয়াছি চারিদিকে ফেরে শিব নামে,
যাদুবলে করে নিত্য আকাশে বিহার।
নিতান্ত সে নীচজাতি মনিপুর বাসী;
সেই কি সতীত্ব তোর গেলরে বিনাশি?

সুমুখী।—শুনে যে কাঁপেরে প্রাণ ওগো মা আমার
তাইত! কেমনে আমি বুঝিব বলনা,
সত্য কি না মহাদেব এ কণ্ঠের হার;
অথবা কলঙ্ক মাত্র,—কেবল ছলনা!
দুরু দুরু কাঁপে বক্ষ, ধর মোরে ধর,
চেতনা মিলায় যে গো রক্ষ মোরে হর!
(মূর্চ্ছা)
বিজয়া।—মর তুমি সেই মোর একান্ত বাসনা!
(সুমুখীর মূর্চ্ছাভঙ্গ)
শিব-বলে পেল বুঝি আবার চেতনা!
সুমুখী।—(উঠিয়া) এখন বল্‌লো তুই কি করি উপায়?
না জানিয়া না বুঝিয়া ঘটিল কি দায়!
বিজয়া।—ভয় নাই ধৈর্য্য ধর,কে বলিতে পারে,
হয়ত সত্যই শিব প্রণয়ী তোমার!
পরীক্ষা করিয়া তুমি লইবে এবারে,
সহসা দিওনা স্থান নিকটেতে আর!
এখন আসিলে, আগে করি অভিমান,
কহিওনা কোন কথা; রেখো দূরে তারে;
তার পর, যখন সে হোয়ে আগুয়ান
প্রণয় বচনে আসি তুষিবে তোমারে,
করিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দিতে পরিচয়
পার্ব্বতীর নামে; শেষ অঙ্গীকার হলে
কোরো তাঁরে পীড়াপীড়ি দেখাতে নিশ্চয়,
কপালে নয়ন তাঁর জলে কি না জ্বলে।
অন্য কোন চিহ্নে তুমি ভুলনা কখন;
যাদুবলে যাদুকর কত কি না পারে,
কিন্তু সাধ্য আছে কার ধরে ত্রিনয়ন?
সেই গো নিশ্চিত চিহ্ন কহিনু তোমারে।
হেরিলে কপালে তাঁর সে দীপ্ত নয়ন,
"ভয়পাবে মো'রে যাবে" বলিতেও পারে।
কিন্তু সে কথায় দেখো ভুলনা কখন।
মরণ কি হয়, মৃত্যুঞ্জয় রক্ষে যারে?
সুমুখী।—ঠিক বলেছিস্ তুই তাহাই করিব,

নতুবা, না জানি চিত্ত, কেমনে সঁপিব ?
সত্য হৌক অথবা গো মিথ্যা ছলনায়
অর্পিয়াছি প্রাণ মোর মহেশ সেবায়,
অজ্ঞাতে কলঙ্ক যদি ছুঁয়েছে তাহার,
বিষ পানে, শিব নামে, করিব সংহার !
বিজয়া।—(স্বগত) ধরেছে ঔষধ মোর আর
চিন্তা নাই !
যা হবে বুঝেছি শেষ এখন পালাই।
(প্রকাশ্যে) সুমুখি, বিদায় দে গো যাই মা
নগরে,
প্রভাতে আসিব তোরে দেখিবার তরে।
(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

(স্বর্গপথে মহাদেব সুমুখীর গৃহের দিকে
অবতরণ করিতেছেন; সঙ্গে নন্দী)

মহাদেব।—নন্দি !
নন্দী।—প্রভু !
মহাদেব।—কোথা শুনি রোদনের ধ্বনি ?
ডাকিছে আমারে আজি কে সে অসহায় ?
নন্দী।—দেবদেব ! পতি-হারা কাঁদিছে রমণী,
করিছে তোমার নাম লুটায়ে ধূলায়।
মহাদেব।—দ্রুত যাও, পতি তার দেও বাঁচাইয়া,
জগতে বিচ্ছেদ জ্বালা সহিবে না কেহ,
স্বয়ং ঈশ্বর যদি প্রণয়ে মজিয়া
ধূলার জগতে আসি করিলেন গেহ !
নন্দী।—যে আজ্ঞে চলিনু তবে ! (প্রস্থান)
মহাদেব।—(সুমুখীর গৃহে অবতরণ করিয়া)
সুমুখি, কোথায় ?
নিত্য দেখি অপেক্ষিয়া থাকে দরজায় !
আদরেতে আগুসারি হাসি ভরা মুখে,
প্রেমময় বাহুপাশে বাঁধে মোরে বুকে।
কৈ গো আজি তো তারে দেখিতে না পাই :
সুমুখি ! সুমুখি ! নাগো হেথায় তো নাই।

অসুস্থতা ? অমঙ্গল ? সম্ভবে না কভু,
স্বয়ং মঙ্গলদাতা শিব যাঁর প্রভু।
মহেশ্বরী অভিমানে বধেছেন প্রাণ ?
দেবতার বক্ষে কম্প ! ! করিব সন্ধান !
সুমুখি !
(সুমুখীর প্রবেশ)
এইত মোর চাঁদের উদয় !
শশাঙ্কশেখর যারে শিরে তুলে লয় !
(অবনত মুখে সুমুখীর পরিভ্রমণ)
ধরায় কৈলাস তুমি, ভবানী, শঙ্করী ;
কাছে এস—
সুমুখী।—যাও যাও !
মহাদেব।— একি লো সুন্দরি !
সুমুখি, তোমার মুখে একি শুনি বাণী ;
কাছে এস, কাছে এস, হৃদয়ের রাণী !
(সুমুখীর দূরে গমন)
অহো, আজি সৃষ্টি কিরে নিবিবে নিমেষে !
সুমুখি ! চিনিতে তুমি পারনা মহেশে ?
সুমুখী।—থাম্, শঠ প্রবঞ্চক !
মহাদেব।—সুমুখি আমার !
সুমুখী।—যাও যাও ! !
মহাদেব।—আমি শিব চরণে তোমার !
সুমুখী।—তুমি শিব ? ছিছি তোর হয় না শরম?
জন্ম লয়ে রাজবংশে এমন ধরম ?
সতীত্ব নাশের পাপে, মনিপুর পতি !
করিবেন শিব তোর নিরয়েতে গতি !
মহাদেব।— (সগৌরবে) হের বিশ্ব পদতলে
ঘুরিছে আমার।
আমি মনিপুর-পতি ? কি কথা তোমার ?
সুমুখী।—পাপ ! পাপ ! মহাপাপ ! বলিও না
আর !
মহাদেব।—এ কি ভাষা ! এ কি স্বপ্ন দেখিছ
মায়ার ?
সুমুখী।—মায়ার স্বপন বটে ! ঠিক কথা তাই !!

(ঊর্দ্ধে চাহিয়া) এ কিরে কুহকে মোর ফেলিলে গোঁসাই !
যাও যাও, দূরে যাও, যা হবার হলো ;
করিলাম ভ্রমে সুধু কলঙ্ক স-ম্ব-ল—
নারীর সতীত্ব রত্ন কেনই হরিলে,
শিব নামে মোরে তুমি কেনই ছলিলে ?
মহাদেব।—শিবত্বে সন্দেহ ধনি,হয়েছে তোমার?
সুমুখী।—সত্য যদি শিব তুমি হইতে আমার !
আহারে যৌবন মোর সঁপিয়াছি শিবে !
যদি তুমি শিব নহ, সুমুখী মরিবে !
মহাদেব।—বল ধনি কি করিব দিতে পরিচয় ?
সুমুখী। প্রতিজ্ঞা"পার্ব্বতী নামে"কর মহাশয়।
যা সুধাব যা বলিব করিবে গো তাই।
মহাদেব।—(স্বগত) কে শিখাল এ প্রতিজ্ঞা, একিরে বালাই !
অঙ্গীকার না করিলে ক্ষুব্ধ হবে প্রাণে।
(প্রকাশ্যে) ভাল, করিলাম দিব্য পার্ব্বতীর নামে !
সুমুখী।—পুরাণে তন্ত্রেতে উক্ত শিব ত্রিনয়ন।
কপালে তৃতীয় চক্ষু দেখাও এখন।
মহাদেব।—(বিষাদে) সুমুখী ধরিগো পায়, ক্ষমা কর মোরে ;
এমন দুর্ব্বুদ্ধি বল কে দিয়াছে তোরে ?
পার্ব্বতীর নামে করিয়াছি অঙ্গীকার,
সাধ্য নাই, সাধ্য নাই, ভাঙ্গিব আবার।
করলো সুমুখি তুমি অন্য আবদার,
সে চক্ষু দেখিলে তুমি যাবে ছারখার।
দেখ চেয়ে গ্রহ তাহা আমার ঈঙ্গিতে,
জ্যোতিহীন ম্রিয়মান হয়েছে চকিতে,
ঐ দেখ রজনীতে হল সূর্য্যোদয়,
ইথে কি সন্দেহ আর, পেতে পরিচয় !
সুমুখী।—যাদুকর, যাদুবলে পারে সমুদয়,
ইহাতে কিছুই মোর না হয় প্রত্যয় !
বরংসন্দেহ বড় জনমিল প্রাণে।
দেবতা কি সুখ আশে আসিবে এখানে ?
স্বরগে শঙ্করী সদা সাথে সাথে যাঁর,
নিজসৃষ্ট কীট প্রেমে কিহবে তাঁহার ?
মহাদেব।—জাননা প্রেয়সি তুমি রহস্য ইহার ;
চিত্রকর মুগ্ধ হয় চিত্রে আপনার।
আপনি গড়িয়া মূর্ত্তি আপনি পাগল,
হয়েছে জগতে শ্রেষ্ঠ ভাস্করের দল।
সুমুখী।—কি কাজ সে কথা শুনি ? হৃদয় চঞ্চল,
দেখিতে কপালে সুধু চক্ষু সমুজ্জ্বল !
মহাদেব।— আতঙ্কে কাঁপিছে বক্ষ, সুমুখি আমার।
ছাড় এ কুমন্ত্র, কর অন্য আবদার।
সুমুখী।—হইলে প্রতিজ্ঞাচ্যুত, চলিলাম আমি। (যাইতে উদ্যত)
মহাদেব।—আজিকি সঙ্কটে হায় ত্রিভুবনস্বামী,
সুমুখি ! নিয়তি বল, কে খণ্ডিতে পারে !
অক্ষম রক্ষিতে আজি দেবতা তোমারে !
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সাধ্য কি খণ্ডিব ?
এস, এস, যাহা চাও তাই দেখাইব !
হায়, হায় ! সুমুখিরে, ফলিল কি ফল !!
এইদেখ দীপ্ত ভালে চক্ষু সমুজ্জ্বল !
(ত্রিনেত্র প্রকাশ—এবং সুমুখীর পুড়িয়া ভস্ম হইয়া পতন)
(বিষাদে অন্তরীক্ষে মহাদেব ; মৃতপুরুষের জীবনদানের সংবাদ লইয়া নন্দী উপস্থিত)
নন্দী।—দেব-দেব ! আজ্ঞাক্রমে জীবন সঞ্চার
করিয়াছি নরদেহে। কি করিব আর ?
মহাদেব।—যাও যাও, দ্রুতবেগে যাওগো আবার,
ফেল তারে মৃত্যু-মুখে বাঁচায়েছ যার !
অযুত যুবতি-পতি আরো কর বধ,
ছাড়াও পৃথিবীময় বিচ্ছেদ বিপদ।
বিচ্ছেদে কাতর যদি ত্রিভুবনেশ্বর,
বিয়োগ বিধুর তবে হোক্ নারীনর।
(উভয়ের প্রস্থান)
(যবনিকা পতন)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ছাটীয়ার জন্ম ষষ্ঠী।

বাপের পাঁরিশ (গোত্র) মত ছেলের পারিস হয়, মার মত হয় না। যে গ্রামে সন্তান হয়, সে গ্রাম অশুদ্ধ হয়। শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত পূজা পর্ব্ব কিছু হয় না। পুত্র জন্মের পাঁচ দিবস পরে এবং কন্যার তিন দিবস পরে শুদ্ধ স্নান করিতে হয়। সেই দিন ছেলের বাপ গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনে। সকলে আসিলে নাপিত প্রথমে পুরোহিত (পূঝার), তাহার পর তন্ত্রধার (কুড়াম নায়কি) মোস্তাজির পরামাণিক, যোগ মাঝি, যোগ পরামাণিক ও গোড়াইতকে ক্রমান্বয়ে কামাইয়া শেষে গ্রামের অন্য সকলকে কামাইয়া ছেলেকে কামাইয়া দেয়। দাই দুইটা দোনা (পাতের চোঙা) লইয়া ছেলেকে কোলে করিয়া দ্বারে বসে। একটা দোনায় জল, অন্যটায় ছেলের মাথার চুল থাকে। কামান শেষ হইলে যে তীরে ছেলের নাড়ী কাটা হয়, দাই সেই তীরে দুটা সুতা বাধিয়া দেয়। তখন ছেলের বাপ দোনায় তেল লইয়া পুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিয়া আসে। তাহারা ফিরিয়া আসিলে দাই তেল হলুদ সুতা বাঁধা শর লইয়া সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্নান করিতে যায়। ঘাটে গিয়া দাই চুলের দোনা ও একটা সুতা ভাষাইয়া দেয় এবং ঘাটে পাঁচ ফোঁটা সিঁদুরের দাগ দেয়। ইহাকে ঘাট কেনা বলে। অন্য সুতা ও শরটী ধুইয়া ঘরে আনে। সেই সুতায় হলুদ মাখাইয়া ছেলের কোমরে দড়ি করিয়া দেয়। ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়া দাই চালের নীচে ছেলে কোলে করিয়া প্রসূতিকে বসাইয়া চালের উপর গোবর জল ঢালিয়া দেয়। সেই জল চোঁয়াইয়া প্রসূতির মাথার উপর পড়ে। কিছু জল হাতে মাথায় ছুইয়া দেয় ও কিছু পান করে। তাহার পর প্রসূতি ঘরে গিয়া ছেলেকে খাটিযায় শোয়াইয়া দেয়। তখন দাই চালের জল খাটিয়ার কোণে ছিটাইয়া দেয়। এক দোনা লইয়া পুর্ব্বোল্লিখিত ক্রমে গ্রামের প্রধানদিগের গায়ে ছিটাইয়া দেয়। এবং আর এক দোনা জল লইয়া পর্য্যায়ক্রমে উক্ত প্রধানদিগের স্ত্রী ও গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকের চক্ষে ছিটাইয়া দেয়। তাহার পর শিশুর নামকরণ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম পিতার নামে। দ্বিতীয়ের নাম মাতামহের নামে। জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম পিতামহীর নামে ও দ্বিতীয় কন্যার নাম মাতামহীর নামে হয়। খুল্লতাত মাতুল প্রভৃতির নামে অন্য পুত্রের এবং খুড়া মাসী প্রভৃতির নামে অন্য কন্যার নামকরণ হয়। নাম স্থির হইলে দাই সকলকে দণ্ডবৎ করিয়া শীকারে ও অন্য কর্ম্মে পুত্রকে এবং জল আনিতে ও অন্য কর্ম্মে সেই নামে কন্যাকে ডাকিতে সকলকে অনুরোধ করে। তদনন্তর নীম পাতার গুঁড়া ও চালের গুঁড়া জলে ফুটাইয়া সেই জল পুরুষ ও স্ত্রীদিগকে বিতরণ করিলে ছাটিয়ার সম্পূর্ণ হয়। তদবধি শিশু কুটুম্বের মধ্যে পরিগণিত হয়। ছাটিয়ারের পাচ দিন পরে দাই ও নাপিত দুই জনে মিলিয়া আর একবার ছেলেকে কামাইয়া দেয়। হাড়িয়া (মদ) ভিন্ন সাঁওতালের কোন পর্ব্ব পূর্ণ হয় না। এবং বোঙ্গা বুদ্ধিকে না দিয়া তাহা পান করে না। এজন্য সে কথা স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হইল না।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায় চৌধুরী।

সমুদ্র।

(প্রথম প্রস্তাব)

পৃথিবীতে স্থল অপেক্ষা জলের ভাগ অনেক অধিক। পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সমুদ্রের পরিমাণ প্রায় ১৪,৪৭,১২,০০০ বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর $\frac{৩}{৪}$ অংশের কিছু কম স্থান সমুদ্র কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত।

সমুদ্রের গভীরতা সকল স্থানে সমান নহে। বঙ্গোপসাগরের যে স্থান দিয়া গঙ্গা পাতাল প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে, তাহা অতলস্পর্শ না হইলেও যে অত্যন্ত গভীর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গত ১৫ বৎসরে সমুদ্রের অনেক স্থানের গভীরতা স্থিরীকৃত হইয়াছে; তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, সেণ্টটমাস দ্বীপের ১০০ মাইল উত্তরস্থ সমুদ্রই আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর এবং উহার গভীরতা প্রায় ৪॥০ মাইল। কিউরিল দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্বস্থ প্রশান্তমহাসাগর প্রায় ৫॥০ মাইল গভীর, ইহা অপেক্ষা গভীর স্থান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পৃথিবীর মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং উহার উচ্চতম শৃঙ্গ প্রায় ৫৸০ মাইল উচ্চ। সুতরাং পৃথিবীর গভীরতম স্থান হইতে উচ্চতম স্থানের উচ্চতা প্রায় ১১।০ মাইল হইল। যাহা হউক, পূর্ব্ব কথিত স্থান দ্বয়ের ন্যায় গভীর সমুদ্র প্রায় লক্ষিত হয় না। সমুদ্রের অল্প ও অধিক গভীরতার গড় ধরিলে উহার সাধারণ গভীরতা প্রায় ৩ মাইল হইবে। তাহা হইলে সমুদ্রের ঘন পরিমাণ প্রায় ৪০,০০,০০,০০০ চল্লিশ কোটী ঘন মাইল হইবে। কিন্তু এই অসীম জল রাশি, সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করিলে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইবে। পৃথিবীকে যদি একটা কমলা লেবুর মত মনে করা যায়, তাহা হইলে তাহার $\frac{৩}{৪}$ অংশে তুলি দ্বারা জল লাগাইয়া দিলে যত টুকু জল লাগে, সমুদ্র-জলের অনুপাত তাহা অপেক্ষা বড় অধিক হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে সমুদ্র সম্বন্ধে যতগুলি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটী প্রধান তত্ত্ব এই যে, উত্তর, ভূমধ্য ও কৃষ্ণসাগর, ক্যারেবিয়া, ওখটস্ক ও চীন সমুদ্র, বাফিন ও হাডসন্ উপসাগর প্রভৃতির সঙ্গে মহাসমুদ্রের কোন সম্বন্ধই নাই। স্থলভাগের স্থানে স্থানে বসিয়া গিয়া ঐ সমস্ত সাগর ও উপসাগর উৎপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা যদি কয়েক শত ফ্যাদাম উচ্চ হয়, তাহা হইলে ঐ সকল জলভাগ আবার স্থলরূপে পরিণত হইবে।

পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন কোথাও সমতল ক্ষেত্র বিস্তৃত, কোথাও গভীর গর্ত্ত, আবার কোথাও বা পর্ব্বত শ্রেণী শূন্যে মস্তক উন্নত করিয়া বিরাজ করিতেছে, সমুদ্র তলের অনেক স্থানেও সেইরূপ বিস্তৃত সমতল, গভীর গর্ত্ত ও পর্ব্বত শ্রেণী রহিয়াছে। আটলাণ্টিক মহাসাগরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক পর্ব্বত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের চূড়া ২।৩ শত ফিট জলের নিম্নে অবস্থান করিতেছে; আর কতকগুলির উন্নত শৃঙ্গ সমুদ্রের উপরিভাগে দ্বীপরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহাঁদের মধ্যে আজোরজ্, সেণ্ট-

পল, আসেন্সান্, ট্রিষ্টান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল-দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্র গর্ভস্থ পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত। এই পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত। যে সমস্ত দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ ভূভাগ হইতে অনেক দূরে সমুদ্র মধ্যে রহিয়াছে, তাহারা হয় আগ্নেয়গিরি, না হয় সমুদ্র গর্ভস্থ পর্ব্বতের উপর প্রবালকীট দ্বারা নির্ম্মিত। সেণ্টহেলেনা, আসেন্সান্, ফ্রেণ্ডলি, স্যাণ্ডউইচ্ প্রভৃতি ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। সমুদ্রের সঙ্গে আগ্নেয়গিরির বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ প্রায় সমস্ত আগ্নেয় পর্ব্বতই সমুদ্রের উপকূলে, না হয় দ্বীপের উপর অবস্থান করিতেছে, আবার অনেকগুলির শৃঙ্গ সমুদ্র গর্ভেই রহিয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতেও সময়ে সময়ে অগ্নিশিখা, গলিত প্রস্তর প্রভৃতি পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই সমস্ত আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্নিই বাড়বানল নামে অভিহিত হইয়াছে।

নদী ও পুষ্করিনীর জল পরিষ্কার, সুতরাং পানের উপযোগী; কিন্তু সমুদ্র জলের সঙ্গে নানা প্রকার লবণ পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহা কিছুতেই পান করা যায় না। সাধারণত, সমুদ্র জলের প্রতিশত ভাগে প্রায় ৩$\frac{১}{২}$ ভাগ বিভিন্ন প্রকারের লবণ থাকে। ইহার মধ্যে প্রায় ২$\frac{৩}{৪}$ভাগ আমাদের আহার্য্য লবণ। সমুদ্র সকল স্থানে সমান লোণা নহে। যেখানে সমুদ্র হইতে প্রচুর পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হয়, সেখানকার জল অধিক লোণা। এই জন্যই উষ্ণ প্রধান দেশের সমুদ্র অধিক লোণা। এই জন্যেই ভূমধ্য সাগরের জলে কখন কখন শত করা ৪$\frac{১}{১২}$ ভাগ পর্য্যন্ত লবণ পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে যেখানে নদী প্রভৃতি দিয়া প্রচুর পরিমাণ পরিষ্কার জল সমুদ্রে আসিয়া পড়ে এবং সেই সমুদ্রের চতুর্দ্দিক যদি অনেকটা স্থল ভাগ দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তাহা হইলে সেখানকার জলের লবণের পরিমাণ কম হয়। বল্টিক সাগরের জলে এই কারণে শতকরা $\frac{১}{২}$ ভাগ হইতে ১$\frac{৩}{৪}$ ভাগের অধিক লবণ পাওয়া যায় না।

সমুদ্র জলের সঙ্গে নানা প্রকার লবণময় পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নদী জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা অনেক অধিক। এক সহস্র কলসী সমুদ্র জলের ভার এক সহস্র ছাব্বিশ কলসী নদী জলের ভারের সমান। সমুদ্র জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক বলিয়া জাহাজাদি কোন জলযান সমুদ্রে গেলে অধিক ভাসিয়া উঠে।

সমুদ্র জলে এত লবণ কোথা হইতে আসিল? উহার জল পূর্ব্বে পরিষ্কার ছিল এবং তৎপরে কারণ বিশেষের দ্বারা লবণাক্ত হইয়াছে, অথবা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই উহার জল লবণাক্ত, এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। জলের এই একটী বিশেষ শক্তি আছে যে, যে কোন পদার্থ উহার সংস্পর্শে আসিবে, তাহার কিছু না কিছু অংশ গলিয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। কাচ যে এমন কঠিন পদার্থ, তাহাতেও পরিষ্কার জল রাখিলে, কাচের কিয়দংশ গলিয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। এখন দেখা যাইতেছে যে, বৃষ্টির জল পর্ব্বতের উপর এবং পৃথিবীর নানা স্থানে পতিত হইয়া, নদী খাল প্রভৃতি দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে, সুতরাং ইহা স্থির নিশ্চয় যে, প্রতি বৎসর অসংখ্য নদী দিয়া, নানা প্রকার লবণ পদার্থ সমুদ্রে গিয়া

পড়িতেছে। এখন হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, নদী দিয়া লবণ পদার্থ সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? কই আমরা নদীর জল ত তত লোণা দেখিতে পাই না? এ কথার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, নদী জলে লবণ থাকিলেও উহার পরিমাণ অনেক স্থলে এত অধিক নহে যে, অত জলকে বিস্বাদ করিয়া ফেলিবে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই লবণের অস্তিত্ব অনায়াসেই দেখা যাইতে পারে। সমুদ্রে যে জল গিয়া পড়িতেছে, তাহাতে অল্প পরিমাণে লবণ পদার্থ থাকে বটে, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপে যে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতেছে, তাহা পরিষ্কার; সুতরাং যেমন বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, সমুদ্র জলে লবণের ভাগও তেমনি বাড়িয়া যাইতেছে।

সমুদ্র জল এইরূপে লোণা হইয়াছে, ইহা মানিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টির আদিতে সমুদ্র জল লোণা ছিল না, তৎপরে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র জল যে কোন কালে পরিষ্কার ছিল, তাহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না, বরং তাহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়; তাঁহারা বলেন, নদী প্রভৃতি দিয়া সমুদ্রে লবণ যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন আর একটী বিশেষ কারণে সমুদ্র জল এত লোণা হইয়াছে। তাহা এই;—সৃষ্টির আদিতে যখন আমাদের পৃথিবী বাষ্পাকারে অবস্থান করিত, তখন অন্যান্য পদার্থের ন্যায় সমস্ত জল রাশিও বাষ্পাকারে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, তৎপরে ক্রমে ক্রমে যখন এই জলীয় বাষ্পরাশি অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইল, তখনই বায়ুমণ্ডলস্থ নানা প্রকার লবণ পদার্থের সহিত মিশিয়া লবণাক্ত হইয়া গেল। এই লবণাক্ত জল রাশিই সমুদ্র, সুতরাং সৃষ্টির আদি হইতেই সমুদ্রের জল লোণা। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বকালে সমুদ্র জলে লবণের ভাগ যেরূপ ছিল, এখন নানা কারণে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সমুদ্রের পূর্ব্ব অবস্থা সম্বন্ধে দুইটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পৃথিবী যখন তরল হইতে কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার উপরিভাগ প্রায় এক সমতলে ছিল। সুতরাং জল সমগ্র পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। তখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় স্থলভাগ ছিল না। তৎপরে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা স্থান বিশেষ উন্নত হইয়া অল্প বা অধিক উচ্চ স্থলভাগের সৃষ্টি হইয়াছে।

আবার বর্ত্তমান সময়ের ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানা স্থানের স্তর সমূহ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান পাওয়া যায়, যাহা কোনও কালে জলের নীচে ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং জলের নীচে ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। এই মত সত্য হইলে, পৃথিবীর জন্ম হইতেই উহার উপরিভাগে স্থল ও জল রহিয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যাহাই হউক, বর্ত্তমান স্থলভাগের অনেক স্থান যে পূর্ব্বকালে জলময় ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান হ্রদ প্রভৃতির উপর দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত হইত। উত্তর মেরু সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলি ও সাহারা মরু পূর্ব্বকালে সমুদ্রগর্ভে ছিল। আবার যেখানে স্থল ছিল, এমন অনেক স্থান সমুদ্র হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব কথিত উত্তর, ভূমধ্য সাগর, হাড্‌সন্ উপসাগর প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

শ্রীকালীবর ভট্টাচার্য্য।

ইউরোপীয় মহাদেশ।

(২)

বাসগৃহের প্রত্যক্ষ ইতিহাস।

এফেল-স্তম্ভ হইতে উত্তরদিকে বাহির হইয়া দুই ধারে মানব সমাজের আদিম অবস্থা হইতে বাসগৃহের পর্য্যায়ক্রমে কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে, (Histoire de L'Habitation de l'homme) তাহা দেখাইবার জন্য প্রায় ১৪ রশি লম্বা ও ২ রশি প্রস্থ স্থান ব্যাপিয়া প্রমাণ গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বকালের বাসস্থান গুলি ৪ শ্রেণীতে স্থাপিত।

১। ছাদহীন প্রস্তর-প্রাচীর-বেষ্টিত সামান্য আশ্রয় স্থান।

২। গুহা গৃহ।*

৩। হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা-হেতু জলাশয় মধ্যে প্রোথিত শঙ্কু পরি স্থাপিত কুটীর। অস্ত্রাদির অসদ্ভাবে জলন্ত অঙ্গার দ্বারা কাঠ কাটা হইত, দেখান হইয়াছে।†

* পুরাশৈলিক (Palæolithic) ও নবশৈলিক (Neolithic)যুগে ইউরোপ ও আসিয়া খণ্ডস্থ বহু গুহা প্রাথমিক (Primitive) মানবের বাসস্থান ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বুশমান প্রভৃতি কতিপয় অসভ্য জাতি গুহা ভিন্ন অন্য রূপ আশ্রয় জানে না।

† ইতিহাস বহির্ভূত (Prehistoric) কালে ইউরোপের অনেক হ্রদে এই রূপ গ্রাম সমূহ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে বোর্ণিও (Borneo), সিলিবিস (Celebes) ও কারোলীন দ্বীপপুঞ্জে (Caroline islands), নবগিনির (New Guinea) অন্তর্গত ডোরী উপসাগরে (Bay of Dorei) মধ্য আফ্রিকার মোর্হ্রিয়া (Morhrya) হ্রদে (গোলাম ধরা ডাকাইতদের ভয়ে), দক্ষিণ আমেরিকার মারাকাইবো খাত(Gulf Maracaibo) প্রভৃতি বহুস্থানে এরূপ গ্রাম দেখা যায়। কাশ্মীরেও না কি হ্রদ মধ্যে বাসস্থান আছে।

৪। বল্গা হরিণ (Reindeer), মার্জ্জিত প্রস্তত (Polishd stone), পিত্তল (Bronze ও লৌহ (Iron) যুগের (Epoch) কতক পরিষ্কার গৃহাদি।

ঐতিহাসিক কালের গৃহগুলি ৫ পংক্তির সভ্যতার অন্তর্ভূত করা হইয়াছে।

১। প্রাথমিক সভ্যতা।

২। আর্য্য-সভ্যতা।

৩। রোমাণ পাশ্চাত্য সভ্যতা।

৪। রোমাণ প্রাচ্য সভ্যতা।

৫। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সভ্যতা, যাহা ভারতি-ইউরোপীয়(Indo-European) সভ্যতার বহির্গত, সুতরাং সমগ্র মানবসমাজের উন্নতি পক্ষে কাজে আসে নাই।

খ্রীঃ পূ ১৫০০ অব্দের রাজা সিসষ্ট্রীসের (Sesostris) আমলের মিসরীয় অট্টালিকা; সিরীয়; ফিনিসিয়; খ্রীঃ পূ ১০০০ অব্দের হিব্রু ও ইট্রস্কান; খ্রীঃ পূ ৭০০ বৎসরের আসিরীয়; পেলাস্গিয়; ৪৫০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের পেরিক্লিসের (Pericles) সময়ের গ্রীক; ৩০০ খ্রীঃ পূ অব্দের হিন্দু; পারস্য; রোমাণ; বাইজান্তাইন; আরব; ৪০০বৎসের পূর্ব্বেকার মেক্সিকোর আদিম নিবাসী আজতেকগণের বাটী (Aztecs); বর্ত্তমান কালের স্কাণ্ডিনেবীয় ও আফ্রিকান অসভ্যগণের কুটীর; কাফ্রি ক্রীতদাসদের কুটীর; সুদানীয়; চীন, ও জাপানীয় গৃহ এবং লাপলণ্ড দেশের একটী বরফাবৃত ক্ষুদ্র গ্রাম; এই স্থানের প্রধান দৃশ্য।

ইতিহাসের পুরাকালিক অসভ্যাবস্থার

আবাসগুলিতে কালোপযোগী বস্ত্রাবরণ সহ তদবস্থ মানুষের মূর্ত্তি রক্ষিত। ঐতিহাসিক ও বর্ত্তমানের গৃহ প্রাসাদ অট্টালিকাতে সেই সেই দেশীয় স্ত্রী পুরুষদিগকে স্ব স্ব পোষাক পরিচ্ছদে তত্তৎস্থানীয় বিক্রয়ার্থ দ্রব্যাদি সহ রাখা হইয়াছে। মহাশিল্পী গার্ণিয়ে (M. Garnier) এই স্থানে যেরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করত সমস্ত ঠিক যথাযথ ভাবে প্রস্তুত ও নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত দেশের পুরা ও বর্ত্তমান তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও সাধারণ দর্শক একমুখে তাঁহার ভূয়সি প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। এমন কি, স্থানে স্থানে প্রয়োজন মত অতি প্রাচীন কালের চিত্রাদি দৃষ্টে তদনুরূপ পোষাক প্রস্তুত করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ধন্য গবেষণা ও ধন্য তাহার প্রত্যক্ষ প্রচার। শতপুস্তক পাঠেও যে জ্ঞান লাভের সান্ত্বনা নাই, এক প্রহর কাল এই স্থান পরিদর্শন করিলে তাহা অনায়াসে পাওয়া যায়। জগতের সভ্যাসভ্য সমস্ত জাতিকে শিক্ষা দিবার জন্য ইউরোপ, বিশেষ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জর্ম্মনি যেরূপ অতুলনীয় উদ্যম, উৎসাহ ও যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন, ও করিতেছেন, সংসার সে ঋণ কখনই পরিশোধ করিতে পারিবেনা। আমরা এমনি হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া জাতি যে, এরূপ সহজ সস্তা জ্ঞানোপার্জ্জনেও পরাঙ্মুখ। কি যে ভয়ানক আলস্য অবসাদ ও অনিবার্য্য "পয়সার চিন্তা" আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না; কল্পনার সয়তান জীবন্তভাবে আমাদের উপর চূড়ান্ত যথেচ্ছাচারের সহিত অবাধে রাজত্ব করিতেছে। "শিক্ষিত" বলিয়া যাঁহারা দারুণ অভিমানগ্রস্ত, তাঁহারা যেন মনের কোণেও স্থান না দেন যে, অশিক্ষিতাপেক্ষা তাঁহারা অনেক উচ্চদরের জীব, উনিশ বিশ তফাত মাত্র, প্রায় এক লাঙ্গলের বলদ। এম, এ, ডি, এল উপাধিধারী "দশ টাকা রোজগারক্ষম" মিউনিসিপাল কমিশনর, জষ্টিস অব দি পিস্ ইত্যাদি ইত্যাদি মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু নিধিরাম ঘোষ রায় বহাদুর ও স্কন্ধে বাঁক-ধারী "দুপয়সা উপায়ক্ষম" গ্রাম্য পঞ্চায়েতের মোড়ল, দধি-দুগ্ধ-বিক্রেতা, দীনতার্ণব, নিরক্ষর, শ্রীহীন দুঃখীরাম ঘোষ গোয়ালাতে বড় বেশী তারতম্য নাই। আর সকল অসংখ্য অগণ্য মহা মহাব্যাপার থাকুক, কেবল এই সামান্য স্থানব্যাপী "মানব বাসগৃহের প্রত্যক্ষ ইতিহাস" টুকু ইউরোপীয় ক্ষমতার যেরূপ পরিচয় দিতেছে, এইরূপ পরিচয় দিবার যোগ্য হইতে পণ্ডিত মোহানন্দ (দুষ্ট ?) সরস্বতী, ডাক্তার দুনিয়াদাস (অ ?) বিদ্যা-হিমালয় এ, বি, সি, ডি, প্রভৃতি মহাশয়গণের কত জন্ম কাটিয়া যাইবে, তাহার ঠিক নাই। প্রস্তুত অন্নে বেগুণ পোড়া মাখিতে আমরা খুব মজবুত; কোন লুপ্ত প্রাচীন গ্রন্থ দৈবযোগে হাতে পড়িলে তাহার অনুবাদ, নকল বা বেমালুম চুরি করিয়া মহাগবেষক বলিয়া বাহবা মারিতে সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত, কিন্তু মৌলিক তত্ত্বাদির বেলায় দন্তবিকাশ, তখন ৮০ বছরের জরাগ্রস্ত (Fossilized) বৃদ্ধা মাতামহীও যেখানে, আমিও সেখানে; বিশ্ববিদ্যালয়াদির উপাধির তাড়া বগলে করিয়া দিদিমার অঞ্চল অবলম্বন করত হেঁসেল ঘরের আশ্রয় লই। মহাবীর ষ্টানলে (Stanley) যেরূপ উদারতা, উচ্চশ্রেণীর সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতা এবং বিপুল ক্ষমতা ও অসাধারণ অধ্যবসায় প্রকাশ করিয়াছেন, করিতেছেন এবং আরও কত করিবেন, আমাদের দেশে

কোন্ কালে কয়জন সেপথে তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন? শুধু পাড়া ও শ্বশুর বাড়ীর স্ত্রীলোকদের কাছে দশ বার গণ্ডা পাশের বাহাদুরী মারিলে, এবং অন্দরমহলে ভার্য্যার নিকট বড়াই করিলে মনুষ্যত্ব হয় না। শ্বশুর বাড়ীতে আড়াল হইতে শাশুড়ীর মুখে যদি শুনিলেন, "এমন জামাই হয় না, গড়্ গড়্ করিয়া পাঁচগণ্ডা পাশ দিয়াছেন, আবার এই বয়সে হাকিমী চাকরি করিয়া আমার খেন্তকে গা সাজাইয়া গহনা দিয়াছেন, এক গোছা কোম্পানির কাগজ করিয়াছেন, এমন গুণবান ছেলে বিশ্ববাঙ্গালায় আর একটী মেলা ভার," আর রক্ষা নাই, ভীমার্জ্জুন, নিউটন, দার্ব্বীন-বাঞ্ছিত পদ তাঁহার নিকট তুচ্ছ, উচ্চাশার চরম শিখরে উন্নীত হইয়া ভাবে গদ গদ। এত সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র যাহার আকাঙ্ক্ষার দৌড়, সে ব্যক্তি ত জন্মিবামাত্র মৃত, তাহার "জীবন" দুর্গন্ধময় শটিত শবমাত্র, সর্ব্বপ্রকারে সমূহ ক্ষতির কারণ। আর এক কথা;—পুরুষের প্রতি, "ভাল চাকরি ও সোণার দোয়াত কলম," এবং স্ত্রীলোকের প্রতি "চেলী চন্দ্রকোণা ও সোণার-বাউটী মুক্তার-মালা পরা" যে দেশের প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ, সেদেশে আশীর্ব্বাদ-দাতা ও তদ-গ্রহীতা উভয়ে উচ্ছন্নের পথে কত দূর গিয়া পড়িয়াছেন, সুবৃহৎ ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণও তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। কেবল জড়! কেবল জড়! কেবল জড়! চারিদিকে জড়েরই সম্মান, জড়েরই পূজা, জড়েরই রাজত্ব। হায়! এত জড় কত শতাব্দীতে মুক্ত হইবে, জানি না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব বড় শক্ত জিনিস, কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া এক মাত্র ন্যায় ও কর্ত্তব্যের পথে সোজা খাড়া হইয়া চলিতে হয়, ভাবরাজ্যে অনেক উচ্চে উঠিতে হয়, সংসারে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ পদদলিত করিয়া সুদূর দৃষ্টিতে অগ্রসর হইতে হয়, কূপ হৃদয়কে প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় বিস্তৃত করিতে হয়, দেশ কালের ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে অন্তরে স্থান দিতে হয়, তবে মনুষ্য নামের যোগ্য হওয়া যায়, নচেৎ গোরিলা, বুশমান ও আমাতে কোনই প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

আবার বলি, পাদরীশূর ধর্ম্মাত্মা মহা-প্রেমিক ডাক্তার লিভিংষ্টোনের (Living-stone) মত ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানবিস্তার ও উৎপীড়িত দীন দুঃখী ধর্ম্মহীন কাফ্রি জীব সমূহের উদ্ধার হেতু দেহ প্রাণ সমর্পণের ভাব, আমাদের মধ্যে কয় জনের হৃদয়ে স্থান পায়? "যোগ" "ভক্তির" বাহাড়ম্বর সম্বন্ধে অনেকের মুখে অনেক লম্বা কথা সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যোগভক্তি লাভের প্রথম ও প্রধান উপায় জ্ঞান কর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকের নিকট শুনি। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়; যেখানে নির-বচ্ছিন্ন আলস্য, বিনাব্যয়ে চক্ষুবুজিয়া আমিরী আরাম, সেইখানে আমাদের ষোল আনা ঝোঁক; আর যেখানে স্বার্থত্যাগ, শরীর মনের পরিশ্রম, সেখান হইতে আমরা সহস্র-হস্ত দূরে থাকি। মৃত্যুর পরপারে যোগভক্তি চর্চ্চার বিপুল অবকাশ পাওয়া যাইবে, কিন্তু কর্ম্মের আশা নাই; অতএব মন, মস্তিষ্ক, হস্ত পদাদি থাকিতে উহাদের সদ্ব্যবহার না করিলে শেষে দারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। বিধাতা আমাদিগকে ইহ সংসারে জড় চৈতন্যের আশ্চর্য্য সম্মিলন স্থল এই শরীর মন দিয়া এরূপ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা সম্পাদিত ছোট ছোট

কর্ম্মেও আমরা বহু উন্নতি লাভে সক্ষম হই। ক্রমাগত ত্রিরাত্রি নয়ন মুদিত করিয়া ধ্যান করিলে যত দূর অগ্রসর না হওয়া যায়, জল হইতে উদ্ধার করতঃ একটী ডুবন্ত বালকের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলে তদপেক্ষা সহস্র গুণ উচ্চে উঠা যায়। অতএব আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, এ পৃথিবীতে কর্ম্মই ঈশ্বরের উপাসনা ও আরাধনা।

"Work is Worship."

এফেল স্তম্ভের দক্ষিণে

সুয়েজ পানামা গৃহ।

সুয়েজ ও পানামা। টাওয়ারের ডাহিন দিকে প্রথম সুয়েজ ও পানামার ঘর। এটী হিব্রু ধরণের এক আজব গঠনের গৃহ। সুয়েজখালের অবিকল নকল একটী প্রকাণ্ড টেবিলের উপর রাখা আছে। অনেকগুলি দর্শক জমা হইলে ঘর অন্ধকার করিয়া দিয়া বহুসংখ্যক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যাতিক আলোক দ্বারা খাল আলোকিত করা হইল। জোনাকীর মত আলোগুলি জ্বলিতেছে, বয়া ভাসিতেছে, জাহাজ যাইতেছে, দুই ধারে সুয়েজ ও পোর্টসায়েদ বন্দরে অনেক জাহাজ লাগিয়া আছে, ভারত ও ভূমধ্য সাগরে কত জাহাজ ভাসিতেছে। এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক খেলাঘরের সুয়েজ খাল। চারিদিকে খালের কল, কারখানা, সাজ, সরঞ্জামের নকল সাজান রহিয়াছে।

পানামা।—পাসিফিক্ ও আটলান্টিক মহাসাগরদ্বয়কে যোগ করিবার জন্য যোজকের এপার ওপার পানামা (Panama) হইতে কোলোন (Colone) পর্য্যন্ত ৫৪ মাইল যে খাল কাটা হইতেছে, তাহার কল কারখানা শুদ্ধ খালের কাণ্ড উল্লিখিতরূপে আর এক স্থানে রক্ষিত। সুয়েজে কেবল মরু কাটিয়া খাল করিতে হইয়াছে, এখানে উপরান্ত পাহাড় কাটিতে এবং কতকগুলি নদীর সহিত তাল রাখিতে হইবে। আবার দুই সমুদ্রের জলের উচ্চতায় বিলক্ষণ তারতম্য, উভয়ের সহিত মিল রাখিয়া খালের ব্যবস্থা আবশ্যক। সুতরাং অনেক প্রকার কল ব্যবহার হইতেছে, প্রদর্শিত হইল।

কনফিদারেসিও আর্জেন্তিনা গৃহ।

আর্জেণ্টাইন বা রৌপ্য সাধারণতন্ত্র।—স্থানীয় নাম Confederacion Argentina অর্থাৎ লাপ্লাটা ও পাটাগোনিয়া মিলিত রাজ্য। প্রত্যেক ঘরেই তদ্দেশের প্রচলিত মুদ্রা সমূহ, ৩৪ খানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সাধারণ ও রিলিফ ম্যাপ ও প্রধান দৃশ্যাবলী, উদ্ভিদ, জীব জন্তু ও মহৎলোকের ফটোগ্রাফ এবং অন্যান্য প্রকার চিত্র; এবং স্থানীয় আচার ব্যবহারাদি বিজ্ঞাপক ছবি ও মূর্ত্তি অতি সুন্দর ভাবে রক্ষিত। চিত্র মধ্যে গ্রাণ চাকোর (Gran Chaco) প্রধান শিকারবন ছবি অতি মনোহর। পারাণা (Parana) নদীর তীরবর্ত্তী জীব জন্তু সমাকীর্ণ একটী গভীর জঙ্গলের নকল অতীব চিত্তরঞ্জন। ইন্দুর জাতীয় গিনিশূকর, ক্ষুদ্রকায় টুকো টুকো (Ctenomys Braziliensis), হিংস্র জাগুয়ার, ক্ষুদ্র হরিণ এবং নানাবিধ পক্ষী ও সরীসৃপাদির সমাবেশ এক নূতন কারখানা। উদ্ভিদের মধ্যে এক প্রকার নূতন জাতীয় তালবৃক্ষ (Trithrinax) ও নারিকেল-খর্জ্জুর (Cocos Detib), অর্থাৎ নারিকেলের মত গাছ, খেজুরের মত ফল; এবং রেশমের ন্যায় কোমলভাবে উজ্জ্বল রৌপ্যবর্ণ শীষ (panicle, ধান্যের ন্যায়) বিশিষ্ট তোতোরাস (totoras), পাম্পাসতৃণ (Gynerium argentum) নয়ন আকৃষ্ট করিল।

লৌহ, তাম্র ও রৌপ্যের খনির নকলও দেখান হইয়াছিল। মুর্ত্তির মধ্যে ল্যাসো (lasso) ও বোলাস (bolas) সর্ফাঁস-চর্ম্মরজ্জু র গোচ্ছা সহ ছোট গোব্দা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন মিশ্র গাউকো (Gaucho) জাতীয় অর্দ্ধ সভ্য পুরুষ ও পেরুদেশের স্বাধীনতাদাতা সেনাপতি সান-মার্টিনের (General San martin) ঘোড়সওয়ার মূর্ত্তি বিশেষ দ্রষ্টব্য। স্থানীয় দ্রব্যজাতের মধ্যে পশম, চর্ব্বি, লোনা-মাংস, উষ্ট্রপক্ষীর পালক, রৌপ্য, লৌহ, কয়লা, অস্ত্র শস্ত্র, স্থানীয় ব্যবহার্য্য ও ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি প্রদর্শিত। পল্টনের পোশাকগুলি নূতন ধরণের। রাজধানী বুঞ্জায়েরার (Buenos Ayres) রিলিফ নক্সা (plan in relief) সুন্দর সহরের উপযুক্ত।

ব্রাজীল গৃহ।

ব্রাজীল বা সুন্দর বিহঙ্গের রাজ্যঃ—জঙ্গল। প্রকৃত দৃশ্যের কৃত্রিম অনুরূপ যেন জীবন্তভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে; সুদীর্ঘ হইতে অতি হ্রস্ব বিচিত্র পুচ্ছবিশিষ্ট নানা বর্ণের গাছের পাখীগুলি* মৃত কি জীবিত, ঠিক করা কঠিন। সাপগুলি (sorrocuco, jarraraca প্রভৃতি) এরূপ ভাবে ফণা ধরিয়া আছে যেন পরমুহূর্ত্তেই ছোবল মারিবে। নাগ ভয়ে পলায়মান ছোট ছোট জন্তুগুলি ঠিক যেন ছুটিতেছে। ২০।২২ হাত লম্বা বোয়া (Boa Constrector) একটী শূকরকে জড়াইয়া বধ করিতেছে। দেশীয় অসভ্য স্ত্রী-লোকের গলহার রূপে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র উজ্জ্বল স্বর্ণ প্রবাল সর্প শান্ত নীরিহভাবে পড়িয়া আছে। বনবিড়াল, তরক্ষু, জাগুয়ার, শ্লথ, সজারু প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ। এক অনুপম দৃশ্য। বলিহারি সাজান।

উদ্ভিদঃ—এই অট্টালিকায় একটী প্রকাণ্ড উদ্ভিদাগার (green house) স্থাপিত; তথায় ব্রাজীল প্রদেশের বিশেষ বিশেষ লতা গুল্ম বৃক্ষাদি জীবন্ত রাখা হইয়াছে। এক একটী বৃক্ষে শৈবাল হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রকারের এত পরগাছা যে এ সকল দেশে (ইউরোপে) বহু-আয়তন ভূমিখণ্ডে অত উদ্ভিদ একত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। বৃক্ষারোহী লতা (Canisteria প্রধানত Malpighianœ জাতীয়) গাছে গাছে ফিরিয়া মালার ন্যায় শোভমান। বৃক্ষ ও পরগাছা গুলিতে নানা বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত। আমাদের শিমুলগাছ এখানে দেখা গেল।

চিত্রঃ—আমাথন * (Amazon) নদী তীরস্থ পারুয়াকুয়ারার (Paruacuara) জঙ্গল ও পর্ব্বত শ্রেণী; পারা (Para) নগরের বাজার; রাজধানী রাইয়ো জেনেরোর (Rio de Janeiro) দৃশ্যাবলী বিশেষ দ্রষ্টব্য।

মূর্ত্তি—মলাটো (mullattoes), মামালুকো (mamalucos), মেষ্টিজো (mestizoes) ও ছাঁকা আদিম নিবাসীগণের আচার ব্যবহার-ব্যঞ্জক বহু মূর্ত্তি রক্ষিত।

দ্রব্যজাত—কাফি, চিনি, তামাক, চা, স্বর্ণ, হীরক ও নানা প্রকার মূল্যবান প্রস্তর, অস্ত্র শস্ত্র, স্থানীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির পোষাক ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি এবং ঐতিহাসিক নানা প্রকার সামগ্রী রক্ষিত।

* জঙ্গলের সমস্ত জীব সজীবের ন্যায় রক্ষিত (stuffed)।

* ব্রাজীলের ভাষা স্পেনীয়, উহাতে z আমাদের থর ন্যায় উচ্চারিত। ইংরেজী ভাষায় ভূগোল পাঠ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নাম আমরা যে রূপ উচ্চারণ করিয়া থাকি, তাহা অনেক স্থলে ভুল।

মেক্সিকো গৃহ।

১২।১৪ কাঠা জায়গা ব্যাপিয়া এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ। ইহার ভিতর তিন থাকে ঠাশা জিনিষ পত্র; তন্মধ্যে কোন্ কোন্টীর কথা বলিব, জানি না; অন্যান্য গৃহের ন্যায় ইহার বর্ণনা করিতে পারাও দুঃসাধ্য। মান্ধাতার আমল হইতে যে দেশে যাহা কিছু আছে, তাহা সংগ্রহ করিতে ফরাসিগণ যথাসাধ্য ত্রুটি করেন নাই; এবং প্রত্যেক দেশের শিল্পী, কারিকর, ব্যবসায়ী প্রভৃতি শ্রম ও পণ্যজীবী ব্যক্তিগণ লাভের আশায় বিজ্ঞাপনোদ্দেশে আপনাপন জিনিষ পত্র পাঠাইতে সাধ্যমত কসুর করেন নাই; এমন কি, নানাবিধ আহার ও পানীয় দ্রব্য, ঔষধ ও খাট, চৌকি, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি প্রত্যেক গৃহের যথেষ্ট স্থান ঘেরিয়া রাখিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে উপরোক্ত গৃহগুলির বর্ণনা দ্বারা কেবল মাত্র তাহাদের সমূহ অপমান করা হইয়াছে, প্রকৃত অবস্থার কণা মাত্রও প্রকাশ করা হয় নাই। অতএব ভবিষ্যতে ওরূপ গুরুতর অপরাধ হইতে নিবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

টোলটেক (Toltecs), আজটেক (Aztecs), মায়া (Mayas) প্রভৃতি-সভ্যাসভ্য আদিম নিবাসিদের সময় হইতে বর্ত্তমান ইউরোপীয় অধিবাসিগণের কাল পর্য্যন্ত যত প্রকার দ্রব্য এই প্রাচীন দেশে বিদ্যমান আছে, তাহা সম্ভবমত সংগৃহীত হইয়াছে।

এইরূপে বোলিভিয়া (Bolivia), ইকোয়েডর (Equador), ভেনেজিউলা (Venezuela), কলম্বিয়া (Colombia), পেরু (Peru) উরুগুয়ে (Uruguay), পারাগুয়ে (Paraguay), চিলী (Chili) প্রভৃতি দেশ এক একটী গৃহে প্রদর্শিত। এই অংশে শিশুদের প্রীত্যর্থ নানাবিধ সামগ্রী একটী প্রাসাদে রক্ষিত।

এফেল স্তম্ভের বামদিকে।

গ্যাস কোম্পানির ঘর।—নগরে গ্যাস কোম্পানির যে প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য আছে, ইহা তাহারই অনুরূপ। সন্ধ্যার পর ইহার ছাদ, চূড়াশ্রেণী, বারাণ্ডা, দ্বার, গবাক্ষাদি বেলওয়ারের দীপমালা দ্বারা আলোকিত হয়। ঠিক যেন সমস্ত বাটী সুসজ্জিত ভাবে অগ্নিময়।

টেলিফোন গৃহ।—টেলিফোনালয় একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহ। এখানে মহাত্মা এডিসন (Edison) কর্ত্তৃক প্রকটিত টেলিফোনের প্রথমাবস্থা হইতে আধুনিক উন্নতি পর্য্যন্ত সকল প্রকার যন্ত্রাদি প্রদর্শিত ও দর্শকগণ কর্ত্তৃক ব্যবহার দ্বারা পরীক্ষিত হইতেছে।

সুইডেন দেশের গৃহ।—এখানে সুইডেন দেশের নানাবিধ দ্রব্যজাত ও কল কৌশলের মধ্যে দেশালাই, কাচ ও চিনেমাটীর সামগ্রী প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রদর্শিত। রাজধানী ষ্টকহলমের নিকটস্থ Skurusund এর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও গোটেনবর্গ নগরের চিত্র মনোরম।

নরওয়ে গৃহ।—সমুদ্রে মাছ ধরিবার নানা প্রকার কল কৌশল; বল্গা ও এল্ক, হরিণ ও অন্যান্য জন্তু (stuffed); এবং লাপলাণ্ডবাসীদের কুটীর ও গার্হস্থ্য জীবনজ্ঞাপক মূর্ত্তি ও বল্গা হরিণের রথাদি জীবন্ত ভাবে দেখান হইয়াছে। চিত্রের মধ্যে "সাত ভগ্নীর প্রপাতের" সহিত Geiranger Fjord এর নানা প্রকার ছবি সুন্দর। ইহার নিকটে রুশ দেশের ছোট ছোট খড় ছাওয়া কাঠের ঘর; ফিনলণ্ড দেশের গৃহ; মোনাকো

প্রদেশের অট্টালিকা; লোহাই (pastel) দ্বারা পলস্তরা করা গৃহ ও তাহাতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী; ও তুর্কি তামাকের ঘর;—এই স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাক অর্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রায় এক পোয়া ক্রীত হয়। একজিবিশনে প্রদর্শিত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের দ্রব্য সামগ্রী ঠিক সেই সেই দেশের প্রথানুসারে নির্ম্মিত প্রাসাদাদিতে রক্ষিত, ইহা কম বাহাদুরীর কথা নয়।

মধ্যস্থলে।

এফেলখণ্ড হইতে বাহির হইয়া অকূল সমুদ্রে পড়িলাম; আর কূল কিনারা পাইবার জো নাই। ৩।৪ বিঘা ব্যাপিয়া এক একটী চত্র, তদুপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা:—কোনটীতে ভাস্কর কার্য্য সমূহ; কোথাও বৃহৎ বৃহৎ তৈল ছবি; কোন গৃহে কেবলই জলচিত্র (water color paintings); কোথাও অগণ্য কল কারখানা বাস্প ও তাড়িত বেগে হুশ্ হুশ্ করিয়া চলিতেছে; কোন স্থানে হাতে চালান যন্ত্র সকল রক্ষিত, চারিদিকে নানা দেশের রেলগাড়ী ও এঞ্জিন সাজান রহিয়াছে; কোন বৃহদট্টালিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে সভ্য জগতের নানা রাজ্যের অসংখ্য শ্রেণীর বিবিধ প্রকারের পণ্য দ্রব্য; কোথাও দশ বারকাঠা স্থান জুড়িয়া কেবলই স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মাণিক, মুক্তা, প্রবালাদির বহুবিধ অলঙ্কার। কোন খানে প্রকাণ্ড ঘর সাজান কেবলই ঘড়ি; কোথাও খালি চিনের বাসন; এক স্থানে শুধু ফরাসি রেশমের বস্ত্রাদি; অন্যত্র পোষাকের ব্যবহার্য্য হরেক রকমের কৃত্রিম ফুল, পাতা, লতা; মেমের পোষাকের স্থান শেষ করা দায়; কোথাও কেবলই ধাতব ব্যবহার্য্য দ্রব্য সমূহ; কোন খানে কেবলই বৈদ্যুতিক কারখানা, কোন গৃহে ব্যোমযান সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত সরঞ্জাম ও বৃত্তান্ত; কোথাও ভিন্ন ভিন্ন জাতির নৌকা ও অর্ণবপোতাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নকল ও তদ্বিবরণাবলী; কোন ঘরে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারি কাণ্ড কারখানা; এক অতি প্রকাণ্ড প্রাসাদে যুদ্ধাদি সম্বন্ধীয় অসংখ্য ব্যাপার:—এফেলস্তম্ভের ন্যায় এখানে সর্ব্বদা ভয়ানক ভিড়, অতি কষ্টে প্রবেশ করা গেল। ভিতরে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম, তাম্বু কানাত, যান বাহন, পোষাক, রসদ, অস্ত্র শস্ত্র না আছে, এমন জিনিষ নাই। এক একটা অজগর কামান দেখিলে চক্ষু স্থির। যুদ্ধ সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারির কল কৌশল যে কত রকম প্রদর্শিত, তাহা গণনা করা অসাধ্য। তবু অনেক জিনিষ অপরের অজ্ঞাতসারে সময়শিরে কাজে লাগাইবার জন্য হাতে রাখা হইয়াছে। হাঁসপাতাল, সেতু, পরিখা, গড়বন্দি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ দেখান হইয়াছে, এমন কি, যুদ্ধকপোতকে শিক্ষা দিবার জন্য যে প্রণালী আবশ্যক, তাহাও দর্শকগণের গোচর করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রাচীন যুদ্ধাদি ও ওয়াটারলু প্রভৃতি মহা সমরের দ্রব্য সামগ্রী ঐতিহাসিক বিভাগে রক্ষিত। ঘোড় সওয়ার, পদাতিক প্রভৃতি সৈন্যগণের গতি বিধি এরূপ স্বাভাবিক মূর্ত্তিতে গঠিত যে, এক এক স্থানে চমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। পুরাকালের অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রাদিও প্রদর্শিত। যুদ্ধ বিক্রম গৌরবোন্মত্ত ফরাসি বীরগণ এই প্রাসাদে জাতীয় যুদ্ধবিদ্যাবৃদ্ধি নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সাধ্যমত ক্রটী করেন নাই। জর্ম্মনির নিকট পরাস্ত হইলে কি হয়? বৈজ্ঞানিক স্থল-যুদ্ধে প্রখর-যোদ্ধা উৎসাহপূর্ণ ফরাসি কোন জাতির নিকট নতশির নন। গৃহের একাংশে জল-যুদ্ধের

সাজ সরঞ্জাম ও জাহাজাদির নকলও রক্ষিত। যত শীঘ্র হয়, সাংসার হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যাওয়াই উচিত, তজ্জন্য বহু দেশের জ্ঞানী পুরুষ সম্যক চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং এ বিষয়ে প্রাণ খুলিয়া খাঁটি প্রশংসা করিতে পারা গেল না। ফরাসিগণ নিজেরাও পৃথিবীতে ভ্রাতৃশোণিত-পাত আর দেখিতে চান না; একজিবিশনের প্রচারিত উদ্দেশ্য সমূহ মধ্যে, পরস্পরের সংশ্রবে বিশেষ আলাপ পরিচয় দ্বারা প্রেমসূত্রে বদ্ধ হইয়া সংসারে শান্তি সংস্থাপন করা একটী প্রধান। যদিও রাজকর্ম্মচারিগণ মধ্যে কেহ কেহ জর্ম্মণদের প্রতি দারুণ কোপ প্রকাশ করিতে ছাড়েন না, কিন্তু সাধারণ প্রজাবর্গ ক্রমে সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়া শান্তিপ্রিয় হইয়াছে! ফরাসি ভূমিতে অনেক বার রক্তপ্রবাহ চলিয়াছে; আর ভাল দেখায় না।

এইরূপে কোন স্থানে চিকিৎসা শাস্ত্রের নানা বিভাগের ঔষধ পত্র, অস্ত্র যন্ত্রাদি; কোথাও রসায়ন ভূতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর বিজ্ঞানোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী কল কারখানা; এক সম্পূর্ণ দিশাহারার ব্যাপার, যথাযথ বর্ণনা করে সাধ্য কার? কেবল কলঘরের বিষয় কিছু বলা উচিত।

কলঘর।—এফেল স্তম্ভের ন্যায় ইহাও ইঞ্জিনিয়ারির এক অত্যদ্ভুত কাণ্ড; পৃথিবীর মধ্যে এক ছাদে এত বড় বাড়ী আর একটী নাই। ইংরেজ মার্কিন ঐক্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন "It is the largest building under one roof in the world." ৩৭৭ ফুট পরিসরের (span) উপর এক খিলান। সমস্ত সভ্য জগতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজনৈতিক চিহ্ন (coat of arms) মধ্য স্থলে চিত্রিত। অধিকাংশ কল ফরাসিদের, কিন্তু ইংলণ্ড, বেলজিয়ম, মার্কিন প্রভৃতি অন্যান্য দেশেরও বহু কল দুই সহস্র অশ্বশক্তি (2000 horse power) দ্বারা ঘণ্টায় পাঁচ লক্ষ কিলোগ্রাম বাষ্প কর্ত্তৃক চলিতেছে। কলে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে, অতি চমৎকার। এই ঘরের একাংশে এডিসনের উন্নত ফনোগ্রাফ (phonograph) দ্বারা দর্শকগণ প্রকৃত মানুষের স্বরে কলের গান শুনিতেছেন। দোমসান্ত্রাল গম্বুজ ২৫০ ফুট উচ্চ ও ১০০ ফুট পরিধি বিশিষ্ট। প্রাসাদ ও বাতিঘরের উপযুক্ত বহু শ্রেণীর বৈদ্যুতিক দীপ এখানে প্রদর্শিত। কতকগুলি কল তাড়িত বলে চলিতেছে।

পাশ্চাত্য রাজ্য সমূহের ভিন্ন ভিন্ন ঘরের বর্ণনা অসম্ভব; সুতরাং এই বিরাটকাণ্ডের বাহিরে পূর্ব্বদেশে যাওয়া যাউক।

জাপান গৃহ।—আসিয়া খণ্ডের এই ক্ষুদ্র দ্বীপ বর্ত্তমান সময়ে বেশ উন্নত; এবং অধিকতর উন্নতির জন্য রাজ্য ও সমাজের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিয়াছে। অতি অল্প কালের মধ্যে জাপান কত নিম্ন হইতে কত উচ্চে উঠিয়াছে, দেখিয়া উহার পথ অনুসরণ করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য! ঐ টুকু দেশে পঁচিশ হাজার রীতিমত স্কুল, আর কি চাই? এই খানে প্রদর্শিত জাপানের রেশম, চিনে মাটি, সোণা রূপা ও এনামেলের (enamel) কাজ অতুলনীয়; নেকরে (nacre) লিখিত গ্রন্থাবলী, বাক্স, ছাতা, বাঁশের জিনিষ পত্র ও কৃত্রিম পুষ্প অতি চমৎকার; "হেমেজিগাবা" চর্ম্ম-পোর্টম্যাণ্টো, পুতুল ও পাণ্টিলের (pantile) কাজে আর কোন জাতি জাপানকে পারে কি না, সমূহ সন্দেহ। ইহার পরেই পারস্য গৃহ; তথা হইতে বাহির হইয়া একেবারে মিসর দেশে,

কায়রো রাজপথে।

(বিখ্যাত Street du Caire.)

এখানে দাঁড়াইয়া কাহারও সাধ্য নাই বলিতে যে, আমরা ইউরোপে; ঠিক যেন পূর্ব্বরাজ্য উঠাইয়া আনা হইয়াছে, বাস্তবিকও তাই।—জনৈক ফরাসি কর্ম্মচারী (M. Delort de Cleon) কর্ম্মোপলক্ষে বহুকাল মিসরে বাস করেন, এবং নীল নদী তীরবর্ত্তী প্রদেশে তাঁহার বহু দূর গতিবিধি ছিল। ইঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে অনেক জীর্ণ প্রাসাদাদি ভাঙ্গা হয়; সেই সময় হইতে ইনি মাল মস্‌লা সংগ্রহ করেন, এবং ঐ সকল কাষ্ঠের কাজ করা বারাণ্ডা, দরজা, প্রকৃত গবাক্ষাদি (মুস্‌আরাবী) দ্বারা এই স্থানে বহু প্রাচীন হইতে বর্ত্তমান প্রথানুসারে পঁচিশটী বড় বড় বাড়ী, একটী মসজিদ ও মিনারেট (minaret) এবং কয়খানি দোকান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। গন্ধী আতর, ফুলেল তেল বিক্রয় করিতেছে; নান্‌বাই বাখরখানি, চপাটি প্রভৃতি সাজাইয়া বসিয়া আছে; হালোয়াই রোতলুকুম মিষ্টান্ন সজ্জিত লোগিয়া সম্মুখে করিয়া পা ছড়াইয়া উপবিষ্ট; কোথাও আরবেরা বিকট চিৎকার করিয়া গান গাইতেছে, কোন বাড়ীতে মিসরী সুন্দরীগণ বিশেষ হাব ভাব সহ নৃত্য গীত দ্বারা দর্শকবৃন্দের চিত্তরঞ্জন করিতেছে, কোন স্থানে বানর-নাচ ও সাপ-খেলান হইতেছে; রাস্তায় বহু স্ত্রীলোক বালক গর্দ্দভপৃষ্ঠে বিচরণ করিতেছে; পথে, মিস্‌রী, আরব, ইউরোপীয় প্রভৃতির ভিড় ঠেলিয়া চলা ভার; হুবহু মিসরের গুলজার বাজার। ১০০ গর্দ্দভ তাহার সরঞ্জাম ও সহিস ও দোকানদার নর্ত্তকী বাদ্যকর প্রভৃতি খাশ কায়রো হইতে আনা হইয়াছে। বলিহারি! বলিহারি! বলিহারি! এ স্থানটী অতি মনোরম, এক মজার ব্যাপার।

ইহার পরে মরক্কো বাজার, তদ্দেশীয় নৃত্য গীতাদির ব্যাপার, চীন ও ভারতভবন। শেষোক্ত স্থানে সাদা পাগ্‌ড়ি, চাপকান, পাজামাধারী দেশের খানসামাগণ চা বিস-কুটাদি দ্বারা দর্শকবৃন্দের সেবা করিতেছে। এই অংশস্থিত হাইটী দ্বীপ, গুয়াটিমালা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরের নামোল্লেখ মাত্র করিয়া অন্য দিকে যাওয়া যাউক। আপেক্ষিকতার দরুণ এই সকল সুন্দর বিচিত্র-গঠন হর্ম্ম্যগুলি এখানে অকিঞ্চিৎকর হইয়া রহিয়াছে, নচেৎ এমন একটী ঘর আমাদের ৮৪ সালের একজিবিশনে থাকিলে কত লোকের চক্ষু সার্থক হইত। এখান হইতে প্রদর্শনী প্রদক্ষিণকারী

দিকবিল (Decauville) রেল

দ্বারা ভিন্ন অংশে চলিলাম। এই রেলের ছোট ছোট খোলা গাড়িগুলি ঠিক কলিকাতার ট্রাম গাড়ির মত। রেলপথের দুই ধারে পৃথিবীর মৃত জীবিত বহু ভাষায় বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন (placards) প্রচারিত রহিয়াছে;—যেন কেহ গাড়ী হইতে হাত, পা, মুখ না বাড়ান;—তন্মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত প্লাকার্ড দেখিয়া বড় আনন্দ হইল, কিন্তু বঙ্গভাষায় বিজ্ঞাপন না পাওয়াতে দুঃখিত হইলাম; হিন্দি, উর্দ্দু প্রভৃতির সঙ্গে বাঙ্গালা থাকা নিতান্ত উচিত ছিল, ফরাসিদের এই ক্রটি আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না।

আদর্শ গ্রামাবলী।

উক্ত রেলে যে অংশে উত্তীর্ণ হইলাম, তথায় কতকগুলি গ্রামের নকল স্থাপিত।

তন্মধ্যে প্রধান যবদ্বীপ (Java), সেনিগাল (Senegal), মালগেচিয়া (Malgachia), টাহিটী (Tahiti), কঙ্গো (Cango), নব কালিডোনিয়া (New Caledonia) ও গাবম (Gabon)। পৃথিবীর নানা স্থানীয় দূর দূর দেশের ২০।৩০।৪০ জন অধিবাসী সহ খড় বাঁশ তালপাতা প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত পাশাপাশি এক এক খানি গ্রাম; কি বিচিত্র ব্যাপার। এই গুলি দেখিলে ঠিক সেই সেই স্থানের গার্হস্থ্য জীবন প্রত্যক্ষ করা যায়। স্থানীয় দোকান পসার ও স্থানীয় লোক স্থানীয় ভাবে ঐখানে এই কয় মাসের জন্য জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি চাই? এক জন ইংরেজ পণ্ডিত প্রকাশ করিয়াছেন, এরূপ নিশ্চিন্ত, নিরাপদ, বিনা ব্যয়ে, বিনা ক্লেশে, স্বল্প সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন আর কি প্রকারে সম্ভবে? "We can linger in a Tahitian village, a Cingalese, Cochin Chinese, or Chanack, and examine the inhabitants; then going round the world not in eighty days, or even eighty hours, but in an hour or an hour and a half and without danger of being killed or eaten, which is certainly an advantage." এরূপ ব্যবস্থা যে ফরাসি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সম্ভবে, তাহা বিশ্বাস হয় না; তবে মার্কিন-উৎসাহ ভয়ঙ্কর সতেজ, বিশেষ এই রেশারেশি স্থলে উহারা কত দূর করিবে, এখন বলা কঠিন। পৃথিবীর আর কেহ যাহা একপক্ষে করিতে সক্ষম হয় না, আমেরিকগণ তাহা এক দিনে সমাপ্ত করে। জনবুল-শ্রেষ্ঠ অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সর উহাদের অত্যদ্ভুত উৎসাহ ও অমানুষিক উদ্যম দেখিয়া হতভম্ব হইয়াছিলেন। উদ্যম, উৎসাহ উন্নতি ত মার্কিনের; এ কথা সংসারের সবাই স্বীকার করিতে বাধ্য; শরীর মন অবিশ্রান্ত খাটাইতে এরূপ আর কেহ পারে না। না হইবে কেন? জন্ বুল সন্তানের নূতন দেশে নূতন ভাবে বিকাশ আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায়, জগতের বিশেষ শিক্ষার বিষয়। বাস্তবিক, মানব দেহ ধারণ করিয়া এই নশ্বর শরীর মন যদি নররূপী নারায়ণের সেবাতে না লাগাইতে পারিলাম, ধিক আমার জন্ম। ওরূপ স্থলে জড়ে ও আমাতে তফাৎ কি? বরং জড় আমা অপেক্ষা অনেক গুণে উপকারী;—জড়কে জীব ইচ্ছামত ব্যবহার দ্বারা যথোপযুক্ত কাজে লাগাইতে পারে; আমার সেটুকু উপযোগীতাও নাই। "যায় যাবে যাক্ প্রাণ, তোমার কর্ম্ম সাধনে," কেবল মুখের কথা, গানের বুলি; কাজের বেলায় গা হাত পা কামড়ায়, মাথা ধরে, ক্লান্তি বোধ হয়, ঘুম পায়; কিন্তু আবার সেই দুর্দ্দম্য আলস্যের সময় যদি ফাঁপা বাকপটুতা প্রকাশের কোন অবকাশ উপস্থিত হয়, অমনি তৎক্ষণাৎ সকল আবল্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া জন্মবাগ্মী মহাপুরুষ। এত অকর্ম্মণ্যতা সত্ত্বেও আমাদের জাঁক কমে না, এই বাহাদুরী—এক মুখে বিদ্যার জাঁক, বুদ্ধির জাঁক, মান্ধাতার আমলের বিগত গৌরব ও লুপ্ত সভ্যতার জাঁক, রূপের জাঁক, গুণের জাঁক, ধর্ম্মের জাঁক, কর্ম্মের জাঁক, জাঁকের জ্বালায় দুনিয়া অস্থির; কেবল শুনিতে পাওয়া যায় না, বর্ত্তমান সময়ের বলবীর্য্যের জাঁক, কারণ ওখানে ত শুধু বাকচাতুরীতে কুলাইবে না, শক্তি সাহসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির করিতে হয়; সুতরাং ঐটী ছাড়া, অর্থাৎ শরীর মনের বল বিক্রম ব্যতীত, এমন জিনিষ নাই, যাহা আমাদের ছিল না

বা এখন নাই। কেবল অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ, নতুবা আর কোন দুঃখ নাই, সকলই ঘরে মজুত!

যবদ্বীপ।—এখানকার মানুষ ক্ষুদ্রকায় ও পীতবর্ণ। স্ত্রীলোকগুলি দেখিতে অনেকটা আসাম প্রদেশের নাগাদের ন্যায় কিন্তু বড় কৃশ। গ্রামের নিকটে একটী নাট্যশালা, তথায় বিচিত্র পোষাকে অভিনব দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে যুবতী নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছে; এক নূতন আমোদ ও শিক্ষার বিষয়। এই নাটমন্দিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম, কিঞ্চিৎ জলযোগ ও যাবানী নৃত্য গীত বাদ্য দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা নয়ন মনকে প্রীত করা গেল। যাবানীরা পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিল, এখন মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত।

টাহিটী।—পশ্চিম আফ্রিকার সেনিগাল, কাফ্রিগ্রামের পার্শ্বে টাহিটী গ্রাম। অধিবাসীগণ তাম্রবর্ণ, সুচারু গঠন ও মধ্যমাকার। ইহাদের ভাষা, বিশেষ স্ত্রীলোকদের কথার স্বর অতি মধুর, চিরবসন্ত বিরাজিত, মনোহর সুগন্ধ পুষ্প শোভিত রমণীয় দ্বীপের উপযুক্ত। ইহারা খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে দীক্ষিত।

নব কালিডোনিয়া।—এখানকার স্ত্রীলোক এত কুৎসিত যে, প্রবল কল্পনার দ্বারাও ওরূপ কদাকার ভাবিয়া উঠিতে পারা যায় না। বহুদিন ফরাসিদিগের শাসনাধীনে থাকা সত্ত্বেও এই প্রশান্ত সাগরস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপে অনেক নরমাংস-লোলুপ রাক্ষস জাতীয় মানুষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

গাবন।—আফ্রিকার গিনি উপকূলস্থ গোরিলার আবাস ভূমি গাবন গ্রাম খানিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়। এ স্থানের কীট পতঙ্গ সংগ্রহ প্রাণীতত্ত্ব-শিক্ষার্থীর পক্ষে অতি উপাদেয়। অধিবাসীগুলি সাধারণ কাফ্রি অপেক্ষা অনেকাংশে সুন্দর ও সুশ্রী! এখানকার লাল পিপীলিকা বড় ভয়ানক।

আলজিরিয়া, টিউনিস প্রভৃতি দেশের বাড়ী, মস্‌জিদ, মিনারেট, গাছপালা, দ্রব্যজাত, অধিবাসী ও বাজারাদির নাম মাত্র উল্লেখ করিয়া স্থানান্তরে যাইব।

ক্রমোন্নতির ঐতিহাসিক গৃহ।

এই প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য বাহির হইতে যেমন সুন্দর, ভিতরের কাণ্ড কারখানা ততোধিক হৃদয়গ্রাহী ও গভীর উপদেশ পূর্ণ। দুঃখের বিষয় সম্যক বর্ণনা মানব ক্ষমতার অতীত; চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ না করিলে ঠিক ঠাক বুঝা অসম্ভব। কোথাও মানবজাতির পূর্ব্ব পুরুষ পর্ব্বত গুহা হইতে উকি মারিতেছেন, গুহা পার্শ্বে ব্যাঘ্র দণ্ডায়মান, কোথাও উলঙ্গ মনুষ্য কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি বাহির করিতেছেন; কোন বৃক্ষতলে বল্কল-পরিহিত দীর্ঘকায় পুরুষ চকমকি ঠুকিতেছেন; কোন গৃহে মিসরীয় স্ত্রীলোক শিশুক্রোড়ে তাঁত বুনিতেছেন; কোন উদ্যানস্থ টোলে গ্রীক পণ্ডিত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছেন; কোথাও রোমাণ রাজসভা, আদালত; আবার কোন দিকে প্রাচীন অসভ্য ইউরোপের কামারের দোকান; কোথাও কালডীয় মেষপালক জ্যোতিষ্কমণ্ডল পরিদর্শন করিতেছেন; কোন স্থানে বল্‌গা হরিণ ও শীলমৎস্য সহ শিবিরবাসী এস্কিমোর সংসারাশ্রম; কত বলিব? এ প্রকারে নানা দেশের নানা যুগের, নানা অবস্থার সামাজিক জীবন, তত্তৎকালিক বেশ ভূষা ও আচার ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র যন্ত্রাদি সহ জীবন্তভাবে প্রদর্শিত; হঠাৎ তাকাইলে বোধ হয় যেন স্ত্রীলোকের হস্তস্থ মাকু এখনি চলিবে, কামা-

রের উত্তোলিত হাতুড়ি এই মুহূর্ত্তেই নেহা-নের উপর ঠনাৎ করিয়া পড়িবে। এই হর্ম্ম্যের এক পার্শ্বে নানা দেশ হইতে সংগৃহীত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সাক্ষী স্বরূপ জিনিষ পত্র ও ছবি রক্ষিত।

নিকটস্থ একটী গৃহে নানা দেশের নানা বিধ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখান হইতেছে। এখান হইতে বাহির হইয়া নিকারাগুয়া (Nicaragua) ঘরে তদ্দেশের নিকটস্থ প্রশান্ত মহাসাগরের নকল অতি চমৎকার;—ছোট ছোট জাহাজ ভাসিতেছে, নদীর স্রোত, হ্রদের ঢেউ, সাগর তরঙ্গ বাস্তবিক অদ্ভুত; কাচের উপর প্রকৃত জল দ্বারা এই সকল দৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

অদূরে আর একটী ঘরে পৃথিবীর আয়তনের নিযুতাংশের পরিমাণ এক বিরাট গোলক। গোলকটীর সমস্ত অংশ দেখিতে গেলে তিন থাক উঠিতে হয় এবং প্রদক্ষিণ দ্বারা বিলক্ষণ ক্লান্তি বোধ হয়। এই স্থানে ছোট বড় নানা রকমের গোলক প্রদর্শিত।

আর এক স্থানে কলে ঐকতানবাদন চলিতেছে, এবং নিকটেই পর্সিপলিস্ নগরের ভূগর্ভ হইতে নবাবিষ্কৃত প্রাচীন পারসিকগণের আহুরা মাজদার উপাসনা মন্দির, ঠিক ঠাক সেই ভাবে নির্ম্মিত হইয়া উপাসকাদি সহ বিদ্যমান।

এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চ স্তম্ভ এবং তাহার চূড়ায় উঠিবার তাড়িত কলের ব্যবস্থা, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের নাচ, গান, থিয়েটর, তামাসা; এবং নানা জাতীয় নানা শ্রেণীর অগণ্য হোটেল, কাফে (cafe), রেস্টরাঁ (restaurant), কাবারে (cabaret) প্রভৃতি পানাহারের গৃহ, হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও ক্ষুদ্র দোকান।

নদী পারে।

ঠিক সম্মুখে ট্রোকাডেয়ারো দুই বিশাল পক্ষ (wing) বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। প্রাঙ্গনে কৃত্রিম ঝরণা ও বৃহৎ এক ফোয়ারা চারিটী বড় বড় পাথরের জন্তুর দ্বারা ধৃত;—ষাঁড়, ঘোড়া, গণ্ডার ও হাতি। প্রাসাদের ভিতরে এক প্রকাণ্ড হল, তথায় টেবিল চেয়ারাদি সরঞ্জাম সহ প্রায় পাঁচ হাজার লোক বসিয়া আহার করিতে পারেন। অন্যান্য প্রকোষ্ঠে প্রাচীন ও আধুনিক ভাস্কর-কার্য্য, ফটোগ্রাফ ও পৃথিবীর সভ্যাসভ্য নানা জাতীয় পোষাক, অলঙ্কার, ব্যবহার্য্য দ্রব্য সামগ্রী, অস্ত্র শস্ত্র, যন্ত্র তন্ত্র, বাদ্য বাজানা ও নর নারীর মূর্ত্তি রক্ষিত। এ স্থানটী সাময়িক ভাবে একজিবিশনের সামিল হইয়াছিল, কিন্তু আসলে এই খণ্ড একটী স্থায়ী মিউজিয়ম।

এপারে বন, উপবন, নদী, সেতু, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, ফল এবং জীবিত জলচর জন্তু সমূহ প্রদর্শিত।

বিশ্বপ্রদর্শনী শেষ করিলাম, কিন্তু কিছুই বলা হইল না; এজন্য ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে পাঠক মহোদয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা চক্ষে আর দেখা যাইবে না, কেবল কাগজে-কলমে ও চিত্রে যতদূর হয়। ইউরোপীয়গণ সহজ জীব নন; কয়েক মাস হইতে লণ্ডনস্থ Oxford Cyclorama হলে পৃথিবীর অন্যান্য বহুবিধ দৃশ্যের সহিত পারিস একজিবিশনের ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড এরূপ ভাবে দেখাইতেছেন যে, ঠিক আসল বলিয়া ভ্রম হয়; দেখিতে দেখিতে হঠাৎ যেন বোধ হয় পতাকাগুলি উড়িতেছে। "মডরণ ট্রুথ" (Modern Truth) নামক পত্রিকার মত

নিম্নে উদ্ধৃত হইল; তাহাতে কতক বুঝা যাইবে, কি প্রকার কাণ্ড।

"No words could give the faintest idea of the wonderful realism of the representations. You look along the landscape for miles and miles and are entranced. So perfect is the method employed that the haze of the atmosphere and that chiaroscuro which many of our best painters fail to catch, is faithfully reproduced. The green herbage on the mountain side is so vivid and apparently so near that you feel as though it were possible to stretch out your hands and pluck a cowslip from its vernal bed. We are charmed and have forgotten when the circle is completed that we are in England's metropolis. It is simply astounding in its verisimilitude."—29th March, 1890.

যাহাই হউক, সেই রমণীয় নন্দনকানন; সেই বৃক্ষরাজির পত্র মধ্যে তাড়িতালোকের বিচিত্র শোভা; সেই অগণ্য নর নারীর জনতা; সেই শিল্পজ ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মেলায় রূপের বাজার; চারিদিকে সেই আনন্দহিল্লোল; মূল কথা, সেই সর্ব্বতোভাবে মনোহর ও বিরাট বিশ্ব-প্রদর্শন কোন শিল্পীর সাধ্য নাই জগৎকে আর একবার দেখায়।

বিগত শত বৎসরে জগতে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এই প্রদর্শনী তাহারই জীবন্ত প্রমাণ। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অসহ্য ফরাসি রাজশক্তি নাশ করিবার উদ্যোগ আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত কয় বৎসরের কি লোমহর্ষণ রক্তস্রোত দ্বারা উহা ভাসান হয়; আর আজ ১৮৮৯ অব্দের শেষ ভাগে পারিস একজিবিশনের অবসানে ১১ই নবেম্বর তারিখে বিশাল ব্রাজিল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর প্রজাবন্ধু ষষ্টাধিক বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ সম্রাট ডম পিড্রো (Dom Pedro) অর্দ্ধ শতাব্দির সুশাসনের পর রাজ্যের ভবিষ্যৎ হিতোদ্দেশে প্রকৃতি-রঞ্জনার্থ নিঃশব্দে নিজের ও বংশাবলীর জন্য সিংহাসন স্বত্ব জলাঞ্জলি দিয়া প্রিয় ব্রাজীলের নিকট জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করত ইউরোপ যাত্রা করিলেন;—শান্তভাবে প্রজাপরতন্ত্র শাসন প্রণালী সাম্রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইল।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন

প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ।

স্বাস্থ্যরক্ষা শাস্ত্রে যাহাই বলুক, প্রত্যুষের নিদ্রাটুকুর মত তৃপ্তিদায়ক জিনিস, এই দুঃখের সংসারে বড়ই বিরল। সাগর পাড়ি দিয়া, কূলে আসিয়া সাগরের সৌন্দর্য্য দেখার মত; সেতারে রাগিণী আলাপের পর, গতের ঝঙ্কারের মত; অতি ভোজনের পর, একটু "রসনার রস" চাট্‌নি চাটিবার মত; এবং মাতালেরা বলিতে পারেন যে, অতিমাত্রায় নেশা করিবার পর, একটু খোঁয়ারী ভাঙ্গার মত; এই প্রত্যুষের নিদ্রায় অনেক সুখ। আর স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ? যাহারা নিত্যসুস্থ, অথবা যাহারা স্বাস্থ্যেরই প্রতিমূর্ত্তি, সেই বিদ্যালয়ের শিশুছাত্র ভিন্ন শোনে কে? এ কথায় কেহ হয় ত টেনিসনের বচন তুলিয়া বলিবেন, "Cursed be the sickly forms that err from honest

Nature's rule." যাহাই বল বাপু, অভিধানের বোঝা ঘাড়ে করিয়া সাহিত্য চর্চ্চা; আর স্বাস্থ্যরক্ষার গ্রন্থ কুক্ষিগত করিয়া "প্রবৃত্তি কুত্র কর্ত্তব্যা"র অনুসন্ধান; আমা হইতে হইবে না। তবে যিনি ত্রেতায় সূর্য্যকে কুক্ষিগত করিয়া, রাত্রি বাড়াইয়াছিলেন, তাঁহার পবিত্র বংশোদ্ভব মহাত্মারা, পারিলে পারিতে পারেন। দোহাই ডারবিন্ সাহেব, আমি সেই গৌরবান্বিত দলভুক্ত নহি।

কিন্তু আমার প্রত্যূষ নিদ্রার অনেক ব্যাঘাত। আমার এই সুখের পথে অনেক কণ্টক। বিধাতা! শোভার শোভা, রূপের রূপ অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রতারকা তোমার যে অঙ্গুলীর সৃষ্টি, এই কর্কশ কণ্ঠ, কদাকার, কুরূপ, কৃষ্ণকায় কাক জাতি কি সেই অঙ্গুলী গঠিত? তোমার পরম রমণীয় বিহঙ্গ-জগতে এত কলকণ্ঠ, 'এত চিত্রিত বিচিত্রিত পক্ষী থাকিতে, এ কাকের সৃষ্টি কেন? বাজখাই আওয়াজের ভয়ে আমার এ জীবনে, সঙ্গীত শিক্ষা হইল না, আর আমার "ঘরের চালে পালে পালে" এত বাজখাই ছড়াইয়া দিলে কেন? পরীক্ষিত সর্পযজ্ঞ করিয়াছিলেন, আমি কাকযজ্ঞ করিব। আমি কাকের জ্বালায় প্রাণ ভরিয়া প্রত্যূষে নিদ্রা যাইতে পারি না। যে দেশে কাক নাই, সে দেশে কি রাত্রি প্রভাত হয় না? যেথানে বক্তা নাই, সেখানে কি স্বদেশ-প্রেম জন্মে না? যেথানে উকীল নাই, সেখানে কি ন্যায় বিচার চলিতে পারে না? যাহাদের পুরোহিত নাই, তাহাদের কি ধর্ম্মলাভ হয় না? যে ঘরে পত্নীর মা নাই, সে ঘরের কি গৃহিনীপনা বন্ধ থাকে? যাহারা মদ খায় না, তাহারা কি আমোদ প্রমোদ করে না? ভারতমাতার বিশ কোটী সন্তান, যদি প্রতিজন এক একটী করিয়া কাক বধ করেন, তবে এ কাককুল অচিরাৎ নির্ম্মূল হয়; আর আমি সুখে এই শরতের প্রভাতে, আনন্দে একটু নিদ্রা যাই।

রাত্রে এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। তাই প্রভাতে, ঈষৎ মাত্রায় শীত বোধ হওয়াতে, বিছানার চাদর খানি তুলিয়া গায় দিয়া, একটু খানি মিঠে রকমের ঘুম ঘুমাইতেছি; এমন সময় সেই "কা-কা" শব্দ, চৈত্রের রৌদ্রে ঢাকের শব্দ অপেক্ষাও কর্কশ হইয়া কাণে গেল। রাগ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম; দেখি, চারি দিকে কেবল সেই "কা, কা, কা,"! দরজা খুলিয়া দেখি, শরতের জগতে সৌন্দর্য্য যেন আর ধরে না! কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে বালাই সেই "কা, কা" শব্দ! ভূমির সমান্তরাল রেখায় উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত, "তোয়াবশেষেণ হিমাভমভ্রম্," মেঘ শ্রেণীকে সপ্তবর্ণে চিত্রিত করিয়া ঊষার নবীন রাগ পূর্ব্বাকাশ অনুরঞ্জিত করিয়াছে। এবং সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল আকাশের প্রতিবিম্ব বুকে ধরিয়া, স্বচ্ছ, সুনীল, বহুদূর প্রসারিত, তরঙ্গান্দোলিত সাগরবারি, সাগরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর মণিমাণিক্য খচিত অঞ্চলের মত দুলিতেছে। ভাবিলাম, সেই অতুলনীয়া শোভা, একবার প্রাণ ভরিয়া দেখি! মনে করিলাম, যদি নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছেই, তবে একবার এই প্রত্যক্ষীভূতা মূর্ত্তিমতী কবিতার লাবণ্য সাগরে ঝাঁপ দি! কিন্তু কাকের সেই কর্কশ স্বর, আমার সৌন্দর্য্য অনুধ্যানের বাধা হইল; কবিতার প্রতি উদ্দীপ্ত মধুর প্রেম ভাবে, একটু যেন তিক্ততা আসিয়া পড়িল; আত্মবিসর্জ্জনের অনুরাগ যেন শিথিল হইয়া

পড়িল! দুর্ম্মুখ আবার ডাকিল "কা! কা! কা!"। আমি পরাজিত হইয়া মনে মনে কাতর ভাবে কাকের উদ্দেশে বলিলাম, বাপু, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষণকালের জন্য একটু চুপ কর, আগামী নবান্নের সময় তোমাকে প্রাণ ভরিয়া চাউল খাইতে দিব। কাক যেন আমার কাতরতা বুঝিয়া বিদ্রূপ করিয়া আরও চীৎকার করিতে লাগিল।

যে মানুষ কাকের কাছে পরাজিত হয়, তাহার মূল্য কি? বাস্তবিকই এ ছার মনুষ্য জীবনের মূল্য কি? বহির্জগতে আমার নিদ্রার বিঘ্ন এই কুৎসিৎ কাক কোলাহল; এবং অন্তর্জগতে আমার শান্তির বিঘ্ন শত শত কুপ্রবৃত্তির হলাহল! অসংযত রসনা প্রতি মুহূর্ত্তে যে বিষ উদ্গীরণ করে, তাহাতে কত বন্ধুর হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছে! কুশাসিত দৃষ্টি যেরূপ বক্র গমন করে, তাহাতে কত পবিত্র-স্বভাবা রমণী, সে দৃষ্টিকে সর্পের বক্র গমন অপেক্ষাও ভীষণ মনে করিয়া আমাকে দূরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন! আমি প্রতি-নিয়ত হস্ত সঞ্চালনে কত নির্দ্দোষীর হৃদয়ে আঘাত দিতেছি; আমি প্রতি পাদবিক্ষেপে কত অবনত-মস্তক দরিদ্রের রুগ্ন শীর্ণ জীর্ণ মস্তক চূর্ণ করিতেছি! আমি প্রতি প্রশ্বাসে যে পাপের ঝড় প্রবাহিত করিতেছি, প্রতি নিঃশ্বাসে তাহার নির্ম্মম ধ্বংস কার্য্যের জন্য অনুতাপের ব্যথা বুকে পূরিতেছি! আমার শান্তি কই? আমার সুখ কই? অথবা সুখ বুঝি এ সংসারে নাই। তবে আমার প্রত্যূষ নিদ্রাই হউক, আর অন্য যে কোন কারণেই হউক, কখন কখন আমরা যাহাকে সুখ বলিয়া বর্ণন করি; তাহারা সুখ নহে, দুঃখকে ঘনীভূত করিবার হেতু মাত্র। দেশী কবিতায় আছে:—"দুঃখের সংসারে সুখ, দুঃখ দিতে আসে।" বিদেশী কবি, দান্তেও তাহাই বলিয়াছেন, "No greater grief, than to remember days of joy, when misery is at hand" টেনিসনেও তাহারি ভাষ্য, "A sorrow's crown of sorrow is remembering happier things." যদি সুখ নাই, কেবলি দুঃখ, তবে সেই দুঃখের উপর অল্প একটু দুঃখের মাত্রা চড়াইয়া, এই দুঃখের সংসারকে কদলি প্রদর্শন করায় ক্ষতি কি? মরণে আপত্তি কি? কিন্তু মরিতে এ প্রাণ চায় না। কেন? কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখি।

ঐ শোন, বুদ্ধি আমাকে বলিতেছে, "তুমি বড় দুঃখী, তুমি মর"। প্রাণ বলিতেছে, "এই আশ্চর্য্য সৃষ্টির মধ্যে পরমাশ্চর্য্য এই মনুষ্য দেহ, আমি কেমন করিয়া ইহাকে অন্ধকারে ডুবাইয়া দিব?" বুদ্ধি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল, "দেখ, ঐ প্রজা-পতিটি কেমন সুন্দর! এবং সে যে ফুলটির উপর উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে, সেই জড় ফুলটিও কেমন সুন্দর!" প্রাণ বলিল, "সেকি কথা! মানুষের সঙ্গে কাহার তুলনা সাজে? জ্ঞান, কর্ম্ম, মাহাত্ম্য, এত কাহার আছে? মানুষ সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ!" বুদ্ধি বিদ্রূপ করিল; বলিল, "তুমি প্রত্যূষে নিদ্রা যাও, ক্ষতি নাই, কিন্তু এমন শরৎকালটা বহিয়া গেলে, তুমি কি এক দিনও রাত্রিকালে, ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ নাই? দেখ নাই, কত অনন্ত লোক, তোমার মাথার উপর প্রতিদিন প্রভাসিত হইতেছে, এবং নিবিতেছে! এই অনন্ত সৃষ্টির তুলনায়, তোমার পৃথিবী রেণুর রেণু! সেই পৃথিবীতে তুমি কিয়ৎ পরিমাণে বিকশিত, জাটি * স্নায়ু-চক্র বিশিষ্ট দেহ পাইয়া, এত বড়াই কর?

এই অনন্ত লোকে কত অনন্ত সৃষ্টি আছে, তুমি জান? তোমা অপেক্ষা কত উন্নততর জীব সৃষ্টি রহিয়াছে, তাহার সন্ধান পাইবারও তোমার ক্ষমতা নাই।" কিন্তু প্রাণ নিরস্ত হইবার নহে। সে বলিল, "এ সংসারে কেহই তুচ্ছ নহে; সকলেরই সমান প্রয়োজন। শালগাছ অপেক্ষা একটা শুষ্ক তৃণ কম মূল্যবান, কে বলিবে? একটিতে এক কার্য্য, অন্যটিতে অন্য কার্য্য সাধিত হয়; একের কার্য্য অন্যে সাধন করিতে পারে না। সুতরাং প্রয়োজনের হিসাবে বিভিন্নতা কই?" এ কথা শুনিয়া, বুদ্ধি যেন একটু খানি নাসিকা উত্তোলন করিয়া, ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিল; "এমন করিয়া প্রবোধ দেওয়া মন্দ নয়! কিন্তু দেখ, এই জগতে, হাম্‌বোল্ট মহোদয়ের গণনায়, লুপ্ত এবং স্থিত উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর "জাতি" কোটি পরিমিত। প্রতি জাতিতে কত বর্ণ, বর্ণে বর্ণে কত গোত্র, প্রতি গোত্রে কত গোষ্ঠি, গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে কত পরিবার, এবং প্রত্যেক পরিবারে কতগুলি তুমি এবং আমির সমষ্টি। গণনা এই খানেই শেষ হয় নাই। তোমার এই অতি ক্ষুদ্রতা, একবার সৃষ্টিপুঞ্জের মধ্যে পৃথিবীর যে অতি ক্ষুদ্রতা, তাহার সহিত বিচার করিয়া লও। বল দেখি, এ গণনায় তুমি কোথায়? বাঁচিয়া আছ, না মরিয়াই আছ? যে সৃষ্টিপুঞ্জের মধ্য হইতে তোমার সমগ্র সৌর জগৎখানি পুঁছিয়া ফেলিয়া দিলে, ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, হিসাব নিকাশ নাই, সেখানে তোমার কাতরোক্তি শুনে কে? হে নগণ্য, হে তুচ্ছ, তুমি মর।" প্রাণ যেন ইহার উত্তরে কহিল, "আমি নগণ্য, আমি তুচ্ছ, তাহা মানি! অনন্ত সৃষ্টির তুলনায় আমি যাহা; অনন্ত পরমেশ্বরের তুলনায় তুমি যাহাকে অনন্ত সৃষ্টি বলিতেছ, তাহাও তাহাই! সৃষ্টি বলিলেই বুঝিলাম, তাহার আদি আছে, কূল আছে। কাজেই সে যত বড় হইলেও সীমাবদ্ধ। স্রষ্টার করুণাসাগরে সেও এক বিন্দু। এ পৃথিবীর মধ্যে একটা পর্ব্বত, একটা বৃক্ষ অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া, গর্ব্ব প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু যদি উর্দ্ধে উঠিয়া দেখ, যদি গ্রহান্তর হইতে দৃষ্টিপাত কর, তবে ক্ষুদ্র ও বৃহতে ভেদ বুঝিতে পার কি? হিমাচল ও বালুকা স্তূপ, কণার কণা হইয়া কোথায় মিশাইয়া যায়। সুতরাং স্রষ্টার কাছে আমি এবং এই অসীম সৃষ্টি, সকলেই বিন্দু। আর যিনি অনন্ত, যিনি স্রষ্টা, তিনি কি ক্ষুদ্র বলিয়া আমার প্রতি উদাসীন? "যত দূর শাসন করিতে পারিবে না, তত দূর রাজ্য বাড়াইও না।" এই কথা এক জন সামান্য স্ত্রী একজন সম্রাটকে বলিয়াছিলেন। যদি তত্ত্ব লইতে না পারিতেন, তবে কি সেই বিশ্বস্রষ্টা তোমাকে কিম্বা আমাকে গড়িতেন? আরও শুন, তোমাকে সেই প্রাচীন কালের একটী কথা এই স্থানে বলি। দেখ, আমার অন্তরে কত আশা, কত স্নেহ! যেন ফুরায় না, ফুরাইতে চাহে না। আমি বিন্দু, কিন্তু ইহাদের এক এক বিন্দু, সিন্ধু অপেক্ষাও বৃহত্তর! আমার আশা এই ক্ষুদ্র জগতের চতুঃসীমায় বদ্ধ নহে। তুমি যাহাকে অনন্ত সৃষ্টি বলিতেছ, তাহাকেও পদতলে দলিয়া এ উড়িতে চায়। এক হিসাবে আমি নগণ্য বটে; কিন্তু অন্য দিক্ দিয়া দেখ, আমার মাহাত্ম্য বড় কম নহে।"

এবার বুদ্ধি রাগ করিল। ভ্রুকুটি করিয়া কহিল; তোমার বড় স্পর্দ্ধা বাড়িয়া গিয়াছে, দেখিতেছি। তুমি ক্ষুদ্র ও নগণ্য, এ কথা

যেন বুঝিয়াও বুঝিতেছ না। তোমার মনে মনে, অজ্ঞাতে এই কুসংস্কারের বীজ এখনও অঙ্কুরিত আছে যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী লইয়াই যত সৃষ্টি; এবং সেই সৃষ্টির মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ। তাহা না হইলে, মরণান্তেও তোমার আশা, ঈপ্সিত পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে, এমনটা ভাবিবে কেন? দেখ, তুমি এইমাত্র যে কাক জাতির উপর রাগ করিয়াছিলে, সে কাক জাতির পরিণামের কথা ত তুমি একবারও ভাব না? পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদির আশা ভরসা, যদি তাহাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইতে পারে, এমনটা ভাবিতে পার, তবে তোমার নিজের বেলায় এতটা বাড়াবাড়ি কর কেন? তোমা অপেক্ষা সহস্র গুণে উন্নততর জীব, এ সৃষ্টিতে থাকিতে পারে। অথবা তোমাদেরই ক্রমবিকাশে ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠতর মনুষ্যের সৃষ্টি হইবে। তুমি এই ক্ষুদ্র কাক বেচারীকে যে চক্ষে দেখিতেছ, তাহাদের দৃষ্টিতে, তুমি, তাহা অপেক্ষা আর কি বড় একটা কিছু? তোমার আশাই যদি অনন্তে ছুটিয়া যায়, তবে তাহাদের আশা কত দূর প্রসারিত হইবে? অনন্তের পর তো আর স্থান নাই! অত আত্মশ্লাঘায় কাজ নাই, তুমি মর।

এ কথা শুনিয়া প্রাণ যেন একটু বর্দ্ধিত তেজে, অধিকতর অনুরাগে কহিতে লাগিল:— "কাকের আশা, কাকের ভরসা কাক জানে। তুমি কিম্বা আমি তাহার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে কথা কখনও বুঝিতে পারিব না। তবে সে কথায় তোমার আমার কাজ কি? আর তুমি যে উন্নততর জীবের কথা বলিতেছ, আমি তাহাতে অবিশ্বাস করিতেছি না। কিন্তু উন্নতের আশাও উন্নততর হইবে, এইরূপ বুঝি। আমি যে তৃপ্তির জন্য লালায়িত, আমি যে অনন্তের ভিখারী, তাহা হয়ত তাহার কাছে বড় ক্ষুদ্র। সুতরাং আমি যাহা চাই, তাহা আমার বিবেচনায় শেষ হইলেও, উন্নততর প্রাণের কাছে শেষ বলিয়া গণিত হইবে না। তুমি আমাকে নগণ্য বলিতেছ, অথচ এই নগণ্যের ক্ষুদ্র আশা ও কল্পনা লইয়া মহতের বুকে পূরিয়া দিতে চাও কেন? কাকের কাম্য কাকের কাছে, আমার কাম্য আমার কাছে; আব উন্নততরের কাম্যও তাহারই কাছে। সকলেরই আশার পরিতৃপ্তি হইবে। নচেৎ আশার উদয় হয় কেন? কিছুই যখন উদ্দেশ্য-বিহীন নয়, তখন, আমার ক্ষুদ্র আশা বেচারী মাঠে মারা যায় কেন?

দূর হউক ছাই! ভাবিতে ভাবিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি! আমার সেই প্রভাতের সপ্তবর্ণ-চিত্রিত মেঘ কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। সে অরুণ জ্যোতি নাই, সে স্নিগ্ধ সমীরণ নাই; সতেজ শ্যামল পত্রে, জল বিন্দু সম্পাতের সৌন্দর্য্য নাই। কাকের সেই দিক্‌ব্যাপী কর্কশ কণ্ঠও নাই। সূর্য্যের প্রদীপ্ত কিরণ, স্নিগ্ধপত্রে প্রতিফলিত হইতেছে; আকাশ আলোকে ভাস্বর; পৃথিবী কর্ম্ম কোলাহলে উদ্দীপ্ত! আর কাকগুলি? তাহারা এখন অতি দূরে বা অনতিদূরে, একটু নরম সুরে "কা কা" করিতেছে! কিন্তু এই ভাবনায় বুঝি আমার একটু উপকার সাধিত হইতেছে। সেই কাকের স্বর, সেই সূর্য্যের আলোক, সেই আকাশের মহিমা, পৃথিবীর সেই কর্ম্মময় উৎসাহ, এবং বৃক্ষের সেই উজ্জ্বল রূপ, সকলি যেন এক সঙ্গে, একই সঙ্গীতের বিভিন্ন স্বর হইয়া, আমার হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠিল। আমি যে দুর্বৃত্ত বাসনার বাধার কথা বলিতে-

ছিলাম, তাহারা আমার তন্ত্রীর সা, ঋ, গা, মা প্রভৃতির পরদা সাজিয়া দাঁড়াইল। আমি তখন দেখিলাম, জগতের আদি অন্ত মধ্য কোথাও ক্লেশ নাই, দুঃখ নাই, দুর্গতি নাই। অনন্ত লোক হইতে যেন একই শান্তির গীতি উত্থিত হইতেছে। আমি আশ্বস্ত হইলাম। বুঝিলাম, আর কাকের ডাকে আমার অনিষ্ট হইবে না। অদ্য হইতে আমার প্রত্যূষ নিদ্রার পথ নিষ্কণ্টক হইল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

শ্রীমূর্ত্তিদর্শনম্।

বাসন্তচূতমুকুলেষ্বলিঝঙ্কৃতেষু
কুঞ্জেষু মঞ্জুকলকোকিলকূজিতেষু।
সম্পূর্ণশারদসুধাকরমণ্ডলেষু
সৌন্দর্য্যসাগর হরে! তব মূর্ত্তিমীক্ষে ॥ ১ ॥

মধুমাসের চূতমুকুলে, অলিকুলের ঝঙ্কারে, নিকুঞ্জবনে, কলকণ্ঠ কোকিলের মধুর কুহুরবে এবং শারদীয় সুধাকরের পরিপূর্ণ মণ্ডলে, হে সৌন্দর্য্য-সাগর হরি! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ১।

প্রফুল্লপদ্মেষু সরোবরেষু
তারাবিচিত্রেষু নভস্তলেষু।
মাতুঃ স্তনে কাকণিকস্য চিত্তে
গোবিন্দ! পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ২ ॥

যখন কমলকুল প্রফুল্ল হইয়া সরোবরসকলকে সুশোভিত করে, যখন সুনীল নভোমণ্ডলে বিচিত্র তারকাপুঞ্জ প্রস্ফুটিত হয়, যখন স্নেহময়ী জননীর স্তন হইতে অমৃতধারা নিঃসৃত হয়, যখন দয়ালুর হৃদয় দয়ারসে দ্রবীভূত হয়, তখন সেই সকল মধুময় দৃশ্যমধ্যে হে গোবিন্দ! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ২।

বিচিত্রপুষ্পাসু বনস্থলীষু
সুগন্ধমন্দানিলবীজিতাসু।
বিহঙ্গসঙ্গীতনিনাদিতাসু
গোবিন্দ! পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৩ ॥

যখন বনভূমিসকল বিচিত্র কুসুমমালায় সুসজ্জিত, সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত এবং মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের সঙ্গীতরবে নিনাদিত হয়, তখন সেই শান্তিময় দৃশ্যমধ্যে হে গোবিন্দ! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ৩।

শিখণ্ডিকেকা নবমেঘশব্দে
ভেকালিকণ্ঠাশ্চ নবাম্বুপাতে।
ঝিল্লীরবাঃ সুপ্তজনে নিশীথে
উদ্বোধয়ন্ত্যঙ্গ তবৈব মূর্ত্তিম্ ॥ ৪ ॥

নব-মেঘ-গর্জ্জনে শিখিগণের কেকারব, নববর্ষাগমে ভেককুলের কোলাহল, নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে ঝিল্লীরব, হৃদয়মধ্যে তোমারি মূর্ত্তিকে উদ্বোধিত করে। ৪।

প্রত্যগ্রসিন্দূররসৈরিবার্দ্রে
বালাতপৈর্বিচ্ছুরিতেঽন্তরীক্ষে।
পশ্যামি সন্ধ্যাম্বুদবিভ্রমেষু
প্রেমাভিরামাং তব কৃষ্ণ! মূর্ত্তিম্ ॥ ৫ ॥

যখন উষাদেবী অভিনব সিন্দূররসের ন্যায় অপূর্ব্ব অরুণালোকে গগনতলকে সুরঞ্জিত করেন, যখন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আতাম্র কিরণমালা সান্ধ্য মেঘস্তবকে প্রতিফলিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নব নব বিলাস-লহরী প্রকাশ করে, তখন আমি সেই

ভুবনমোহন দৃশ্যপটে হে কৃষ্ণ! তোমারি প্রেমময়ী মূর্ত্তি দর্শন করি। ৫।

উদ্ভিন্নগারুত্মতসুপ্রকাশৈঃ
ক্ষেত্রেষু কীর্ণেষু নবীনশস্যৈঃ।
স্নিগ্ধেষু পশ্যামি চ পল্লবেষু
বিশ্বাভিরামং তব কৃষ্ণ! রূপম্॥ ৬॥

যখন মরকতমণির ন্যায় শ্যামল নবীন শস্যসকল সমুদ্গত হইয়া ক্ষেত্রমণ্ডলকে অপূর্ব্ব বেশে বিভূষিত করে, যখন তরুলতা-সকল স্নিগ্ধ নবপল্লবে সুশোভিত হয়, তখন সেই কমনীয় দৃশ্যমধ্যে হে কৃষ্ণ! আমি তোমারি বিশ্ববিমোহন রূপ দর্শন করি। ৬।

কঙ্কালমালাবহুলেঽতিরৌদ্রে
শ্মশানদেশে শবধূমধূম্রে।
প্রচণ্ডবাতক্ষুভিতেঽর্ণবে চ
প্রেক্ষে মহারুদ্র! তবৈব মূর্ত্তিম্॥ ৭॥

চিতা-ধূমে ধূম্রবর্ণ শব-কঙ্কালে সমাকীর্ণ বিভীষিকাময় শ্মশানমধ্যে, এবং প্রচণ্ড ঝটিকায় বিক্ষোভিত সমুদ্রমধ্যে হে মহা-রুদ্র! আমি তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ৭।

গাঢ়ান্ধকারাসু কুহূক্ষপাসু
দিগ্ব্যাপিঘোরাভ্রঘটাসু চৈব।
দম্ভোলিভীমধ্বনিতেষু বীক্ষে
মহাবিরাজস্তু তবৈব মূর্ত্তিম্॥ ৮॥

যখন অমানিশার নিবিড় অন্ধকারে দশ-দিক্ সমাচ্ছন্ন হয়, যখন ঘোরতর ঘনঘটায় গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হয়, যখন ভীষণ কড়-কড় শব্দে বজ্রাগ্নি স্ফুটিত হয়, তখন হে মহাবিরাট! আমি সেই লোমহর্ষণ দৃশ্যমধ্যে তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ৮।

শশাঙ্কতারাপ্রতিবিম্বগর্ভান্
তোয়াশয়ান্ স্বচ্ছজলান্ সমীক্ষ্য।
উদেতি চিত্তে তব কাপি মূর্ত্তিঃ
অনন্তবৈচিত্র্যময়ী মুকুন্দ!॥ ৯॥

যখন চন্দ্রনক্ষত্রমণ্ডিত অসীম আকাশ-পট স্বচ্ছ সরোবরগর্ভে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন সেই অপরূপ দৃশ্য দর্শনে, হে মুকুন্দ! আমার হৃদয়মধ্যে তোমার অনন্ত-বৈচিত্র-ময়ী এক অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। ৯।

পুণ্যানি তীর্থানি তপোবনানি
দৃষ্ট্বা সরিৎসাগরসঙ্গমাংশ্চ।
নামাবশেষাংশ্চ পুরাণদেশান্
পুরাতনং ত্বাং পুরুষং স্মরামি॥ ১০॥

পবিত্র তীর্থ সকল, তপোবন সকল, নদী সমুদ্রের সঙ্গম সকল, এবং নামাবশিষ্ট প্রাচীন স্থান সকল দর্শন করিয়া, হে পুরাণ পুরুষ! আমি তোমারি মূর্ত্তি ধ্যান করি। ১০।

লীলাঃ শিশূনাং গৃহচত্বরেষু
গবাং প্রচারেষু চ বৎসলীলাঃ।
জলেষু পশ্যন্ জলপক্ষিলীলাঃ
স্মরামি লীলাময়বিগ্রহং ত্বাম্॥ ১১॥

গৃহপ্রাঙ্গণে মধুরমূর্ত্তি শিশুগণের লীলা দর্শনে, গোষ্ঠে গোবৎসগণের লীলা দর্শনে, জলাশয়ে জলপক্ষিগণের লীলা দর্শনে, হে ভগবন্! তোমার অনন্তলীলাময়ী মূর্ত্তি আমার হৃদয়-মন্দিরে নৃত্য করিতে থাকে। ১১।

স্তনন্ধয়ানাং স্তনদুগ্ধপানে
মধুব্রতানাং মকরন্দপানে।
দানে দয়ালোরথ ভক্তগানে
পশ্যামি মূর্ত্তিং করুণাময়ীং তে॥ ১২॥

যখন স্তন্যপায়ী শিশুসন্তানকে স্তনদুগ্ধ পান করিতে দেখি, যখন মধুকরকে মকরন্দ পান করিতে দেখি, যখন দয়ালু ব্যক্তিকে দান করিতে দেখি, যখন ভক্তের মুখে ভগ-বৎসঙ্গীত শ্রবণ করি, তখন, হে ভগবন্! আমি তোমারি করুণাময়ী মূর্ত্তি দর্শন করি। ১২।

মাণিক্যখণ্ডৈরিব দীপ্যমানৈঃ
খদ্যোতপুঞ্জৈর্নিচিতানগণ্যৈঃ।
বনদ্রুমান্ বীক্ষ্য ঘনান্ধকারে
স্মরামি তে মূর্ত্তিমপূর্ব্বরূপাম্॥ ১৩॥

গাঢ় অন্ধকারে অগণ্য মাণিক্যখণ্ডের ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ খদ্যোতমালায় যখন বনবৃক্ষ-সকল আপাদমস্তক প্রদীপ্ত হইতে থাকে, তখন আমি হৃদয়মধ্যে তোমারি অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করি। ১৩।

বনস্পতৌ ভূভৃতি নির্ঝরে বা
কূলে সমুদ্রস্য সরিত্তটে বা।
যত্রৈব চিত্তে সমুদেতি ভক্তিঃ
তত্রৈব পশ্যামি তবৈব মূর্ত্তিম্॥ ১৪॥

কি বনস্পতি, কি ভূধর, কি নির্ঝর, কি সমুদ্রকূল, কি নদীতট, যে দৃশ্য দর্শনেই মনে ভক্তির উদ্রেক হয়, আমি সেই দৃশ্যমধ্যেই তোমারি মূর্ত্তি দর্শন করি। ১৪।

কীটে পতঙ্গে চ সরীসৃপে চ
মীনে পশৌ পক্ষিণি মানবে চ।
স্থূলে চ সূক্ষ্মে চ জলে স্থলে খে
পশ্যামি তে রূপমনন্তরূপ!॥ ১৫॥

কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ, মৎস্য, পশু, পক্ষী, মনুষ্য, স্থূল, সূক্ষ্ম, জল, স্থল, আকাশ, যাহা-তেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, হে অনন্তরূপ! আমি তোমারি রূপ দর্শন করি। ১৫।

ভূতেষু সর্ব্বেষু চরাচরেষু
দূরে সমীপে চ পুরশ্চ পশ্চাৎ।
বিলোকয়াম্যূর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
হে কৃষ্ণ! তে রূপমনন্তরূপ!॥ ১৬॥

চরাচর সমস্ত পদার্থে, দূরে, সমীপে, অগ্রে, পশ্চাতে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে, তির্য্যক্ ভাগে, হে অনন্তরূপ কৃষ্ণ! আমি তোমারি রূপ দর্শন করি। ১৬।

অহো নিমগ্নস্তব রূপসিন্ধৌ
পশ্যামি নান্তং ন চ মধ্যমাদিম্।
অবাক্ চ নিস্পন্দতরো বিমূঢ়ঃ
কুত্রাস্মি কোঽস্মীতি ন বেদ্মি দেব!॥১৭॥

অহো! আমি তোমার রূপসাগরে নিমগ্ন হইয়া, আদি অন্ত মধ্য কিছুই দেখিতে পাই-তেছি না; আমি অবাক্ স্পন্দহীন ও সংজ্ঞা-শূন্য হইয়াছি; হে দেব! কে আমি? কোথা আছি? কিছুই জানিতে পারিতেছি না। ১৭।

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে!
নমস্তে নমস্তে হরেঽচিন্ত্যশক্তে!
নমস্তে নমস্তেঽখিলাশ্চর্য্যসিন্ধো!
মহাদেব শম্ভো! নমস্তে নমস্তে॥ ১৮॥

হে বিভো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার নমস্কার; হে অচিন্ত্যশক্তিধারিন্ হরি! তোমাকে নমস্কার নমস্কার; হে নিখিল আশ্চর্য্যের আধার! তোমাকে নম-স্কার নমস্কার; হে মহাদেব শম্ভো! তোমাকে নমস্কার নমস্কার। ১৮।

ইতি শ্রীতারাকুমারকবিরত্নকৃতং
শ্রীমূর্ত্তিদর্শনম্।

আমারি যে দোষ !*

(১)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
সে যে কুরুচির হাঁড়ি,
বাঙ্গালী কুলের নারী,
নিরালা একা না পেলে ফিরে নাহি চায় !
নয়নে নয়নে কথা,
বোঝেনা সে অশ্লীলতা,
বাঙ্গালীর বোকা-বউ বোঝান কি যায় ?
আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !

(২)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
সে যে পরে শাড়ী, ধূতি,
ফুটিয়া বেরোয় জ্যোতি,
এলো মেলো চুল তার বাতাসে উড়ায় !
পান খায়—রাঙ্গা ঠোঁটে,
মুখ ভ'রে রক্ত ওঠে,
ঘাড় ভেঙ্গে খায় ভয়ে সুরুচি পলায় !
আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !

(৩)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
শোনে না অপরে যথা,
কোণে-কাণে কয় কথা,
সে বোঝেনা অশ্লীলতা আছে ইসারায় ।
ঘোমটার তলে হাসি,
চুরি করা জোৎস্না রাশি
অপবিত্র এর সম নাহি এ ধরায় !
আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !

(৪)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
মনে মনে ভাল বাসে,
লুকায়ে নিকট আসে,
চুপে চুপে কাঁদে হাসে, পাছে শোনা যায় !
আদরে ধরিয়া গলা,
থাক্ ছুটো কথা বলা,—
চুম্বনে সুরুচি তার চূর্ণ হয়ে যায় !
বোঝেনা যে হতভাগী এত বড় দায় !

(৫)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
দিনে নাহি দেখি ঘরে,
রেতে আসে ছু'পহরে,
সে বেরুলে তারি শোভা উষা পরে গায় !
সে কালে বিদায় দিতে,
একটুকু বুকে নিতে
শীলতা পড়িয়া সেই চাপে মারা যায় !
বোঝেনা যে হতভাগী এত বড় দায় !

(৬)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
ঘোমটা—লজ্জার লেপ,
খু'লে সে না পরে 'কেপ্,'
করুণ আঁখিতে সে যে অরুণ ভুলায় !
কচি—খুকি—কাচা হেম,
সংকোচে রাখে সে প্রেম,
বডি-ভরা-ভালবাসা লেডী সে না হায় !
আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !

(৭)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায় !
সে নয়নে ফুলবাণ,
ফুলের ধনুকখান,
ছি ছি ছি ! তারে কি আর চখে দেখা যায় ?

---

*"আমারি কি দোষ ?" কবিতাটী পড়িয়া কেহ কেহ "আমারি যে দোষ" বুঝিয়াছেন, তাহাই এই কবিতাটীতে লিখিত হইল।

সে পরেনা 'ব্লুম্ রোজ',
রাখেনা রুচির খোজ,
বদনে মদন-ভস্ম পৌডার শোভায়
সে করেনা কামজয়—দিগ্বিজয় হায়!

(৮)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায়।
সে জানে না ভ্রাতৃ ভাব,
সে জানে না "ফিরি লাভ্"
পর পুরুষের ছায়া দেখে ভয় পায়!
যায় না বাগান পার্টি,
ভেরি আগ্লি, ভেরি ডার্টি,
ইয়ারের ডিয়ারের চীয়ারে ডরায়!
কোণে ব'সে ভালবাসে—শীলতা কোথায়?

(৯)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায়?
জোরে সে জানে না কথা,
লাজে গলে ননী যথা,
সার্ম্মন্ লেক্‌চার দিতে পারে না সভায়!
সে জানে না সাম্যনীতি,
প্রেমে ধর্ম্মে মাখা গীতি,—
ধর্ম্মে 'এক'—প্রণয়েতে 'অনন্ত' যথায়,—
দীপ্ত যথা গ্যাসালোকে,
পাপ অনুতাপ শোকে
পবিত্র প্রণয়ী যথা শত চোখে চায়,
গেল না সে হতভাগী 'সমাজে' তথায়!
সেত অতি দূরে—দূরে,
স্বপনের মত ঘুরে,
নিজের চরণ শব্দে চমকিয়া যায়,
অতি আস্তে—চুপে চুপে,
আসে যেন কোন রূপে
চুরি করে শুধু সে যে চুমো খে'তে চায়!
বোঝেনা যে হতভাগী এত বড় দায়।

(১০)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায়!
সে করেনি বি এ পাশ্,
বেথুন-কেতনে বাস,
করেছে 'বাসর' বাস বিয়ে ফাঁসে হায়!
সে জানে না ক্লিওপেট্রা,
মেরীরাণী-এট্‌সেট্রা,
পবিত্র প্রণয় তবে শিখিবে কোথায়?
সে লেখে "তোমারি আমি,
প্রাণময় প্রিয় স্বামি!"—
নাহি ঝরে অশ্রুকণা তার কবিতায়!
দেয়নি সে কোর্টসিপে,
বেছে নিতে টিপে টিপে,
ফাটন্ট যৌবন—ভরা জ্যাকেটে জামায়!
সে বলেনা সাদা সিদে,
মুখে লাজ পেটে ক্ষিদে,
দূরে দূরে চুরি করে দেখিতে সে চায়!
আঁধারে জোনাকী কিবে,
মনোহর জ্বলে নিবে,
কনকের কণা যেন ক্ষণেকে হারায়!
বোঝেনা যে হতভাগী পাপ কত তায়!

(১১)

আমারি যে দোষ—ভালবেসেছি তাহায়!
কিনে দিনু উল সূতা,
না বুনিল মোজা যুতা,
যত করে ছল ছুতা কত কব তায়!
না পাইল পুরস্কার,
না করিল থিয়েটার,
না গেল সে এক দিন মহিলা-মেলায়!
এত উন্নতির দিনে,
নাহি দেখি তারে বিনে,
ফিটেনে চড়িয়া যে না ইডেনে বেড়ায়!

সে আছে আঁধার কোণে,
কারো কথা নাহি শোনে,
ভয়ে মরে রবি শশী দেখে পাছে তায়!
কে জানে যে কত কুড়ি,
সে করেছে চুমো চুরি
দিন নাই-রাত নাই—প্রদোষ-উষায়!
আমারো কুরুচি বেশি,
তারি সনে মেশা মেশি
শুনিয়া স্বরুচিদের স্থচি বিঁধে গায়!
বোঝেনা যে হতভাগী এত বড় দায়!

(১২)

আমারি যে দোষ—ভাল বেসেছি তাহায়!
এবে সে যে দেশে আছে,
কয়ে দিব কার কাছে,
থাকিলে 'সমাজ' তথা সেথা যেন যায়!
এম্ এ, বি এ, পাশ হবে,
বিশেও আবিয়ে রবে,
বেথুনে মিথুন-মেলা—কোর্টসিপ্ তায়!
স্বর্গ মন্দাকিনী পাশে,
চৌরঙ্গির শ্যাম ঘাসে
আনন্দে নন্দনে যেন বেড়িয়া বেড়ায়!
মেনকার নাচ ঘরে,
থয়েটার যেন করে,
যৌবন-জুবিলি দেয় দেবের সভায়!
আর যেন দেবপুরী,
করে না সে চুমো চুরি,
কুরুচি ভাসিয়া যেন আসে না পদ্মায়!
যেন অশ্লীলতা দোষে,
আর নিন্দা নাহি ঘোষে,
ঠাকুরাণী না ঠেকায় ফিরে পুনরায়!
কয়ে দিব দেবদেশে যদি কেহ যায়!

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস

চাকুরি।

প্রভু ও ভৃত্য।

আমাদের সেই নগর প্রান্তস্থিত উদ্যান—অস্তগামী সূর্য্যের রাঙ্গা আভায় গাছের পাতা রাঙ্গা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী ক্ষুদ্র গাছে জমিয়া কলরব করিয়া পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছে। একটী ক্ষুদ্র বালক কখন বা ফুল তুলিতে ছুলিয়া ছুলিয়া দৌড়িতেছে, কখন বা পাখীর পিছনে ছুটিতেছে। বাগানী কাজ করিতেছে। সম্মুখে গৃহস্বামী দণ্ডায়মান, সেই দেবমূর্ত্তির কনক-কান্তিতে উদ্যানের শোভা যেন আরও ফুটিয়াছে। সেই মহিমাময় দেহ যেন পবিত্র পুষ্পচয় রচিত, অথচ কেমন দৃঢ় গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক। চরিত্রের রাজশ্রী মুখে কেমন বিভাষিত। গৃহস্বামী মালীকে বলিলেন, "তোমার কাজ আজ ভাল হয় নাই, আমি তোমার কাজে অদ্য অসন্তুষ্ট হইয়াছি।" মালী পরিণত বয়স্ক, নূতন এই বাগানে লাগিয়াছে, অধিক কথা কহে না, নির্দ্দিষ্ট কাজ করিয়া চলিয়া যায়। মালী প্রশান্তভাবে উত্তর করিল, "মহাশয় আমার ধর্ম্মে যেরূপ বলে, সেইরূপ আমি কাজ করিয়াছি. আপনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আপনার যদি অনুমতি হয়, কল্য হইতে আমি আর কাজ করিতে আসিব

না।" গৃহস্বামী একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "আচ্ছা"। মালী সে দিন কাজ করিয়া সায়াহ্নে বাটী যাইল। তাহার পর দিন আর আসিল না। গৃহস্বামী নিজে স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী, নিজে বহু সম্মান ও প্রভুত্বের পদ প্রভুর ঈষৎ অসন্তোষ বাক্যে ত্যাগ করিয়া ছিলেন। তেজস্বী ব্যক্তি, তেজস্বিতার আদর করেন। গৃহস্বামী জানিতেন, মালী অতিশয় দরিদ্র, তাহার স্ত্রী আছে, সে রোজকার না করিলে তাহার সংসার চলে না। তথাপি সে কাজে আর আসিল না। অন্য কোন স্থানে কাজেও লাগে নাই। নিজের কুটীরে বসিয়া আছে। গৃহস্বামী তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সে আসিল। গৃহস্বামী বলিলেন, "তুমি আমার কাছে থাকিবে না কি?" মালী প্রশান্তভাবে বলিল, "আপনি দয়া করিয়া রাখিলেই থাকি।" "হাঁ! তুমি থাক। আমি বুঝিয়াছি, তুমি খাটী লোক।" তাহার পর সেই মালী যত দিন জীবিত ছিল, তত দিন সেই মুনিবের নিকটই সম্মান ও আদরের সহিত চাকুরি করিয়াছিল।

সে জাতিতে চণ্ডাল, বড়ই দরিদ্র, তখন বয়স হইয়াছিল, যৌবনের সামর্থ্য তখন ছিল না। তথাপি মনের তেজ যাইবার নহে। ষোল আনা খাটিত, বৃথা বাক্য ব্যয় করিত না, কিন্তু কাহারও, মুনিবেরও চড়া কথা সহ্য করে নাই। কেহ কখন তাহাকে চড়া কথা বলিলে, তাহার প্রশান্ত, দৃঢ়, অথচ শিষ্ট উত্তরে তখনি বুঝিতে পারিত যে, মূর্খ "ছোট লোক" হইয়াও সে ভদ্র লোক, দরিদ্র হইয়াও তেজস্বী, চণ্ডাল হইয়াও ব্রাহ্মণ, ভৃত্য হইয়াও প্রভু। অনেক দিন হইল সেই মালী মরিয়া গিয়াছে। যে বৃক্ষগুলি সে রোপণ করিয়াছিল, তাহার চিহ্নও এখন নাই। তথাপি মানসনেত্রে সেই ভৃত্যের প্রশান্ত তেজস্বিতা, অনুকরণীয় মহত্ত্ব, আমার হৃদয়ে দীপ্তি পাইতেছে। তবে কে বলে, চাকুরিতে নীচতা, অনতিক্রমণীয় ভাবে সংলগ্ন আছে? চাকুরিতে নীচতা নাই। নীচতা লোভে, নীচতা ভয়ে। নীচতা, প্রভুর কাছে মান বেচিয়া টাকা উপার্জ্জন করা। নীচতা, পাছে চাকুরী যায়, এই ভয়ে;—মনুষ্য মাত্রই যে সম্মানের অধিকারী, তাহা ত্যাগ করা। নীচতা, দেহের বিকাশের জন্য মনকে সঙ্কুচিত করিয়া টাকা রোজগার করা। নতুবা চাকুরিতে কিছুমাত্র নীচতা নাই। ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, প্রভু, ভৃত্য অপেক্ষা অধিক মাননীয় নহে। প্রভু টাকা দেন, ভৃত্য তাহার বিনিময়ে কাজ দেন। প্রভু হয়ত গণ্ডমূর্খ—পিতার সঞ্চিত টাকা চাকরকে দিতেছেন, ভৃত্য নিজের বুদ্ধি বিদ্যা বল দিতেছেন। প্রভুর টাকাব অপেক্ষা ভৃত্যের কার্য্যের কম মূল্য, কে বলিল? প্রভুও দান করিতেছেন না, ভৃত্যও দান করিতেছেন না—কেবল বিনিময় মাত্র। এক জন একটী দোকান করিল, দোকান চালাইবার জন্য এক জন চাকর রাখিল। তাহাতেই কি দোকানী তাহার চাকরের অপেক্ষা বড়লোক হইল? ধর, দোকানী মাসিক বেতন না দিয়া চাকরকে বলিল, "দেখ, তুমি লাভের অর্দ্ধেক পাইবে। আমার মূলধন, তজ্জন্য আমি লাভের অর্দ্ধেক পাইব, তোমার পরিশ্রম, তুমি তজ্জন্য লাভের অর্দ্ধেক পাইবে।" চাকর এখন অংশীদার। বুঝিয়া দেখিলে, চাকর সকল সময়ই প্রভুর অংশীদার—প্রভুর সাহায্যকারী মাত্র। ধর, আমি ধনী জমীদার, তুমি আমার শিক্ষিত কর্ম্মচারী—এখানে আমি নিজে একক যদি সমুদয় কর্ম্ম করিতে

পারিতাম, তাহা হইলে কর্ম্মচারী রাখিবার প্রয়োজন ছিল না, রাখিতামও না। অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন, তাই তোমাকে চাহি। আমার সুবিধার জন্য তোমার বিদ্যা বুদ্ধি চাহি, তুমি তোমার নিজের সুবিধার জন্য বিদ্যা বুদ্ধির বিনিময়ে আমার টাকা চাও। সুতরাং অর্থও বিদ্যার বিনিময় মাত্র। শিক্ষিত কর্ম্মচারী সম্বন্ধে যে যুক্তি, অশিক্ষিত খানসামা ইত্যাদি সম্বন্ধেও সেই যুক্তি খাটে এবং সেখানেও চাকুরী বিনিময় মাত্র, সাহায্য প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে সাহায্য দান মাত্র। যখন চাকরের সংখ্যা অধিক, মুনিবের সংখ্যা কম, তখন মুনিবের গৌরব অধিক। যখন চাকরের সংখ্যা কম, মুনিবের সংখ্যা অধিক, তখন চাকরের গৌরব অধিক। এখন, বিশেষতঃ মফঃস্বলে, দিন দিন চাকর চাকরাণী দুর্লভ হইয়া উঠিতেছে, তাই চাকর চাকরাণীর গৌরব দিন দিন অধিক হইতেছে। এমন কি, অনেক স্থানে মুনিব তাহাদের অপমান করা দূরে থাকুক, তাহারা মুনিবকে অপমান করিয়া তাহার পর দিন আর কাজে আসে না। আমার পরিচিত একটী রায় বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, তাহার বাটীর এক জন দাসী তাঁহার স্ত্রীর সহিত অতি মন্দ ব্যবহার করিয়া কলহ করে, এবং তাহার পর দিন আসে নাই। তাহার মত কার্য্যে সুপটু অন্য একটী দাসী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, তাহাকে তিনি তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে পর দিন ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি কাজ কর। (হাসিতে হাসিতে) তুমি আবার আমার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিও।" তুমি হয়ত বলিবে, "সামান্য একটা চাকরাণীর আস্পর্দ্ধা কত দেখ।" চাকরাণীর আস্পর্দ্ধা নহে, Law of Supply and demand, প্রয়োজন অপেক্ষা আয়োজন কম। প্রয়োজন মত দাসী পাওয়া কঠিন, তাই দাসীর এখন এত আদর।

বুঝিয়া দেখিলে সংসারে কেহ কাহারও প্রভু নহে, কেহ কাহাও ভৃত্য নহে। এক মাত্র প্রভু ভগবান, কেবল তাঁহারই ভৃত্য আমরা সকলে। মানুষ মোহে যখন অন্ধ হয়, তখনই সে আপনাকে কাহারও প্রভু মনে করে। তথাপি কোনও মানুষকে যদি প্রভু বলিতে চাহ, তবে তাঁহাকে প্রভু বলিও, যিনি আপনার রিপুগণকে সম্পূর্ণরূপে দমন করিয়াছেন—যিনি লোভে ভয়ে মোহে কখন অভিভূত হন না—যিনি আত্মাকে হৃদয়ের সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গণের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন, —যিনি মনুষ্য মাত্রতেই নারায়ণের অংশ দেখিয়া ভৃত্যকেও সম্মান ও ভক্তি করেন। তিনিই প্রভু,—যাঁহার হৃদয়স্বরূপ জগন্নাথের শ্রীক্ষেত্রে, ভালবাসার মহোৎসবে, প্রভু ও ভৃত্যের, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের, মিত্র ও শত্রুর মধ্যে ভেদ নাই, সকলই একাকার, প্রেমের প্লাবনে সকলই একাকার, সকলই প্রাণের ভাই। তাই চৈতন্যদেব, প্রভু।

আমি চাকুরিকে বিনিময় বলিয়াছি। টাকার ও শ্রমের বিনিময়—অথবা ভূতকালের শ্রমের (অর্থাৎ ভূতকালের শ্রমে অর্জ্জিত টাকার) এবং বর্ত্তমান কালের শ্রমের বিনিময়। আমার অর্থ এমন নহে, চাকুরিতে কেবল অর্থ ও শ্রমের বিনিময় মাত্র থাকা উচিত। না, ইহার সহিত হৃদয়ের বিনিময় থাকা উচিত। প্রভু ও ভৃত্যের ভিতর এদেশে পূর্ব্বে যে একটী পারিবারিক ভাব ছিল, একটা ঘনিষ্ট আত্মীয়তা ছিল, তাহা বিলাতী সভ্যতার

হের অনুকরণে নষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে ধোপা নাপিত ভাণ্ডারী প্রভৃতি যেন পরিবারের মধ্যে গণ্য হইত। তাহাদের নাম ধরিয়া ডাকা হইত না। মামা, দাদা, খুড়া প্রভৃতি সম্পর্ক পাতান হইত এবং তাহা বলিয়া ডাকা হইত। আমি এবং আমার সহোদরগণ বাল্যকালে বাটীর গোয়ালা ভাণ্ডারিকে "গিরীশদাদা" বলিয়া ডাকিতাম, মনে আছে। গিরীশদাদাকে আমরা খুব ভয় করিতাম, ও সম্মানও করিতাম। তাহার শাসনে আমাদের বাল্যলীলার ধ্বংসপ্রিয়তা অনেকটা দমিত হইত। সে আমাদের কত ভাল বাসিত। আমাদের পরিবারের বিপদ ও অনিষ্ট নিজের বিপদ ও অনিষ্ট মনে করিত। এ বিষয় আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুস্তকে পড়িয়াছি যে, কর্ত্তারা চাকরদিগকে বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। তাহাদের সন্তানগণকে কোলে লইতেন। তিনি আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, নব্য বাবুরা কুকুর কোলে করিতে পারেন, কিন্তু চাকরের পুত্র কখন কোলে করিতে পারেন না, যেন কোলে করিলে দেহ অশুচি হয়। প্রভু ও ভৃত্যে আজি কালি হৃদয়ের বিনিময় নাই। বড় দুঃখের বিষয়। আজ কাল —কাজ করিলে টাকা দিলাম চুকিয়া যাইল, —ভাব এই রকম। এটা একটা সামাজিক বিকার। টাকাতে ঋণ শোধ হয় না। টাকার সম্বন্ধে ছাড়া আরও সম্বন্ধ আছে, তাহা উচ্চতর পবিত্র সম্বন্ধ।—"We have profoundly forgotten everywhere that *Cash-payment* is not the sole relation of human beings; we think nothing doubting, that *it* absolves and liquidates all engagements of man." প্রভু ও ভৃত্য উভয়ে সখা—উভয় উভয়ের মঙ্গলের জন্য দায়ী। প্রত্যেক প্রভুর জানা উচিত, ধনে ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ক্রয় করা যায় না, ধনে শ্রম ক্রয় করা যায় মাত্র। এমন কি, ধন বিতরণ করিলেও ভালবাসা পাওয়া যায় না। ভালবাসা, ভক্তি, হৃদয়ের ধন। হৃদয় না দিয়া কেমন করিয়া তাহা পাইবে?

"স্বর্গের জ্যোতি যাহা
মৃত্তিকায় কেমনে রচিবে তাহা।"

"ন প্রভা তরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ"

একটা গল্প আছে, মিলিসে নামক একজন ধনী ব্যক্তি খুব দান খয়রাৎ করিত, লোক জনকে খুব খাওয়াইত। গৃহে নিত্য ভোজ দিত। তথাপি সে দেখিল, কেহ তাহাকে প্রকৃতপক্ষে ভালবাসিত না। সে বিষণ্ণ হইয়া জেরুজিলামে জ্ঞানী সালিমান সম্রাটের নিকট গিয়া এই কথা নিবেদন করিয়া তাঁহার উপদেশ চাহিল। প্রবুদ্ধ সালিমান কেবল মাত্র বলিলেন, "যাও, ভালবাসিও।" যার হৃদয়ে ভালবাসা নাই, সে প্রভু হউক, ভৃত্য হউক, সে একটা পশু বিশেষ। এমন ভীষণ নরহত্যা নাই যে সে তাহা করিতে পারে না। আর যাহার হৃদয় ভালবাসার বীণার ধ্বনিতে নিত্য সঙ্গীতময়, ভৃত্য হইলেও সে বৈকুণ্ঠধামে মহাপ্রভুর প্রসাদে নিত্য নিত্য নূতন প্রভুত্ব লাভ করিতেছে জগতে যিনি হৃদয়ের সহিত বহু লোকের সেবা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত প্রভু, —যিনি লক্ষ জনের পদরেণু প্রেমে ভক্তিভরে প্রণতশিরে বহন করেন; তিনি যথার্থই লক্ষপতি,—যিনি মহাসেবক, তিনিই মহাপ্রভু।

গরিব ব্রাহ্মণ।

তত্ত্বকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১০১। তুমি ঐশ্বর্য্য মদে মত্ত হইয়া যাহাদিগকে তৃণতুল্য গণনা করিতেছ, সর্ব্বদা যাহাদের প্রতি কতই না অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেছ, মৃত্যু হইলে তাহাদের দেহও মাটীই হইবে, তোমার দেহও মাটীই হইবে। তুমি স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়া রাজত্বই কর, আর অন্যে উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাই করুক, কিন্তু মৃত্যুর পর তোমারও যে দশা, অন্যেরও তাহাই। সেই বিচারকের নিকট গেলে সকলকেই সমভূমিতে আসিতে হইবে। ধনী বলিয়া তুমি কিছু দরিদ্র হইতে অধিক সম্মান পাইবে না। এখন তুমি যে সমস্ত বিলাস দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া ভোগ সুখে মত্ত আছ, সে সমস্তই তোমার পড়িয়া থাকিবে। দাস দাসী, পুত্র কন্যা, কেহই তোমার সঙ্গী হইবে না। তুমি যেমন উলঙ্গ অবস্থায় একাকী পৃথিবীতে আসিয়াছ; বিদায়ের সময়েও তেমনি উলঙ্গ শরীরে একাকীই তোমাকে যাইতে হইবে। বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বিক্রম, ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা প্রভৃতি যাহারা এক্ষণে তোমার বক্ষ স্ফীত করিয়াছে, যাহারা এতদিন তোমাকে অহঙ্কারের স্কন্ধে চড়াইয়া উচ্চে উঠাইয়াছে, দেখিবে, তাহারাই একত্র হইয়া শেষে তোমাকে নাকে দড়ি দিয়া নরকের পথে টানিবে। এখন তুমি বিবিধ উপাদেয় দ্রব্যে যে রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছ, সেই রসনা দ্বারাই অতি কর্কশ ও কঠোর বাক্যে অপরকে মর্ম্ম পীড়া দিতেছ। সেই রসনা তোমার কীটের আহার্য্য হইবে। এই বেলা রসনায় ঈশ্বরের গুণানুবাদ গান করিয়া তাহার সার্থকতা সম্পাদন কর। যে চক্ষুর ক্রোধ-রঞ্জিত রক্তাক্ত দৃষ্টিতে অপরকে ভস্মীভূত প্রায় করিয়াছ, যাহা কুচিন্তার সাহায্যে কুদৃশ্য ব্যতীত দেখে নাই, তাহা পিপীলিকার উদরস্থ হইবে। সময় থাকিতে সেই চক্ষুকে ভক্তি রসার্দ্র ভাবে ঈশ্বরের সুকৌশল পূর্ণ সৃষ্টি দর্শন করিতে শিক্ষা দেও। যে কর্ণ মিথ্যা স্তুতিবাদ শুনিতে সন্তুষ্ট ও সত্য কথা শুনিতে রুষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ঈশ্বর-প্রেমের কীর্ত্তন শুনিতে নিয়োজিত কর। যে নাসিকায় বিবিধ সৌগন্ধ পূর্ণ বিলাস দ্রব্যের আঘ্রাণ লইয়াছে, তাহার প্রতি নিশ্বাসের সহিত ঈশ্বরের নাম হৃদয়স্থ কর। যে ত্বকে, দুগ্ধ-ফেণ-নিভ সুকোমল শয্যা ও কোমলাঙ্গী সুন্দরী কামিনীর স্পর্শ সুখ লাভে নিয়োজিত ছিল, তাহাকে কঙ্করযুক্ত মৃত্তিকা শয়নে অভ্যস্ত কর। হস্তকে দুঃখীর দুঃখ মোচনে মুক্ত করিয়া দেও। পদকে পাদুকাহীন করিয়া ঈশ্বরের নাম বিস্তার করিতে ভ্রমণে নিযুক্ত কর। তোমার সকল ইন্দ্রিয় তাঁহারই কার্য্যে খাটিতে শিক্ষা করুক।

মোস্ নবীতে উক্ত আছে—

১০২। তুমি কারুণের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী ও আলেকজাণ্ডারের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত দিগ্ বিজয়ী ভূপতি হইলেও তোমাকে গোরে যাইতে হইবে। আলেকজাণ্ডার নিজ বাহু বলে পৃথিবীর বহুতর জনপদ করতলস্থ ক-

রিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে কিছুই সঙ্গে লইতে পারেন নাই। তিনি মুমূর্ষু সময়ে অমাত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমার মৃত্যু হইলে যখন তোমরা কাফন (শবাচ্ছাদিত বস্ত্র) পরাইয়া গোরের সমীপে লইয়া যাইবে, তখন আমার হস্ত কাফনের বাহিরে রাখিবে। কেন না, তাহাতে লোকে জানিতে পারিবে যে, সম্রাট লোভ পরবশ হইয়া দুর্ব্বল রাজগণের রাজ্য সকল তাঁহাদিগের হস্ত হইতে অচ্ছিন্ন করিয়া স্বকীয় রাজ্যে সংযোজিত করিয়াছিলেন, অপরিসীম ধন রাশি লুণ্ঠন করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিয়াছিলেন, সে সমস্ত কোথায় রহিল? মাতৃগর্ভ হইতে যেমন খালি হাতে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সেই রূপ খালি হাতেই যাইতে হইল?

এ সংসারে ধন, বিক্রম, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য মান, অভিমান, গর্ব্ব কয় দিনের জন্য? সকলেরই পরিণতি আছে। সকলেরই বিকাশ ক্ষণকালের জন্য। তবে কেন লোকে অসার গর্ব্বোন্মত্ত হইয়া এত আস্পর্দ্ধা প্রকাশ করে। মহম্মদ গজনবী (সুলতান মামুদ) দেশ লুণ্ঠনকরিয়া রাশিকৃত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। চরম সময়ে তাঁহার অমাত্যবর্গকে সেই পর্ব্বত প্রমাণ ধন রাশী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলেন। মামুদ তত্তাবৎ অবলোকন করিয়া অনুতাপে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

কোহিনূর, তুমি কত অতীত ঘটনার সাক্ষী! যখন যাহার প্রবল প্রতাপ, তুমি তখনই তাহার শীর্ষ দেশের শোভা সম্পাদন করিয়াছ। আবার তাহাকে ভিখারী সাজাইয়া তুমি আর এক গৌরব-বাঞ্চিত ধন-গর্ব্বিত ব্যক্তির চূড়ায় আরোহণ করিয়াছ। তোমার লোভে ধরণী রক্ত-স্রোতে প্লাবিত হইয়াছে। তুমি অগণিত নর-শোণিতে স্নান করিয়া দিগ্‌বিজয়ী রাজার মাথায় গিয়া বসিয়াছ। এখন সাত সমুদ্র পারে গিয়া যাঁহার মস্তকের শোভা সম্পাদনে নিযুক্ত আছ, তাঁহারই বা এ গৌরব কয় দিনের জন্য? তুমিই তাহার সাক্ষী!! তুমিই তাহার সাক্ষী!! তুমি ইতিহাস, তুমি শিক্ষক! তোমাকে অধ্যয়ন করিলে অনেক গর্ব্বিত রাজার পরিণাম স্মরণ হয়। পৃথিবীর ক্ষমতা দম্ভ প্রভৃতির অসারত্ব প্রতীয়মান হয়। তুমি সকলের শিক্ষাগুরু। যে সাহাজান বাদসাহ ময়ূর সিংহাসনে বসিয়া তোমাকে মস্তকে ধারণ করত পৃথিবীতে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর গৌরবান্বিত মনে করিতেন, যাঁহার নির্ম্মিত তাজমহল এখনও পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্য দ্রব্যের একটী, সেই জাঁকজমকশালী সম্রাটের শোকসূচক স্মরণচিহ্ন ব্যতীত আর কি আছে? কোহিনূর, তুমি গম্ভীর স্বরে পৃথিবীকে শিক্ষা দিতেছ, সকলই ক্ষণভঙ্গুর! সকলই ক্ষণভঙ্গুর!! সকলই ক্ষণভঙ্গুর!!!

১০৩। তুমি ঐশ্বর্য্যশালীর দুর্গতি বুঝিতে পারিলে আর কাহারও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দুঃখিত হইও না। অভাবকে অভাব বোধ করিও না। সাংসারিক অভাবের মোচন হয় না।

তুমি যে ধনে বঞ্চিত, অভাব-সাগরে ডুবিয়া সেই রত্নের উদ্ধার কর। আত্মার অভাব পূর্ণ হইলে পার্থিব কোন অভাব থাকে না। তখন লোষ্ট্র কাঞ্চন, বিষ্ঠাচন্দন, সদন্ন কদন্ন সমান হয়। সকল আশা আকিঞ্চন মিটিয়া যায়। এক মাত্র ভগবানই

তোমার অন্তরে আনন্দময়রূপে দেদীপ্যমান হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপন করিবেন।

হাফেজ বলিয়াছেন—

১০৪। এক দিন পাদুকা না থাকায় দুঃখিতান্তকরণে বেড়াইতে বেড়াইতে কোন পান্থ নিবাসে উপস্থিত হইয়া দেখি, এক ব্যক্তির পা-ই নাই, তখন আমার মনের ক্ষোভ দূরীকৃত হইল। সেই ব্যক্তির গলিত চরণ আমার জ্ঞান নেত্রের বিকাশ করিয়া দিল। তখন আমি ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলাম, হে ঈশ্বর, তোমার দয়ায় হাফেজের কোনই অভাব নাই। যাহাকে অভাব মনে করিয়া হাফেজ দুঃখিত হইতেছিল, তোমার রাজ্যে শত সহস্র লোকে তদপেক্ষা শত সহস্র গুণ অভাব ভোগ করিতেছে। হাফেজ, তুমি ধন্য! তুমি জন্ম মাত্র জননীর সুকোমল স্তন পান করিতে পাইয়াছ; পৃথিবীর জল, বায়ু, তাপ, শৈত্য, ফল শস্য সকলে তোমার জীবন রক্ষার জন্য দাসের ন্যায় সেবা করিয়াছে। তুমি আজি পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরে পরম পিতার সম্পূর্ণ দান গ্রহণ করিতে সমর্থ আছ, তোমার তুল্য ভাগ্যবান কে? হে মহিমাসাগর ভগবন্! তোমার মহিমা বুঝা কাহার সাধ্য।

১০৫। এব্রাহিমকে নমরুদের অগ্নি মধ্য হইতে, যোসেফকে কেনাণের অন্ধকূপ হইতে, ইউনস্‌কে মৎস্যের উদর গহ্বর হইতে, আয়ুবের গলিত শরীরকে তাহার মস্তিষ্ক স্থিত কীটের দংশন হইতে, মুষাকে নীলনদ হইতে যিনি উদ্ধার করিলেন, যিনি প্রহ্লাদকে হস্তিপদতল, অগ্নিকুণ্ড এবং পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতে নিক্ষেপের সময়ে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রক্ষা করিলেন, সেই অনন্ত শক্তিময় দয়ার সাগর পরমেশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালাবাসিলে, তাঁহাতে একান্ত নির্ভর করিলে, পৃথিবীর সমস্ত বিপদরাশি একত্র হইয়াও তাহার কিছুই করিতে পারে না। ভক্তবৎসল হরিভক্তের কাতর আহ্বানে কর্ণ না দিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তের মান, ভক্তের আবদার রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারেন না। ভগবান ভক্তের অনুগত, যে তাঁহাকে ভক্তি করিয়া ডাকে, তাহাকেই তিনি দর্শন দেন। তাঁহার নিকটে জাতির বিচার নাই, ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই, সকলেই তাঁহার স্নেহের সন্তান। তাঁহার অভয় হস্ত সকলেরই মস্তকের উপর প্রসারিত আছে। তাঁহার অবাধ্য পাপী সন্তানও অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া পাপভার হইতে উন্মুক্ত হয়। তিনিই দস্যু রত্নাকরের উদ্ধারকর্ত্তা। তিনিই পাপী জগাই মাধাইয়ের মুক্তিদাতা।

১০৬। পরম গুরু প্রেরিত মহম্মদ তাঁহার আত্মাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার শিষ্যবর্গকে মুসলমান অর্থাৎ ভক্ত উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলমান শব্দের প্রকৃত অর্থ, যে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করে। মুসলমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য, যাহাতে নামের গৌরব নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন।

মুসলমান শব্দের অন্য অর্থ, প্রেমপূর্ণ সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। তিনি নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়াই বিবেকবাণীতে কোরাণ পরিপূর্ণ। তিনি অতি নিরক্ষর ছিলেন, কিন্তু ভগবানের অনন্ত কৃপায়, জ্ঞানের মহিমায়, পরম পণ্ডিতের ন্যায় মহামূল্য উপদেশ সমস্ত প্রদান করিয়া ভগবৎ কৃপার মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন। মহম্মদ তাঁহার প্রচারিত সত্য ধর্ম্ম চারি শাখায় বিভক্ত করেন। শরিয়ত,

তরিকত, হকিকত এবং মা'রফত। সরিয়ত অর্থ, সাধারণ মুসলমানী সমাজ। তরিকত (সত্যপথাবলম্বনে অলৌকিকতা প্রকাশ) হকিকত (তত্ত্বজ্ঞান), মারকত (দর্শন)।

১০৭। মুসলমান ধর্ম্মের পাঁচটী সোপান;—১। কল্‌মা। মহম্মদকে সত্য ধর্ম্ম প্রচারক বলিয়া এবং ঈশ্বরকে অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করা।

২। নামাজ। দিবা রাত্রে পাঁচবার প্রেমপূর্ণ স্বরে তাঁহার উপাসনা করা।

৩। রোজা। বৎসরে এক মাস সমস্ত দিন উপবাস থাকিয়া ভগবানের উপাসনা ও উৎসব করা।

৪। জাকাত। অর্জ্জিত সম্পত্তিতে অংশ দান করা এবং দীন দুঃখীদিগের প্রতি দয়া করা।

৫। হজ্জ। জীবনের মধ্যে অন্ততঃ এক বার মক্কায় মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া আরকত পর্ব্বতের শিখরে নবলক্ষ লোকের সহিত যোগ দিয়া উপাসনা করা।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি উপদেশ আছে, তাহা মুসলমান মাত্রেরই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য।

সত্যধর্ম্ম প্রচারকদিগের বিবেক-বাণীতে বিশ্বাস এবং আদম হইতে মহম্মদ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম প্রচারকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। এই পৃথিবী, এক কালে বিলয় হইবে। পৃথিবীতে মন্দ করিলে পরকালে মন্দ এবং ভাল কার্য্য করিলে ভাল ফল ভোগ করিতে হয়। আত্মা নিত্য, ইহা অনন্তকাল আছে এবং অনন্তকাল থাকিবে।

১০৮। আজ যাহাকে শিশু দেখিতেছি, যে অর্দ্ধ-মুকুলিত-দশন বিকাশ করিয়া মধুময় হাসিতে জনক জননীর প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিতেছে, যাহার আধ আধ কথায় জনক জননীর প্রাণে সুধার উৎস উঠিতেছে, সেই শিশু দেখিতে দেখিতেই শৈশব সীমা উত্তীর্ণ হইয়া কৈশোরে পদার্পণ করিল। এখন সে হাস্য নাই, সে প্রাণস্পর্শী কথা নাই, এখন বালক বিদ্যা শিক্ষায় নিপুণ। এখন তাহার মনে চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সে কৈশোরও চলিয়া গেল। সে শিশু আজ যুবা। আজ তাহার মনে কত ভাবনা, চিন্তা, কে তাহার অন্ত করে? সংসার সুখের অনন্ত বাসনা তাহাকে নিরন্তর উৎসাহিত করিতেছে। কখনও হতাশার কালিমা তাহার উৎসাহোৎফুল্ল বদন মেঘাবৃত চন্দ্রমার ন্যায় মলিন করিতেছে। কখনও স্ত্রী পুত্রের সম্মিলনে আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছে। পরক্ষণেই অন্ন চিন্তা, পুত্রের পীড়ার চিন্তায় মুর্মুর দাহনে বিদগ্ধ হইতেছে। কাল যে পিতা মাতা সতত মুখ চুম্বন করিয়াছেন, যাঁহাদের কৃপায় একটুও ভাবিতে হয় নাই, আজ তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়া যুবা পুত্রের চিন্তা বৃদ্ধি করিতেছেন। যুবা আজ চিন্তা-বিষে জর্জ্জরিত, খাটিতে খাটিতে অবসন্ন। কপালে চিন্তার রেখা পড়িল। অলক্ষিত ভাবে এক দুই করিয়া কেশগুলি শাদা হইয়া উঠিল। দন্তগুলিও বিদায় গ্রহণ আরম্ভ করিল। চক্ষুর দৃষ্টি কমিয়া আসিল। চর্ম্ম লোলিত হইল। আজ সেই কন্দর্প-নিন্দিত সুন্দর পুরুষ কুৎসিতের একশেষ। বলবীর্য্য, সাহস, অধ্যবসায়, উচ্চাভিলাষ, সকলই হত। বৃদ্ধ ক্রমে সম্পূর্ণ পরবশ হইয়াছেন। এখন কবে পৃথিবী হইতে বিদায় হইবেন, সেই শেষ দিন গণনা করিতেছেন। এখন বৃদ্ধ যৌবনের পাপরাশি স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। পরকাল ভাবিয়া

ভয়ে কম্পবান হন। যৌবনের দুর্দ্দমনীয় লালসায় কত কি করিয়াছেন। এখন সেই সকল মনে হইয়া অন্তরে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা প্রদান করে। পূর্ব্বে অম্লান বদনে পাপ কার্য্য করিয়াছেন, এখন পাপের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বদা ভয়ত্রাস্ত চিত্তে পুত্রকে উপদেশ দেন। দেখিতে দেখিতে সে জরা-জীর্ণ শরীর খানিও বিলয় হইল। আত্মীয় স্বগণবর্গ একবার কাঁদিয়া বিস্মৃত হইলেন। পৃথিবীতে কালকার সেই শিশুর অস্তিত্ব আর নাই। তাহা কালের অনন্ত উদর-কন্দরে মিশিয়া গিয়াছে।

একটী প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্প কিয়ৎ কাল হাতে করিয়া রাখ। তোমার চক্ষের উপর দেখিতে দেখিতে তাহার সুশোভন দল গুলি কুঁকড়িয়া যাইবে। মনোহর সুরভি গন্ধের স্থানে দুর্গন্ধ জন্মিবে। মনোজ্ঞ শোভা সৌগন্ধের বস্তুটীর কোনই আদর থাকিবে না। তুমি আমি, স্ত্রী পুত্র, ভ্রাতা বন্ধু, ফল পুষ্প, বৃক্ষ লতা, সকলেরই একই দশা। জগতের এই অস্থায়িত্ব সর্ব্বদাই দেখিতেছ, কিন্তু দেখিয়াও দেখ না। ঘোরতর অজ্ঞানতা এককালীন অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, দেখিবে কি? একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, জগতের অসারত্ব বুঝিতে পারিবে। দেখিবে, এই ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র সেই হরি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তুমি যাহাদিগকে তোমার বলিয়া কতই না অহঙ্কার করিতেছ, যাহা-দের জন্য জীবন ক্ষয় করিতেছ, চৌর্য্য, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, পরপীড়া প্রভৃতি বিবিধ পাপের ভার মস্তকে ধারণ করিতেছ, তাহারা কেহই তোমার নয়। কেহই তোমার পাপের অংশী হইবে না। তখন অনুতাপ অগ্নিতে দগ্ধীভূত হইবে। তোমার এ জীবন পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায়। একটু বাতাসেই ইহার পতন হইবে। এই বেলা সময় থাকিতে সেই করুণাময়ের নিকটে আত্ম দুঃখ জানাও। তোমার পাপরাশির জন্য তাঁহার নিকটে কাতরভাবে প্রার্থনা কর। তিনি কৃপা করিয়া তোমার সকল পাপ মোচন করিবেন। শৈশবকাল ক্রীড়া কৌতুকে, যৌবন ভোগ সুখে মত্ত হইয়া কাটা-ইলে। এখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত। এখনও যদি বিষয় লালসাতেই মত্ত থাক, তবে তোমার বিষম সঙ্কট। আর দুই দিন পর তোমার সকল ইন্দ্রিয় অবশ হইবে। চক্ষু দেখিবেনা, কর্ণ শুনিবেনা, রসনা বলিবেনা। সুধাময় হরি নামের মধুর আস্বাদ তোমার পশু জীবনে ঘটিবেনা।

দেখ, তোমার ভোগ বাসনার তৃপ্তি হইল না, কিন্তু তুমি কালের গ্রাসভুক্ত হইতেছ। তপশ্চরণ করিলে না, কিন্তু তুমি তপ্ত হই-তেছ। কাল যাইতেছে না, কিন্তু তুমি যাইতেছ। তৃষ্ণা জীর্ণ হইতেছে না, তুমি জীর্ণ হইতেছ। তুমি যে তৈমুর সাহের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, যে দিগ্বিজয়ী মোগল বীরের বংশে, বাবর, হুমায়ুন, আক-বর, জাহাঙ্গীর সাহ জাহান প্রভৃতি সম্রাটগণ পৃথিবীতে শৌর্য্য বীর্য্য ক্ষমতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা এক কালে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" সম্মান পাই-য়াছেন, তাঁহারাই যদি না ভোগ বাসনায় তৃপ্ত হইলেন, তবে তুমি ত কীটাণু কীট। তাঁহারা অর্দ্ধ ভূমণ্ডলে একাধিপত্য করিয়াও লালসা জয় করিতে পারিলেন না, তুমি ত পরের দাস। ভোগ লালসার পার নাই, অন্ত নাই। মহাবীর আলেকজাণ্ডার পৃথিবী জয় করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,

তাঁহার আর জয়ের স্থান নাই! তাঁহারই আশার অবধি হইয়া ছিলনা, তুমি কি চাও? একবার জ্ঞাননেত্রে তোমার পূর্ব্ব পুরুষ মোগল সম্রাটগণের দিকে তাকাও, তোমার দম্ভ, অহঙ্কার, মান, অভিমান, আশা লালসা সমস্ত চূর্ণীকৃত হইবে। যিনি রাজার রাজা, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের রাজা, সেই রাজার শরণাগত হও। যাঁহার কটাক্ষে অনন্ত কোটী জগতের উৎপত্তি ও বিলয় হইতে পারে, সেই মহান ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ কর। তিনি যেমন মহান, তেমনি দয়ারও সাগর। তিনি তোমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তোমার কাতরোক্তিতে করুণার্দ্র হইয়া তাঁহার অভয় ক্রোড়ে তোমাকে স্থান দিবেন। তোমার মনের ব্যথা তাঁহাকে জানাইও, হৃদয়ে বল পাইবে, শান্তি পাইবে। প্রাণ ভরিয়া বদন ভরিয়া তুমি নিজে মাতিয়া জগতকে মাতাইয়া একবার হরি * বল। হরির অমৃতময় নামে জগৎ অমৃতময় হইবে। পাপ তাপ দূরে পলায়ন করিবে। অতএব হৃদয় খুলিয়া হরি বল। (সমাপ্ত)

শ্রীমির্জ্জা আমিনউদ্দিন আহাম্মদ।

ভারতীয় মুদ্রা।

(প্রথম প্রস্তাব)

বকল্ নামক সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত তাঁহার "সভ্যতার ইতিহাস" নামধেয় জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "কোনও পতিত জাতির পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইলে, অতীত ইতিহাসের আলোচনা করা সর্ব্ব প্রথমেই প্রয়োজন। সেই পরপদানত পতিত জাতির পূর্ব্ব গৌরব বা পূর্ব্ব মহিমার যদি কিছু লিপিবদ্ধ বিবৃতি থাকে, তাহা হইলে সেই মহামূল্য বিবৃতির সমালোচনা ও শিক্ষা দ্বারা, পতিত জাতিকে উত্তেজিত এবং স্বদেশবৎসলতায় অনুপ্রাণিত করা উচিত; ইহাই ইতিহাসের মহাফল এবং ইহার জন্যই ইতিহাসের প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন।" বকলের এই মহামূল্য বচন গুলি কত দূর সমিচীন এবং সূক্ষ্মদর্শিতা পরিপূর্ণ, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। ভারতের অর্দ্ধমৃত ও অধঃপতিত জাতিদিগের পক্ষে এই কথা গুলি সঞ্জীবক মহামন্ত্র স্বরূপ হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের পঞ্চবিংশ কোটি পতিত মানবের কোনও ইতিহাস নাই; ইউরোপীয় মহাপুরুষেরা যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা কেবল বালক শিক্ষার পক্ষেই শোভা পায় বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজ এত দূর স্বার্থান্ধ, স্বদেশ-প্রেমিক, স্বজাতি-পক্ষপাতী এবং বৈষয়িক বিদ্যায় পারদর্শী যে, অনেক সময়ে জ্বলন্ত ও জীবন্ত সত্যকেও অপলাপিত করিয়া আপনার স্বার্থ এবং আপনার ভ্রান্তমতকে রক্ষা করিতে অসম্মত হয়েন না।

আমি নিজে সমগ্র ভারতবর্ষ প্রায় দুই

* যিনি পাপ হরণ করেন, তিনিই হরি।

বার পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি; বোধ হয়, ভারতের এমন কোনও প্রাচীন বা আধুনিক ঐতিহাসিক স্থান নাই, যাহা আমি স্বচক্ষে দেখি নাই। বম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য-ভারত, মালোয়া, মারোয়ার, মেওয়ার, নিমার, খান্দেশ, রাজপুতানা, পঞ্জাব, সিন্ধু-প্রদেশ, বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতির অন্তর্গত প্রয়োজনীয় স্থান ও দৃশ্য সমূহ আমি নানা কারণে অনেক দিন ব্যাপিয়া বিশেষ-রূপে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছি। ভ্রমণ কালে একটি বড় ভাল কাজ করিয়াছি; বহুস্থানের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছি। ভারতের অনেক স্থানে এমন কত শত প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক স্থান ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব রহিয়াছে, যাহার নাম পর্য্যন্ত ইতিহাসের বা ভূগোলের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় না। ভারতের প্রকৃত ইতিহাস বা ভূগোল নাই, কিন্তু কোন মনিষী ব্যক্তি প্রকৃত ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিলে, আমার বহু চেষ্টায় সংগৃহীত বিবরণ সমূহ বোধহয় ভারতের প্রকৃত ইতিহাস-শরীরের কঙ্কালার্দ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারিবে। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, মুদ্রাযন্ত্র হইতে ভারতের যে সকল ইতিহাস নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা মাত্র। যাহাই হউক, ভারতের একখানি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নিরপেক্ষ ইতিহারের যে সম্যক প্রয়োজন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন?

বহু দিনের চেষ্টা, বহু অর্থব্যয়, বহুবিধ গ্রন্থাদর পাঠ, বহুসংখ্যক সুযোগ্য মনিষীর প্রতিভার একত্রে সংযোগ এবং আমার ন্যায় নানাস্থান পরিভ্রমণ ব্যতীত এই বৃহৎ ব্যাপার সুসম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। এবম্প্রকার উপায়াদির দ্বারা উদ্যম সফল হইলেও, চারিটি প্রধান ও প্রয়োজনীয় উপকরণের সহায়তার আবশ্যক। প্রথম,—অপ্রকাশিত দস্তাবেজ্, গুপ্তলিপি, নীলপীঠ, সেরেস্তা, দপ্তরনামা, রোবকারী, ফার্খৎ প্রভৃতির সংগ্রহ এবং পাঠ। দ্বিতীয়,—ঐতিহাসিক স্থান সমূহে প্রচলিত মৌখিক ইতিহাস ও জনপ্রবাদাদির সংগ্রহ। তৃতীয়,—প্রাচীন অট্টালিকা, মন্দির, কূপ, দুর্গ ইত্যাদির গঠন দর্শন। চতুর্থ,—মুদ্রা ও তাম্রফলক।

আমার সুদীর্ঘ ভ্রমণ কালে, আমি আর একটি বড় ভাল কাজ করিয়াছি। ভারতের প্রাচীন ও আধুনিক প্রায় দুই শত পঞ্চত্রিংশ প্রকার মুদ্রা এবং তৎসহ চারি পাঁচটি অতি প্রাচীন তাম্র ফলক সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই সকল প্রয়োজনীয় প্রাচীন মুদ্রা এবং তাম্রফলক আমার নিকটে আছে, এবং ভরসা করি এক সময়ে পুরাতত্ত্বানু-সন্ধায়ী মহাপুরুষদিগের মহা প্রয়োজনে আসিবে। ভারতের মুদ্রা সকলের ধাতু বিবেচনা করিলে, তাহাদিগকে পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত করা যায়, তদ্যথা (১) সুবর্ণ মুদ্রা (২) রৌপ্যমুর্দ্রা (৩) তাম্র মুদ্রা (৪) রৌপ্য ও তাম্র মিশ্রিত ধাতুর মুদ্রা, এবং (৫) উত্তরা খণ্ডী মুদ্রা। শেষোক্ত প্রকারের মুদ্রার ধাতু ঐ কয়েক প্রকার ধাতু হইতে ভিন্ন; তাহা পরে বলিব।

রাজনৈতিকভাবে বলিতে গেলে, ভারতের মুদ্রা সমূহকে সপ্ত ভাগে বিভক্ত করা যায়। ১। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা। ২। হিন্দু রাজাদিগের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা। ৩। মুসলমান শাসকদিগের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা। ৪। ভারতবর্ষস্থ ফরাসি গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা। ৫। ভারতবর্ষস্থ পর্টুগীজ গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা। ৬। স্বল্প কালের জন্য ভারতবর্ষীয় ওলন্দাজদিগের প্রব-

ত্তিত্ত্ব মুদ্রা। ৭। স্বাধীন রাজ্যের মুদ্রা। এদেশে জৈনেরা কখনও প্রকৃতরূপে রাজত্ব করিতে পায় নাই, সুতরাং তাহাদের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা নাই; বৌদ্ধেরা রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক প্রকারের তাম্রফলক ব্যতীত তাঁহাদের কোনও প্রকারের মুদ্রা পাওয়া যায় না। গ্রীকোবাক্‌ট্রিয়ান সমসাময়িক কয়েক প্রকারের মুদ্রা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা গ্রীকদিগের ভারতাক্রমণ কালে সৈন্যপুঞ্জের দ্রব্যাদি সহ আসিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষস্থ গোয়া প্রভৃতি স্থানে পর্টুগীজদিগের এবং পণ্ডিচারী প্রভৃতি নগরীতে ফরাসীদিগের মুদ্রা প্রচলিত আছে। এই সকল স্থানের মুদ্রা বৃটীশ ভারতে প্রচলিত হয় না, কিন্তু বৃটীশ ভারতের মুদ্রা, এই সকল স্থানে বাজারের উট্‌তী কম্‌তী দর হিসাবে, কখনও ইংরেজী মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট মূল্য হইতে অল্প বা অধিক মূল্যে বিনিময়িত হইয়া থাকে। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত রৌপ্য, তাম্র এবং স্বুবর্ণ মুদ্রা সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে, তাহা পাঠকবর্গের সকলেই বোধ করি অবগত আছেন। এদেশে নেপাল ও ভোটান ভিন্ন আর কোনও স্বাধীন রাজ্য নাই; বর্ত্তমান সময়ে এই দুইটী রাজ্যকেও "স্বাধীন" বলিতে আর ইচ্ছা হয় না। যাহা হউক, ইহাঁদের মুদ্রা ইহাঁরা নিজেই প্রস্তুত করেন। করদ ও মিত্ররাজ্য সমূহে ইংরাজের মুদ্রা চলিয়া থাকে, কিন্তু বাজারের উট্‌তী কম্‌তী হিসাবে কখনও মূল্যের তারতম্য হয়। একটী "দেশীয় রাজ্যের" মুদ্রা অন্য একটী "দেশীয় রাজ্যে" (Native State) প্রায় চলেনা। অনেক করদ ও মিত্ররাজ্যের রাজা বা নবাবেরা আপনাপন টাকশালা হইতে আপনাপন রাজ্যের মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা (যথা আলোয়ার, দেওয়াস প্রভৃতি) ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের টাকশালার দ্বারা নির্ম্মিত করিয়া লয়েন। কোনও কোনও দেশীয় রাজ্যের স্বতন্ত্র মুদ্রা নাই; নিকটবর্ত্তী কোনও প্রবল রাজা বা নবাব থাকিলে পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রায়ই প্রবল রাজা বা নবাবের মুদ্রা চলিয়া থাকে, কোথাও বা স্বতন্ত্র মুদ্রারও প্রচলন দেখিয়াছি। কখনও কখনও এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয় ইংরাজ রাজ্যের স্থান বিশেষে ইংরেজ মুদ্রার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় মুদ্রাও প্রচলিত হইয়া থাকে; আবার এমনও হইয়া থাকে যে, দেশীয় রাজার বংশ, রাজ্য, চিহ্ন প্রভৃতির কিছুই অস্তিত্ব নাই, কিন্তু তাঁহার নামের মুদ্রা এখনও চলিয়া যাইতেছে! প্রথম পক্ষের দৃষ্টান্ত ডুমরাউন, বক্সার, মুঙ্গের, আরা প্রভৃতি "ঢেউয়া" বা "ডেপুয়া" মুদ্রা; দ্বিতীয় পক্ষের দৃষ্টান্ত, পুনা, সোলাপুর প্রভৃতিতে প্রচলিত মহারাষ্ট্র রাজা বাজীরাও পেশোয়ার প্রবর্ত্তিত মুদ্রা।

বেদাদি প্রাচীনতম গ্রন্থে মুদ্রার উল্লেখ নাই, মনু সংহিতায় মুদ্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মনু যে ভাবে মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন, এখনকার সভ্য জাতিরা তাহাকে "মুদ্রা" বলিয়াই গণ্য করেন না। রামায়ণে স্বুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং প্রস্তর মুদ্রার বহুল উল্লেখ আছে এবং বাইবেলের পুরাতন টেষ্টামেণ্টে "সেকেল" নামক এক প্রকাব মুদ্রার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মিসর, গ্রীশ ও রোমে বহুকাল পূর্ব্বে নানা প্রকার মুদ্রা প্রচ-

লিত ছিল, এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। *

যাহা হউক, আমি যে সকল তাম্রফলক ও মুদ্রা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদিগের বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই লিপিবদ্ধ বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রদত্ত হইতেছে বটে, কিন্তু পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইহা হইতে অনেক কথা উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবেন। সর্ব্বপ্রথমে আরও কতকগুলি কথা বলিয়া রাখা উচিত। বৃটীশ ভারতের কোনও কোনও দেশীয় রাজারা রৌপ্য এবং তাম্র, এতদুভয় প্রকারেরই মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার পাইয়াছেন, যথা জয়পুর, গোয়ালিয়র, ইত্যাদি। কেহ কেহ কেবল তাম্রের মুদ্রা প্রস্তুত করিতে পারেন, যেমন মধ্যভারতের রটুলাম, প্রতাপগড় ইত্যাদি। কোনও কোনও রাজা বা নবাব কেবল রৌপ্য মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকারী, যথা মালোয়ার অন্তর্গত জাওরা। ইংরাজাধিকৃত ভারতের কোনও কোনও স্থানে এমন নিয়ম আছে যে, তদ্দেশের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদিগের প্রবর্ত্তিত মুদ্রা এখন চালাইবার কেহ চেষ্টা করিলে গুরুতর রূপে অর্থদণ্ড বা শারীরিক দণ্ড প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ শাসনে ভারতের কোনও রাজাই স্বর্ণ মুদ্রা প্রস্তুত করণের অধিকার পান নাই। ইংরেজের নিজের মুদ্রা সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, কোনও প্রজা কোনও ধাতুর সহযোগে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত ব্রিটীশ মুদ্রা প্রস্তুতের চেষ্টা করিলে যাবজ্জীবন কালের জন্য দ্বীপান্তরে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারিবে, অথবা অন্য কোনও বস্তুকে ব্রিটীশ মুদ্রার ন্যায় প্রতিপন্ন করাইয়া বিনিময় বা বিক্রয় করিলে ঐ দণ্ড প্রাপ্ত হইতে পারিবে। ভারতের মুদ্রা সমূহ দেখিতেও অতীব কৌতুককর; কোনও মুদ্রায় হনুমানের চিত্র, কোনও মুদ্রায় গাভী, কোনও মুদ্রায় হস্তী, কোনটাতে শিবের ত্রিশূল, কোনটাতে চন্দ্র সূর্য্য, কোনও মুদ্রায় মন্দির ও মস্‌জিদ্, কোনটাতে তরবারী, কোনও মুদ্রায় বা ভগবতীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রা সকলের আকারও নানা প্রকার, যথা ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোলাকার, ইত্যাদি। রাজা রামচন্দ্রের সমসাময়িক স্বর্ণ মুদ্রা বা "রামচন্দ্রী মোহর" খুব কম মিলে, ইহাদের এক একটা কখন কখনও দশ সহস্র টাকায় বিক্রীত হয়; রামচন্দ্রী মোহর ওজনে প্রায় দেড় তোলা হইতে অধিক নহে, কিন্তু হিন্দুর নিকটে ইহা পবিত্রতম এবং মহাপূজ্য। একমুখী রুদ্রাক্ষ, দক্ষিণাবর্ত্তী শঙ্খ, চিত্রকূটের দশ সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞকুণ্ডের ভস্ম, কিম্বা লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি হইতেও ইহা অধিকতর রূপে শ্রদ্ধাস্পদ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস এই যে, যাহার গৃহে রামচন্দ্রী মোহর থাকে, তাহার গৃহে ধনদেবী লক্ষ্মী কখনও চঞ্চলা হয়েন না। হিন্দু গৃহস্থ রামচন্দ্রী মোহর পাইলে তাহার দুই পৃষ্ঠায় সিন্দুর মাখাইয়া রাখে এবং প্রতিদিন স্নানান্তে তাহার পূজা করে। আমি রামচন্দ্রী মোহর চক্ষে কখনও দেখি নাই, কিন্তু জৌনপুরে এক জাঠের নিকট "রামচন্দ্রী রৌপ্যমুদ্রা" দেখিয়াছি, ইহার এক পৃষ্ঠে রাম ও সীতার মূর্ত্তি; রামের পদতলে হনুমান উপবিষ্ট এবং সীতার পদতলে ধনুর্ব্বাণ হস্তে লক্ষ্মণ বক্রভাবে শায়িত। অপর পৃষ্ঠে দেবনাগরাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায়

* মৎ প্রণীত "ভারতীয় গ্রন্থাবলী" নামক পুস্তক দেখুন।

গোলাকারে কতকগুলি শব্দ দেখা যায়, আহার অর্দ্ধেকেরও অধিক পড়া যায় না। মুসলমানদিগের মধ্যে সাহ আলম ও আকবর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মোহর বা সুবর্ণ মুদ্রা এখনও অনেক পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রাচীন কালে অথবা ভারতের বর্ত্তমান "দেশীয় রাজ্য" সমূহে বর্ত্তমান কালে যে প্রকারের বিশুদ্ধ রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায়, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মুদ্রায় সেরূপ পাওয়া যায় না। ইংরাজের স্বর্ণ ও রৌপ্যে অনেকটা খাদ মিশান থাকে, এইজন্য কোনও কোনও দেশীয় রাজার টাকশালাধ্যক্ষ মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন "ইংরাজের যাহা কিছু দেখ, তাহাতেই 'খোটা' ও 'খাদ' মিশান থাকে।"

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

ঢাকার পুরাতন কাহিনী।

(৩)

গৌড়েশ্বর পালরাজগণ।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সুবিজ্ঞ প্রিন্সেপ সাহেব মহীপালের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রাপ্ত হন। ইহার বহুকাল পরে জেনারেল কানিংহাম কর্ত্তৃক বিগ্রহ পালের নামাঙ্কিত মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। ১৮৪৮ খ্রীঃ কর্ণেল কিটো সাহেব বিহার প্রদেশের অন্তর্গত পেসিরোয়া নামক স্থানে যে তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন, তাহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে রাজা দেব পালের নাম উল্লিখিত হয়। গয়াতে নারায়ণ ও নরপালের নামাঙ্কিত দুই খানি ক্ষুদ্র লিপি পাওয়া গিয়াছে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সুপণ্ডিত ব্রাড্‌লি সাহেবের প্রযত্নে মগধ ও গৌড়ের অধিপতি পাল রাজগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় তাম্রশাসনাদি বিহারে আবিষ্কৃত হয়। নালন্দায় যে এক খানি প্রস্তরলিপি পাওয়া যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, পাল বংশের প্রথম রাজা গোপাল দেব বল্লভী দেশীয় রাজতনয়া বাগীশ্বরী দেবীর পানিগ্রহণ করেন। ইহা তাঁহার রাজত্বের সপ্তম বর্ষে ৮ই আশ্বিন তারিখে লিখিত হয়। তথায় এক বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারদেশে তৈলিক জাতীয় হরদত্তের পৌত্র ও গুরু দত্তের পুত্র কৌশাম্বীবাসী বৌদ্ধ বালাদিত্যের নামাঙ্কিত যে লিপি পাওয়া যায়, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপালভণ্ডার করের মতে তাহা রাজা মহীপাল দেবের রাজত্বের একাদশতম বর্ষের ৩রা বৈশাখ লিখিত হয়। বিহারে বৌদ্ধদেবের অঙ্কিত প্রতিকৃতির নিম্নভাগে যে লিপি পাওয়া যায়, তাহা রাজা মদনপাল দেবের সময়ে ২৪শে বৈশাখ তারিখে সাময়িক নামে বৌদ্ধ কর্ত্তৃক লিখিত হয়। তথায় অপর এক লিপি বিগ্রহ পাল দেবের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষের ১৯শে বৈশাখ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দেবাহূ স্বর্ণকারের পুত্র কর্ত্তৃক লিখিত হয়। তিত্রাবন নামক স্থানে পুণ্ড্রেশ্বর সৈমহানিকের (মহীপাল ?) সময়ে বিষ্ণুর পুত্র গোপতিচন্দ্র কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ ক্ষুদ্র এক খণ্ড লিপি পাওয়া গিয়াছে। তথায় বৌদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর প্রতি-

মূর্ত্তির নিম্নভাগে অপর যে এক লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা রামপতি (রামপাল ?) দেবের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষের ২৮শে বৈশাখ ভট্ট নহোর পুত্র ভট্টইচ্ছ কর্ত্তৃক লিখিত হয়। এই রাজা সম্ভবতঃ ১১৫০ খ্রীষ্টীয়াব্দে বিহারে রাজত্ব করিতেছিলেন। ঘোশ্রাবণ নামক স্থানে যে এক প্রস্তরলিপি পাওয়া যায়, তাহাতে প্রসঙ্গ ক্রমে রাজা দেবপালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। পঞ্জাবের অন্তর্গত নাগরহারনিবাসী ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বৌদ্ধভিক্ষু বীরদেব কনিষ্কের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধবিহারে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। তিনি পর্য্যটন করিতে করিতে নালান্দায় উপনীত হইয়া, বহুকাল তথায় অবস্থিতি করেন। নালন্দায় আগমনের পূর্ব্বে যশোবর্ম্মপুরের বিহারে অবস্থান কালে তিনি রাজা দেবপাল হইতে বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হন।† গয়াতে গোবিন্দপালের যে দুই খানি শাসনলিপি ব্রাড্‌লি সাহেব প্রাপ্ত হন, তাহার একখানি ১২৩৩ সংবতাব্দে (১১৭৬ খ্রীঃ) এবং অপর খানি ১২৩৫ সংবতাব্দে (১১৭৮ খ্রীঃ) লিখিত হয়। বিহারে রাজা মদনপালের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে লিখিত এবং লক্ষ্মীসরাই ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী জয়নগরে তাঁহার শাসনকালের উনবিংশতম বর্ষে লিখিত দুই খানি লিপি পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেবের গবেষণা ও অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয়। মজফরপুর জিলার অন্তর্গত ইমাদপুরে লিঙ্ক নামে জনৈক সাহেব যে দুই খানি ক্ষুদ্রলিপি প্রাপ্ত হন, তাহা রাজা মহীপালের রাজত্বের অষ্টচত্বারিংশতংতম বর্ষে ২রা বৈশাখ তারিখে লিখিত হয়।

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণায় গৌড়েশ্বর পালরাজগণের যে সকল শাসনপত্র ও প্রস্তরলিপি এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। এই সকল শাসনলিপি হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, বারাণসী, মগধ, ত্রিহুত, গৌড় (পশ্চিমবঙ্গ) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তরবঙ্গ) এবং সম্ভবতঃ বুড়ীগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর উত্তর তীরবর্ত্তী পূর্ব্ববঙ্গের অংশ পর্য্যন্ত পরাক্রান্ত পালরাজগণের শাসন প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ডাক্তার হারন্‌লি সাহেব অনুমান করেন যে, অযোধ্যা প্রদেশ পর্য্যন্ত তাঁহাদের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাঁহাদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন মত প্রচারিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সারনাথের প্রস্তরলিপি ১০৮৩ সংবতাব্দে (১০২৬ খ্রীঃ) স্থিরপাল ও বসন্তপালের আদেশে লিখিত হয়। তাঁহারা সম্ভবতঃ বিহার প্রদেশে স্বাধীনভাবে বা গৌড়েশ্বর পালরাজন্যবর্গের অধীনে রাজত্ব করিতেন। এই প্রস্তর লিপিতে গৌড়েশ্বর মহীপালের উল্লেখ দৃষ্টে, পুরাতত্ত্ববিৎগণ পালবংশীয় নৃপতিদিগের রাজত্বকাল নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহা হইতে সুপণ্ডিত কোলব্রুক সাহেব খ্রীষ্টীয় অষ্টম কি নবম শতাব্দী

---

† সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণের অবগতির জন্য ঘোশ্রাবণের প্রস্তরলিপি হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

বজ্রাসনং বন্দিতুমেকদাথ
শ্রীমন্মহাবোধিমুপাগতোঽসৌ (বীরদেবঃ)।
দ্রষ্টুং তথাগাৎ সহদেশিভিক্ষূন্
শ্রীমদ্‌যশোবর্ম্মপুরং বিহারং ॥৮
তিষ্ঠন্নথেহ সুচিরং প্রতিপত্তিসারঃ
শ্রীদেবপাল ভুবনাধিপ-লব্ধপূজঃ।
প্রাপ্তপ্রভঃ প্রতিদিশেদয়পূরিতাঙ্গঃ
পূষেব দারিততমঃ প্রসারো ররাজ ॥৯

হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পালরাজগণের রাজত্বকাল বলিয়া অনুমান করেন, সুবিজ্ঞ উইলসন সাহেব এই মত সমর্থন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ জন পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতি বিহার ও বাঙ্গালা দেশে রাজত্ব করেন। তিনি গড়ে প্রত্যেক রাজার রাজত্ব সময় ২৫ বৎসর ধরিয়া, রাজা মহীপালের সময় ১০২৬ খ্রীষ্টীয়াব্দ অবধারণ পূর্ব্বক তাঁহার উর্দ্ধতন ও অধস্তন পুরুষদিগের কাল নির্ণয় করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ সাহেব বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকাল গণনা করিয়া ভারতীয় প্রত্যেক নরপতি গড়ে ১৬ হইতে ১৮ বৎসর কাল রাজ্যশাসন করিয়াছেন বলিয়া অবধারণ করেন। এই অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র পালরাজগণের রাজত্বের আরম্ভ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া অনুমান করেন। তাঁহার মতে পালবংশীয় একাদশ জন রাজা পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। আমগাছির শাসনপত্রে এই একাদশ জন নরপতির মধ্যে দশ জনের নামই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সারনাথের প্রস্তরলিপি গৌড়েশ্বর মহীপালের রাজত্বের মধ্যভাগে লিখিত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত একাদশ জন রাজার প্রত্যেকে গড়ে বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন, এই অনুমানের বলে বহুমানাস্পদ ডাক্তার মিত্র মহোদয় খ্রীষ্টীয় ৮৫৫ হইতে ১০৮০ অব্দ পর্য্যন্ত পালরাজগণের পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে রাজত্বের আনুমানিক সময় নিরূপণ করিয়াছেন।

সুবিজ্ঞ ডাক্তার হারনলি সাহেবের মতে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর আরম্ভ হইতে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত (৯০৬-১০২৬ খ্রীঃ) ১২০ বৎসর কাল মাত্র ছয় জন পালবংশীয় রাজা বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। গড়ে এক এক পুরুষে ২৪ বৎসর ধরিয়া, তিনি পাঁচ পুরুষে ১২০ বৎসরকাল গোপাল হইতে নারায়ণ পালের রাজত্ব সময় অবধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গোপালদেব (৯০৬-৯২৬ খ্রীঃ), ধর্ম্মপাল (৯২৬–৯৫৬ খ্রীঃ), দেবপাল বা নয়পাল (৯৫৬–৯৯১ খ্রীঃ), বিগ্রহপাল বা শূরপাল (৯৯১–১০০৬ খ্রীঃ), এবং নারায়ণ পাল (১০০৬–১০২৬ খ্রীঃ) বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। তিনি রাজ্যপালকে দেবপালের পুত্র, বিগ্রহপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মহীপালের পিতা বলিয়া অনুমান করেন। যে সময়ে নারায়ণপাল বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে মহীপাল বা ভূপাল বারাণসী ও অযোধ্যাতে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই মহীপাল ১০০৬–১০৫৬ খ্রীষ্টীয়াব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎবর্ষকাল বিহার ও বারাণসীতে রাজত্ব করেন। নারায়ণপালের মৃত্যুর পর কিয়ৎকালের নিমিত্ত বঙ্গদেশে মহীপালের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব নহে। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা নারায়ণপাল পৈতৃক বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা মহীপালের শাসনাধীন বিহার ও অযোধ্যা প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল থাকে। সম্ভবতঃ তাঁহার অধীনস্থ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হিন্দুধর্ম্মানুরক্ত সামন্ত ও হেমন্ত সেনের সাহায্য ও প্ররোচনায় রাজা নারায়ণপাল হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ

করেন। তাঁহার নাম এবং বুদ্দল ও ভাগলপুরের শাসনলিপি হইতে ডাক্তার হারনলি কি রূপে নারায়ণ পালের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণের পরিচয় পাইলেন, স্থূল বুদ্ধিতে আমরা তাহা কোনও ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি না। এই নারায়ণ পালের বংশধরই ১০৩০ খ্রীষ্টীয়াব্দে বিজয়সেন বা সুখসেন কর্ত্তৃক বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হয়। বীরসেন বা আদিশূর এই বিজয় সেনেরই নামান্তর মাত্র। বৌদ্ধ মহীপালের বংশধরগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে বিহার ও বারাণসী শাসন করিতে থাকেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রগণের অন্যতম চন্দ্রদেব হৈহয় বংশীয় চেদিরাজ কর্ণদেবকে (১০২৫-৫০ খ্রীঃ) দূরীভূত করিয়া কান্যকুব্জে গাহড়বাড়বংশীয় পালরাজন্যবর্গের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। কনোজরাজ চন্দ্রদেবের পিতা মহীচন্দ্র ও পিতামহ যশোবিগ্রহকে তিনি যথাক্রমে মহীপাল ও বিগ্রহপাল বলিয়া কল্পনা করেন। আমরা ডাক্তর হারনলির অনুমিত কোন মতেরই পক্ষপাতী নহি।

চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ ১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া গৌড়েশ্বর মহীপালকে পরাজিত করেন,—এই মর্ম্মের এক খানি শাসনলিপির বিবরণ ১৮৭৬ খ্রীঃ ডাক্তার বার্ণেল সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ইহার দ্বারা কানিংহাম, ডাক্তার মিত্র ও হারনলি প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিৎগণের সকলের সময় নির্দ্দেশ সম্বন্ধেই ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কারণ ইঁহারা সকলেই সারনাথের প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত ১০৮৩ সংবতাব্দ (১০২৬ খ্রীঃ) মহীপালের রাজত্বকালের মধ্যভাগ অনুমান করিয়া পালরাজগণের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। এই ঘটনা ১০৯৩ সংবতাব্দে ঘটিয়া থাকিলে, সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যাইতে পারে। কারণ ১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালায় সেন বংশের আধিপত্য বদ্ধমূল হয় এবং পাল রাজগণ সেনবংশীয়দিগের পরাক্রমে বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইয়া বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে মহারাজ বল্লাল সেন রামপালে রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা শাসন করিতেছিলেন।

আমগাছির শাসনপত্র হইতে গৌড়েশ্বর পালরাজগণের নিম্নলিখিত বংশাবলী পাওয়া যাইতেছে। বুদ্দলের প্রস্তরলিপিতে যে সুরপালের উল্লেখ আছে, পালবংশের অপর কোনও শাসনলিপিতে তাঁহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন যে, মুঙ্গেরের শাসনপত্রে যে যুবরাজ রাজ্যপালের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি দেবপালের জ্যেষ্ঠপুত্র ও সুরপালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। রাজা দেবপালের মৃত্যুর পর পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইয়া সুরপাল ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। এই উক্তি কি কি যুক্তি ও প্রমাণের প্রতি প্রতিষ্ঠিত, কানিংহাম সাহেব তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। ডাক্তার হারনলি সাহেব সুরপালকে বিগ্রহপাল (প্রথম) হইতে অভিন্ন ব্যক্তি ও রাজ্যপালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলিয়া বিবেচনা করেন। যদি মিশ্রবংশ পুরুষানুক্রমে পালরাজগণের মন্ত্রিত্ব পদে বৃত হইয়া থাকে, যদি রাজা দেবপালের অতিদীর্ঘ রাজত্বকালে দর্ভপানি ও তাঁহার পৌত্র কেদারনাথ মিশ্রের দেবপালের মন্ত্রিত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকা কোনও ক্রমে সম্ভবপর না হয়, যদি সুরপাল

দেবপালের নামান্তর না হয়, তাহা হইলে ডাক্তার হারনলির মতে সুরপালকে বিগ্রহ পালের নামান্তর বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।
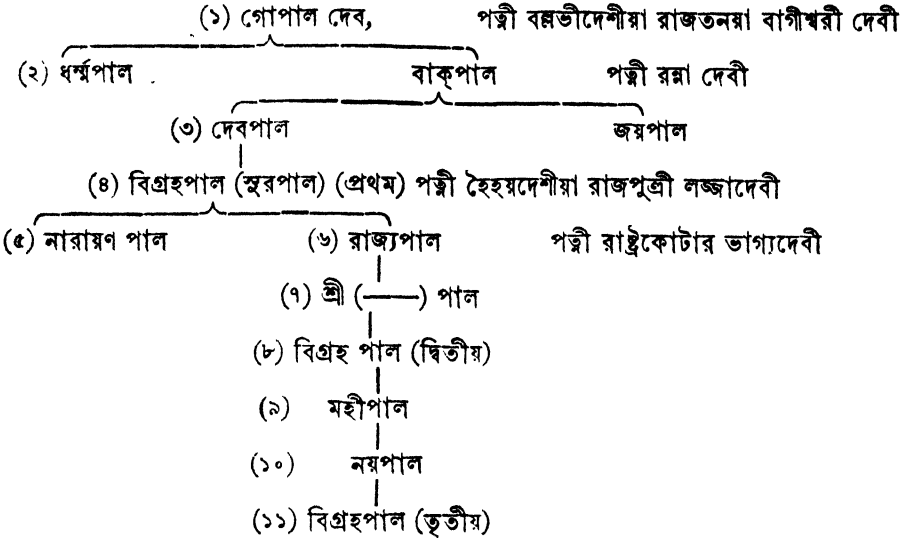
এই সকল রাজার রাজত্বকাল নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিবার কোনও উপায় নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকের নামাঙ্কিত যে সকল লিপি আবিষ্কৃত হইযাছে, তাহা হইতে তাঁহাদের রাজ্যকালের নিম্নতম সীমা অনায়াসেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অনুমানের সাহায্য ভিন্ন তাহার উর্দ্ধতম সীমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

নালন্দায় গোপাল দেবের রাজত্বের সপ্তম বর্ষের একখানি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে। কানিংহাম সাহেব বলেন যে, প্রবাদ আছে, পালবংশের আদিপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা অতি দীর্ঘকাল (৪৫ কি ৫৫ বৎসর) রাজত্ব করেন। ডাক্তার মিত্রের মত অনুসারে তিনি সম্ভবতঃ (৮৫৫–৮৭৫ খ্রীঃ) এবং ডাক্তার হারনলির মতে (৯০৬–৯২৬ খ্রীঃ) ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। ডাক্তার হারন্‌লি বলেন যে, ধর্ম্মপালের রাজত্বের ষড়বিংশতম বর্ষে লিখিত একখানি লিপি ১৮৮০ খ্রীঃ এসিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মতে ধর্ম্মপাল সম্ভবতঃ ত্রিশ বৎসর রাজ্যশাসন করেন। মুঙ্গেরের শাসনপত্র দেবপালের রাজত্বের ত্রয়স্ত্রিংশত্তম বর্ষে লিখিত হয়। ডাক্তার হারনলির মতে তিনি ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ১৮৬২ খ্রীঃ ডাক্তার হল সাহেব গোয়ালিয়র হইতে যে এক খণ্ড প্রস্তরলিপির বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহাতে দেবপালের নামে এক জন রাজার উল্লেখ আছে। ইহা ১০২৫ সংবতাব্দে (৯৬৮ খ্রীঃ) লিখিত হয়। ডাক্তার হারনলি অনুমান করেন যে, এই দেবপাল গৌড়েশ্বর দেবপাল ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। বুদ্দলের শাসনলিপির উক্তি অতিরঞ্জিত বলিয়া পরিগণিত না হইলে, দেবপাল পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। গোপালদেব গুজ-

রাটের বল্লভীবংশীয় রাজতনয়ার পাণি গ্রহণ করেন। গুজরাট পর্য্যন্ত যে পালবংশ কুলমান ও ক্ষমতায় সুপরিচিত ছিলেন, সেই বংশের সর্ব্বপ্রধান নরপতির নাম গোয়ালিয়রের প্রস্তরস্তম্ভে অঙ্কিত থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দিগ্বিজয় উপলক্ষে মধ্যভারতের অন্তর্গত চেদিরাজ্যের হৈহয়বংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া, রাজতনয়া লজ্জা দেবীকে যুবরাজ বিগ্রহপালের সহিত পরিণীত করা দেবপালের পক্ষে অসম্ভব নহে। বিহারে বিগ্রহপালের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষে লিখিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইনি তিন বিগ্রহপালের মধ্যে কোন্ বিগ্রহপাল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। ডাক্তার হারনলির মতে বিগ্রহপাল বা সুরপাল ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ইমাদপুরে মহীপালের রাজত্বের অষ্টচত্বারিংশৎতম বর্ষে লিখিত দুই থানি ক্ষুদ্র লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিব্বত দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থকার তারানাথ ও কানিংহাম সাহেবের মতে তিনি ৫২ এবং ডাক্তর হারনলির মতে ৫০ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। ভাগলপুরের তাম্রশাসন রাজা নারায়ণ পালের রাজত্বের সপ্তদশতম বর্ষে লিখিত হয়। ডাক্তার মিত্র ও হারনলি সাহেবের মতে তিনি ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। আমগাছির শাসনপত্র নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষে লিখিত হয়। ডাক্তার মিত্রের অনুমান মতে তিনি ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া থাকিবেন।

কালক্রমে বৌদ্ধ পালরাজগণের অধঃপতন সংঘটিত হইল। পূর্ব্ববঙ্গে এক অভিনব রাজবংশ দক্ষিণাপথবাসী কর্ণাট রাজবংশীয় বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। বর্ত্তমান বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রামপালে সেনবংশের রাজধানী সংস্থাপিত হইল। বিজয় সেনকে হিন্দুধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পূর্ব্ববঙ্গবাসী প্রজাবর্গের আনন্দের আর সীমা রহিল না। বিজয়সেন বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রজাপুঞ্জের হৃদয় সবিশেষ আকৃষ্ট করিলেন। পালরাজগণের শাসিত প্রদেশের হিন্দু প্রজাগণও সর্ব্বান্তঃকরণে বিজয়সেনের বিজয় কামনা করিতে লাগিল, এবং দলে দলে তাহারা বিজয়সেনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিতে লাগিল, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের এই প্রবল সংঘর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরাজয় সাধিত হইল। বাঙ্গালার সর্ব্বত্র হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সেন বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। পালরাজগণ নব প্রতিষ্ঠিত সেনরাজবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অসমর্থ হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড় অঞ্চল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। প্রাচীন রাজধানী মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) তাঁহাদের একমাত্র আবাসস্থল উঠিল।

পালরাজবংশের এক শাখা করতোয়া নদী অতিক্রম করিয়া, কামরূপের দক্ষিণ ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিল। প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের রাজধানী বর্দ্ধনকুঠীর সপ্ততি মাইল উত্তরে পালবংশীয় যে ধর্ম্মপালের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ ডাক্তার বুকানন কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়, প্রবাদ আছে যে, তাঁহার রাজ্য তেজপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল *। এই পালবংশীয় শেষ রাজাকে নিহত করিয়া খায়েন

* সুপণ্ডিত গ্রিয়ার্সন সাহেব বলেন যে, এই ধর্ম্মপাল সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে করতোয়ার পূর্ব্বতটে বর্ত্তমান রঙ্গপুর ও জলপাইগুড়ি জিলায় এক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। ধবমপুরে

বংশীয় নীলধ্বজ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক কোমতাপুরে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং তিন পুরুষ পর্য্যন্ত তথায় প্রবল পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৪৯৮ খ্রীষ্টীয়াব্দে বাঙ্গালার নবাব আলাউদ্দিন হুসেন সা কোমতাপুর বিধ্বস্ত করিয়া, কামরূপ ও আসাম কিছু কালের নিমিত্ত বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করেন।

যে সময়ে পালবংশের এক শাখা সেনরাজগণের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া কামরূপে আশ্রয় গ্রহণ ও নব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে তাহার প্রধান মূল শাখা বিহারে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। বাণপাল, উষাপাল, চন্দ্রপাল ও ধর্ম্মপালের আবাসবাটীর ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রঙ্গপুর ও দিনাজপুর জিলায় যেমন বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ বিহারের দক্ষিণাংশে স্থিরপাল, বসন্তপাল, ভূমিপাল, কুমারপাল, মদনপাল ও মহেন্দ্রপালের শাসন কালের পরিচায়ক কতিপয় শাসনলিপি বিহার, নালন্দা, গয়া প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে, বাঙ্গালা ও ত্রিহুত (উত্তরবিহার) তাঁহাদের হস্তচ্যুত হইলে পর তাঁহারা বারাণসী ও আলাহাবাদ পর্য্যন্ত আপনাদের আধিপত্য বিস্তৃত করিয়া থাকিবেন। সারনাথের শাসনলিপি বারাণসী পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকার বিস্তারের পরিচয় দিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই সেনরাজগণের শাসন প্রভাব প্রথমতঃ আরম্ভ হয়। রামপাল নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী সংস্থাপিত হয়। ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তরবঙ্গ)। গৌড় (পশ্চিম বঙ্গ) ও ত্রিহুত (উত্তরবিহার) সেনবংশীয় রাজন্যবর্গের অধিকার ভুক্ত হয়। পালবংশীয়দিগের আধিপত্য দক্ষিণবিহারে নিবদ্ধ হয়। সুবিজ্ঞ ব্রডুলি সাহেব অনুমান করেন যে, রামপতিপাল সম্ভবতঃ ১১৫০খ্রীষ্টীয়াব্দে দক্ষিণ বিহারে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ কালক্রমে মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া, তাঁহারা বিহার নগরীতে আপনাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন ১১৭৬ এবং ১১৭৮ খ্রীষ্টীয়াব্দের লিখিত গোবিন্দপালের নামাঙ্কিত লিপি ব্রড্‌লি সাহেবের যত্নে গয়াতে আবিষ্কৃত হয়। এতদ্দ্বারা মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক ১১৯৯ খ্রীষ্টীয়াব্দে রাজধানী বিহার নগরীর সহিত দক্ষিণবিহার অধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৌদ্ধ পালবংশীয় রাজগণই তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। মহম্মদ বক্তিয়ার খিলজী সসৈন্যে বিহার আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া, কাপুরুষ পালরাজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পালায়ন করে। মুসলমান সেনাপতি দুই শত সেনা

তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্টিত ছিল। ধর্ম্মপাল বঙ্গের পালবংশীয় রাজগণেরই বংশধর হইবেন। তাঁহার রাজধানীর অনতিদূরে মাণিক চন্দ্র নামে বণিক এক সুদৃঢ় দুর্গে বাস করিত। ধর্ম্মপালকে পরাজিত ও নিহত করিয়া মাণিক চন্দ্র ধর্ম্মপুর অধিকার করে। ইহার দুই মাইল পশ্চিমে মাণিকচন্দ্রের আবাসবাটী তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীর নাম অনুসারে ময়নামতীর কোট নামে এক্ষণে পরিচিত। গ্রিয়ারসন সাহেব এই মাণিকচন্দ্রের (রঙ্গপুর জিলার প্রচলিত) গান প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মপালের সময় নির্দ্দেশ করিবার জন্ম নিম্নলিখিত রাজনামাবলী রঙ্গপুর হইতে সংগ্রহ করেন।

(১) ধর্ম্মপাল, (২) মাণিক চন্দ্র, (৩) গোপী চন্দ্র, (৪) ভব চন্দ্র, (৫) এক জন অজ্ঞাত নামা পালবংশীয় রাজা, (৬) অরাজকতার সময়; (৭) নীলধ্বজ, (৮) চক্রধ্বজ, (৯) নীলাম্বর (কোমতাপুরের শেষ রাজা)।

জন প্রবাদ অনুসারে রঙ্গপুরের রাজা ভবচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্র অত্যন্ত নির্ব্বোধ ছিলেন।

সঙ্গে লইয়া অনায়াসে বিহার নগরী অধিকার করে। ভয়ত্রস্ত নগরবাসীদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুষ্ঠিত হয়, এবং নিষ্ঠুর মুসলমান সেনার হস্ত তাহাদের অধিকাংশ নিরপরাধে নিহত হয়, এই ঘটনার দুই বৎসর পরে বিজয়ী বক্তিয়ার লুষ্ঠিত দ্রব্যজাতের কিয়দংশ উপহার রূপে লইয়া দিল্লীশ্বর কুতুব উদ্দিনের সমীপে উপস্থিত হন এবং বহু সমাদরে গৃহীত হইয়া বিহারের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হন।

পালরাজগণ যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁহাদের শাসনলিপি স্পষ্টাক্ষরে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু বৌদ্ধ হইলেও তাঁহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ সর্ব্ববিধ প্রজাবর্গকে সমান ভাবে পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহাদের সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধের বিদ্বেষ তিরোহিত হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি ও সুশাসন্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজার সমদর্শিতা ও অপক্ষপাতিতা ও ন্যায়বিচারে বৌদ্ধ হিন্দুকে ভাতৃভাবে দর্শন করিত। এই সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দুর আচার ব্যবহারাদি বিষয়ের বিরোধ এবং পার্থক্যও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়া থাকিবে। এই সময়ে বাঙ্গলায় সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলনও যে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, পালরাজগণের শাসনপত্রেই তাহা প্রকাশিত রহিয়াছে। এই সময়ে সমস্ত রাজকার্য্যে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত, রাজকর্ম্মচারীদিগকে রীতিমত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে হইত ও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কবিতা রচনা অভ্যাস করিতে হইত। সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সভামণ্ডপ অলঙ্কৃত করিতেন। ইতি পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, রাজা নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরব মিশ্র স্বয়ং বুদ্দল ও ভাগলপুরের শাসনলিপির শ্লোক রচনা করেন। তিনি বেদবেদান্ত ও কাব্য-জ্যোতিষ প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নারায়ণ দত্ত নামে এক ব্যক্তি গৌড়েশ্বর মহারাজ নয়পাল দেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। এই নারায়ণের পুত্র চক্রপাণি দত্ত এক জন অতি প্রসিদ্ধ বৈদ্যকশাস্ত্রীয় গ্রন্থকার। তিনি তত্ত্বচন্দ্রিকা, চিকিৎসাসংগ্রহ (গূঢ়রাজ্যবোধক), চরক-তাৎপর্য্য-দীপিকা ও শব্দচন্দ্রিকা নামে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রীয় অভিধান প্রণয়ন করেন। তিনি বৈদ্য ও নারায়ণের পুত্র বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

দেবং প্রণম্য হেরম্বং, বৈদ্যশ্রীচক্রপাণিনা।
ভৈষজ্যশব্দবোধায় ক্রিয়তে শব্দচন্দ্রিকা॥
(শব্দচন্দ্রিকা)

গৌড়াধিনাথরসবত্যাধিকারি-পাত্র-
নারায়ণস্য তনয়ঃ সুনয়ো দন্তবঙ্গাৎ (?)।
ভানোরনুপ্রথিত-লোধ্রবলী কুলীনঃ
শ্রীচক্রপানিরিহ কর্ত্তৃপদাধিকারী॥

চক্রপাণির তত্ত্বচন্দ্রিকা গ্রন্থের টীকাকার শিবদাস সেন লিখিয়াছেন যে, এই 'গৌড়াধিনাথ' শব্দের লক্ষ্য গৌড়েশ্বর নয়পাল দেব। এই কথা কত দূর প্রামাণিক, তাহা বলিতে পারি না।

পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার স্বপ্রকাশিত চণ্ডকৌশিক নাটকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, ক্ষেমীশ্বর নামে জনৈক সুকবি ও সুপণ্ডিত গৌড়েশ্বর মহীপালের সভাসদ ছিলেন। তিনি মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র ও বিশ্বামিত্রের প্রসিদ্ধ করুণরস পূর্ণ উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সংস্কৃতে চণ্ডকৌশিক নাটক রচনা করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় কোন্ স্থান

হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, জানিনা।

পালরাজগণের ধর্ম্মসম্বন্ধে ভারতীয় ইতিহাসবিৎদিগের মধ্যে মতভেদ না থাকিলেও, তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। আবুল ফাজলের মতে তাঁহারা কায়স্থ ছিলেন। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বের লেখকগণ বিগ্রহপালের পত্নী লজ্জা দেবী যে হৈহয় বংশীয় রাজতনয়া ছিলেন, তাহা জানিতে না পারিয়া পালরাজগণকে হৈহয়জাতীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একটী অস্পষ্ট জনপ্রবাদ অবলম্বন করিয়া কানিংহাম ও ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব তাঁহাদিগকে ভুঁইহার বংশীয় বলিয়া অনুমান করেন। ডাক্তর হার্নলি তাঁহাদিগকে গহড়বাড় বংশীয় ক্ষত্রিয় কল্পনা করিয়া রাঠোরবংশীয় কনোজরাজ চন্দ্রদেবকে পালবংশীয় বৌদ্ধ মহীপালের হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পুত্র বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ ডাক্তার হারনলির এই স্বকপোল-কল্পিত অনুমানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বীয় পুচ্ছগ্রাহিতা ও অনুকরণপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন। পালরাজগণের শাসনপত্রে যদিও তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ নাই, তথাপি বল্লভী ও হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের এবং রাজ্যকূটাপতির সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ বন্ধন দৃষ্টে, পালবংশের ক্ষত্রিয়ত্বে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখা যাইতেছে না।

পালবংশীয় নৃপতিবর্গের সহিত ঢাকার ইতিহাসের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। জনপ্রবাদের প্রতি নির্ভর করিয়া আমরা শিশুপাল, যশপাল ও হরিশ্চন্দ্র পালকে বুড়ীগঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর উর্দ্ধর তীরস্থিত ভূভাগের বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছি। তাঁহাদের 'পাল' উপাধি ভিন্ন তাঁহাদিগকে জনশ্রুতি অনুসারে পালবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করার অন্য কোনও অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আমরা এখানেই পালরাজগণের অসম্পূর্ণ বিবরণ সমাপ্ত করিলাম। ভবিষ্যতে আদিশূর ও সেনরাজগণের বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিব।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

কৌলিন্য ও কুসংস্কার।

অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া অতীত সাক্ষী ইতিহাসের আলোচনায় প্রয়োজন নাই। সময়ের যবনিকা উদ্ঘাটন করিয়া বাঙ্গালীর সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক জীবনের ক্রমোন্নতি প্রদর্শনও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সমাজরূপ বিশালক্ষেত্রে কত কণ্টক বৃক্ষ জন্মিয়া কাল সহকারে আপনি লয় পাইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? কিন্তু ভগ্নমূলাবশেষ বৃক্ষের ন্যায় যে গুলি অদ্যাপি সমাজক্ষেত্রে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহা সমূলে উৎপাটিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ রক্ষণশীল অথবা উন্নতিশীল কোন্ মতের অধিক পক্ষপাতী, স্থির করা আবশ্যক।

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন অধিকাংশই যে রক্ষণশীলতা মতের অনুমোদন করেন, বোধ হয় ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কিছুই নাই। যে নিয়ত অন্ধকারে বাস করে, সে যেমন অন্ধকার প্রিয় হয়, আলোক সহ্য করিতে পারে না, আমরাও যে তথাবিধ কারণে কুসংস্কার-প্রিয় হইব, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। যাহা প্রাচীন তাহাই যে মৌলিক ও সর্ব্বথা দোষস্পর্শ-শূন্য, ইহার তুল্য অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত আর দ্বিতীয় সম্ভবে না। প্রাচীনতার প্রতি এইরূপ অন্ধ-বিশ্বাস জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়। বস্তুতঃ শিক্ষা ও সভ্যতালোক বিস্তার ভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব। সমাজের গতি দেশ কালের আবরণ ও পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারের সংকীর্ণ সীমায় নিবদ্ধ। সুতরাং কোন দেশে কোন কালে কুসংস্কারের আধিপত্য সহসা এক দিনে বিলুপ্ত হয় না। অপিচ, প্রাচীন আচার ব্যবহার ও নিয়মাবলীর প্রতিও লোকের অন্ধ বিশ্বাস সহসা তিরোহিত হয় না। ইংরেজী শিক্ষার আলোকে এ দেশ আলোকিত না হইলে সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি যে সুদূর-পরাহত হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তথাপি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিরোধী কুসংস্কারগুলি অদ্যাপি সমাজে বদ্ধমূল দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কৌলিন্য প্রথা সম্বন্ধেই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

কৌলিন্য প্রথার মূল সূত্রটী এই ছিল :—
"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং,
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণং।"

এই সমস্ত লক্ষণ অনুসারেই কুলীন ও অকুলীনের প্রভেদ স্থাপিত হইত। (১) সদাচার সম্পন্ন, (২) বিনয়ী, (৩) বিদ্বান, (৪) গৌরবান্বিত ও (৫) তীর্থ দর্শন-পরায়ণ এবং (৬) ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্, (৭) সৎপথে অর্জ্জনশীল ও সৎপাত্রে দানশীল এবং (৮) তপোনিষ্ঠ ও (৯) দাতা, এই নব গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিই কুলীন পদবাচ্য ছিলেন। পাঠক এখন বলুন দেখি, ইহা কি ব্যক্তিগত, অথবা গুণগত, না বংশগত উপাধি? সামান্য পাঠশালার ছাত্রও বোধ হয় এই সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে, ইহা যদি বংশগত উপাধি হয়, তবে বি-এ, এম, এ, তর্কালঙ্কার, ন্যায়রত্ন ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি উপাধিগুলি বংশগত হইলে হানি কি? কেহ কেহ এই কুসংস্কার প্রণালীর পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া নানা বিধ অপসিদ্ধান্ত কল্পনা করিয়া থাকেন, সে গুলিও প্রস্তাবিত প্রবন্ধে অবশ্য বিচার্য্য।

"কৌলিন্য মর্য্যাদা বংশ পরম্পরাগামী করাতে আমাদিগের ইংরেজি শিক্ষাভিমানী কৃতবিদ্য মহোদয়গণ বল্লাল সেনের প্রতি অপরিমিত গালিবর্ষণ ও কুলীনের প্রতি অযথা অবজ্ঞা ও বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন। তাঁহারা কি চাহেন যে, পরীক্ষা করিয়া পারদর্শিতানুসারে উচ্চ ও নিম্ন কুলীন স্থির করিতে হইবে? * * * যে বিলাতকে আমরা সকল বিষয়ে অভ্রান্ত ও সর্ব্বথা কুসংস্কার শূন্য মনে করি; আমরা সেখানে কি দেখিতে পাই। "লর্ডের" পুত্র "লর্ড" (কুলীন) হন, না তিনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে লর্ড দল হইতে খারিজ হন, না যে অন্য কেহ ভাল করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তিনি "লর্ড" (কুলীন) হইয়া গেলেন? যদি ইংলণ্ডীয় কৌলিন্য আভিজাত্যগত না হইয়া যোগ্যতা বা পাণ্ডিত্য সাপেক্ষ হইত, তাহা হইলে নিউটন বা

ডারউইন, জনষ্টুয়ার্ট মিল বা হাবার্ট স্পেনসার, ফসেট্ বা ব্রাইট্ এত কাল সদা "মিষ্টর" নামে অভিহিত হইতেন না।" *

এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ভারতের ও বিলাতের সামাজিক অবস্থা তুলনা করা আবশ্যক। ভারতে জাতিভেদ প্রথা, ধর্ম্ম ও প্রকৃতিগত প্রভেদ অনুসারে, নিরূপিত হইয়াছে। যথা, "সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, অহিংসা, তপস্যা ও দয়া, এই সকল লক্ষণ যাঁহাতে লক্ষিত হয়, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলে। যে সকল মনুষ্য রজোগুণ প্রভাবে কাম ভোগাসক্ত, তীক্ষ্ণ, ক্রোধশীল ও সাহসী হইয়া ব্রহ্মভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, তাহারা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত। যাহারা রজ ও তমোগুণ প্রভাবে ব্রহ্মভাব হইতে স্খলিত হইয়া বণিক্-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহারাই বৈশ্য। যাহারা তমোগুণ প্রভাবে হিংসা-পরতন্ত্র, লুব্ধ-স্বভাব, সর্ব্ব-কর্ম্মোপজীবী, মিথ্যাবাদী ও শৌচ-পরিভ্রষ্ট, তাহারাই শূদ্র বলিয়া অভিহিত †।" কিন্তু ইউরোপ প্রভৃতি দেশে আমরা কি দেখিতে পাই? তথায় ধনী ও ক্ষমতাবান একজাতি, দরিদ্র ও অক্ষম অন্য জাতি। তাহাদের মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান নিষিদ্ধ। এমন কি, কোন সিবিলিয়ান মহাত্মা বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার পণ্যজীবী ভ্রাতার সঙ্গে একত্র বসিয়া এক টেবিলে আহার করেন না। ধন ও পদগৌরবান্ধতা-জনিত বৈষম্য, সাম্যবাদী দেশে, ইতোধিক আর কি সম্ভবপর হইতে পারে? বস্তুতঃ সেখানে জাতিভেদ ও যত প্রকার সামাজিক ভেদ পরিকল্পিত হইতে পারে, সমস্তই ধন-বৈষম্য হইতে উৎপন্ন। মুদ্রাহীনতা যে সকল দোষের মূল ও সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রধান অন্তরায়, ইউরোপ প্রভৃতি দেশ তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। "ডিউক" "নাইট" ও "আরল" প্রভৃতি উপাধিগুলি তথায় স্বর্ণ মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে; এবং তাহা বংশানুক্রমিকও দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ গুণানুসারে নির্ব্বাচন ভিন্ন ধন বৈভব যে উপাধির একমাত্র নিয়ামক, তাহা বংশগত না হইবে কেন? সেই জন্যই "লর্ডের" পুত্র "লর্ড" ও "ডিউকের" পুত্র "ডিউক" উপাধিতে বিভূষিত হন। অস্মদ্দেশেও এরূপ দৃষ্টান্তের অপ্রতুল নাই। রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর, নবাব ও বাদসাহ প্রভৃতির বংশধরেরা যে পৈত্রিক উপাধিতে অধিকারী হন, ইহা কে না জানে? এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, উল্লিখিত উপাধিগুলি ও হিন্দু সমাজের কৌলিন্য উপাধি সমস্তই কি এক শ্রেণীর? যে নিতান্ত অন্ধ, সেও বোধ হয় এতদুভয়ের প্রকৃতিগত মৌলিক পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে; সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে বিলাতী কৌলিন্যকে এ দেশীয় কৌলিন্যের আদর্শ কল্পনা করিয়া কৌলিন্য প্রথা বংশগত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আর যদি ইউরোপীয় সমাজে কুপ্রথা ও কুসংস্কারের আধিপত্যই থাকে, আমরাও কি অন্ধভাবে তাহার অনুসরণ করিব? আদর্শ ব্যক্তির বা সমাজের গুণের অনুকরণ করাই মহত্ব লাভের একমাত্র উপায়; কিন্তু দোষের অনুবর্ত্তী হওয়া অধঃপতনের ক্রমনিম্ন সোপানে অবতরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

* "কৌলিন্য প্রথা" শীর্ষক প্রবন্ধ—মালঞ্চ।

† মহাভারত—বনপর্ব্ব,—শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

আর এক শ্রেণীর আপত্তিকারী দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মত এই যে, যে সত্য-পরায়ণতা, বিশুদ্ধাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, শুধু জন্মগুণে যাহা লাভ করা যায় না, সেই সদাচার-ভ্রষ্ট, অনৃতবাদী, পরহিংসা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন, তবে কুলীনের বংশ পরম্পরাক্রমে কুলীন না হইবে কেন? এ যুক্তিটীও আমাদের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। আমরা স্বীকার করি যে, জন্মগুণে বংশপরিচয়ার্থ ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হওয়া ভিন্ন কেহ কখনও ব্রহ্মবিদ্যা-পরায়ণ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। সদাচার, তপশ্চর্য্যা ও সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। কিন্তু এই সমস্ত বিশুদ্ধাচার ও নৈতিক উৎকর্ষতা ধারাবাহিকরূপে বংশ পরম্পরা ক্রমে অনুষ্ঠিত হওয়াতে ব্রাহ্মণ সন্তান যত সহজে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারেন, অন্ত্যজ জাতি মধ্যে কেহ কখন সেরূপ পারে কি না, সন্দেহ। সেই জন্যই হাড়ি, ডোম, চণ্ডালের বংশে ব্রাহ্মণত্ব লাভের উপযোগী সদ্‌গুণশালী লোক কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জ্ঞান ও প্রতিভা সম্বন্ধেও শ্রেষ্ঠবর্ণ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শূদ্র প্রভৃতির সঙ্গে অন্ত্যজ জাতির তুলনা অসম্ভব। প্রাচীন কালের কথা গণনার বাহিরে রাখিয়া বর্ত্তমান সময়ের সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে দৃষ্টিপাত করিলেও আমরা কি দেখিতে পাই; যখন শুভক্ষণে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয় তিরোহিত হইয়া আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেই জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনায় অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই সময় কাল হইতে বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যেও ভারতে যত কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সুলেখক ও বাগ্মী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সমস্তই উল্লিখিত বর্ণত্রয় হইতে। হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের লোক যে অচিরে এইরূপ জ্ঞানী ও প্রতিভাশালী হইয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে, এরূপ আশা করা সুকঠিন। সুতরাং এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া প্রতীতি হয় যে, ব্রাহ্মণত্ব বংশগত না হইলেও জন্মগুণ যে ব্রাহ্মণত্বের অনেকটা অনুকূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণত্ব বংশগত হওয়াতে সমাজের যত না অনিষ্ট সম্ভাবনা, কৌলিন্য প্রথায় তাহা অপেক্ষা শতগুণ অনিষ্ট সংসাধিত হইতেছে। এই মতটী সত্যের অধিক সন্নিহিত কি না, তাহা সুবিবেচক পাঠকগণের বিবেচনা সাপেক্ষ।

প্রাচীন ভারতে জাতিভেদ প্রথা অংশতঃ শ্রমবিভাগ নীতির উপরও প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্রাহ্মণ, যজন, যাজন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা পরায়ণ ছিলেন। সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া পর ব্রহ্মের নিষ্কাম উপাসনায় তাঁহারা জীবন অতিবাহন করিতেন। ক্ষত্রিয় যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন; বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা ও যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি সামরিক ব্যাপার তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে পরিগণিত ছিল। বৈশ্য কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; এবং শূদ্র ব্রাহ্মণের দাস অথবা দাসত্ব ব্যবসায়ী হইয়া সমাজের নিম্ন শ্রেণীতে স্থানলাভ করিয়াছিল। এই শ্রমবিভাগ নীতি যে জাতিভেদ প্রথার মূল ভিত্তি, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এইরূপ উচ্চ নীচ প্রভেদ সমাজে আবহমান কাল হইতে

চলিয়া আসিতেছে। আর জ্ঞান ও প্রতিভার স্রোত অব্যাহত রাখিবার জন্যও শ্রেষ্ঠ বর্ণের সঙ্গে অন্ত্যজ বর্ণের শোণিত-সংযোগ সর্ব্বথা অবৈধ। সুতরাং পরস্পর ভিন্ন বর্ণে ভোজ্যান্নতা ও বিবাহাদি ক্রিয়া প্রাচীন কাল হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কৌলিন্য প্রথার মূলে এরূপ কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নিহিত আছে কি? এই প্রথা কি সদ্‌গুণের আদর এবং দোষের শাসন জন্য একটী রাজ নিয়ম মাত্র নহে? যেমন দশ দশ বৎসর অন্তর গবর্ণমেণ্ট লোকসংখ্যা গ্রহণ করেন, তেমনই যদি কৌলিন্যের লক্ষণানুসারে নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর অন্তে বিচার হইয়া কুলীনের তালিকা প্রস্তুত হইত, তাহা হইলে কি আর বর্ত্তমান কৌলিন্য প্রথা সমাজের দুরপনেয় কলঙ্ক স্বরূপ হইত? একথা সাহস পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করা যায় যে, সর্ব্বথা অপাত্রে ন্যস্ত হইয়া কৌলিন্য যে জঘন্য আকার ধারণ করিয়াছে, কৌলিন্য-প্রথা-প্রবর্ত্তকের মূল উদ্দেশ্য তাহা ছিলনা। ইয়োরোপে যেমন ধন গৌরবে কৌলিন্য, এদেশে তেমনই গুণ গৌরব অনুসারে কৌলিন্য উপাধি প্রদত্ত হইত। দেশের দুরদৃষ্ট বশতঃ সমাজ-সমুদ্র-মন্থনে অমৃতের পরিবর্ত্তে হলাহল উঠিয়াছে। আজ এমন কেহ নাই যে, এই হলাহল পান করিয়া সমাজের প্রাণ রক্ষা করে। তাই আজ কৌলিন্য বংশগত, কুলীন মেলবদ্ধ, দেশ মন্ত্রমুগ্ধ ও অধঃপতিত।

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, কুলীন অর্থাৎ গুণবান এবং অকুলীন বা গুণহীনে পরস্পর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নহে? যদি তাহা হয়, তবে উভয়ত্র উল্লিখিত বংশ পরম্পরায়ও আহার ব্যবহার এবং উদ্বাহাদি ক্রিয়া অবশ্য নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। কিন্তু এই যুক্তিটী আমাদের মত না প্রতিকূল, তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে অনুকূল বলিতে হইবে। আমরা স্বীকার করি যে, গুণবান স্বামী ও গুণবতী ভার্য্যার মিলন সর্ব্বথা ন্যায়ানুমোদিত সন্দেহ নাই। এরূপে গুণের সমাদর রক্ষিত হয়, এবং অবৈধ মিলন বিরহে উত্তরোত্তর গুণবানের সংখ্যা বৃদ্ধিও ইহার আবশ্যম্ভাবী ফল বলিতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই, এরূপ বাঞ্ছনীয় মিলন স্থলে গুণবান ও গুণহীন বলিয়া পৃথক পৃথক বংশ নির্দ্দেশ করা কি স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য নহে? জাতিভেদ অথবা বর্ণভেদ মূলক যেখানে ব্রাহ্মণ ও শুদ্রাদির ন্যায় পরস্পর প্রকৃতিগত প্রভেদ বিদ্যমান নাই, অথচ শ্রমবিভাগ নীতি অনুসারেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ন্যায় পৃথক পৃথক ক্রিয়ানুষ্ঠানজনিত বৈষম্যও লক্ষিত হয় না; যেখানে কুলীন ও অকুলীনের ব্যক্তিগত শ্রেণী বিভাগস্থলে বংশ নির্দ্দেশ করা কি ঘোরতর অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের ফল নহে? এক পিতার পুত্র কেহ পণ্ডিত, কেহ মূর্খ, কেহ বুদ্ধিমান, কেহ স্থূলবুদ্ধি, কেহ বিনীত শান্ত, কেহ বা উদ্ধত-স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়। একই শুক্র শোণিতে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও যদি এরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয়, তবে বংশ পরম্পরাক্রমে যে আরও কত গুরুতর পার্থক্য জন্মিতে পারে, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। সুতরাং কুলীনের বংশানুক্রমে যে সকলেই কৌলিন্য লক্ষণাক্রান্ত নবগুণ বিশিষ্ট হইবে, এরূপ মনে করা উন্মাদ কল্পনা বই আর কিছুই নহে। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে গুণবানের সম্মান ও উৎসাহ বর্দ্ধন এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি, তাহা ব্যক্তিগত অথবা

গুণগত উপাধি ভিন্ন কখনই বংশগত নহে।

হিন্দুসমাজে অদ্যাপি ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাদিতে যেরূপ প্রভেদ বিদ্যমান, কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ ও ভঙ্গকুলীন প্রভৃতি কুলীন সম্প্রদায়ের অসংখ্য পর্য্যায় পরম্পরার প্রভেদও তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূনতর বলিয়া বোধ হয় না। ব্রাহ্মণ, শূদ্র অথবা বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিলে যেমন তজ্জাতিত্ব প্রাপ্ত হন; "কুলীনেরা শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিলে বংশজ এবং নিকষ কুলীনেরা বংশজের কন্যা গ্রহণ করিলে স্বকৃত-ভঙ্গ আখ্যা পান।" অর্থাৎ পূর্ব্ব গৌরব ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হন। শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায় দেখুন। ইহা যদি ব্যবস্থা হয়, তবে অব্যবস্থা কাহাকে বলে, জানি না। অনেকে আবার এই অসার কৌলিন্য প্রথার অংশতঃ সংস্কার প্রয়াসী; আমরা বলি যে, তাঁহাদের মত ভ্রান্তবুদ্ধি আর কেহই নহে। মূলশূন্য বিষয়ের মূলানুসন্ধানে চেষ্টা করা ও আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা উভয়ই তুল্য, কারণ যে কুসংস্কার ভিত্তির উপর বর্ত্তমান কৌলিন্যপ্রথা প্রতিষ্ঠিত, তাহা সংস্কার অথবা সমূলে উৎপাটন করা একই কথা। অপিচ বিষবৃক্ষের শাখাচ্ছেদ না করিয়া আমূলত উৎপাটন করাই সুকৃযাণের কাজ, কিন্তু কুলীনেরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যে এই কুসংস্কার নীতির মূলোচ্ছেদ করিবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। আর এখনও সমাজে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যাই অধিক; দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই রক্ষণশীল সম্প্রদায় বিশেষ সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। তাহাদের নিকট কৌলিন্য প্রথার অপকারিতা বর্ণন ও অরণ্যে রোদনে কিছুই ইতর বিশেষ নাই। কিন্তু যাবৎ না সমাজ মর্ম্ম-কৃন্তন-কারী কৌলিন্য প্রথার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাধা হয়, তাবৎ সামাজিক মঙ্গলের আশাও সুদূরপরাহত।

হিন্দুশাস্ত্রে অষ্ট প্রকার বিবাহ পদ্ধতি উল্লিখিত আছে; তন্মধ্যে পৈশাচিক বিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম। কিন্তু এই গণনা অনুসারে ধরিতে গেলে বর্ত্তমান কৌলিন্য বিবাহের স্থান কোথায় হইবে, তাহা স্থির করাও কঠিন। অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত সপ্তম বর্ষীয়া বালিকার এবং চত্বারিংশত্ বর্ষীয়া প্রৌঢ়ার সঙ্গে দশম বর্ষীয় বালকের পরিণয়, কিরূপ অভাবনীয় দৃশ্য, তাহা মনে করাও কষ্টকর। ভারতীয় আদিম অনার্য্য সমাজে যখন সভ্যতার আলোক প্রবিষ্ট হয় নাই, একমাত্র পাশব প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি জন্যই যখন বিবাহের প্রয়োজন হইত, তৎকালীন সমাজে যে সমস্ত কুৎসিত বিবাহ প্রণালী প্রচলিত ছিল, আধুনিক কৌলিন্য বিবাহ তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। "দক্ষিণ ভারতবর্ষে 'রেডী' বলিয়া একটা জাতি আছে। তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত বিবাহ প্রণালী প্রচলিত। প্রাপ্ত-যৌবনা বিংশতি বা ততোধিক বর্ষ বয়স্কা স্ত্রীলোকের একটী পাঁচ বৎসরের বালকের সহিত বিবাহ হয়। বালকের যৌবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহার স্ত্রীকে যে গর্ভধারণে নিরস্ত থাকিতে হয়, এরূপ নহে। সেই স্ত্রী তাহার স্বামীর মাতুল গোষ্ঠীর কোন যুবার সহবাসে গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করিতে থাকে। সন্তানগুলি যদিও এইরূপে উৎপন্ন, তথাপি সেই বালক স্বামীর সন্তান বলিয়াই পরিচিত হয়।"*

*"বিবাহ রহস্য" শীর্ষক প্রবন্ধ—মালঞ্চ।

বর্ত্তমান কৌলিন্য-বিবাহ এই বর্ব্বর জাতির জুগুপ্সিত প্রথার কতকাংশে অনুরূপ, সন্দেহ নাই। (বিবাহ-ব্যবসায়ী কুলীন সন্তানগণ সপ্ততি, অশীতি, কখন বা ততোধিক রমণীর পানিগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু পত্নীর ভরণ পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার পিতৃ পরিবারের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। অন্য কথা দূরে থাকুক, প্রচুর রূপে কৌলিন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত না হইলে প্রাণান্তেও ইহারা পত্নীর মুখ দর্শন করেন না।) কুলীন কুলসর্ব্বস্ব নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থে কৌলিন্য বিবাহের বিষময় ফল বিশদ ভাবে বিবৃত হইয়াছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে বাহুল্য বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলিব যে, এরূপ অবৈধ পরিণয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল ব্যভিচার ও জারজ সন্তানের জন্ম; এবং স্থল বিশেষে ভ্রূণ হত্যা অথবা শোচনীয় আত্মহত্যা! ধন্য দেশাচার! তোমার অসাধ্য কার্য্য কিছুই নাই। তুমি ধর্ম্মের নামে মূর্ত্তিমান অধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিতেছে, দেবতা বলিয়া পিশাচের পূজা করিতেছ, অমৃত বলিয়া কালকূট হলাহল ঢালিয়া দিতেছ; এবং ব্যভিচার ও ভ্রূণ-হত্যার স্রোতে ভারতভূমি কলুষিত করিতেছ। অহো! আমাদের সমাজ এখনও গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। আবাহন ও উদ্বোধন ভিন্ন এ মৃতকল্প সমাজের সঞ্জীবনী শক্তি পুনরুজ্জীবিত হইবে না। হায়! সেই মহাত্মা রামমোহন রায় নাই। যাঁহার উদয়োন্মুখী প্রতিভালোকে অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন ভারতভূমি জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত হইয়াছিল। যিনি অশেষ প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া—উৎপীড়িত, নিগৃহীত এবং সমাজে লাঞ্ছিত হইয়াও দেশাচার ও কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অঙ্গার হইতে হীরক, ভস্ম হইতে অগ্নি, অথবা উপধর্ম্ম হইতে সত্য-ধর্ম্ম আবিষ্কার করিয়া ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেরূপ মহাপুরুষের অভ্যুদয় বঙ্গবাসীর পক্ষে শুভযুগ বলিতে হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কি আমরা সেরূপ আশা করিতে পারি? তাঁহারা সর্ব্বথা সাহস, অধ্যবসায় ও উদ্যমহীন, এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের তুচ্ছ অসন্তুষ্টি অথবা নিন্দার ভয়ে ভীত। যেদিন তাঁহারা কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও বিবেকের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বার্থনাশ, লোকনিন্দা ও সমাজভীতি অতিক্রম করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবেন, সেই দিন হিন্দু সমাজে নবযুগের অভ্যুদয় হইবে। জানি না, এই হতভাগ্য জাতির সে শুভদিন কবে আসিবে!

শ্রীমহেশ চন্দ্র সেন।

ব্রহ্মজ্ঞান ও পৌত্তলিকতা।

(৩)

আদর্শ, মনুষ্যের স্বাভাবিক কল্পনা। আ-[illegible] হইতেই এই কল্পনার উদয়। অথচ [illegible]না বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া, ইহা কস্মিন্‌কালে [illegible]হ উড়াইয়া দিতে পারে নাই। আশৈশব আমরা সকলেই এই কল্পনা-বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়া থাকি। আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে প্রকারাদি ভেদে অবশ্য এই কল্পনার অনেকটা ইতর বিশেষ আছে, কিন্তু আমরা সকলেই

যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, স্ফুট কি অস্ফুট একটি না একটি আদর্শের অধীনে চলিতেছি—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। কখন যে এই স্বাভাবিক কল্পনার হাত ছাড়াইতে সক্ষম হইব, সে আশা অতি অল্পই আছে। কৃত্রিম কল্পনা—মানুষ ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কল্পনার জীবন সঞ্চার করে, ইচ্ছামত যাহার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর; তাহাকেই আমরা কল্পনা বলিয়া বুঝিয়া থাকি; অথবা যাহা অসম্বদ্ধ স্বপ্নবৎ ক্ষণস্থায়ী, এক কথায় যাহা উষ্ণ মস্তিষ্কের বিকার মাত্র, তাহাকেও আমরা কল্পনা নাম দিয়া থাকি। কিন্তু স্বাভাবিক কল্পনা—মানুষের যাহাতে জীবন সঞ্চার হয়, আপন ইচ্ছামত যাহার পরিবর্ত্তন সম্ভবপর হয় না, এক কথায় মানুষ যাহার সৃষ্টি করে না, প্রকৃত পক্ষে মানুষকে যাহা সৃষ্টি করে, অর্থাৎ মানুষের চরিত্র যাহাতে গঠিত হয়, যাহার অভাব ঘটিলে আমরা মৃত অচেতন পদার্থবৎ হইয়া পড়ি, সাময়িক অবস্থা ও উত্তেজনার দাস হইয়া পড়ি, তাহাই হইল আসল কল্পনা। এবম্বিধ স্বাভাবিক কল্পনাব নাম বিকল্প নহে, তাহার প্রকৃত নাম বরং সঙ্কল্প দেওয়া যাইতে পারে। সঙ্কল্প ভিন্ন কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হয়? মহৎ ব্যক্তিবর্গের জীবনচরিত এবম্বিধ স্বাভাবিক কল্পনা বা সঙ্কল্পের অমানুষিক অত্যাশ্চার্য্য মহিমার পরিচয়স্থল। সিদ্ধির মূল মন্ত্র কি—না উজ্জ্বল পরিস্ফুট আদর্শ।

মোট কথা এই—মূল স্বভাব যাহা নিরপেক্ষ ও নির্গুণ, তাহা আমাদিগের সকলেরই বাক্যমন বুদ্ধির অগোচর। তাহাতে উৎপন্ন যে রস, অর্থাৎ আন্তঃকরণিক ঘনীভূত ভাব, যাহাতে নিরাকারে ও সাকারে প্রথম শুভদৃষ্টি ঘটিয়াছে, অর্থাৎ যাহাতে সাকার ও নিরাকার, সসীম ও অসীমের অস্ফুট খণ্ডতা মাত্র হইয়াছে, তাহা অপরিচ্ছিন্ন ভাবমাত্র বিধায়, আমাদিগের নিকট জ্ঞেয় অথচ অজ্ঞেয়; আমরা ধরিতে পারি, অথচ পারি না। আদর্শ এই রসের আলেখ্য,—সসীম অথচ সেই অসীমের প্রতিবিম্ব স্বরূপ; আমাদিগের জ্ঞেয় উপাস্য ও ধ্যেয়। আদর্শ হইল স্বভাবের রূপ, বাহিরে স্বভাবের ছায়া। আদর্শ না থাকিলে মূল স্বভাব আমাদিগের নিকট চির অজ্ঞেয় থাকিয়া যায়। আদর্শ ও স্বভাব পৃথক হইলেও এক। আদর্শ-অজ্ঞেয় স্বভাবের সুন্দর মনোহর অভিব্যক্তি, ইহজগতে তাহার একমাত্র পরিচয় স্থল। আদর্শ অতীতকে জীবন্ত করে; ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানে আনে; একাধারে উভয় কালকে মিশাইয়া লইয়া, জীবনকে নূতন পরিধি বিস্তার করিবার অবসর ও শক্তি প্রদান করে। স্বভাব হইল বীজ, রস হইল মূল, আদর্শ হইল বৃক্ষ। অতএব আদর্শের পূজা করাও যা, স্বভাবের পূজা করাও তাই।

অতএব আত্মরূপই আদর্শ হইয়া, গুরু হইয়া, ঈশ্বর হইয়া, আমাদের চক্ষের সম্মুখে থাকে; অথচ বোধ হয়—বাস্তবিকই প্রাণে প্রথমতঃ অনুভব হয় যে, সে পদার্থ যেন আমি নহি; আমি যদি সেই আদর্শ হইতাম, তবে আবার তাহা আমার আদর্শ হইবে কিরূপে? বোধ হয় যেন, তাহা আমার অতীত; যেন সে এক অপর প্রচণ্ড শক্তি, যেন সে এক মহাপ্রাণ, তাহাতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ ডুবিয়া রহিয়াছে: আমি যেন নিষ্প্রভ ও মলিনাবস্থায় তাহারই এক কোণে পড়িয়া মিশিয়া গিয়াছি। খ[illegible]তে ও চন্দ্রমায়, কূপে ও সাগরে, যত [illegible]

প্রভেদ, বোধ হয় যেন আমাতে ও আমার অন্তরের সেই মহা মহিমাময় পদার্থে, ঠিক তত খানি প্রভেদ। তবে আর কেমন করিয়া সেই আদর্শরূপকে আমাদিগের স্বভাব ও আত্মরূপ বলিয়া গৌরব করিতে পারি? সহজ দৃষ্টিতে এইরূপই আমাদিগের মনে হয় বটে,—কিন্তু সকল সময় সাদা দেখায় ঠিক দেখা ঘটিয়া উঠে না। কথাটা আমাদিগের আর একটু খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক।

আমাদিগের এই বর্ত্তমান অবস্থাকেই যদি সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিতে হয়, আর এই যে এখনকার অবস্থা, ইহার নামই যদি স্বভাব হয়, অর্থাৎ আমাদিগের বর্ত্তমান আকারকেই যদি আত্মরূপ বলিয়া ধরিতে হয়, তাহা হইলে কেবল যে আদর্শরূপ কখন আত্মরূপ হইতে পারে না, তাহা নহে; এক সঙ্গে সকল গোলই চুকিয়া যায়। কিন্তু তাহাত আর নহে, বর্ত্তমান রূপকে কেমন করিয়া আত্মস্বরূপে উল্লেখ করিতে পারা যাইবে? এই খানেই যদি স্বভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়া থাকে, তবে আমার জীবনের গতি ত এই খানেই থামিয়া যায়। আমি যা', আমি যদি তাই হইতে পারিয়াছি, তবে আর আমার পক্ষে কর্ত্তব্য কি থাকিতে পারে? বৃক্ষের যদি সম্পূর্ণ বিকাশই ঘটিয়া থাকে, তবে আবার তাহার কি বিকাশ হইবে? সার কথা এই যে, ঐ তহবিল কোন দিন সমান থাকে না, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে জমাও হইতেছে, খরচও হইতেছে; দিনান্তের কৈফিয়তে, মজুদ তহবিলে, কিছু না কিছু অবশ্যই তারতম্য ঘটিবে। শৈশবে যাহা ছিলাম, আজ আর সে রকম নহি; তখন আমার এক রকম রূপ ছিল, আজ আমার আর এক রকম রূপ দাঁড়াইয়াছে, বয়োবৃদ্ধেই কি এই বর্ত্তমান রূপ থাকিবে? তারতম্য ঘটিয়া আসিয়াছে ও ঘটিতে থাকিবে, তবে আর এখনকার বিকাশকে স্বভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ বলিয়া কি হিসাবে নিশ্চিন্ত থাকিতে পার? অতএব এই অস্ফুট স্বভাব যে আদর্শ ধরিয়া, দিন দিন সমধিক প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, বরং তাহাকেই এক্ষণে স্বভাব বলিয়া মানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। থাকুক না তাহা দূরে, হউক না তাহা আমা হইতে শত যোজন, লক্ষ যোজন তফাৎ, তথাপি আমি, 'প্রকৃত আমি' সেই খানে। হই না আমি ক্ষুদ্র কূপ, আর হউক না তাহা মহাসাগর, তথাপি আমি, 'প্রকৃত আমি' তাই। স্বভাব মানে যদি 'আমি' হই, তবে যেখানে আমার স্বভাবের বিকাশ, সেইখানে আমি;—এ কথা অস্বীকার করি কেমন করিয়া?

ভাল, সেই বিকাশ কিরূপে সম্ভবপর, এক্ষণে তাহারই আলোচনায় যৎসামান্য ভাবে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। আদর্শের গোড়ায় থাকে রস; সেই রস যে ঘনীভূত ভাব, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তদ্ভিন্ন আদর্শের উৎপত্তিই সম্ভবপর হয় না। কাজেই সকলের আগে রসের উদ্দীপনা চাহি, ভাবাঙ্গের ঔৎকর্ষ্য সাধন করা চাহি, নতুবা স্বভাব যেমন অব্যক্ত, তেমনি অব্যক্ত থাকিয়া যায়। সেই উদ্দীপনা, সেই ঔৎকর্ষ কিসে হয়? আমরা বলি, সংসারে অনুরূপ পদার্থের মিলনে। অনুরূপ, সসীম ও সাকার দৃষ্টান্ত অনুকূল অবস্থায় না পাইলে রস আদৌ স্ফূর্ত্তি পায় না। ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের বেলায় যেমন দৃশ্যাদি বিষয়ের অস্তিত্ব থাকা আবশ্যক করে, আন্তঃকরণিক ভাবগুলির বেলা-

তেও, ঠিক সেই একই প্রকার নিয়ম বলে, ভাব্য পদার্থের অস্তিত্ব একান্তই থাকা চাহি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভাবের বস্তু যেমন ভাবেরই প্রতিমূর্ত্তি, ভাবও তেমনি সেই ভাব্য বিষয়ের প্রতিমূর্ত্তি। কেবল যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বেলাই আমি জগতের ছাঁচে ঢালা কিছু, তাহা নহে; ভাবের সম্বন্ধেও আমার রূপ জগতের দ্বারা গঠিত ও বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু জগত আমাকে যেমন একটা ভাব-দেহ দেয়, আমিও সেইরূপ তাহার ভিতরে একটী ভাবময় জীবনের সঞ্চার করি। আমাদিগের আদর্শ, আমাদিগের অন্তরের ঈশ্বর-ভাবকে, আমরা এই কারণ বশতঃ বাহিরে আঁকিয়া জগদীশ্বর করিয়া তুলি। আমাদিগের অন্তরের আদর্শ চৈতন্যে দয়া প্রেমাদি নিষ্কলঙ্ক সদ্‌গুণ রাশি দিয়া আমরা তাহা যেরূপ ভাবে সজ্জিত করিতে ভাল বাসি, জগতের মূল কারণে প্রকৃতপক্ষে তাহার একটী গুণ না থাকিলেও আমরা তাহা সহজেই আরোপ করিয়া লই। হাজার যুক্তি দিয়া বুঝি যে, জগতের মূল কারণে এ সকল গুণ থাকা কদাচ সম্ভবপর নহে, হাজার চক্ষের সম্মুখে সেই সকল কল্পিত গুণের বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখি, তবু তলায় একটা অন্ধ বিশ্বাস থাকিয়া যায়। ফলতঃ আমি যেমন জগতের প্রতিবিম্ব, জগতও তেমনি সর্ব্বতোভাবে আমার প্রতিবিম্ব বলিয়া, আমার নিজের আন্তঃকরণিক আদর্শরূপ প্রতিবিম্বে, জগতের মূল কারণের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইতেছি বলিয়া বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে। এবম্বিধ বিশ্বাসে, অস্তিত্ব ও অস্মিতা, জগত ও আমি, বাহির ও অন্তর, একাকারে একাধারে প্রবর্ত্তিত ও পরিণত হইয়া পড়ে। পারমার্থিক জ্ঞান যে অসীম ও সসীমে, সাকার ও নিরাকারে, একটী অচ্ছেদাত্মিক যোগ করিয়া দিতে চায়—ইহা তাহার একটা মস্ত উদাহরণ স্থল।

ভাবের অনুরূপ পদার্থই আমাদিগের চক্ষে একমাত্র সুন্দর বোধ হয়। সৌন্দর্য্যবোধের মূলীভূত কারণ কোথায়?—না আমার নিজেরই ভিতর। আমার ভিতরেই জগতের সকল সৌন্দর্য্যের খনি লুক্কায়িত অবস্থায় রহিয়াছে। বাহিরের আলোক না পড়িলে সে গুলি আজন্মকাল হৃদয়-গুহার ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। কে জানে কত হীরককুচি, কত মণি মরকৎ, কত অমূল্য রত্ন, আমার মজ্জার মর্ম্মস্থানে অন্ধকারে চাপা রহিয়াছে? বাহির হইতে ঠিক আলোক যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে বহির্জগতে তাহাদের আবির্ভাব হইয়া এই জীবনের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। যথাযোগ্য ভাব্য পদার্থের সম্মিলন ব্যতিরেকে, ভাবের সুন্দর বিকাশ কদাচ সম্ভবপর নহে।

সংসারে যা'কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান, তা' সকলই আমাদিগের কোন না কোন ভাবাঙ্গের প্রতিরূপ। অসংখ্য তারকা-খচিত অনন্ত নীলাকাশ ও শুভ্র ফেনপুঞ্জময় উত্তালতরঙ্গাকুল অকূল জলধি হইতে ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, দূর্ব্বাদল-শোভিত নীহার বিন্দু পর্য্যন্ত সকল পদার্থই আন্তঃকরণিক বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতিরূপ বলিয়া, তাই তাহারা আমাদিগের নিকট এত সুন্দর ও প্রিয় হইয়া উঠে। যাঁহার হৃদয় মহান অনন্ত ভাবের জন্য ব্যাকুল, তিনি স্বতঃই উপরে অনন্তাকাশের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে ভালবাসেন, যাহার প্রাণ আপনা হইতে কোন অনির্দ্দেশ্য অদম্য শক্তির কারণ লালায়িত, তিনি সহজেই ভয়ানক ঝড় তুফানের

দিনে ঘন ঘটাচ্ছন্ন আকাশে গভীর বজ্ররব শুনিতে ভালবাসেন। এ সকল অতি জানা-কথা, সুতরাং বেশী দৃষ্টান্ত দ্বারা আর কাহা-কেও বুঝাইয়া দিতে হয় না।

অতএব আসল, যাহা ভিতরে রহিয়াছে, তাহার উদ্রেক ও উদ্দীপনার কারণ বাহিরে নকলের প্রয়োজন করে। একটা কিছু অব-লম্বন না পাইলে আগুন জলে না। আগুন যখন জ্বলে, তখন তদবলম্বিত দাহ্য পদার্থকে আত্মস্বরূপে পরিণত করিয়া প্রকাশ পায়। অন্তরে আসল ও বাহিরে নকলের বেলাতেও, ঠিক তাই বুঝিতে হইবে। বাহিরের যে পদার্থ অবলম্বন করিয়া অন্তরের আসল রস প্রকাশ পায়, আদর্শের সৃষ্টি হয়, স্বভাব প্রস্ফুটিত হয়, সে পদার্থ নকল হইলেও অনু-ভবকালে একত্রে এক সময়ে একাকারে অনুভূত হয়। অনেক সময় এমন হয় যে, আসলের ঠিক ছায়া, ঠিক অনুরূপ পদার্থ সংসারে পাওয়া যায় না, আবার এমনও হয় যে, আসল সেই আদর্শের প্রকৃত ছায়ার কথক কথক অংশ বিশেষ মাত্র, সেই ভাব দেহের সামান্য অঙ্গ বিশেষের প্রতিরূপ মাত্র, সংসারে পাওয়া যায়। এবম্বিধ ভাবাঙ্গ বিশেষের নকলেও যে কিছুমাত্র ফল পাওয়া না যায়, তাহা নহে। ষোল আনা ভাবের এক আনারও যদি ঔৎকর্ষ্য সাধিত হয়, তাহা হইলে বাকী পনের আনারও কিছু না কিছু পরিমাণে শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এখন কথা হইতেছে এই যে, সকল সময় আসলের নকল সংসারে মিলে না বলিয়া, অথবা যদিও মিলে, অনুকূল মানসিক অবস্থায় তাহা মিলে না বলিয়া, নকলের আবার আর একটা নকল খাড়া করা আবশ্যক হইয়া উঠে। এতক্ষণ আমরা নৈসর্গিক অকৃত্রিম নকলের কথা বলিয়া আসিতেছিলাম, এখন আমরা বাধ্য হইয়া কৃত্রিম নকল প্রসঙ্গের অবতারণা করি-তেছি।

অরণ্যজাত বৃক্ষাদি প্রাকৃতিক অনুকূল ঘটনা বলে যেমন আপন আপন স্বভাব বিকাশ করে, উদ্যানজাত বৃক্ষাদির বিকাশও সেই প্রকার অনুকূল প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সাপেক্ষ, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু উভ-য়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, একটিতে সেই অনুকূল ঘটনাবলী কাহারও ইচ্ছায়ত্ত নহে, অপরটির বেলায় তাহা আমাদিগের অনেকটা আয়ত্তাধীন। মনুষ্যত্বের বেলাতেও তাই। ঠিক অনুকূল প্রাকৃতিক ঘটনা মিলিয়া যায়, ও তাহা অবশ্যই বিকশিত হয়, তাহাতে আর কোন কথা থাকে না; কিন্তু যদি না মিলে, যদি তাহা নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, যদি তাহা দুর্ভাগ্য ক্রমে শিলাময় অনুর্ব্বর ভূমিতে রোপিত হইয়া থাকে, তবে সেই স্বভাব-বীজ ফুটাইবার কারণ সাধ্যমত কৃত্রিম উপায় অবলম্বন একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। এইরূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন দ্বারা স্বভাব-বীজ বা অদর্শ চৈতন্য-বীজ বা সহজ জ্ঞান-বীজ বিক-শিত করিবার চেষ্টার নাম সাধনা। অকৃ-ত্রিম স্বাভাবিক বিকাশ যে সকলের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় ও মূল্যবান, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা অতীব দুর্লভ। বাহিরের এই বিচিত্র অসংখ্য ঘটনাবলী, আর অন্তরের এই অগণ্য কূট আবর্ত্তনশীল ভাবচক্র,—এতদুভয়ের সামঞ্জস্য প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, কাজেই সাধনা ভিন্ন, কৃত্রিম উপায় অবলম্বন ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর থাকে।

কৃত্রিমতা আবার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক ভেদে দ্বিবিধ। কৃত্রিমতা স্বাভাবিক হইতে পারে—এ কথা শুনিতে কিছু আশ্চর্য্য বোধ হয়, কিন্তু বুঝিলে আর সে আশ্চর্য্য বোধ থাকে না। যে কৃত্রিমতা বিকল্প ও বিপর্য্যয় বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন, যাহার অনুরূপ কোথাও কোন পদার্থে প্রাপ্ত হইবার আশা করা যায় না, যাহা মনের উদ্ভ্রান্ত ক্রীড়ার ফল মাত্র, যাহা অন্তরে স্বভাবের কোন এলেখা রাখে না, বাহিরে নৈসর্গিক নিয়মের বড় ধার ধারে না, তাহা যে অনেকটা অসার, তাহা আর বেশী করিয়া সকলকে জানাইতে হইবে না। কিন্তু কৃত্রিমতা—যাহার প্রাণ হইয়াছে স্বভাব, ছায়ার ন্যায় যাহা স্বভাবের অনুবর্ত্তী, যাহা দেখিলে স্বভাবের কথা মনে আসে, রসের স্রোত বহে, আদর্শের বিমল জ্যোতি প্রকাশিত হয়, হউক না তাহা মানুযের কৃত, কৃত্রিম হইলেও তাহা আমাদের পরম আদরের বস্তু।

আর হিসাব মত ধরিলে আমাদিগের এমন কোন্ বিদ্যা আছে, যাহা কৃত্রিমতার হস্ত হইতে নিস্তার পায়? নিস্তার পাওয়া দূরের কথা, কৃত্রিমতাই সকল বিদ্যার সারভূত আসল পদার্থ। গণিত বল, দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার পত্তন হয় কিসে—না স্বভাবের অনুকরণে। স্বভাব বলিতে অবশ্য এখানে বাহপ্রকৃতিকে বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রকৃতিরই ধারা দৃষ্টে ধারাপাতের উৎপত্তি। ক্ষেত্রতত্ত্বের মূল হইল বাহিরের এই অসীম ক্ষেত্র-বিন্দু ও অণুত একই জিনিষ। ছোট বড় সকল কল কারখানা এই প্রকৃতির ভিতরেই বিদ্যমান। মানুষ যত তাহার অনুকরণ করিতে পারে, ততই তাহার বাহাদুরি। আমরা কোন্ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, যাহার উদ্বোধয়িত্রী প্রকৃতি নহে? অতএব স্বভাবের আদর্শে যে কৃত্রিমতার সৃষ্টি, তাহা কদাপি তুচ্ছ হইতে পারে না, বরং তাহাই যে আমাদিগের সকল বিদ্যার, সকল সভ্যতার প্রশস্ত সোপান স্বরূপ, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই বলিলেও, বোধ হয়, বড় একটা অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু এ'সকল ত হইল বহি প্রকৃতির অনুকরণ বাহিরেই রচিত, অন্তর্জ্জগতের কৃত্রিম অনুকরণ কোথায়? বহির্জ্জগতের অনুকরণে আমাদিগের সভ্যতা বর্দ্ধিত হইয়াছে, বাহিরের বিস্তর অভাব পূর্ণ হইয়াছে, অনেক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক কষ্ট দূর হইয়াছে ও হইতেছে সত্য, কিন্তু এসকলই ত হইল বাহিরের ঔৎকর্ষ্য। এই বাহিরের ঔৎকর্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে তদাশ্রিত অন্তর্জ্জগতের যেটুক উন্নতি সম্ভব, তাহা হইয়াছে বই কি? কিন্তু ইহাতে যে আমাদিগের স্বভাবের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হইতেছে না। আসল অভাব যাহা, তাহা যে পূরিতেছে না। আধ্যাত্মিকের ঘর যে একরকম একেবারেই খালি। স্বভাবের, মনুষ্যত্বের উন্নতি, জড়জগতের কেবল মাত্র জড় অনুকরণ হইতে আশা করা যাইতে পারে না। তবে এখন চাই কি? চাই—জড়ে চৈতন্যের প্রতিভাস, জড় পদার্থের এমন সব অনুকরণ, যাহা দেখিলে, যাহা ধারণা করিলে সহজে—অতি সহজে—চৈতন্য জগতের ঔৎকর্ষ্য সাধিত হয়, যাহাতে চিত্ত সমাবিষ্ট করিলে, অতি সহজ ভাবে স্বভাবের কথা মনে আসে ; মানুষ যা' মানুষ তাই শিক্ষালাভ করে। এমন যদি কৃত্রিম অনুকরণ থাকে, এমন কৃত্রিম অনুকরণ হওয়া যদি সম্ভবপর হয়, তবে হউক না

তাহা কল্পনা-প্রসূত,—হইলেও, তাহা সাধনের জিনিষ বটে।

অসম্ভব না হইলেও না হইতে পারে। কবিত্বে, সঙ্গীতে ও চিত্রবিদ্যায় তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। বাহিরের জিনিষে ভিতরের ভাবের প্রতিবিম্ব দর্শন, ভাবুক ব্যক্তিবর্গের অগোচর নেহ। কচি ছেলের সরল হাসি দেখিলে, অতি কুটিল প্রাণেও একটুক না একটুক সরলতার উদয় হইয়া থাকে। একটি ফুট ফুটে গোলাপ ফুল দেখিলে, ভাবুক ব্যক্তির মনে কিছু না কিছু সুন্দর ভাব আসে। একটি ধপ্‌ধপে পদ্ম দেখিলে কবির প্রাণে, কোথা হইতে কে জানে, কিছু না কিছু পবিত্রতার ছায়া পড়ে। কিন্তু কবি যাহা সঙ্কেতে বলেন, চিত্রকর তাহা খুলিয়া প্রকাশ করেন। ভাষার তুলিতে যতটুকু আঁকা যায়, রঙের তুলিতে তার চেয়ে অনেক ভাল কবিয়া আঁকিতে পারা যায় বলিয়া বোধ হয়। আসল কথা এই যে, আমাদিগের অন্তঃকরণ-জাত আদর্শ-চৈতন্যের সমষ্টিগত ভাব, যেমন আমরা সমস্ত জগতে আরোপ করিয়া, তাহার ভিতরে তদনুরূপ একটি চিন্ময় সত্তা কল্পনা মতে, জগদীশ্বরকে মানবোচিত গুণ ও ধর্ম্মে সজ্জিত করিয়া থাকি; সেইরূপ আমরা ব্যষ্টি ভাবের প্রাবল্যে, ভাবানুগ কবিত্ব আদি বিদ্যাতে, কোন কোন অচেতন পদার্থের ভিতরে, আপন ভাবের ছায়া পাইয়া তাহাতে চৈতন্যের সঞ্চার করিয়া থাকি। তবে কবিত্বে বল, চিত্রবিদ্যায় বল, ইহারা জড়ে যদিও চৈতন্যের কথক প্রতিভাস আনে বটে, কিন্তু তথাপি তাহা নৈসর্গিক বহির্জগতে অন্তর্জগতের ভাব রচনা বই আর কিছুই নহে। এখন তবে অমরা চাই কি? চাই, এমন কবিত্ব, এমন চিত্রবিদ্যা, যাহা বহির্জগতের উপর টেক্কা মারিয়া, আপন মন হইতে জড় দিয়া এমন জিনিষ গড়ে, যাহার একমাত্র আদর্শ আমাদিগের স্বভাব।

অকৃত্রিম ভাব বিশেষের কৃত্রিম অনুকরণ দৃষ্টে যে সেই ভাবাঙ্গের একটা ক্ষণস্থায়ী ঔৎকর্ষ্যও সাধিত হইতে পারে, তাহার একটা মস্ত উদাহরণ স্থল রঙ্গক্ষেত্র। অভিনয় যত স্বাভাবিক হয়, ততই যে মনোহর হইয়া থাকে, তাহা আর বেশী করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অন্তঃকরণে বিশেষ বিশেষ ভাবের উদ্রেকে, স্বতঃই আমাদিগের যেরূপ অঙ্গবিন্যাস ঘটিয়া থাকে, ঠিক তদনুরূপ ভাব ভঙ্গী দেখিলে, আমাদিগের মনে সেই সকল অকৃত্রিম ভাবের কিছু না কিছু সঞ্চার না ঘটিয়া যায় না। সেগুলি নকল মাত্র বলিয়া পূর্ব্বে জানা থাকিলেও, তাহা দেখিয়া সময়ে সময়ে, আমাদিগকে আত্মহারা হইয়া পড়িতে হয়। আর কেবল রঙ্গক্ষেত্রই যে ঐ বিষয়ের একমাত্র উদাহরণ স্থল, তাহা নহে। প্রসিদ্ধ বাগ্মীবর্গের স্থানেও এ বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারে। মুখের কথায় যাহা না হয়, কৃত্রিম অঙ্গ সঞ্চালনের কৌশলে যে তাহা ঘটিতে পারে, তাহা বড় বড় বক্তারা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলে এমন হইয়াছে যে, শ্রোতা বিশেষের দ্বারা যে জলন্ত ত্যাগ স্বীকার করিতে দেখা গিয়াছে, বক্তৃতার তাহা সার মর্ম্ম হইলেও, বক্তার দ্বারা তাহা ঘটে নাই। এ সকল ব্যাপারের অর্থ কি? কেন এমন হয় তাহা বলি—যে আগুন প্রচ্ছন্নভাবে শ্রোতার প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল, যে স্বভাব অব্যক্ত ছিল, যাহার কথা

মনে ছিলনা, বাহিরে তাহার অনুকরণ দৃষ্টে তাহা মনে পড়িল, স্বভাব প্রস্ফুটিত হইল, আগুন হইতে পাঁশ উড়িয়া গেল, শ্রোতার পক্ষেই তাহা হইল, বক্তার পক্ষে তাহা আর ঘটিল না; সুতরাং শ্রোতার দ্বারা জগত যাহা দেখিল, বক্তার নিকট হইতে তাহা দেখিতে পাইল না।

আরও এক প্রকার কৃত্রিমতা আছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের সহিত দৃশ্যাদি বিষয়ের যেমন ধারা সম্বন্ধ আছে, ভাবের বেলাতে ভাব্য বস্তুর সহিত ঠিক তেমনি একটা সম্বন্ধ আছে। এখন কথা হইতেছে এই যে, বিষয়াভাবে ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় না সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও সেই বিষয় যে বাহিরে খাড়া থাকিবেই থাকিবে, এমন কিছু ধরা বাঁধা নিয়ম নাই। এমন ত অনেক সময় হয় যে, হয় ত প্রকৃতপক্ষে, বাহিরে কোন জিনিষ নাই, অথচ স্নায়ু সমূহের ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া প্রভাবে, আমরা নানাবিধ পদার্থের অস্তিত্ব বাহিরে গড়িয়া পিটিয়া লই। স্বপ্ন দেখিবার সময় প্রায়ই ত এইরূপ ঘটিয়া থাকে। অনুভব কালে বাহ্য বিষয়াদি দ্বারা আমাদিগের স্নায়ু সমূহের যে বিকার ঘটে, আমরা সেই বিকার মাত্রই বুঝিতে সমর্থ হই, ও সেই বিকার-জাত অনুভব সমষ্টিকে দ্রব্য বিশেষে অভিহিত করিয়া থাকি; কিন্তু যদি কোন বিষয় উপস্থিত না থাকে, অথচ অন্য কোন জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণ দ্বারা আমাদিগের স্নায়ু সমূহের ঠিক তদনুরূপ বিকার উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার ফল হয় এই যে, প্রকৃতপক্ষে বাহিরে কোন জিনিস না থাকিলেও, আমরা সেই বিকার সমষ্টি হইতে বাহিরে ঠিক সেই পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করি। নানাবিধ পীড়ায় এ কথার আরও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। উদ্ভ্রান্ত ও ক্ষিপ্ত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের খেয়াল ও প্রলাপাদি এই কারণ বশতঃই ঘটিয়া থাকে। এখন বিকার যে কেবল মন্দের দিকেই ঘটে, তাহা নহে, ভালর দিকেও ঘটে। রোগী ও অরোগী, দুঃখী ও সুখী, পাপী ও পুণ্যবানের স্বপ্ন দর্শনের পার্থক্য ও তারতম্য, তাহাদিগের নিদ্রিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আর এবম্বিধ স্নায়ু বিকার যে কেবল আধিভৌতিক কারণ হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহা নহে, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম নানা কারণ হইতে তাহা ঘটিতে পারে। ফলতঃ যে কোন কারণেই হইক, স্নায়ু মণ্ডলীর বিশেষ ধরণের বিকার উপস্থিত হইলে, তাহা হইতে কোন বিশেষ ভাব অন্তঃকরণ মধ্যে প্রবলরূপে উদ্দীপ্ত হইলে, তাহাতে ভাব্য বস্তুর দর্শন পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। এই দর্শন অর্থে, মানসিক দর্শন অর্থাৎ সেই আসল ভাব্য বস্তুর প্রতিরূপ বা ফটোগ্রাফ্ দর্শন মাত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন, বিক্ষিপ্ত অতি সূক্ষ্ম অদৃশ্য অণু সমূহ সংহত ও ঘনীভূত হইলে দৃশ্যমান হয়, সেইরূপ অন্তরে লীন অজ্ঞাত সূক্ষ্ম মাত্রাবস্থিত 'অনিমা' ভাবের দ্বারা সংগৃহীত ও সংহত হইলেই, তাহা অন্তরে থাকিয়াও যে ইন্দ্রিয় গোচর হয়, অথবা হইতে পারে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এখন এই যে মানসিক প্রতিমূর্ত্তি তাহার যদি আবার নকল করা যায়, তুলি দিয়া রঙ ফলাইয়া যদি ঠিক আঁকা যায়, অথবা শাস্ত্র-মতে—"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা; মনোময়ী মণীময়ী প্রতিমাষ্ট-বিধাস্মৃতা" বলিয়া শৈল ও দার্ব্বাদি [illegible]

আট রকম করিয়া হউক, অথবা যে কোন রকমে হউক, যদি তাহার আবার নকল মূর্ত্তি বা প্রতিমা এক একটি গড়িয়া বাহিরে খাড়া করা যায়, তবে সমাহিত চিত্তে তাহা দেখিলে, ও তাহা ধ্যান করিলে, কোন প্রকার ভাবের ঔৎকর্ষ্য সাধন হইতে পারে কি না, সে বিষয়ে আমরা আর বেশী বলিব কি? হয় কি না হয়, তাহার পরিচয় এবম্বিধ প্রকৃত ভাব-সাধক ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে লওয়া কর্ত্তব্য; অথবা তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ মতে, এ বিষয় নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সাদা চোখে দেখিয়া, সাদা মোটা বুঝিয়া, সকল সময় সকল জিনিষ উপেক্ষা করা বিধেয় নহে।

সংক্ষেপে মোট কথা আমাদিগের এই—যে সকল সুন্দর ভাব স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া অন্তঃকরণে প্রকাশ পায়, অথবা যাহারা স্বভাবেরই সুন্দর বিকাশ, তাহাদিগের ঔৎকর্ষ্য বিধান ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিলেই, আদর্শ চৈতন্যের যথার্থ পূজা করা হয়। আদর্শের পূজায় তাহারাই উদ্বোধক মন্ত্র স্বরূপ। তার পর, হৃদয়ে যখন সেই সকল সুন্দর ভাবের জমাট বাঁধে, যখন একটা অনির্ব্বচনীয় মধুর ভাব আসিয়া হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া যায়, যখন তাহার প্রসাদে রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখনই—কেবল তখনই, আদর্শ-চৈতন্যের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা প্রাণে আরম্ভ হয়। অতএব গোড়ায় সেই সকল সুন্দর ভাবকে উদ্দীপিত করিবার কারণ, ও একবার উদ্দীপিত হইলে, তাহাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিবার কারণ, ভাব্য পদার্থের অবলম্বন আবশ্যক করে। মানে এই যে, দৃশ্য ব্যতীত যেমন দর্শন অসম্ভব, তেমনি ভাব্য বস্তু ব্যতিরেকে ভাবের উদ্দীপনাও অসম্ভব। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে সেই ভাব্য পদার্থ দ্বিবিধ। যেখানে অন্তঃকরণের অনুকূল অবস্থায় ভাবের অনুরূপ অকৃত্রিম পদার্থ সংসারে না মিলে, সেইখানে কৃত্রিমতার অবতারণা সহজেই অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সেই কৃত্রিমতা দেশ কাল পাত্র ভেদে নানা প্রকারে হইয়া থাকে ও হইতে পারে। পুত্তলিকা গঠন সেই কৃত্রিমতার বা সাদা কথায় সাধনের একটি অঙ্গ বিশেষ মাত্র বলিয়া পরিগণিত করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। অতএব নিরাকার ব্রহ্ম মানে যদি স্বভাব হয়, পরমেশ্বর মানে যদি আদর্শ-চৈতন্য হয়, তাহা হইলে প্রকৃত পৌত্তলিকতা তাহার কিছু মাত্র বিরোধী নহে ও হইতে পারে না। তবে যে স্থলে স্বভাব ও আদর্শ-চৈতন্যের উদ্দীপনার কারণ পৌত্তলিকতা অনুষ্ঠিত হয় না, যে স্থলে পৌত্তলিকতা মধ্যে পুঁতুলই একমাত্র সর্ব্বস্ব ধন হইয়া উঠে, সে স্থলে প্রকৃতই "মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ। ক্লিশ্যন্ত স্তপসা মূঢ়া পরাং শান্তিং ন যান্তিতে" মূর্খ তপস্বী সকল মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত প্রতিমা সমূহে ঈশ্বর বুদ্ধি করিয়া যে বৃথা ক্লেশ পাইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে যে পৌত্তলিকতা অনুমোদিত হইয়া থাকে, স্বভাব ও আদর্শ-চৈতন্যের উদ্দীপনাই তাহার প্রকৃত অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য বটে কি না, তাহা পাঠকবর্গের ব্যক্তিগত পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের উপর নির্ভর থাকিল। ফলে, পরিশেষে তাহা যদি ভাব সাধনার অন্তর্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে হিন্দু শাস্ত্রের নিম্নলিখিত উক্তিটি যথার্থই সার্থক হইয়া উঠে। সেই উক্তিটি কি,—না

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপ কল্পনা।"

শ্রীবিপিন বেহারী সেন।

হিন্দু ও মুসলমান।

ভারতবাসীদিগকে "হিন্দু" এই নাম মুসলমানেরাই দিয়াছেন এবং ভারতবর্ষকে "হিন্দুস্থান" নামে তাঁহারাই অভিহিত করিয়াছেন। হিন্দুস্থানে যে লোক বাস করে, তাহাকে হিন্দু বলা তাহাদিগের উদ্দেশ্য, এক্ষণ দেখা যাইতেছে, হিন্দুরা অতিশয় সমাদরের সহিত সেই নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

এই নামকরণের পর মুসলমানেরা স্বয়ং এদেশে বাস করেন এবং শাসনে কি প্রলোভনে জানি না, বহু সংখ্যক হিন্দু স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া মুসলমান হয়। এক্ষণে যে মুসলমান জাতি ভারতবর্ষে দেখা যাইতেছে, ইহার পনর আনা না হউক, একটা প্রচুর অংশ যে হিন্দু ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যে সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমান হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আমূল পরিচয় অদ্যাপি পাওয়া যায়, মূর্খ দরিদ্রদিগের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এরূপ ভাবে হিন্দুদিগকে গ্রহণ করিয়া নিজের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরিপুষ্টি সাধন করাতে বিশুদ্ধ মুসলমানদিগের প্রতি কোন দোষারোপ হইতে হইতে পারে না, কারণ এক্ষণও দেখা যাইতেছে খ্রীষ্টানেরা পৃথিবীর নানা স্থানে লোককে ভজাইয়া নিজপক্ষের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে।

আমি এ কথার উল্লেখ করিতেছি এই জন্য যে, তোমরাই এদেশীগিকে আর্য্য নাম মুছিয়া ফেলিয়া হিন্দু নাম ও এ দেশকে হিন্দুস্থান নাম দিলে, তার পর নিজেরা হিন্দুস্থানে বাস করিলে, এক্ষণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিতে চাহ না কেন? নিজের রক্ষিত সংজ্ঞা নিজে গ্রহণ করিতে অস্বীকার হও কেন? নিজের নিয়মের প্রতি সম্মান দেখানইত গৌরবের বিষয়। বিশেষতঃ কোরাণিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মে গুরুতর কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না; বৈদিক একমেবাদ্বিতীয়ং ও কোরাণের লা এলাহা এল্লেল্লা একই অর্থব্যঞ্জক মহাবাক্য, সুতরাং উভয়ের সৌহার্দ্দেরইত যথেষ্ট কারণ দেখা যাইতেছে। সাকার নিরাকারের যে ভেদের কথা কেহ কেহ বলেন, তাহা তুচ্ছ, কারণ বেদে সাকার নিরাকার, দুই মতই গৃহীত হইয়াছে।

সামাজিক হিন্দু মুসলমান, যাহারা দেশের প্রকৃত মেরুদণ্ড; তাহাদিগের মধ্যে অতি পবিত্র সদ্ভাব দেখিতে পাই। শ্রমজীবীরা পরস্পরের সহিত এরূপ অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্মিলিত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদিগের আজীবন কখনও স্মরণও হয় না যে, উভয়ে কোন পৃথক্ ধর্ম্মের উপাসক। গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর মধ্যেও স্বর্গীয় সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে, কেবল শিক্ষিত সভ্যতাভিমানী সহরবাসী জন কয়েকের মধ্যে। দূষিত বুদ্ধিতে ইহাদিগের মন এতই অপ্রশস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, উভয়ের লক্ষ লক্ষ সদ্গুণ থাকা সত্ত্বেও কেহই কাণার ন্যায় অপরে একটীও গুণ খুঁজিয়া পাইতেছে না; ক্রমাগত উভয়ে উভয়ের বৃথা দোষান্বেষণ করিয়া দুঃখ পাইয়া মরিতেছে। হিন্দুর উন্নতি দেখিয়া মুসলমান কাঁদেন, মুসলমানের উন্নতি দেখিয়া হিন্দু

কাঁদেন। দুই হতভাগ্য কুক্কুর ভোজন-নিযুক্ত ইংরেজের দরজায় শুইয়া লেজ নাড়িতেছেন, এক খানা কাঁটা পড়িতেছে আর অমনি দুই জনে মহা কামড়া কামড়ি আরম্ভ করিতে-ছেন; একের মুখে এক খানা ভাল কাঁটা দেখিলে অশ্রুজলে অপরের বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। ইহারাই কি সেই খ্যাত-নামা শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ ঋষিদিগের বংশা-বতংশ? ইহারাই কি সেই উজ্জ্বল চন্দ্র সূর্য্য বংশের বংশধর? ইহারাই কি বীরপ্রবর তৈমুর খাঁর বংশধুরন্ধর? অথবা ইহারাই কি সেই উজ্জ্বল মোগল বংশের পতাকা? বিশ্বাস ত হয় না।

যদিও মুসলমান সম্রাটদিগের সময়ে ভারতবর্ষকে কোন দেশান্তরকে কর দিতে হইত না, বরং কাবুল ও বর্ম্মার অর্থে সময় সময় ভারতবর্ষীয় কোষ পুষ্ট হইত, এবং ভারতবর্ষের ধন সমৃদ্ধির কথা পৃথিবীময় উপকথারূপে কথিত হইত; যদিও তখন আইনসঙ্গত লুণ্ঠন ছিল না; যদিও অনি-বার্য্য বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশের রুধির শুষ্ক হইত না, তথাপি কতকগুলি ছাগোপম শিক্ষিত হিন্দুরা মুসলমান রাজত্বকে ভারত-বর্ষের পরাধীনতা ভিন্ন বলিতে চাহেন না। স্বাধীনতা বলে কাহাকে বোঝ, খাটাস? এক জন মুসলমান সম্রাটের অণুবীক্ষণের অবধারণীয় কোথায় কি একটা দোষ ছিল বলিয়া, তাহারা সমস্ত মুসলমান শাসনের দোষারোপ করেন। নিজের ঘরের দোষ সত্য হইলেও পরের কাছে বলাতে যে কাপুরুষতা হয়, তাহা এই শৃগালেরা কদাচ বুঝিবে না। ইহাদিগের মধ্যে এরূপ অর্দ্ধো-ন্মাদ অনেক আছে, যাহারা নিজ রচিত গ্রন্থে একটা কাল্পনিক হিন্দু মুসলমানের বিবাদ সাজাইয়া, সেই ছুতায় মুসলমান-দিগের ভূরি ভূরি কুৎসা কীর্ত্তন করে, কখ-নও বা এই সকল বিদ্বেষোৎপাদক রচনা ধাঙ্গোরদিগের থিয়েটারে অভিনীত হয়; এই সকল আলকাতরা পোরা মাথাওয়ালা হতভাগারা কখনও বুঝিবে কি যে, ভারত-বর্ষীয় জাতি কাহাকে বলে? এরূপ এক খানি গ্রন্থে ও একটী অভিনয়ে ভারতবর্ষের শুভ দিন যে ৫০ বৎসর করিয়া পিছাইয়া যায়, ইহা ঐ পামরেরা মানিবে কি?

হিন্দু গ্রন্থকারেরা গ্রীক ল্যাটিনের মূল্য-বান লেখা সকল মাতৃভাষায় অনুবাদ করি-তেছে, কিন্তু আরবিতে যে সকল অমূল্য নিধি আছে, তাহা অনুবাদ করে না, তার বেলায় সব ধেনো কাণা। সমাজে যে সকল আরবি শব্দ দেশীয় ভাষার সহিত অনুস্যূত হইয়া গিয়াছে, অভিধানে অদ্যাপি তাহা সন্নিবেশিত হয় নাই; স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে রামায়ণ মহাভারত ও বাইবেলে উত্তম উপদেশ সকল উদ্ধৃত হইয়া থাকে, কিন্তু আরব্য শাস্ত্রের রত্ন সকল উপেক্ষিত হয়। কোরণ যে এদেশের এক খানা প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং বাইবেল অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক আত্মীয়, তাহা গর্দ্দভদিগের বুঝিবার সাধ্য নাই।

মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ গো-মাংস ভক্ষণ করেন, ইহা হিন্দুরা সহিতে পারেন না। নিজের পয়সায় নিজের ঘরে বসিয়া তিনি যাহা ইচ্ছা খাইবেন, তুমি তাহাতে কথা কহিবার কে? কোন শাস্ত্র অনুসারেইত সে পাপ তোমার হইবে না। বিশেষতঃ শাক্তদিগের পক্ষে ছাগাদি বলি দেওয়া যেমন তন্ত্র শাস্ত্রের আদেশ, মুসল-মানদিগের পক্ষেও গোরু কোরবানি করা,

বলি দেওয়া, শুনিয়াছি সেইরূপ কোরাণের আদেশ, সুতরাং ইহাতে আপত্তি করা ত উচিত হয় না; আরও দেখ, গোমাংস ভোজনে মুসলমানের যে তৃপ্তি হয়, সে তৃপ্তি অন্য কিছুর দ্বারা দিতে পারে কি? আমি জানি এ দেশ কৃষি প্রধান এবং ইহাও জানি যে গোবংশের ক্রমশঃ হানি হইতেছে, কিন্তু ঐ হানি যে মুসলমানদিগের ভক্ষণে হইতেছে, ইহা তুমি কিসে আমাকে বিশ্বাস করাইতে পার? আমার ত ইহা অটল সংস্কার যে, চারণ স্থানের অভাবে গোজাতির এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। দুর্ভিক্ষের হুতাশে দেশের প্রায় সমস্ত পতিত ভুমি চষা হইয়া গিয়াছে; গোরুর চরিবার স্থান নাই, এক্ষণ কাজেই অনাহারে ন্যূনাহারে গোরুর ক্ষয় হইতেছে। এ গরম দেশ, এ দেশে গোমাংস অসহ্য, ইহা অনেক মুসলমানেরা জানেন; মুসলমান সমাজে বুদ্ধিমান ও হৃদয়-বান লোকের অভাব নাই, এজন্য কৃষির অদ্বিতীয় সহায়কে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিতে অনেকেই নারাজ। গোমাংসের ভক্ষক বোধ হয় মুসলমানের শতকরা এক জন, ইহাতে এত আপত্তি উত্থাপন করা হিন্দুর বিধেয় হইতে পারে না। যদি এই গোমাংস ভক্ষণ ব্যাপারে, ন্যায়তঃ বলিবার কোন কথা থাকে, তবে সে এই যে গাভীর গর্ব্ভে বৎসাদি জন্মে, এজন্য গাভীর দ্বারাই গোবৎসের বৃদ্ধি হয়, পুংগো একটী দ্বারা শত গাভী পাল পাইতে পারে। অতএব খাইতে হইলে বা কোর্বানি করিতে হইলে, গাভী হত্যা না করিয়া গো হত্যা করাই উচিত। আমি শুনিয়াছি, মক্কায়ও অতি সতর্কতার সহিত এই নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে। হিন্দুরা শ্রাদ্ধাদিতে যে ষাড় করেন, তাহাও গোবংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য।

পক্ষান্তরে দেখা যায়, কতকগুলি শিক্ষিত মুসলমানেরাও হিন্দুদিগের প্রতি অত্যন্ত অনমুকূল হইয়া উঠিয়াছেন—শিক্ষা ও অর্থো-পার্জ্জনের ক্ষেত্রে হিন্দুদিগকে একটু অগ্রসর দেখিয়া তাঁহারা একান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়া-ছেন। চিনের, ফরাসির, জার্ম্মানির উন্নতিতে তাঁহারা নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুর উন্নতি দেখিলে কষ্ট বোধ হয়, কারণ বুদ্ধি দোষে ভাবেন, হিন্দুরা তাঁহা-দিগের প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি। হিন্দুরা প্রজা-সাধারণের হিতের জন্য কোন একটা রাজ-নৈতিক আন্দোলন উত্থাপিত করিলে, তাহা অবিসম্বাদিতরূপে শুভপ্রসূ বলিয়া প্রতীয়-মান হইলেও, মুসলমানেরা তাহাতে যোগ দান করিতে চাহেন না। ভারতবর্ষে সিবিল-সার্ব্বিস্ পরীক্ষার প্রস্তাব হইল, পাছে হিন্দুরা অধিক সিভিলিয়ান হয়, এই শঙ্কায় মুসল-মানেরা তাহাতে আপত্তি করিলেন; বিদেশী ইংরেজ সিভিলিয়ানকে সুদৃষ্টিতে দেখিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুকে পারেন না, ইহা ভারত-বর্ষের দগ্ধ অদৃষ্টের ফল। ভাব, কাল যদি ইংরেজ জাতি এ দেশ শাসনে অস্বীকৃত হয়, তবে তোমরা এ দেশ শাসনের কি ব্যবস্থা করিবে? ইংলণ্ড জার্ম্মানি হইতে লোক আনাইবে, না নিজের দেশের যোগ্য-তম লোকের দ্বারা কর্ম্ম চালাইবে? দেশীয় কার্য্যের যোগ্যতার পরীক্ষাকে ইংলণ্ডে হওয়া উত্তম বোধ করিলে, যদি ইংলণ্ড তোমার একটী ছেলের জন্য লক্ষ টাকা করিয়া ফি লয়, তাহা হইলে ত তোমার একটীও সিভিলিয়ান হইতে পারে না, তখন কি পেকিন পরীক্ষা স্থান করিবে, না নিউ-

ইর্কে যাইবে? ধিক্ এরূপ বিদ্বেষ বুদ্ধিকে, ধিক্ এরূপ আত্মপর বিচারকে, ধিক্ এরূপ জাতিদ্রোহিতাকে।

মহার্ঘ মূল্যে বিচার বিক্রয় হইতে আরম্ভ হইয়া দেশ ছারে খারে গেল; দুর্ভিক্ষ প্রজাদিগকে প্রত্যেক বৎসর লক্ষ লক্ষ পরিমাণ ধ্বংস করিতে লাগিল, অস্ত্র আইনে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র নিরীহ প্রজা হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক নষ্ট হইল; বনকর বিভাগের অত্যাচারে সহস্র সহস্র বাওয়াল হাহাকার করিয়া মরিল, লবণের বৃদ্ধি দরে শত শত দুঃখী প্রজা আলুনী খাইয়া মরিল; দুর্ভিক্ষ তহবিলের নাম করিয়া লাইসেন্স ট্যাক্স লওয়া হইল; পরে সেই টাকা দুর্ভিক্ষে না ব্যয় করিয়া অন্যায় যুদ্ধে উড়ান হইল, অবশেষে ইন্‌কম টেক্স নামের দ্বারা লাইসেন্স টেক্সের নামকে একেবারে সমাহিত করিয়া দুর্ভিক্ষতহবিলের ইতিহাসটাকে পর্য্যন্ত হজম করা হইল—এ সমস্তই মুসলমানেরা সহ্য করিবেন, তথাপি হিন্দুর সহিত মিলিয়া, উভয়ে ভাই ভাই ভাবে কার্য্য করিবেন না। এরূপ বিদ্বেষের বিদ্যমানতায়, বিপক্ষের পক্ষে কি পরম সৌভাগ্যের বিষয় নয়?

হিন্দু হউন বা মুসলমান হউন, কোন বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিলে, তাহাকে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, ভারতবর্ষীয় জাতির সেবক হইতে হয়, ইহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন কি? (১) দেশের উৎপত্তি বৃদ্ধি, (২) দেশের ধন বিদেশে যাওয়া রোধ করা, (৩) বিদেশের ধন স্বদেশে আনা, (৪) দেশের গৌরব বৃদ্ধি করা, এই চারিটীই জাতির সম্বন্ধে মহৎ কার্য্য, যে ইহার কোন একটী করিতে পারিবে, পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর হাত তুলিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করা উচিত। আনন্দমোহন বসু র‍্যাঙ্গালার পরীক্ষা পাস করাতে পৃথিবীর নিকট ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, ইহাতে যদি ভাবতবর্ষের হিন্দু মুসলমান তাঁহাকে না আশীর্ব্বাদ করেন, তবে তাঁহার পরিশ্রম কিসে সার্থক হইবে?

শিক্ষা ক্ষেত্রে যোগ্যেরা যে বৃত্তি পাইয়া থাকেন ও চাকরি ক্ষেত্রে যোগ্যেরা যে চাকরি পাইয়া থাকেন, মুসলমানেরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, সাম্যনীতি তাহাদিগের নিকট কুৎসিত বলিয়া বোধ হইল, এজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়া বৃত্তি ও চাকরি বিলি সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ ব্যবস্থা বাহির করিয়াছেন; ইহাতে গবর্ণমেণ্টের ও জন সাধারণের যে কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা মুসলমানেরা বুঝেন না। সাম্যনীতি বাস্তবিক অতিশয় পবিত্র নীতি, উহাতে অবস্থিতি করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্ট বিঘ্নশূন্য হয় এবং এই নীতি অনুসৃত হইলে প্রজা সাধারণের অত্যন্ত মঙ্গল হয়।

এই নীতির ব্যতিক্রম হইলে প্রজা ও গবর্ণমেণ্টের কি অমঙ্গল হয়, তাহা একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। জগতে গুণই একমাত্র পূজ্য পদার্থ, যেখানে গুণের অনাদর, সেখানে শান্তি কদাচ থাকিবে না, কারণ মহৎ উদ্দেশ্যে কখনই গুণ অনাদৃত হইতে পারে না। হিন্দু পরীক্ষায় যে গুণ দেখাইয়া বৃত্তি পায় না, তদপেক্ষা কম গুণ দেখাইয়া মুসলমান বৃত্তি পাইলে, গুণের অবমাননা হইল না কি? আবার দেখুন, চাকরিগুলি সমস্তই প্রজা সাধারণের হিতের জন্য; যে কার্য্য উপস্থিত, তাহাতে প্রাপ্তব্য যোগ্যতম লোক নিযুক্ত হইলেই প্রজার

পূর্ণ মঙ্গল হয়; যদি যোগ্যতম ব্যক্তিকে উপেক্ষা করিয়া হীনগুণকে ঐ কার্য্য দেও, প্রজার উত্তম সেবা হইবে না, গুণের অবমাননায় রাজ্যে পাপ প্রবেশ করিবে। সুতরাং এ বিষয়ে মুসলমান গবর্ণমেণ্টের নিকট যে অনুগ্রহ পাইয়াছেন, তাহাতে সাম্যনীতি যে পদদলিত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় নাই; ইহাতে উৎফুল্ল হইয়া যদি মুসলমান প্রজা সাধারণের কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না না করেন, তাহা হইলে ঐ অনুগ্রহ নিশ্চয়ই শুভফল প্রসব করে নাই, বরং ঘুষের ন্যায় কার্য্য করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ইহাতে কোন মুসলমান বলিতে পারেন যে, তবে কি আমরা কখনও উন্নতি করিব না, ইহাই আপনার অভিপ্রায়? তদুত্তরে আমি বলি যে, না, কদাচ তাহা নহে। এ দেশের প্রত্যেক মনুষ্যই ভারতবর্ষীয় মহাজাতির ভৃত্য। ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কোন কোন অতি মহৎ যোগ্যতায় ভূষিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই হিসাবে কেহ কৃষক, কেহ উকীল, কেহ ডাক্তার হওয়া উচিত। জাতির নিকট কৃষকের ও উকীলের সম্মানের কোন তারতম্য নাই, সকলেই জাতির মহাযজ্ঞের কুশসমিধ সদৃশ। তাহাতে তুমি যদি জোর করিয়া ডাক্তারকে কৃষক, ও কৃষককে এঞ্জিনিয়ার কর, তাহাতে দেশের কল্যাণ হইতে পারে না। উদ্যোগ এবং অধ্যবসায়ই উন্নতির এক মাত্র বীজ, তাহার আশ্রয় না লইয়া সঙ্কীর্ণ বিধির অনুসন্ধান করাটা ভ্রম নয় ত কি? ডাক্তার বাউটন এক জন মুসলমান রাজপুরুষের নিকট ইংলণ্ডীয় জাতির জন্য অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া ছিলেন, তিনি প্রোটেস্‌ট্যাণ্ট ছিলেন, কেবল প্রোটেস্‌ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের জন্য চাহিলেও পারিতেন; কিন্তু তিনি জাতির হিতাহিতের যে পরিশুদ্ধ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন, তাহাতে তিনি সেরূপ চাহিতে পারেন নাই।

হিন্দুরা কদাচ তোমাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে; তোমরাও যে (জাতির শুভ স্বরূপ) তীর্থের যাত্রী, হিন্দুরাও তাহাই। রাজনৈতিক আন্দোলনে যদি এক কপর্দ্দকও লাভ হয়, তাহা হইলে কেবল হিন্দুর তাহা ভোগ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ হিন্দু নিজের জন্য রাজদ্বারে কোন সংস্কারের প্রার্থনা করে নাই। প্রত্যেক ধর্ম্ম সম্প্রদায় যদি স্ব স্ব পক্ষের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে, তাহা হইলে জাতির কল্যাণের আশা অতলজলে ডুবিয়া যাইবে। ইউরেসিয়গণ যে অশেষ প্রকারের বিশেষ অনুগ্রহ ভোগ করিতেছে, তজ্জন্য হিন্দু মুসলমানের কিছু উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যক নাই, কারণ প্রত্যেক ইউরেসিয়ান দুইটা করিয়া হ্যাট মাথায় দিলেও আমি নখদর্পণে দেখিতেছি, উহারা ভারতবাসী ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহারা কালক্রমে বাধ্য হইয়া এদেশের সুহৃৎ হইবে, ইংরেজ মোহে পড়িয়া দুদ কলা দিয়া সাপ পুষিতেছে।

মুসলমানদিগের আরও একটা দোষ এই যে, যদিও তাঁহারা এই দেশের চির অধিবাসী, তথাপি এদেশের প্রচলিত ভাষাকে সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতেছেন না। দশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমানের আচার ব্যাবহার সম্বন্ধে যে সৌসাদৃশ্য ছিল, সরা না ফারাজীর মত প্রচলিত হইয়া তাহার বিশেষ হানি হইয়াছে। বিবাহাদি উৎসবে এক্ষণ তাঁহারা ঢোল ও ফুল ব্যবহার করিতে চাহেন না। নিঃশব্দ বিবাহে বিবাহ-ভঙ্গের মোকদ্দমার

সংখ্যা অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে, অথচ বাজনদর ও মালাকর জাতির কেবল হিন্দুর অল্প সাহায্যে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছে।

যাহাতে কোরাণিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের কোণ সংঘর্ষ না ঘটে, অথচ আচার ব্যবহারে উভয়ের সন্নিকর্ষ লাভ হয়, তাহা উভয় পক্ষের পবিত্র দেশহিতৈষীদিগের প্রার্থনীয় নয় কি? সাম্যভাব ত অনেকটা হইয়াছিল; কত হিন্দু খাঁ তরফদার, মজুমদার, পাকড়াসী ও কত মুসলমান বিশ্বাস মণ্ডল উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুরা মাণিকপীরের সিন্নি ও গাজীর ভোগ দিয়া থাকেন। মুসলমানেরা এরূপ কিছু কিছু করিতেন, কিন্তু সরা হইয়া তাহা রহিত হইয়া যাইতেছে। যাহা ধর্ম্মের হানিকর নহে, অথচ সমাজের সৌহার্দ্দ বর্দ্ধক, তাহাতে আপত্তি করা অপরিণামদর্শিতা। আমার মতে হিন্দুদিগের বারইয়ারিতে মুসলমানদিগের ও মুসলমানদিগের সিন্নিতে হিন্দুদিগের চাঁদা দেওয়া উচিত। উভয়েই যখন সত্য ধর্ম্মের উপাসক, তখন পরস্পরকে কাফের বা যবনের ভাবে দেখা একান্ত পশুবুদ্ধির কার্য্য।

মুসলমানদিগের একটা সংস্কার হইয়াছে যে,হিন্দুরা তাহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ইহার কারণ তাঁহারা এই অনুমান করেন যে, ইংরেজদিগের রচিত মুসলমান শাসনের যত ইতিহাস আছে, তাহাতে মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতেন, এইরূপ অযথা উক্তিতে পরিপূর্ণ; হিন্দুরা সেই সকল ইতিহাস পড়িয়া এক্ষণ প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইয়াছেন। মুসলমানদিগের এরূপ সংস্কারের মূল কি, তাহা আমি জানি না, আমি কোন বিষয়ে হিন্দুদিগকে দলবদ্ধ ভাবে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধ দেখিনা। কোন কোন মূর্খ হিন্দু যে সকল অন্যায় করে, তাহা সমগ্র হিন্দু জাতির স্কন্ধে নিক্ষেপ করা নিতান্ত অবিচার।

গোহত্যার-বিরোধী হিন্দু চিরকাল, সে কোন প্রতিশোধ লালসায় নহে। পর্য্যটন করিয়া দেখ, দেশে হাজার হাজার হিন্দুর কৃত স্কুল, রাস্তা, পুষ্করিণী, পুল আছে, তাহাতে হিন্দু মুসলমানের কিছুমাত্র পক্ষপাত নাই। হিন্দু শিক্ষক, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, মুসলমানকে তুল্য চক্ষে দেখিয়া থাকেন। চাকরির বিষয়ে স্বজনের সাহায্য স্বজনে আজ নূতন করিতেছে না; আমি এই জন্য মুক্তভাবে গুণের মানদণ্ড চালাইবার জন্য চীৎকার করি। আরও দেখা কর্ত্তব্য যে, যখন জন সংখ্যায় হিন্দুরা মুসলমানের ৪ গুণ অধিক, তখন চাকরিতে হিন্দুর আধিক্য না হইবে কেন? এক্ষণ যে সে ৪ গুণের স্থলে ৮ গুণ হিন্দু দেখা যাইতেছে, তাহারও কারণ আছে; মুসলমান শ্রেণীতে মধ্যবিতের পরিমাণ অল্প, শ্রমজীবীর সংখ্যা অধিক; হিন্দু শ্রেণীতে মধ্যবিতের সংখ্যা অধিক, শ্রমজীবীর সংখ্যা কম। যদি শ্রমজীবীদিগকে শ্রম ত্যাগ করাইয়া চাকরির মধ্যে প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে অনুপাতের সংশোধন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে দেশের কল্যাণ হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

অতএব আমি কোন প্রকারেই দেখিতে পাইতেছি না যে, হিন্দুরা মুসলমানদিগের বিপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন। উভয়েই যখন চিরভারতবাসী এবং বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষীয় জাতির অনুপূরক, তখন ইহারা উভয়েই মহাজাতির ভৃত্য ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং যদি কেহ

জাতির মঙ্গলের চেষ্টা না করিয়া, শ্রেণী বিশেষ কি ব্যক্তি বিশেষের মঙ্গল অন্বেষণ করেন, তাহা হইলে তিনি সেই শ্রেণী বা ব্যক্তির লোক হইবার যোগ্য, কিন্তু মহা-জাতির লোক হইবার যোগ্য নহেন। কিন্তু যাঁহারা মহাসাগর সদৃশ প্রশস্ত হৃদয়ের অধীশ্বর, তাঁহারা সেরূপ ক্ষুদ্রত্বে অবতরণ করিবেন কেন? তাঁহাদিগের বিরাট প্রাণ নিরন্তর মহাজাতির মঙ্গল ধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে।

বাস্তবিক পক্ষে হিন্দু মুসলমানের কেহই কাহারও শত্রু নহেন, ও হইতে পারেন না— সহরবাসীরা স্বচক্ষে গ্রাম্য হিন্দু মুসলমানের হরিহর ভাব দেখেন নাই, সুতরাং ইহা বুঝিবেন না। সহরে স্বল্প লোক বাস করে, কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রচুর, তাহাদিগের পরস্পরের অসৌহার্দ্দে অনেক এসে যায়, এজন্য মফস্বলবাসীদিগের প্রার্থনা যে, তাঁহারা পরস্পরকে যথার্থরূপে মানিতে চেষ্টা করেন, দড়ীকে সাপ বলিয়া ভ্রম হইলে সে ভ্রমে মোহ পর্য্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক সে সাপ নহে, দড়ী, অতএব ক্ষান্ত দেও, আর বৃথা পরস্পরের কুৎসা গাইও না; এমনিই ত পরাধীন কুক্কুর, তাহাতে আবার ঘরাঘরি ভেদ সাজাইয়া বিপক্ষের সোণায় সোহাগা করিয়া দিওনা। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতিরা— কালকার জাপানও, যে তোমাদের অনৈক্য দেখিয়া উপহাস করে, ইহা কি তোমরা একটুও বুঝনা?

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুকুমার-বিদ্যা ও সমাজ।

রাজ্য সমাজেরই অংশ। জন-সাধারণের নীরব অনুমোদনে সমাজ-প্রতিভূর নাম রাজা, রুক্ষ আন্দোলনে প্রেসিডেন্ট, ঔদাস্য-জড়তায় সার্ব্বভৌম। রাজ্য, আমাদিগেরই মতিগতি-সঙ্কুল গৃহের সমন্বয়। সুতরাং, রাজনীতি উচ্চাঙ্গের গৃহস্থালী মাত্র। গৃহ ব্যষ্টি, রাজ্য সমষ্টি।

উন্নত গৃহের প্রতি-পুরজনই গৃহস্থালীর উন্নতি-কল্পে যথাসাধ্য নিযুক্ত। রাজ্যের উন্নতি-কল্পে প্রত্যেক প্রজার সাহায্য আবশ্যক। সূত্রের তরঙ্গ-পারঙ্গে বস্ত্র। একটী ক্ষুদ্র প্রজার নিষ্কর্ম্মাবস্থাও প্রকাণ্ড রাজ্যের গলগ্রহ-স্বরূপ। একটী ক্ষুদ্র স্ফোটকে সমস্ত দেহ উত্তাপিত।

আদর্শ গৃহ, ত্রিবৃত্তির সাধনা-স্থল। ত্রিবৃত্তি—কার্য্যকারিনী, জ্ঞানার্জ্জনী ও চিত্তরঞ্জিনী। জগত, সত্য-শিব-সুন্দর। নিত্য-আবশ্যক ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ উভয় বস্তুই গৃহীর সংগ্রহনীয়। বন্যের অরণ্য, দেবতার মন্দার-কুঞ্জ, গৃহীর পুরোদ্যান। পুরোদ্যানের একাংশে আহার্য্য লতা-গুল্মাদি, অন্যাংশে বিকসিত পুষ্পরাজি।

সুকুমার-বিদ্যা সভ্যতার দীপ্তি। সুকুমার-বিদ্যার আদরে ও অনুরাগে গৃহস্থের সচ্ছলতা প্রকাশ পায়। রাজ্যেরও তদ্রূপ। গৃহীর ইচ্ছায় পুরোদ্যান পতিত-ভূমি বা নন্দনারণ্যে পরিণত হইতে পারে। গৃহী স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু, রাজ্য বা সমাজ নিয়মাধীন।

বহির্শত্রু ও অন্তর্শত্রু নিবারণার্থে বলিষ্ঠদিগকে এবং শান্তি-রক্ষার্থে কর্ম্ম-বোদ্ধাদিগকে সমাজ প্রতিপালন করে। সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য শ্রমজীবী, বণিক ও যন্ত্র-নির্ম্মাতাদিগকে উৎসাহ প্রদত্ত হয়। দেব-প্রসন্নতা-মুরোধে ঋত্বিক ও দৈবজ্ঞগণ সমাজান্নে পরিপুষ্ট। সুকুমার-বিদ্যায় রাজ্যের এবম্বিধ সাক্ষাতঃ কোন লাভ নাই। সুতরাং, শিল্পী, গায়ক, চিত্রকর, সাহিত্য-জীবী ইত্যাদি-দিগকে উৎসাহ-দান সমাজের কেন অবশ্য কর্ত্তব্য?—ইহা অর্থ-নীতির কথা।

অর্থ-নীতির মৌলিক অর্থ, অর্থ-সঞ্চয় নহে, অর্থ-ব্যবহার। অর্থাৎ, কিরূপে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। প্রথমে সঞ্চয়ে সুখ, চরমে ব্যয়ে সুখ। জীবনের উদ্দেশ্য সুখ। অবশ্য সুখোদ্দেশেই ব্যয়। প্রাগুক্ত ত্রিবৃত্তির যথাযথ পরিণতি-ফলে সুখ; যথাযথ অনুশীলনে আনন্দ। এই উদ্দেশ্যে ও অনুশীলনেই মনুষ্যত্ব। সুতরাং, ত্রিবৃত্তির সামঞ্জস্য বা মনুষ্যত্ব রক্ষার্থে চিত্ত-রঞ্জিনী-বৃত্তির চর্চ্চানুকূল ব্যয়ে সভ্যতার পরিণতি লক্ষণ। কার্পণে মনুষ্যত্বের ক্ষতি, সভ্যতায় অপরিণতি।

সুখ স্বাভাবিকতা, দুঃখ ব্যভিচার। শুদ্ধ বহির্জগত মত্ততায় প্রকৃত সুখ দুর্ল্লভ। বহির্জগত কর্ম্মস্থল; অন্তর্জগত আনন্দস্থল। যোদ্ধা ও বণিক কর্ম্মবন্ধু, গায়ক ও চিত্রকর অন্তর্বন্ধু। কর্ম্মের অনুরোধে কর্ম্ম-বন্ধুত্ব; অন্তরের অনুরোধে অন্তর্বন্ধুত্ব। কর্ম্মে সংঘর্ষ, আনন্দে সম্মিলন। এই অন্তর্বলেই মনুষ্যের প্রাণী-জগতে শ্রেষ্ঠত্ব। আনন্দ, অন্যান্য শাস্ত্রের গৌণ ফল হইতে পারে; কিন্তু, সুকুমার বিদ্যার মুখ্য ও গৌণ—উভয় ফলই আনন্দ। আনন্দ ভিন্ন তাহার অন্য উদ্দেশ্য নাই, অন্য উদ্দেশ্যে উদ্ভবে না।

বল ও অর্থ পশুত্বে স্বতঃ উদ্রিক্ত, মদগর্ব্বে বিপ্লবোন্মুখ। সুকুমার-বিদ্যা আপন সৌকুমার্য্যে আপনি বেপথুবতী। আপন আনন্দে আপনি অন্তর্মনা। সৌন্দর্য্য-অভিব্যক্তির ঝনঝনা কোথায়? ক্ষেপনী চাক্ষুষ বিষম উৎক্ষেপনে প্রক্ষেপনে নদীকে তরঙ্গায়িত করে, কিন্তু বহিত্র বহে না। যত্নলাঞ্চিত জলমগ্ন কর্ণই নীরবে বহিত্রকে গম্যস্থানে লইয়া যায়। কর্ণধার পশ্চাতে ও উচ্চাসনে। সুকুমার-বিদ্যা সভ্যতার সর্ব্ব পশ্চাতে। সর্ব্বপশ্চাতে শ্রেষ্ঠের স্থান।

অবশ্য অস্ত্র বা বস্ত্রের ন্যায় প্রতিভা আমাদের নির্ম্মাণীয় নহে। কিন্তু, স্বর্ণখনির ন্যায় প্রতিভার আবিষ্কারে ও সংস্কারে আমরা সক্ষম। ব্যয় অপব্যয় নহে। সুতরাং জিজ্ঞাস্য, ১ম, পাত্রাপাত্র নিরূপণের উপায় কি? ২য়, সমাজের কিরূপ সাহায্য প্রশস্ত?

বর্ত্তমান সমাজ হট্টগোল মাত্র। বর্ত্তমান সমাজের মূল নীতি তাড়না। তাড়না, সভ্যতার আদিম নীতি। সংস্কার, সভ্যতার চরম নীতি। বেত্রাঘাত বা কারাদণ্ডে চৌরের সংস্কার অসম্ভব। সুশিক্ষায় সম্ভব। সুশিক্ষাদানই সংস্কার-নীতি। সংস্কারের মূলে পালন। প্রসঙ্গতঃ তাড়না—পুত্রের হিতার্থে সুশিক্ষিত পিতার পুত্র প্রতি তাড়না, পালনেরই অঙ্গীভূত। সুকুমার-বিদ্যার প্রকৃত উন্নতি, এই সুদূর পালন-নীতি-সাপেক্ষ।

সমাজ-তন্ত্র শ্রম-বিভাগ মাত্র। সজ্ঞান শ্রম—প্রকৃত শ্রম; অজ্ঞান শ্রম—বৃথা শ্রম। ক্ষেত্রে জলসিঞ্চন প্রকৃত শ্রম; সমুদ্রে জলসিঞ্চন বৃথা শ্রম। মন্ত্রীর করধৃত লাঙ্গলে বা কৃষকের মন্ত্রীত্বে উন্নতি বিপর্য্যয়। যথাযথ কার্য্যে যথোপযুক্ত ব্যক্তিরই নিযুক্তি উন্নতির অনুকূল। লৌহকে লৌহবর্ম্মে ও স্বর্ণকে

অলঙ্কারে পরিণত করাই প্রশস্ত। সুতরাং, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃত্যনুযায়ী সুশিক্ষা দানই প্রতিভা আবিষ্কারের উপায়। প্রবৃত্তির বিপর্য্যয় শিক্ষায় প্রতিভার অধোগতি, সমাজের অনুন্নতি।

বিধি-কৃপায় বা প্রকৃতি-নিয়মে আমাদিগের একোনশত শিশু সাধারণ বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। পিতা মাতার শত স্নেহ-পক্ষপাত সত্বেও তাহারা সাধারণ বুদ্ধি ও সাধারণ কর্ম্মোপযুক্ত। ইহারা সমাজ-দেহ। অবশিষ্টটীর ভবিষ্যত জন্য অভিভাবক যে শিক্ষা-সূচনাই করুক, সে আপন পথ আপনি নির্ব্বাচন করিয়া লয়। এইটী সমাজ-মজ্জা। এইটি প্রতিভা। কিন্তু, প্রতিভাও বিকার-রহিত নহে। প্রতিভা দুই প্রকার, এক, মনোকল্পিত প্রতিভা; অপর, প্রকৃত প্রতিভা। মনোকল্পিত প্রতিভা স্বভাবতঃ অস্থির ও লক্ষ-চ্যুত। প্রকৃত প্রতিভা সংহত ও ধ্রুবান্বেষী।

এই কেমিকেলও খাঁটি স্বর্ণের প্রভেদ নিরূপণার্থে "শিক্ষানবিসাগার" স্থাপন আমাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য। অবশ্য, তথাকার বিচক্ষণ নেতা বা নেতৃগণ কৃপালু পিতার ন্যায় প্রত্যেক শিক্ষা-নবীসের মতিগতি বুঝিযা সযত্নে শিক্ষা দান করিবেন। ধান্য হইতে তুষ ত্যাগের ইহাই সুব্যবস্থা। নতুবা, কবি-প্রকৃতিকে চিত্র-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে বা বনিগ্‌-বুদ্ধিকে গীত-বাদ্য শিক্ষা দিয়া মন্ত্রণাগারে আসীন করিতে কেহ পরামর্শ দিতেছে না।

সুকুমার-বিদ্যাবিদ্‌গণকে শিক্ষানুসারে যৌবনে কর্ম্মদান, এবং বার্দ্ধক্যে বৃত্তিদান সমাজের অপর কর্ত্তব্য। ইহাই প্রশস্ত সাহায্য। সাধারণ মন স্থিতি-স্থাপক; বাত-কুক্কুটের ন্যায় স্বভাবতঃ অবস্থানুকূলে আপনাকে চালিত করিতে সক্ষম। প্রতিভা অসাধারণ; আঘাতে প্রতি-ঘাতোদ্যত। সুতরাং, সাধারণ-বিরোধী। এই জন্য প্রতিভাশালীর অর্দ্ধ-জীবন প্রায়শঃ আমরা উপবাসে দগ্ধ করি। কঠোর জীবিকা-যুদ্ধে প্রতিভা ক্রমশঃ রুক্ষ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। অধিকন্তু, জীবিকা-লক্ষ্যে ইতর-সাধারণের তুষ্টি-লাভাকাঙ্ক্ষায় সুকুমার-বিদ্যা ঐন্দ্রিয়কতা দূষিত হয়। পরিশেষে যখন তুমি তাহার প্রাপ্য অর্থ ও যশ-ডালি লইয়া তাহার সম্মুখীন হও, তখন তাহার শক্তি অপচিত, প্রতিভা নৈরাশ্য-দগ্ধ, হৃদয় সন্দিগ্ধ। আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিশাপে তোমাকে সংবর্দ্ধনা করে।

এই বিশুদ্ধ পালন-নীতির অভাবে আধুনিক সুকুমার-বিদ্যা পরিদুষ্ট। অলসের আলস্যে, উচ্ছৃঙ্খলের মত্ততায়, খাম-খেয়ালীর খাম্‌-খেয়ালে, একরোখার রূঢ় অবাধ্যতায় বিকলাঙ্গ। এই পালন-নীতির সম্যক অভাবে প্রতি সমাজে অসংখ্য সুকুমার প্রতিভার—

"প'ড়ে থাকে দূরগত, জীর্ণ অভিলাষ যত,
ছিন্ন পতাকার মত, ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৩৮)

দক্ষিণাপথে—বাসুদেবোদ্ধার।

মাঘ মাসের প্রথমে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফাল্গুন মাসে নীলাচলে আগমন করেন ও ফাল্গুনের শেষে জগন্নাথের দোলযাত্রা দেখার পর চৈত্র মাসে সার্ব্বভৌমকে কৃপা করেন। বৈশাখের প্রথমে তাঁহার দক্ষিণ দেশপর্য্যটনের ইচ্ছা হইলে তিনি বন্ধুদিগকে ডাকিয়া বিনীত ভাবে সকলের হাতে ধরিয়া বলিলেন ;—"তোমরা আমার প্রাণাধিক বন্দু, প্রাণ ছাড়া যায়, তবু তোমাদের ছাড়িতে পারি না। তোমরা আমাকে এখানে আনিয়া জগন্নাথ দর্শন করাইয়া সত্য সত্যই বন্ধুর কার্য্য করিয়াছ। এখন তোমাদের নিকট আমি আর একটী ভিক্ষা চাহিতেছি। তোমরা অনুমতি কর, আমি দক্ষিণাপথে গমন করিব। জননীর নিকটে প্রতিশ্রুত আছি, বিশ্বরূপের উদ্দেশে যাইতে, সে সত্য অবশ্যই পালন করিব। কিন্তু এবারে আমি একাকী যাইব, তোমাদের কাহাকেও সঙ্গে লইব না। সেতুবন্ধ হইতে যে পর্য্যন্ত আমি ফিরিয়া না আসি, তোমরা সে পর্য্যন্ত এই স্থানে রহিবে।"

এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ মহা দুঃখিত হইলেন এবং ম্লান মুখে নীরবে রহিলেন। নিত্যা-নন্দ বলিলেন "এ কেমন করিয়া হইতে পারে? তুমি একাকী যাইবে, ইহা কার প্রাণে সহ্য হয়? দক্ষিণের তীর্থপথ আমার সকলই জানা আছে, আমাকে আজ্ঞা দাও, আমি সঙ্গে যাইব। না হয়, আর‍্দুই এক জন চলুক। বিপদ্‌সমাকুল পথে তোমার একাকী যাওয়া হইবে না। কি জানি কখন কি বিঘ্ন ঘটে?

শ্রীচৈতন্য মৃদু মধুরস্বরে বলিলেন—"নিতাই! তুমি সূত্রধার আর আমি নর্ত্তক। তুমি যেমন নাচাও, আমি তেমনি নাচি। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আমি কোথায় বৃন্দাবনে যাইতে ছিলাম, তুমি আমাকে অদ্বৈত ভবনে লইয়া গেলে। নীলাচল পথে আসিতে আসিতে আমার প্রিয় দণ্ডগাছটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলে। দেখিতেছি, তোমাদের গাঢ় প্রেমে আমার কার্য্য পণ্ড হইতেছে। আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, জগদানন্দ আমাকে বিষয়ীর ন্যায় বিষয় ভোগ করাইতে চাহে। কি করি? সে যা বলে, আমি ভয়ে তাই করি। না করিলে ক্রোধভরে আমার সঙ্গে সে তিন দিন কথা কয়না। আমি বৈরাগ্য ধর্ম্ম রক্ষার জন্য শীত কালেও ত্রিসন্ধ্যা স্নান করি ও ভূমিতে শয়ন করি দেখিয়া মুকুন্দের দুঃখের সীমা নাই। সে মুখে কিছু না বলিলেও তাহার হৃদয়ের দুঃখে মুখ মলিন হয়। তাহার দুঃখে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। দামোদর ব্রহ্মচারী, আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সদাই আমাকে শিক্ষা-দণ্ড দিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় দামোদরের লোকাপেক্ষা নাই। আমি লোকাপেক্ষা ছাড়িতে পারি না। সেজন্য সে আমার স্বতন্ত্র আচার দেখিলেই ব্যবহার শিক্ষা দিয়া থাকে। ভ্রাতৃগণ, দিন কতক তোমরা নীলাচলে স্থির হইয়া থাক, আমি একেলা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসি।"

শ্রীচৈতন্যের নিন্দাচ্ছলে ভক্তদিগের স্তুতি ও বাৎসল্য পূর্ণ মধুর সম্ভাষণ শুনিয়া চারি জনই তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য কত অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তখন নিত্যানন্দ বলিলেন, "তোমার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য, ইহাতে আমাদের সুখ দুঃখ যাহা হয় হইবে। কিন্তু আমার আর একটী নিবেদন আছে। কর্ত্তব্য কি না, বিবেচনা করিয়া দেখ। আর কিছু সঙ্গে না লইলেও কৌপীন, বহির্ব্বাস ও একটী জল পাত্র তো লইতে হইবে। তোমার দুই হাত নাম সংখ্যা গণনায় আবদ্ধ থাকিবে, এ সব সামগ্রী কে বহিয়া যাইবে; বিশেষতঃ তুমি যখন প্রেমাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, তখন তোমাকে কে রক্ষা করিবে? তাইতে বলি, কৃষ্ণ দাস নামে এই সবল ব্রাহ্মণ কুমার তোমার জলপাত্র বস্ত্র বহিয়া পাছে পাছে যাউক। তোমার যাহা ইচ্ছা করিবে, এ কোন বিষয়ে কিছু বলিবে না।" শ্রীচৈতন্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বন্ধুদিগকে লইয়া সার্ব্বভৌম সদনে গমন করিলেন এবং তাহাকে নিজ সঙ্কল্প বলিলে তিনি অতি কাতর ভাবে কতক দিন অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অনুরোধে গৌরচন্দ্র কিছু দিনের জন্য যাওয়া স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় সার্ব্বভৌম-গৃহে নিমন্ত্রণ ভোজনে ও হরি কথা নৃত্য কীর্ত্তনে গত হইল। পরে যাত্রার নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের নিকট অনুমতি চাহিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন আমি তীর্থ ভ্রমণ ও বিশ্বরূপের উদ্দেশ করিয়া নিরাপদে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিতে পারি।" সার্ব্বভৌম বিরহ শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং চারিখানি নূতন কৌপীন ও বহির্ব্বাস ও কতক গুলি মহাপ্রসাদান্ন ব্রাহ্মণ দ্বারা আলালনাথ পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া গৌরকে বলিলেন, "আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিও, গোদাবরী তীরে বিদ্যা নগরে উৎকল রাজ প্রতিনিধি রামানন্দ রায় আছেন। তাঁহার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিও। তিনি তোমার সঙ্গের যোগ্য পাত্র। তাঁহার ন্যায় রসিক ভক্ত আর দেখা যায় না; পাণ্ডিত্যের ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা একাধারে তাহাতেই সামঞ্জসীভূত হইয়াছে। তাঁহার অলৌকিক ভাব চেষ্টা বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত বৈষ্ণব জ্ঞানে পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে কত পরিহাস করিয়াছিলাম। তোমার কৃপায় এখন আমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে। এখন তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিতেছি। তাঁহাকে শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা করিও না। অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলে তাঁহার মহিমা জানিতে পারিবে। গৌরচন্দ্র এ কথা অঙ্গীকার করিয়া জগন্নাথ-মন্দিরে যাইয়া আশীর্ব্বাদ অনুমতি গ্রহণ করিয়া সমুদ্র কূলের পথ দিয়া দক্ষিণাপথ ভ্রমণে যাত্রা-করিলেন। সার্ব্বভৌম স্বীয় পরিচর সঙ্গে সমুদ্র তীর হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। নিত্যানন্দাদি চারি জন ও গোপীনাথ আচার্য্য বস্ত্র ও প্রসাদ লইয়া আলালনাথ পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে চলিলেন। পুরীর ৪ ক্রোশ দক্ষিণে আলালনাথ দেবমন্দির। শ্রীচৈতন্য স্বশিষ্যে মন্দিরের পুরোভাগে হরি সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সে দেশবাসীগণ সন্ন্যাসীর অপরূপ ভাব ও পুলকাশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ দেখিয়া একপ্রাণে শুনিতে ও

দেখিতে লাগিল। ক্রমে জনতা গাঢ়তর হইল; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অপরূপ সন্ন্যাসী দেখিতে আসিল। নিত্যানন্দ ভক্তগণকে বলিলেন;—"এইরূপে গ্রামে গ্রামে নৃত্য কীর্ত্তন হইবে; তাহার পূর্ব্বাভাস আরম্ভ হইল।" মধ্যাহ্ণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল তথাচ ভিড় কমিল না, দেখিয়া নিতাই গৌরকে মধ্যাহ্ণ স্নান করাইবার জন্য লইয়া গেলেন এবং স্নানান্তে সঙ্গী কয়জন সহিত মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বহির্দ্বার বদ্ধ করিয়া দিলেন। ভোজনাদি সমাপন হইলে আবার দ্বার উন্মুক্ত হইল, আবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এবারে জনতা আরও বাড়িয়া গেল। সন্ধ্যার পর কীর্ত্তনান্তে লোক সব হরিনাম গাইতে গাইতে নাচিতে নাচিতে স্ব স্ব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। সকলেই গৌরের জীবন্ত ধর্ম্ম ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব হইয়া গেল। রজনী প্রভাতে গৌরচন্দ্র স্নানান্তে ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় হইয়া চলিয়া গেলেন। কৃষ্ণদাস পাছে পাছে বস্ত্র জলপাত্র বহিয়া চলিলেন। ভক্তগণ গৌরের বিচ্ছেদে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; গৌরচন্দ্র তথাচ একবার ফিরিয়া তাকাইলেন না। ভক্তগণ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া পরদিন প্রাতে দুঃখিতান্তঃকরণে নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে শ্রীচৈতন্য মত্তসিংহের ন্যায় নিম্নলিখিত মতে নামোচ্চারণ করিতে করিতে পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্!
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্!
রাম রাঘব! রাম রাঘব! রাম রাঘব! রক্ষ মাম্!
কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! কৃষ্ণ কেশব! পাহি মাম্!

এবারকার ভ্রমণে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম খুব প্রচার হইতে লাগিল; বক্তৃতা, সংকীর্ত্তন বা উপদেশে নহে, কিন্তু তাঁহার জ্বলন্ত ধর্ম্ম জীবনের প্রতিভায়। যাহারা তাঁহার নিকট আসিয়া তদীয় ভাব দেখিল ও তাঁহার সঙ্গে একত্র থাকিয়া সদালাপ করিতে সুযোগ পাইল, তাহারা তাঁহার ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। সেই সকল লোক আবার স্ব স্ব গ্রামে যাইলে তাহাদের দেখিয়া অন্য লোক সাধু হইতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া অপরে, এইরূপে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় রামের দেখিয়া শ্যাম, শ্যামের দেখিয়া যদু ও যদুর দেখিয়া নবীন নবভক্তি বিধানের ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত প্রেম, নাম ও ভক্তি বিলাইতে বিলাইতে শচীনন্দন ভ্রমণ বিহার করিতে চলিলেন।

আলালনাথের পর গৌরচন্দ্র কূর্ম্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়া কূর্ম্ম বিগ্রহের বন্দনা প্রণাম করিলেন এবং নাম সংকীর্ত্তনের বন্যায় সমাগত লোকমণ্ডলীকে ভাসাইয়া কূর্ম্মনামক বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কূর্ম্ম তাঁহার প্রেমভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার জ্ঞানে পূজা করিলেন। এবং পর দিন প্রাতে প্রাতঃস্নান করিয়া গৌর গমনোদ্যত হইলে বিনীতভাবে তাঁহার অনুগমন করিবার অভিলাষ জানাইলেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিলেন, "তাহা কখন হইতে পারে না, গৃহস্থাশ্রম পবিত্র সাধন ক্ষেত্র। গৃহে বসিয়া নাম সাধন কর, বিষয়তরঙ্গে কখন পড়িবে না। ফিরিয়া আসিবার সময় আবার আমাকে এই খানে দেখিতে, পাইবে।"

সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত যেখানে যাহার গৃহে

শচীনন্দন অতিথি হইয়াছিলেন, সেই সেই গৃহের গৃহস্বামীগণ তাঁহার প্রতি এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গী হইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সর্ব্বত্রই গৌর তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া ঘরে বসিয়া ভজন সাধন করিতে বলিয়াছিলেন। কূর্ম্মকে বিদায় দিয়া শ্রীচৈতন্য শুভ যাত্রা করিয়া পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে বাসুদেব নামে এক গলিতকুষ্ঠী ব্রাহ্মণ শ্রীচৈতন্যের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার অভিলাষে কূর্ম্ম ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব পরম বিশ্বাসী ভগবদ্ভক্ত, তাঁহার অলৌকিক জীবে প্রেম শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ। ক্ষতস্থানে কীট সকল নিরন্তর তাঁহার অঙ্গের পুঁজ রক্ত পান করিতেছে,তাহাদিগকে দূরীভূত করা দূরে থাকুক, কোন কীট দৈবে খসিয়া পড়িলে তিনি তাহাকে উঠাইয়া আবার সযতনে সেই স্থানে রাখিয়া দিতেন। বাসুদেব কূর্ম্মালয়ে আসিয়া যখন শুনিলেন যে গৌর চলিয়া গিয়াছেন, তখন সাধু দর্শন হইল না বলিয়া বিষাদে কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কে জানে কি অলৌকিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গৌর সেই মুহূর্ত্তে সেখানে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং বাসুদেবকে সপ্রেম গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া সুখী করিলেন। কথিত আছে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শে বাসুদেব কুষ্ঠ রোগ মুক্ত হইয়া সুন্দর সুস্থ দেহ লাভ করিলেন। গৌরের অলৌকিক কৃপা দেখিয়া তাঁহার মন প্রাণ গলিয়া গেল, তখন তিনি গৌরের চরণ ধরিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কত স্তব করিতে লাগিলেন। বাসুদেব ভাগবতের রুক্মিনী-প্রেরিত শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে দরিদ্র ব্রাহ্মণের উক্তি অনুসরণ করিয়া বলিলেন; কোথায় পাপী, দরিদ্র কৃপা পাত্র আমি, আর কোথায় ঈশ্বরাবতার তুমি। আমার গলিত দেহে তুমি যে আলিঙ্গন করিলে, ইহা জীবে সম্ভবে না। আমার গায়ের দুর্গন্ধে, অতি জঘন্যহীন লোকও পলাইয়া যায়; তাহা তুমি কেমন করে স্পর্শ করিলে? কিন্তু প্রভো! আমি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ভাল ছিলাম। এখন আমার দেহ-গর্ব্বে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারে। গৌর বলিলেন, 'সাধু দেহে অহঙ্কার আসিবে কেন? তুমি নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর ও নাম সংকীর্ত্তন প্রচার কর। তোমা হইতে এদেশে জীব নিস্তার হইবে।' এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধান হইয়া গেলেন। কূর্ম্ম ও বাসুদেব শোকাভিভূত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাসুদেবকে উদ্ধার করিয়া শ্রীচৈতন্য তদীয় ভক্ত সমাজে "বাসুদেবামৃত" পদ" নাম পাইয়াছিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

কূট প্রশ্নের নীরস সত্য।

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহাদিগের নির্দ্দয় বিচারে, রসহীন তীব্র সমালোচনায়, ভাবুক, প্রেমিক, ভক্ত, বিশ্বাসী-দিগের বড় রসভঙ্গ এবং মর্ম্মান্তিক ক্লেশ উপস্থিত হয়। কুটিল বুদ্ধি-প্রসূত কূট প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারিয়া তাহারা শেষ রাগ করে, কটু কথা বলে, এবং কালের দুর্দ্দমনীয় প্রভাব স্মরণ পূর্ব্বক দুঃখিতান্তঃকরণে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে থাকে। বিচার-প্রিয় চতুরবুদ্ধি সংশয়বাদীরা বাস্তবিক বড় নিষ্ঠুর জীব। তাহারা লোকের পুরুষ পরম্পরাগত জীবনাবলম্ব বিশ্বাসের উপর বিচারের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র আঘাত করে। চিরপোষিত প্রাচীন রমণীয় বিশ্বাস সংস্কারের রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা সকল খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে, যেখানে কোন কালে অবিশ্বাস অভক্তি প্রবেশ করে নাই, সেখানেও তাহারা সন্দেহের বিষ প্রবিষ্ট করিয়া দেয়। বিচার বলে, যুক্তি তর্কে কোন শ্রান্ত ক্লান্ত ধর্ম্ম-পিপাসু তত্ত্বানুসন্ধায়ীর মনে শান্তি কিম্বা আশার সঞ্চার করিতে পারে না, কিন্তু অনেকের পুরাতন পৈতৃক কুলগত বিশ্বাসের গোড়া আল্‌গা করিয়া দিতে পারে। আহা, তাহাদের তর্ক-তরঙ্গে পড়িয়া কত শত নর নারী নিরাশ্রয় নিঃসম্বলে কালাতিপাত করিতেছে। এক অর্থে, এই কূটপ্রশ্নকারী বৌদ্ধদিগকে কালাপাহাড়ের মত মনে হয়। ইহারা গুরু পুরোহিত-ব্যবসায়ী ভ্রান্তমত-প্রতিপোষক ব্যক্তিদিগের অন্নের হন্তারক, নির্দ্দোষ, নির্ব্বাক্, অচল জড়স্বভাব দেব দেবী-গণের মূল উচ্ছেদক, এবং পুরাণ কাব্য চিত্রিত সুন্দর সুন্দর রমণীয় মূর্ত্তি, অলৌকিক দেব চরিত্রের বিনাশক। ইহারা প্রেম ভক্তি ভাবরস-পিপাসু নরনারীর শুষ্ক কণ্ঠে অনি-শ্চিত জ্ঞানের সন্দেহ মিশ্রিত অম্লরস এবং আনুমানিক সিদ্ধান্তের প্রস্তরবৎ নীরস সত্য ঢালিয়া দিতে চায়। কোন নববিধ সত্যে নিঃসংশয় বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারে না, কিন্তু পুরাতন সংস্কার এবং বিশ্বাস ভক্তির মূল উৎপাটন করিতে বিলক্ষণ পটু। ভগবান্ যেন ভাবোদ্যানের রোপিত বৃক্ষ সকলকে সবলে নড়াইবার জন্যই ইহাদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ইহারা বিশ্বা-সীর পরীক্ষক।

এক জন নাট্যশালায় রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের দৃশ্য কাব্য দর্শন পূর্ব্বক রোমাঞ্চিত শরীরে অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে পার্শ্বস্থ ব্যক্তির নিকট মনের সরল ভাব ব্যক্ত করিতেছে, মাঝখান হইতে অনিমন্ত্রিত অনা-হূত এক জন সংশয়বাদী বলিয়া উঠিলেন, "রাধা ত কবিকল্পনা! ইতিহাসে ভাগবতে রাধিকার নাম গন্ধও পাওয়া যায় না!" "কি উপসর্গ! তুমি কে হে বাপু? এত দিনের রাধা ঠাকুরাণীকে তুমি কিনা দুই একখান মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবত পড়িয়া একবারে ঠাকুর ঘর হইতে তাড়াইয়া দিতে চাও? যাহার বসতবাটীর দলীল নাই, সে যদি বিশ বৎসর নির্ব্বিবাদে সে স্থান দখল করিয়া আসিতেছে, এমন প্রমাণ হয়, তাহা হইলে কাহার সাধ্য তাহাকে সেখান হইতে তাড়ায়?

আর এই রাধারাণী, যিনি শত শত বৎসর ধরিয়া রাসমঞ্চে, দোলমঞ্চে, রথে ক্রমাগত শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্রের বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, এক দিনের জন্যও বাপেরবাড়ী কি কুটুম্ব ভবনে যান নাই, তাঁহাকে কি না তুমি উড়াইয়া দিতে চাও? কি ভয়ানক সাহসের কথা। স্ত্রীলোক অবলা ববিয়া কি এই অত্যাচার? রাধিকার অস্তিত্ব যদি লোপ হয়, তবে আর কৃষ্ণের রহিল কি? কোন একটা ঘৃণার ভাব মনে আসিলে এখনো পর্য্যন্ত আমরা "উ হুঁ হুঁ! রাধাকৃষ্ণ! রাধাকৃষ্ণ!" বলিয়া আন্তরিক ভাব ব্যক্ত করি। সেই রাধা একবারে নাই, এ কথা তোমরা মুখে আন কি প্রকারে? বরং কৃষ্ণ বিহনে বৃন্দাবন-বাসীদের এক আধ দিন চলে, রাধা প্রেমময়ী বিনা মুহূর্ত্ত কালও চলিতে পারে না। রাসলীলা, বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, এ সকল তবে কোথা হইতে আসিল?" সংশয়বাদী এক কথা বলিয়া একবারে যেন বৃন্দাবনে আগুন লাগাইয়া দিলেন। এত কালের পরব পার্ব্বণ, যাত্রা নাটক, কথকতা তবে উঠিয়া যাউক! তোমার ইতিহাসে বাধিকার নাম থাক, আর নাই থাক, রাধিকা আমাদের চাই। স্ত্রীলোক, বালক, সাধারণ জনসমাজ, কি' কাঠ চিবাইয়া বা পাথর গিলিয়া থাকিবে? হাজার বৎসর যাঁহাকে লোকে কৃষ্ণের পার্শ্বে দেখিয়া আসিতেছে, তাঁহার অস্তিত্ব এখন লোপ হইতে পারে না।

সংশয়বাদী অবিশ্বাসীর এই এক কথায় যদি ভারত-সমাজ খড়্গাহস্ত হয়, তবে আর দুই একটা কূট প্রশ্ন তুলিলে না জানি কি না ঘটিতে পারে। স্বয়ং কৃষ্ণের সম্বন্ধেও তাহাদের মধ্যে কারো কারো এইরূপ সন্দেহ আছে। তিনিও কতদূর ঐতিহাসিক, তদ্বিষয়ও ভয়ানক সংশয়স্থল। তাঁহার সংক্রান্ত প্রচলিত লীলা খেলা অধিকাংশই কল্পনা এবং ভুল, ইহা বলিতেও তাহারা কুণ্ঠিত নহে। মূলে যে শাস্ত্র মানে না, অতর্কিত বিশ্বাস ভক্তি ভাবুকতা যাহার নাই, সেত বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস ব্যতীত প্রতি পদে পদেই সন্দেহ করিবেই। প্রত্যক্ষ দর্শনকেও কত সময় তাহারা দৃষ্টিভ্রান্তি বলে। শাস্ত্র বচন, গুরুবাক্য একবার অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করুক, আর কোন সন্দেহ জন্মিবেনা। কিন্তু কুটিল-বুদ্ধি সংশয়বাদীর সে বিশ্বাস কৈ? তুমি ভাবুক বৈরাগী কিম্বা বিশ্বাসী হিন্দু, ধ্রুব প্রহ্লাদ দুইটী ভক্ত শিশুর মধুব প্রার্থনা স্তোত্র শুনিয়া, তাহাদের বাল্য সৌন্দর্য্য সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, কাঁদিলে, প্রেমভক্তিতে মাতিলে, সংশয়বাদী বলিল, "ও সব কবির কল্পনা। পাঁচ বৎসরের বালক কি কখন এরূপ ভক্ত হইতে পারে?" তুমি রাম সীতার পূজা করিয়া রামায়ণ পড়িয়া ভাবে প্রেমে গদ্গদ হইয়াছ, সংশয়বাদী বলিল, "একটু মদ্য পান করিলেও ওরূপ আনন্দ হইতে পারে। সকলি কল্পনার খেলা। আর কিছু দিন পরে দেখিবে, বঙ্কিম বাবুর কল্পিত কাব্যচরিত্র সকল দেব দেবীর মধ্যে গণ্য হইয়াছে। ভাবান্ধ জন সাধারণের উপর কবিদিগের কল্পনার কি সামান্য প্রভাব? ব্যাস বাল্মীকির ক্ষমতা কি কম? মিথ্যা কল্পনাকে তাঁহারা হিন্দু জাতির রক্তের মধ্যে এমনি বেগে চালাইয়া দিয়া গিয়াছেন যে, তাহা এখনো কত যুগান্তর চলিবে, কে বলিতে পারে। ইহা দ্বারা পৃথিবীর অনেক উপকার হইতেছে এবং হইবে, কিন্তু ভিতরে সব মিথ্যা! মিথ্যার

উপর পৌরাণিক পৌত্তলিক ধর্ম্ম-গৃহ স্থাপিত।"

পৌত্তলিক হিন্দু ভক্তদিগের সম্বন্ধে সর্ব্বসংশয়াত্মাদিগের এই কথা, কেবল তাহা নহে; নিরাকারবাদী জ্ঞানী ভক্তদিগের সম্বন্ধেও তাহারা এই রূপ বলে। বিধাতা অন্ন দিয়া ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলেন, বিপদে উদ্ধার করিলেন, বিশেষ কৃপা পাঠাইলেন, আদেশ প্রচার করিলেন, প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, উপায় বলিয়া দিলেন, ইত্যাদি কথাও ভ্রান্তিমূলক বলিয়া তাহারা উপহাস করে এবং বিশ্বাসী ভক্ত মাত্রকেই তাহারা নির্ব্বোধ কুসংস্কারান্ধ বলে।

কিন্তু ইহারা যাহাই বলুক, আর যাহাই করুক, দেশ কালের অতীত সার্ব্বভৌমিক পূর্ণ সত্য তাহাতে খণ্ডিত হইবে না। বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক বিশ্বাসের রাজ্যে যে সকল ভক্তি ভাবুকতার লীলা প্রকটিত হয়, তাহাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতেও পারিবে না। কারণ, তাহাতে অলৌকিক অস্বাভাবিক কিছুই নাই, সকলই সত্য ঘটনামূলক, বিজ্ঞান-সম্মত। সে যাহা হউক, এই শ্রেণীর লোক দ্বারা কিন্তু ভ্রান্তি, কল্পনা, কুসংস্কার বহু পরিমাণে অপনীত হইতেছে। ইহারা যাহা বলে, তাহা অতি নীরস, কিন্তু তাহাতে অভাব পক্ষের সত্য আছে? তদ্দ্বারা খাঁটি সত্য দর্শন সম্বন্ধে ইহারা অনেক সহায়তা করে। নির্ম্মল সত্যজ্ঞান বড় আনন্দজনক। মিথ্যা কল্পিত সংস্কারে যখন এত আনন্দ হয়, তখন সার সত্যের আনন্দ যে আরো অধিক হইবে, তাহা ত স্বাভাবিক। অতএব অবিশ্বাসী সংশয়াত্মা বিচারপ্রিয় কুটিলবুদ্ধি যে সকল কূট প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাহাতে কেহ ভীত হইও না। অবিশ্বাসীর ভয়ে সত্য জিনিষ ঢাকিয়া বা লুকাইয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই। ভ্রান্তি কুসংস্কারে তাহার গৌরব বাড়ে না; অবিশ্বাস সন্দেহে তাহার প্রকৃত মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য কমে না। সংশয়বাদীর নীরস সত্য জ্ঞানী বিশ্বাসীর নিকট সরস সত্যে পরিণত হয়। অকপটে নির্ভয়ে সত্য অনুসন্ধান কর। জ্ঞানময়ের প্রতি চাহিয়া থাক, তাঁহার প্রেরিত দিব্য জ্ঞানালোকে প্রকৃত সত্য, নিগূঢ়তত্ত্ব বাহির হইয়া পড়িবে। বহুকালের পোষিত বিশ্বাসে আঘাত লাগিবে, কি আমার সুখের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাইবে, আমি অবিচারে যাহা সত্য বলিয়া এতকাল মানিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে আমার হৃদয় শুকাইয়া যাইবে, এরূপ ভয়ে কি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া থাকিব? তবে আর জ্ঞান বিজ্ঞান, ন্যায় দর্শন, আলোচনা করিয়া কি ফল হইল? সত্যই সারজ্ঞান, সত্যই ভক্তিপ্রেম, সত্যই স্বর্গ এবং সত্যই স্বয়ং ভগবান। কূটপ্রশ্নে বা কুটিল তর্কে ইহার কিছুই করিতে পারে না, বরং তাহা দ্বারা সত্যবত্ন আরো সমুজ্জ্বলিত হয়। অন্ধ বিশ্বাস এবং অন্ধ ভক্তিতে মত্ত হইয়া থাকা যেমন অনিষ্টজনক, জ্ঞানবিচারে শুষ্ক কুতর্কে অবিশ্বাস সংশয় দ্বারা আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ স্বভাব-সম্ভূত সার্ব্বভৌমিক পূর্ণ সত্যের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন তেমনি ভয়ানক। প্রকৃত সত্যপ্রিয় জ্ঞানী ইহার মধ্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সরস সুন্দর সারভূত সত্যের উপাসক হইবেন, সত্যের প্রত্যক্ষ প্রেমলীলা বিজ্ঞান-নয়নে দেখিবেন। বিশ্ববৃন্দাবনে, প্রতি নরনারীর জীবনে সেই দেবতার নিত্যলীলা হইতেছে।

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা।

উৎকল-ভ্রমণ।

পুরীর শ্রীমন্দির।

সন্ধ্যার সময়, বিজয় বাবু, পুরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইতে লইয়া গেলেন। বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র, পুরীর একজন সম্ভ্রান্ত উকীল। ইহার বাসাতে প্রত্যহ অনেক বন্ধুর সম্মিলন হয়। বন্ধুগণ সকলে, সেই সাগরতীরে, অতি দূর দেশে, যেন এক পরিবার-ভুক্ত—একের সুখ দুঃখে যেন অপরের সুখ দুঃখ। পোষ্ট-মাষ্টার বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন, জে'লার বাবু নগেন্দ্র কুমার ঘোষ, ডাক্তার বাবু সাতকড়ি মিত্র, প্রধান শিক্ষক বাবু শশধর রায়, বাবু পূর্ণচন্দ্র আঢ্য, বাবু লোকনাথ মিশ্র প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইহারা সকলেই সদাশয়, মিষ্টভাষী, সহৃদয়, এবং সচ্চরিত্র। যেমন কটক, তেমনি পুরী। স্বদেশীয় বন্ধুবর্গ এই দূর দেশে সচ্চরিত্রতার জন্য সকলের নিকট সম্মান পাইতেছেন দেখিয়া, প্রাণে যারপর নাই আনন্দ লাভ করিলাম।

সেই রাত্রেই সেই প্রলুব্ধ অসহায়া রমণীদিগের কথা বন্ধুদিগের নিকট বলিলাম। সমস্ত কাহিনী শুনিয়া সকলেই উত্তেজিত হইলেন। পাণ্ডারা বাঙ্গালী হিন্দু পরিবারের জাতি ধর্ম্ম বিলোপ করিল, এই কথা বলিয়া, সকলেই আক্ষেপ করিলেন। অনেকেই পাণ্ডাদের দুর্ব্বৃত্ততার দুই একটী উদাহরণ ব্যক্ত করিলেন। সকলেই প্রতিবিধানে বদ্ধ-প্রতিজ্ঞ হইলেন। সহৃদয়তার এমন জীবন্ত ছবি, আমি আর কোথাও দেখি নাই। সেখানকার সকলেই যেন একাত্মক। বিজয় বাবু সকলেরই ভালবাসার জিনিস। দেখিলাম, ভাবিলাম এবং আশ্চর্য্য হইলাম। পরদিন প্রাতে রমণীদিগের অনুসন্ধানে বাহির হওয়া যাইবে, ধার্য্য হইল। রাত্রেই সংবাদাদি লইবেন, কোন কোন বন্ধু ভার লইলেন।

পুরীর সাগর—সৌন্দর্য্যের অনন্ত প্রস্রবণ, পূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছি। পুরীর শ্রীমন্দির অলৌকিক ব্যাপার পরিপূরিত এক দ্বিতীয় সৌন্দর্য্যের সাগর। অনন্ত সাগরের তীরে এও এক অনন্ত সাগরবৎ অনুপম কীর্ত্তি। শ্রীমন্দিরের সীমা আছে বটে, কিন্তু ভাব রাজ্যে, জ্ঞান রাজ্যে, চিন্তা রাজ্যে ইহা অসীম। সীমায় অসীম, সান্তে অনন্ত—পুরীর মন্দিরে এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

পুরীর জগন্নাথদেব, কথিত আছে, ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হন। অনেক দর্শন এবং অদর্শনের পর যযাতি কেশরীর দ্বারা ৪০৯ শকাব্দে জগন্নাথ দেব পুনঃ সংস্থাপিত হন। তার পর অনঙ্গ ভীমদেব ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার সিংহাসনারূঢ় হইয়া বর্ত্তমান পুরীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। মন্দির নির্ম্মাণে ১৪ বৎসর-ব্যাপী সময় লাগিয়াছিল। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। প্রবাদ এই রূপ, তিনি আরো ৬০টী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় শ্রীদারুব্রহ্ম নামক পুস্তকে জগন্নাথ দেবের ইতিহাস সম্বন্ধে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন. পৌরাণিক মত, উৎকল দেশীয় মত, বৌদ্ধ গ্রন্থের মত, দাঁতবংশের মত লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

"জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের আকৃতির সহিত কোন হিন্দু দেবমূর্ত্তির বিন্দু মাত্রও সাদৃশ্য নাই। পক্ষান্তরে বৌদ্ধদিগের স্তূপের সহিত ইহার বিশেষ রূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বৌদ্ধগণ, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, এই তিনটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া কুসুমরাশি দ্বারা তাহা সজ্জিত করতঃ উপাসনা ও বন্দনা করিত। এজন্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ত্রিমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছিল। এস্থলে ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষের একত্র সমাবেশ রূপ কল্পনা করিয়া দুই যুগল রূপের পূজা করাই এদেশের চিরন্তন পদ্ধতি। হিন্দুগণ সর্ব্বত্রই হরের সহিত লক্ষ্মী মূর্ত্তি সংযোজিত করিয়া পুরুষের একত্র পূজা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কুত্রাপি এরূপ ভ্রাতা ভগিনীর একত্র পূজা প্রচলিত থাকাব প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" (শ্রীদারুব্রহ্ম, ৫৪ পৃষ্ঠা)

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ রূপ ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে আমরা কৈলাস বাবুর এই অপূর্ব্ব শ্রীদারুব্রহ্ম গ্রন্থ খানি একবার পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এরূপ গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। জগন্নাথ দেবের গঠন ও আকৃতি এবং পুরীর অন্যান্য সমস্ত বিশেষ ব্যাপার অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল পরাক্রম খর্ব্ব করিয়া ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দ্বারাই জগন্নাথ দেব প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবেন। শঙ্কর মঠ নামে পুরীতে একটী মঠ আছে। শঙ্করাচার্য্য পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন, ইহাতে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনিই বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধীগণের অগ্রণী। কিন্তু যাহাই হউক, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান মূল মন্ত্র অদ্যাবধিও পুরীতে অব্যাহতরূপে প্রতিপালিত হইতেছে। অহিংসা পরম ধর্ম্ম—জগন্নাথদেব অদ্যাবধিও জগতে এই কথা, অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা ঘোষণা করিতেছেন। জাতিভেদ প্রথা জগন্নাথক্ষেত্রে নাই—আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ, সকলে একত্রে প্রসাদ উপভোগ করিলেও জাতি যায় না। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের অক্ষয় দ্বিতীয় চিহ্ন। বৌদ্ধধর্ম্মের তৃতীয় চিহ্ন, পুরীর সৈকতময় বক্ষে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুষ্করিণী খনন করিয়া লোকের জলকষ্ট নিবারণ করা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের নিম্নলিখিত উপদেশ যাঁহারা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা পুরীতে গমন করিলে দেখিতে পাইবেন—জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম—বৌদ্ধধর্ম্মেরই পরিণতি।

বুদ্ধদেব বলিয়াছেন।—

"ক্ষমাই এ জগতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।"

"স্বভাবই মনুষ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্পত্তি।"

"ক্রোধ ও হিংসাকে পরিত্যাগ কর।"

"কাহাকেও দুর্ব্বাক্য দ্বারা বিদ্ধ করিওনা।"

"অবিদ্যাই অন্ধকার স্বরূপ।"

"দীন দুঃখী ও তৃষ্ণাতুরকে অন্ন, জল ও বস্ত্র প্রদান কর।"

"নদীবক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দেও।"

"মনুষ্য পশু ইত্যাদির জন্য পথ পার্শ্বে জলাশয় খনন কর।"

"যজ্ঞার্থে কিম্বা উদর পরিতোষ জন্য কখনও জীব হত্যা করিও না।"

"পরের দ্রব্য অপহরণ করিও না।"

"পরদার করিও না।"

"মিথ্যা কথা বলিও না।"

"মাদক দ্রব্য সেবন করিও না।"

জগন্নাথ ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, অহিংসা-প্রধান। ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ;—ক্রোশ-ব্যাপী মন্দির-প্রাচীরের মধ্যে অসংখ্য দেব দেবীর মন্দির সংস্থাপিত রহিয়াছে। শুনিয়াছি, পূর্ব্বে এখানে বলিদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না। শাক্ত ধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সমন্বয় করিবার জন্য নায়-

পুর (যজ্জপুর). হইতে পার্ব্বতী মূর্ত্তি আনিয়া এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। মহাষ্টমীর দিন জগন্নাথ যখন নিদ্রিত হন, সেই সময়ে এখানে বলি প্রদান হইয়া থাকে। বস্তুত পরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ যাহাই করুন, জগন্নাথ দেব যে অহিংসা-পরায়ণ দেবমূর্ত্তি বলিয়া পরিকল্পিত, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কেহ কেহ বলেন, চৈতন্যের আগমনের পূর্ব্বে এখানে ভোগের প্রথা ছিল না। এ কথা কত দূর প্রামাণিক, বলিতে পারি না। আমাদের নিকট এ কথার সত্যতা কিছু জটিল সন্দেহে আচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল।

"স্থাপত্য-কার্য্যে পুরীর মন্দির জগতে অদ্বিতীয়," বঙ্গবাসী এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন।* আমরা এ কথা স্বীকার করি না। পারিস নগরের এফেল টাউয়ার প্রভৃতির কথা এখানে তুলিতে ইচ্ছা করি না। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সহিত কারুকার্য্যে পুরীর শ্রীমন্দিরের কোন প্রকার তুলনা হইতে পারে না। যাঁহারা উভয় মন্দির দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন। তুলনায়, পুরীর মন্দিরকে কারুকার্য্যহীন বলিলেও অধিক বলা হয় না। এই শ্রীমন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অনেক পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু পুরীর শ্রীমন্দির অপেক্ষাকৃত কিছু উচ্চ বলিয়া মনে হয়। পুরীর মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ;—কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষাও ইহা অনেক উচ্চ। কলিকাতার মনুমেণ্ট মাত্র ১১০ হাত উচ্চ। সাগরের প্রায় একমাইল দূরে, প্রধান রাজপথের পশ্চিমে মন্দির প্রতিষ্টিত। মন্দির দুই স্তর প্রাচীরে বেষ্টিত। পূর্ব্বে কেবল এক স্তর মাত্র অনুচ্চ প্রাচীর ছিল। মন্দির নির্ম্মাণের তিন শত বৎসর পরে পুরুষোত্তম দেবের রাজত্বকালে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ভয়ে উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মিত হয়। ইহার নাম, মেঘনাদ প্রাচীর। প্রাচীর প্রায় ২০।২৫ ফুট উচ্চ হইবে। এই প্রাচীর থাকায়, বাহির হইতে মন্দিরের শ্রী-শোভা দেখা যায় না। প্রাচীরের বাহিরে সমুদ্রের তরঙ্গ-নির্ঘোষ শুনিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ছাদের উপর না উঠিলে ভিতরে কিছুই শোনা যায় না।

বহিঃপ্রাচীরে ৪টী ফটক আছে। পূর্ব্ব দিকের ফটকটী বড়ই জাঁকাল। এইটীই সিংহদ্বার, এ ফটকে নানাবিধ গঠিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। চারিটী ফটকের চারি নাম। পূর্ব্ব "সিংহদ্বার," উত্তর "হস্তীদ্বার," দক্ষিণ "অশ্বদ্বার," পশ্চিম "খঞ্জদার।" "সিংহদ্বারে সিংহমূর্ত্তি, "হস্তিদ্বারে" হস্তিমূর্ত্তি ও অশ্বদ্বারে "অশ্বমূর্ত্তি" প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিম দ্বারে কোন মূর্ত্তি নাই।

পূর্ব্বদ্বারের সম্মুখেই "অরুণস্তম্ভ।" এই অতি মনোহর, অত্যাশ্চার্য্য কারুকার্য্যপূর্ণ স্তম্ভটী কণারকের উজ্জ্বল চিহ্ন, বহু টাকা ব্যয়ে এখানে আনীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অরুণ-স্তম্ভের অঙ্গ যে কি অপরূপ কারুকার্য্যে ভূষিত, তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

যাঁহারা শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দির স্বচক্ষে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন,—তাঁহারাই বলিতে পারেন,—মন্দিরের কি অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল। কেমন যে সুন্দরভাবে, সুশৃঙ্খলা-বন্দোবস্তে পাকশালা, ভোগমন্দির, নৃত্য-শালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত; তাহা যে না দেখিয়াছে, সে তাহার মর্ম্ম কি বুঝিবে।

অধিষ্ঠান-মন্দির, জগমোহন, নাট-মন্দির, ভোগ-মন্দির, রন্ধন-শালা, নৃত্য-শালা প্রভৃতি

* ১২৯৭ সালের ৭ই বৈশাখের বঙ্গবাসী দেখ।

লইয়া ক্রোশব্যাপী মন্দির-ক্ষেত্র। বড় বড় মন্দিরগুলি প্রায় সমস্তই প্রস্তর নির্ম্মিত। পুরীর মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ—এত উচ্চে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড সকল কি রূপে উত্তোলিত হইয়াছে, অনেক ইংরাজ সবিস্ময়ে একথা জিজ্ঞাসা করেন। জনপ্রবাদ এইরূপ, এক খান প্রকাণ্ড প্রস্তর ফলক একবার শ্রীমন্দিরের গাত্র হইতে পতিত হইয়াছিল, তাহা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায় নাই। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভবও বটে। শুনিলাম, মন্দির কতক দূর নির্ম্মিত হইলে বালুকা দ্বারা তাহাকে প্রোথিত করা হইত, তৎপরে বালুকা রাশির উপরে আবার নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিত। এইরূপ করায় সময়ে সময়ে মন্দির অদৃশ্য হইয়া যাইত এবং পরবর্ত্তী লোকের চেষ্টায় আবার আবিস্কৃত হইত। এ সকল কথা কত দূর সত্য, বলা যায় না। নির্ম্মাণ-কৌশল এত আশ্চর্য্য যে, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত বলিয়া যে জনপ্রবাদ আছে, তাহা সাধারণ লোকে উড়াইয়া দিতে পারে না। অরুণস্তম্ভের ন্যায় কণারকের আরো অনেক কারুকার্য্য-পূর্ণ প্রস্তর মূর্ত্তি এখানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কারুকার্য্যে কণারকের সূর্য্যমন্দির অদ্বিতীয়। অল্প মাত্র তাহার নমুনা যাহা ভোগমন্দিরের গাত্রে দেখিয়াছি, তাহাতেই মোহিত হইয়াছি। প্রস্তর-খোদিত এক একটী মূর্ত্তি ৩।৪ ঘণ্টা ধরিয়া দেখিলেও দেখার সাধ মিটে না। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের পশ্চাতে তিন দিকে যেরূপ, পার্ব্বতী, গণপতি ও কার্ত্তিকেয়ের অপূর্ব্ব প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি সংলগ্ন রহিয়াছে, পুরীর শ্রীমন্দিরের পশ্চাৎ তিন ধারের গাত্রে, সেইরূপ নৃসিংহ, বামন ও কল্কি অবতারের তিন বিরাট মূর্ত্তি সংলগ্ন। এরূপ প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি যাযপুর ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় কি না, সন্দেহ। এতদ্ভিন্ন পুরীর শ্রীমন্দিরের তিন দিকের গাত্রেই অসংখ্য অশ্লীল ছবি অঙ্কিত ও খোদিত রহিয়াছে। ভ্রাতা ভগ্নী, পিতা কন্যা, স্বামী স্ত্রী মিলিয়া—সে সকল কদর্য্য ছবি দেখা যায় না। মানুষের চিন্তায়ও তাহা স্থান পাওয়া সম্ভবে না। স্ত্রী পুরুষের বিবিধ রূপ সঙ্গমের জীবন্ত ছবি মন্দির-গাত্রে দেদীপ্যমান*। এ সকল ছবির ইতিহাস কি, বুঝিতে পারিলাম না, কেহ ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে পারিল না। জগন্নাথদেবের রথবিহারের জন্য আর একটী মন্দির, ঠিক এই মন্দিরের অনুরূপে, দূরে নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহার নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এই মন্দিরের অশ্লীল ছবি পরিদর্শন করিয়া আমাদের ছোট লাট বেলী সাহেব অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে, ধর্ম্মমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে এরূপ কদর্য্য ছবি সকল কেন অঙ্কিত হইয়াছে, বুঝা ভার। কেহ কেহ বলিলেন, এবং আমাদেরও বোধ হয়, এ সকল ছবি অনেক পরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। তখনকার রুচি ইহাতে প্রকাশ পায়। কেহ কেহ বলিলেন, এই সকল দেখিয়াও যাহাদের মন বিচলিত হয় না, তাহারাই প্রকৃত জগন্নাথ দর্শনের অধিকারী। সেরূপ অধিকারী কয় জন আছেন, জানি না। সে সকল দেখিয়া লজ্জায় মুখ অবনত করে

* আমরা পুরীর মন্দিরের কদর্য্য ছবির ব্যাখ্যা করিয়াছি বলিয়া সহযোগী বঙ্গবাসী আমাদিগকে প্রকারান্তরে গালি দিয়াছেন। আমরা "মূর্খ"—সুতরাং পাণ্ডিত্যাভিমানী" বঙ্গবাসীর সহিত তর্ক বিতর্ক করা আমাদের পক্ষে সাজে না।

না, সেখানে অতি অল্প লোক। তবে অবশ্য, "বঙ্গবাসীর" কথা আমরা বলিতে পারি না। সন্ধ্যার পর পুরীর মন্দিরে গমন করিলাম। বাহিরে পাদুকা রাখিয়া মন্দির-প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, বহু লোক ভোগ বিক্রয় করিতেছে। এতদ্ভিন্ন অনেক লোক ঘৃত দীপ সাজাইয়া বিক্রয় করিতেছে। আমরা নাটমন্দির হইয়া জগমোহনে (Hall of audience) যাইলাম। মন্দির ৪ অংশে বিভক্ত, (১) শ্রীমন্দির, (২) জগমোহন, (৩) নাটমন্দির, (৪) ভোগমন্দির। সেখানকার জনতা ভেদ করে, কার সাধ্য। সময়ে সময়ে সেখানে মানুষ পেষিত হইয়া যায়। দোল ও রথ যাত্রার সময় জনৈক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিস সাহায্যে শান্তি রক্ষা করেন। আমরা অতি কষ্টে জনতা ভেদ করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলাম। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম—প্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট। মন্দির অন্ধকারময়, দিবসেও বাতি জ্বালিতে হয়। উড়িষ্যার মন্দির সমূহের ছায়াতে আসামের মন্দির সমূহ নির্ম্মিত। উভয় দেশেই মন্দিরের অভ্যন্তর গভীর অন্ধকারময়। শ্রীমন্দিরে প্রবেশের একটী মাত্র দ্বার—তাহার সম্মুখে জগমোহন, তার পর নাট্য-মন্দির, তার পর ভোগমন্দির ইত্যাদি। সূর্য্যালোকের সাধ্য কি, সে সূচিভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে। অহোরহ ঘৃতের প্রদীপ জ্বলিতেছে। তাহার সাহায্যে আমরা মূর্ত্তি দেখিলাম। পুরীর ভোগমন্দির লক্ষ লোকের আহার যোগাইতে সমর্থ। এ এক অলৌকিক ব্যাপার, ৬০০০ লোক এই কাজে সমস্ত বৎসর নিযুক্ত থাকে। জগন্নাথের প্রসাদে বিশ: সহস্র লোক সমস্ত বৎসর জীবন ধারণ করে। শ্রীক্ষেত্রে ২৪টী উৎসব হয়, তন্মধ্যে দোল ও রথ যাত্রাতেই অধিক যাত্রীর সমাগম হয়। এই উভয় উৎসবের মধ্যে রথযাত্রাতেই অধিকতর যাত্রী উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশের লোক এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন মহাত্মা "পেরিশ মহামেলাকে পৃথিবীর ছবি" বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রকে আমরা, সেইরূপ, ভারতবর্ষের প্রতিরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি। এ তীর্থের পবিত্র সংস্পর্শে না আসিয়াছে, ভারতবর্ষের অসংখ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ সম্প্রদায় নাই। পুরীর রথযাত্রা, এক অলৌকিক ব্যাপার। প্রতি বৎসর নূতন রথ প্রস্তুত হয়। রথ খানি ৪৫ ফিট উচ্চ হয়। ৪২০০ বেতনভোগী লোকের সাহায্যে রথ গমন করেন। সুতরাং কত কাষ্ঠের সাহায্যে যে তাহা নির্ম্মিত, অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে। শুনিলাম, রথ-নির্ম্মাণের কাষ্ঠের জন্য অনেক অরণ্য রক্ষিত রহিয়াছে।

পুরীতে যে ৫টি মহা তীর্থ আছে, তাহাদের নাম নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, সমুদ্র, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও চক্রতীর্থ। এতদ্ভিন্ন পুরীর প্রধান ধর্ম্মালয়—লোকনাথ, চৈতন্যের মঠ, স্বর্গদুয়ার, শঙ্কর মঠ, তোটাগোপীনাথ। এ সকল সম্বন্ধে অল্পাধিক পরিমাণে কিছু কিছু পরে বলিব।

একটা বড় বিস্ময়কর ব্যাপার শ্রীক্ষেত্রে দেখা যায়। জগন্নাথের সেবার জন্য এক দল বেশ্যা রক্ষিতা আছে। বাঙ্গালায় যেমন পুরোহিত শ্রেণী, পুরীতে জগন্নাথের বেশ্যা-শ্রেণী সেইরূপ সম্মানের জিনিস। রথ যাত্রার সময় মন্দিরের সম্মুখে ইহারা পাল্টা বাদ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। ধর্ম্মমন্দিরে বেশ্যার এরূপ অধিকার আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কেমন করিয়া এই প্রথার আবির্ভাব

হইয়াছে, অনুমান করা কঠিন। বোধ হয়, ইন্দ্র সভার অনুকরণে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা হউক, ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, এই বেশ্যাশ্রেণী সমাজে বিশেষরূপ আদৃতা হইয়াছে, ইহাদের দ্বারা বহু লোকের ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতেছে। পুরীর প্রধান পাণ্ডাগণের দূষিত চরিত্রের কারণ যে ইহারা নহে, তাহাই বা কেমনে বলিব? পুরী—শ্রীক্ষেত্র, কিন্তু হিসাবান্তরে পুরী অধর্ম্মের লীলাস্থল। পুরী-তীর্থ হইতে চরিত্র ও কুলধর্ম্ম বজায় রাখিয়া যে সকল যাত্রী আসিতে পারেন, তাহারা নারী হইলে দেবী, পুরুষ হইলে দেবতা। শুনিয়াছি, পুরী ব্যভিচার-দোষে প্লাবিত। তীর্থ সমূহের এই রূপ কদর্য্য কথা শুনিলে প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে। ভারতবর্ষের তীর্থগুলি এখন অধর্ম্মের লীলাস্থল হইয়া ভারতের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে।

দ্বিতীয় দিন প্রত্যূষে আমরা ৩।৪টী বন্ধু মিলিয়া সেই রমণীগণের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। কলিকাতা হইতে টেলিগ্রাম পাইয়াছি, তাঁহারা পলায়ন করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং এখন আর মিথ্যা চলিবে না। পূর্ব্ব রাত্রে যাঁহাদের উপর সংবাদ লওয়ার ভার ছিল, তাঁহারা সংবাদ দিলেন যে, ওমুক স্থানে তাঁহারা আছেন। যাত্রী-দিগের গৃহের তালিকা আছে, কোন্ গৃহে কোথা হইতে কে আসিয়া বহিয়াছে, পরিদর্শকগণ তাহার বিবরণ সংগ্রহ করেন। ভোগ পরিদর্শনের জন্য, যাত্রী নিবাস পরিদর্শণের জন্য, উৎসবের সময় মন্দির রক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, পালাক্রমে, পুলিসের সাহায্যে মন্দিরের শান্তি রক্ষা করেন। এ সকল বন্দোবস্ত অতি সুন্দর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঘুষ নামক যে একটা পদার্থ আছে, তাহার আকর্ষণের হাত এড়ান বড়ই কঠিন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের সুন্দর বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও পচা ভোগ বাজারে বিক্রয় হয়, যাত্রী-নিবাসে ১০ জনের স্থানে ২০ জন স্থান পায়, ইত্যাদি। আমরা নির্দ্দিষ্ট গৃহে গমন করিলাম। লোকেরা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ব্যাপার কি? রমণী চতুষ্টয় তখন তীর্থ করিতে গিয়াছেন, অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করিলাম, তবুও সাক্ষাৎ হইল না। ইত্যবসারে আমরা কালীর মন্দির দর্শন করিয়া আসিলাম। আসিয়াও তাঁহাদিগকে পাইলাম না। প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথার উপর চড়িল—রাস্তার বালুকারাশি উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তবুও তাঁহারা তীর্থ হইতে ফিরিলেন না। অগত্যা ভগ্নমনে প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আর আর কথা পরে বক্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ও ব্রাহ্মধর্ম্ম। (৪)

বঙ্কিম বাবু, ভক্তির বিশদ ব্যাখ্যা করিবার সময়ে, পূজা, হোম, যজ্ঞ, নামসংকীর্ত্তন সন্ধ্যা বন্দনাদি সম্বন্ধে এক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন—"তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন যাহা, তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম,

সেই পূজাদি করিবে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বর চিন্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্য-ভক্তির লক্ষণ। আর "আমার পাপ স্খলিত হউক, আমার সুখে দিন যাউক," ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যা বন্দনা, স্তুতি বা Prayer, গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য। বঙ্কিম বাবুর এই বিস্তৃত ও বিশদ ধর্ম্ম ব্যাখ্যার মধ্যে প্রার্থনাদি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, এই স্থলে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত তাঁহার মতের গভীর পার্থক্য রহিয়াছে। স্বাভাবিক প্রার্থনা, ধর্ম্মজগতের একটা দুর্জ্জয় শক্তি বিশেষ। ক্ষুদ্র সসীম ব্যক্তি, অনন্যগতি হইয়া, যখন অসীম অনন্ত শক্তির নিকট কাতরে কৃপা প্রার্থনা করে, তখন তাহাকে কেহই উড়াইয়া দিতে পারেন না। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে দেখিয়াছি—সরল প্রার্থনাই ধর্ম্ম জীবনের—ভক্ত জীবনের এক মাত্র বস্তু, যাহার বলে মানুষ জগতে অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ। ইহাকেই জগতের লোকেরা Miracle বলিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুও প্রকারান্তরে এ কথা স্বীকার করিয়াছেন—তিনি বলেন, "অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত, ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে যে, অস্ত্র নিষ্ফল হয়।" এই যে ঈশ্বর কৃপা লাভ, ইহা ঐকান্তিকী প্রার্থনার অবশ্যম্ভাবী ফল। সকল প্রার্থনার সার প্রার্থনা, ধর্ম্মের উচ্চসোপানে—"তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক—অথবা "Thy will be done," ইহার মধ্যে সমস্ত ভক্তিতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। সমস্ত বৃত্তি অনুশীলিত হইয়া যখন সিদ্ধির অবস্থায় মানুষ উপস্থিত—যখন তিনি ও ভক্ত একত্রে, তখনও এরূপ প্রার্থনা স্বাভাবিক। কেননা, তিনি যে প্রভু, আমি যে দাস, তিনি যে মহান্, আমি যে ক্ষুদ্র! ভিক্ষা না করিলে আমার দিন যাইবে কেন?—না চাহিলেও তিনি দিবেন বটে. কিন্তু তাহাতে আমার চাহিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি লোপ হইবে কেন? আমি চাহিব,ইহা আমার প্রাণের বিশেষ ভাব; তিনি দেন, ভালই; না দিলেও চাহিব। কেননা, না চাহিয়া ত পারি না। আমার অভাব যে অনন্ত—তাহা পূরণের আর ত কোন উপায় দেখি না। আমার একমাত্র উপায় যে তিনি! করযোড়ে, প্রাণ মনের সহিত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট বলিতেন—"দ্বারে আঘাত কর, দ্বার মুক্ত হইবে,—চাও, পাইবে।" প্রার্থনাকে গৌণ ভক্তি বলায় বঙ্কিম বাবুর আধ্যাত্মিকতার কিছু স্থূলদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। ধর্ম্ম জগতে এমন ভক্তের কথা আজ পর্য্যন্ত শুনি নাই, যিনি প্রার্থনা-পরায়ণ ছিলেন না। বিষ্ণুপুরাণ হইতে বঙ্কিম বাবু প্রহ্লাদ চরিত্রে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রহ্লাদের কামনা নিষ্কাম ছিল। আমরাও প্রতিপন্ন করিতে পারি—মানুষের "প্রার্থনা"ও নিষ্কাম হইতে পারে। কেবল তাঁহাকে পাইবার জন্য যখন কাতরে প্রার্থনা, করে, অর্থাৎ যখন মানুষের অন্য কামনা রহিত হয়, তিনিই লক্ষ্য হন, তখনই প্রার্থনা নিষ্কাম। আমি যা চাই, সে সকলেরই লক্ষ্য ঈশ্বর হইতে পারেন। সুতরাং মানুষের সকল প্রার্থনাকেই নিষ্কাম বলিব, তাহাতে আর বাধা কি? সকল কামনা যখন তাঁহাতে সংন্যস্ত, তখনই ত প্রকৃত ভক্তির উদয়। আমরা অতি ক্ষুব্ধচিত্তে

বলিতে বাধ্য হইতেছি—বঙ্কিম বাবু প্রার্থনা রূপ ধর্ম্মের সরল, মধুর রাজ্যে এখনও বুঝিবা পৌছিতে পারেন নাই। তবে এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত নহি যে, ব্রাহ্মসমাজে যে মুখস্থ মন্ত্রের ন্যায় প্রার্থনা "অন্ধকার হইতে আলোতে ইত্যাদি" করা হয়, তাহা সারধর্ম্ম বা ভক্তির অনুমোদিত না হইতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে এ প্রদেশে এক দল ভূঁইফোড় হিন্দুধর্ম্মবিৎ দ্বিগ্‌গজ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা উপন্যাসকে উপন্যাস বলিতে, কাব্যকে কাব্য বলিতে কুণ্ঠিত। মহাভারত, রামায়ণে যে ইতিহাসের ছায়া অতি অল্প, এ কথা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিযাছি; সম্প্রতি এই কথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করায়, অদ্বিতীয় দেশহিতৈষী, পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহাত্মা রমেশচন্দ্র ছেলে মহলে অনাদৃত হইযাছেন,—অর্থাৎ টেক্ষ্ট-বুক-কমিটীর ধুরন্ধবগণের যোগে, বঙ্গবাসী-প্রমুখ হিন্দুর দল, আপন আপন ইতিহাস কাটতির হ্রাস হেতু, একটা বিরাট আন্দোলন তুলিযা রমেশ বাবুর ভারতবর্ষের ইতিহাস খান স্কুল হইতে তুলিয়া দিতে সমর্থ হইয়া দেশে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছেন! প্রকৃত ইতিহাস-শূন্য এই হতভাগ্য দেশে কেবল দুই খানি ইতিহাসের অঙ্কুর জন্মিয়াছিল—৺রাজকৃষ্ণের বাঙ্গলার ইতিহাস ও রমেশচন্দ্রের ভারতবর্ষের ইতিহাস। কিন্তু হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী। এ দেশে তাহা আদৃত হইবে কেন? খোসামুদী, ঘুষ, ও ভালবাসার মায়ার কুহকে যে দেশের পুস্তক নির্ব্বাচক-সম্প্রদায় বশীভূত, সে দেশে এরূপ হইবে, বিচিত্র কি! বঙ্কিমচন্দ্র সাহসী পুরুষ—জ্ঞানী, প্রতিভাশালী। প্রতিভার নিত্য সহায় সাহস। কাপুরুষ প্রতিভাশালী লোক, কাঁঠালের আমসত্ত্ববৎ। সাহসী পুরুষ ভিন্ন কেহই জগতের কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে সাহসী প্রতিভাশালী ব্যক্তি কি বলিয়াছেন, শুন:—

"শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে।" ধর্ম্মতত্ত্ব—১৮৬ পৃষ্ঠা।

"ভগবদ্গীতায যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত।" ২০৫ পৃষ্ঠা।

বিষ্ণুপুরাণে যেরূপে প্রহ্লাদের কথা কথিত হইযাছে, ঠিক সেই রূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বলিযাই সেই বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি।" ২১০ পৃষ্ঠা।

"প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস, তদ্বিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্যাসে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপন্যাসে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময়ে অধিকতর স্পষ্ট হয়।" ২১১ পৃষ্ঠা।

"তারপর হিরণ্যকশিপু, সর্পগণকে আদেশ করিলেন যে উহাকে দংশন কর। কথাটা উপন্যাস; সুতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা করি তুমি বিরক্ত হইবে না।" ২১২ পৃষ্ঠা

শাস্ত্রের মর্ম্ম, ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব না বুঝিয়া বর্ত্তমান সময়ের লোক সকল সর্ব্বকর্ম্মী, সর্ব্বধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিম বাবুর এই উপদেশে তাঁহাদের আস্ফালনটা একটু কমিলে আমরা যারপর নাই সন্তুষ্ট হইব। দেখ, বিশুদ্ধ ভাষায়, তেজের সহিত, তারপর উদার ধর্ম্ম-পিপাসু বঙ্কিমচন্দ্র কি বলিতেছেন।—

"খ্রীষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্তর্গত। গড্ বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ... জ্ঞান ও

আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপাল জোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও, তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধম ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুয়ানি যায়।" ২২৩ ও ২২ পৃষ্ঠা।

আমরা গত বার ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, বঙ্কিম বাবু ভক্তির যেরূপ বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এরূপ আর শুনি নাই। কেহ কেহ এ কথাতে বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা জানি। তাঁহাদিগকে অধিক আর কি বলিব, তাঁহাদিগকে একবার অনুরোধ করি, এই গ্রন্থ খানি একবার পড়িয়া দেখুন। এমন উদার সার্ব্বভৌমিক ভিত্তির উপর বঙ্কিম বাবু ভক্তিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, তাহা অতি আশ্চর্য্য;—"যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই, অবস্থাই ভক্তি।" এই ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাতেই গ্রন্থ খানির আরম্ভ, ইহাতেই শেষ। এ স্থলে এ কথা না বলিলেও ক্রটী থাকিয়া যায় যে, বিষ্ণুপুরাণ হইতে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ভক্তির যে তারতম্য তিনি ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, তাহা অতি উদার ও অতি সুন্দর হইয়াছে। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে তাঁহার কথাটী কেবল তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম।

"যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছ উপাসনা দ্বিবিধ, সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম যে উপাসনা সেই কাম্য কর্ম্ম; নিষ্কাম যে উপাসনা সেই ভক্তি। ধ্রুবের উপাসনা সকাম,—তিনি উচ্চপদ লাভের জন্যই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্তি নহে, ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা নিষ্কাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্য ঈশ্বরে ভক্তিমান হয়েন নাই, বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান হওয়াতে বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও, তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই।" ২০১ পৃষ্ঠা।

ভক্তের লক্ষণ কি কি? এ সম্বন্ধে পৃথিবীতে অনেক মত ব্যক্ত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর মতগুলি সংক্ষেপে এখানে তুলিয়া দেখাইব, ব্যাখ্যা কত দূর সমীচীন হইয়াছে।

"ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—অনন্ত মঙ্গল অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন[illegible] তুষ্ট যে বৃত্তির উদ্দেশ্য, তাহার আ[illegible] কোথায়। ভক্তি শাসিতাবস্থাই সকল [illegible] সামঞ্জস্য।" ১৪৩ পৃষ্ঠা।

"স্থূল কথা এই, যে যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তে সকল কর্ম্ম সন্ন্যাসী, তিনিই ধার্ম্মিক।" ১৮৫ পৃষ্ঠা।

"তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নির্গুণ উপাসক, ও ঈশ্বরভক্ত, উভয়েই ঈশ্বর প্রাপ্ত হ[illegible] কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই, যে ব্রহ্মোপাসকেরা অ[illegible]তর দুঃখ ভোগ করে; ভক্তেরা সহজে উদ্ধৃত হ[illegible] ১৯৭ পৃষ্ঠা।

"যে মমতাশূন্য, অহঙ্কারশূন্য, যাহার সুখ দু[illegible] সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতাত্ম দৃঢ়-সঙ্কল্প, যে হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত, [illegible] বিষয়াদিতে অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ যিনি দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষার অতীত, যাঁহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোষ্ণ, সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আসঙ্গ-বিবর্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, সেই ভক্তই আমার প্রিয়।" গীতা ১২।১৩—২০।

"ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক্ ঠক্ করিয়া হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আপ

জয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সেই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্ত বৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে।" ২০০ পৃষ্ঠা।

তৎপরে ভক্তির সাধন সম্বন্ধে গীতার উপদেশ ব্যাখ্যাত করিয়া তিনি বলিতেছেন—"প্রথম সাধন, চিত্ত ভগবানে স্থির রাখা। (২) স্থির রাখিতে না পারিলে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য্য অভ্যস্ত করিবে। যাহারা ~~ করিতে পারে, তাহারা ঈশ্বরা- র্ম্ম করিয়া মন স্থির করিবে। অসমর্থ হইলে ভগবানাশ্রিত ়ম্ম করিবে। (৪) তাহাতে অশক্ত যতাত্মা হইয়া সর্ব্ব কর্ম্মফল ত্যাগ । এই চতুর্ব্বিধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। াহারা না পারিবে, তাহারা উপাসনাদি ব। "তবে কি গীতায় সাকার মূর্ত্তির নো বিহিত হইয়াছে?" শিষ্যের এ ব উত্তরে গুরু বলিতেছেন—"ফল াদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে তমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা ই। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, যেখানে দিবে, ়েই খানে তিনি পাইবেন।"

প্রতিমাদির পূজা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, অধিকার ভেদে নিষিদ্ধ এবং বিহিত। ভাগবত পুরাণ হইতে যে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,-তাহার ব্যাখ্যা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি, সর্ব্বভূতে ভূতাত্মা স্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রতিমা পূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে আত্মাস্বরূপ অনীশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।" ৩স্ক। ২৯অ। ১৭।১৮।—২৩৪ পৃষ্ঠা।

"যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মে রত, সে যতদিন না আপনার হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদি পূজা করিবে।"২৯অ।২০।—২৩৪পৃষ্ঠা।

তার পর বঙ্কিম বাবু বলিতেছেন—

"যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদির অর্চ্চনা বিড়ম্বনা। আর যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদির পূজা নিষ্প্রয়োজনীয়। তবে যতদিন সে জ্ঞান না জন্মে, তত দিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা অবিহিত নহে, কেন না, তদ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমা পূজা গৌণ ভক্তির মধ্যে।" ২৩৪ ও ২৩৫ পৃষ্ঠা।

"ঈশ্বর জগন্ময়; জগতের কাজই তাঁর কাজ। অতএব, যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্ম্মই কৃষ্ণোক্ত "মৎকর্ম্ম," তাহার সাধনে তৎপর হও এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও। তাহা হইলে যাঁহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম্ম, তাহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত হইবে।" * * * যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা, নামকীর্ত্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্ব্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহাড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা সর্ব্ব প্রকার সাধনের অভাবই ভাল।" ২৩৬ ও ২৩৭ পৃষ্ঠা।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বঙ্কিম বাবু যখন প্রতিমা পূজাকে গৌণ ভক্তির সাধনের উপায় মধ্যে ধরিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রতিমা পূজাকে একেবারে তুলিয়া দিয়াছেন, তখন উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় কই? এ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাই না। কেবল এই বলি—প্রতিমা পূজার অর্থ কল্পনার পূজা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম যতই মহান্ ও উন্নত হউক না কেন, এই কল্পনার হস্ত হইতে যে একেবারে নির্ম্মুক্ত, তাহা আমরা মনে করি না। জড় দেহধারী মানুষের পক্ষে কল্পনার অতীত হইতে পারা বড়ই কঠিন। যে, যে পরিমাণে জড়ের অতীত হইয়া চিন্ময় রাজ্যে বাস করে, সে সেই পরিমাণে কল্পনার অতীত হয়, অর্থাৎ সে সেই পরিমাণে চিন্ময়ের উপাসক বা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের স্বরূপ ব্যাখ্যার যে প্রণালী দেখা যায়, তাহা এই কল্পনারই ক্রীড়া মাত্র। স্বরূপতঃ ভগবানের সহিত যাহার সাক্ষাৎ হয়, সে আর তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না। এই জন্যই মহাজনেরা বলিয়াছেন যে, তিনি বাক্য ও মনের অতীত। বাক্যের অতীত যিনি, তাঁহার ব্যাখ্যা যে, প্রতিমা পূজার ন্যায় নিকৃষ্ট সাধনা, ইহাতে সংশয় কি? এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিয়া সকলের বিরাগভাজন হইতে চাহি না; তবে, বঙ্কিম বাবুর প্রতিমা পূজার ন্যায় নিকৃষ্ট পূজার হস্ত হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম সুরক্ষিত হউক, ইহাই প্রার্থনা।

বঙ্কিম বাবু যে ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে আর বিন্দু মাত্র সংশয় নাই। তিনি সরল ভাষায় বলিতেছেন—"সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে, সকল সময়ে, সোজা পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, দুই এক জন বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই বিহিত। এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেহ সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে। * * * অতএব সর্ব্ব প্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি করুণাময়—যাহাতে সকলের পক্ষে ধর্ম্ম সোজা হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।" ১৯৫ ও ১৯৬ পৃষ্ঠা।

উপসংহার।

বঙ্কিম বাবুর সার সার মতগুলি আমরা সংক্ষেপে দেখাইয়াছি। দুই স্থানে সামান্য একটু অমিল হইয়াছে;—প্রথম যুদ্ধার্থে সুরাপান এবং যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা এবং দ্বিতীয় প্রার্থনাকে ভক্তির নিকৃষ্ট অঙ্গ রূপে প্রতিপাদন। শেষোক্ত স্থলে বরং আমরা উদার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি—ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে প্রার্থনার প্রয়োজন না থাকিতেও পারে;—তখন "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" ইহাই সকল প্রার্থনার সার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু প্রথম স্থলে আমরা কিছু দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, এই সামান্য মতভেদে কিছু আসিয়া যায় না। আমরা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছি, প্রকারান্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মই তিনি প্রচার করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন চিন্তাযুক্ত কথা বলিতে হইলেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সমর্থন করিতে হইবে। বঙ্কিম বাবুর মত সমালোচন করিয়াছি বলিয়া কোন কোন ব্রাহ্ম ভ্রূ-কুঞ্চন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে আমাদের এক মাত্র অনুরোধ এই, বঙ্কিম বাবুর পুস্তক খানি সমস্ত পাঠ করেন। তবে এ কথাও বিনীত ভাবে স্বীকার করিতেছি, ব্রাহ্মধর্ম্মকে আমরা যেরূপ অর্থে বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি। এ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়া থাকি, সংবাদ পত্রের দ্বার অবারিত, সকলই আমাদের

প্রতিবাদ করিয়া ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতে পারেন।

আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বোধ হয়, [illegible]টী গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিয়াছি। [illegible] এই সমালোচনা করিতে অধিকারী কি না, জানি না। প্রাণের আবেগে,—অনেক যাচ্ছে-তায় মত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছি। তাহাতে কেহ প্রাণে আঘাত পাইয়া থাকিলে, আমাদিগকে ক্ষমা করেন, বিনীত অনুরোধ। তবে যাঁহারা, আমরা বঙ্কিম বাবুর অন্যায় প্রশংসা ঘোষণা করিয়াছি বলিয়া দুঃখিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা এই একটী কথা কেবল বলিতে চাই—আমরা তাঁহার প্রশংসা করিয়া ধন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও এ সম্বন্ধে আমরা কৃপণ। যে দিন প্রশস্থ হৃদয়ে প্রকৃত মহৎ ও গুণী ব্যক্তির প্রশংসা করিতে শিখিব, সে দিন আমরা এই পূতিগন্ধময়, হিংসাবিদ্বেষ পরিপূর্ণ সংসারের একটু উপরে উঠিতে পারিব। সে অবস্থা এখনও হয় নাই, তাই আমরা দুঃখিত। বঙ্কিম বাবু ধর্ম্মতত্ত্বের কেবল প্রথম ভাগ প্রকাশ করিয়াছেন, এখনও উত্তর ভাগ অবশিষ্ট আছে। আমরা তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। আজ কাল যদিও না হয়, আমাদের বেশ বিশ্বাস আছে, এক দিন না একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের এই "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রতি গৃহে অধীত হইবে। বঙ্কিমচন্দ্রের আর আর সমস্ত পুস্তকের সহিত ইহাও স্বর্ণাসন প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীচরণে।

বৃন্দাবনে রাধিকার
অনিবার হাহাকার
কেবল যমুনা ছাড়া কারো কাণে পশে না।
তুমি রাজা মথুরার
স্নেহে বদ্ধ কুবুজার,
পুরাণ পিরীতি রসে প্রাণ আর রসে না,
দূরে গেছ আছ ভুলে
কাজ কি এ কথা তুলে,
ভুলে থাক সুখে থাক এই সুধু বাসনা।
প্রেম লবে লও নাথ,
স্মৃতি রবে প্রাণ সাথ,
স্মৃতি লয়ে করি সদা মরণের কামনা,
রাধা বরষার নদী
এখন থাকিত যদি
রাধা নামে সাধা বাঁশি নীরবে কি থাকিত।
রূপের সৈকতে বসি
থাকিত শরৎ শশী
সেধে সেধে কত নিশি এ চরণ পূজিত।

ভগ্ন হৃদয়।

ভেঙ্গে গেছে যাক ভেঙ্গে হৃদয় আমার,
শিখুক ফেলিতে শ্বাস প্রতি পরমাণু
থাক প্রাণ হয়ে শুধু পত্রহীন স্থাণু,
বেঁচে থাকি বেঁচে রব মরুর মাঝার,
ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত শত অত্যাচার,
যে পবাণে পারে নাই করিতে কম্পিত,
সেই প্রাণ আজি হ'ল শতধা চূর্ণিত?
একটু আঘাতে শুধু ক্ষীণ উপেক্ষার?

প্রাণের যে প্রাণ-প্রেম তারই অবসান
প্রাণ-দেহ, প্রেম তার জীবন সুন্দর
তাই যদি গেল তবে প্রাণের কি মান,
প্রেমহীন প্রাণ সেতে দুখের নির্ঝর,
ভাঙ্গা প্রাণে শোক আছে নাহি সে গর্জ্জন
অশ্রুনাই আছে শুধু নীরস রোদন।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

সাহিত্য-বাজার। (৫)

মাসিক পত্র।

সাহিত্য-বাজার সম্বন্ধে বক্তব্য যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা লিখিতে আর ইচ্ছা করে না। কথায় বলে, সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই;—সাহিত্য-বাজারের মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। বঙ্কিম চন্দ্রের বঙ্গদর্শন, বাঙ্গলা ভূমির অক্ষয় কীর্ত্তি; কিন্তু আজ বঙ্গদর্শন কালের গর্ভে লুক্কায়িত। যে আর্য্যদর্শন ও বান্ধবের আবির্ভাব দেখিয়া, উৎফুল্ল চিত্তে, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য-বাজার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে আর্য্যদর্শন নাই—সে বান্ধব নামে থাকিয়াও কাজে নাই। শুনিয়াছি, বান্ধব ন-মাস ছ-মাসে এক একবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহা আমরা দেখিতে পাই না। বহুদিন, ঐরূপ প্রকাশের সংবাদও পাইতেছি না। সুতরাং বান্ধব এখন "না জীবিত—না মৃত,"—অথবা জীবন্মৃত। বঙ্গদর্শন নাই, আর্য্যদর্শন নাই, বান্ধব জীবন্মৃত,—তবে আর আছে কি? বাঙ্গালা দেশ হতভাগ্য, বিবিধ-মত-সমন্বিত এইরূপ উচ্চ দরের পত্রিকাগুলিকে পরিপোষণ করিতে পারিল না। শুনিয়াছি, বঙ্গদর্শন ঋণগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। কথা সত্য হইলে, ইহাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, যোগেন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, রমেশচন্দ্র, সকলেই আছেন, কিন্তু এখন আর কোন মাসিক পত্রিকার সহিতই তাঁহাদের যোগ নাই। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলার পক্ষে, ইহা যারপর নাই দুর্ভাগ্যের বিষয়।

আর্য্যদর্শন ও বান্ধবের সমসাময়িক পত্রিকা "ভারতী"। "ভারতী" চিরপূজ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ। এই ঠাকুর পরিবারের নাম চিরকাল বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। "তত্ত্ববোধিনী" ও "ভারতী" ভ্রাতা ও ভগিনী দ্বারা সম্পাদিত দুই খানি অপূর্ব্ব পত্রিকা। তত্ত্ববোধিনী বাঙ্গলা ভাষার যে কি উপকার করিয়াছে, আমাদের ক্ষীণ লেখনী তাহা বর্ণনা করিতে অসমর্থ। বঙ্গদর্শনের অস্তিত্ব যখন কল্পনার জরায়ু-গর্ভেও ছিল না, তখন তত্ত্ববোধিনী বাঙ্গলা ভাষার শক্তিশালী কাগজ। এই উভয় পত্রিকাই, আজও, সমান তেজে চলিতেছে। এই পরিবারের সকল ব্যক্তিই বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি-কল্পে বদ্ধ-প্রতিজ্ঞ;—বোধ হয় যেন এই কাজের জন্যই আছেন। বাঙ্গলায় এরূপ ধনে, মানে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে সমন্বিত উন্নত পরিবার আর দেখা যায় না। "ভারতী"র উচ্চ বংশে জন্ম,—বেশভূষা পরিপাটী। এখানি এই পরিবারের কাগজ। বাহিরের লোকের লেখা অল্প বলিয়া বিভিন্ন মতের সমাবেশ ইহাতে কিছু খুব কম। "বালক" এখন "ভারতীর" সহিত একাত্মক হইয়াছেন। এ কাজটাতে "ভারতীর" পূর্ব্বে গৌরব কিছু নষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, ভারতী এখন বাঙ্গলা

মাসিক পত্রিকার মান রাখিতেছেন। ভারতী প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস-প্রধান পত্রিকা।

ভারতীর সমসাময়িক কাগজ—প্রবাহ। প্রবাহ—এখন অনন্ত বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন। তারপর নব্যভারত, যেরূপ চলিতেছে, সাধারণে জ্ঞাত আছেন। ইহা কোন সম্প্রদায়ের কাগজ নহে, সকল প্রকার মতই ইহাতে স্থান পায় বলিয়া বহু লেখক ইহাতে লিখিতেছেন। ভবিষ্যত সম্বন্ধে কেহই কিছু বলিতে পারে না। উপন্যাস না দিয়া মাসিক পত্রিকা চালান যায় কি না, তাহারই পরীক্ষা হইতেছে।

নব্যভারতের সমসাময়িক—নবজীবন ও প্রচার। খুব আয়োজনে, খুব ধুমধামের সহিত এই দুই খানি পত্রিকা বাহির হইয়াছিল। জিনিষও বেশ হইয়াছিল। আদরও এদেশে খুব পাইয়াছিল; কিন্তু এদেশের আব হাওয়া সহ্য হইল না। প্রচারের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে,—নবজীবনের সংবাদ বড় একটা পাওয়া যাইতেছে না। নবজীবন এখন থাকিলেও, মৃত্যুশয্যায় আছেন। ইহাপেক্ষা বাঙ্গালার অধোগতির সংবাদ আর কি আছে? বাঙ্গালী কঙ্গ্রেসে বক্তৃতা করিতে মজবুত, কিন্তু জাতীয় ভাষার উন্নতিতে বিমুখ।

নব্যভারতের প্রথম বৎসর পাক্ষিক-সমালোচক বাহির হইয়াছিল, বেশ চলিয়াছিল, কিন্তু অল্পদিন পরেই লোপ পাইয়াছে। এখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকা। কল্পনাও দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকা। বাবু হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা পূর্ব্বে সম্পাদিত হইত, এখন যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদক হইয়াছেন। এখানিও উপন্যাস প্রধান পত্রিকা। সময়ে সময়ে দেখা দেন। মধ্যে মধ্যে বেশ ভাল লেখা ইহাতে থাকে। শুন যায়, বেদব্যাস—নবজীবন ও প্রচারের স্থান অধিকার করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় অধ্যবসায়ী, কিন্তু বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে, প্রচার ও নবজীবনের ধারেও পৌছিতে পারেন নাই। কেমন একরূপ এক-ঘেয়ে সুরে ইহার তন্ত্রী বাঁধা। সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে থাকাতেই ইহার এই অবস্থা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তবু এ কথা অম্লান চিত্তে বলা যাইতে পারে, বেদব্যাস দ্বিতীয় শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। উপন্যাসের নাম গন্ধও ইহাতে নাই। নবজীবনের ছোট ভাই—মালঞ্চ। মালঞ্চ, বেশ দক্ষতার সহিত চলিতেছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাধারণীর তিরোধানের পর আর দেখা যাইতেছে না। ফুলের বাগানে আর ফুল ফুটিতেছে না। মালঞ্চও দ্বিতীয় শ্রেণীর কাগজ। "বিভা" একখানি প্রথম শ্রেণীর কাগজ, মালঞ্চের সমসাময়িক, কিন্তু এক বৎসরের পরই জ্যোতিহীন হইয়াছেন, আর চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। গান ও গল্প এবং সাহিত্য-কল্পদ্রুম নামক দুই খানি মাসিক পত্রিকা উপহারের বিপুল আয়োজন লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গান ও গল্প উঠিয়া গিয়াছে, কল্পদ্রুম এ বৎসর "সাহিত্য" নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার সম্পাদক এবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় যেরূপ উদ্যোগী, আশা আছে, কাগজখানি বেশ চলিবে। লেখা, ছাপা প্রভৃতি বেশ হইতেছে। আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী ও চিকিৎসা-সম্মিলনী দুই খানি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট পত্রিকা। প্রথম খানি উচ্চ কুলে জন্মিয়াও দীর্ঘায়ু পায় নাই, শেষের খানি বেশ চলিতেছে। অনুসন্ধান—এক খানি পাক্ষিক পত্রিকা, সাহিত্য সেবা ইহার উদ্দেশ্য না থাকিলেও, ক্রমে

ক্রমে সাহিত্যের সেবায় মনোনিবেশ করিয়া সকলের ভালবাসা আকর্ষণ করিতেছেন। বর্ত্তমান বৎসর খুব আড়ম্বরের সহিত প্রতিমা নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া কাহারও কাহারও প্রশংসা পাইয়াছে। আশাপ্রদ, সন্দেহ নাই; কিন্তু "বিবাহের দরখাস্ত" প্রভৃতি চুটকি প্রবন্ধ দেখিয়া এবং এখনই রীতিমত বাহির হইতেছে না বলিয়া, আমাদের মনে কিছু আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে।

বালকদিগের জন্য "সখা" গত ৭।৮ বৎসর খুব দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। ঠাকুর বাড়ী হইতে "বালক" বালক বালিকাদের জন্য বাহির হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ভারতীর সহিত এখন মিলিয়া গিয়াছে। মহিলাদিগের জন্য বামাবোধিনী ও পরিচারিকা দুই খানি উৎকৃষ্ট পত্রিকা। বামাবোধিনীর ন্যায় দীর্ঘকাল-স্থায়ী মাসিক এদেশে আর নাই। বামাবোধিনী এ সম্বন্ধে সকলের আদর্শ। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পত্রিকার মধ্যে ধর্ম্মবন্ধু, আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারক, তত্ত্ব-বোধিনী, ধর্ম্মতত্ত্ব ও তত্ত্বকৌমুদীই প্রধান। কয়েক খানিই বেশ চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রিকা অনেক বাহির হইয়াছে, অনেক হইতেছে। কিন্তু সে সকলের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য এক খানিও দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ সে সকল দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে কি না, বলা যাইতেছে না, সুতরাং এখনও উল্লেখের সময় হয় নাই।

সংক্ষেপে সাময়িক পত্রিকার উল্লেখ শেষ করিলাম। এই সঙ্গে সাহিত্য-বাজার আপাততঃ শেষ হইল। সাময়িক পত্রিকার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। সংবাদ পত্রের অবস্থা, তাহা অপেক্ষা ভাল। পুস্তকের অবস্থা, তাহা অপেক্ষা ভাল। মধ্যে মধ্যে এখনও ভাল ভাল পুস্তক বাহির হইতেছে, ইহাতে আশা আছে, কালে বাঙ্গলা সাহিত্য প্রভূত সম্মান লাভ করিবে।

দেশের কৃতবিদ্যগণের নিকট নিবেদন, সকলে বাঙ্গলা ভাষার উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধ-পরিকর হউন। ইংলণ্ডের প্রত্যেক কৃত-বিদ্যের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা থাকে—লেখক হইব। এই জন্যই সে দেশের ইংরাজি ভাষার এত উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশের অনেকেরই লক্ষ্য—চাকরি। জাতীয় ভাষার উন্নতি ভিন্ন কোন দেশের কোন জাতি উন্নতি লাভ করে নাই, ইহা স্মরণ রাখিয়া সকলে যাহা কর্ত্তব্য, করুন।

সাহিত্য বাজার লিখিতে যাইয়া আমরা কোন কোন সম্পাদকের খুব বিরাগ-ভাজন হইয়াছি। বুদ্ধি ও বিবেচনায় যাহা বুঝিযাছি, তাহাই নির্ভয়ে লিখিয়াছি, কাহারও অনিষ্ট সাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। যাঁহারা তীব্রভাবে আমাদের প্রতি কটূক্তি ও গালি বর্ষণ করিয়াছেন, বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া, দেশের অনন্ত অভাব রাশি বিদূরিত করিতে সমর্থ হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন। যাঁহারা আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের চরণ-ধূলি ভিক্ষা করিতেছি। বিধাতা সকলের মঙ্গল করুন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **নিদানতত্ত্ব**।—বিবিধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম, আর, সি,পি,কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। মূল্য আপাততঃ ২৲। পুস্তক খানি ছোট,কিন্তু ইহাতে অস্ত্রচিকিৎসা-সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগের নিদান সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ পুস্তক এই নূতন প্রকাশিত হইল। বাঙ্গলা ভাষায় বিজ্ঞান লেখা বড় কঠিন, কিন্তু যোগেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে আশাতিরিক্ত কৃতকার্য্যতা দেখাইয়াছেন। ভাষা অতি সুন্দর হইয়াছে। পুস্তক খানিতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মেডিকেল স্কুলের ছাত্র, এবং নেটিভ ডাক্তারদিগের যথেষ্ট উপকারে আসিবে। আর যাহারা বাঙ্গলা ভাষার পক্ষপাতী, তাঁহারা একবার পুস্তক খানি পাঠ করিলে প্রভূত আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

২। **চৈতন্য-লীলামৃত**।—শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত; মূল্য ১৷৷০। জগদীশ্বর বাবু নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। বৈষ্ণব শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। বাল্যকাল হইতে তিনি বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রতি অনুরক্ত—আজও তাহার চর্চ্চায় নিযুক্ত। তাহারই ফল—এই গ্রন্থ। প্রবন্ধগুলি নব্যভারতে বাহির হইয়াছিল বলিয়া মতামত দিতে আমরা সঙ্কুচিত হই; কিন্তু এ কথা না বলিলে নদীয়ার অদ্বিতীয় প্রেমাবতারের প্রতি অসম্মান দেখান হয় যে, তাঁহার এরূপ অপূর্ব্ব জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। বহুলোক নব্যভারতের চৈতন্যলীলা ও চৈতন্যধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি; তাঁহারা এই পুস্তক দেখিয়া যে আনন্দিত হইবেন, বিন্দুমাত্র সন্দেহ করি না। দেশের সর্ব্বসাধারণের নিকট, বিশেষত ভক্তিপিপাসু ব্যক্তিগণের নিকট এ পুস্তক যে বিশেষ রূপে আদৃত হইবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। ভাষার মাধুর্য্যে এবং বর্ণনার চাতুর্য্যে এ গ্রন্থ অতি মনোহর হইয়াছে।

৩। **আভাষ**।—শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী প্রণীত; মূল্য ৸০। এই পুস্তকে অশ্রুকণার কতকগুলি কবিতা তোলা হইয়াছে এবং অনেক গুলি নূতন কবিতা আছে। গিরীন্দ্র মোহিনী সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা "অশ্রুকণার" সমালোচনার সময়ে বলিয়াছি। তিনি আমাদের দেশের মহিলা-কবিগণের শির্ষস্থানীয়া, একথা বলিলে, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আভাষের সকল কবিতা তেমন সরস হয় নাই। আমাদের বিবেচনায়, কতকগুলি কবিতা বাদ দিয়া, বাল্যরচনা নামে পৃথক একখানি পুস্তক ছাপাইলে ভাল হইত। গিরীন্দ্রমোহিনীর শক্তি যে অসাধারণ, আভাষের অনেক কবিতায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গিরীন্দ্র মোহিনীর দ্বারা বঙ্গের স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের আশায় বুক ফুলিয়াছে। অনেক কবিতা তুলিতে সাধ, কিন্তু কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টী তুলিব, বুঝি না। কিবা লিপি-চাতুর্য্য, কিবা ভাব-ছটা, কিবা মধুর গাথা। অনেক কবিতা পড়িতে পড়িতে অবাক হইয়া যাইতে হয়। সেই জন্য, তুলিয়া তাহার একটীরও সৌন্দর্য্য নষ্ট করিলাম না।

৪। প্রমীলা।--কহিনুর প্রেসে মদ্রিত, মূল্য ॥০। এখানিও কবিতা-পুস্তক, বঙ্গমহিলার লেখা। "প্রমীলা" প্রমীলার লেখা — নব্যভারতের পাঠকগণ ইহাকে জানেন। বালিকার লেখা সাধারণত লোকের নিকট উপেক্ষার জিনিস, কিন্তু সে ভ্রান্তি এ পুস্তক পাঠে দূর হইবে। গিরীন্দ্র মোহিনীর সহিত প্রমীলার তুলনা হয় না বটে, রবীন্দ্র নাথ, গোবিন্দ চন্দ্র, অক্ষয় কুমার ও গিরীন্দ্র মোহিনীর ছায়া স্থানে স্থানে প্রতিফলিত দেখিলাম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া ইনি উপেক্ষার জিনিস নহেন। কবি নিজে বলিতেছেন—

"বনফুল ফোটেনা কি ফুটিছে গোলাপ যেথা?
যে বনে কোকিল গায়, বায়স ডাকেনা সেথা?
আকাশে চাঁদিমা হাসে, সেথা কি উঠেনা তারা?
ধরায় বসন্ত হাসে, ঝরে না বরিষা ধারা?
তুমি কেন স্বধু তবে সৌন্দর্য্য বিহীন ব'লে,
মুকুল হৃদয় খানি যেতে চাও পায়ে দ'লে?"

ঠিক কথা;—যে একের সৌন্দর্য্যে ভুলিয়া অপরকে তুচ্ছ করে, সে মূর্খ। আমরা সাদরে, সানন্দ চিত্তে কবিকে অভিবাদন করিতেছি। আশা করি, এদেশে তিনি অনাদৃতা হইবেন না।

৫। ভাব ও চিন্তা।—শ্রীফকির চন্দ্র সাধু খাঁ প্রণীত, মূল্য।০। আমরা সাবধানে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পড়িলাম, পড়িয়া মোহিত হইলাম। কবি ভাবে পাগল, চিন্তায় আত্মবিস্মৃত। এই দুই গুণই কবির পক্ষে যথেষ্ট।

কবি চিন্তায় কেমন আত্মবিস্মৃত, দেখুন।

"জগতের দ্বারে মাগিয়া বিদায়
এসেছি হেথায় মরিতে!
সবাকার তরে চির আদরের
আপনায় আজ ভুলিতে।
* * * * *
মুছে ফেলে যেন চরণের চিন্
চিনিবে আমায় যে জনা;
তা হলে কা'কেও হবে না কাঁদিতে
ভাবিতে আমার ভাবনা।
* * * * *
পরাণ মরিয়া হবে মহাপ্রাণ
মানব মরিয়া দেবতা;
সসীম মরিয়া হইবে অসীম
পাষাণ গলিয়া মমতা।
আমিও মরিয়া সবার হইব
সকলে মিশিবে আমাতে;
যোজনের পথে আছয়ে যাহারা
মিলিবে প্রাণেতে প্রাণেতে।"

তারপর কবি কেমন ভাবে বিভোর, তাও দেখুন।

"আমাকে ফেলিয়া কেহ যেতে নারে,
সকলে আমাতে বসিয়া;
আমাকে বাঁধিয়া সবাকার সাথে
গিয়াছি আপনি মরিয়া,
প্রকৃতি মরিলে আমি মরে যাই,
আমি ম'লে কিছু রয় না;
অমর প্রকৃতি মরে না বলিয়া
অমর মানব চেতনা।
অমর রবির প্রকৃতি লইয়া
নিজেও অমর হয়েছি;
অমর বিশ্বের অমর ছায়ায়
আপনাকে আমি বেঁধেছি।"

আরো ভাব দেখুন—

"নির্ঝর বেয়ে আস্‌বে ছুটে
মায়ের যত স্নেহের ঢেউ·
পাষাণ যাবে ভেঙ্গে চুরে,
থাক্‌বে নাক বাকি কেউ।
সমান জোয়ার বয়ে যাবে
ডুবিয়ে দেবে নিখিল্ ধরা।

অগাধ জলে বল্‌ব ডুবে
মায়ের কোলে আছি মোরা!
* * * * *
থাক্‌বে নাক চেনাচিনি
ভায়ে ভায়ে করব্‌ খেলা;
যাবে ধরা হিংসাভরা,
পড়ে যাবে হাসির মেলা।"

কবির সহিত আমাদের পরিচয় নাই। তিনি যুবা কি বৃদ্ধ, কবিতায় তাহার পরিচয় পাইলাম না; তবে এ পরিচয় পাইলাম, ভাবে তিনি নবীন, চিন্তায় তিনি প্রবীণ। তাঁহার "উপহার" "ফুরাবে কি জীবন সঙ্গীত" "সুখের মরণ" "বসন্ত বিদায়" "সাধের কানন" "মায়ের স্নেহ" "অভাগার কথা" "আমি'র মহত্ত্ব" "বিধবা ভগিনী." "আয় মা ঘরে আয়" প্রভৃতি কবিতায় গভীর ভাবের খেলা দেখিলাম; আর "চিন্ময়ী" "জন্মভূমি" "নীরবে মরণ" "প্রকৃতি দর্শন" "অনন্ত বিরহ" "ভবিষ্যতের নিমন্ত্রণ" "ভাব ও চিন্তা" প্রভৃতি কবিতায় তাঁহার উচ্চাঙ্গের চিন্তার পরিচয় পাইলাম। কোন কোন কবিতা একটু একটু অস্ফুট হইয়াছে, স্থানে স্থানে একটু আধটু অনুকরণ-ছায়া পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে ভাব ও চিন্তায় একটু আধটু বিবাদ বাধিয়াছে বটে, কিন্তু গুণের সহিত তুলনায় সে দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। বলিতে কি, এই এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক পড়িয়া কবিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে ইচ্ছা হইয়াছে। যিনি প্রকৃত কবি, তাঁহাকে যদি আদর না করি, বাচিয়া কাজ কি? ফকির চন্দ্র সাধু খাঁ কাব্য জগতে অমর হউন, এই প্রার্থনা;—তাঁহাকে যেন আক্ষেপ করিয়া আর বলিতে না হয়;—

'ক্ষুদ্র প্রেম বোলে ঘুচিবে না তায়
কণামাত্র ধরণীর ভার?
মরণের কোলে শয়ান বলিয়া
পাব না কি অমৃতের ধার?

৬। **সরল প্রাকৃত ভূগোল।**— শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়, এম, এ, প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। আমরা পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন-কমিটির সুবিচারের কথা অনেক বার লিখিয়াছি। আমাদের বকাবকিতে কিছু ফল দর্শিবে, সে আশা বড় নাই; তবুও দুই একটী কথা লিখিবার খাতিরেই লিখিতে হয়। যাঁহারা শিক্ষা বিভাগের সহিত সংসৃষ্ট, তাঁহারা যে কোন বিদ্যায় পারদর্শী—এ কথাটা গোড়ায় না মানিয়া লইলে বুঝিতে পারা যায় না যে, যিনি বৈজ্ঞানিক নহেন, তাঁহার ভূবিদ্যাই বা পাঠশালায় কেন চলে, আর যোগেশ বাবুর মত বিজ্ঞ লেখকের পুস্তকই বা পড়িয়া থাকে কেন? ভূবিদ্যা গ্রন্থের সৃষ্টি হইতে যোগেশ বাবুর পুস্তকের প্রকাশ পর্য্যন্ত, ক্রমাগত বিংশাধিক সংস্করণে ভূবিদ্যা পুস্তকে বালকেরা সহস্রাধিক ভুল শিখিয়া আসিতেছিল। সহসা এবারকার নূতন সংস্করণে যদিও অনেক ভুল সংশোধিত হইয়াছে, তবুও এখন অনেক আছে। "চন্দ্র পৃথিবীর অধিক নিকট; চন্দ্রের আকর্ষণ সূর্য্যাপেক্ষা পৃথিবীর উপর বেশী," এই অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক সত্য দ্বারা যে গ্রন্থে জোয়ার বুঝান হইয়াছে, তাহা কি রাধিকা বাবুর নামের জোর ভিন্ন পাঠশালায় চলিতে পারিত? যোগেশ বাবু বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক; বিজ্ঞানে তাঁহার গভীর দৃষ্টি, লিপি-কুশলতাও তাঁহার অতি চমৎকার। এসকলেরই পরিচয় স্থল তাঁহার প্রাকৃত ভূগোল। যদি ন্যায় বিচারে দোষ না থাকে, তবে পাঠ্য পুস্তক কমিটি একবার সরল প্রাকৃত ভূগোল খানি পড়িলেই ইহার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৩৯)

দক্ষিণাপথে—রামানন্দ মহোৎসব।

কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে গৌরচন্দ্র জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে আসিয়া নৃসিংহ দেখিয়া স্তব বন্দনা করিলেন। এখানে ভূগর্ভে পাদমূল প্রোথিত নৃসিংহ মূর্ত্তি বিরাজমান। কথিত আছে, এক সরল বিশ্বাসী পুঁড়া গোয়ালের এই স্থানে শস্য ক্ষেত্র ছিল। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে যাইবার সময় শস্যক্ষেত্রে অন্যরক্ষক না রাখিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ক্ষেত্রগুলি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইত। কিন্তু দেখিতে লাগিল, প্রত্যহ রাত্রে কে তাহার শস্য নষ্ট করিয়া যায়। সে দুঃখিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল যে, যে তাহার শস্য নষ্ট করে, তাহাকে যেন সে দেখিতে পায়। এই বলিয়া রজনীতে এক স্থানে সে লুকাইয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল যে, ভীষণমূর্ত্তি এক বরাহ আসিয়া তাহার শস্য খাইতেছে। অমনি সে ধনুকে গুণ যোজনা করিয়া শূকরকে বিদ্ধ করিল, এবং শুনিতে পাইল, শূকর রাম! রাম! শব্দ করিয়া নিকটস্থিত পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিল। তখন গোয়ালা বুঝিল যে, সে শূকর নহে, ভগবান তাহাকে ছলনা করিয়াছেন। ইহাতে সে নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে উপবাসী থাকিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত ভগবানের নিকট আত্ম দোষের ক্ষমা চাহিয়া প্রার্থনা করিল। দৈববাণী হইল, 'তোমার অপরাধ নাই, ঘরে যাও।' পুঁড়া ছাড়িবার পাত্র নয়, বলিল, 'আমার দোষ ক্ষমা করিলে কেমন করিয়া বুঝিব, যদি কোন প্রসাদ চিহ্ন দেখিতে না পাই?' দৈববাণী উত্তর করিল 'পাইবে'। পুঁড়া তখন দেশের রাজার নিকটে যাইয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলে, রাজা বলিলেন, 'যদি তুমি দেখাইতে পার, তবে আমি তোমার ক্রীত দাস।' তখন রাজা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলে, দৈববাণী হইল, 'তুমি যে জাতিবুদ্ধি ছাড়িয়া আমার ভক্তের সম্মান করিয়াছ, তাঁহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এইখানে দুগ্ধ সেচন কর, আশ্চর্য্য দেখিবে।' তখন রাজাজ্ঞায় সেই স্থানে দুগ্ধ সিঞ্চন হইতে লাগিল এবং একটু একটু করিয়া ভূগর্ভ হইতে অপূর্ব্ব নৃসিংহ মূর্ত্তি উঠিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ বিস্মিত হইয়া গেল। জানু পর্য্যন্ত উঠিলে আজ্ঞাবাণী হইল, 'আর উঠিবে না; নিরস্ত হও।' রাজা তখন মহানন্দে সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া মহা মহোৎসব করিলেন। কিছু দিন পরে জিয়ড় নামে এক সাধু মহাজন দুই পুরঙ্গনা সমভিব্যাহারে দেবমূর্ত্তি দেখিতে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে হঠাৎ তাঁহার সঙ্গিনী দুই জনকে পাষাণময়ী হইয়া দেবচরণ লাভ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে রোদন করিতেছিলেন। দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'রোদন ছাড়; তোমার রমণীদ্বয় সদগতি লাভ করিয়াছেন। আজি হইতে তোমার নামে আমার নাম হইল।' সেই অবধি জিয়ড় নৃসিংহ নাম প্রকাশ হইল। চৈতন্যদেব নৃসিংহ মন্দিরে যাইয়া এই কিম্বদন্তী শুনিতে পাইয়াছিলেন।

নৃসিংহক্ষেত্র ছাড়িয়া গৌরচন্দ্র কত দিন পরে গোদাবরী তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। গোদাবরী দেখিয়া যমুনা ও তীরস্থ বন দেখিয়া বৃন্দাবন স্মৃতি হওয়ায় তিনি অনুরাগ ভরে বন মধ্যে অনেকক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। এবং নদী পার হইয়া পর পারে আসিয়া স্নানাবগাহন সাঙ্গ করিয়া ঘাটের কিছু দূরে জল সন্নিধানে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই নগরের নাম বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রি। ইহা উৎকল রাজের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী। অল্পক্ষণ পরে মহাপ্রভু দেখিলেন যে, বহুলোক সঙ্গে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে এক বিচিত্র দোলায় চড়িয়া কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘাটে স্নানাবগাহন জন্য আসিলেন। তাঁহার সঙ্গের স্তাবক এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। রাজপুরুষ বিধিমত স্নান তর্পণ সমাধা করিলেন। শ্রীচৈতন্য মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই কি রাজা রামানন্দ রায়, যাঁহার কথা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াদিয়াছেন? ইতিমধ্যে রাজপুরুষ সন্ন্যাসী দেখিয়া নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলে, গৌর উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রাজা রামানন্দ রায়।" আগন্তুক উত্তর করিলেন "হাঁ আমি সেই মন্দবুদ্ধি শূদ্রাধমই বটি।" গৌর বলিলেন, "আমি নীলাচল হইতে আসিতেছি; সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আপনার গুণ বর্ণনা করিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যই আমার এখানে আসা; ভাল হইল যে অনায়াসে দর্শন পাইলাম।" এই বলিয়া গৌরচন্দ্র বাহু প্রসারিয়া রামানন্দ রায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রায়ও তাঁহাকে আলিঙ্গিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন। স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণতে উভয়ে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। ক্ষণ কালের জন্য উভয়েই আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। কে জানে ভক্তদিগের অন্তরে অন্তরে কি এক অদৃশ্য বৈদ্যুতিক তার আছে যে, পরিচয় না থাকিলেও দর্শন শ্রবণে পরস্পরকে চিনিতে বাকী থাকে না। দর্শক লোকেরা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিল, "এই সন্ন্যাসীকে মহা তেজোময় দেখিতেছি, শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ইনি কাঁদিতেছেন কেন? আর আমাদের মহারাজ পরম গম্ভীর ও পণ্ডিত; ইনিই বা কেন সন্ন্যাসী স্পর্শে অস্থির হইলেন।" যাহা হউক, উভয়েই ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের কথার উত্তরে বলিলেন, "সার্ব্বভৌম আমাকে ভৃত্য জ্ঞানে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন বলিয়া আমার উপকারের জন্য আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আজ আপনার দর্শন ও আলিঙ্গনে পবিত্র হইলাম। আমি অস্পৃশ্য রাজ-সেবী শূদ্রাধম; আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ হইয়াও আমাকে যে স্পর্শ করিলেন, সে আপনার কৃপার গুণে। মহৎদিগের স্বভাবই এই যে, নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহারা পামরদিগের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। আপনার প্রভাব সাক্ষাতেই দেখিতেছি যে, আমার সঙ্গের এই সহস্রাধিক লোকও আপনাকে দেখিয়া হরি নাম পুলকাশ্রুতে দ্রবীভূত হইয়াছে। গৌর বলিলেন, "না, তা নয়। আপনি ভাগবতোত্তম; আপনার মিলনে আমার প্রেমভক্তি লাভ হইবে বলিয়াই সার্ব্বভৌম এখানে

আসিতে বলিয়া দিয়াছেন।" এইরূপ কথা বার্ত্তার মধ্যে রাজার ইঙ্গিতে এক বৈদিক বিপ্র মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিল। শ্রীচৈতন্য নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া রামানন্দ রায়কে বলিলেন, "আপনার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে বড় সাধ আছে। আবার যেন দর্শন পাই।" রায় বলিলেন, "যদি অধম তারিতে এখানে আসিয়াছেন, তবে ৫।৭ দিন থাকিয়া আমার দুষ্ট মনকে সংশোধন করুন।" এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া রাজা রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে মহা সমারোহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীচৈতন্যও ব্রাহ্মণের সঙ্গে তদীয় গৃহে যাইয়া মধ্যাহ্নাদি সমাপন করিলেন।

রামানন্দ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :— ভবানন্দ রায় নামে উড়িষ্যার করণ বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পাঁচ পুত্র। গোপীনাথ পট্টনায়ক, বাণীনাথ পট্টনায়ক, রামানন্দ রায় এবং আর দুই জন, যাঁহাদের নাম জানা যায় না। সপুত্র ভবানন্দ চিরদিন উড়িষ্যার রাজ সংসারে উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মালজ্যেঠ্যা দণ্ডপাঠ নামক প্রদেশে গোপীনাথ শাসন কর্ত্তা, রামানন্দ রায় গোদাবরী প্রদেশের শাসন কর্ত্তা, তাঁহার উপাধি রাজা। ভবানন্দ ও বাণীনাথ নীলাচলে উচ্চ উচ্চ পদে অভিষিক্ত। ইহার পর শ্রীচৈতন্য নীলাচলে থাকার সময়ে এই গোষ্ঠি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহারই পরিবার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ভবানন্দের পাঁচ পুত্রের মধ্যে রামানন্দ রায় পরম পণ্ডিত ও রাধাকৃষ্ণের উপাসক, পরম ভক্ত এবং সর্ব্বোচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্ত ভক্ত জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ তাঁহার জীবন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাজা রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্য স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে উভয়ের পুনর্ম্মিলনের উৎকণ্ঠায় সন্ধ্যা উপনীত হইল। শ্রীচৈতন্য সায়হ্ন স্নান সমাপনান্তে নিভৃতে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় রামানন্দ রায় এক মাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলে তিনি আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে ভৃত্যকে বাহিরে থাকিতে বলিলেন। রঙ্গ স্থানে নানা কথোপকথন হইলে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধ্য বস্তু কি? তাহার নির্ণয় করুন।"

রামানন্দ উত্তর করিলেন, "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণের ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ এই চারি আশ্রমের ধর্ম্ম যেরূপ মন্বাদি ঋষিগণ নিরূপণ করিয়াছেন, স্ব স্ব অধিকার ভেদে তাহাই যাজনা করিয়া ভগবানের আরাধনা করা উচিত।" শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "এত বাহিরের কথা; নিগূঢ় কথা কি বল।" রামানন্দ বলিলেন, "ভগবানে কর্ম্মার্পণই সাধ্যসার। পান, ভোজন, দান, তপস্যাদি যে কোন কর্ম্ম করা যায়; তাহার ফলাফলে উদাসীন থাকিয়া ভগবদিচ্ছার অনুগত হইয়া চলাই সার ধর্ম্ম।"

শ্রীচৈতন্য। 'এও বাহিরের ধর্ম্ম।'

রামানন্দ। 'তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগই শ্রেষ্ঠ; বর্ণাশ্রম-নিরূপিত ও বেদ-বিহিত সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কেবল মাত্র ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধক।'

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা।

রামানন্দ। জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিই সাধ্য শিরোমণি। যাঁহার অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হইয়াছে; যাঁহাতে ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন ও যিনি ব্রহ্মে অবস্থিতি করেন; যাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া, শুভ, অশুভ, রোগ, শোক, সম্পদ, বিপদ সমজ্ঞান হইয়া চিত্ত নির্ম্মল ও প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, তিনিই সর্ব্বত্র সমভাবে ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়া ব্রহ্ম যোগরূপ পরা-ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের ধর্ম্ম; ইহার পর কি বল।

রামানন্দ। জ্ঞান শূন্যা ভক্তিই সাধ্য শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের পথ কুটিল, তাহাতে সর্ব্বদাই সংশয় আসিয়া আত্মাকে কলুষিত করে; বিশেষতঃ সকলের পক্ষে কিছু জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে কয় জন জ্ঞানী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়? আর জ্ঞানের সীমাই বা কোথায়? কে কতটুকু জ্ঞান লাভ করিতে পারে? মানবজ্ঞান তো অতি অকিঞ্চিৎকর; অসীম জ্ঞান বস্তুকে কি ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে? এই সকল বিবেচনা করিয়া যিনি জ্ঞানানুসন্ধানে প্রয়াস না করিয়া সাধুমুখবিনিসৃত ভগবৎ কথা শ্রবণ ও তাহা কায়মনোবাক্যে অবলম্বন করিয়া থাকেন, অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও ভগবান প্রায় এরূপ লোকের নিকট আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য। এ এক রকম কথা বটে। কিন্তু ইহার পর কি, শুনিতে চাই।

রামানন্দ। প্রেমভক্তিই সর্ব্ব সাধ্যসার। প্রেমবিহীন কৃষ্ণ পূজা ভক্তের কখনই সুখকর হয় না। এক মাত্র প্রেমভক্তি রস লাভই তাঁহাদের লোভনীয়। কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য রসেও ঐ লোভ পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্য। এও বটে। তার পর?

রামানন্দ। দাস্য প্রেমই সাধ্য শিরোমণি। যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র জগৎ পবিত্র হয়, সেই ভগবানের নিত্য দাসদিগের চেয়ে, আর সৌভাগ্যবান্ কে?

শ্রীচৈতন্য। এও বেশ, তারপর কি।

রামানন্দ। সখ্য প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য সার। জ্ঞানীরা ব্রহ্ম সুখানুভূতিতে ও ভক্তগণ আরাধ্যরূপে যাঁহাকে প্রতীতি করেন; যদি কেহ তাঁহার সহিত সখ্যতা করিয়া তাঁহার অপার পারমেশ্বরী শক্তি ভুলিয়া গিয়া সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদের বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে ভাবিতে পারে, তবে সে সাধকের সম শ্রেষ্ঠ আর কে?

শ্রীচৈতন্য। এ উত্তম কথা। ইহার পর আর কিছু আছে?

রামানন্দ। আছে; বাৎসল্য প্রেমই সাধ্য সার। সকল ভুলিয়া গিয়া যাঁহারা ভগবানকে আপনার সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে পারেন, তাঁহাদের তুল্য সাধক আর কে? নন্দ যশোদার তুল্য কাহার সৌভাগ্য?

শ্রীচৈতন্য। অতি উত্তম; তার পর?

রামানন্দ। তার পর কান্ত ভাব। ইহাই সকল সাধ্যের শ্রেষ্ঠ সাধ্য। ভগবানে আত্ম সমর্পণের ন্যায় আর কি আছে? সতী স্ত্রী যেমন প্রিয় পতিকে শরীর, আত্মা, প্রাণ, মন সকলই সমর্পণ করেন, তেমনি কান্তভাবে ভক্ত সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ক্ষিত্যপ্ তেজো মরুদ্ব্যোম পঞ্চ ভূতের স্থায়িভাব যেমন পর পর ভূতে বৃদ্ধি হইতে হইতে ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পাঁচটী তন্মাত্রই থাকিয়া যায়, তেমনি শান্তের অচঞ্চলতা, দাস্যের সেবা, সখ্যের

বিশ্বাস, বাৎসল্যের স্নেহ এবং কান্তের আত্ম সমর্পণ সকলই কান্তভাবে অন্তর্নিবিষ্ট। ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ। যাহার যে পন্থা, তাহাই তাহার নিকট সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে কান্ত প্রেমই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। অন্য প্রেমে ভগবানকে পাওয়া গেলেও পরিপূর্ণ রূপে এক কান্ত প্রেমেই যাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, যত দূর বলিলেন, ইহাই সাধ্যের সীমা বটে; কিন্তু ইহার পর আর কিছু যদি থাকে, তবে বলুন।

রামানন্দ উত্তর করিলেন, ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে এমন লোক জগতে আছে বলিয়া জান্‌তাম না। যাহা হউক, ইহার পর আছে বই কি? শ্রীরাধিকার প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য শিরোমণি। কেন জানেন না কি? শত কোটী গোপীর সঙ্গে রাসবিলাসে প্রবৃত্ত থাকিয়াও ভগবান্ রাধা প্রেমে এমনই মুগ্ধ যে, রাস ছাড়িয়া তাঁহাকে লইয়া বন মধ্যে লুকাইয়াছিলেন?

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাতে রাধাপ্রেমের গৌরব হইল কৈ? গোপীদিগের সঙ্কোচে যখন রাধিকাকে লইয়া ভগবানকে লুকাইতে হইল, তখন সে প্রেমে অন্যাপেক্ষা হইল; তাতে তো প্রেমের গৌরব হইল না। যদি জানিতাম, ভগবান শ্রীরাধিকার জন্য সর্ব্ব সমক্ষেই গোপীদিগকে ত্যাগ করিতে পারিবেন, তবে বুঝিতাম, শ্রীরাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ। আপনার মুখ দিয়া অমৃতনদী প্রবাহিত হইতেছে; বলুন এ কথার সমাধান কি?

রামানন্দ বলিলেন, তা নয়। রাধা প্রেমই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। রাসমণ্ডলে যত গোপী নাচিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের পাশে এক এক কৃষ্ণমূর্ত্তি নাচিতেছিল। রাধার পাশেও এইরূপ এক মূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল। সাধারণ প্রেমে সর্ব্বত্রই সমভাব দেখিয়া শ্রীরাধিকার অভিমান উপস্থিত হইলে, তিনি রাসমণ্ডল ছাড়িয়া অভিমানিনী হইয়া চলিয়া গেলেন। নিগূঢ় প্রেমেই অভিমান হয়; সাধারণ প্রেমে তাহা হয় না. শ্রীরাধিকার অভিমান এই নিগূঢ় কুটিল প্রেম নিবন্ধনই হইয়াছিল; তাহাতেই সে প্রেমের গভীরতা বুঝা যাইতে পারে। যাহা হউক, অভিমানিনী রাধার অন্বেষণ জন্য ভগবানও রাসমণ্ডল ছাড়িয়া নিবিড় নিকুঞ্জ বনে বেড়াইয়া তাঁহাকে পাইয়া কামনা উপভোগ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। শত কোটী গোপীতেও যে কাম নির্ব্বাপণ হইল না, একা রাধিকাতেই তাহা হইল। ইহাতেও শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতা বুঝুন।

শ্রীচৈতন্য মহা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমি ধন্য হইলাম; যাহা শুনিতে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, তাহা সকলই শুনিলাম। এখন আর কয়টী প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর দানে কৃতার্থ করুন। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার স্বরূপ কি? রস কোন্ তত্ত্ব? প্রেমই বা কি? এই যে 'কাম' শব্দ বলিলেন, তাহাই বা কি?"

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ।

(১৭৬ পৃষ্ঠার পর।)

"ঠাকুর"ই হউন আর "দাস"ই হউন আদিশূরের সময়ে পঞ্চ কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং এক্ষণে এই রূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্যান্য বংশীয় কায়স্থগণ কোন্ স্থান হইতে কখন বাঙ্গালায় আসিয়াছেন? এই প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে; যথা—

১। পঞ্চ কায়স্থের আগমনের পূর্ব্বে এ দেশে যে সকল কায়স্থ ছিলেন, তাঁহারাই সামৌলিক ও মৌলিক, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।

২। পঞ্চ কায়স্থ বাঙ্গালায় আগমনের পর আরও অনেকগুলি কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছেন।

৩। যে সকল ক্ষত্রিয় পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালায় বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা কায়স্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

৪। বাঙ্গালার শূদ্রগণ কায়স্থদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইত্যাদি।

এই সকল উত্তরের মধ্যে যে আংশিক সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। কারণ আদিশূরের বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যবংশীয় এক শাখা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্গের কতকগুলি লোক কায়স্থ আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছিলেন। রাজকার্য্য উপলক্ষে সেই শাখার কতকগুলি লোক অবশ্যই বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কারণ লেখক অর্থাৎ মুহুরী না থাকিলে কোন দেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

ধ্রুবানন্দ কৃত কায়স্থ কারিকায় লিখিত আছে যে, সেই পঞ্চ কায়স্থের সহিত নাগবংশীয় দেবদত্ত ও মহৌজা; নাথবংশজ চন্দ্রভানু, দাসবংশজ চন্দ্রচূড় বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তদনন্তর অম্বষ্ঠ কুলজাত সেনবংশীয় জয়ধর গৌড় দেশে আগমন পূর্ব্বক গৌড়ীয় কায়স্থ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হন। তৎপর করবংশীয় ভূমিঞ্জয়, দাসকুলভূষণ ভূধর, পালবংশীয় জয়পাল, পালিতবংশসম্ভূত চক্রধর, চন্দ্রবংশের দীপক স্বরূপ চন্দ্রধ্বজ, রাহাবংশসম্ভূত মহাপ্রাজ্ঞ রিপুঞ্জয়, ভদ্রকুলজাত সুশীল বীরভদ্র, ধরকুলের কমল স্বরূপ দণ্ডধর, নন্দীবংশের শিরোমণি তেজোধর, দেববংশজ মহাবাহু শিখিধ্বজ, কুণ্ডবংশের চন্দ্রস্বরূপ বশিষ্ঠ, সোমবংশসম্ভূত সুধীর ভদ্রবাহু, সিংহকুলের কমল মহাবাহু বীরবাহু, রক্ষিতকুলভূষণ মহাবীর ইন্দুধর, অঙ্কুরবংশের দীপকস্বরূপ সুধী হরিবাহু, বিষ্ণুবংশের দীপক মহাযশা লোমপাদ, আদ্যকুলসম্ভূত মহাজ্ঞানী বিশ্বচেতা এবং নন্দনককুলভূষণ মহীধর,—আদিশূরের শাসনকালে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আদিশূরের সময়েই বসু, ঘোষ, মিত্র, গুহ, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, সেন, কর, দাম, পাল, পালিত, চন্দ্র, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, সিংহ, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আদ্য, নন্দন প্রভৃতি সপ্তবিংশতি বংশীয় কায়স্থ বাঙ্গলায় উপনীত হইয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর রাজরাট, সপ্তপুর, রাজাপুর, বটগ্রাম, মল্লপুর, পদ্মদ্বীপ, লৌহিত্য, মল্লকোটী,

লক্ষ্মীপুর, কেশিনী, কুমার, কীর্ত্তিমতি, নন্দীগ্রাম, বাটাজোড়, স্বর্ণগ্রাম, দক্ষপুর, মাণ্ডব, মণিকোটী, শম্ভুকোটী, সিংহপুর, মৎস্যপুর, মেঘনাদ, ভল্লকুলী, সিন্ধুরাঢ় ও শূরপুরী নামক সপ্তবিংশতিগ্রাম প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ যে কায়স্থ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারেনা। কারণ এক্ষণে বাঙ্গালায় যে সকল ক্ষত্রিয় বা রাজপুত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহারা সকলেই মুসলমান শাসনের অন্তভাগে বাঙ্গালায় আসিয়াছেন। সেন রাজবংশের সৌভাগ্য-ভাস্কর অস্তমিত হইলেও বাঙ্গালার সামন্তরাজগণ সমূলে উৎপাটিত হন নাই। তাঁহারা অবশ্যই ক্ষত্রিয় ছিলেন। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর নবদ্বীপ বিজয়ের কিঞ্চিদূনাধিক ৩৮৫ বৎসর অন্তে আকবরের বিখ্যাত সচিব আবুল ফজল আইন আকবরী রচনা করেন। তৎকালে বাঙ্গালায় তিন জাতীয় "জমিদার" বা সামন্ত রাজা ছিলেন যথা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও মুসলমান। আবুল ফজল বলেন, "ইহাদিগের মধ্যে কায়স্থের সংখ্যাই অধিক।" আবুল ফজলের আইন আকবরী রচনার প্রায় ১৫০ বৎসর পরে নবাব সুজাউদ্দিন "জমা তুমারি তক্‌ছিছি" নামক বাঙ্গালার রাজস্বের যে হিসাব প্রস্তুত করেন, তদ্‌পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তৎকালে বাঙ্গালায় ১১ জন প্রধান জমিদার ছিলেন। তন্মধ্যে ৫ জন ব্রাহ্মণ, ৪ জন কায়স্থ, ১ জন রজপুত (ক্ষত্রিয়), এবং ১ জন মুসলমান। ব্রিটীসগবর্ণমেণ্টের নিলামী আইনের কৃপায় যদিচ এক্ষণ বাণিজ্য ব্যবসায়ীর সন্তান সম্প্রদায় জমিদারী ক্রয় করিতেছেন, তথাপি কায়স্থদিগের এই অধিকারটী সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহাদের হস্তস্খলিত হয় নাই। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, হিন্দু শাসন কালের ক্ষত্রিয় কুলজাত বাঙ্গালার সামন্ত নরপতির বংশধরগণই মুসলমান শাসনের আরম্ভে বাঙ্গালার জমিদার শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছিলেন। বিশেষত চন্দ্রদ্বীপের আদি রাজবংশ যে বাঙ্গালার সেন রাজবংশ হইতে উদ্ভূত, এরূপ অনুমান করিবার বিশেষ কারণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ভুলুয়ার হৃতসর্ব্বস্ব শূর রাজবংশধরদিগের মধ্যে অদ্যাপি ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গালার "সিংহ" ও "বর্ম্মা" বংশীয় কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয় কুল হইতে উদ্ভূত, উপাধিই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিশেষত মিত্র, নাগ, পাল, সেন, দত্ত, বর্দ্ধন বংশীয় প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গের সহিত বাঙ্গালার ঐ সকল উপাধিধারী কায়স্থগণের অবশ্যই কোন রূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে।*

---

*শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার "প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস" নামক উপাদেয় গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩১১ পৃষ্ঠার টীকায় লিখিয়াছেন:—

"Here and elsewhere we have stated that Kayasthas are descended from the ancient Vaisyas. A controversy is going on since many years past, and reasons have been advanced to shew that Kayasthas are descended from Kshatriyas. We have not entered into the merits of this controversy, and we are unable to give an opinion on the subject. Our main contention is that Kayasthas are not Sudras nor the product of a hybrid mixture of castes; that they are the sons of the ancient Aryan population of India, and have formed a separate caste because they embraced a separate profession. Whether they are descended from Aryan Kshatryas or from Aryan Vaisyas is a question of minor importance. It is possible that their ranks have been mainly recruited

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যখন ইতর জাতির রুধির সংযুক্ত হইতেছে, তখন কায়স্থদিগের মধ্যে অবস্থাপন্ন দুই এক জন শূদ্র অনুপ্রবিষ্ট হইবেন, ইহা বিচিত্র কি? এবম্প্রকার দোষারোপ করিয়া যাহারা সমগ্র কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বংশজ প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা নিতান্ত সল্পজ্ঞান সম্পন্ন। বশিষ্ট, ব্যাস, শুক, কানদ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ঋষিগণের জন্মবৃত্তান্ত আমরা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। স্থানে স্থানে অবস্থাপন্ন বৈষ্ণব অধিকারীগণ কিরূপে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছেন এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ কিরূপে ভাড়ার মেয়ে বিবাহ করিয়া পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তৎপর কায়স্থদ্রোহীগণ জিহ্বা আস্ফালন করুন, ইহা আমাদের অনুরোধ।

বল্লাল কৃত শ্রেণীবিভাগ ও মর্য্যাদা স্থাপন।

আদিশূরের তিরোধানান্তে পাল রাজগণের অভ্যুদয়। পালবংশীয় দ্বাদশ জন নরপতি কিঞ্চিদূন সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী বাঙ্গালা দেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় মহীপাল দেবের শাসন কালে প্রবল বিক্রম চোলারাজ কুলতুঙ্গার সাহায্যে দক্ষিণাপথ-নিবাসী বিজয় সেন দেব বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন। ইনিই বাঙ্গালায় সেন বংশের স্থাপনকর্ত্তা। বিজয়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বল্লাল সেন দেব পৈত্রিক আসন অধিকার করেন। বল্লাল যেরূপ বিদ্বান—সেইরূপ বিদ্যোৎসাহী, যেরূপ গুণবান—সেইরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার শাসন কালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বাঙ্গালার শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছিলেন। এজন্য তিনি কেবল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের শ্রেণীবিভাগ ও তাঁহাদের মধ্যে কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন।* সেই শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এ স্থলে আমরা ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিব না। কেবল কায়স্থদিগের বৃত্তান্ত লিখিত হইবে।

মহারাজ বল্লাল দ্বারা কায়স্থগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাসনিবন্ধন প্রধানত চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যথা বঙ্গজ, দক্ষিণ রাঢ়ী, উত্তর রাঢ়ী ও বারেন্দ্র।

উদগত দক্ষিণ রাঢ়েচ বঙ্গ বারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতুশ্রঃ সংজ্ঞা স্যুস্তত্তদ্দেশ নিবাসনাৎ॥
কুলং চতুর্ব্বিধং তেষাং শ্রেণি শ্রেণি বিশেষতঃ

---

from the Ksatriya stock, and that poor relations of kings gladly accepted the posts of accountants and record-keepers in the royal courts. We are informed that to the present day the period of impurity for Kayasthas in Northern India, on the death of relations is the same as is prescribed for Kshatriyas."

আমিরা আনন্দের সহিত রমেশ বাবুর শেষোক্ত মত অনুমোদন করিতেছি। অধিকন্তু কালিঞ্জরাধিপতি চন্দ্রবংশীয় রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মদেবের ১১৯০ সম্বতের ১৫ মাঘের তাম্রশাসনের লিখিত "কুটম্বি কায়স্থ মহাত্মারা দীন সর্ব্বান" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই মতের উপর একটি উজ্জ্বল আলোক নিক্ষেপ করিতেছে। প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গের ক্ষোদিত লিপি সমূহে কুটম্ব ও কায়স্থদিগকে এক শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। চেদিপতি মহারাজ যযল্ল দেবের শাসন পত্রও এই মতকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে।

* আমাদের মতে বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজ বল্লালের সময়ে গঠিত হয় নাই, সুতরাং বৈদ্যদিগের কৌলিন্য প্রথা ও বল্লাল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বৈদ্যদিগের ঘটক নাই, ইহাই আমাদিগের মত সমর্থনোপযোগী সুদৃঢ় প্রমাণ।

বঙ্গজ কায়স্থ।

সেনরাজগণের যে সকল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ে বঙ্গান্তর্গত প্রাচীন (সমতট) বিক্রমপুর* তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান রাজধানী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং কায়স্থদিগের শ্রেণী বিভাগের কথা উল্লেখ করিতে হইলে, প্রথমেই রাজধানী বিভাগের বিষয় উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে আমরা প্রথমেই বঙ্গজ কায়স্থদিগের বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু যে সকল কুলজীগ্রন্থ আমাদের একমাত্র অবলম্বন, তাহা প্রত্যয়োপযোগী নহে। বঙ্গস্থ কায়স্থ সমাজপতি রাজা দনুজমর্দ্দন দেবকৃত শ্রেণী বিভাগের পর বঙ্গজ ঘটকদিগের গ্রন্থসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং বল্লাল ও দনুজ কৃত শ্রেণীবিভাগের মধ্যস্থিত প্রভেদ সমূহ আবিষ্কার করত তাহার সমালোচনা করা নিতান্ত দুরুহ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বঙ্গীয় কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, দেব, সেন, পালিত ও সিংহ, এই দ্বাদশ বংশ বিশুদ্ধ ও প্রধান।

"এতে দ্বাদশ নামানঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধ বংশজাঃ।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ৮৭ বংশীয় কায়স্থ নিম্ন শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন।

ঘটকদিগের গ্রন্থপাঠে অনুমিত হয়, মহারাজ বল্লালসেন দেব বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে ২৭ ঘর কায়স্থের বিশেষ প্রশংসা করিয়া, সেই ২৭ বংশের ২৮ জন কায়স্থকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। *তন্মধ্যে পঞ্চবংশ কুলীন ও দ্বাবিংশ বংশ মহাপাত্র বা সন্মৌলিক।

কুলীন পঞ্চবংশ।

ঘোষ	চতুর্ভুজ।
বসু	লক্ষ্মণ ও পূষণ।
গুহ	দশরথ।
মিত্র	অশ্বপতি।
দত্ত	নারায়ণ। * মৌদ্গল্য গোত্রজ।

মহাপাত্র বা সন্মৌলিক দ্বাবিংশ বংশ

নাগ	দশরথ।
নাথ	মহানন্দ।
দাস	চন্দ্রশেখর।
সেন	গঙ্গাধর।
পালিত	জন।
সিংহ	রত্নাকর।
দেব	কেশব
কর	দামোদর।
দাস	উমাপতি।
চন্দ্র	নারায়ণ।
পাল	আব।
রাহা	কৃষ্ণ।
ভদ্র	দিগাম্বর।
নন্দী	প্রভাকর।
ধর	ব্যাস।
কুণ্ড	অধিপতি।
সোম	বংশধর।
রক্ষিত	নারায়ণ।
অঙ্কুর	বেদগর্ভ।
বিষ্ণু	দৈত্যারি।
আঢ্য	ত্রিলোচন।
নন্দন	উমাপতি।

* ইহার আধুনিক নাম রামপাল।

* এই নারায়ণ দত্ত, মহারাজ বল্লাল ও তৎ পুত্র লক্ষ্মণসেন দেবের মহাসন্ধীবিগ্রহী ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন দেবের শাসনপত্রে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বসুবংশেষু মুখৌদ্বৌনাম্না লক্ষণপূষণৌ।
ঘোষেষুচ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজ মহাকৃতিঃ॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে অশ্বপতি স্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতেচ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥
নাগেদশরথশ্চৈব মহানন্দস্ত নাথকঃ।
চন্দ্রশেখরদাসস্ত সেনে গঙ্গাধরোস্তথা॥
পালিতে জনসংজ্ঞস্যাচ্চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ।
পালে আবঃ সমাখ্যাতোরাহাবংশেষু কৃষ্ণকঃ॥
ভদ্রে দিগাম্বরোশ্চৈব ধবেচ ব্যাসসংজ্ঞকঃ।
প্রভাকরস্ত নন্দীস্তাৎ কেশবো দেববংশজঃ॥
অধিপতিরিতিখ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ।
সোমেবংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকরস্তথা॥
নারায়ণঃ সমাখ্যাতৌ বক্ষিতেচ তথা পরে।
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারি বিষ্ণু সংজ্ঞকঃ॥
আদ্যে ত্রিলোচনো খ্যাত নন্দনেচ উষাপতিঃ।
এতে বঙ্গজা নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা॥

বঙ্গজকায়স্থকারিকা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।*

* ফরিদপুরে একটি আর্য্যকায়স্থসমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই কায়স্থ সমিতি হইতে "আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা" নাম্নী এক খণ্ড ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। আমরা এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ফরিদপুরের কয়েকজন ব্রাহ্মণ এই সমিতির প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছেন। সেই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সম্প্রতি "কায়স্থকুল চন্দ্রিকা" নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ছাপা ও লেখা, উভয়ই কদর্য্য। তাঁহারা যে কি সাহসে এই কদর্য্য পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। এই পুস্তকের প্রকাশক একজন "মোক্তার", সুতরাং কার্য্যটি তাঁহার ব্যবসায়ের অনুরূপই হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতে কায়স্থদ্রোহীদিগের যে সকল মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়াছি, এই পুস্তক খানাতে সেই সকল প্রাচীন কথার চর্ব্বিত চর্ব্বন মাত্র দৃষ্ট হইল। অধিকন্তু কায়স্থদিগের বিরুদ্ধে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের একখানা প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। যতদিন ভারতবাসী স্মৃতি পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করিতে পাইত না, ততদিনই শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় এক্ষণে আমরা সকলেই সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে সক্ষম হইয়াছি। সুতরাং এক্ষণ আর ব্যবস্থার কোন প্রয়োজন নাই। এই সকল ব্যবস্থা-দাতা পণ্ডিতের মধ্যে ত্রিপুরার জলপায়ী পণ্ডিত কেহ আছেন কিনা, তাহা কোন ফরিদপুরবাসী কায়স্থ বন্ধু আমাদিগকে জনাইলে আমরা নিতান্ত অনুগৃহীত হইব, এবং বারান্তরে ব্যবস্থাপত্রের এবং তদ্দাতা পণ্ডিত মহাশয়দিগের মূল্য নিরূপণ করিতে যত্ন করিব।

ব্রাহ্মণেরা সেই প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থদিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার ও বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইহার কারণ কি? কায়স্থগণ কখনই ব্রাহ্মণদিগের উপরে আপনাদের আসন সংস্থাপন করিতে যত্ন করেন নাই। তথাপি এই বিদ্বেষ কেন? কায়স্থ বিদ্বেষ রূপ রোগ কি পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইবে? কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ই হউন আর শূদ্রই হউন, তাহাতে ব্রাহ্মণ জাতির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তথাপি ফরিদপুরের ব্রাহ্মণগণ কেন হিংসার দংশনে অস্থির একরূপ ছুটা ছুটি করিতেছেন! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থার মূল্য যুগী জাতিতেই প্রকাশ হইয়াছে। লজ্জটা কি পদ্মার জলে বিসর্জ্জন করা হইয়াছে নাকি!

সৌরকলঙ্ক।

কবিগণের উপমাস্থল চন্দ্রের কলঙ্ক সকলেই বিদিত আছেন। সূর্য্যের কলঙ্ক তত প্রসিদ্ধ নহে। এতৎসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

সূর্য্যও সময়ে সময়ে কলঙ্কময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার প্রখর জ্যোতিঃ বশতঃ তাঁহার কালিমা-চিহ্ন সহজে দেখা যায় না। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে গালিলীও সর্ব্ব প্রথমে ইয়োরোপে সৌরকলঙ্ক আবিষ্কার করেন। আমাদের দেশে যে উহা জানা ছিল, বিজ্ঞানানুশীলনরতা 'পৃথিবী'-রচয়ত্রী তাঁহার 'পৃথিবী' নামক গ্রন্থে তাহার কয়েকটি প্রমাণ দিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত সেই গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিযাছেন, "দূরবীন সৃষ্টি হইবার পরে ইয়োরোপে অল্পকাল মাত্র সূর্য্যবিম্ব (solar spots) পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মার্কণ্ডেয় পুরাণে রহিয়াছে,

'তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃশনৈঃ।
তেনাস্মিন্ শ্যামিকা জাতা শাতনেনোর্চিষ
স্তথা ॥'

"বিশ্বকর্ম্মা অল্প অল্প করিয়া সূর্য্যের তেজ কর্ত্তন করিয়া লইলেন, যে যে অংশ কর্ত্তিত হইল, সেই অংশটি শ্যামিকা অর্থাৎ কলঙ্ক হইল।"

তাঁহারা যে তখন কলঙ্ক দেখিয়াছিলেন, এই শ্লোকটি তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

জ্যোতির্ব্বিদ বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় সূর্য্যবিম্বের অর্থাৎ সৌরকলঙ্কের কথা স্পষ্টাক্ষরে রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হার্শেল সূর্য্যবিম্বের সহিত দুর্ভিক্ষের যে সম্বন্ধ দেখান, বরাহমিহির বহুদিন পূর্ব্বে তাহাই বলিতেছেন—

"যস্মিন যস্মিন্দেশে দর্শন মায়াস্তি সূর্য্য-
বিম্বস্যাঃ।
তস্মিন তস্মিন ব্যসনং মহীপতীনাং পরি-জ্ঞেয়ং।
* * * * বারিমুচো ন প্রভূত বারিমুচঃ
সরিতো আয়ান্তি তনুত্বং ক্বচিৎক্বচি জায়তে
শস্যং।"

যে যে দেশে সূর্য্যবিম্ব দেখা যায়, সেই সেই দেশাধীপের বিপদ জানিতে হইবে। * * মেঘ সকল প্রভূত বারি বর্ষণ করে না। নদী সকল ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং কোন কোন স্থানে মাত্র শস্য জন্মায়।"

উপরি উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা যায়, বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবাসী সৌরকলঙ্ক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, ইদানীন্তনের কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ন্যায় তাঁহারা পৃথিবীর, সুতরাং আমাদের ইষ্টানিষ্টের সহিত সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে। বাস্তবিক, জ্যোতিষ ও দর্শন শাস্ত্র ভারতের কিরীট স্বরূপ। তাহার কহিনূরের অতিবিস্তৃত সুদূর-প্রসারিত রশ্মিমালায় এখনও লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে সৌরকলঙ্কের অস্তিত্ব জানা থাকিলেও, তাহা যে সবিশেষ সন্ধ সম্পণে

ঙ্কের বিস্তার অবগত হওয়া যায়। উহার কেবল অপূর্ণচ্ছায়াটি দশ সহস্র মাইল দীর্ঘ ছিল; অর্থাৎ উহা সৌরদেহের দশ কোটি বর্গ মাইল স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ইহাকে সামান্য বলিতে হইবে, কেন না এতদপেক্ষা বৃহত্তর কলঙ্ক দেখা গিয়াছে। একবার একটিকে ৪৫০০০ পঁয়তাল্লিশ সহস্র মাইল দীর্ঘ দেখা গিয়াছিল, তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাহা দুই শত কোটি বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল।

সূর্য্যদেহে কলঙ্কের সংস্থান ভেদও বিচিত্র। ইরোরোপীয় জ্যোতির্বিদগণ উহা সূক্ষ্মরূপে অবধারণ করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, সূর্য্যবিম্বের সকল স্থানেই কলঙ্ক দেখা যায় না। সৌরগোলকের নিরক্ষবৃত্তের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে ও নিম্নে মাত্র কলঙ্ক দেখা যায়। উহার মেরুদ্বারে কিম্বা তৎসন্নিকটে কিছু মাত্র কলঙ্ক কথন দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্যবিম্বের নিরক্ষবৃত্ত লইয়া উত্তর দক্ষিণে ৩০°।৪০° অক্ষাংশ পরিমিত মণ্ডলের মধ্যে কলঙ্ক আবির্ভূত হয়।

দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্যবিম্বস্থ কলঙ্কগুলি কোথায় এবং কিরূপ দেখায়, তাহা বলা গেল। কঠিন বিষয় বলিতে বাকী আছে। উক্ত কলঙ্কগুলির উৎপত্তি কিসে, এ সম্বন্ধে বহুবিধ মত প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক কপোল-কল্পিত মত আড়ম্বর পূর্ব্বক বিজ্ঞান-সমাজে ঘোষিত হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যদ্দ্বারা সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি ও উৎপত্তি বুঝিতে পারা যাইবে, তদ্দ্বারা সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থাও জানা যাইবে। গ্লাসগো-বাসী ডাক্তার উইলসন সাহেব বিগত শতাব্দীর শেষভাগে প্রথমে এসম্বন্ধে এক মত ব্যক্ত করেন। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ সার উইলিয়াম হার্শেল সাহেব তাঁহার মত স্বীকার করিয়া বলেন যে, সূর্য্যবিম্বের চতুর্দ্দিকস্থ বাষ্পরাশির আলোড়ন বশতঃ মধ্যে মধ্যে তথায় ফাঁক উৎপন্ন হয়। সেই সকল ছিদ্র দিয়া সৌরদেহের কৃষ্ণবর্ণ কঠিনাংশ দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ কৃষ্ণবর্ণ অংশই তাঁহার মতে সৌরকলঙ্ক। উক্ত পণ্ডিতের স্বনাম-খ্যাত-পুত্র সার জন হার্শেল সাহেব উক্ত ব্যাখ্যা অবলম্বন করেন, আর বলেন যে, সৌরবাষ্প-মণ্ডলে ঝটিকা উৎপন্ন হইলে উহার স্থানে স্থানে ছিন্নবিছিন্ন হওয়া সম্ভব। যাহা হউক, এই ব্যাখ্যা তত সন্তোষপ্রদ নহে। কেন না এতদ্দ্বারা সূর্য্যের প্রভূত তেজোরাশির উৎপত্তি বুঝা যায় না। সূর্য্য হইতে নিরন্তর তাপ ও আলোক বিকীর্ণ হইতেছে, সেই তাপ ও আলোকের অবশ্য সমুচিত কারণ আছে।

বিশ্ব জগতের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ মত আছে। তন্মধ্যে লাপলাস প্রকাশিত নেবুলা নামক সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থ হইতে জগতের উৎপত্তির কথা বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে বিশেষ সমাদৃত। তিনি বলেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহাদি তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ছিল না। তাহাদিগের পরিবর্ত্তে আকাশে কেবল জ্বলন্ত বাষ্পরাশি ছিল। উক্ত উত্তপ্ত বাষ্পরাশি ক্রমশঃ শীতল হইয়া জমিতে থাকে। সেই বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়াই সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহাদি রূপ ধারণ করিয়াছে। সার উইলিয়াম টমসন সাহেব উক্ত মত অনুসরণ পূর্ব্বক বলেন যে, বাষ্পময় সৌরদেহ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকাতেই এত তেজোরাশি বিকীর্ণ হইতেছে। বাষ্পীয় অবস্থায় যে শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, বাষ্পসঙ্কোচন কালে

তাহাই তেজোরূপে প্রকাশিত হইতেছে। হেলম্‌হোল্‌জ, র‍্যানকিণ, টেট প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপকগণও এই মত সমর্থন করেন। হেলম্‌হোল্‌জ সাহেব বলেন যে, সূর্য্যের বাস্পময় দেহের সঙ্কোচন কালে উহার বাস্প-মণ্ডলে বিশাল আবর্ত্ত উৎপন্ন না হওয়াই অসম্ভব। কেন না বিকীরণ বশতঃ সৌর বাস্পমণ্ডলের পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শীতল ও ঘন হইতেছে। উক্ত ঘন অংশ নিম্নস্থ অপেক্ষাকৃত কম ঘন ও অধিকতর উত্তপ্ত বাস্পরাশির উপর অবস্থিত হইতেছে। আমা-দের পৃথিবীতেও সেই কারণ ।তঃ বাতা বর্ত্ত প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের যাবতীয গতি উৎপন্ন হইযা থাকে। সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত ভূভাগের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু নিম্নে উত্তপ্ত হয় এবং উপরে প্রচুর বিকীরণ বশতঃ সর্ব্বদা শীতল থাকে। সূর্য্যের আকৃতি ও তাহার উত্তাপ স্মরণ করিলে সৌরবাস্পমণ্ডলে অতীব প্রকাণ্ড আলোড়নের সংঘটন বুঝিতে বাকী থাকে না। সূর্য্যের ধাতব বাস্পমণ্ডলে আবর্ত্ত জন্মিলে, আবর্ত্ত-কেন্দ্রের চাপ নিশ্চয়ই কম পড়িবে। তাহাতে তথায় শৈত্য উৎপন্ন হইয়া বাস্পীয় ধাতব সামগ্রী অপেক্ষাকৃত ঘন ভাবাপন্ন হইবে। সুতরাং তথায় সৌরদেহা-ভিমুখে অতি বিস্তৃত অপেক্ষাকৃত অল্পোষ্ণ বাস্পরাশি মেঘবৎ প্রতীয়মান হইবে। অত-এব সমুদায় কলঙ্কগুলি সৌর বাস্পমণ্ডলস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর বিশেষ। অপেক্ষা-কৃত অল্পোষ্ণ হওয়াতে এক একটি কলঙ্ক নিম্নস্থ অধিকতর উজ্জ্বল প্রভাময় সৌরদেহে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। বলা আবশ্যক যে, কৃষ্ণবর্ণ দেখাইলেও উহা একেবারে নিষ্প্রভ নহে। প্রখর তাড়িতালোকের সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত বাতি ধরিলে বাতি যেমন নিষ্প্রভ দেখায়, তদ্রূপ কলঙ্কসকলও সৌরদেহের প্রচণ্ড আলোক বশতঃ নিষ্প্রভ দেখায়। সৌরকলঙ্ক যে সৌর-বাস্পের আবর্ত্ত-সম্ভূত, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা কলঙ্কের আকার পবিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহা প্রমাণিত হয়। পুনশ্চ রশ্মি দর্শন-যন্ত্র ও সৌরবাস্পমণ্ডলের ভয়ঙ্কর অলোড়েনর সত্যতার অন্য প্রকার সাক্ষ্য প্রদান করে।

উপরে সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি ও উৎপত্তি সামান্যতঃ বর্ণিত হইল। কলঙ্কের উৎপত্তির বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, সূর্য্যের মধ্যভাগ অপেক্ষা অল্পোষ্ণ বাস্প-রাশি তাহাব চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। সেই বাস্পরাশির কথাই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সূর্য্যের মধ্যভাগ হইতেই আলোক ও তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। আমাদের মৃন্ময় পৃথিবীর চরিদিকে যেমন বায়ুরাশি ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সূর্য্যদেহের চারিদিকেও ধাতব বাস্প তদ্রূপ পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ, সূর্য্যবিম্বের চিত্র ফটোগ্রাফী যন্ত্র দ্বারা নানা মানমন্দিরে অঙ্কিত হইতেছে। তৎসমুদায় তুলনা করিলে সৌর বাস্পমণ্ডলের অস্তিত্ব জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ রশ্মিদর্শন-যন্ত্র সাহায্যে সৌরকর জাল নিরীক্ষণ করিলে সৌরদর্শনে (Solar spectrum) অসংখ্য রেখা সকল দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সমস্ত কৃষ্ণ রেখা অনুসন্ধান পূর্ব্বক কীরকফ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক সুন্দর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা বাস্পমণ্ডলের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ সূর্য্যগ্রহণ কালে দেখা যায় যে, সূর্য্যবিম্বের বহির্দ্দিকে লোহিত আলোক অগ্নিশিখাবৎ প্রতীয়মান হয়। তাহা অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়

যে, সূর্য্যবিম্বের মধ্যভাগে যাহাই থাকুক, উহার পৃষ্ঠদেশ অতীব প্রখর জ্যোতিবিশিষ্ট। এই জ্যোতিবিশিষ্ট বহির্ভাগের নাম দ্যুতি মণ্ডল রাখা হইয়াছে। ইহার বাহিরে আরও দুইটি আবরণ রহিয়াছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় সেগুলি বর্ণিত হইল না। এস্থলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দ্যুতিমণ্ডলের বাস্পময় গহ্বর গুলিই কলঙ্ক স্বরূপ দেখা যায়। সেই গহ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গভীরতা বশতঃ কলঙ্কের পূর্ণচ্ছায়া ও অপূর্ণচ্ছায়ার উৎপত্তি।

সৌরকলঙ্ক দ্বারা আমাদের কোন ইষ্টানিষ্ট আশঙ্কা আছে কি না, তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। ইতি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বরাহমিহিরের শ্লোক, পৃথিবী নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। হোফরাথ সোয়াবে সাহেব প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সৌরকলঙ্ক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর সৌরকলঙ্ক সমান পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। প্রায় প্রত্যেক একাদশ বৎসর ব্যবধানে কলঙ্কের সংখ্যা অধিক দেখা যায়; অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক একাদশ বৎসরে সূর্য্য নিষ্কলঙ্ক ও কলঙ্কময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই শতাব্দীর ১৮০০, ১৮১১, ১৮২২, ১৮৩৩, ১৮৪৪, ১৮৫৬, ১৮৬৭, ১৮৭৮, ১৮৮৮ বৎসরে সৌরকলঙ্ক অত্যল্প সংখ্যক ছিল। এবং ১৮০৫, ১৮১৬, ১৮২৭, ১৮৩৮, ১৮৪৮, ১৮৫৯, ১৮৭১, ১৮৮২ বৎসরে বহু সংখ্যক বৃহৎ আকারের কলঙ্ক দেখা গিয়াছে *। এই নিয়মানুসারে এ বৎসরের প্রারম্ভে এবং গত বৎসরের সৌরকলঙ্কের নিম্নতম সংখ্যার কালের অবসান হইবার আশা করা গিয়াছিল। বাস্তবিক বিগত বৎসরে সৌরকলঙ্কের প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক, ইহাতে উক্ত চক্রাকার কাল পরিবর্ত্তনের ব্যতিক্রম ধরা যাইবে কি না, সন্দেহ আছে। এই বৎসরের বিগত মার্চ্চমাসে সূর্য্যের উচ্চ অক্ষাংশে দুইটী কলঙ্ক সূর্য্যবিম্বে পরিভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। তাহাতে বোধ হয় যে, এবারের অপেক্ষাকৃত অধিককাল ব্যাপী সৌরকলঙ্কের অভাব শীঘ্র দূর হইবে। বস্তুতঃ সূর্য্যবিম্বে এক্ষণে কলঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণচিহ্ন দেখা গিয়াছে। ইতি মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসেও সামান্য সামান্য কলঙ্ক দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক, দুই তিন মাসের মধ্যে বোধ হয় সৌর বাস্পমণ্ডলের ক্রিয়া-সূচক কলঙ্ক দেখা যাইবে।

সৌরকলঙ্কের উর্দ্ধতম ও নিম্নতম কালচক্রের পরিবর্ত্তনের সহিত পৃথিবীর ঝড় বৃষ্টি শস্য ও বাণিজ্যের সম্বন্ধ দেখাইবার অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতীয় বায়ুবিদ্যা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ব্লানফোর্ড সাহেব তৎকৃত বায়ুবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মেলড্রাম সাহেব ভারত সমুদ্রের দক্ষিণাংশে এবং পোএ সাহেব ওয়েষ্টইণ্ডিজ প্রদেশের বাতাবর্ত্ত সকলের উৎপত্তিকাল আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে যে বৎসর সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্য ছিল, সেই সেই বৎসরে বাতাবর্ত্ত অধিক সংখ্যক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন বাতা-

* এখানে বলা আবশ্যক যে, সৌরকলঙ্কের উর্দ্ধতম ও নিম্নতম সংখ্যায় কালের চক্রাকার (cycle) পরিবর্ত্তন ঠিক একাদশ বৎসরে সম্পন্ন হয় না। ইহার কাল পরিমাণ ১১.১১ বৎসর। উপরের তালিকায় উর্দ্ধতম ও নিম্নতম সংখ্যায় কালের নিকটবর্ত্তী বৎসর দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ। দুঃখের বিষয় এখানকার বাতাবর্ত্ত গুলির বিবরণ বহুদিন হইতে তাদৃশ যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ হয় নাই। অনেক বৎসরের বাতাবর্ত্তের সংখ্যা না পাইয়া উহাদিগের আবির্ভাব কালের কোন নিয়ম বাহির করিতে পারা যায় না। ১৮৭২ হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরে কিম্বা ভারতের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের অপরাংশে যে সকল বাতাবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকলের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় এক শতটি বাতাবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াছে। দেখা যায় যে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী (১৫টি) বাতাবর্ত্ত জন্মে। এবং ১৮৭৩ ও ১৮৭৫ অব্দে একটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ঐ ঐ বৎসরের সঙ্গে সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্য বা অপ্রাচুর্য্যের কোন বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায় না।

সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্যের সহিত বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য্যের সম্বন্ধ এক্ষণে দেখা যাউক। ব্লানফোর্ড সাহেব ভারতের বৃষ্টি ও সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন। মেলড্রাম, লকিয়ার, সার উইলিয়াম হার্শেল এবং উল্‌ফ সাহেব ভূপৃষ্ঠের বৃষ্টিপতনের পরিমাণ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সৌরকলঙ্কের সংখ্যার সহিত বৃষ্টি পরিমাণের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, যে যে বৎসর অধিক সংখ্যক কলঙ্ক দেখা গিয়াছে, সেই সেই বৎসরে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং কলঙ্কের নিম্নতম সংখ্যার বৎসরে বৃষ্টিপাতও কম হইতে দেখা গিয়াছে। অধিকন্তু, সার উইলিয়াম হার্শেল ও অধ্যাপক উল্‌ফ সাহেব অনেক বৎসরের পুরাতন বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছেন যে, কেবল তাহাই নহে, সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্যের বৎসরে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে ও শস্যের মূল্য-হ্রাস ঘটিয়াছে। সিংহল দ্বীপে এই নিয়মটি নাকি এত দূর লক্ষিত হইয়াছে যে, তথাকার সাধারণ লোক সমাজ পর্য্যন্ত তাহা অবগত আছে। দক্ষিণ-ভারতের দুর্ভিক্ষ ও সৌরকলঙ্কের অপ্রাচুর্য্য এক সময়েই ঘটিয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ডাক্তার হাণ্টার সাহেব বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন। ব্লানফোর্ড সাহেব ভারতের মধ্যে সিংহল, কর্ণাট প্রদেশ ও সামান্যতঃ মান্দ্রাজ প্রদেশ সম্বন্ধে বৃষ্টিপাত ও সৌরকলঙ্কের সমকালিক আতিশয্য এক প্রকার স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, বিগত ২২ বৎসরের মধ্যে ভারতের নানা স্থানের বৃষ্টিপাত তুলনা করিলে সমুদায় ভারত সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম দেখা যায় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিল সাহেব তথাকার শীতকালের বৃষ্টিপাতে এইরূপ একটা সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সৌরকলঙ্কের সহিত ভূতলস্থ ঝটিকা ও বৃষ্টিপাতের সম্বন্ধ কেন থাকিবে? ইহার উত্তরে এই দেখা যায় যে, সূর্য্যবিম্ব হইতে তাপ ও আলোক প্রতি বৎসর সমান পরিমাণে বিকীর্ণ হয় না। এরূপ ঘটিবার কারণ এই যে, সূর্য্যবিম্ব কখনও বা অধিক কখনও বা অল্প সংখ্যক এবং বিভিন্ন পরিমাণ আকারের কলঙ্কে আবৃত থাকে। বস্তুতঃ, জলীয় বাষ্প নিঃসরণের উপর বৃষ্টি পরিমাণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সূর্য্যবিম্ব যখন সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক থাকে, তখন উহা হইতে তেজঃ কম পরিমাণে

বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়। এজন্য সে সময় বাষ্প নিঃসরণ ক্রিয়া ও বৃষ্টিপাত কম দেখা যায়। ইহা যে কতদূর সত্য, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। বহু বৎসরাবধি পর্য্যবেক্ষণ না করিলে এ সকল বিষয়ে কোন সম্বন্ধ বাহির করা বৃথা। গত বৎসর সৌরকলঙ্ক দেখা যায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অথচ গত বৎসরে কি বাণিজ্য কিম্বা শস্য কম হয় নাই? ব্লানফোর্ড সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সৌরকলঙ্কের উর্দ্ধতম সংখ্যার কালের দুই এক বৎসর পরে বৃষ্টিপাত বেশী হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, এ তত্ত্বের শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই। অনেক বৎসর ধরিয়া সূর্য্যবিম্বের ফটোগ্রাফ তুলনা করিলে বোধ হয় তাহার সকলঙ্ক কিম্বা নিষ্কলঙ্ক অবস্থা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। এজন্য অনেকগুলি বড় বড় মানমন্দিরে সূর্য্যের প্রতিরূপ অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ফটোগ্রাফ যন্ত্রাদি সজ্জিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে যে দিবস সূর্য্য আকাশমার্গে দৃশ্যমান হয়, সেই দিবসেই, তাহার প্রতিরূপ চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত করা হইতেছে।

প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর দুইটি কথার উল্লেখ না করিলে ইহা অসম্পূর্ণ থাকে। সৌরকর-জালের সহিত পার্থিব ব্যাপারের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এতদ্দারা বুঝা যাইবে। সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব কোন কোন ব্যাপারের আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখা যায়। মেরুজ্যোতিঃ (aurora) নামক যে নৈসর্গিক ব্যাপার আছে, তাহা প্রতি বৎসর সমান সংখ্যার দেখা যায় না। কোন বৎসর বা উহার সংখ্যা বেশী, কোন বৎসর বা কম দেখা যায়। বড় আশ্চর্য্য কথা যে, সৌরকলঙ্কের উর্দ্ধতম ও নিম্নতম সংখ্যার বৎসর ও মেরুজ্যোতির উর্দ্ধতম ও নিম্নতম সংখ্যার বৎসর প্রায় এক। ইহার চক্রও দশ হইতে একাদশ বৎসরের মধ্যে পূর্ণ হয়।

আর একটি ব্যাপার এই যে, সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্যের সহিত চুম্বক শলাকার অবস্থিতির দিক্ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। একটা চুম্বকশলাকা শূন্যে ঝুলাইয়া দিলে, উহাকে প্রায় উত্তর দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। ভূভাগের কোন অংশে উহা বরাবর একই দিকে স্থির থাকে না। ইহার অবস্থানের একটি দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রাতঃকালে উহার উত্তরমুখ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে এবং মধ্যাহ্নে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হেলিতে দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠের সকল স্থানে এই দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন সমান পরিমাণে ঘটে না; কিম্বা প্রতি বৎসরও সমান পরিমাণে হয় না। দশ বৎসরের কিঞ্চিদধিক কালে ইহার পরিবর্ত্তনচক্র সম্পূর্ণ হইতে দেখা যায়। বাস্তবিক সৌরকলঙ্কের কালচক্রের সহিত মেরুজ্যোতিঃ ও চুম্বকশলাকার কালচক্রের ঐক্য লক্ষিত হয়।

অনেকে আবার মনে করেন যে, বৃহস্পতি, শনি ও শুক্র গ্রহের আপন আপন কক্ষের বিশেষ বিশেষ অংশের অবস্থিতির সহিত, সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ আছে। কিরূপে এই সকল গ্রহ সূর্য্যের পৃষ্টদেশের পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে, তাহা সম্যক্ জানা নাই। ডাক্তার লুমিস সাহেব মনে করেন যে, সূর্য্যের চারিদিকে প্রবল তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে। তাঁহার মতে সৌরতেজের তাহা অন্যতর কারণ। যাহা হউক, ঐ সকল গ্রহ

সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিবার সময় বিশেষ বিশেষ অংশে তাহারা সূর্য্যের উপর কার্য্য করিতে পারে। তাহাতে ঐ সকল গ্রহের ভ্রমণ কালের সহিত সৌরকলঙ্কের কাল চক্রের ঐক্য ঘটিয়া থাকে। যদিও কোন কোন স্থলে এরূপ ঐক্য ঘটিতে দেখা গিয়াছে তথাপি তাহাদিগের মধ্যে যে কোন কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে, এমন বোধ হয় না। বোধ হয় তৎসমুদায় কাকতালীয় রূপে ঘটিয়া থাকে। সূর্য্যের জ্যোতিঃ-মণ্ডলের উপর বৃহস্পতি গ্রহের ক্রিয়ার দ্বারা সৌরকলঙ্কের উৎপত্তির কথাও কেহ কেহ বলেন। প্রকৃটর সাহেব এই মত সমর্থন করিতেন। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সৌর-কলঙ্কের ঊর্দ্ধতম সংখ্যার কাল ছিল, তখন বৃহস্পতি গ্রহ দূরকক্ষে অবস্থিত ছিল। বিশ বৎসর অগ্রে বৃহস্পতি গ্রহ নিকটকক্ষে ছিল, তখনও একবার সৌরকলঙ্কের ঊর্দ্ধতম সংখ্যার কাল ছিল।

সারজন হার্শেল সাহেব একটি সৌর-কলঙ্কের যে পরিমাণ করিয়া ছিলেন, তাহার সারাংশ দিয়া এ প্রবন্ধটি শেষ করা যাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, "১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আমি একটা কলঙ্কের বিস্তার পরিমাণ করি। তাহা তিন শত আটাত্তর কোটি বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ছিল। একটার মধ্যস্থিত যে গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ পূর্ণচ্ছায়া দেখা গিয়াছিল, উহা এত প্রকাণ্ড যে, তাহার ভিতর দিয়া আমাদের পৃথিবী অনায়াসে প্রবেশ করিয়া তাহার কোন অংশ স্পর্শ না করিয়া নির্গমন করিতে পারিত। কেবল তাহাই নহে, পৃথিবীর চারি-দিকেও প্রায় সহস্র মাইল ব্যবধান থাকিতে পারিত। * এতদপেক্ষা বৃহত্তর কলঙ্কের বিবরণ পাওয়া যায়। কি ভয়ঙ্কর অগ্নিময় ঝটিকা সূর্য্যদেহে বহমান হইতেছে, ইহা হইতে তাহার কথঞ্চিত আভাষ পাওয়া যায়। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, যে তদ্দারা স্থানে স্থানে আবর্ত্ত জন্মিয়া সূর্য্যপৃষ্ঠের আকার এতাদৃশ পরিবর্ত্তিত হয়।" কি প্রকাণ্ড ভাবেই সৃষ্টি স্থিতি কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। সূর্য্য একটা সামান্য অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র। এত ক্ষুদ্র যে সিরিয়ান নামক একটা নক্ষত্রই দুই তিন শত সূর্য্যকে গ্রাস করিতে পারে। সেই সকল নক্ষত্রে না জানি কি ভীষণ পরাক্রমে, কি বিশাল আকারে প্রাকৃতিক কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ড আবার অনন্ত অসীম, তাহার রহস্যও অনন্ত অসীম।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।

হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইউরোপের সভ্যজাতিগণের মধ্যে নাটকীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই, এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহারও সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে পূর্ণ মাত্রায় নাটকের প্রচার ছিল।

মনুষ্যসমাজে নাটকের সৃষ্টি অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। মানব জাতির

মধ্যে অনুকরণ প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী। বালকবালিকাদিগের মধ্যে এই অনুকরণ করিবার শক্তি সম্যক্‌রূপে পরিলক্ষিত হয়। বালকেরা প্রায়ই পরিণতবয়স্কদিগের আচার ব্যবহারাদি অনুকরণ করিয়া থাকে। তাহারা কখন রাজা, কখন বিচারক, কখন পিতা, কখন অধ্যাপক প্রভৃতির বেশ ধারণ করিয়া সবিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত তাঁহাদের অনুষ্ঠানাবলীর অনুকরণ করিয়া থাকে। বালিকাদিগের প্রায় প্রত্যেক ক্রীড়ার সহিত সংসারের গুরুতর ব্যাপার সমূহের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দেশীয় ষষ্ঠবর্ষীয়া বালিকা পুত্রীকৃত মৃৎপুত্তলের বিবাহ সম্পাদন কার্য্যে কতই বিব্রত; তাহার নিমন্ত্রণের ঘটাই বা দেখে কে। মানবজাতির এই অন্তর্নিহিত অনুকরণী প্রবৃত্তি, অনন্ত ঘটনাপূর্ণ মানবজীবন এবং অনন্ত লীলাময়ী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ব্যাপ্তি এবং উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, এবং ইহাই কালক্রমে নানারূপান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক চক্ষু ও কর্ণের যুগপৎ প্রীতিপ্রদ, অত্যুৎকৃষ্ট আমোদ-প্রদান-সমর্থ নাটকাভিনয় ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে, এই অনুমান করা কোন ক্রমেই যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কেবল আর্য্যজাতির মধ্যেই নাটকের বহুল প্রচার দেখা যায়। তন্মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীসে স্বাধীনভাবে নাটকের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। প্রাচীন রোম হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইংলণ্ড, জর্ম্মনি প্রভৃতি সমগ্র ইয়োরোপ গ্রীসের নিকট নাটকাভিনয় শিক্ষা করিয়াছে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি জাতিকে নাটকাভিনয় প্রথা শিক্ষা দিয়াছে। প্রাচীন পারসীকদিগের মধ্যে নাটকের প্রচার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সেমিটিক জাতির মধ্যেও নাটক নাই। আরব এবং হিব্রুজাতিরা এক সময়ে সভ্যতার অত্যুন্নত সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার নাটকাভিনয়ের উল্লেখ নাই। হিরোডোটস প্রাচীন মিশরবাসিদিগের সভ্যতার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, এবং তাহাদের আচার, নীতি এবং সামাজিক অবস্থাদির অনেক সূক্ষ্ম বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার নাটকের অভিনয় হইত, এরূপ কোন আভাষ দেন নাই। পক্ষান্তরে চীনজাতির প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির সহিত তাহাদের উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় প্রথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এমন কি, কোন কোন অনুকরণপ্রিয় অসভ্যজাতিদিগের মধ্যেও, এক প্রকার সামান্য রকম অসভ্যোচিত যাত্রাভিনয়ের ন্যায় নাটকাভিনয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কি নিমিত্ত মনুষ্যের স্বাভাবিক অনুকরণী প্রবৃত্তি ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কেবল কয়েকটী জাতির মধ্যে নাটকের আকার ধারণ করিয়াছে, এবং কি নিমিত্তই বা অবশিষ্ট দেশগুলিতে নাটকের উৎপত্তি হয়নাই, তাহা নিরূপণ করা অতি কঠিন ব্যাপার। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে জাতির মধ্যে প্রাচীন কালে নাটকাভিনয় প্রথা বর্ত্তমান ছিল, তাহারা সভ্যজাতিবৃন্দের শীর্ষ স্থানীয়, এবং জাতি সাধারণের অবশ্য পূজনীয়।

যতদূর অনুমান দ্বারা স্থির করিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয়, নৃত্য গীত হইতেই নাটকের প্রথমোৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃতে 'নাটক' শব্দটী, 'নৃত্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'নৃত্য' এবং 'নাট্য', 'নর্ত্তক' এবং 'নট' উভয় একই পদার্থ বলিয়া বোধ হয়।

প্রথমতঃ নৃত্যের সহিত আনুষঙ্গিক অঙ্গসঞ্চালনাদি এবং সঙ্গীতের সমাবেশ; পরে হস্তাদি সঞ্চালন এবং বহুবিধ মুখভঙ্গির সহিত স্বাভাবিক ভাষায় কোন পৌরাণিক ইতিবৃত্তের বর্ণনা; তৎপরে যাত্রাদির ন্যায় কথোপকথন এবং সঙ্গীতের সংমিশ্রণ এবং সর্ব্ব শেষে প্রকৃত নাটকের সৃষ্টি; এইরূপ ক্রমবিস্তারেই নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে নাটকের কয়েকটী বিভিন্ন স্তর স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বঙ্গীয় নাটকের উৎপত্তি একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, সাধারণতঃ নাটকের উৎপত্তি বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙ্গালা নাটকের প্রথম অবস্থা, রামায়ণ কিম্বা মহাভারত অথবা অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ; ইহাকে সাধারণতঃ "কথা" বলে। "কথক" ঠাকুর রামায়ণাদির অংশ বিশেষ সুর করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রবণ করাইয়া থাকেন। তিনি রামের কথা, রাবণের কথা, অথবা হনুমান প্রভৃতির কথা, শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনার্থ বিভিন্ন ভাষায় বিবিধ সুরে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি সহকারে ব্যক্ত করেন। এই স্থানেই আমরা নাটকাভিনয়ের অঙ্কুর দেখিতে পাই। দ্বিতীয় স্তর, আমাদের দেশের যাত্রাভিনয়। ইহাতে নাটকের প্রধান প্রধান উপকরণ কথোপকথন, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রায় সমুদায়ই পরিলক্ষিত হয়, কেবল অভিনয় ক্রিয়া, কবিত্ব প্রভৃতি কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, সম্যক্ পরিস্ফুট হইতে পারে না। ইহারই অব্যবহিত পরে, পূর্ণ নাটকের সৃষ্টি; উৎকৃষ্ট সঙ্গীত, উৎকৃষ্ট চিত্র এবং উৎকৃষ্ট কবিত্বের একত্র সমাবেশ; বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের যুগপৎ পরম পরিতৃপ্তি।

জাতীয় সভ্যতার সহিত নাটকের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। জাতীয় সমৃদ্ধির উন্নত অবস্থাতেই নাটকের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, প্রত্যেক সুসভ্যজাতির মধ্যে এমন এক সময় আসে, যে সময়ে নাটকের স্বাভাবিক সৃষ্টি হইয়া থাকে। নানা প্রকার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া এবং উন্নতির চেষ্টার সময়ে নাটক এবং নাটকাভিনয় প্রথার সৃষ্টি হয়। দুই একটী সভ্যজাতির ইতিহাস পাঠ করিলে এই কথাটী স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ইংলণ্ডের পরম সৌভাগ্যবতী রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে ইংরেজ জাতির নাটকের সৃষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই সময় ইংরেজ জাতি উন্নতির চরমসীমা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদিগের শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল এবং তাহারা উদ্যমশীলতা এবং কর্ম্মদক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে সমৃদ্ধি সুখ এবং শান্তি বিরাজ করিতেছিল। ইংরাজেরা তখন ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, নূতন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল। স্প্যানিস্ আর্ম্মাডার (Spanish Armada) পরাজয়ে ইংরাজের বাহুবল অতুলনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইল। কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধির প্রতিদিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। লোকের কর্ম্মদক্ষতা, কর্ম্ম করিবার বাসনার সহিত চতুর্গুণ উদ্দীপিত হইল। কেহ আমেরিকায় নূতন দেশ আবিষ্কার করিতে চলিল; কেহ ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ অন্বেষণ করিতে চলিল; কেহ বা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করিতে গিয়া সহস্র প্রাণীপূর্ণ অর্ণবযান সহিত অতল জলে ডুবিয়া গেল। এইরূপ নানা প্রকার "ঘাত প্রতি-

ঘাস্তের” মধ্যে ইংরাজের জাতীয় নাটকের সৃষ্টি হইল। জাতীয় প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি ক্রমে নাটকীয় হইয়া পড়িল। প্রথমে অসম্পূর্ণ নাটক ‘Mysteries”, “Moralities”, “Interludes”, প্রভৃতি নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। পরে নাটকগুরু সেক্সপীয়ার এবং তাঁহার সমসাময়িক নাটককারগণ কর্তৃক নাটকের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি হইল। প্রাচীন গ্রীসদেশেও নাটক সৃষ্টির ইতিহাস এইরূপ। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসবাসীগণ পারস্যাধিপতি জেরাক্সিসের ৫০ লক্ষ সেনাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। তাহাদের বাহুবল তখন অসীম। এই সময়ের কিঞ্চিৎ পরে পেরিক্লিস্ এথেন্সের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার শাসনগুণে এথেন্সবাসিদিগের সুখের সীমা ছিল না। এই সময়ে তাহারা শিল্পবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার সুকুমার শিল্পে চরমোৎকর্ষ লাভ করিযাছিল। তখন তাহাদের অদ্ভুত উদ্যমশালিতা ছিল। এইরূপ সময়েই এথেন্সে নাটকের সৃষ্টি হয়। প্রথমে ধর্ম্মমন্দিরে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত যাত্রাদি হইত। পরে এস্কিলিস্, সফোক্লিস্, ইউরিপাইডিস্, এরিষ্টফেনীস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা নাটকরচয়িতৃগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা অত্যুৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্যাবলী রচনা করিয়া রাজকোষের ব্যয়ে অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডল সমক্ষে অভিনয় প্রদর্শন করাইতেন; এবং আপামর সর্ব্ব সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থনিচয় অদ্যাপি তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

এইরূপে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নাটক সভ্যতার একটি অঙ্গ। যে দেশ প্রাচীন কালে নাটকীয় সাহিত্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে দেশ যে সেই সময়ে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শত শত প্রমাণ আছে; প্রাচীন ভারতে নাটকীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ, অন্যতম একটি প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান কালে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকাবলীর অনুশীলনে আমাদের অনেক উপকার দর্শিতে পারে। ইহাদের অনেকগুলি, সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন, প্রকৃত কবিত্বের খনি। কালিদাস ও ভবভূতির নাটকগুলি কিরূপ অলৌকিক কবিত্বরসে পরিপূর্ণ, কিরূপ অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। সংস্কৃত নাটকাবলী প্রকৃত কাব্যরসজ্ঞের চিত্তবিনোদন এবং উপদেশ প্রদানে সম্পূর্ণ সমর্থ। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন নাটকের আলোচনায় আমাদের আর একটি গুরুতর লাভ আছে। আমাদের প্রাচীন কালের কোন প্রকৃত ইতিহাস নাই। প্রাচীন হিন্দু সমাজের অবস্থা প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার। আমাদের প্রাচীন নাটকগুলি অনেক পরিমাণে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের স্থান পূরণ করে। ইতিহাস শুদ্ধ ঘটনাবলীর শৃঙ্খল নহে; অথবা রাজবৃন্দের জীবনীও নহে। এলিজাবেথ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন; তাঁহার পিতার নাম ৮ম হেন্‌রী, তাঁহার পিতামহের নাম ৭ম হেন্‌রী; দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দে হইয়াছিল; এইরূপ কয়েকটি বিবরণ অবগত হইলেই ইতিহাস জানা হইল

না। জাতি, জাতীয়তার সংগঠন, জাতির উন্নতি, জাতির সমৃদ্ধির বিবরণ এবং জাতীয়ত্বের ক্রমবিকাশ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় লইয়াই প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হওয়া উচিত। হিন্দুজাতির এই সকল বিবরণ জানিতে হইলে তাহাদের প্রাচীন কালের নাটকীয় সাহিত্য অনুসন্ধান করা উচিত। প্রাচীন হিন্দুজাতির আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, রাজনৈতিক অবস্থা, সমাজের অবস্থা, প্রভৃতি সমস্তই এই নাটকাবলীতে বর্ণিত আছে। নাটকে কল্পিত চরিত্রের সমাবেশ হইলেও, এমন কোন নাটক হইতে পারে না, যাহাতে দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী অথবা সামাজিক অবস্থার ছায়া প্রতিফলিত হয় না।

এক্ষণে আমরা হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ প্রয়োগ করিব।

আমাদের দেশের কতকগুলি প্রথা এত প্রাচীন যে, তাহাদের প্রথম উৎপত্তি ঠিক্ কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ সুকঠিন। অনেক সময়ে এই প্রথাগুলি দৈবসম্ভব বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এবং কখন কখন এতৎ সম্বন্ধীয় অনেক পৌরাণিক উপন্যাসও পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন, আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা কত প্রাচীন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই প্রথা ঠিক কোন্ সময়ে কত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ সুকঠিন। এতৎ সম্বন্ধে প্রচলিত উপন্যাসটি বড়ই চমৎকার বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মা যে সময়ে প্রথম মনুষ্য সৃষ্টি করেন, সেই সময়ে তিনিই জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইলেন; বাহু হইতে ক্ষত্রিয় হইলেন; উরু হইতে বৈশ্য হইলেন; এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিলেন (১)। এই উপন্যাসে জাতিভেদ প্রথা একেবারে সৃষ্টির সমসাময়িক হইল, এবং ইহার প্রাচীনত্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। এই উপন্যাসের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই; কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ একটি সত্য পাওয়া যাইতেছে। জাতিভেদ প্রথা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা এই উপন্যাস দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে উপলব্ধি হয়। এইরূপ, অধিকাংশ অতি প্রাচীন প্রথা সম্বন্ধে, প্রাচীনতার পরিচায়ক অনেক উপন্যাস পাওয়া যায়।

নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধেও এইরূপ উপন্যাস প্রচলিত আছে। প্রথম নাটক দেবতাদিগের মনোরঞ্জনার্থ স্বর্গে অভিনীত হয়। এই নাটকের প্রথম প্রবর্ত্তক ভরতনামা মনি। স্বয়ং বাগ্দেবী সরস্বতী নাটক রচয়িত্রী ছিলেন। আর অভিনয় করিতেন, অপ্সরাগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নামক নাটকে এইরূপ একটি গল্প আছে। বিক্রমোর্ব্বশীর তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভে ভরতমুনির শিষ্যদ্বয়ের একটি কথোপকথন আছে। তাহাতে এক শিষ্য অপরকে স্বর্গে গুরু-প্রবর্ত্তিত নাটকাভিনয়ের বৃত্তান্ত কহিতেছেন। প্রথমোক্ত বলিতে লাগিলেন, তাহাদের গুরুদেব শ্রীমতী সরস্বতী দেবী প্রণীত "লক্ষ্মীস্বয়ম্বর" নামক নাটক অভিনয় করাইতেছিলেন। অভিনয় হইতেছিল, দেবগণের সমক্ষে; আর

(১) বভূবুর্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণ জাতয়ঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চ জাতাং ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ॥
উরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্র জাতয়ঃ।

অভিনয় করিতেছিলেন, প্রথিতনাম্নী উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ। উর্ব্বশী লক্ষী-চরিত্র এবং মেনকা বারুণীচরিত্র অভিনয় করিতেছিলেন। বারুণী (মেনকা) লক্ষীকে (উর্ব্বশীকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, সমবেত সকেশব লোকপালগণের মধ্যে কে তোমার মনোমত বলিয়া বোধ হয়। উর্ব্বশীর বলিতে হইবে "পুরুষোত্তমে"। উর্ব্বশী ইতিপূর্ব্বে প্রাণদাতা পুরুরবার ভুবনমোহনরূপে উন্মাদিনী; পুরুরবার নাম তাহার জপমালা। উর্ব্বশী নাটকাভিনয় ভুলিয়া গেল; নিজের মনের কথা বলিয়া ফেলিল, নামের আদ্যক্ষরদ্বয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া বলিল "পুরুরবসি"। স্বপ্রবর্ত্তিতশাস্ত্রের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া উপাধ্যায় উর্ব্বশীকে অভিশাপ দিলেন, "তোর দিব্য জ্ঞান নষ্ট হইবে।" উর্ব্বশীর শাপে বর হইল। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া মর্ত্ত্যলোকে পুরুরবার মহিষী করিয়া পাঠাইলেন। বোধ হয়, নাটক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, এবং এই উপন্যাসটি নাটকের প্রাচীনতারও সম্পূর্ণ পরিচায়ক।

হিন্দু নাটকের প্রাচীনতা প্রমাণ করিবার আরো একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। কোন একখানি নাটক মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে সেই নাটক হইতেই তাহার প্রাচীনতার পরিচায়ক অনেকগুলি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা মৃচ্ছকটিক নামক (১) প্রাচীন নাটক হইতে কয়েকটি প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছি। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের মুখে নাটককারদিগের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় থাকে; অন্তত তাহাতে সমাসবদ্ধ বিশেষণসংযুক্ত গ্রন্থকারের নামটি জানা যায়। মৃচ্ছকটিকে নাটকরচয়িতার কিছু বিস্তৃত বিবরণ আছে। তিনি গজেন্দ্রগতি, চকোরনেত্র, চন্দ্রানন, রূপবান, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং অপরিমিত বলশালী ছিলেন। তাঁহার নাম শূদ্রক ছিল। তিনি ঋক্ এবং সামবেদ, গণিতশাস্ত্রে এবং নৃত্যগীতাদি ললিতকলা এবং হস্তিশিক্ষা প্রভৃতিশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। তিনি স্বীয়পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক দশদিনাধিক শতবর্ষ বয়সে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধ-ব্যসনী, অপ্রমত্ত, বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ, তপোধন এবং বাহুযুদ্ধ-নিপুণ ছিলেন। এবং তিনি স্বয়ং রাজা ছিলেন। কিন্তু এতখানি বর্ণনার মধ্যে, তিনি কোন্ দেশের রাজা ছিলেন, তাহার নামগন্ধটি পর্য্যন্ত নাই। রাজাশূদ্রক কোন্ দেশের রাজাছিলেন, কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, প্রভৃতি তত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিলেই তদীয় গ্রন্থের সময় নিরূপণ করা যাইত। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শূদ্রকনামে একজন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে অন্ধ্র বংশীয় মগধরাজগণের প্রথম রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ২ তাঁহাকে বিক্রমাদিত্যের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক অবন্তী রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এবং এই

(১) প্রচলিত সংস্কৃত নাটকাবলীর মধ্যে মৃচ্ছকটিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

রূপে তিনি খ্রীষ্টজন্মের দুই অথবা তিন শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। কিন্তু এই শূদ্রকরাজা এবং মৃচ্ছকটিকের নাটককার প্রকৃত পক্ষে একই ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায়না। এই সকল আনু-মাণিক কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা প্রস্তা-বনোক্ত বিবরণে একটি অপেক্ষাকৃত সার-বত্তর কথা পাই না। তিনি "অগ্নি প্রবেশ দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন" এই কথাটি গ্রন্থের অতিশয় প্রাচীনত্বের একটি প্রমাণ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এইরূপে "অগ্নি প্রবেশ দ্বারা আত্মহত্যা করা মহাপাপ।" কিন্তু অতি প্রাচীন কালে মনুসংহিতাদি সংগৃহীত হই-বার সময়ে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণে শরভঙ্গ নামক ঋষির এইরূপ অগ্নি প্রবেশের কথা আছে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের আদিম অবস্থায় এবং কলিযুগ-প্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে, এই নাটক লিখিত হইয়া-ছিল। এইজন্য গ্রন্থকারের অগ্নি প্রবেশ দ্বারা মৃত্যু সমাজে দূষনীয় বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই; এবং এই জন্যই প্রস্তাবনা-লেখক (১) অসঙ্কুচিতচিত্তে গ্রন্থ মধ্যে এই কথার সন্নি-বেশ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রমাণদ্বয় এই মতের সম্পূর্ণ পরিপোষক।

প্রায় প্রত্যেক নাটকে শকার অথবা রাজশ্যাল বলিয়া একটি চরিত্রের সমাবেশ থাকে। শকার অনেকটা ইংরাজি clown এর (ভাঁড়ের) সদৃশ। শকার সাধারণতঃ রাজরক্ষিত বলিয়া দুষ্কর্ম্মান্বিত, মূর্খ, ভীরু, এবং দুর্ব্বলের উৎপীড়ক। তাহার কথা হতোপম, পুনরুক্ত, এবং লোক-ন্যায়-বিরুদ্ধ। মৃচ্ছকটিকের শকার সংস্থানকও এইরূপ দুশ্চরিত্র ও দুষ্ক্রিয়ারত। স্বানুরূপ সঙ্গি-সমভিব্যাহারে বসন্তসেনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া, বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া শকার মহাশয় রামায়ণ এবং মহাভারতের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, এবং নিজের অদ্ভূত এবং অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। কতকগুলি শ্লোকে, রাবণবশীভূতা কুন্তী, হনুমানের সুভদ্রাহরণ, রামভয়ে দ্রৌপদীর পলায়ন, চাণক্য কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি অদ্ভুত ইতি-হাসজ্ঞতার পরিচয় আছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, সংস্থানক শুদ্ধ রামায়ণ, এবং মহাভারত হইতে কেন উদাহরণ তুলিল, এবং পুরাণাদি হইতে কেন একটিও উদাহরণ গ্রহণ করিল না। গ্রন্থকার অবশ্য মহামহো-পাধ্যায় এবং অশেষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, এমন কি চাণ-ক্যের কথা পর্য্যন্ত তুলিলেন, কিন্তু কেন যে তিনি পুরাণোক্ত ব্যক্তিগণের নাম একে-বারেই করেন নাই, তাহার সন্তোষজনক কোন কারণ দেখা যায় না। এই জন্য ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় যে, পুরাণাদির পূর্ব্বেই এই নাটক লিখিত হইয়াছিল; এবং তখন পর্য্যন্ত পুরাণসমূহের একেবারেই

(১) সাধারণতঃ অনেকের বিশ্বাস নাটককার স্বয়ংই প্রস্তাবনায়, সূত্রধারের মুখে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপ ধারণা সত্য হইলে মৃচ্ছ-কটিকের প্রস্তাবনা বড়ই কৌতুকাবহ বলিয়া বোধ-হয়। গ্রন্থকার স্বয়ং কি করিয়া লিখিলেন, তিনি ১০০ বৎসর ১০ দিন বাঁচিয়া মরিয়াছিলেন। একজন টীকাকার বলেন, তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন; স্বকীয় বিদ্যা প্রভাবে তিনি ভবিষ্যৎকে অতীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই টীকাকারের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলেই সহজে অনুমানকরিতে পারেন যে, প্রায় প্রত্যেক নাটকেরই প্রস্তাবনা দ্বিতীয় ব্যক্তির লিখিত।

সংগ্রহ হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও তাহাদের বহুল প্রচার হয় নাই। চাণক্যের নামোল্লেখ থাকাতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের পর নাটক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে, অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, এই নাটক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই নাটকের প্রাচীনত্বের আর একটি দৃঢ় প্রমাণ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ভারতের অনেক উপকার করিয়াছে, তাহা বোধ হয় বিদ্বজ্জন মাত্রই স্বীকার করিবেন। বৌদ্ধধর্ম্মের তেজঃপ্রভাবে তাৎকালিক হিন্দু-ধর্ম্মের কুসংস্কার সকল ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিল। ইহারই অভ্যুদয়ালোকে অন্ধ তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ভারতেতিহাস স্থানে স্থানে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম দিগন্ত-ব্যাপিত হইয়াছিল বলিয়া, সময়ে সময়ে বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ ভারতে আগমন করিয়া স্ব স্ব সময়ের প্রকৃত ইতিহাস লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে ভারতবর্ষের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য এবং নাটকাবলীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেক অভিনব ঐতি-হাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে। ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া, অন্যান্য গ্রন্থোক্ত বিবরণা-বলী পাঠ করিলে, অনেক ঐতিহাসিক ঘট-নার সময় নির্দ্দেশ করা যায় এবং জাতীয় রীতি নীতি এবং সমাজের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যায়। মৃচ্ছকটিকের স্থানে স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যা-সিদিগের বৃত্তান্ত আছে। যেরূপভাবে এই বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের তখন হীন অবস্থা ছিল না। এবং প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন বিরোধ ছিল না। বৌদ্ধেরা তখন একটি সবিশেষ পরিচিত এবং ক্ষমতা-শালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। এক্ষণে, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, খ্রীষ্ট জন্মের দুই শত অথবা ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের এই রূপ অবস্থা ছিল। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে; এবং খ্রীষ্ট দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে এই ধর্ম্ম ভারতে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং আমরা অনেক পরিমাণে নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারি যে, অন্ততঃ খ্রীষ্ট জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মৃচ্ছকটিক লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ নানাবিধ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, মৃচ্ছকটিক অন্ততঃ খ্রীষ্ট জন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক এক খানি পূর্ণাঙ্গ নাটক। অতি প্রাচীন হইলেও ইহাতে আধুনিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান আছে। অতি কৌশলে ইহাতে দুইটি বিভিন্ন উপন্যাস সংমিশ্রিত হইয়াছে। অতি কৌশলের সহিত নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজিতে যাহাকে Plot-interest (1) বলে, তাহাও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত

(1) উপসংহারৌৎসুক্য।

সমভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর নাটক লিখিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই যে নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মেরও অনেক পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষে নাটকের প্রচার ছিল, নিম্নে তদ্বিষয়ে একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ভগবান্ পাণিনির ব্যাকরণে নাটকের প্রাচীনতার পরিচায়ক একটি সূত্র আছে, সে সূত্রটি এই, "পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষু নট সূত্রয়োঃ"। এইটি "ণিনক্" প্রত্যয়ের বিধায়ক একটি সূত্র। পারাশর্য্য প্রণীত ভিক্ষুসূত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে "পারাশরিণঃ ভিক্ষবঃ" এবং শিলালিমুনি প্রণীত নটসূত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে "শৈলালিনোনটাঃ" বলা হয়। এই সূত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পাণিনির পূর্ব্বে শিলালি নামক এক জন মুনি ছিলেন, এবং তিনি নাটক শাস্ত্রের সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে নাটক প্রথা শুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা নয়, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাটক অধ্যয়নীয় শাস্ত্ররূপে বর্ত্তমান ছিল, ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এক্ষণে পাণিনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই হিন্দু নাটকের অতি প্রাচীনত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। পরম পণ্ডিত অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর "নির্ব্বাণোহবাতে" * প্রভৃতি পাণিনি সূত্রের সূক্ষ্ম সমালোচনা দ্বারা অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে, পাণিনি বৌদ্ধধর্ম্মাভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। পাণিনির সময় নিরূপণ সম্বন্ধে অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকরের এই মত এক্ষণে প্রচলিত মত হইয়াছে। বুদ্ধদেব খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টজন্মের ছয় শত বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নাটক-প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল।

অন্য ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে আমাদিগকে এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইতেছে যে, খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে বহুল পরিমাণে নাটকের প্রচার ছিল। ইহা অপেক্ষাও অনেক পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে নাটকের প্রচার ছিল, এরূপ অনুমান করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। এমন কি, মহাভারতে পর্য্যন্ত নাটক প্রথা প্রচলনের আভাষ পাওয়া যায়। এই সকল এবং নাটক সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বল।

ভিখারী।

(১)

আমিও তোদেরি একজন—
আমিও শৈশব-সুখে
বেড়েছি মায়ের বুকে ;
আমিও বাবার কোলে পেয়েছি যতন ;
আমিও কিশোর বেলা

* পাণিনির এই সূত্রদ্বারা বায়ুশূন্যতা অর্থে নিঃ পূর্ব্বক বা ধাতুর উত্তর "ক্ত" প্রত্যয়ের "ত" স্থানে "ন" হয়। বৌদ্ধদিগের অপবর্গবাচক "নির্ব্বাণ" শব্দ পাণিনির ব্যাকরণে নাই। এমন কি "নির্ব্বাণদীপ" প্রভৃতি স্থানে "নিবে যাওয়া" অর্থে পাণিনি "নির্ব্বাণ" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কাত্যায়নের বৃত্তিতে এবং পতঞ্জলি ভাষ্যেতেই এই "নিবে যাওয়া" অর্থ পাওয়া যায়। ইহা হইতেই গোল্ডষ্টুকার অনুমান করেন, শাক্যজন্মের পূর্ব্বেই পাণিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

খেলেছি সাধের খেলা,
আমারো সোহাগ ছিল "সোণা, যাদু, ধন",
আমিও তোদেরি একজন!

(২)

আমিও তোদেরি একজন—
আমারো, ভুলাতে জ্বালা
পরিয়া মুকুতা মালা,
সরল তরল ঊষা দি'ত দরশন;
নিতুই সাঁঝের করে
হাসিত আমারো ঘরে
উজল সুধাংশু খানি সোণার বরণ।
আমিও তোদের একজন।

(৩)

আমিও তোদেরি একজন—
প্রকৃতি আমারে হাসি
পরিত ভূষণ রাশি,
উছলি পড়িত ছটা মধুর মোহন!
শ্যামল রসালে থাকি
গাহিত আমারো পাখী,
ফুটিত আমারো যূথি জাতি বেলিগণ!
আমিও তোদের একজন!

(৪)

আমিও তোদের একজন—
আমারো এ বুক ময়
কত কি উচ্ছ্বাস বয়,
তরঙ্গে তরঙ্গ ছোটে করি গরজন;
আমারো মরমে সাধ,
(মেঘেতে লুকানো চাঁদ)
আমরো হৃদয় আছে, আছে প্রাণ মন।—
আমিও তোদেরি একজন!

(৫)

আমিও তোদেরি একজন—
আজি আমি বড একা,
কেউ নাহি দেয় দেখা,
খুঁজিতেছি দো'রে দো'রে আপনার জন;
শত দূর, শত পর,
শত দুখে মর মর।
তোরা কি আমার কেউ হবি গো আপন?
আমিও তোদেরি একজন!

(৬)

আমিও তোদেরি একজন—
তোরা যে দেবের শিশু,
আমি নীচ, হীন, পশু,
আমারে দিবি কি তোরা মানুষ-জীবন?—
বিন্দু বিন্দু প্রাণ দিয়া
মৃত দেহ বাঁচাইয়া,
দেখা'বি কি যা দেখিলে হয় না মরণ?
আমি ও তোদেরি একজন?

(৭)

আমিও তোদেরি একজন—
তোরা আলোকের পাখী,
আমিই আঁধারে থাকি,
কখন চেনেনা আঁখি আলোক কেমন!
পতিত এ হীন প্রাণ
তোরা কি করিবি ত্রাণ,
তোরা কি আমার কেউ হ'বি গো আপন?
আমিও তোদেরি একজন!

(৮)

আমিও তোদেরি একজন—
তোদের জনম যেথা
আমিও হয়েছি সেথা,
তবে যে ভিখারী আমি কপালে লিখন!
থাকি এই অন্ধকারে,
অন্ধ কূপ কারাগারে,
হাসেনা রবিটি হেথা বহেনা পবন!—
আমিও তোদের একজন!

(৯)

আমিও তোদেরি একজন—
আজ রে জীবনে মরা,
কালিমা মরিচা ধরা,
আঁধারে আঁধারে হায় নিবিছে জীবন।—
তোদের সুখের বাস,
আলো সেথা বার মাস,
তোদের আনন্দ-ভূমি নন্দন কানন!
পারিজাত ফুল ফোটে,
মন্দাকিনী নিতি ছোটে,
নিশিতে চাঁদিমা হাসে ঊষায় তপন!—
সব ভাই সব বোন,
সবে আপনার জন,
একটী ভিখারী নাই আমার মতন!
আমিও তোদের একজন!

(১০)

আমিও তোদের একজন—
তোরা কি আমার হবি,
"আমারে" আমার ক'বি,
ঘুচাবি এ পরাণের জ্বলন্ত বেদন,
অণু অণু প্রাণ দিয়া
মৃত দেহ বাঁচাইয়া,
দেখাবি কি দেব-দেশ মধুর কেমন,
তোমাদের পিছু পিছু,
আমি কি পারিব কিছু,
জীবনের "মহাব্রত" করিতে সাধন,
আমারে কি ভিক্ষা দিবি, অমরজীবন?
আমিও তোদের একজন!

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

ধন-বিজ্ঞান (২)

ধনোৎপত্তি।

ধনের উৎপত্তি ৩ প্রকারে সংঘটিত হয়, (১) প্রাকৃতিক জড়পদার্থ হইতে, (২) মূলধন হইতে ও (৩) শ্রম হইতে। এই ৩টী মিলিত ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধন উৎপাদন করিতে সমর্থ।

(১) প্রাকৃতিক জড় পদার্থ—এই শ্রেণীর মধ্যে ভূমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থায় যে সমস্ত পদার্থের আদান প্রদান হইতে পারে, তৎসমুদয়ই ইহার অন্তঃপাতী। মনুষ্য মাত্রেরই ভূমির আবশ্যকতা অপরিহার্য্য, কারণ অবস্থিতি করিবার জন্য সকলেরই একটু স্থানের প্রয়োজন হয়, তার পর পৃথিবীতে স্বভাবতঃ যে সকল আহারোপযোগী দ্রব্য জন্মে,তাহার দ্বারা বহু সংখ্যক মনুষ্যের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য মানুষ কেবল অবস্থিতি করিবার স্থান পাইয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, শস্যোৎপাদনের জন্য ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভূমির আবশ্যকতা বৃদ্ধি হইয়া আস্তে আস্তে ভূমি ধনোৎপত্তির একটা মুখ্য পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে।

(ক) সান্নিধ্য,(খ) সাধ্যত্ব,(গ) ফলশালীত্ব ও (খ) প্রতিদ্বন্দিতা ভেদে ভূমির মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

(ক) সান্নিধ্য ঃ—যদি আবশ্যকীয় ভূমি মূল্যবান ভূমির নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্য অধিক হইয়া থাকে, কারণ

যে সকল হেতুতে প্রথম ভূমি মূল্যবান হইয়াছে, দ্বিতীয় ভূমিতেও সেই সকল হেতু বিদ্যমান আছে।

(খ) সাধ্যত্বঃ— যে উদ্দেশ্যে ভূমিগ্রহণ করা যায়, সহজে সেই উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হইতে পারিলে সেই ভূমিকে সাধ্যত্ব-গুণ-সম্পন্ন বলা যায়। কোন কোন স্থলে জঙ্গল কাটিয়া গর্ত্ত বুঁজাইয়া খাল কাটিয়া, গাথনি ভাঙ্গিয়া ভূমিকে প্রয়োজনসুকর করিয়া লইতে হয়, এরূপ স্থলে অবশ্যই ভূমির মূল্য কম হইয়া থাকে। কিন্তু অনায়াস ব্যবহার্য্য হইলে তাহার মূল্য অধিক হয়।

(গ) ফলশালীত্বঃ—একই ব্যয়ে কোন ভূমিতে প্রচুর ও কোন ভূমিতে অল্প জন্মে, সুতরাং যে ভূমিতে সহজে অধিক উৎপন্ন হয়, তাহারই অধিক আদর হইয়া থাকে, অর্থাৎ ফলশালীত্ব অনুসারে ভূমি ধনোৎপাদনে সমর্থ হয়।

(ঘ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঃ—কোন কোন সময়ে এরূপ ঘটে যে, একই ভূমিখণ্ড বহু ব্যক্তির লইবার আবশ্যক হয়; এরূপ স্থলে গ্রাহকের আধিক্য প্রযুক্ত প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে একরূপ নীলাম চলিতে থাকে, তাহাতে ভূমির মূল্য বাড়িয়া যায়, কাজে কাজেই ভূমি অধিক উৎপাদনে সমর্থ হইয়া উঠে। জন সংখ্যার বৃদ্ধিই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান কারণ; চেষ্টা দ্বারা স্থান বিশেষের জন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ভূমির মূল্য বাড়ান যায়।

কোন ভূমি দ্বয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ অবধারণ করিতে হইলে বিচার্য্য গুণ ব্যতীত অন্য সমস্ত গুণ উভয় পক্ষে তুল্য করিয়া লইতে হয়, ইহা ভিন্ন বিশুদ্ধ মীমাংসায় উপনীত হইবার কোন উপায় নাই।

(২) মূলধন ঃ—ধনের সেই মূল অংশকে ধন বলা যায়, যাহা আবশ্যকীয় ব্যয় সমুদয় নির্ব্বাহ করিয়া ভবিষ্যতের উৎপাদনের জন্য বাঁচাইতে পারা যায়। তুমি এক মাস খাটিয়া নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণাদি সম্পন্ন করিয়া যাহা ভবিষ্যতের উৎপাদনের জন্য বাঁচাইতে পার, তাহা তোমার সেই মাসের মূলধন। ইহা অর্থ ও মুদ্রা, উভয় প্রকারের বলা যাইতে পারে। মূলধনের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রামিককে শ্রমকার্য্যে পরিপোষণ করা।

মূলধন দুই প্রকারের হইতে পারে; যে মূলধন একবারের ব্যবহারে শেষ হইয়া যায়, অর্থাৎ একবার ব্যবহার করিলে সেই আকারে পুনরায় ব্যবহার করা যায় না; তাহাকে ভ্রাম্যমান মূলধন কহে, আর যাহা হইতে পুনঃ পুনঃ ধনের উৎপত্তি হয়, তাহাকে স্থাবর মূলধন কহে। অন্ন ইন্ধন ভ্রাম্যমান মূলধন; তাঁত, বাইশ, নেহাই স্থাবর মূলধন। ভ্রাম্যমান মূলধনের মূল্য উহার ক্রয়ে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে সেই ধন, ও উহার নিয়োগে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাও লভ্যাংশ, কিন্তু স্থাবর মূলধনের মূল্য মূলধনের কিয়দংশ ও উহার ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ ও লভ্যাংশ। ভ্রাম্যমান মূলধনের উৎপন্ন তৎক্ষণাৎ একবার ব্যবহারে হস্তগত হয়, কিন্তু স্থাবর মূলধনের উৎপন্ন যত কাল উহা ব্যবহার করা যায়, ততকাল ব্যাপিয়া হইয়া থাকে।

বিলাস দ্রব্য সকল কোন মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ উহার উৎপাদনে যে মূলধন নিয়োগ করা যায়, বিলাস পদার্থ গুলি সেই মূলধনের রূপান্তর মাত্র, বিলাস দ্রব্যের ক্ষয়ের সহিত সেই মূলধনেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। কেহ হয়ত

বলিবেন যে, বিলাস দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যখন লাভ হয়, তখন উহা মূলধন নহে। ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? এ প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, বিলাস দ্রব্য স্বয়ং যখন কোন শ্রমের পরিপোষক নহে ও অন্য শ্রমের উৎপাদক নহে, অথচ ক্ষয়েই উহার পরিসমাপ্তি হয়, তখন উহা কদাচ মূলধন শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

ভাব, একজন লোক গহনা প্রস্তুত করিতেছে ও একজন লোক দা গড়িতেছে। এ স্থলে গহনাটা বিলাস দ্রব্য, উহা যে ব্যবহার করে, তাহার শ্রমকার্য্যে কোন অতিরিক্ত যোগ্যতা লাভ হয় না এবং উহাকে কোন উৎপাদক ভাবে ব্যবহার করাও যায় না; সুতরাং উহা মূলধন শব্দের বহির্ভূত, কিন্তু দা মূলধন, কারণ উহা ঘরামীর উপার্জ্জনের সহায়। কিন্তু এরূপ যদিও নির্দ্দেশ করা হইল, তাই বলিয়া বিলাস দ্রব্যকে একেবারে নিষ্ফল বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, কারণ উহাতে কথক গুলি লোকের জীবিকা লাভ হয় এবং কোন কোন স্থলে শ্রামিকদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে উৎসাহিত করিয়া উৎপাদনের সহায়তা করে। কিন্তু বিলাস দ্রব্য যখন স্বদেশজ হয়, তখন তাহার এই এক গুণ থাকে, বিদেশীয় হইলে তাহার ফল কোন প্রকারে শুভজনক নহে। ভাব, কাবুল যদি আমাদিগের নিকট ক্রমাগত আতর বিক্রয় করে, তাহা হইলে অনুৎপাদক আতরের বিনিময়ে আমাদিগের ধন ক্রমাগত কাবুলে যাইতে থাকে। ইহাতে আমরা ক্রমশঃ নিঃস্ব হই; কিন্তু যদি আতর-ওয়ালা কাবুলীকে আতরের বিনিময়ে বাজি দিয়া বিদায় করিতে পারি, তাহা হইলে দেশের কোন অনিষ্ট হয় না। *

মূলধনকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখিলে উহা অনুৎপাদক হইয়া যায়। টাকা পুঁতিয়া রাখা, অচলভাবে সঞ্চয় করা ও গহনা করা এই কারণে দূষণীয়। আজকাল গহনার বিরুদ্ধে অতি গভীর প্রতিবাদের স্বর শুনিতেছি: কিন্তু গহনা দ্বারা ধনকে অনুৎপাদক অবস্থায় রাখা হইলেও এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় উহা দূষণীয় বলিতে পারি না; কারণ ইহা সকলেরই বুঝা উচিত যে, মূলধন, ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকিলেই লাভ হয় না, উহা উৎপাদক ভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া চাই। যাঁহারা গহনা প্রথার দোষারোপ করেন, তাঁহারা গহনার মূলধন নিয়োগের কোন প্রশস্ত পথ দেখান না। সেভিংব্যাঙ্কে কোন কোন জেলায় গবর্ণমেণ্টের দুই বৎসরের মুনাফার পরিমাণ টাকা আমানত হইয়াছে; গবর্ণমেণ্ট চলিয়া যাইতে চাহিলে পায়ে তৈল দিয়া দুই বৎসর রাখিতে পারিবে কি? কেহ কেহ হিন্দু-টি-কোম্পানী প্রভৃতি দুই চারিটা কোম্পানীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মূলধন নিয়োগের প্রশস্ত পথ দেখান, কিন্তু তাহাতে কটা টাকা খাটিতে পাবে, তাহা তলাইয়া দেখেন না।

এই সকল কারণে আমি বিবেচনা করি যে, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে আমরা এক্ষণও যেমন নিরেট মূর্খ, তখন গহনা প্রথা আরও খরতর বেগে চলা আমাদিগের পক্ষে অশেষ রূপে কল্যাণকর। অর্থ সকল যেরূপ খরতর বেগে পশ্চিম দিকে ধাবমান হইতেছে,

* এই কারণে ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যে আমরা অশেষ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। ইংলণ্ডের নিকট খেলনা, পমেটম, ব্র্যাণ্ডি লইয়া তন্বিনিময়ে গম তুলা পাট এই সকল দ্রব্য দিতেছি।

তাহাতে এই গহনাগুলি অর্থাকারে রূপান্তরিত করিলে স্বল্প-দিনেই আমাদিগের অজ্ঞাতসারে উহা পশ্চিমের পুষ্টি সাধন করিবে।

পরাধীন জাতির ধনাগমের দ্বার সহজে প্রসারিত হইতে পারে না। লোকে রাজ্য জয় করে, শাসন করে কিঞ্চিৎ পাইবার নিমিত্ত। ইংরেজ জাতি অবশ্য মানুষের সমষ্টি, ইহাদিগের লক্ষ্যও যে তাঁহাই, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? সুতরাং মানুষের আশা যেমন স্বভাবত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, ইহাদিগের আশাও সেইরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না হইবে কেন? যত দিন পাইবার সহজত্ব থাকিবে, ততদিন আশা বৃদ্ধি পাইবে। যখন দুঃখের দুঃসহনীয়তায় একান্ত ব্যথিত হইয়া এ দেশের লোকেরা অর্থ নির্গমের পথের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবে, তখন আমাদিগের শুভ দিনের সূচনা হইবে। তারপর যখন কেবল দৃষ্টিতে সন্তুষ্ট না হইয়া বাক্ বিতণ্ডা আরম্ভ করিবে, তখন ইংরেজের আশা সমস্তকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষয় হইতে থাকিবে। যখন ক্ষয়ের সূচনা হইবে, সেই সময় জানিবে, এদেশের কার্য্যারম্ভের শুভ যোগ। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, এক্ষণ কোন্ কাল যাইতেছে, তদুত্তরে আমি এই বলিব যে, এক্ষণ দৃষ্টির কাল যাইতেছে, ইহার সম্পূর্ণতা হইলে বাদানুবাদ কাল, তৎ পরে কর্ম্ম কাল আসিবে।

এক্ষণ শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যের অসময় বলিয়া, কেহ ইহা আমার উদ্দেশ্য মনে করিবেন না, এক্ষণ কাজ করিতে হইবে না। কাজ অবশ্যই করিতে হইবে, কাল দোষে ফল অল্প হইবে, এই মন্ত্র স্মর্ত্তব্য।

(৩) শ্রমঃ—শ্রম ব্যতিরেকে প্রায় কোন দ্রব্যই ব্যবহার্য্য হয় না; ক্ষেত্র শ্রম প্রয়োগ দ্বারা শাসিত হইলে ফল প্রদান করে, মূলধন শ্রম যোগে পরিচালিত হইলে লাভ উৎপাদন করে। যে কোন দ্রব্য কেন উৎপাদন করিতে যাওনা, দেখিতে পাইবে, শ্রম তাহার একটা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

শ্রম ত্রিবিধ (ক) মানসিক (খ) বাচনিক, (গ) কায়িক।

(ক) মানসিক ;—মানসিক বৃত্তির পরিচালন দ্বারা বিষয় সকলের যথার্থ তত্ত্ব অবধারিত হয়। যে ব্যক্তি বা জাতি এই বৃত্তির অনুশীলনে তৎপর, সেই বুদ্ধি জগতে পূজনীয় হইয়া থাকে। লোকে মানসিক শ্রমের দ্বারা যেরূপ লাভবান হয়, এরূপ অন্য কোন প্রকারে হয় না, কিন্তু কোন্ ব্যক্তির কোন্ বিষয়ে মানসিক বৃত্তি পরিচালন বিধেয়, তাহা ব্যক্তিরাই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে নির্ব্বাচন করিয়া থাকে; যে দেশে স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আছে, সেখানে ব্যক্তি দিগের মনোবৃত্তি অনুসারে বিষয় বিশেষে প্রবেশের জন্য সুন্দর সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

সচরাচর মানসিক শ্রমের ফল যাহার মন, সেই ভোগ করে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী লোকেরা আদর্শ হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য সচ্চিন্ত ব্যক্তি যে স্থানে বাস করেন, তাহার চতুর্দ্দিগের লোক তাহার বুদ্ধি বৃত্তি হইতে জ্যোতি লাভ করিয়া হানি সকল পরিহার করিতে ও লাভ সকল বৃদ্ধি ও ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

(খ) বাচনিক ;—বাচনিক শ্রম মানসিক শ্রম প্রকাশের দ্বার স্বরূপ, উহা আবার দ্বিবিধ (১) কথিত ও (২) লিখিত। সঙ্গত ও সংযত বাক্য বলা মনীষীদিগের একটী অসাধারণ ক্ষমতা, ইহা দ্বারা জগতের অশেষ

প্রকারের হিতাহিত সর্ব্বদা সংঘটিত হইতেছে। বিচারকেরা মীমাংসা লিখিয়া, উকীলেরা অনুকূল প্রতিকূল কথা বলিয়া, চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বদা সংসারের শান্তি বিধান করিতেছেন। লোকে ইহাদিগের শ্রমের মূল্য দিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করে।

যে দেশ যেরূপ সভ্য, সে দেশে সেই রূপ সুকথিত ও সুলিখিত বাক্যের আদর হইয়া থাকে। তুমি যদি কাহাকেও বুঝাইতে পার যে, একটী দেশের লোক সংখ্যার সহিত সেই দেশের প্রচলিত সংবাদ পত্রের যে অনুপাত, অপর একটী দেশে তদপেক্ষা উচ্চ অনুপাত দৃষ্টি করিয়াছ, তাহা হইলে তোমার শ্রোতা অতর্কিত রূপে এই মীমাংসায় উপনীত হইবেন যে, প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টী সভ্যতর দেশ। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত পৃথিবীতে বাচনিক শ্রমেরও হাট বসিয়াছে; অধ্যাপক পি ঘোষ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের বাচনিক শ্রমের হাট হইতে অধ্যাপক টটণ্টার নিষ্কাসিত হইয়াছেন; এমন দিন ক্রমে আসিবে, যখন দেশীয় সংবাদ পত্র বিদেশীয় সংবাদ পত্রকে ও দেশীয় ব্যারিষ্টার বিদেশীয় ব্যারিষ্টারকে স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইবেন।

(গ) কায়িক শ্রমঃ—কায়িক শ্রমও মানসিক শ্রমের দ্বারস্বরূপ। যাহার মন অপরিস্ফুট, কায়িক শ্রমে ফল-লাভ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য। কায়িক শ্রমও দ্বিবিধ (১) দৈহিক ও (২) যান্ত্রিক। যন্ত্রের আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত দৈহিক শ্রমেরই রাজত্ব ছিল, কিন্তু এক্ষণ আর সে দিন নাই; দশ জন দরজী হাতে সূচী চালাইয়া যাহা করিত, একটী সেলাইএর কল অনায়াসে তাহা করিতেছে। হাটিয়া এক জনের ২০ মাইল পথ যাওয়া কষ্ট, বাষ্পীয় যানে লোকে অনায়াসে অর্দ্ধ ঘণ্টায় ২০ মাইল যাইতেছে; সুতরাং দৈহিক বলে এক্ষণ জাতির উন্নতির কোন আশা নাই। জগতে সেই জাতিরই আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবার আশা, যাহার যন্ত্র সকল অতিশয় কর্ম্ম-কুশল।

যান্ত্রিক শ্রম যে কায়িক শ্রমীদিগকে কর্ম্ম-চ্যুত করে, ইহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। ৫০,০০০ নৌকায়, ৫০,০০০ গাড়ীতে যে মাল ও আরোহীকে গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায় লইয়া যাইত, ই, বি, রেল একাকী তাহা করিতেছে। ইহাতে নিশ্চয়ই কথকগুলি নৌকা ও গাড়ীজীবী লোক নিরুপায় হইয়াছে। শুভ ফল এই হইয়াছে যে, মূলধনীরা মূলধন নিয়োগ দ্বারা লাভবান হইয়াছে; কর্ম্মচারীরা যে উপার্জ্জন করে, তাহা অতিশয় সামান্য, সুতরাং ধর্ত্তব্য নহে।

উপরে যে কয়েকটী ফল দৃষ্টিগোচর হইল, তন্মধ্যে দুই পক্ষ প্রধান দেখা যাইতেছে। লাভ পক্ষে মূলধনীগণ ও হানিপক্ষে নৌকা ও গাড়ীজীবীগণ। যদি এরূপ স্থলে মূলধনী এবং নৌকা ও গাড়ীজীবী এক দেশের লোক হয়, তবে দেশ দরিদ্র হইবার কোন আশঙ্কা থাকেনা, কিন্তু যদি ধনী বিদেশী হয়, তাহা হইলে ঘোরতর হানি; যদি গাড়ী প্রস্তুতের যন্ত্র সকল আবার বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা অর্থাৎ হানির একশেষ।

যন্ত্রে, দেখা যাইতেছে, নিশ্চয়ই মানুষকে শ্রম-চ্যুত করে, সুতরাং এক মাত্র সেই দেশই জগতে পূজ্য হইবার আশা করিতে পারে, যাহার এত যন্ত্র আছে যে যন্ত্রেই সে জাতির

সমস্ত শ্রম শক্তি ক্রিয়া পায়। তাহা হইলে তাহারা কায়িক শ্রমী জাতিদিগের নিকট সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া নিজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে। কিন্তু ঈদৃশ বিস্তারিত যন্ত্রবান জাতিদিগের মধ্যে সেই জাতির কৃতকার্য্যের আশা অধিক, যাহার সমস্ত শ্রমোপকরণ দ্রব্য যান্ত্রিক শ্রমের দ্বারা নিজদেশে উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডের এই অংশে বড়ই দুর্ব্বলতা আছে, পৃথিবীর অনেক দেশ মূর্খ। তাই ইংলণ্ডকে এক্ষণও সে দোষ অনুভব করিতে হইতেছে না, কিন্তু কাল ক্রমে এমন দিন আসিবে, যখন আমাদিগের ন্যায় মূর্খ দেশ সকলের চক্ষু ফুটিবে, তখন ইংলণ্ডকে ক্ষেত্রজ সামগ্রীর জন্য সঙ্কটে পড়িতে হইবে। জগতের সেই দেশকে সুখী ও নিরাপদ বলিতে পারি, যাহাকে বাধ্য হইয়া পরের মুখের অপেক্ষা করিতে হয় না। নিজের দ্রব্য পরের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য লালায়িত হইতে হয় না। সম্পূর্ণ সাম্যনীতিতে অবস্থান বলিয়া, কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না, অন্যথা এক সময়ে না এক সময়ে প্রতিযোগিতা আসিবেই আসিবে। আজ কাল ইউনাইটেড্‌ষ্টেট বহুল পরিমাণে এই নীতির অনুসরণ করিতেছে।

যন্ত্র যে দেশের সমস্ত প্রাপ্তব্য শ্রম না গ্রাস করিতে পারে, সে দেশে শ্রমজীবীরা কষ্ট ভোগ করে। যাহারা (survival of the fittest) যোগ্যতমের পরবর্ত্তীতার একমাত্র পক্ষপাতী, তাঁহারা দরিদ্রদিগের কাতর স্বরে বিচলিত হন না, ভাবেন, জন সংখ্যার একটা অকর্ম্মণ্য অংশ ধ্বংস হওয়াই কল্যাণকর। আমার নিকট কিন্তু এ নীতি পাশব বলিয়া বোধ হয়। এ দেশে লোকে দরিদ্রদিগকে ইচ্ছানুসারে ভিক্ষা দেয়, ইহাতে অসংখ্য দরিদ্র লোক জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু দাতাদিগের একান্ত অবিমৃশ্যকারিতা প্রযুক্ত ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা বংশগত করিয়া লইয়াছে এবং মহাসুখে বিলাস দ্রব্যাদি ভোগ করিয়া ভিক্ষুক "বাবুর ন্যায়" জীবন যাপন করিতেছে। ভিক্ষায় অক্ষমদিগেরই অধিকার, বলিষ্ঠ কার্য্যক্ষমদিগকে ভিক্ষা দিলে যেমন একপক্ষে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তেমনি পরিশ্রমকে অমান্য করা হয়। এজন্য আমার ইচ্ছা যে, আমার স্বদেশীয়গণ এবিষয়ে বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করেন।

শ্রম প্রয়োগে যন্ত্রের ন্যায় সহায়তাকরে, এরূপ একটা প্রণালী আছে, তাহার নাম শ্রমবিভাগ নীতি। নানা প্রকারের শ্রমবিভাগ নীতির শুভ ফলে আজ ইউরোপ জগতের শীর্ষস্থ, কিন্তু অবশিষ্ট পৃথিবী অদ্যাপি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হয় নাই। ইহা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে, একজন লোক একাকী সমস্ত করিয়া আলপিন প্রস্তুত করিতে পারে না। কিন্তু যদি দশ জন সমবেত হইয়া ঐ আলপিন গঠনের কার্য্য বিভাগ করিয়া করে, তাহা হইলে প্রত্যেকে এক দিনে ৫০,০০০ আলপিন প্রস্তুত করিতে পারে। এ প্রকারের শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা অবশ্যই সুশিক্ষিত লোকের বুদ্ধি-প্রসূত ; কিন্তু এ দেশে সুশিক্ষিত লোকদিগের এ প্রকারে শ্রম বিভাগের ব্যবস্থা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের সাহস নাই, প্রখরতা নাই। তাঁহারা নিরন্তর সতৈল-হস্ত, পরপদ-লেহনক্ষম, লেখনী-অম্বুতাড়নে ক্ষিপ্রহস্ত এবং বেতনাস্বাদনে তাহাদিগের লোল রসনা আবক্ষ-প্রসারিত।

শ্রমবিভাগের আর একটা প্রণালীর নাম যৌথ কারবার—ইংলণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য্য

এই নীতির মধ্যে লুক্কায়িত—এই বিশাল বিদেশীয় অধিকার, কুবের সদৃশ ধনসম্পত্তি, সকলই এই নীতি হইতে প্রাপ্ত। এ দেশের বিজ্ঞেরা ইহার তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এত মিথ্যাবাদী, জুয়াচোরের মধ্যে কোন নূতন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তুলা অসম্ভব; অখাদ্য খাইয়া খাই নাই, অকার্য্য করিয়া করি নাই বলে শিক্ষিত লোকের পনের আনা; রাত্রিকালে কদর্য্য স্থানে মাতাল অবস্থায় যে সকল লোক শুইয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেক শিক্ষিত লোক! এই সকল ধূর্ত্ত শৃগাল শিক্ষিতদিগের দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে কি?

দেশে যত প্রকার শ্রমজীবী থাকে, তন্মধ্যে ভূমি হইতে শস্যোৎপাদন যাহার ব্যবসায়, তাহার ন্যায় অটল জীবিকা কাহারও নহে; কারণ প্রত্যেক দেশের আদি সম্পত্তি তদ্দেশীয় ক্ষেত্রোৎপন্ন সামগ্রী সকল, এই আদি দ্রব্য না পাইলে যন্ত্র সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। যান্ত্রিক শ্রমের উন্নতি যেরূপ অনিশ্চিত, কৃষিজীবীর উন্নতি যেরূপ অনিশ্চিত নহে। এজন্য প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, কৃষকদিগের অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

শ্রামিক মূল্যের পরিমাণে যেরূপ কার্য্য করে, তদনুসারে তাহার মূল্যের ন্যূনাতিরেক হইয়া থাকে। যে অভাব ও পূরণের নিয়মে দ্রব্যের মূল্য অবধারিত হয়, শ্রমের মূল্য অবধারণেও সেই নিয়ম প্রবল। যে স্থানে শ্রমের একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য আছে, সে স্থানে হটাৎ বহুসংখ্যক শ্রামিক আসিয়া কার্য্য প্রার্থনা করিলে শ্রমের বাজার দর অবশ্য কমিবে, কিন্তু ইহাতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, সেই স্থানে দৈনিক শ্রমব্যয় যত হইয়া থাকে, নবাগত ও পুরাতনেরা তাহা বণ্টন করিয়া লইবে। জগতে যে যাচমান হয়, তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য্য—এস্থলে নবাগতেরা যাচমান সুতরাং নিয়োগকর্ত্তাগণ যে দর নির্দ্ধারণ করেন, তাহাতেই তাহাদিগকে সম্মত হইতে হয়।

শ্রম তত্ত্বে ইহা একটী স্থির মীমাংসা যে, ধনের প্রয়োজন দ্বারা শ্রমের প্রয়োজন জন্মে না ও শ্রমের প্রয়োজন দ্বারা ধনের প্রয়োজন জন্মে না। উভয়ের মধ্যে যে প্রবল হয়, সেই অন্যের অধীন হইয়া পড়ে। যদি শ্রমের আবশ্যক অধিক হয়, মূলধন তাহার পরিপোষণের পক্ষে অপ্রচুর হয়, তাহা হইলে মূলধনই সে স্থলে নিয়ামক হইয়া থাকে; আবার মূলধন যে স্থলে অধিক হয়, শ্রম অল্প থাকে, সে স্থলে শ্রমই মূলধনের নিয়ামক হইয়া থাকে। অতিরিক্ত শ্রম বা মূলধন ক্ষয় পাইয়া পরস্পরের সাম্য বিধান করে। এবিষয়টা জটিল, এজন্য একটা উদাহরণ দিতেছি। আমার ৫০,০০০ মালসার দরকার, কিন্তু কুম্ভকার মূলধন অভাবে ৫০০০র অধিক দিতে পারে না, সুতরাং আমার ঐ ৫০০০ই অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া কুম্ভকারকে অধিক মুনাফা দিতে হয়, আবার ভাবুন আমার দরকার ৫০০০র, কিন্তু ঐ কুম্ভকারের এত মূলধন আছে যে, সে ৫০,০০০ প্রস্তুত করিতে পারে, সে স্থলে তাহার ৫০০০র অতিরিক্ত মূলধন বসিয়া থাকিবে, অর্থাৎ তাহার সমগ্র মূলধনের উৎপত্তি ন্যূন হইবে।

শ্রীগঙ্গেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখা পড়া।

"লেখা পড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে," আমাদের এই কথা। সুতরাং বুঝিতে হইবে, লেখা পড়ার প্রকৃত আদর আমাদের দেশে আজ কাল নাই। ব্যাস, কনাদ, কপিলাদি মহাত্মাগণ যথাসাধ্য লেখা পড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাগ্যে গাড়ী ঘোড়া চড়া নিশ্চয় ঘটে নাই; অথচ বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল মহাপুরুষদের তুলনায় যৎসমান্য লেখাপড়া করিয়া কত উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার জুড়ি গাড়ী হাঁকাইতেছেন। এই দুই শ্রেণীর জীবের লেখা পড়ায় কত খানি তফাৎ, বুঝিতে না পারাই ভারতের বর্ত্তমান ব্যাধি। প্রথমোক্ত অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন অমরাত্মাগণ যাবচ্চন্দ্র দিবাকর এই সংসারে জীবিত থাকিবেন, আর একালের বিদ্যাদিগ্‌গজ লেখাপড়া-ওয়ালা বাবুগণ সাধারণ জীবের ন্যায় কালাতিপাত করিয়া যথাসময়ে অনন্ত কালের জন্য বিলুপ্ত হইবেন।

বিদ্যাধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিদ্যালাভ বই আর কিছুই নয়, কিন্তু অবিদ্যা অর্থাৎ ভোগবিলাসাদি ক্রয় জন্য অর্থোপার্জ্জন যদি লেখা পড়ার কারণ হয়, তাহার নাম লেখা পড়া নয়, অতি নিম্ন শ্রেণীর ব্যবসায়। ইহার প্রমাণ আমরা নিজেরা। আমাদের মধ্যে কাহাকেও সর্ব্বদা মনোযোগের সহিত অধ্যয়নে নিযুক্ত দেখিলে তাহাকে ঐ সৎপথ হইতে বিরত করিয়া আমাদের দলে আনিবার জন্য বলি, "কি এখন এত লেখা পড়ায় ব্যস্ত!", অর্থাৎ কালেজে লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকিবার কথা, এখন সংসারে প্রবেশ করিয়া পুরাতন হইয়াছি, স্বার্থপরতার নিকট দস্তখত লিখিয়া দিয়া টাকা রোজগারে নিযুক্ত হইয়া, মাছের ঝোল, স্ত্রীর অলঙ্কার ও কোম্পানির কাগজ ভিন্ন চতুর্থ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করি না; এখন ওরূপ নিষ্ফল কাজে (unproductive labour) ব্যস্ত থাকা নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত কথা। কিন্তু এইরূপ কৈফিয়ত বা আশ্চর্য্যোক্তি দ্বারা বাস্তবিক কি বুঝায়? ইহা দ্বারা আমি ধরা পড়িলাম, নিজের কপালে স্বহস্তে বড় বড় হরপে "মূর্খতার" ছাপ মারা হইল মাত্র;—এত কালের নাম আজ ডুবিল, শত শত পুঁথি পড়িয়াছি বলিয়া যে এক ভুয়া খ্যাতি ছিল, তাহা মুছিয়া গেল। টাকা রোজগারের গরমাগরম সময়ে বন্ধু যে সর্ব্বদা একমনে একধ্যানে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জনে ব্যস্ত, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারাতে কেবল মাত্র ইহাই প্রকাশ পাইল যে, আমি একজন চিনির বলদ, অনেক পুস্তক পড়িয়াছি বটে, কিন্তু শুধু মথন পড়া সার হইয়াছে, অর্থবোধ হয় নাই; কারণ তাহা আমার ক্ষমতার অতীত ছিল; জন্মাবধি লেখা পড়া করিয়াছি, কিন্তু আজ বেশ বুঝিতে হইতেছে, আমি ও রাইচরণ টিনওয়ালা উভয়ে সমান, প্রভেদ মাত্র এই যে, আমার উপর সৌভাগ্যের সুবাতাস বহিয়াছে, উহার অদৃষ্টে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে।

মানুষ নিঃস্বার্থ ভাবে শুধু জ্ঞান-লালসায় পরিচালিত হইয়া যাবজ্জীবন অধ্যয়ন নিরত

থাকে, ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হয়; তবে কি আমি ঘোর অজ্ঞান? যদি এই সর্ব্ববাদী-সম্মত বাক্য সত্য হয় যে, যে চোর না হইলে কোন বিশেষ পটু চোরের বাহাদুরী সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, নিজে চিত্রকর না হইলে সুচিত্রের গুণপনা বুঝিতে অক্ষম হয়; সাধু না হইলে সাধুর সাধু ভাব দেখিতে পায় না; (অর্থাৎ যাঁহার যে বিষয়ে যত টুকু খাঁটি অধিকার আছে, তিনি যে বিষয়ে তত টুকু উপলব্ধি করিতে সক্ষম) তাহা হইলে আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় ঐ উক্তির দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এখনও যদি আমি নিজের ত্রুটি ও অভাব দেখিতে পাইয়া থাকি, মঙ্গল, নতুবা সর্ব্বনাশ।

বহুকাল হইল গুরু রস্কিনের (Ruskin) নিকট শুনিয়াছিলাম "You might read all the books in the British Museum (if you could live long enough), and remain an utterly illiterate, uneducated person; but that if you read ten pages of a good book, letter by letter,—that is to say, with real accuracy,—you are for ever more in some measure an educated person." অর্থাৎ যদি কেহ অমানুষিক দীর্ঘ জীবন পাইয়া ব্রিটীশ মিউজিয়মের বিশ লক্ষ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারে, অথচ প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, সে নিরক্ষর মূর্খ বলিয়া গণ্য হইবে, আর যিনি কোন একখানি ভাল গ্রন্থের দশ পৃষ্ঠা উত্তমরূপে পড়িবেন, তত্রস্থ সত্যগুলি নিজের সম্পত্তি করিয়া লইতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় কতক পরিমাণে শিক্ষিত জীব। এই কয়টী মহামূল্যবান কথার মর্য্যাদা করিতে শিখি নাই বলিয়া আজ সংসারের ন্যায় বিচারে মূর্খ পদ বাচ্য হইলাম; ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে! হায়, অর্থকরী ভাবে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া কত অমূল্য জ্ঞান রত্ন হেলায় হারাইয়াছি। এখন বুঝিলাম, অর্থোপার্জ্জনের লেখা পড়া নয়, লেখাপড়ার জন্য অর্থোপার্জ্জন; অদ্যাবধি যথাসাধ্য অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিব, যাহাতে অতি শীঘ্র এই সয়তানের দাসত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনে মনোভিনিবেশ করিতে পারি।

শ্রীচন্দ্র শেখর সেন।

সৌন্দর্য্য।

এই বিচিত্র জগৎ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার। স্থির নয়নে একবার দৃষ্টিপাত করিলে, এই অনন্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চিত্ত চমৎকৃত ও বিমোহিত হইয়া পড়ে। আজ আমরা প্রতিনিয়ত সেই সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছি; সেই শোভা একই ভাবে আমদের সমক্ষে বিরাজ করিতেছে,—তাই আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, দেখিয়াও যেন দেখিতেছি না। কিন্তু মনে করুন, আমরা যেন মহা নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া সহসা এই সংসারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম; প্রকৃতির ভাণ্ডার আমাদের সমীপে উদ্ঘাটিত হইল, দেখিবামাত্র সুদূর সুনীল গগনে পরম শোভাকর শশধর

বিরাজমান; নক্ষত্ররাজি পুঞ্জে পুঞ্জে গ্রথিত হইয়া কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে, প্রকৃতির অলঙ্কার কুসুমরাজি বিকশিত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে; লতা কুসুম মণ্ডিত হইয়া মৃদুমন্দ সমীরণ সংযোগে সঞ্চালিত হইতেছে, অলিকুল পরিমল লোভে বিমুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছে। সাধ্য কি যে মন এ শোভা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? সৌন্দর্য্যের সমাকার্ষণে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, চিত্তে আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, শরীর সুশীতল সলিল সিঞ্চনবৎ সুস্নিগ্ধ হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যের সমুজ্জ্বল কিরণে নয়ন বিস্ফারিত, হৃদয়-সরোজ সমুদ্ভাবিত। সৌন্দর্য্য শারদীয় গগনের সুবিমল শশাঙ্ক, প্রশান্ত সাগরের আনন্দ-ময়ী লহরী লীলা, কিন্নরী-কণ্ঠ বিনিঃসৃত সংগীত—তাপস মনের অখণ্ড শান্তি। এ জগতে যাহা দেখিলে, শুনিলে বা ভাবিলে হৃদয় প্রফুল্ল হয়, তাহাই সুন্দর, তাহা-তেই সৌন্দর্য্য। অত্তুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ, বিশাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র হইতে সামান্য বালু-কণা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুতেই মনোহর শোভা সমাকীর্ণ রহিয়াছে। গভীর সাগর-কল্লোল, মৃদুগভীর মেঘনিনাদ হইতে কামিনী-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত সুতান সঙ্গীত পর্য্যন্ত প্রত্যেক মনোহর শব্দে মধুরিমা ক্ষরিত; অনুপম শোভা বিকশিত।

প্রকৃতি জগতে যাহা সৌন্দর্য্য, মানব-জীবনে তাহা বিভিন্নাকার। মানবের গুণই মানবের প্রকৃত সৌন্দর্য্য;—পবিত্রতা মানব জীবনের সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ। সত্য আমাদের অলঙ্কার, কোমলতা আমা-দের সৌরভ, দয়া আমাদের মকরন্দ। যখন বাহ্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে গুণের সম্মি-লন হয়, তখন সে সৌন্দর্য্য—সে মণি-কাঞ্চন যোগ—অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকু-ন্তলার সৌন্দর্য্য আর নন্দন কানন-বাসিনী অপ্সরাগণের সৌন্দর্য্য—চন্দ্রের কোমলতা আর সূর্য্যের প্রখরতা চিত্তের চির শান্তি এবং ক্ষণিক উল্লাস, ইহার মধ্যে একের সঙ্গে অপরের তুলনা হইতে পারে না। মানবের বাহ্য সৌন্দর্য্য বিলাস-ভঙ্গিমা সময়ে সময়ে লোকের চিত্ত বিমোহিত করে সত্য, কিন্তু যে সৌন্দর্য্যের জ্বলন্ত প্রতিভায় হৃদয়-নিহিত প্রেম বিগলিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়, এবং হৃদয়-নদী পূর্ণ হইয়া প্রেম সাগরে মিশিবার জন্য প্রধাবিত হয়, সে সৌন্দর্য্য বহি-র্জগতে নাই,—মানবের আভ্যন্তরীণ প্রদেশে তাহার পূর্ণ বিকাশ।

এই বসন্ত কাল; প্রকৃতি সুন্দরী অনুপম শোভায় সমুদ্ভাবিত। শীতের আতিশর্য্যে পৃথিবী শীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, বাসন্তিক সমীরণ সংযোগে শরীর বিকশিত ও সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত। জগৎ কেমন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে—সর্ব্বত্র অনন্দে পূর্ণ। মানব জগতে তদ-পেক্ষা সমধিক মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য প্রকাশিত। যৌবনের প্রারম্ভে যে অনুপম শোভা বিকশিত হয়, তাহা সন্দর্শন করিলে কাহার না চিত্ত বিমোহিত হয়—নয়ন আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত হয়?

সেই সৌন্দর্য্য অধ্যয়ন করিতে করিতে মনুষ্য ক্রমশ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। কল্পনা শক্তি উৎকর্ষতার শেষ সীমা অতিক্রম করত, এই মর্ত্ত্য জগতে স্বর্গের অপূর্ব্ব লীলা বিস্তার করিয়া, সেই ঐন্দ্রজালিক শোভায়

চিত্ত চমৎকৃত ও বিমোহিত করে। স্মৃতির অপূর্ব্ব ভাণ্ডার কত শত অলৌকিক ভাবে পরিপূর্ণ হয় এবং মুখমণ্ডলে অনুপম স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমাকীর্ণ হইয়া দেব ভাব ধারণ করে। সৌন্দর্য্য কবির কবিত্বশক্তির উন্মেষ সাধন করে—বালারুণ কিরণে শতদল বিকশিত হয়। সৌন্দর্য্যের লোপ হউক, জগৎ হইতে কবিত্ব অন্তর্হিত হইবে। যখন কবি সৌন্দর্য্যের নিভৃত নিবাসে প্রবেশ করিয়া তাহার অলৌকিক শোভা সন্দর্শন করেন, তখন তাঁহার মনে যে যুগপৎ কত শত ভাবের উদয় হয়, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? তিনি তখন যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করেন, তাহা মানবে "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"।

কালিদাসের কবিত্ব সৌন্দর্য্য-বিন্যাসময়; তিনি সেই সৌন্দর্য্যের সমাকর্ষণে দুষ্মন্তের মন হরণ করিয়াছিলেন। পথশ্রান্ত মৃগয়াক্লিষ্ট রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন, কবি সৌন্দর্য্যের বাসন্তিক লীলা বিস্তার করিলেন। দেখিতে দেখিতে কল্পনার তিনটী ছবি তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। আহা! সে সরলতা, সে কোমলতা, সে অলৌকিক মধুরিমা কে বর্ণনা করিতে পারে? প্রকৃতির তিনটী মনোহর ছবির সেই মধুর কথোপকথন, সেই সরলতাময় প্রণয়, সেই যৌবন-সুলভ ঈষৎ আকুঞ্চিত ভাব, সেই বৈকালিক সৌর কিরণ-পরিস্নাত পবিত্র তপোবনের অপূর্ব্ব শোভা, দুষ্মন্ত অনিমেষ লোচনে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন, বাহ্য জগতের সঙ্গে চিত্তের সমন্বয় হইল, তিনি বিহ্বল হইয়া সেই সৌন্দর্য্যস্রোতে পতিত হইয়া ভাসিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ সমুদায় সংসার অন্তর্হিত হইল; কেবল একটী মাত্র ছবি—সৌন্দর্য্যের লীলাময়ী সেই মনোহারিনী মূর্ত্তি খানি দেখিতে লাগিলেন। হৃদয়-তন্ত্রী একে একে বাজিয়া উঠিল; অন্তর্জগতে এক মনোহর সঙ্গীত সমুত্থিত করিল। প্রেমের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য, সৌন্দর্য্যের এই অতুল বিন্যাস কবি তাঁহার সেই অবিনাশী গ্রন্থে চিত্রিত করিয়া তাহার বিকাশ দেখাইয়াছেন। সৌন্দর্য্যে প্রেম, প্রেমে মিলন, এবং মিলনে সমাজ সংগঠন ও পাথিব সুখের উদয় ও সম্ভোগ। সৌন্দর্য্য বৃক্ষ, প্রেম তাহার ফুল, এবং মিলন তাহার ফল। এই সৌন্দর্য্যবোধই মানবকে ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছে, তাহা না থাকিলে মানবে ও ইতর জন্তুতে কোন প্রভেদ থাকিত না। মানব প্রতিনিয়ত সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে প্রধাবিত। মানবের স্বর্গ, অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনন্ত আলয়। মানবের দেবতা, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অবতার।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-লিপ্সা যেমন এক দিকে মনকে উন্নতির চরম সীমায় উপনত করিতেছে, অপর দিকে তেমনই বিলাসের প্রবল তরঙ্গে ফেলিয়া মানবের চির শান্তি ও সুখ অপহরণ করত তাহাকে বিনাশের পথে অগ্রসর করিতেছে। মানব কর্ত্তব্যের পথে বিচরণ করিতে করিতে সহসা সৌন্দর্য্যের অনুপম মূর্ত্তি দর্শনে এরূপ উন্মত্ত হইয়া পড়ে যে, আর স্থির থাকিতে পারে না। হিমাচলের তুষারমণ্ডিত বালারুণ-রঞ্জিত শোভা সন্দর্শনে ভাবুক বিমোহিত হইয়া স্থির নয়নে ভগবানের কীর্ত্তি অনুধ্যান করিতে থাকেন, আর অবোধ পুরুষ অধীর হইয়া ঐ রত্নমনি পাইবার জন্য আরোহণ

করিতে গিয়া অধঃপতিত ও নিষ্পেষিত হইয়া যায়। রমণীর অনুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে পারস্ত কবি ভগবানের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, আর ইন্দ্রিয়-প্রমত্ত পাপ-পুরুষ তাদৃশ রূপে সমাকৃষ্ট হইয়া অনন্ত নরকে ডুবিতেছে। ক্লিওপেট্রাররূপে বিমুগ্ধ হইয়া এনটনি অতুল সাম্রাজ্য ও স্বদেশের মমতা পরিত্যাগ করিয়া চির কলঙ্ক-পঙ্কে ডুবিলেন, আর আগস্ত সিজার তাহা পাপের প্রলোভন বলিয়া পদতলে দলিত করত বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট ও অতুল বৈভবের অধীশ্বর হইয়া স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন।

আমি তেমন সৌন্দর্য্য চাহিনা। ঐ যে সর্প-জড়িত চন্দন তরু রহিয়াছে, উহার নিকট যাইতে চাহিনা। আমি সৌন্দর্য্য দেখিতে চাহি, স্পর্শ করিতে চাহিনা। ফুলটি ফুটিতেছে, কেমন বাতাসে দুলিতেছে, তাহা দেখিতে ভাল বাসি—উহা ছিড়িতে চাহিনা; উহা ছিড়িলে উহার সে শোভা, সে সৌন্দর্য্য থাকিবেনা; সে নূতনত্ব, সে কোমলতা কিছুই থাকিবে না। ঐ যে অবোধ পতঙ্গ সৌন্দর্য্য ডুবিবে বলিয়া কত চেষ্টা করিতেছে, কতবার যাইয়া ঐ আবরণের উপরে পড়িতেছে, কত ব্যাকুল হইতেছে, মোহ আবরণ উহার পথের প্রতিবন্ধক বলিয়া কত আর্ত্তনাদ করিতেছে, অবশেষে অশেষ চেষ্টার পরে ঐ যে আলোর উপর উৎপতিত হইয়া পুড়িয়া গেল—আমি উহার মত প্রমত্ত হইতে চাহিনা। এই যে সংসারের মোহ, এই যে সংসারের স্নেহ মমতা, উহা আমার নিকট বড় আমোদের জিনিষ—আমি উহা-রই মধ্যদিয়া সেই পূর্ণ আলোক দেখিতে চাহি; অনন্ত কাল দেখিব—স্থির নয়নে স্থির ভাবে দেখিব, কিন্তু সাধিলেও আমি উহাতে যাইয়া পড়িবনা; আমার ভয় হয়, আমার শঙ্কা হয়—আমি উহার সঙ্গে মিলিতে অনুপযুক্ত,—মিলিতে চেষ্টা করিলে আমার ঐ পতঙ্গের দশা হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

বঙ্গবাসী ও অনাচরনীয় হিন্দু।

(৩)

আমি যে অতিশয় "মূর্খ", তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। বঙ্গবাসীতে ঐ কথার পুনরুল্লেখে আমি সমধিক কৃতজ্ঞ হইয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু নব্য-ভারতের সম্পাদক মহাশয় ও "সমস্ত বাবু-দের মূর্খতা" আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

বঙ্গবাসীর নীতি সম্বন্ধে যাহা আমরা বলিয়াছি, বঙ্গবাসী তাহা একে একে সকলই স্বীকার করিয়াছে ও করিতেছে। তবে যে গুণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শৌণ্ডিকের ও সুবর্ণবণিকের বাটীতে দানগ্রহণ করিয়া সমাজে আসিয়া অস্বীকার করেন, স্বভাবসিদ্ধ সেই পরম রমণীয় গুণ বশতঃ বঙ্গবাসী

আমাদের কথায় উত্তর দিয়াও প্রকাশ্যে আমাদের কথায় উপেক্ষা ও "ঘৃণা" প্রদর্শন করিয়াছে। আমরাও বঙ্গবাসীকে একথা বলিতে পারি যে, আমরা যদি কোন বস্তুকে ঘৃণা করি, তবে এই প্রকারের কাপুরুষতাকেই করি।

ইহা আমরা জানি ও বলিয়াছি যে, এ দেশের অনেক মূর্খ লোক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকেই হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া জানে। আবার এমন বিচক্ষণ লোকও আছে, যাহারা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ও যাজকতা যে ভিন্ন জিনিষ, ইহা উপলব্ধি করিতে পারে। আধুনিক বাবুগণই এই বিভিন্নতা বুঝেন, এমত নহে, বঙ্গবাসীর অবাবুগণও উহা বিলক্ষণ রূপে বুঝেন। যত কেন সূক্ষ্মভাবে ও সতর্কভাবে বলা হউক না, বঙ্গবাসীর উপদেশ যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যকে লক্ষ্য করে, তাহা বুঝিতে কৃতবিদ্য সমাজের আর বাকী নাই। তবে যাঁহারা নিদ্রা যাইতে যাইতে বঙ্গবাসী পাঠ করেন, তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গের জন্য গত কয়েক সপ্তাহের বঙ্গবাসী হইতে, আমাদের উত্তরচ্ছলে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

১। "শাস্ত্রশাসিত ও ব্রাহ্মণাশ্রিত সমাজকেই আমরা হিন্দু সমাজ বলিয়া জানি।" বঙ্গবাসী ২২শে ভাদ্র, ১২৯৭, ৪র্থ স্তম্ভ।

২। "ব্রাহ্মণ যাহাতে সুব্রাহ্মণই থাকেন, দেশে যাহাতে সংস্কৃত ভাষার সমধিক চর্চ্চা হয়, শাস্ত্রানুশীলন বিশিষ্ঠ রূপে হয়, ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা। * * * ধর্ম্মশাস্ত্রের সার কথা ব্রাহ্মণের জিহ্বাগ্রে অবস্থিতি করুক—ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা। আমরা জানি, সুব্রাহ্মণ ব্যতীত হিন্দু সমাজ সুরক্ষিত হইবে না। তাই আমরা ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য এত বদ্ধকর।" বঙ্গবাসী ২৫ শে শ্রাবণ, ১২৯৭; ৫ম স্তম্ভ।

পাঠক! বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণের স্বার্থে পরিচালিত কি না, এস্থলে বিবেচনা করুন।

শাস্ত্রশাসিত ধর্ম্মকে আমরাও হিন্দুধর্ম্ম বলি। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সটীক স্মৃতি সংগ্রহ যদি শাস্ত্র হয়, রমেশ বাবুর সটীক ঋক্‌বেদ সংহিতা শাস্ত্র হইবে না কেন, ইহাই আমরা বুঝি না।

সুব্রাহ্মণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন, ইহা আমাদেরও ইচ্ছা; কিন্তু কুব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া তাহার ব্যবসায়োচিত বর্ণে তাহাকে নিমজ্জিত কর এবং পংক্তি ভোজনের সময় তাহাকে ব্যবসায়োচিত বর্ণের সঙ্গে বসিতে দাও। আর তাহা যদি না কর, তবে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কথা মুখে আনিও না, এবং শুঁড়ী যদি যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইতে চায়, তাহাকে নিষেধ করিও না।

৩। "কলিকাতার হিন্দু হোষ্টেলে সুবর্ণবণিকের সন্তানকে স্থান দেওয়া হয় নাই, তাই একটু ঘোট হইতেছে। হোষ্টেলের নিয়ম আমরা জানি না। কিন্তু যেখানে সংস্পর্শের আশঙ্কা সেখানে সুবর্ণবণিকেরাই বা জিদ করিবেন কেন?" বঙ্গবাসী ২২ শে ভাদ্র, ১২৯৭—১ম স্তম্ভ।

অনাচরণীয় হিন্দুগণ বঙ্গবাসীর কর্ণধারত্বে যে লাভ করিবেন, তাহার নমুনা বাহির হইতেছে। ধনকুবের সুবর্ণবণিকগণ যখন বিদ্যালঙ্কার ও সিদ্ধান্তবাগীশদিগকে চুপে চুপে দান করেন, তাঁহাদের হাতের রসিদ রাখিবার রীতি যদি প্রবর্ত্তিত করিতেন, তবে অনেক উপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায়ের নাম

তাঁহাদের দ্বারদেশে সাইনবোর্ডে দেখাইতে পারিতেন। তাহাত তাঁহারা করেন নাই। ধন আছে ধনের ব্যবহার করিয়াছেন, সুখ হইয়াছে ও হইতেছে, এই পর্য্যন্ত। কৈবর্ত্ত-গণের মধ্যে একদল ঘুষ দিয়া সংস্পর্শের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন; তাঁতীর মধ্যে "ক্ষীর তাঁতী" নাম ধারণ করিয়া একদল উঠিয়া গিয়াছেন, দাগদেওয়া গোয়ালও সজল ব্যবহারের অন্তর্গত হইয়াছে; শৌণ্ডি-কের মধ্যে একদল 'কুণ্ড' উপাধিগ্রহণে উপরে উঠিয়াছেন; সুবর্ণবণিকের মধ্যে, বহু বহু সুবর্ণবণিক নাম ধারণ করিয়া, অবশ্য শাস্ত্রাধ্যক্ষগণকে ঘুষ দিয়া, উঠিয়া যাইবার জন্য একদলের চেষ্টা আছে। যাহা হউক, এরূপেও যদি দেশে সজল ব্যবহার হয়, দোষ নাই। কিন্তু আজ কি ব্রাহ্মণে পাতি দিলেই অন্যান্য জাতি, অনাচরণীয় জাতির মধ্যে এবম্বিধ ছিন্ন-লাঙ্গুল শৃগাল তুল্য উচ্চাভিলাষীদিগের জলস্পর্শ করিবে? আমরা এমন মনে করি না। সজল ব্যব-হারের জন্য এরূপ পরোক্ষ ভাবের যত্ন আমরা অনুমোদন করি না। পরোক্ষ ভাবের যত্ন অতি হীন জাতির সম্ভবে, সুবর্ণবণিকের ন্যায় মান্যগণ্য জাতি, সজলত্যাগ করিয়া কিছু ঘুষ ঘাস দিয়া উপরে উঠিবার যত্নকরিতে পারিবেন, এমন আমরা মনে করি না।

অনাচরণীয় বর্ণের কি উপায়ে সজল ব্যবহার হইতে পারে, এবিষয়ে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা লিখিয়াছি। তাহাতেই আমরা বলিয়াছি, সকল অনাচরণীয় জাতি সমবেত ভাবে সজল ব্যবহারের যত্ন করিলে, সিদ্ধকাম হইতে পারেন। সুবর্ণবণিক ও শৌণ্ডিকগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেই কার্য্য হয়।

৪। "এত যে জাতি নাশের চেষ্টা, হিন্দু মুসলমান, পার্শী খৃষ্টান সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিবার আগ্রহ, এই যে ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ, বাল্যবিবাহের উপর আক্রোশ * * ইত্যাকার অন্যবিধ সমাজ সংস্কারের প্রয়াস এই সমস্ত বাবুদের মূর্খতা জন্য।"

৫। "বাবুদের মধ্যে কদাচিত দুই এক জন বিদ্যাভিমানী আছেন। ঋক্‌বেদের ভুঁইফোড় আচার্য্য হইয়া ইঁহারা ধূয়া ধরাইয়া দেন। নিরক্ষর অনুচরবর্গ অমনি সমস্বরে দোহারী করিতে থাকেন।" (বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র, ১২৯৭, ৪।৫ স্তম্ভ)।

এই ভুঁইফোড় আচার্য্য বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত, আর এই দোহারী-কারক বোধ হয় আমাকে বলা হইয়াছে। রমেশ বাবুর বেদানুবাদে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে বসি-য়াছে। আমি অবগত হইয়াছি, তিনি একটি বৈদিক বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষায় বেদ শিক্ষা দেওয়ার বিধান করি-বেন। এ বিষয়ে আমার নিকট যে সকল কাগজ পত্র আছে, তাহা আমি ক্রমশঃ মুদ্রিত করিব। সুতরাং এক্ষণ কিছু বলিব না।

৬। "বাবু বিদ্যালয় বাবু বানাইবার কল। বাবুরাই সমাজ ধ্বংসের মূলীভূত কারণ হইতেছেন। চোকের উপর এই সর্ব্বনাশ দেখিতেছি, তবুও ত চৈতন্য কাহা-রও হয় না। ইংরেজি যখন শিখিতে হইবে, তখন আজ কাল খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও বাবুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর কি আছে? তখন ছিল এক শত্রু (খ্রীষ্টানেরা) এখন হইয়াছে তিন শত্রু (খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও বাবু) সুতরাং বহিয়া যাইবার পথ প্রশস্ত হই-

য়াছে।” (বঙ্গবাসী ১৫ই ভাদ্র, ১২৯৭, ৬ষ্ঠ স্তম্ভ)।

বঙ্গবাসীর লেখকগণের মধ্যে যে কেহই বাক্যানুরূপ হৃদয় ধারণ করেন না, এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে চাহি না। যাঁহারা দেশের উপকার করিবার প্রয়াসী, তাঁহাদের যদি কোন শত্রু থাকে, তবে সে শত্রু কপটতা। বঙ্গবাসী কি প্রকৃতই বাবুগণকে এইরূপ শত্রু মনে করে? ইংরেজী শিক্ষা কি প্রকৃতই বঙ্গবাসীর অশ্রদ্ধেয়? তবে কলিকাতার বঙ্গবাসী স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয় কেন? এই প্রকার কপট উপদেশে কি সুব্রাহ্মণ তৈয়ার হইবে? ছি! যদি বাবুই ঘৃণার পাত্র ও শত্রু হয়, তবে বঙ্গবাসীর আফিসময় যে আমরা বাবু দেখিতেছি! বঙ্গবাসীর শত্রু বাবুরা নয়, বঙ্গবাসী নিজে।

৭। “আবার অজ্ঞান ও দুর্বুদ্ধি বশত ‘সমং পশ্যতি পণ্ডিতঃ’ ইত্যাদি বাক্যে একে আর বুঝিয়া এক অদ্ভুত সাম্যবাদের সৃষ্টি করিয়া ইঁহারা জাতি নাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়, বৈষম্যই জগৎ। যতক্ষণ বৈষম্য থাকিবে, ততক্ষণ সৃষ্টি থাকিবে। সাম্যই প্রলয়।” (বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র ১২৯৭, ৪।৫ স্তম্ভ।)

বলি, ইংলণ্ড ও রুষ ভূমে যে বর্ণবৈষম্য নাই, সে সব স্থানে প্রলয় হইয়াছে কি?

আবার দেশে যে কন্যা বা বর বিক্রয়ের প্রথা হইয়াছে, তাহাও নাকি বাবুদের দোষ।

৮। “তাই বলি ইংরেজী শিক্ষিত বিক্রীত বাবুদের মতি গতি ফিরাইতে না পারিলে কন্যাদায়ের বিষম রোগ সারিবে না। * * * * কন্যাদায়ের কুপ্রথা ঘুচাইবার চেষ্টা করিতে হইলে প্রত্যেক সমাজের জাতিকে স্বতন্ত্রভাবে করিতে হইবে। একাকারে চলিবে না। (বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র, ৪র্থ স্তম্ভ।)

ধন্য সত্যবাদীতা! কৌলিন্য প্রথা, অন্তর্বিবাহের অভাব, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কারণে কন্যাদায় জন্মিয়াছে। সে দোষটা এক্ষণ বাবুদের শিরে চাপাইয়া দেওয়া হইল! বাস্তবিক কি ইহা সরল হৃদয়ের কথা? যদি ইহা কপট বাক্য হয়, তবে এ দেশের এত লোককে ত ইহা শুনিতে দেওয়া উচিত হইতেছে না। বাবুদের যে দোষ নাই, তাহা নহে। কিন্তু কন্যা বিক্রয়ের বা বর বিক্রয়ের দোষ বাবু হইতে জন্মে নাই।

যে দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম, একতার নাম “একাকার”, সে দেশেই এত কপট ব্যবহার সম্ভবপর হয়।

৯। “হিন্দু মুসলমানকে একাকার করিবার চেষ্টাও অজ্ঞান প্রযুক্ত। তেলে জলে মিশাইতে গেলে তাহাতে আর প্রদীপও জ্বলে না, তৃষ্ণাও ভাঙ্গে না। তেলও নষ্ট হয়, জলও নষ্ট হয়। অথচ বাবুদের ব্যাপারই এই রকমের।” (বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র, ৪।৫ স্তম্ভ।)

হিন্দু ও মুসলমান তেল ও জল নহে। ইহারা তেল ও তেল। তেলে তেলে মিশাইলে প্রদীপ বিলক্ষণ জ্বলে। এই তেল কেবল দুই বোতলে রাখা হইয়াছে। মিশাও, প্রদীপও জ্বলিবে, পাকের কাজও চলিবে। ইহা যে বুঝ না, ইহাই মূর্খতা।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

ভারতীয় মুদ্রা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

ব্রিটীশ ভারতের ইংরাজ পুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মুদ্রা সকলের বিবরণ পাঠকদিগের নিকট বোধ করি অবিদিত নাই; কিন্তু তবুও এসম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার বিষয় বাকী আছে। ইংরাজ রাজা এদেশে প্রধানতঃ তিন প্রকার ধাতুর মুদ্রা প্রচলন করিয়াছেন, তদ্যথা স্থবর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র। ইংরাজের স্থবর্ণ মুদ্রা দুই প্রকার (১) গিণি সোণার মুদ্রা এবং (২) পান্না সোণার মুদ্রা। শেষোক্ত প্রকার স্বর্ণই খাঁটি এবং এতদ্দেশীয় বিশুদ্ধ স্থবর্ণ। রৌপ্য মুদ্রা সমূহ টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি এবং একাণী, এই পঞ্চম প্রকারে বিভক্ত। একাণীর ব্যবহার এখন খুব কম। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রৌপ্য মুদ্রার ৫ বার সংস্করণ হইয়াছে; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কালে রৌপ্য মুদ্রায় তুলাদণ্ডের চিত্র ছিল, তাহার পরে ব্যাঘ্রমূর্ত্তি বসান হয়। কিছুকাল পরে শার্দ্দুলের ভীষণ মূর্ত্তি উঠাইয়া দিয়া চতুর্থ উইলিয়মের নামে টাকা উঠিতে আরম্ভ হয়, তদনন্তর কুইন ভিক্‌টোরীয়ার প্রতিমূর্ত্তি ও নামে টাকা অঙ্কিত হইতে থাকে। লর্ড লিটনের শাসন কালে দিল্লীর বিখ্যাত দরবারের পরে এন্‌প্রেশ্‌ ভিক্‌টোরীয়া নামে মুদ্রা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। তাম্র মুদ্রা সমূহ একপয়সা, অর্দ্ধপয়সা এবং $\frac{১}{১২}$ আনী, এই চারি ভাগে বিভক্ত। ইংরাজী বারো পাই আমাদের এক আনা; অর্দ্ধপয়সার নীচে অতি ক্ষুদ্রাকার তাম্র মুদ্রা চলে, তাহার নাম $\frac{১}{১২}$ আনা মুদ্রা অর্থাৎ বারো পাই হিসাবে যে "আনা" হয়, সেই আনার ইহা দ্বাদশাংশের একাংশ। বাঙ্গালা দেশে ইহা কম চলে, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইহার অধিক প্রচলন, তথায় ইহা ছোটা পাই, এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের তিনটা এক পয়সার সমমূল্য। ইংরাজের তাম্রমুদ্রার প্রায় ত্রয়োদশ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। এই ত্রয়োদশ সংস্করণের ভিন্ন ভিন্ন পয়সা একত্র করিলে দেখিবেন, সিংহ, শার্দ্দুল, তুলাদণ্ড, কুইন ভিক্‌টোরীয়া, এম্‌প্রেস ভিক্‌টোরীয়া, চতুর্থ উইলিয়ম, উদ্যান, কোম্পানীর কুঠি, কোম্পাণীর নাম, তাম্র প্রভৃতি লেখা আছে। যতই সংস্করণ হউক না, ধাতুর ওজন ও দর প্রায়ই সকল সময়ে এক থাকে। ধাতুপরীক্ষকেরা বলেন, ইংরাজের টাকায় প্রায় তিন আনা খাদ দেখা যায়, কখনও কখনও তাহার অধিকও থাকে। এক্ষণে সংগৃহীত মুদ্রা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। যতপ্রকার মুদ্রা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকটিতে সংখ্যা দিয়া বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। রট্‌লামের তাম্র মুদ্রা।

মধ্যভারতের অন্তর্গত মালোয়া প্রদেশের সীমান্তবর্ত্তী রট্‌লাম একটি ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য। বর্ত্তমান রাজার নাম রনজিৎ সিংহ, যুবাপুরুষ এবং জাতিতে ক্ষত্রিয়। আয় প্রায় বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা; গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন। রাজার নিজের টাকশালা আছে, তথায় কেবল তাম্র মুদ্রা (পয়সা) অঙ্কিত

হয়; রৌপ্য বা স্বর্ণ মুদ্রা অঙ্কণের অধিকার রাজার নাই। টাকশালার অধ্যক্ষের নাম রঘুনাথ প্রসাদ। রট্‌লামে যে তাম্র মুদ্রা দেখা যায়, তাহা দুই প্রকার, যথা প্রাচীন ও আধুনিক। বর্ত্তমান (সন১২৯৭) সালের শ্রাবণ মাস হইতে বর্ত্তমান রাজা রনজিৎ সিংহ একপ্রকার নূতন ধরণের পয়সা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহারই নাম আধুনিক পয়সা। এই পয়সা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যে তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম প্রাচীন পয়সা। রটলামের লোকেরা ইহাদিগকে "কদমী পয়সা" এবং "হালী" পয়সা, এই দুই নামে আখ্যাত করেন। রটলামের পুরাতন পয়সার একপৃষ্ঠের দুই পার্শ্বে দুই তরবারীর চিত্র এবং তরবারীদ্বয়ের মধ্যে সূর্য্যের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি দেখা যায়। সূর্য্যদেবের মস্তকোপরে সুদর্শনচক্র এবং নিম্নে গঙ্গানদী। পয়সার অপর পৃষ্ঠায় ইংরাজী অক্ষরে "Rutlam: 1853" এই গুলি দেখিতে পাইবেন। পয়সার আকার গোল; ওজনে ইংরাজী এক পয়সা হইতে কিছু অধিক। এই পয়সা রট্‌লামে প্রায় ৪৮ বৎসর চলিতেছিল, ইহার পূর্ব্বে হোলকার মহারাজার মুদ্রা এখানে চলিত। উপরে যে পয়সার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ইং ১৮৫৩ অব্দের মুদ্রা। অর্দ্ধ পয়সার চলন এখানে নাই। এখন যে নূতন পয়সা চলে, তাহার বিবরণ এই রূপ। এক দিকের চতুষ্পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর লতা এবং ঐ লতার শাখায় পত্র ও ফুল; মধ্যে দেবনাগরাক্ষরে "এক পয়সা" এই কয়েকটি কথা লেখা। ইহার নীচে সম্বতের উল্লেখ থাকে। অপর পৃষ্ঠার চতুষ্পার্শ্বে লতা, পাতা, ফুল, ফলের চিত্র আরও নিবিড়, সুন্দর এবং দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বড়। ইহার মধ্যস্থানে মারুতী দেব (পবনপুত্র) হনুমান, বস্ত্রদ্বারা কটিদেশ বদ্ধকরিয়া, ভীষণ গদা হস্তে মহাবীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। ইহার পদতলের নীচে দেবনাগরাক্ষরে "রৎলাম" কথাটি অতি ক্ষুদ্রাকার রূপে দেখিতে পাইবেন। পয়সার আকার গোল, ওজন প্রায় ব্রিটিশ পয়সার সমতুল্য। সুতা দিয়া রৎলামের প্রাচীন ও আধুনিক পয়সাকে মাপিলে, প্রথমের পরিধি প্রায় (সুতার লম্বত্ব অনুসারে) পৌণে চার অঙ্গুলি এবং দ্বিতীয়ের পরিধি প্রায় ৪ অঙ্গুলি হইয়া থাকে। যে সুতা দিয়া মাপিবেন, সেই সুতার দৈর্ঘ্যের মাপের কথা বলা যাইতেছে। রৎলাম রাজ্যে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের এবং পার্শ্ববর্ত্তী দুই।একটি দেশীয় রাজ্যের পয়সারও প্রচলন আছে।

২। বরোদারাজ্য। গুজরাটের বরোদারাজ্য অতি বিস্তৃত ও প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের রাজারা গুজরাটী ভাষায় গায়কোঁয়াড় নামে খ্যাত। "গায়" অর্থে গাভী, "কোঁয়াড়" অর্থ "পালক" অর্থাৎ গাভীর রক্ষক ও পালক, এই জন্যই বরোদারাজ্যে গাভীর খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা। বরোদারাজ্যের তাম্র মুদ্রার (পয়সার) আকার গোল। ইহার একদিকে লতা পাতার চিত্র এবং তাহার মধ্য দেশে দেবনাগরাক্ষরে "এক পয়সা এবং সম্বতের উল্লেখ আছে।" অপর পৃষ্ঠায় দেবনাগরাক্ষরে "শ্রী রায়াজী রাওমগায়ক বাড" এবং তদন্তর "সেনাখ্যা সখেল শমসের বাহাদুর" এই শব্দগুলি দেখিতে পাইবেন। ইহাদের মধ্যস্থলে দেবনাগরাক্ষরে "সরকার"

এবং তাহার নীচে কর্ত্তিত নরমুণ্ডের অর্দ্ধাংশ ও তন্নিম্নে এক তরবারীর চিত্র। ওজনে ইংরাজী পয়সার সমতুল্য। সুতা দিয়া মাপিলে সুতার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ অঙ্গুলি হয়।

৩। আশির গড়। খান্দেশের অন্তঃপাতী। খাণ্ডোয়া হইতে গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনীন্‌শুলার রেলওয়ে কোম্পানীর গাড়ীতে বোম্বাই অভিমুখে যাইলে পথে চাঁদনী ষ্টেশন দেখিতে পাইবেন। ইহা বোম্বাই হইতে ১৬০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। চাঁদনী ষ্টেশন হইতে আশিরগড় প্রায় তিন ক্রোশ। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে আশা আহির নামক এক গোয়ালা জাতীয় কৃষক এই রাজ্য স্থাপন করেন। পর্ব্বতের উপরে যে মহা প্রকাণ্ড দুর্গ আশিরগড় নামে খ্যাত, তাহা ইহারই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। আকবর সাহ এই দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরেজেরা আশিরগড় এক্ষণে কারায়ত্ব করিয়া রাখিয়াছেন। কতকগুলি ইংরাজ ও দেশীয় সৈন্য এখানে এক্ষণে বাস করে। এই দুর্গ ইংরাজের "রাজকয়েদী" (Political State prisoners) গণের কারাগার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। রাজা আশা আহিরের মুদ্রার আকার চতুষ্কোণ, ইহা তাম্র ও রৌপ্য, এতদুভয়ে নির্ম্মিত। আকার ক্ষুদ্র। কোনও অক্ষর বা চিত্র নাই, দুই পৃষ্টে কতকগুলি অর্থ শূন্য বিন্দু মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ওজনে এক দুয়ানীর সঙ্গে সমান। ইহার দৈর্ঘ্য কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নখের সমান। এই পয়সা এখন চলে না; আশিরগড় এখন ইংরাজ রাজ্য।

৪। ভারতে পর্টুগীজ রাজ্যের মুদ্রা। গোয়া প্রভৃতি পর্টুগালাধিকৃত রাজ্য সমূহে এই মুদ্রা (পয়সা) প্রচলিত হয়। ইহার ধাতু তাম্র, আকার গোল। ইংরাজের পয়সার সমতুল্য ও সমমূল্য। ওজন প্রায় এক। এই পয়সার এক দিকে ইংরাজী অক্ষরে "Ludovicus. 1. Portug: et. Algarb : Rex. 1884." এই কথাগুলি লেখা আছে। ইহাদের মধ্যদেশে পর্টুগীজ সম্রাটের মুখের মূর্ত্তি। সম্রাটের মাথায় আবরণ নাই। অপর পৃষ্ঠায় ইংরাজী অক্ষরে "India Portugueza. De Tanga" এই কয়েকটি কথা আছে। ইহাদের মধ্যদেশে সম্রাটের মাথার মুকুটের চিত্র, এবং এই চিত্রের নিম্নে ইংরাজীতে "quarto', শব্দ দেখিবেন। সুতা দিয়া পরিধি মাপিলে, সুতার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ অঙ্গুলি হয়।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দত্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

অন্বেষণ।

খুঁজে খুঁজে হারানিধি মেলে নাই যার
নিরাশ হয়েছে তবু, খোঁজে নাকি আর?
তেমতি এ অন্বেষণ,
তাই পুনঃ আকিঞ্চন,
তাই ও ভুলের দেশে যেতেছি যাচিয়ে,
বাসনা—বিমনা, আশা উঠে শিহরিয়ে।

বরষা প্লাবিত স্নেহ কেমনে শুকায়,
বাল্য-রবি অনুরাগ কোথায় লুকায় ?
হতাশের প্রাণ নাশা,
জ্বর পূর্ণ ক্ষীণ আশা,
পিপাসায় ছুটাছুটি করে তৃষ্ণিকায়,
হারায়েছে যারে; তারে তবু নাহি পায়!

উপেক্ষাই আত্মহত্যা—ধৃতির বিকার,
স্মৃতি মাঝে অনাবৃষ্টি বজ্র হাহাকার,
সেথায় কার্য্যের শেষ,
অনিবার্য্য হেথা ক্লেশ,
প্রতিধ্বনি সে হৃদয় নাহি করে পান
সাঁপেতে শিশির বিন্দু কটোর পাষাণ!!

কবিতা-বসন্তে কেন কোকিল-কূজন
আশা সুরভিতে ভরা মলয় স্বজন ?
না যাইবে কাছে তার
না ছুঁইবে দেহ আর
গান মাখা এ অনিল প্রাণে করে খেলা
পশে না সেথায় যেথা প্রেমে অবহেলা।

যে ছিল সে স্মৃতি মাঝে নিদ্রায় মগন
জীবন্ত সমাধি আমি কাঁদি অকারণ
জীবন যা—মরিয়াছে
মৃত্যু সুধু-জেগে আছে—
সাধিলে কি মৃত্যু কাছে—মিলিবে জীবন
হারায়েছি যারে—তার বৃথা অন্বেষণ।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

আকুলতা।

কেন এই আকুলতা মরমের মাঝে গো,
ভাবের লহরী পরে অজানা উছাস!
শীতের কুয়াশা দিনে, অফুট হৃদয় বনে,
কোথা হতে ব'হে আসে বসন্ত বাতাস।
প্রাণের ভগন ঘরে, কেন গো, কিসের তরে
সহসা পড়িল মৃদু জ্যোছনা আভাস?
বিশুষ্ক পতিত চিতে আকুলতা জাগাইতে,
কে আনিল, কোথাকার কুসুম সুবাস?
নিভৃতে পাতার আড়ে, লুকাইয়ে অন্ধকারে,
কোন্ পিক দিয়ে সাড়া থামিল আবার;
আধ মৃদু তার গান, ভরেছে ঘুমন্ত প্রাণ,
মেলিতে অলস আঁখি পারিনা যে আর!
কি এক স্বপনে হায়! পরাণ ভাসিয়ে যায়
ভাঙ্গিয়া হৃদয় স্তর আকুলতা স্রোত বয়!
কেন এই আকুলতা, কেন এ নীরব ব্যথা,
কিছুই বুঝিতে নারি,—বিপ্লব পরাণময়।

শ্রীবিনয় কুমারী বসু।

বসন্ত ফুরায়ে গেল ?

কখন বসন্ত এসে
সেজেছিল নব বেশে
কখন ফুটিল ফুল
বহিল মলয় বায় ?
পিউ পিউ তান ধরে
পাপিয়ারা গান করে
কুহুরবে নবলতা
শিহরে কোমল কায় ?
গুণ গুণ অলিকুল
আড়ে চায় বনফুল
নিকটে আসিলে কাঁপে
হেঁসে অলি উড়ে যায়।
কখন বসন্ত এল
কখন চলিয়া গেল
কখন ফুটিল ফুল
ভরা ভরা লতিকায় ?
আমার হৃদয় মন
ধ্যানে ছিল নিমগন

প্রিয়ের প্রেমের ছবি
দিবা নিশি অরচনে।
অনমনে এক যোগে
নির্নিমেষ সুখ ভোগে,
কেটেছে রজনী দিন
জাগরণ সুস্বপনে।
ফুল তুলে মালা গেঁথে,
কাননের পথে পথে,
করিনি যে সখি খেলা
ফুলদের চুমি চুমি।
একিসের ঘুমের ঘোর,
একিসে স্বপন মোর,
অথবা সে নাহি এল,
না শোভিল বনভূমি।
মালা গাঁথা নাহি হোলো,
মালা দে'য়া নাহি হোলো,
আসিল বসন্ত আর
অমনি চলিয়া গেলো!
বিরহের বারি ধারা
ঝটিকা করকা তারা
গিয়ে কেন নাহি যায়
যেই এলো সেই এলো?

শ্রীরণ কুমারী।

মিলন।

(১)

সংসারে প্রবাসী মোরা সবে,
বাস মোদের অনন্তের তীরে,
এক দিন থাকিয়া এ দেশে,
পর দিন যাই ঘরে ফিরে।

(২)

পান্থশালে সকলের সনে
দেখা শুনা নাহি কভু হয়,
কিন্তু সমধর্ম্ম দুটী আত্মা
দূরে থেকে করে পরিচয়।

(৩)

বীণা যন্ত্রের তন্ত্রীর মত,
বাজে যখন একটী প্রাণ,
উল্লঙ্ঘিয়া সংসার প্রাচীর,
দ্বিতীয়টী ধরি লয় তান।

(৪)

পথ ভুলে যায় যদি চলি
অদৃষ্টের ঘোর আবর্ত্তনে,
পরাণটী জাগিয়া সদা
নীরবেতে খেলে তার সনে।

(৫)

সত্য, ধরার বিজ্ঞানে তারা
ভ্রমে দুই প্রতিকূল তীরে;
স্থান আর কাল মাঝে আসি
বিচ্ছেদ জন্মায় পরস্পরে।

(৬)

যবনিকার অপর পারে,
নাহি স্থান, কাল ব্যবধান,
সেথা বিয়োগেতে হয় যোগ
হরণেতে রয়েছে পূরণ।

(৭)

ক্রূর বিচ্ছেদ শকুনী কভু,
রক্ত মাংস করেনা ভক্ষণ,
বহু মিশে একের কবলে,
চির দিন অনন্ত মিলন।

শ্রীরজনী নাথ নন্দী।

কি সাধে রব!

দিনের পর রা'ত হ'তেছে,
রা'তের পর দিন,
আমার জীবন একই ভাবে,
বিষাদে মলিন।
হাসির পর কান্না আসে,
সুখের পরে দুখ।
চির দিন কেঁদে কেঁদে,
আমার ম্লান মুখ।

মা গিয়াছে, বাপ গিয়েছে,
ফেলে মোরে একা,
বন্ধু-বান্ধব সব গিয়েছে,
আর না হবে দেখা।
বাগানেতে ফুল ফুটেছে,
সৌরভ গেছে ছুটে।
এমন সৌরভ নাই আমাতে
মানুষ-অলি জুটে।
কি সাধেতে রব তবে
এ ভবেতে আর,
জুড়াই গিয়া জীবন জ্বালা
যথা মা আমার।

শ্রীভুবন মোহন দাস।

আর কেন ?

আর কেন বিফল রোদন ?
কাঁদায়েছ, কাঁদিয়াছ ঢের ;
এস সখি করি উদ্‌যাপন,
এই খানে ব্রত আমাদের !
এই মুছিলাম অশ্রুজল,
ম্লান মুখে ফুটাইনু হাসি,
বিস্মৃতির পাষাণ চাপনে—
ঢাকিলাম বিষাদের রাশি !
মুদিলাম নয়ন পল্লব,
ফিরাইয়া লইলাম মুখ,
হৃদয়ের গুহাতল হ'তে
উপাড়িয়া ফেলিলাম দুখ !
ভাঙ্গিলাম জীবন-শয্যার
স্বপ্নময় মোহময় ঘুম ;
যে অনলে দগ্ধ কলেবর
আজি তাহা হইল নির্ধূম !
যাও, সখি, সেই পথে যাও,
যে পথে হবেনা আর দেখা,
যে পথে কেবলি অন্ধকার
একটীও নাই আলোরেখা !
দৈবে, যদি দেখা হয় কভু,
মুখ ঢেকে যেও পলাইয়া,
এক বিন্দু নীরব নিশ্বাস
বাতাসেরে যেও বিলাইয়া।
সে নিশ্বাস ভেসে ভেসে এসে
যেমন লাগিবে মোর গায়
যেন সেই নীরব নিশ্বাসে
এ প্রাণ তখনি মিশে যায় !

শ্রীযদুনাথ ঘটক।

সমাধি।

আজি হোতে আমি যে গো ভুলে যাব ভালবাসা;
আজি হোতে আমি যেগো ভুলে যাব কাঁদা হাসা।
তারকার বিষ হাসি হেরিব না মুখ তুলে ;
আকাশের ইন্দু ছিঁড়ি ডুবাব সিন্ধুর জলে।
বিদ্যুৎ কাড়িয়া লব নীরদের কোল হ'তে ;
বিষাদে কাঁদিবে সুধু নীরবে আকাশ পথে।
গোধূলির রবিকরে উড়াব মেঘের ধূলা ;
বিহগের কণ্ঠ কাটি জুড়াব প্রাণের জ্বালা।
মুখে মৃদু হাসি মাখা প্রাণে জাগে কপটতা,
এরূপ বনের যত রাক্ষসী কুসুম লতা ;
তাদিগে দলিয়া যাব আপনার দুই পায়,
আর কিছু রহিবে না, র'বে সুধু হায় হায়।
গম্ভীর অম্বরতল ভেদি সেই হাহাকার,
আকাশের গ্রহতারা করিবে গো চুরমার।
সে মহা ধ্বংসের পরে দাঁড়ায়ে ধরিব তান ;
চরাচর কাঁপাইয়া গাহিব প্রলয় গান।
গাহিব গো উচ্চৈঃস্বরে—"হৃদয় নাহিক হেথা,
আঁখি জল হা হুতাশ কেবলি কথার কথা;
হেথায় নাহিক কভু প্রেম আর সুখ আশা,
হেথায় নাহিক তাহা যাবে কহ ভালবাসা।"
—এই গানে করিব গো অযুত রজনী ভোর ;
শেষে এই ধ্বংস মাঝে লভিব সমাধি মোর।

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র সেন।

প্রাণোৎসর্গ।

কি ছার এ প্রাণ
জলের বুদ্‌বুদ প্রায়, বায়ুতে মিশিয়া যায়
ক্ষণেক লহরী কোলে, মলয় অনিলে দোলে
আবার মুহূর্ত্ত পরে হয় অন্তর্দ্ধান!
অসার ভৌতিক দেহ, প্রানের বাসের গেহ
ক্ষিতি অপতেজসনে, মিশি যায় ক্ষণে ক্ষণে
এ অসার জড়পিণ্ড বহি ক্ষণ কাল।

অসার ইন্দ্রিয় গ্রাম, ক্রোধ লোভ মোহ কাম
করে তারে বিচলিত, চিরতরে কলুষিত
বহিয়া পাপের বোঝা বিষম জঞ্জাল।
অসার সংসার মায়া, পুত্র মিত্র বন্ধু জায়া
আজি যার সনে দেখা, কালি কোথা নাহি লেখা
তাহাদের তরে কেন করি বিসর্জ্জন।

অসার পার্থিব ধন, স্বর্ণ রৌপ্য প্রলোভন
বালক খেলনা প্রায়, নয়ন ঝল্‌সে যায়
যারতরে দেহ মন পাপে নিমগন।
অসারের মাঝে থাকি, অসার সঞ্চিয়া রাখি
অনিত্য সম্পদ লয়ে, নিরন্তর ব্যস্ত হয়ে
অশ্রু জলে ভাসি চির লইব বিদায়।

এই কি নিয়তি হায়, এরতরে এত দায়
সংসার সর্ব্বস্ব করি, ক্ষণে তাহা পরিহরি
নিরালম্ব নিঃসহায় নিরাশ্রয় প্রায়।
এ সকল পরিহরি, কি ধন আশ্রয় করি
প্রবল ইন্দ্রিয় দ্রোহ, কাম ক্রোধ লোভ মোহ
রোধ করি স্বর্গধামে করিব গমন।

না রবে মৃত্যুর ভয়, শোক দুঃখ করি জয়
উচ্চসংকল্পের রথে, চলিব স্বর্গের পথে
এছার পরাণ পাবে নবীন জীবন।
অনিত্য শরীর সহ, দেখ কত অহরহ
মুক্ত আত্মা অগণন্, যুঝিতেছে অনুক্ষণ
অনুক্ষণ মরণেরে করি পরাজয়।

ইন্দ্রিয়েরে জয় করি, আকাঙ্ক্ষা ঘোটকে চড়ি
চির উন্নতির রথে, চলিছে মহত্ব পথে
বিপক্ষে সপক্ষ করি মানব নিচয়।
ভূতবলে ভূতে বান্ধি, নরের নয়ন ধান্ধি
মহান ব্যাপার কত, সাধিতেছে অবিরত
এক এক মহাজন পুরুষ প্রধান।
এ কি উপাদানে গড়া, এ কি এই বসুন্ধরা
তবে কেন হেনমতে, চলিব নৈরাশ্য পথে
কি কারণে বলি তবে অসার পরাণ।

এ প্রাণ অসার নয়, মানবাত্মা মহাশয়
অনন্ত শকতিপানে, যাইবে পুণ্যের যানে
বিরোধী শকতি গণে করি পরাজয়।
নিজে চিনি একবার, যদি করে হুহুঙ্কার,
পাহাড় পর্ব্বত চয় পদাঘাতে চূর্ণ হয়,
সমুদ্র অতল স্পর্শ গণ্ডুষে বিলয়।

কেন ভীরু হীনবল, বিলাপে কি হবে ফল,
উঠ হুহুঙ্কার করি, অলসতা পরিহরি,
অবশ্য মহত্ত্ব প্রাণে হইবে উদয়।
ধ্রব বল কর পণ, যুঝিতে সম্মুখ রণ
পাপ প্রলোভন সনে, দমি বাধা বিঘ্নগণে
অবশ্য পাইবে রাজ্য অনন্ত অক্ষয়।

নাহি কি জীবনে বল, হীনতেজ পেশীদল?
ইন্দ্রিয় শৃঙ্খলে পড়ি, করিতেছ জড়াজড়ি?
অনন্ত শকতি নামে কররে হুঙ্কার।
এ ধরণী কর্ম্মক্ষেত্রে, দৈবতেজ ধরি নেত্রে,
করবীর্য্যে আস্ফালন, কররে জীবন পণ
অনন্ত শকতি পাবে বিক্রম অপার।

উৎসর্গ করহ প্রাণ, হও তেজ বলবান
ছাড়ি মোহ ছাড়ি ভয়, গাইয়া সত্যের জয়
সত্যের প্রতিষ্ঠা তরে কর প্রাণপণ
নহেরে অসার প্রাণ, নহে হীনজন দান
নয় আত্মা হীনবল, অসার এ ভূমণ্ডল
আমরাও হ'তে পারি পুরুষ প্রধান।

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত।

বিদায়।

তোমরা ভুলিয়া যদি যাও
তবু স্মৃতি কাতর পরাণে,
সজল নয়ন দু'টি তুলে,
র'বে চেয়ে তোমাদেরি পানে!
তোমাদের হৃদয়ের ছায়
স্নেহ ফুল, লতায় পাতায়,
বেঁধেছিনু খেলাবার ঘর,
কেমনে ছাড়িব তারে আজ
তাই প্রাণ বড়ই কাতর!
দিন যাবে, মাস যাবে কত!
সে কুটীরে আর কত শত
দীন আসি লইবে আশ্রয়;
দিন যাবে, মাস যাবে যত
অভাগার প্রতিচিহ্ন তত
ক্রমে বুঝি পাইবে বিলয়!
সে কুটীরে এখনো যেমন
হাসে মৃদু জ্যোছনা চাঁদের,
আশে পাশে ফুটে শত ফুল
বিলাইয়া সুরভি তাদের—
তখনো ফুটিবে ফুল
তখনও রহিবে জ্যোছনা;
তোমাদের র'বে সেই সব
আমিই সেথায় রহিব না!
আমার সে মধুর আলয়
আর যে আমার রহিবে না!
ভেবে তাই কেন গো কি জানি
নয়নে আসিতে চায় জল,
প্রাণ যেন সহসা কেমন
হয়ে আসে কাতর দুর্ব্বল!

ছেড়ে যে'তে চাহেনা পরাণ
তবু আজ চলিনু ছাড়িয়া
প্রতি পদে ফিরে ফিরে চাই—
যে'তে যে'তে ভুলিয়া দাঁড়াই,
অশ্রু দুটি আসে গড়াইয়া!

দূরে কোন বিদেশে বিজনে
প্রবাসী দাঁড়ায়ে ম্লান মুখে,
একটি নয়ন জল ফেলে,
একটি সুদীর্ঘ শ্বাস তুলে
ফিরে চায় আলয়ের দিকে।

প্রবাসী এ হৃদয় আমার
তেমনি, যেখানে গিয়ে থাক্,
যাহা আছে কপালে তাহার
মহা সুখ—মহা দুঃখ পাক্
নিস্তবধ সন্ধ্যার আঁধারে
অবসন্ন উদাস অন্তরে,
পরবাসে সজল নয়নে,
প্রতি দিন—প্রতি দিন সে যে
চাহিবে ও কুটীরের পানে!

তোমরা ভুলিয়া যদি যাও
তাহার রহিবে সদা মনে!

শ্রীকিশোরী লাল গুপ্ত।

চিতায় চিতায়! *

বড় ব্যথা পেয়েছিল ও—
হৃদয়ে জ্বলিত শত চিতা,
চিতায় চিতায় আজি মিশে,
নির্ব্বাণ হইল ওর ব্যথা।
পরাণের অনন্ত শ্মশান,
শ্মশানের ছাই হয়ে গেছে।
হৃদয়ের অনন্ত যাতনা,
যাতনা সমুদ্রে নিবে গেছে।
সহস্র স্নেহের পরশনে,
নিবেনি যে প্রাণের বেদন;

* একটী বিধবার মৃত্যু উপলক্ষে।

আজি তাহা চিতার আগুনে,
একেবারে হয়েছে নির্ব্বাণ।
এতদিন অবিশ্রান্ত জ্বালা,
অহোরাত্র দিতেছিল ব্যথা ;
এখন সে অবসর লয়ে,
শান্তিকে পাঠায়ে দেছে তথা।

কাঁদ কেন আর তার তরে,
ডাক কেন মর্ম্মভেদী ডাক্—
সে যেখানে গিয়াছে চলিয়ে,
বড় সুখে আছে থাক্ থাক্।

শ্রীমতী সরলা বালা দাসী।

প্রাচীন বংশ বিবরণ। (৪)

(২৫৭ পৃষ্ঠার পর।)

নিধ্রুবি।

নিধ্রুবি সঙ্কলিত বেদাংশ, ৯ মণ্ডলের অন্তর্গত ৬৩ ত্রিষষ্টিতম সূক্তে ৩০ ত্রিশটি ঋকে নিবদ্ধ আছে। উহাতে গায়ত্রী ছন্দে সোমের স্তব প্রকটিত হইয়াছে। ইহার কুলোৎপন্ন নৈধ্রুবি হইতে অপ্সার ও কশ্যপের সংযোগে কশ্যপ গোত্র প্রচলিত হইয়াছে। ইঁহার বংশোদ্ভূত নৈধ্রুবের এক কন্যা জন্মে। তাঁহার নাম অজ্ঞাত। এই কন্যাই কশ্যপের প্রেয়সী।

অসিত ও দেবল।

অসিত দেবলের সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ কিছু পরেই বলা যাইবে। এস্থলে কেবল প্রসঙ্গাধীন কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার দুই জনে গায়ত্রী ও অনুষ্টুপ ছন্দে ১৫০ একশত পঞ্চাশটি ঋকে সোম ও আপ্রী দেবতার স্তুতি করিয়াছেন। এই দেবল ভিন্ন আর চারিটি দেবলের বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে। প্রাচীন বংশ বিবরণের দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেবলগণের বিষয় দেখ।

(১) দক্ষের প্রপৌত্রের নাম দেবল। তিনিই সম্ভবতঃ স্মৃতিকর্ত্তা। দক্ষ আবার দুই জন—ব্রহ্মার তনয় দক্ষ, দক্ষ প্রজাপতির মধ্যে এক জন। তিনি প্রসূর্ত্তির ভর্ত্তা। দ্বিতীয় দক্ষ, প্রাচীন বর্হিষের পৌত্র ও প্রচেতার পুত্র।

(২) স্বনামখ্যাত ব্যাকরণকার পাণিনি মুনির পিতামহ এক দেবল।

(৩) বৃহস্পতির জনকও দেবল আখ্যায় পরিচিত। অঙ্গিরার সন্তান যে বৃহস্পতি, তিনি দর্শনবেত্তা। দেবল-পিতা বৃহস্পতি, তাহা হইতে পৃথক্।

(৪) বিশ্বামিত্র পুত্র এক দেবল।

কোন্ কোন্ ঋষি, কি ছন্দে কোন্ কোন্ দেবতার স্তুতি উচ্চারণ করিয়াছেন, সেই স্তবোক্ত বচন-পরম্পরা, বেদব্যাস-সংগৃহীত ঋগ্বেদ-সংহিতার কোন্ মণ্ডলের ও কোন্ সূক্তের অন্তর্গত, এবং কয়টি ঋকই বা তাঁহাদের বিচরিত, পাঠক-সাধারণের জানা উচিত, বিবেচনা করিয়া, পশ্চাৎ তাহারও একটি তালিকা দেওয়া গেল।

ঋকমন্ত্র-প্রণেতার নাম	কোন্ মণ্ডল	কোন্ সূক্ত	ঋকের সংখ্যা	দেবতার নাম	ছন্দের নাম
১। অসিত ২। দেবল	৯ নবম	৫ হইতে ২৪ সূক্ত পঞ্চম হইতে চতুর্বিংশতিতম সূক্ত	১৫০ দেড়শত	আপ্রি, পবমান সোম	গায়ত্রী, অনুষ্টুপ
৩। নিধ্রুবি	ঐ	৬৩ ত্রিষষ্টিতম	৩০ ত্রিশটি	পবমান সোম	গায়ত্রী
৪। রেভ, ৫। সুনূ	ঐ	৯৯ ও ১০০ নবতিতম ও শততম	১৭ সতরটি	ঐ	বৃহতী, অনুষ্টুপ
৬। অপ, ৭। সরঃ	ঐ	১০৪ চতুরধিক শততম	৬ ছয়টি	ঐ	উষ্ণিক
৮। অবৎসার	ঐ	৫৩—৬০ ত্রিপঞ্চাশত্তম সূক্ত হইতে ষষ্টিতম সূক্ত	৩২ বত্রিশটি	ঐ	গায়ত্রী, পুরউষ্ণিক
৯। ভূতাংশ	১০ দশম	১০৬ ষড়ধিক শততম	১১ এগারটি	অশ্বিদ্বয়	ত্রিষ্টুপ
১০। বিবৃহা	ঐ	১৬৩ ত্রিষষ্ঠ্যধিক শততম	৬ ছয়টি	যক্ষ্মা ব্যাধি	অনুষ্টুপ

রেভ ও সুনূ।

অসিত ও দেবলের ন্যায়, রেভ ও সুনূর সম্মিলিত চেষ্টায় কতকগুলি ঋক প্রণীত হয়। সে গুলি, ৯ নবম মণ্ডলের ৯৯ ও ১০০ নিরনব্বুই ও একশত সূক্তের অন্তর্গত। সমুদায়ে ১৭ সতরটি ঋক অর্থাৎ শ্লোক তাঁহাদের যুগলের বিরচিত। সোম দেবতার উদ্দেশে বৃহতী ও অনুষ্টুপ ছন্দে মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল।

অপ্ ও সরঃ।

অসিত ও দেবল এবং রেভ ও সুনূর ন্যায় ইঁহাদেরও উভয়ের উদ্যোগে ৯ নবম মণ্ডলের ১০৪ চতুরধিক শততম সূক্তের ৬ ছয়টি ঋক সোমের উদ্দেশে উষ্ণিক ছন্দে রচিত হয়। কোন কোন লোকের মতে উক্ত মন্ত্র ৬ ছয়টি নারদ ও পর্ব্বত নামক ২ দুই জন ঋষির বাক্য।

অপ্সার।

অপ্ ও সরঃ ঋষি-দ্বিয়ের বংশেই বোধ হয়, অপ্সারের জন্ম হইয়াছিল। তিনি কাশ্যপ-গোত্রীয়। কতকগুলি লোকের অনুমান, অপসার ঋষি, অপ্ ও সরঃ এই উভয় মহর্ষির কুলে সমুৎপন্ন। আনুমানিক সক্তি অলীক বা অমূলক নয়।

অবৎসার।

অবৎসার কর্ত্তৃক ৯ নবম মণ্ডলের

৫৩ হইতে ৬০ ত্রিশপঞ্চাশত্তম সূক্ত হইতে ষষ্টিতম সূক্ত সঙ্কলিত হয়। সোম দেবতার স্তুতির কারণ গায়ত্রী ও পুরউষ্ণিক ছন্দে ৩২ বত্রিশটি মন্ত্র ঐ সূক্তে গ্রথিত আছে।

ভূতাংশ।

১০, দশম মণ্ডলের ১০৬ সষ্ঠাধিক শততম সূক্তের ১১ এগারটি ঋকে ত্রিষ্টুপ ছন্দে ভূতংাশ ঋষি, অশ্বিদ্বয়ের স্তব করেন।

বিবৃহা।

বিবৃহার প্রণীত মন্ত্র, ১০ দশম মণ্ডলের ১৬৩ ত্রিষষ্ট্যধিক শততম সূক্তে ৬ ছয়টি ঋকে অনুষ্টুপ ছন্দে নিবদ্ধ আছে। যক্ষ্মারোগ নিবারণার্থ ঋষি কর্ত্তৃক উক্ত বচনগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল। বিবৃহা ঋষি, কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ব্যাধির উপশমের নিমিত্ত, যে ঋক গুলি প্রস্তুত করেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"তোমার দুই নেত্র, দুই নাসিকা-ছিদ্র, শ্রুতি-যুগল, শির, মস্তিষ্ক, চিবুক, রসনা, এই সমুদয় অঙ্গ হইতে যক্ষ্মাকে (স্বনাম-খ্যাত পীড়াকে) বিদূরিত করিতেছি। ১।

"তোমার গ্রীবাস্থ শিরা, স্নায়ু, অস্থি-সন্ধি, ভুজ-যুগল, স্কন্ধ-দ্বয়—এই সমস্ত অবয়ব হইতে, আমি রোগকে দূরীভূত করিতেছি।২।

"তোমার ক্ষুদ্র নাড়ী, অন্ন-নাড়ী, হৃদয়-স্থল, বৃহদণ্ড, যকৃৎ, মুত্রাশয়াদি হইতে পীড়াকে তাড়াইয়া দিতেছি। ৩।

"তোমার জানু-দ্বয়, উভয় উরু, পাষ্ণি-যুগল (গোড়ালি) যুগ্ম-পদ-প্রান্ত, দুই নিতম্ব, কটি-প্রদেশ ও মল-দ্বার হইতে ব্যাধিকে দূরীকৃত করিতেছি। ৪।

"মূত্র-ত্যাগ-কারী পুরুষাঙ্গ, নখ, রোমাদি অর্থাৎ সর্ব্বাবয়ব হইতেই রোগ দূরীভূত করিতেছি। ৫।

"তোমার সর্ব্বাঙ্গে—সন্ধি-স্থল, লোম ইত্যাদি যেথানে—কোন রোগ জন্মিয়াছে, আমি তাহা বিদুরিত করিতেছি।"৬।—।ঋসং ১০ম। ১৬৩ সূক্ত।]

কাশ্যপ (শণ্ডিল) এবং শাণ্ডিল্য।

কাশ্যপ, মরীচির বংশ-সম্ভূত। অঙ্গিরা ঋষির কুল, ইহার মাতামহবংশ। কাশ্যপের জনক কশ্যপ ঋষি, কিরূপ অপরিমেয়-সামর্থ্যশালী ছিলেন, ইতিপূর্ব্বেই তাহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। নৈধ্রুব, কাশ্যপের মাতামহ। কাশ্যপের দ্বিতীয় বা প্রকৃত আখ্যা শণ্ডিল। শণ্ডিল এক জন প্রধান ঋষি ছিলেন।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৭৫। ভক্ত এত নত-মস্তক হইয়া গুরু-জনদিগকে নমস্কার করেন যে, নমস্য ব্যক্তি তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পান।

২৭৬। সত্যেতে যাহার প্রাণ সদা থাকে মগ্ন, তাহার চিত্ত হয় না কোন ভয়ে ভগ্ন।

২৭৭। কি হইবে পিতা গো! আমার

এই অধম জীবনে ; যদি না পারি থাকিতে সদা তব পবিত্র চরণে।

২৭৮। ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমে সদা মগ্ন যাহার প্রাণ ; সেই করে ভোগ তাঁহার মুক্ত জীবনদান।

২৭৯। ভক্ত জানেন যে তিনি যাহা বলেন, তাহা তিনি সেই সর্ব্বসাক্ষীর সম্মুখেই বলেন। তিনি তন্নিমিত্ত আপন কথানুসারে কার্য্য না করিলে পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হন। তিনি এই বিশ্বাসেরই জন্য আপনার অঙ্গীকার অনুসারে কার্য্য করিবার অভ্যাস করিতে বিশেষ যত্নশীল হন। অভ্যাসের ফল এতই মধুময় যে, যাহা বড় কঠিন বোধ হয়, তাহা তদ্গুণে সহজ হইয়া পড়ে। দয়াময় তাঁহার সন্তানগণকে কি আশ্চর্য্য ক্ষমতাই দিয়াছেন।

২৮০। রোগ ও পাপ হয় প্রাণেশ্বরের অবমাননার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও ফল।

২৮১। সুদীর্ঘ প্রশস্ত ও গভীর জলপূর্ণ নদী প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে যেমন তাহার অভ্যন্তরে সবেগে ও প্রায় নীরবে তদীয় প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে, সেইরূপ ভক্ত জীবনের প্রেমনদী স্থিরভাব ধারণ করিলেও তদভ্যন্তরে প্রেমের স্রোত নীরবে অথচ সবেগে বহিতে থাকে।

২৮২। শান্তি বিনা কেহ পারে না ভোগ করিতে প্রাণ নাথের বিমল, অনুপম, মঙ্গল পূর্ণ অভয় দর্শন, ও তাঁহার পরমানন্দ, পরমামৃত, পরম মঙ্গল, পরম পবিত্রতা ও পরম শোভা। অশান্ত যাহার মন প্রাণ, সে দুর্ভাগা এ সকল নিত্য সুখে বঞ্চিত হইয়া সদা হাহাকার রবে রোদন করে।

২৮৩। ঋষি জীবন স্থান, কাল ও সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে। সকল দেশেও জাতিতে অল্পাধিক উহা দৃষ্ট হয়। যিনি স্বার্থ ত্যাগ করিয়া মঙ্গলময়ের সত্য, নিত্য, মঙ্গল পূর্ণ অভয় চরণে বাস করিয়া আপনার শরীর মনের সুস্থতা, নির্ম্মলতা ও তাঁহার জ্ঞান জ্যোতি, আনন্দ, অমৃত, শান্তি মঙ্গল, পবিত্রতা ও শোভা ভোগ করেন, আর পরের নিত্যোন্নতি ও মঙ্গল সাধনে যত্নশীল থাকেন, তিনিই ঋষি।

২৮৪। এই অনিত্য সংসারের নানা অনিত্য কার্য্য সাধন জন্য মানব ও মানবী বিভিন্ন বাহ্যিক অনিত্য আকার ধারণ করে; কিন্তু তাহাদিগের নিত্য জীবনের গঠন একই প্রকার। অর্থাৎ তাহাতে স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ নাই। সেই ভেদবিহীন জীবনের দিকে যে তাহার নয়ন মন সদা স্থির রাখিবার অভ্যাস করে, সেই পাবে সত্যের জ্যোতি বারম্বার করিতে দর্শন। তাহারই ভেদাভেদ-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়; ফলতঃ শারীরিক জীবনাপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে যাহার মন প্রাণ যতই অধিকতর পরিচালিত হয়, সে ততই সত্যের আলোকে ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে উত্থান করিতে পারিয়া, ইহ ও পর জীবনের জীবনদ্বয়ের পবিত্রতা ও মঙ্গল সাধনে সমর্থ হয়। এ সংসারে সকলই নিত্য, প্রাণের নিত্য চক্ষু দিয়া দেখিবার অভ্যাস করা বড়ই প্রয়োজন।

২৮৫। যাহাতে অনাদি, অনন্ত, সত্যস্বরূপের জ্যোতি প্রতিভাত নাই, যাহা অসত্য বলিয়া অভিহিত, তাহাই পাপ।

২৮৬। মানুষ এতই স্বার্থপরতাধীন যে, সে তাহার জীবনের উচ্চতম কর্ম্ম ধর্ম্মসাধন অথবা তৎ প্রচার কালেও তদীয় অধীন হইয়া চলে। সে তোমার নিকট

কর্ত্তব্য পালন জন্য উপস্থিত হয় না; কিন্তু এই দুই কার্য্যের মধ্যে একটীতেও কিছু মাত্র সহায়তা পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে অনায়াসে আগমন করিবে। যিনি ঈদৃশ স্বার্থ ত্যাগ করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত রূপে ধর্ম্ম পথে পদচারণা করিতে পারগ হন; তাঁহারই জীবনে যথার্থ ঔদার্য্য, প্রেম ও পবিত্রতা দৃষ্ট হয়। যিনি যত কর্ত্তব্য জ্ঞানাধীন, তিনি তত স্বার্থ বিহীন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের বল যতই বৃদ্ধি হয়, ততই তাঁহার ভক্তি প্রেমাদি উচ্চতর বৃত্তি সকল বিশুদ্ধতা লাভ করে।

২৮৭। পুত্রেরা যখন তাহাদিগের মৃত পিতা মাতার সদ্গতির জন্য ও তাঁহাদিগের প্রতি আপনাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি উত্তেজিত রাখিবার উদ্দেশে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তখন তাহারা তাঁহাদিগের জীবিতাবস্থার সদাচরণে রত থাকিয়া নানা পুণ্যানুষ্ঠান করিলে তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবার ফল লাভ হয়। সুতরাং সেই শ্রাদ্ধই অধিকতর শ্রেয়স্কর। অতএব পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে পুত্রগণের ঐরূপে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করাই অধিকতর কর্ত্তব্য।

২৮৮। যাঁহারা ভৃত্যদিগকে শিষ্য সম না দেখেন, তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদিগের ব্যবহার বিশুদ্ধ হওয়া বড়ই কঠিন।

২৮৯। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থান, কাল, গ্রন্থ, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে। যাহা যখন যেখানে যাহাতে সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইবে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

২৯০। উন্নতিশীল মানব প্রাণের অনন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করিতে অনাদি, অনন্ত ও পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ বিনা, সৃষ্ট ক্রমোন্নতি ও আপেক্ষিক নিত্যতা প্রাপ্ত কোন দেব বাচ্য জীবের সাধ্য নাই। মানবের অভ্রান্ত ও অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, ও পবিত্রতা দাতা, সেই একমেবাদ্বিতীয়ং বিনা কেহই হইতে পারেন না।

২৯১। ব্রহ্মাণ্ডপতি যখন মানবের আধ্যাত্মিক জীবন নিত্য করিয়াছেন, তখন তিনি তাহা পবিত্র করিতে বাধ্য। কারণ পবিত্রতা বিনা নিত্যতা হইতে পারে না। তিনি কখন কোন্ ব্যক্তিকে স্থায়ী পবিত্রতা দান করিবেন, তাহা তিনিই জানেন।

২৯২। সদাচরণ করিয়া তাহার গৌরব না করাই যথার্থ গৌরব।

২৯৩। আপনার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা, অভ্রান্ত জ্ঞান, অপার প্রেম, ও অপাপবিদ্ধ পবিত্রতার অধীন করাই এক মাত্র ধর্ম্মানুমোদিত যথার্থ স্বার্থ সাধন।

২৯৪। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার সংগ্রহ। ব্রাহ্ম মাত্রেই এই ধর্ম্মসারগ্রাহী ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। ব্রাহ্মগণ যেন এই মহৎ ব্রত পালনে যাবজ্জীবন প্রাণগত যত্ন করিতে সমর্থ হন।

২৯৫। যতই হয় উন্নত মানবের অনন্ত উন্নতিশীল নিত্য জীবন, ততই সে পায় শোভনতমের সুন্দরতর সুন্দরতম দরশন।

২৯৬। আত্মন, যতই তুমি করিবে তোমার নিত্য উন্নতির পর উন্নতি লাভ, ততই তব হইবে ভোগ পবিত্রতমের গাঢ়তর গাঢ়তর সহবাস।

২৯৭। হে মঙ্গলময়, আমার, এই প্রার্থনা, জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম ও পবিত্রতা, আর চিন্তা, বাক্য, কার্য্য ও ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে ও নির্ব্বিশেষে তব পবিত্রতম চরণাধীন কর।

২৯৮। ব্রহ্ম দর্শন বিনা মানব জ্ঞানের তৃপ্তি নাই। যতক্ষণ জ্ঞানময়ের জ্যোতি মানব জ্ঞানে প্রতিভাত না হয় ও সেই প্রকাশিত জ্যোতিতে সে তাঁহার জ্ঞানময় দর্শন না পায়, ততক্ষণ তাহার জ্ঞানের তৃপ্তি সাধন হয় না। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মানব জ্ঞানের তৃপ্তি।

২৯৯। বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে কর্ত্তব্যের অনুরোধে অর্থাৎ রজনী যোগে সুস্থ শরীরে ও মনে প্রতিমাসে উপযুক্ত কালে এক বারের অনধিক সংসর্গ করিলে, জীবন দেবভাবাপন্ন হয়। আর পাশব বৃত্তির উত্তেজনায় অবৈধ রূপে ঐ কার্য্য করিলে, জীবন পশুবৎ হয়।

৩০০। যে শক্তির বলে অটল ভাবে ও প্রাণপণে ধারণ করে মনপ্রাণে সত্যস্বরূপের নিত্য সত্যদান, তাহার নাম বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বল যতই বৃদ্ধি হয়, ততই তাহার জীবন উন্নত হয়। বিশ্বাস রূপ জীবন্ত ও জ্বলন্ত শক্তি ধারণ করিলে আত্মা অপরাজিত হয়।

৩০১। ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া অন্যূন তিন বৎসর কাল ধর্ম্ম সাধন করিবার পর ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মধুময় ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা। নতুবা বিষ উদ্গীরণ হইতে পারে।

৩০২। ব্রহ্মোপাসক জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দয়া করিবেন। ইহার অন্যথাচরণে তিনি পরব্রহ্মের ও আপনার অবমাননা করিয়া পাপগ্রস্ত হইবেন। তিনি যতই অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারতা সহকারে দয়ার কার্য্য করিবেন, ততই তিনি তাঁহার যোগ্য আচরণে সমর্থ হইবেন।

৩০৩। যাঁহার অভাব নাই, সেই সুখী, যাঁহার যে পরিমাণে অভাব অল্প, তাহার সেই পরিমাণে সুখ অধিক।

৩০৪। সাধক যতদিন না মঙ্গলময়ের কৃপায় তাঁহার সাধনা করিতে করিতে তাঁহার মঙ্গলপূর্ণ সত্তা-সাগরে মগ্ন হইয়া আপ্তকাম হয়, ততদিন সে তাহার সুনিয়মিত ও সুশাসিত জীবনের সকল প্রকার অভাব মোচন জন্য মঙ্গল দাতার নিকট প্রার্থনা করিতে বাধ্য।

৩০৫। পবিত্রস্বরূপের পবিত্রতর চরণ ছাড়া হইলে তুমি নিশ্চয়ই অপবিত্র হইবে। মুহুর্ত্ত কালের জন্যও তাঁহার বিশুদ্ধ সহবাস ত্যাগ করিও না।

৩০৬। সাধন বিনা লব্ধ জ্ঞান জীবনে পরিণত না হইয়া বিফল হয়।

৩০৬। ভারতবর্ষে ব্রহ্মোপাসনা উপনিষদ কালাবধি যেরূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহা গুপ্ত ধর্ম্ম গ্রন্থ বিশেষে বদ্ধ ও ব্যক্তিগত। যাহাতে ব্রহ্ম সন্তানগণ মিলিত হইয়া প্রকাশ্যরূপে ও মুক্তভাবে অর্থাৎ জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও কোন একবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্র নির্ব্বিশেষে পরব্রহ্মের উন্নতিশীল নিত্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তাহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা যেন ব্রাহ্মগণ বিস্মৃত না হন।

শ্রীকানাইলাল পাইন।

মনু-সংহিতানুসারে অরজস্কা স্ত্রী-সহবাস দণ্ডনীয় কি না?

কন্যা কাহাকে বলে? যে স্ত্রীর বিবাহ হয় নাই, সে কন্যা।

> উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
> অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্‌যথাবিধি॥
>
> মনু ৯। ৮৮

উৎকৃষ্ট, অভিরূপ ও সদৃশ বর পাইলে অপ্রাপ্তা হইলেও যথাবিধি উক্ত বরে কন্যা সম্প্রদান করিবেক।

যে অর্থে বর কন্যা এই শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে, বাঙ্গলা দেশের প্রচলিত ভাষায় সেই অর্থে বর কন্যা শব্দ অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিবাহের সম্বন্ধের কথা উঠিলেই বর কন্যা শব্দ ব্যবহৃত হয়।

"অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং"—বিবাহ যোগ্য বয়স না হইলেও বালিকাকে কন্যা শব্দে অভিহিত করা যায়।

> কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যার্ত্তুমত্যপি।
> ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায়কর্হিচিৎ॥
>
> মনু ৯। ৮৯

কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ পিতৃগৃহে থাকুক; তথাপি তাহাকে কদাপি গুণহীন পাত্রে সমর্পণ করিবে না। সুতরাং ঋতুমতী না হইলে তাহাকেও কন্যা বলা যাইতে পারে।

> ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
> ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং॥
>
> মনু ৯। ৯০

কুমারী ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর কাল অপেক্ষা করিবে, (পিতা তাহাকে সৎ পাত্রে সম্প্রদান করেন কি না)। এই সময় অতিক্রান্ত হইলে স্বয়ং সদৃশ পতি গ্রহণ করিবে।

এই স্থলে যে স্ত্রী ঋতুমতী হয় নাই, তাহাকে কুমারী শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে।

> অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্‌ যদি স্বয়ম্।
> নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥
>
> মনু ৯। ৯১

অদীয়মানা স্ত্রী স্বয়ং ভর্ত্তা বরণ করিলে, তাহাকে কোন দোষ স্পর্শ করে না, অথবা যাহাকে সে বরণ করে, সেও কোন প্রকারে দোষী হয় না।

এই অদীয়মানা আগতার্ত্তবা স্বয়ংবরা স্ত্রী কন্যা কি কুমারী শব্দের বাচ্য, এই শ্লোক হইতে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু বক্ষ্যমান শ্লোকে তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে।

> অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ংবরা।
> মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনাস্যাৎযদিতং হরেৎ॥
>
> মনু ৯। ৯২

স্বয়ংবরা "কন্যা" পিতৃদত্ত কি মাতৃদত্ত কি ভ্রাতৃদত্ত কোন অলঙ্কার গ্রহণ করিবে না। তাহা গ্রহণ করিলে চৌর্য্য দোষে দোষী হইবে।

এখানে স্বয়ংবরা স্ত্রীকে কন্যা বলা হইয়াছে। ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর অতিক্রম না করিলে স্বয়ংবরা হইতে পারে না। সুতরাং ঋতুমতী অনূঢ়া স্ত্রীও কন্যা শব্দের বাচ্য।

> পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যংপুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
> তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্॥
>
> মনু ৯।১৭২।

পিতৃগৃহে গোপনে কন্যার যে পুত্র হয়, তাহাকে উক্ত কন্যা বিবাহকারী ব্যক্তির "কানীন পুত্র" বলা যায়। "কৌমার পুত্র" এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই।

ঋতুমতী না হইলে গর্ভসঞ্চার হইয়া পুত্র জন্মিতে পারে না। সুতরাং ঋতুমতী দূষিতা অনূঢ়া স্ত্রীও 'কন্যা' শব্দে, এবং তদবস্থোৎপন্ন সন্তান 'কানীন' শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, অবিবাহিতা স্ত্রী অনাগতার্ত্তবা হউক বা আগতার্ত্তবা হউক, তাহাকে 'কন্যা' বলা যায়।

কন্যা ঋতুমতী হইয়া বরং আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবে, তথাপি তাহাকে গুণহীন বরে সমর্পণ করিবে না, মনুর এই বিধি। ঋতুমতী হইয়া অনূঢ়া থাকিলে কন্যার পাপ পথে পতিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া মনু লিখিয়াছেন।

যোঽকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যোবধমর্হতি।
সকামাং দূষয়ংস্তুল্যো ন বধং প্রাপ্নুয়াৎ নরঃ॥

মনু ৮। ৩৬৪

যে ব্যক্তি আকামা কন্যাকে দূষিত করিবে, তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। যে ব্যক্তি সকামা কন্যাকে দূষিতা করিবে, তাহার প্রাণ বধ হইবে না, অন্য কোন দণ্ড হইবে। সকামা কন্যার সম্বন্ধে মনু লিখিতেছেন।

উত্তমাং সেবমানস্তু জঘন্যোবধমর্হতি।
শুল্কং দদ্যাৎ সেবমানঃ সমামিচ্ছেৎ পিতা যদি॥

মনু ৮।৩৬৬

অধম ব্যক্তি যদি সকামা উত্তম বর্ণা কন্যা দূষিতা করে, তবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। যদি সবর্ণা সকামা কন্যাকে দূষিত করে, তবে কন্যার পিতা ইচ্ছা করিলে সম্ভোগকারীর নিকট হইতে কন্যার শুল্ক আদায় করিতে পারেন।

সহস্রং ব্রাহ্মণো দণ্ডং দাপ্যোগুপ্তে তু তে ব্রজন্।
শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয় বিশোঃ সাহস্রোবৈ ভবোদ্দমঃ॥

মনু ৮।৩৮৩

ব্রাহ্মণ, গোপনে ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা সকামা কন্যা গমন করিলে, অথবা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সকামা শূদ্রা কন্যা গমন করিলে তাহার সহস্র গুণ দণ্ড হইবে।

তবে মনু এই ব্যবস্থা করিলেন যে, অকামা কন্যা সম্ভোগে সেবমান ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড হইবে। কিন্তু সকামা কন্যা সম্ভোগে যদি কন্যা সবর্ণা হয়, তবে কন্যার পিতা ইচ্ছা করিলে সেবমান ব্যক্তির নিকট হইতে কন্যার শুল্ক আদায় করিতে পারিবেন।

যদি কন্যা উত্তম বর্ণা হয়, তবে সেবমান ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড হইবে। কিন্তু সকামা কন্যা অধমবর্ণা হইলে, সেবমান পুরুষের অর্থ দণ্ড হইবে।

এখন সকামা কন্যার দণ্ডের কথা হইতেছে।

কন্যাং ভজন্তীমুৎকৃষ্টং ন কিঞ্চিদপিদাপয়েৎ।
জঘন্যং সেবমানন্তু সংযতাং বাসয়েৎ গৃহে॥

মনু ৮।৩৬৫

যে সকমা কন্যা উৎকৃষ্টবর্ণ পুরুষের সহিত ভোগ করিবে, তাহার কোন দণ্ড হইবে না। আর যে কন্যা নিকৃষ্টবর্ণ পুরুষ গমন করিবে, তাহাকে গৃহে বদ্ধ করিয়া শাসন করিতে হইবে।

কন্যা অর্থাৎ অনূঢ়া স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যত প্রকার দোষ হইতে পারে, অষ্টম অধ্যায়ে তাহার বিধি ব্যবস্থা করিয়া মনু একাদশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন:

রেতঃ সেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ॥

মনু ১১।৫৯

ভগিন্যাদি স্বযোনি, কুমারী, অন্ত্যজা স্ত্রী, সখাপত্নী ও পুত্রবধূতে রেতঃপাত করিলে গুরুপত্নী গমন সমান পাপ হয়। গুরুপত্নী গমনে পাপের অতি গুরু শাস্তি প্রাণ দণ্ড।

অনেকে বলেন, এস্থলে কুমারী অর্থ অনাগর্ত্তবা স্ত্রীলোক। বিবাহ হউক আর না হউক, যে পর্যান্ত রজোদর্শন না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে কুমারী বলা যায়। আর রজোদর্শন হউক আর না হউক, যে পর্য্যান্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে কন্যা বলা যায়।

সকামা ও অকামা কন্যা সম্ভোগ করিবার দণ্ড বিবৃত করিয়া শাস্ত্রকার কুমারী সম্ভোগ অপরাধকে পুত্রবধূসম্ভোগ, ভগিনী সম্ভোগ, ও দুহিতৃ সম্ভোগ তুল্য বিধি দিয়াছেন। কন্যা সম্ভোগ করিলে সকল স্থানেই প্রাণ দণ্ড হয় না। অকামা কন্যা সম্ভোগে প্রাণদণ্ড হয়, কিন্তু সকাম কন্যা সম্ভোগে প্রাণদণ্ড হয় না, লঘুতর দণ্ড হয়। পুত্রবধূ সম্ভোগ করিলে অথবা ভগিনী সম্ভোগ করিলে কিম্বা কুমারী সম্ভোগ করিলে, ভগিনী, পুত্রবধূ ও কুমারী সকামাই হউক আর অকামাই হউক, অপরাধ প্রাণার্হদণ্ড। শুধু তাহা নয়।

যোঽকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যোবধমর্হতি।

মনু ৮।৩৬৪

যে পুরুষ অকাম কন্যা সংগম করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু ভগিনী সঙ্গম ও কুমারী সঙ্গমের প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে আরো দণ্ড আছে।

গুরুতল্পাভিভাষ্যৈনস্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে।:
সূর্ম্মীং জ্বলন্তীং স্বাশ্লিষ্য মৃত্যুনা স বিশুদ্ধ্যতি॥

মনু ১১।১০৪

স্বয়ংবা শিশ্নবৃষণাবুৎকৃত্যাধায় চাঞ্জলৌ।
নৈঋর্তীং দিশমাতিষ্ঠেদানিপাতাদজিহ্মগঃ॥

মনু ১১।১০৫

গুরুপত্নী-গমন পাপ সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়া লৌহময় তপ্ত শয্যায় শয়ন করিবে এবং জ্বলন্ত লৌহময়ী প্রতিমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যুদ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। অথবা স্বয়ং শিশ্ন ও মুষ্ক ছেদন করিয়া অঞ্জলিতে স্থাপন পূর্ব্বক মরণ পর্য্যন্ত অমন্দগতিতে নৈঋত দিকে গমন করিবে।

অকামা কন্যা সম্ভোগ অপেক্ষাও ভগিনী সম্ভোগ বা কুমারী সম্ভোগের গুরুতর দণ্ড।

অবস্থাভেদে সকাম কন্যার সম্ভোগের দণ্ডের তারতম্য আছে, কিন্তু ভগিনী সম্ভোগ ও কুমারী সম্ভোগের দণ্ড, সকাম ও অকাম উভয় স্থানেই সদৃশ।

এই সকল কারণ হইতে স্পষ্ট অনুমিতি হইতেছে যে, কুমারী ও কন্যা শব্দ মনু সংহিতার একার্থবাচক নহে। বিশেষতঃ মনু লিখিয়াছেন।

ত্রীণিবর্ষাণ্যু দীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
উদ্ধ্বন্তুকালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥

মনু ৯।৯০

কুমারী ঋতুমতী হইলেও, তিনবৎসর কাল অপেক্ষা করিবে।

যে স্ত্রীলোকের রজোদর্শন হয় নাই, তাহাকে এস্থলে কুমারী বলা হইয়াছে। মনু অন্যত্র বলিয়াছেন—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি—

মনু ৯।৩

স্ত্রীলোকদিগকে পিতা কৌমারে, ভর্ত্তা যৌবনে, এবং পুত্রেরা বার্দ্ধক্যে রক্ষা করিবেক। স্ত্রীলোকেরা কখনই স্বতন্ত্রা অর্থাৎ অরক্ষিতা হইয়া রহিবেক না।

এস্থলে স্পষ্টতঃ যৌবনারম্ভের পূর্ব্ব-কালকে কৌমার অর্থাৎ কুমারী-অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিবাহ যখনই হউক, যুবতী হইলে ভর্ত্তার রক্ষণে থাকিবে। ইতঃপূর্ব্বে অর্থাৎ দুহিতার কৌমার বয়সে পিতা রক্ষা করিবেন। এস্থলে যৌবনারম্ভের পূর্ব্বকাল যে কৌমার, তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। এবং যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে স্ত্রীর রক্ষণভার স্বামীর কার্য্য নয়, তাহাও জানিতে পারি-তেছি। মনু অন্যত্র বলিয়াছেন,

কালেহ৽দাতা পিতা বাচ্যোবাচাশ্চানুপযন্ পতিঃ।

মনু ৯। ৪

যথা সময়ে কন্যা সম্প্রদান না করিলে পিতার দোষ স্পর্শ হয়; এবং যথাকালে স্ত্রী গমন না করিলে স্বামী দোষ গ্রস্ত হয়েন। কন্যা সম্প্রদান করিবার উৎযুক্ত কাল কখন্ উপস্থিত হয়, তাহা এখন বিচার করিব না।

"বাচ্যোবাচ্যশ্চানুপযন পতিঃ।"

যথাকালে স্ত্রীগমন না করিলে পতির অপরাধ হয়। যে বয়সে স্ত্রীগমন করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই, অথবা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, মৃতবৎসাত্ব প্রভৃতি অতি শোচনীয় চিররোগ জন্মিতে পারে, তৎ সময়ে স্ত্রী সহবাস করিলে কখনই "যথাকাল স্ত্রীগ-মন করা হইল" এমন বলা যায় না।

অকালে স্ত্রীগমন করিবে না, ইহা মনুর স্পষ্ট ব্যবস্থা। কৌমারে পিতা রক্ষা করিবেন, এবং যৌবনে ভর্ত্তা রক্ষা করি-বেন। সুতরাং স্ত্রীর যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে স্ত্রীগমন করা মানব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ।

বালিকাবিবাহ করিলেই অরজস্কা সহবাস করিতে হইবে, গর্ভাধান প্রথার এমন উদ্দেশ্য নয়। মনুর মতে অবস্থাভেদে অপ্রাপ্তা কন্যারও বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে; কোন কোন অবস্থায় বিবাহ সময় উপস্থিত হইলেও কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়।

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি॥

মনু ৯। ৮৮

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যা ঋতুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

মনু ৯। ৮৯

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎকন্যাং হৃদ্যাংদ্বাদশবার্ষিকীম।
ত্র্যষ্টবর্ষোহষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

মনু ৯। ৯৪

উৎকৃষ্ট অভিরূপ সদৃশ বর পাইলে কন্যা অপ্রাপ্তা হইলেও তাহাকে সম্প্রদান করিবে। কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবেক, তথাপি তাহাকে গুণহীন বরে সম্প্রদান করিবে না। ত্রিংশদ্-বর্ষীয় পুরুষ হৃদ্যা দ্বাদশবার্ষিকী কন্যা বিবাহ করিবে, এবং চতুর্বিংশ বর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষবয়স্কা কন্যা বিবাহ করিবে। রজোদর্শনের প্রাক্কালই বিবাহ সময়। কিন্তু অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ উপযুক্ত বর পাইলে অপ্রাপ্তকালে, এবং উপযুক্ত বর পাইতে বিলম্ব হইলে রজোদর্শনের পরও বিবাহ হইতে পারে, এমন কি রজোদর্শনের পর যদি কন্যা স্বয়ং স্বামী বরণ করে, তবে বর কি কন্যা কেহই দোষভাগী হয় না।

অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্যদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যংসাধিগচ্ছতি।

মনু ৯। ৯১

মনুর মতে অপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ বিধি আছে। কিন্তু "অপ্রাপ্তা" বরের কুত্রাপি বিবাহ বিধি দৃষ্ট হয় না। মনু লিখিয়াছেন, চতুর্বিংশবর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা গ্রহণ করিতে পারে। ন্যূনকল্পে বরের চতুর্বিংশ বর্ষ এবং কন্যার বয়স অষ্টম বর্ষ বিবাহ বয়স, ইহাই মনুর বিধি। কিন্তু যৌবনের পূর্ব্বে স্ত্রীর স্বামি-সহবাস নিষিদ্ধ।

যে সকল ব্যক্তি মনুর শাস্ত্র মান্য করেন না, তাঁহাদের জন্য আমি লিখিতেছি না। অঙ্গিরা, স্পেন্সার প্রভৃতি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ঋষির শ্রীচরণে যাঁহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু যাঁহারা মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে চরিত্র গঠন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সুবিধার্থ মনুসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। এই সকল শাস্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, কন্যার অষ্টমবর্ষের পূর্ব্বে, এবং বরের চতুর্বিংশ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ ধর্ম্ম ও শাস্ত্রসঙ্গত নয়। বালিকা বিবাহ মানব শাস্ত্রসঙ্গত; কিন্তু বালক বিবাহ মানব ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। অবস্থা বিশেষে গোবধও শাস্ত্রের বিহিত কার্য্য হইতে পারে; কিন্তু বালকের বিবাহ যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। রজোদর্শনের প্রাক্‌কালই কন্যার শাস্ত্রবিহিত বিবাহকাল। এই সময় অতিক্রান্ত হইলে পিতা পুত্রীর বিবাহবিষয়ে অমনোযোগী বলিয়া দোষার্হ হইবেন; কিন্তু এই দোষভয়ে কদাপি গুণহীন বরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইবেন না। মনু বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, অপ্রাপ্তকাল অর্থাৎ কন্যার কৌমার বয়সে পতি স্ত্রী সহবাস করিবেন না। কিন্তু যথাকালে অর্থাৎ স্ত্রী যৌবনপ্রাপ্ত হইলে স্বামী স্ত্রী সহবাস না করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইবেন। মনু অপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ বিধি দিয়াছেন; কিন্তু তেমনি কুমারী স্ত্রী সহবাস করিলে ভগিনী সহবাস ও পুত্রবধূ সহবাস তুল্য গুরু অপরাধ হয়, তাহার বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগিনী বা পুত্রবধূ সকামা হইলে অপরাধের লঘুতা হয় না; কুমারী স্ত্রী সহবাসেও তাহার সম্মতি আছে বলিয়া, দণ্ডের লঘুতা হয় না।*

চণ্ডালী সহবাস, কুমারী সহবাস, ভগিনী সহবাস, পুত্রবধূ সহবাস, এবং সখা-পত্নী সহবাস এবং গুরুপত্নী সহবাস শাস্ত্রকারের মতে অতি জঘন্য পাপাবহ কার্য্য। পুরাকালে এতাদৃশ পাপলিপ্ত পাষণ্ডের প্রাণদণ্ড হইত। চণ্ডালী সহবাসে এখন কাহারও কোন বিশেষ দণ্ড হয় না। কুমারী সহবাস তো ধর্ম্ম কার্য্যের মধ্যেই গণ্য। সখাপত্নী সহবাস যে জঘন্য কার্য্য, সে বিশ্বাসও শিথিল হইয়া আসিয়াছে। বাকী রহিলেন ভগিনী, পুত্রবধূ, ও গুরুপত্নী। অধোগতির স্রোত যেরূপ দ্রুতবেগে চলিতেছে, তাঁহারাও আর ৫০ বৎসর পর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। তবে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় লোকের চেষ্টায় অধোগতির স্রোতঃ ফিরিতে পারে। রজস্বলা হইলে স্ত্রীর গর্ভাধান † এবং

* আমি মনু-সংহিতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই যে প্রকৃত ব্যাখ্যা, যদি কাহারও তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে, তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত অভিমত পাঠ করুন্।

† স্ত্রীলোকের গর্ভ হইলে গর্ভাধান সংস্কার হওয়া উচিত, প্রথম রজোদর্শনে গর্ভাধান সংস্কার হওয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধি নহে; দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই বিষয় বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইবে।

ষষ্ঠ মাসে শিশুর অন্নপ্রাশন রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। অন্নপ্রাশন হইলে কি শিশুকে মাতৃস্তন্য পরিত্যাগ করিতে হয়? না গর্ভাধান হইলেই স্ত্রীর শারীরিক অবস্থার প্রতি বিচার না করিয়াই স্ত্রী সঙ্গম করিতে হয়? শিশু যদি স্তন্য পরিত্যাগ করিয়া শুধু অন্নের উপর নির্ভর করে, তবে আমাশয়াদি হইয়া আশু মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। গর্ভাধানের পরই আশু গর্ভবতী হইয়া অস্মদ্দেশে অনেক স্ত্রী বন্ধ্যাত্ব,মৃতবৎসাত্ব প্রাপ্ত এবং প্রথম প্রসব চেষ্টায় মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত পতিত হইতেছে।

ভগিনী সহবাস ও অরজস্কা স্ত্রী সহবাস যে মানব ধর্ম্মানুসারে প্রাণ দণ্ডের যোগ্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, রাজা বিদেশী, বিশেষতঃ অপর ধর্ম্মাবলম্বী; সুতরাং দণ্ডের ভার রাজার উপর সমর্পণ না করিয়া আমরা স্বয়ং সমবেত চেষ্টায় কুমারী স্ত্রী সেবমান ব্যক্তির শাসন বিধান করিব, অথবা অনৃতুমতীর বিবাহ রহিত করিব *। ব্রাহ্মণ সমাজ হউক, আর কায়স্থ সমাজ হউক, বাঙ্গালা দেশে হউক আর উৎকলে হউক, যদি সমবেত চেষ্টায় এই জঘন্য পাপাচার রহিত করিতে পারেন, অতি উত্তম কথা। নতুবা রাজা এই অপরাধের দণ্ড বিধান করুন। পৃথিবীতে সৎলোক নিতান্তই অল্প; সকলেই দণ্ড ভয়ে কুপথ হইতে নিবৃত্ত থাকেন; দণ্ড ভয় আছে, তাই পৃথিবীস্থ লোকেরা সুখ সম্পদ সম্ভোগ করিতেছে।

সর্ব্বোদণ্ডজিতো লোকো দুর্লভোহি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ ভোগায় কল্পতে॥

মনু ৭।২২।

লোক সকল দণ্ড দ্বারা জিত হয়, স্বতঃ শুচি লোক একান্তই দুর্লভ। দণ্ডের ভয়েই সমস্ত জগৎ ভোগ করিতে সমর্থ।

যদি ন প্রণয়েদ্ রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষ্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ॥

মনু ৭।২০।

রাজা অতীন্দ্রত হইয়া যদি দণ্ড যোগ্য ব্যক্তিদিগকে দণ্ড নির্দ্দেশ না করেন, তবে বলবত্তর লোকেরা শূলে মৎস্যপাকের ন্যায় দুর্ব্বলদিগকে ভাজা পোড়া করে।

মহর্ষি মনু যেন ভবিষ্যৎ দর্শনবলে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে পারিয়াই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনৃতুমতী সহবাসে অস্মদ্দেশে স্ত্রীলোকের নিতান্ত কষ্টদায়ক দুশ্চিকিৎস্য রোগ জন্মিতেছে, প্রাণবধ পর্য্যন্ত হইতেছে। শিশু বালিকা শ্রেণীর দুদ্দশার একশেষ হইতেছে; কোথায় বালিকারা মাতার স্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সুখে গৃহকার্য্য শিক্ষা করিবে, না কোথায় অকালে স্বামী সহবাস করিতে শ্বশুর গৃহে আনীত হইয়া কত প্রকার যন্ত্রণাই সহ্য করিতেছে। অনেকে ইহজীবন ভারবহ বোধ করিয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতেছে। বস্তুতঃ সবল ব্যক্তিরা শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক জঘন্য কাম রিপুর * বশবর্ত্তী হইয়া শূলে মৎস্য ভাজিবার ন্যায় দুর্ব্বলা অসহায়া অনৃতুমতী বালিকা স্ত্রী-

* আর্য্য বঙ্গ-সম্মিলনী সভা বলিতেছেন, বালিকার ১২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ বন্ধ হউক।

* কালিদাস বলিয়াছেন "কামার্ত্তাহি প্রকৃতি কৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু," কামার্ত্ত ব্যক্তিদের চেতন ও অচেতন বস্তুতে বৈলক্ষণ্য বিচার নাই; তবে কি আর তাহারা রজস্কা ও অরজস্কা বিচার করিয়া চলিবে, এমন প্রত্যাশা করা যায়? এজন্য মনু বিধি করিয়াছেন "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।"

দিগকে ভাজা পোড়া করিতেছেন। দণ্ড্য ব্যক্তির দণ্ড না হইলে কীদৃশ অনিষ্ট রাশি উৎপন্ন হইতে পারে, বিংশতি বর্ষের ন্যূন-বয়স্কা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের দুর্দ্দশা তাহার উদাহরণ স্থল হইয়াছে।

ইংরেজেরা বণিক বেশে অর্থের লোভে এই দেশে আগমন করিয়া ঘটনাচক্রে রাজত্ব পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। কিন্তু বণিকের অর্থ লোভে মুগ্ধ হইয়া অনেক সময় রাজার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেছেন। পাছে অর্থ লাভে ব্যাঘাত ঘটে, এই চিন্তাই প্রবল। অর্থ লাভের জন্য তো রাজত্ব, এই যেন ইংরেজের মূল নীতি। কিন্তু শাস্ত্রকার মনুর ব্যবস্থা অন্যরূপ। রাজা স্বদেশীয় হউন, আর বিদেশীয় হউন, দণ্ড্যব্যক্তিকে দণ্ড বিতরণ করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। রাজা, যে কারণেই হউক, এই রাজকার্য্যে শৈথিল্য করিলে প্রজার তো মহাদুঃখ উপস্থিত হয়ই; রাজার রাজত্ব অল্পে অল্পে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বলের রক্ষা কার্য্য অবহেলা করিয়া প্রবল রোম রাজ্য ধ্বংস পাইয়াছে; মহাপরাক্রমশালী সূর্য্য চন্দ্রবংশ লুপ্ত হইয়াছে, অজেয় মোগল রাজ্য ধূলিসাৎ হইয়াছে। হে ইংরাজ রাজ, হিন্দুরা কদাচারী ও কুপথগামী হইয়া অধঃপাতে যাইলে তোমাদের রাজত্ব নিষ্কণ্টক ও চিরস্থায়ী হইবে, মনে করিও না।

দণ্ডোহি সুমহৎ তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম ॥

মনু ৭। ২৮

রাজদণ্ড সুমহৎ তেজঃস্বরূপ; অকৃতাত্মা রাজার নিকট ইহা দুর্দ্ধর্ষ। এই সুমহৎ তেজঃ ধর্ম্ম পথ হইতে বিচলিত রাজাকে সবান্ধবে বিনাশ করে।

এই যে দুর্ব্বলা অসহায়া বালিকাদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন হইতেছে, সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বর তাহার গণনা করিতেছেন। ইংরেজরাজ শিশু বালিকাদিগকে রক্ষা না করিয়া সমগ্র ভারতের নারীজাতির ঘৃণার পাত্র হইতেছেন। ফল এই হইবে যে, নারীজাতির শ্রদ্ধা হারাইয়া ইংরাজ রাজত্ব লোপ পাইবে। ব্রাহ্মণেতর জাতির অভিসম্পাতে হিন্দুর রাজত্ব লুপ্ত হইয়াছে। নারীজাতির অভিসম্পাতে মোগল রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। যদি ভারতবর্ষে এই প্রবল পরাক্রমশালী ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস হয়, এই সকল শিশু বালিকার অশ্রুপাতে সেই অধঃপাত সংঘটিত হইবে। ১৮২৯ সালের রাজপ্রতিনিধি ভারতবর্ষে "কখনও ধর্ম্মপথ মনুষ্য হইতে বিচলিত হইব না" বলিয়া * যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, যখন ইংরাজ রাজ সেই পথ পরিত্যাগ করিবেন, তখন

"ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্"

মনু ৭। ২৮

"রাজধর্ম্ম হইতে বিচলিত নৃপ সবান্ধবে বিনাশ পাইবেক" মনুর এই অভিসম্পাৎ ইংরাজ রাজকে আচ্ছন্ন করিতে থাকিবে। কি জর্ম্মনি, কি অষ্ট্রীয়া কোন রাজ্যই তখন কোনও প্রকার সহায়তা করিতে পারিবে না। কোথায় বা থাকিবে শাস্ত্রের কুটার্থকারী অরজস্কা সেবমান ব্যক্তির চীৎকার, আর কোথায় বা থাকিবে ইংরেজের অর্থলাভ চিন্তা! দুর্ব্বল ব্যক্তিকে সবল ব্যক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে রাজা এই ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়াছেন, সর্ব্ব শক্তিময় পরম কারুণিক

* See the preamble of Regulation XVII of 1829.

পরমেশ্বরের আজ্ঞার নিয়মানুসারে তিনি বা তদ্বংশীয়েরা ঘটনার চক্রে পড়িয়া সত্বর রাজত্ব হারাইয়াছেন। সর্ব্ব দেশে এবং সর্ব্ব যুগে ঈশ্বরের এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে। সমুদ্রবারির লবণত্বও ধ্বংশ হইবে না, আর এই ঐশিক নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

আর হিন্দু সমাজস্থ লোকদিগকে শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বাক্য স্মরণ করাইয়া সানুনয়ে নিবেদন করিতেছি, "অনাগতার্ত্তবা বালিকা-গমন সোদরাগমন বা গুরুপত্নী গমনের ন্যায় অতি গুরুতর পাপাবহ এবং ঘোরতর অধঃপাতের হেতু। ঐ ভীষণ পাপের প্রথা যে হিন্দুসমাজে গুরুতর বলিয়া বিশ্বাস নাই এবং সেই জন্য যে হিন্দুর সন্তান পরম্পরার ঘোরতর অধঃপাত ঘটিতেছে, আরও ঘটিবে, তাহাত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকি।"

সামান্য দুঃখে কি কবি বলিয়াছেন,—

"অরে কুলাঙ্গার হিন্দুদুরাচার
এই কি তোদের দয়া সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে!
বারেক ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে?"
"ধিক হিন্দুকুলে হয়ে আর্য্যবংশ
নরকণ্ঠ-হার নারী কর ধ্বংশ!
ভুলে সদাচার দয়া সদাশয়
কর আর্য্যভূমি পূতিগন্ধময়.
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী মাঝে।"

বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উৎকল, প্রভৃতি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে এই পাপাবহ প্রথা দণ্ডদ্বারা নিবারিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, শুধু কি বাঙ্গালী জাতি এতৎ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট রহিয়া স্বজাতির গৌরব দূরপনেয় কলঙ্কে মলিন করিবেন?

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

প্রাচীন মহারাষ্ট্র। (১)

"A people that can feel no pride in the past in its history and literature looses the mainstay of its national character. When Germany was in the very depth of its political degradation; it turned to its ancient literature and drew hope for the future, by the study of its past. Something of the same kind is now passing in India."

Professor Max Mullar.

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই ভারতের ইতিহাস নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কাহাকেও এ অভাব মোচনে অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। হয়ত অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, একজনই সমগ্র ভারতের একটী সু-বৃহৎ ইতিহাস লিখিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু এক জনের দ্বারা এই সুবিশাল ভারতের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ইতিহাস সঙ্কলিত হওয়া সম্ভাবপর নহে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া সংগ্রহ করা এক জনের সাধ্যাতীত। কারণ ভারতের এক প্রদেশ অন্য প্রদেশ হইতে এত বিভিন্ন, এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের জাতিগত এবং ভাষাগত পার্থক্য এত অধিক যে, সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, কোন

অদ্ভুত প্রতিভাশালী ব্যক্তি আশাতীত দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইলেও ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা সমূহে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, তৎপরে সেই সেই প্রদেশের তিমিরাচ্ছন্ন ইতিহাসের উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন কিনা সন্দেহ। আমাদের বিবেচনায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আলোচিত ও সংগৃহীত হইলেই অনেক পরিমাণে কৃত-কার্য্য হইবার সম্ভাবনা এবং তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারত-ইতিহাস লেখকের পথও অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা ভারতের ইতিহাসের অংশ বিশেষের—মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত অতি অল্প গ্রন্থই রচিত হইয়াছে; এবং এ বিষয়ে যে দুই এক খানি গ্রন্থ আছে, তাহার একখানিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে যে আমরা আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহার বিশেষ, সম্ভাবনা নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম, আমাদিগের বঙ্গ দেশের কোন কৃতবিদ্য মহোদয় এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন; কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, তখন অগত্যা আমাদিগকেই এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইল।

মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে কাপ্তান জেমস্ গ্রাণ্ট ডাফ্ (Captain James Grant Duff) সাহেব মহোদয় প্রণীত History of the Marathas নামক গ্রন্থ ব্যতীত সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাস পদবাচ্য আর কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। উক্ত মহাত্মা প্রভূত পরিশ্রম ও বিপুল অর্থ (বিংশতি সহস্রাধিক মুদ্রা) ব্যয় করিয়া সর্ব্ব প্রথম মহারাষ্ট্রীয় জাতির এক সুবৃহৎ ইতিহাস প্রণয়ন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আর্য্যগণ কোন্ সময়ে দাক্ষিণাত্যে যাইয়া বসতি করেন, এবং কোন্ সময়ে মহারাষ্ট্র দেশ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, সাহেব মহোদয় এ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। এতদ্ ব্যতীত মরাঠাগণ (মহারাষ্ট্রীয় জাতি) কে? কোথা হইতে আসিল? প্রাচীন কালে মহারাষ্ট্র দেশে কোন্ কোন্ রাজ বংশ রাজত্ব করিতেন? এবং তাঁহাদের বংশীয়গণের মধ্যেই বা এখন কোন্ কোন্ বংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইত্যাদি বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় তদীয় গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। এমন কি, আধুনিক কালের সুবিখ্যাত "ভোঁস্‌লে" "পবার" (প্রমার) "মহাড়ীক," "শিরকে" (সালকে বা চালুক্য) প্রভৃতি পঞ্চকুলের, ছত্রিশ কুলের ও ছিয়ানব্বই কুলের মরাঠাগণ কোন্ বংশোদ্ভূত? কোন্ দেশীয়? এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ কুল পূর্ব্বদিকের রাজবংশ হইতে আসিয়া এ দেশে বসতি করিয়াছে, ইত্যাদি অনায়াস-লভ্য আবশ্যকীয় বিষয় সমূহও উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। প্রাচীন কালে মহারাষ্ট্র দেশে যে সমস্ত সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও কবিগণ জন্ম গ্রহণ করেন ও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রাচীন মরাঠী (মহারাষ্ট্রী) ও সংস্কৃত

ভাষায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্যাদি রচিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তৎসমূহের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। তদীয় গ্রন্থে যে সকল মহাপুরুষ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা একে অতি সংক্ষিপ্ত, তাহার উপর আবার অধিকাংশ স্থলই অসম্পূর্ণ। কারণ যে সকল ঘটনাবলীর উপর তাহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে, দুঃখের বিষয় তাহা একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে *। মরাঠা জাতির চির শত্রু মুসলমান ঐতিহাসিকগণের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াও গ্রন্থকার অধিকাংশ স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অনেক স্থলেই তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলি প্রকৃত ঘটনা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। এই প্রবন্ধের অন্য স্থলে তাহার বিশদরূপে সমালোচনা করিবার আমাদিগের ইচ্ছা রহিল। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে এই সমস্ত ক্রটী বা দোষ পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রভূত অর্থ ব্যয়, কষ্ট স্বীকার ও অধ্যবসায়ের জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, "মহ্রাঠাগণের সম্বন্ধে চারিটি উদ্গার," "গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব প্রণীত, মরাঠা জাতির ইতিহাসের প্রতিবাদ" ও "অতি প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত দক্ষিণ বা মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস" প্রধানতঃ এই তিনখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিত হইল। প্রথম গ্রন্থখানি বোম্বে সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতবর রাজারাম রামকৃষ্ণ ভাগবত মহোদয় কর্ত্তৃক মরাঠী ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে মরাঠাগণের ও মরাঠী ভাষার উৎপত্তি, বিস্তৃতি, ও অতি প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ দেবাস রাজ্যের দেওয়ান রাও বাহাদুর নীলকণ্ঠ জনার্দ্দন কীর্ত্তনে প্রণীত। গ্রন্থকার যখন পুনা কলেজের 'জুনিয়ার ষ্টুডেণ্ট', ছিলেন তখন "পুনা ইয়ংমেনস্ এসোসিয়েশন" নামক ছাত্রদিগের বিতণ্ডা সভায় যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, এই গ্রন্থ তাহারই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র।* পুণে † ডেক্কান কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, এম, এ, মহোদয় শেষোক্ত গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। 'বম্বে গেজেটিয়ার' অর্থাৎ বোম্বাই প্রদেশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ নামক এক সুবৃহৎ ইংরাজি গ্রন্থ বোম্বের গবর্ণমেণ্ট খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন। উক্ত গেজেটিয়ারের "মহারাষ্ট্র দেশের ইতিবৃত্ত" নামক অংশের জন্য ডাক্তার ভাণ্ডারকর মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত দক্ষিণের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দেন। কিন্তু উক্ত গেজেটিয়ার ক্রয় করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, বিবেচনায় সাধারণের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তিনি উহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। মরাঠী ভাষায়, কি ইংরাজি ভাষাতেও মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদেশের

* "A Review of Captain James Grant Duff's History of the Marathas" by Raw Bahadar Nilkantha Janardan Kertani, Late Asst. Guardian and Tutor to H. H. The Nawab of Jawrah. &c. &c.

* গ্রন্থকার আমাকে লিখিয়াছেন "I was very young and raw wheu I penned them. * * * (Though) there is nothing really objectionable in it."

† ইহার বাঙ্গালা উচ্চারণ 'পুণ, ফি'

ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত কেহ লিখিতে পারেন নাই। কারণ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নেলস্ এবং উক্ত সোসাইটির কলিকাতা ও বোম্বে ব্রাঞ্চের (শাখার) জর্নেলস্ (ইতিবৃত্ত), ইণ্ডিয়ান আণ্টি-কোয়েরী ও অন্যান্য বহুবিধ ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থ সমূহে ও সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদি গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক সত্য ও আবশ্যকীয় উপাদন সমূহ সংগ্রহ করা অতি কঠিন ব্যাপার। আবার উক্ত সংগৃহীত সত্য সকল একত্রিত করিয়া ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করা ততো-ধিক কঠিন কার্য্য। ডাক্তার ভাণ্ডারকর অদম্য উৎসাহ ও দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম দ্বারা উহা সম্পন্ন করিয়া, মহারাষ্ট্রবাসীর, এমন কি সমস্ত ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা ইতিহাসপ্রিয় ইংরাজী-অভিজ্ঞ পাঠকগণকে এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাঠকগণ দেখিবেন, এ গ্রন্থে এমন একটিও কথার উল্লেখ নাই, যাহার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। ইংরাজি অনভিজ্ঞ পাঠকগণের ভাগ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠের সুবিধা হইবেনা বলিয়া নারায়ণ বিষ্ণু বাপট মহোদয় সরল মরাঠী ভাষায় ইহার অবিকল অনুবাদ করিয়া মহারাষ্ট্র-বাসী জন সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলন সম্বন্ধে আমরা বাপঠ মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় মহা-রাষ্ট্র দেশেরও অতি প্রাচীন কালের ধারা-বাহিক বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু প্রস্তরলিপি ও তাম্র শাসনাদির সাহায্যে এবং আধুনিক প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর চেষ্টায় ও যত্নে সকল প্রদেশেরই প্রাচীন ইতিহাস অল্পাধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশেও প্রস্তর-লিপি, প্রাচীন মুদ্রা, দান-পত্র ও তাম্রশাসনাদি অনেক পাওয়া গিয়াছে ও তাহা হইতে প্রাচীন কালের অনেক ঐতিহাসিক সত্য কিয়ৎ পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। মহারাষ্ট্র দেশে সর্ব্ব-প্রথম মহাত্মা বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী জাম্ভেকর মহোদয় প্রস্তরলিপি ও তাম্র-শাসনাদি পাঠ করতঃ তাহা হইতে ঐতি-হাসিক সত্য আবিষ্কার করিয়া ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার পথ প্রদর্শন করেন। তৎপরে বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক, শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ রাও পণ্ডিত, কাশী নাথ ত্রিম্বক তেলঙ্গ, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, ও ভগবান লাল পণ্ডিত প্রভৃতি মহোদয়গণ তৎপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। উক্ত মহাত্মাগণের অধ্যবসায় ও যত্নেই আজ আমরা মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন কালের তিমিরাচ্ছন্ন ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিয়াছি। এই সকল মনস্বী পুরুষগণের পরিশ্রম এবং অনুসন্ধিৎসার ফল আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিব।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

উৎকল-ভ্রমণ।

পুরীর তীর্থের কথা।

পুরীর পঞ্চতীর্থের নাম—নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং চক্রতীর্থ। গত বারে ভুল ক্রমে ইন্দ্রদ্যুম্নকে জগন্নাথের রথ বিহারের বাড়ী বলা হইয়াছে। জগন্নাথের রথ বিহারের বাড়ীর নাম গুণ্ডীচাবাড়ী। তারপর দিন প্রাতে গুণ্ডীচাবাড়ী, মাসিমার বাড়ী, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও নরসিংহ-মন্দির দেখিতে বাহির হইলাম। শুনিলাম, রথ বিহারের সময় জগন্নাথদেব একদিন মাসিমার বাড়ী অবস্থিতি করেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী গুণ্ডীচাদেবীর নামে গুণ্ডীচাবাড়ীর নামকরণ হইয়াছে। গুণ্ডীচাবাড়ীর প্রাঙ্গণ পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু মন্দিরের নানা বিভাগ ঠিক শ্রীমন্দিরের অনুরূপ। ভোগ প্রস্তুতের গৃহগুলি ভিন্ন আর সমস্তই ইষ্টকময়। এই মন্দিরের গায়েও অসংখ্য অশ্লীল ছবি বিদ্যমান আছে। প্রাতে দেখিলাম, দলে দলে পাণ্ডা সমভিব্যাহারে যাত্রীগণ গুণ্ডীচাবাড়ী দেখিতে আসিতেছেন। বিধবার সংখ্যাই অধিক। অশ্লীল ছবিগুলি পাণ্ডারা এইরূপ ব্যাখ্যাসহ প্রদর্শন করিতে লাগিল; "এই খানে ভগবান এক সখীর সঙ্গে লীলা করিতেছেন।" এইরূপ কথা শুনিয়া ও ছবি দেখিয়া কেহ কেহ লজ্জায় মুখ আবৃত করিতে লাগিল। কিন্তু পাণ্ডাদের ব্যাখ্যা তবুও ফুরায় না! তাহাদের পয়সা লওয়ার ফন্দি দেখিলে অবাক হইতে হয়। যেখানে লইয়া যাইতেছে, সেই খানেই যাত্রীদিগকে "এই খানে কিছু চড়াও" বলিয়া পয়সা আদায় করিতেছে। পয়সা প্রদানের এত স্থান প্রদর্শিত হয় যে, এক পয়সা করিয়া প্রত্যেক স্থানে দিলেও সমস্ত পুরী দেখিতে ৬। ৭ টাকা লাগে। এতদ্ভিন্ন প্রধান পাণ্ডাদেরপ্রাপ্য—সে ত স্বতন্ত্র কথা। কেহ কেহ পুরী হইতে ফকীর হইয়া প্রত্যাগমন করেন। গুণ্ডীচাবাড়ী দেখিয়া নৃসিংহ-মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। গুণ্ডীচাবাড়ী এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের মধ্যে ইহা অবস্থিত। এখানকার বহুদেব দেবীর মূর্ত্তি মৃত্তিকা নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল। কল্কি অবতারের মূর্ত্তি বিশেষ রূপ মনকে আকৃষ্ট করিল। তৎপর ইন্দ্রদ্যুম্ন দর্শনে গেলাম। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নামে এই পুকুরের নাম হইয়াছে। গুজরাটের যাত্রিকগণ জলে যখন মুরকির মোয়া ভাসাইতে লাগিলেন, তখন জনৈক পাণ্ডা বিকট চিৎকার করিয়া নানারূপ সম্বোধনে কূর্ম্ম-অবতারের বংশধরগণকে ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কূর্ম্মগণ সমবেত হইয়া উপাদেয় আহার গ্রহণ করিতে লাগিল। আর তখন পাণ্ডা মন্ত্র পড়িতে লাগিল "মৎস্য কচ্ছ, দশ অবতার, গদাধর, জনার্দ্দন ইত্যাদি"। যাত্রিকগণ এই দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখিয়া জীবনকে সার্থক মনে করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র।—একটী প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড পুকুর, ইষ্টক দ্বারা তীর বাঁধা। শুনা যায়, ইহার মধ্যে কুম্ভীর আছে। এই পুষ্করের মধ্যেস্থলে একটী মন্দির আছে। বৈশাখ মাসে এখানে একটী মেলা হয়, তাহাকে

চন্দন যাত্রা বলে। ২১ দিন মেলা থাকে। মদনমোহন এই মেলার সময় এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

মার্কণ্ড।—এটী অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু এটীরও তীর বাঁধা, এটীও খুব প্রাচীন পুকুর। এখানে চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমিতে কালীয় দমন যাত্রা হয়।

শ্বেতগঙ্গা—এটী সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানেও যাত্রিকগণ স্নান করিয়া থাকেন।

চক্রতীর্থ—অথবা সমুদ্র। সমুদ্র দেখিলে যে নবজীবন লাভ হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই; তীর্থের মধ্যে এই তীর্থ অতি জীবন্ত ও মহান।

একদিনে এই পঞ্চতীর্থে যাত্রিগণকে স্নান করিতে হয়। ইহারা পরস্পর এত দূরে অবস্থিত যে, প্রাতঃকাল হইতে স্নান আরম্ভ করিলে সকল তীর্থ শেষ করিয়া আসিতে ১২টা বাজে।

সর্ব্বাপেক্ষা পুরীর জীবন্ত দেবতা লোকনাথ। লোকনাথকে ভয় করে না, এমন লোক পুরীতে বিরল। লোকনাথের মন্দির ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত। একদিন প্রাতে দর্শনার্থ গমন করিলাম। অন্ধকারময় গৃহে লিঙ্গরাজ বিরাজিত। এখানে শৈব ধর্ম্মের জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন দেখিলাম। দুই চারি জন ভক্তের সহিত দেখা হইল। শিবরাত্রির সময় এখানে খুব ধূমধাম হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মাঘ, কার্ত্তিক ও বৈশাখ মাসেও খুব ধূমধাম হয়।

তোটাগোপীনাথ—একটী প্রসিদ্ধ মন্দির। প্রবাদ এইরূপ, এই খানে চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান হয়। এ সম্বন্ধে একটী কবিতা পাওয়া যায়; সেটী এই—

"কি করিব, কোথা যাব, বাক্য নাহি সরে।
গোরাচাঁদে হারাইনু গোপীনাথের ঘরে॥"

এখানে চৈতন্যদেব অনেক সময় থাকিতেন। এইরূপ কথিত আছে, এক দিন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, আর বাহির হইলেন না।

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এক দিন স্বর্গদুয়ার দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতির মঠের নিকটবর্ত্তী একটা প্রশস্ত স্থানে, সমুদ্রের খুব নিকটে, বালুকারাশির মাঝে এক খণ্ড প্রস্তর প্রোথিত রহিয়াছে, ইহাকেই স্বর্গদুয়ার বলে। দলে দলে যাত্রিগণ ইহা দেখিয়া পয়সা দিয়া থাকে।

পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বহু ছোট ছোট মন্দির আছে—তাহাতে বহু দেবতার সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে বিমলার মন্দিরই প্রধান। এই বিমলা যাজপুর বিরজা-ধাম হইতে আনীতা হইয়াছেন। শাক্তধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্মিলনের জন্য এই রূপ বিধান করা হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। শুনিলাম, এই বিমলামন্দিরে, মহাষ্টমির দিন জগন্নাথ যখন নিদ্রিত হন, তখন মহাবলী হয়। পুরীতে বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষের একমাত্র চিহ্ন—জাতিভেদের অন্তর্দ্ধান। শ্রীমন্দিরের প্রসাদ আব্রাহ্মণ চণ্ডাল একত্রে সানন্দে ভোজন করিয়া থাকে। এই প্রথা প্রচলিত থাকায় হিন্দুধর্ম্ম বিলোপের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া বিমলাকে এখানে আনিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। শাক্তধর্ম্মানুসারে প্রসাদ মন্ত্রপূত হয়, এই ধারণায় এখন আর ধর্ম্ম লোপের

ভয়েরকারণ নাই। বিমলার মন্দিরের প্রাঙ্গণে রোহিণী-কুণ্ড আছে—এই কুণ্ডে ব্রহ্মার প্রথম সাক্ষী "ভূষণ্ডিকাক" পড়িয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিল, প্রবাদ আছে।

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শ্রুত হইয়াছি। বাহুল্যভয়ে সে সকল বিবৃত করিলাম না। বহুবার জগন্নাথ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। প্রথমত ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন, ১৫০ বৎসর অরণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, ৩ বার চিল্কা-হ্রদে প্রোথিত হইয়াছিলেন। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয; কোন মতে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীঅনিয়ঙ্ক ভীমদেব ১২৫,০০০০ লক্ষ স্বর্ণ মার (এক কোটী টাকা) আড়াই লক্ষ মার মূল্যের মণি মুক্তা এই কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। চূড়া সমেৎ ইহা ১৯৮ ফিট উচ্চ।

জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময়ে তিনটী রথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। সেই তিনটী রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচা গৃহে গমন করেন। এক সপ্তাহ অন্তে তথা হইতে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জগন্নাথের রথের নাম "নন্দীঘোষ" ইহা প্রায় ৩২ হস্ত উচ্চ, বলরামের রথ "তালধ্বজ" ইহা প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ, সুভদ্রার রথের নাম "পদ্মধ্বজ" ইহা প্রায় ২৮ হস্ত উচ্চ।

মহাত্মা হণ্টার সাহেব বলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামানন্দ উৎকলে আগমন করেন। ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে জয়দেবের আবির্ভাব। ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীদাস; ১৪৩৩ তে বিদ্যাপতি, ১৪৪৮তে কবীর, ১৪৮৯তে নানক, ১৫০৯ হইতে চৈতন্যদেব, ১৫৭২তে গোবিন্দ দাস এবং ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তুলসী-দাসের পুরীর লীলা বলিয়া অনুমান হয়। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহু বৎসর উড়িষ্যায় থাকেন; ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চৈতন্যের উৎকল প্রচার; প্রতাপ রুদ্র দেব এই সময়ে রাজা ছিলেন। ১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দ বিষ্ণুপুরাণের সময়। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে রামানুজ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করেন। এইরূপ প্রবাদ, ইঁহারা সকলেই পুরী আগমন করিয়াছিলেন। চৈতন্য কবীর, নানক ও শঙ্করাচার্য্য যে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা, এই সকলের নামেই মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

পুরীতে আগমন করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা ধর্ম্মক্ষেত্র, অথবা শ্রীক্ষেত্র। গবর্ণমেণ্টের প্রতাপ অপেক্ষা শত গুণে অধিক ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর প্রতাপ। যতই পুরীর বিষয় অনুসন্ধান কয়া যায়, ততই নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন ভারতের তত্ত্বরাশি-পূর্ণ এমন দ্বিতীয় স্থান ভারতে দুর্লভ।

আর এক দিন বৈকালে সেই মেয়ে-কয়েকটীর অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। কটক হইতে জনৈক ব্যক্তি সঞ্জীবনীর সদাশয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একখানি বেনামা পত্রে লিখিয়াছিল যে, এই কয়েকটী অসহায়া মেয়েদিগের জন্য "আমরা" কিছুই চেষ্টা করি নাই। সঞ্জীবনীর সম্পাদক মহাশয় দয়া করিয়া সে পত্র ছাপান নাই। ঐ ব্যক্তি সব-জান্তা উপাধি পাওয়ার যোগ্য, কেননা, পুরীতে না যাইয়াও লিখিতে সাহস পাইল, "আমরা কিছুই চেষ্টা করি নাই।" যা'ক। অনুসন্ধানে সেই কয়েকটী মেয়েকে পাওয়া গেল। তাহারা তখন এত দূর বিগড়াইয়া

গিয়াছে যে, তাহাদের কথায় ও প্রতিবাদে আমরা অবাক হইলাম। এদিকে দেখিলাম, অনেক ষণ্ডামার্ক সেই বাড়ীতে আনাগোনা করিতেছে। তাহাদের স্পষ্ট উত্তর পাওয়ার পর বুঝিলাম, আমাদের দ্বারা আর কিছুই হইবে না। তখন অগত্যা কলিকাতায় পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। ইহার পর আর আমরা কোন খবর পাই নাই। তাহারা পরিবারে গৃহীত হইয়াছে কি না, জানি না। পরিবারে গৃহীত হইয়া না থাকিলে দুঃখের সীমা নাই। এইরূপ করিয়া কত নারী যে বিপথে পা ফেলিতেছে, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

পুরীর প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্থ স্বামী এক জন প্রাচীন বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি। শঙ্করের মঠে ইনি তখন থাকিতেন। ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য। শুনিলাম, শীঘ্র মঠ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। মঠধারী সন্ন্যাসীর মঠ পরিত্যাগ—এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সন্ন্যাসী আরো সন্ন্যাসী হইবার জন্য চলিয়াছেন—যাহা কিছু আসক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ছিঁড়িতেছেন; এই জড়বাদের দিনে এরূপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল। আমরা তাঁহার অলৌকিক জীবনের কথা শুনিয়া মোহিত হইলাম। তার পর আমরা তাঁহার আদিষ্ট দিনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

শঙ্করেরমঠ—বালুকা-গুহার মধ্যে নির্ম্মিত। সমুদ্রের উপকূলে অনন্ত বালুরাশি—তাহার মধ্যে একটা গর্ত্তের ন্যায় স্থানে এই মন্দির। মন্দিরের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের বেদি আছে, আর অসংখ্য হস্তলিখিত পুঁথি আছে। মন্দিরের কিঞ্চিৎ আয় আছে, তদ্দ্বারা শিষ্যবর্গের কোন্ রকম ভরণপোষণ হয়। শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্থস্বামী শ্রীমন্দিরের প্রসাদ পাইয়া থাকেন। তীর্থস্বামী সরল সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন; তিনি অতি মিষ্টভাষী ব্যক্তি। তাঁহার প্রসন্ন ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়; তিনি একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত, অদ্বৈতবাদী। তাঁহার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিলাম। তিনি আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ মর্ম্মের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

১। এক অদ্বিতীয় দেবতা ভিন্ন দুই জগতে নাই। যত দিন মানুষ মোহের অধীন, ততদিনই দ্বিত্ব বোধ। মোহ ছিন্ন হইলে—অদ্বৈতভাব প্রাণে উপস্থিত হয়।

২। উপাসনা বা পূজা তত দিন, যত দিন মানুষ মোহের অধীন অথবা যত দিন মানুষের দ্বিত্ব বোধ আছে। দ্বিত্ব বোধ ঘুচিলে আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। ইন্দ্রিয়-মূলক আমিত্ব বোধ মানুষের সর্ব্বনাশের মূল।

৩। "আমিই সেই"—অদ্বৈতবাদীর এ মত নয়, "আমি নাই, কেবল "তিনি আছেন"—এই মত। আপনার নাশই প্রকৃত ধর্ম্ম।

৪। মোহ ও মায়ার অতীত হওয়ার পক্ষে কর্ম্ম কাণ্ড সহায়। শেষে কর্ম্ম কাণ্ডের প্রয়োজন নাই।

এই সকল কথার পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি পুরীর শ্রীমন্দিরের জগন্নাথদেবকে মানেন?

তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন—'না—আমি না।"

আমরা।—তবে সেখানে মধ্যে মধ্যে যান কেন?

তিনি।—লোকদিগকে দেখাইবার জন্য। আমি না যাইলে অনেকের অবিশ্বাস হইবে।

আমরা।—ধর্ম্মে কপটতা ভাল কি?

তিনি।—ভাল নয়, কিন্তু এরূপ না করিলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম যে আর থাকে না।

আমরা।—এই রূপে কি থাকিবে?

তিনি।—থাকিবে, একটা ত ধরা চাই। আশা করি, এইরূপ করিয়া সকলে এক দিন ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিতে পারিবে।

আমরা।—এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন কি?

তিনি।—দেখি নাই বলিয়া দুঃখিত, সেই জন্য মানুষের সংসর্গ আর ভাল লাগেনা, যাইতে পারিলে বাঁচি।

এই রূপ নানা কথায় বুঝা গেল, তিনি যাহা বিশ্বাস করেন না, লোক দেখানের জন্য তাহাও করেন। তিনি সরলভাবে দুর্ব্বলতা স্বীকার করিলেন; ইহাও বলিলেন, জগন্নাথমন্দিরে যাইয়া তিনি পূজাদি করেন না। এই মহাত্মার সংস্পর্শে যতক্ষণ ছিলাম, যেন স্বর্গে ছিলাম। যেমন ধর্ম্মজ্ঞান, তেমনি অমায়িকতা, যেমন বিশ্বাস, তেমনি ভক্তি। অবশেষে তিনি ক্লান্ত হইতেছেন দেখিয়া প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

আমাদের ক্ষীণ ভাষায় আর পুরীর বর্ণনা সম্ভবে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরী সম্বন্ধে ভাবা যায় অনেক, লেখা যায় অল্প। অতি অল্পই লিখিলাম। দেখিবার, জানিবার, শুনিবার, পড়িবার—পুরীতে অনেক জিনিস আছে; কিন্তু সে সকল আমাদের লেখনীর বর্ণনা করিবার শক্তি নাই।

আর একটি কথা। চৈতন্যদেবের শেষ জীবন পুরীর অঙ্গে বিলীন হয়। একথাটী ভাবিলে পুরীর প্রতি আপনা আপনি একটা অজানা গভীর অনুরাগ জন্মে। কেহ কেহ বলেন, গোপীনাথের ঘরে তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়; কেহ বলেন, জগন্নাথের ঘরে; কেহ বলেন, তিনি সমুদ্রে আত্ম বিসর্জ্জন করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে সমুদ্র পতন নামক একটী পরিচ্ছেদ আছে, তাহাতে জানা যায়, তিনি সমুদ্র পতনের পরও উঠিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, কিন্তু তবুও তাঁহার অর্দ্ধধানের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না; বড়ই আশ্চর্য্য।

আমরা সম্প্রতি শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, নবদ্বীপ, কালনা প্রভৃতি চৈতন্য-ভক্তি-প্রধান স্থান দেখিয়া আসিয়াছি। এই সকল স্থানই চৈতন্যদেবের লীলার ভূমি, এই সকল স্থানেই তাঁহার মূর্ত্তি ধূমধামের সহিত পূজিত হইতেছে। এই সকল স্থানের কোথাও আমরা তাঁহার তিরোধানের প্রকৃত কথা জানিতে পারি নাই। নিত্যানন্দের জীবনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিবাহাদি করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বলেন। নিত্যানন্দ সেই আদেশে দেশে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ করেন। খড়দহের গোস্বামী বংশ নিত্যানন্দের বংশ। এইরূপ প্রবাদ, নিত্যানন্দ চৈতন্যের ধর্ম্মকে এইরূপ বিকৃতভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারাই বৈষ্ণব সমাজে চরিত্রহীনতা প্রশ্রয় পায়। নিত্যানন্দের কথা বলিয়া এইরূপ একটী শ্লোক প্রচলিত আছে;—

"মৎস্যের ঝোল, কামিনীর কোল, মুখে হরি বল।"

গোরাচাঁদের ধর্ম্মের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু গৌরচন্দ্রের নিকট এই রূপ একটী তরজা লিখিয়া পাঠান—

"আউলকে কহিও হাটে নাহি বিকায় চাউল,
আউলকে কহিও দেশ হইল বাউল।
আউলকে কহিও কাজে নাকি কাউল।
এই কথা বাউলকে কহিয়াছে বাউল।"

এইরূপ কথিত আছে, এই কথাগুলি শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত বিমর্ষ হন, এবং বলেন "যে ব্যক্তি আহ্বান করিয়া আমাকে আনিয়াছিলেন, তিনিই বিসর্জ্জন দিতেছেন।" ইহার পর প্রায়ই যেখানে সেখানে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। শেষে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হন। কিরূপে কোথায় কি হইল, কেহই জানে না। চৈতন্যের শেষ জীবনের ছায়া উৎকলকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। পুরী চৈতন্যের অতি মিষ্ট স্থান। এই কারণে পুরী বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয় জিনিষ। কিন্তু দুঃখের বিষয়—পুরীতে চৈতন্যের তেমন কোন কীর্ত্তি নাই। পাণ্ডারা জগন্নাথের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য বলেন, "তিনি জগন্নাথ দেবের সহিত মিলিত হইয়াছেন।" ইহাতে জগন্নাথের মহিমাই অপ্রতিহত রহিয়া গিয়াছে। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ চৈতন্যের ভক্তিপূর্ণ জীবন যে ভূমিকে পবিত্র করিয়াছে, পাপীর পক্ষে সে ভূমি যে অতি আদরের জিনিষ, সন্দেহ কি? পুরী—জ্ঞানীর তীর্থ; কেননা, শঙ্করাচার্য্যের ভূমি। পুরী বিশ্বাসীর তীর্থ, কেননা কবীরের বিচরণ স্থান। পুরী ভক্তের তীর্থ—কেননা চৈতন্যের শেষ লীলাভূমি। পুরী, এ জগতে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসের সমন্বয় ক্ষেত্র। কেবল সমন্বয় ক্ষেত্র নয়, হিন্দু ইতিহাসের এরূপ উজ্জ্বল ক্ষেত্র পৃথিবীতে বিরল।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা।

চৈতন্য লাইব্রেরি সভার অধিবেশনে ...জেন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত, মূল্য ৵০। সর্ব্বদেশেই এমন এক এক জন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহাদের জীবনের কথা শুনিবার জন্য জগৎ ঊর্দ্ধকর্ণ হইয়া থাকে। আমাদের এই বঙ্গভূমিতে বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর সেই রূপ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁহার এই বক্তৃতা শ্রবণ কালে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ৩০০।৪০০ শত ব্যক্তি চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়াছিল। এরূপ চিন্তা, গবেষণা ও বিজ্ঞতা পূর্ণ বক্তৃতা এদেশে অতি অল্পই হইয়াছে। চন্দ্র নাথ বাবু সভাপতির মন্তব্যের পর ধন্যবাদ দিবার জন্য উঠিয়া ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, "আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলাম বলিয়াই কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি নাই।" সভাপতি মহাশয় অনুরোধ করিলেও কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বক্তৃতা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। একজন বক্তৃতাপ্রিয় সাহেববেশ-ধারী যুবক

উঠিয়া দুই চারিটী অসংলগ্ন বাহাদুরীর কথা বলিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই বক্তার কথাগুলি ফুটনোটে তুলিয়া আপন বক্তৃতার সাক্ষেবি আনার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই একটা বক্তৃতার জন্য এদেশে অমর হইবেন। সে দিন এই বক্তৃতা শ্রবণের পর দ্বিজেন্দ্র বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া,প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে ছাপাইতে অনুরোধ করিতে, আমাদের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই আজ এই প্রবন্ধটীকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত দেখিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি—এ প্রবন্ধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের কিছুই নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকট তাঁহার পদধূলি চাই; আর স্বদেশীয় লোকের নিকট এই চাই, বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত বলিয়া ঘৃণা না করিয়া এই পুস্তক থানি একবার পড়েন। বাঙ্গলার সামাজিক বর্ত্তমান ঘোরতর বিপ্লবের দিনে এই পুস্তক প্রভূত কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আমরা সকলকে এই অনুরোধ করিতেছি। এই কাজের জন্য দ্বিজেন্দ্র বাবুর নামে ঘরে ঘরে পূজা হওয়া প্রয়োজন। বিলাত হইলে তাহাই হইত। হা বঙ্গভূমি, তুমি আজও প্রকৃত গুণী ব্যক্তির আদর করিতে শিখিলে না!

২। গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ, এম, এ, প্রণীত, মূল্য ১৷৷০। যে দুই প্রাতস্মরণীয় ব্যক্তির মাহাত্ম্যে ইতালী আজ স্বাধীন, গ্যারিবল্ডী তাহার অন্যতর। ম্যাট্‌সিনি গুরু, গ্যারিবল্ডী শিষ্য। ম্যাট্‌সিনি দেবতা, গ্যারিবল্ডী বীর। অথবা ম্যাট্‌সিনির হৃদয়-নিহিত প্রেম-জ্যোতি গ্যারিবল্ডিতে প্রতিফলিত হইয়া আজ ইতালীর বর্ত্তমান অতুল শোভা আনয়নে সমর্থ হইয়াছে। ম্যাট্‌সিনির সময়ে ইতালির যে দশা ছিল, ভারতের ঠিক সেই দশা উপস্থিত। কিন্তু দেশ আজ স্বার্থের কুহক-জালে আচ্ছন্ন; কোথায় ম্যাট্‌সিনি, কোথায় বা গ্যারিবল্ডি! এমন স্বার্থ-বিবর্জ্জিত প্রেমাবতারের অভ্যুত্থান ভিন্ন ভারতের আর আশা কোথায়?

যোগেন্দ্র বাবু ভারত-ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া একমহাযজ্ঞের মহা আয়োজন করিতেছেন। ম্যাট্‌সিনি এবং গ্যারিবল্ডির অমূল্য জীবন কাহিনী বাঙ্গলা ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া এই মহাত্মা, এই মৃত দেশের যে কাজ করিলেন, আজ না হইলেও, শতাব্দী পরে তাহার সুফল ফলিবে। মহত্তের কথা শ্রবণ করিলেও মহত্ত্ব জন্মে। কে জানে, গ্যারিবল্ডির বা ম্যাট্‌সিনির জীবনী এদেশে কত মৃত লোকের জীবন দিতে সমর্থ হইবে!

বলিতে চাই অনেক কথা, কিন্তু বলিবার স্থান নাই। যোগেন্দ্র বাবু প্রেমিক—তাই তিনি এই সকল প্রেমিক জীবন লইয়া মাতোয়ারা। যোগেন্দ্র বাবু বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া এই গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন। বন্ধুবান্ধবেরা সে জন্য তাঁহাকে কত তিরস্কার করিতেছেন; কিন্তু এদেশ নিদ্রিত। এমন অমূল্য জিনিসেরও আদর নাই। বলিতে চাই অনেক কথা, কিন্তু বলিলেই বা ফল কি?

যোগেন্দ্র বাবুর ভাষার আর কত প্রশংসা করিব! বীরকাহিনী লিখিবার জন্য যে ভাষার প্রয়োজন, এদেশে তাহা কেবল যোগেন্দ্র বাবুর লেখনীতেই সম্ভবে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেমন উচ্ছ্বাস ও

তেজোপূর্ণ, তেজনই মধুর, তেমনই সরল। পড়িতে পড়িতে কখন শরীর অগ্নিময় হয়, কখনও আবেগে চক্ষের জল পড়ে। এরূপ পুস্তকের আদর না হইলে বুঝিব, এদেশ জাতীয় সমাসমিতির এবং স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে যতই মাতুক, এদেশের উন্নতি বহু শতাব্দীর পশ্চাতে লুক্কায়িত।

অনেকের ধারণা আছে বাঙ্গলা জীবন-চরিত মাত্রেই ইংরাজির অনুবাদ। এই পুস্তক খানি যে তাহা নহে, দেখাইবার জন্য একটী স্থান তুলিয়া দিলাম ঃ—

"ইতিহাস সপ্রমাণ করিয়াছে যে গ্যারিবল্ডীর উদ্দীপনা-বাক্য বিফল হয় নাই। তাঁহার মন্ত্রপ্রভাবে ঐ সকল জাতির অধিকাংশই তুরস্কের অধীনতাশৃঙ্খল চূর্ণীকৃত করিয়া স্বাধীন রাজ্যসকলে পরিণত হইয়াছে। ভাবিলে বোধ হয় যেন উনবিংশ শতাব্দী জগৎ হইতে অধীনতা উঠাইয়া দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) আমেরিকা যে বিপ্লবতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই তরঙ্গমালা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসি রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে সেই তরঙ্গমালা কিছুকাল ধরিয়া সেই দেশকে আলোড়িত করিয়া ক্রমশঃ প্রাচ্যদেশাভিমুখিনী হইতেছে। তরঙ্গমালা 'লোক সাধারণ ও ঈশ্বর' এই অক্ষরাঙ্কিত পতাকা সম্মুখে লইয়া অপ্রতিহতবেগে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ইহার প্রভাবে ইতালি উঠিয়াছে; গ্রীস্ সঞ্জীবিত হইয়াছে; সার্ভিয়া, রাউমিনিয়া প্রভৃতি প্রদেশসকলও স্বাধীন হইয়াছে! ইহার সম্মুখে ইউপীয় মুকুটীগণ ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইয়াছেন। সেই বিরাট পতাকা লইয়া এই বৈপ্লবিক তরঙ্গমালা কখন কোন্ দেশে উপস্থিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এই তরঙ্গমালা আমেরিকা ও ইউরোপের শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চার করিয়াছে! ইহার প্রভাবে আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই লোকতান্ত্রিক শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইতেছে। অল্প দিন হইল প্রকাণ্ড ব্রাজিল্ সাম্রাজ্য সাধারণ তন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এই তরঙ্গমালার গতি স্থির নাই, ইহা কখন প্রাচ্যে, কখন প্রতীচ্যে, কখন উদীচ্যে এবং কখন বা দক্ষিণে ধাবিত হইতেছে। ইহার প্রভাবে অচেতন জগৎ যেন সচেতন হইতেছে! এক প্রকাণ্ড তাড়িত যন্ত্র যেন নিদ্রিত জাতি সকলের স্নায়ু মণ্ডলীতে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিয়া দিতেছে। যাহার নয়ন আছে, সে নয়ন ভরিয়া এই বিশ্বব্যাপী সঞ্জীবন ব্যাপার দেখিয়া জীবন সার্থক করুক! ভাবুক! আর ঘুমাইয়া কেন? এক বার নয়ন মেলিয়া বিশ্বপতির এই অপূর্ব্ব সঞ্জীবন ক্রীড়া পরিদর্শন করিয়া ইহজীবনের সাধ মিটাও! যাহার অদৃষ্টে সম্ভোগ ঘটেনা, তাহার দর্শনেও বাসনা চরিতার্থ করিয়া লওয়া উচিত। উঠ! আর কুম্ভকর্ণের ন্যায় অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকিও না! উঠিয়া একবার নয়ন মেলিয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ!"

গ্যারিবল্ডির মৃত্যু সংবাদে ইতালীর গভীর শোক গ্রন্থকার অতি মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষে অবিরল ধারায় জল পড়ে। ধন্য যোগেন্দ্র বাবুর লেখনী!

মৃত্যু-সুহৃৎ।

(১)
আমি দেখিয়াছি তারে, ফুল মালা গলে,
বসন্তের নব হাসি
উল্লাসে উঠেছে ভাসি,
মল্লিকা মালতী জাতি থোপা থোপা দোলে;
অঙ্গের সুরভী তার
তুলনা মিলেনা আর,
নন্দনে মন্দার মরি, প্রাণ মন ভোলে।
আমি দেখিয়াছি তার ফুল মালা গলে।

(২)
আমি দেখিয়াছি তারে মলয় বাতাস,
তেমনি মধুর ছটা
তেমনি অনন্দ ঘটা
পরাণে তেমনি করে মাথায় উল্লাস,
অতি আস্তে অতি ধীরে,
হাসে, তোষে, চলে, ফিরে,
অনন্তে ছুটিতে ঢালে অমৃত উচ্ছাস,
আমি দেখিয়াছি সেতো মলয় বাতাস।

(৩)
আমি দেখিযাছি তারে শরতেব শশী,
শারদ চাঁদের মত
তারও জোছনা কত,
হাসিয়া মধুরতর সেও পড়ে খসি !
ফুটায়ে বনের ফুল
উছলি নদীর কুল
জীবন মেঘের পাশে সেও থাকে বসি,
আমি দেখিয়াছি তারে শরতের শশী।

(৫)
আমি দেখিয়াছি তারে পূরবী রাগিণী,
সে যখন জাগে যন্ত্রে,
কি জানি কি মোহ মন্ত্রে
নিচল নিথর চিত ঘুমায় অমনি,
সে যেন মধুর উষা,
সে যেন দেবের ভুষা,
সে যেন সুখের সাধ, সোহাগের খনি।
আমি দেখিয়াছি সেতো পূরবী রাগিণী।

(৬)
আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতা ময়,
মমতা মাথান প্রাণ
মুখে মমতার গান,
বড় আদরের কথা কাণে কাণে কয়;
কাছে গেলে মিঠা হাসে
আদরে ডেকে' নে' পাশে,
কেমন কেমন যেন প্রাণ কেড়ে লয়,
আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতা ময় !

(৭)
আমি দেখিয়াছি তারে মহা যোগে রত,
সে এক জ্বলন্ত যোগী
সুখ ভোগে নহে ভোগী,
পোড়ায়েছে নেত্রানলে পাপ রিপু যত,
আশা তার পর-মার্থ
কোথা কিছু নাহি স্বার্থ,
বিশ্ব প্রাণ ধ্যানে যেন আছে অবিরত
দেখেছি সে পুণ্যময়ে মহাদেব মত !

(৮)
নিষ্কাম সন্ন্যাসী সে যে এ মব ধরায়,
তারে তো চেনে না কেহ
করে না আদর স্নেহ,
"আপদ বালাই" বলে ফিরে নাহি চায়,
শত ঘৃণা শত রাগে,
তার হিংসা নাহি জাগে,
সব অত্যাচার সে তো হাসিয়া উড়ায়,
অথচ সে মহাবীর
ভাঙে ভূধরের শির,
ভুদণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড নাশ তার ক্ষমতায়—
দুহাতে সে ভালবাসা জগতে বিলায় !

(৯)
আমি তারে চিনি শুনি, ভালবাসি তা'য়
শুনিলে তাহারি নাম,
উথলে হৃদয় ধাম,
পরাণ শিহরি ওঠে সুধা পড়ে গা'য়,
এক দিন দূরে—দূরে,
অনন্তে, অমর পুরে
নিয়ে যাবে সে আমারে, বলেছে আমায়।
সে আমার কাছে কাছে,
দিন রাত সদা আছে,
পরাণে বেঁধেছি পাছে ফেলে' চলে যায়,
তার নাম মৃত্যু, আমি ভালবাসি তা'য় !

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস মানব-জাতির শিক্ষা ও উন্নতির তিন সহস্র বৎসরের ইতিহাস স্বরূপ। এই ইতিহাস কতিপয় যুগে বিভক্ত। প্রত্যেক যুগ আবার এত দীর্ঘকালব্যাপী যে, অনেক আধুনিক জাতির সমগ্র ইতিহাস তত দীর্ঘকাল-ব্যাপী নহে।

অনেক পণ্ডিতদিগের মতে জগতের অন্য কোন কোন জাতি হিন্দুদিগের তুল্য বা ততোধিক প্রাচীন। খ্রীষ্টের ৩৪ সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার মিসরদেশীয় লোকের সভ্যতার চিরস্থায়ী নিদর্শন রহিয়াছে। আসিয়ার প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বিবেচনা করেন যে, সুমিরো-আকেডীয় জাতির সভ্যতা ততোধিক পুরাতন। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২৪০০ বৎসর হইতে চীনদেশীয় লোকের ইতিহাস রহিয়াছে। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা, ভারতেতিহাস খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ বৎসরের অধিক পুরাতন। বলিয়া এ পর্য্যন্ত মত ব্যক্ত করেন নাই। ভবিষ্যতে সমধিক গবেষণা হইলে এতাধিক পুরাতন বলিয়া প্রমাণিত হওয়া অসম্ভব নহে।

কিন্তু হিন্দুর প্রাচীন ইতিহাস ও অন্যান্য জাতির প্রাচীন ইতিহাসে মহৎ অন্তর। পুরাকালীন মিসরবাসিদের যে hieroglyphic লেখা রহিয়াছে, তাহা হইতে রাজার ও পিরামিড নির্ম্মাণ-কারীদের নাম এবং রাজবংশ ও যুদ্ধ বিবরণ ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারা যায় না। আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের Cuneiform প্রস্তর লিখন হইতেও ততোধিক কিছুই অবগত হওয়া যায় না। এমন কি, চীনের পুরাতন লিখন হইতেও মনুষ্য-জাতির শিক্ষা ও সভ্যতার তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ইতিহাস কোনও প্রকারে জানা যায় না।

ভারতবর্ষের পুরাতন গ্রন্থ সকল সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। কোন কোন বিষয়ে তাহা অসম্পূর্ণ বটে। রাজবংশ, যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ তাহাতে অতি বিরল। কিন্তু সভ্যতার উন্নতি, মনুষ্যের মানসিক শক্তির বিকাশ, এই সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ ধারাবাহিক স্পষ্ট বিবরণ ভারতের পুরাতন গ্রন্থে যে প্রকার পাওয়া যায়, অন্যান্য পুরাতন জাতির ইতিহাসে তদ্রূপ বিবরণের অন্বেষণ করা পণ্ডশ্রম মাত্র। প্রত্যেক যুগের সাহিত্য তৎকালিক হিন্দু জাতির অবস্থার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি স্বরূপ। বোধ হয় যেন ফটোগ্রাফ যন্ত্রেও বাহ্য বস্তুর ততোধিক পরিষ্কার প্রতিকৃতি রক্ষা পায় না। এইরূপে যুগ যুগের যে বিবরণ রহিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন হিন্দু জাতির ত্রিসহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। সেই বিবরণ এরূপ সম্পূর্ণ ও পরিষ্কার যে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অতুল আনন্দ মাত্র,—পরিশ্রম আবশ্যক করে না!

অন্যান্য দেশে ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তর খোদিত হইয়াছে ও বৃক্ষত্বকে নানা বিবরণ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুদিগের ধর্ম্মসঙ্গীত ও গাথা, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সকল হিন্দু জাতির সভ্যতা ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক প্রতিবিম্ব স্বরূপ।

হিন্দুদিগের পুরাতনতম মানসিক ভাব কোন প্রকারে খোদিত হয় নাই। সুতরাং লিখন-পদ্ধতি বশতঃ মানসিক ভাব যে রূপ সংযত হইয়া প্রকাশিত হয়, এই সকল গাথায় তাহার চিহ্ন নাই। তাহাতে পুরাতন হিন্দুজাতির মহৎ হৃদয়ের অবিকৃত, অসংযত, স্বাভাবিক ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তরে খোদিত হইয়া গাথা রক্ষিত হয় নাই বটে, কিন্তু বংশ পরম্পরায় অবিকৃত ভাবে যুগ হইতে যুগান্তরে লোকের স্মৃতি শক্তিতে তাহা আবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। এরূপ অসাধারণ স্মৃতি শক্তি জগতের অন্যান্য দেশে অমানুষিক দৈব শক্তি বলিয়া বোধ হয়।

যাঁহারা ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভার্থ বেদ সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, সেই অনন্ত গৌরবান্বিত ধর্ম্মসঙ্গীত পরম্পরায় ইতিহাস সংগ্রহ করিবার যে রূপ উপকরণ রহিয়াছে, সেরূপ প্রস্তর খোদিত ও বৃক্ষত্বকে লিখিত বিবরণে কদাপি পাওয়া যায় না। পরন্তু যে সকল পণ্ডিতেরা হিন্দুদের ভিন্ন২ যুগের ভিন্ন২ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, এই অনন্ত গ্রন্থ পরম্পরায় দ্বিসহস্র বৎসর-ব্যাপী হিন্দু সভ্যতার আচার, রীতি নীতি, চিন্তাশক্তি, ও আধ্যাত্মিক ভাব সম্পূর্ণ এবং বিশদরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতবর্ষের এরূপ কোন ধারাবাহিক বিশ্বাস-যোগ্য ইতিবৃত্ত নাই যে, তাহা পাঠ করিয়া আধুনিক পাঠক সম্প্রদায় কৌতুহল নিবৃত্তি ও শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। এই বিশ্বাস যে একান্তই ভ্রান্ত, তাহা দেখাইবার জন্যই উপরোক্ত কয়েকটী কথা বলিলাম। প্রাচীন ভারতের ধারাবাহিক বিবরণ রহিয়াছে। উক্ত বিবরণ এরূপ বিশদ ও এরূপ আনন্দজনক যে, তাহা পাঠ করিয়া উত্তরোত্তর কৌতুহল বৃদ্ধি হইতে থাকে। কি উপায়ে একটী প্রতিভান্বিত আর্য্যজাতি ঘটনাচক্রে জগতের অপরাপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অনুকূল প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে স্বীয় সভ্যতা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইতে পারি। যুগের পর যুগে তাঁহারা কি কিরূপ মানসিক শক্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কি প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতি ও বিকাশ লাভ করিয়াছিলেন, কি রূপে সমগ্র ভারতে অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রাজনীতি বিস্তার ও সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, পাঠ করিয়া ক্রমশঃ কৌতুহল বৃদ্ধি হইতে থাকে। হিন্দু সভ্যতার এই বিস্ময়কর গল্প বিষ্ণু শর্ম্মার গল্প হইতেও কৌতুহল-জনক, রাজমহিষী শাহারজাদীর হৃদয়গ্রাহী উপন্যাসসমূহ হইতেও হৃদয়গ্রাহী।

কিন্তু এই আনন্দজনক হিন্দু ইতিহাসে বিষাদের কথাও আছে। আমাদিগের প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করিব,—আমাদিগের প্রাচীন অভাব গুলিও স্মরণ করিয়া এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিব। যাঁহারা দোষ গুণ উভয় দেখিতে অক্ষম, তাঁহারা যেন ঐতিহাসিক লেখনী কখনও হস্তে গ্রহণ না করেন।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতের পুরাতন ইতিহাস কতিপয় যুগে বিভক্ত, এবং ইহার প্রতি যুগই বহুকালব্যাপী। এই সকল ঐতিহাসিক যুগ এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই উপক্রমণিকা

ভাগে প্রদত্ত হইতেছে। ইহা হইতে পাঠকেরা ভারত-ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন যুগ সমূহের কতকটা আভাস পাইবেন, এবং যথা স্থানে বর্ণিত বিষয় সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রথম যুগ।

প্রথম যুগে আর্য্য হিন্দুগণ সিন্ধু নদী তীরে বাস করিতেন; অমূল্য ঋগ্বেদ সংহিতায় আমরা এই যুগের বিবরণ প্রাপ্ত হই। এই অমূল্য গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্যেরা সিন্ধু এবং তাহার পঞ্চ শাখার নিকটবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া তথায় বাস স্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু শতদ্রুর প্রাচ্য দেশ এই সময়ে তাহাদের এক প্রকার অজ্ঞাত ছিল। তেজ ও জাতীয়-দর্পে পরিপূর্ণ, জাতীয় জীবনে উৎফুল্ল, যুদ্ধাদিতে অনুরক্ত এবং শারীরিক পরিশ্রমে আগ্রহান্বিত হইয়া জয়শালী হিন্দু আর্য্য-জাতি পঞ্চনদ তীরে বাস করিতে লাগিলেন। গোধন, গোচর এবং অন্যান্য সম্পত্তি লাভে তাঁহাদের মহা আনন্দ। অনার্য্য "দস্যু" জাতিগণ বিরুদ্ধাচরণ করিল, কিন্তু হিন্দুরা অজেয় বাহু বলে দস্যুদের সমস্ত দেশ জয় করিয়া তাহাতে নূতন অধিকার সংস্থাপন করিলেন। আদিম নিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিত্য নূতন রাজ্য অধিকার করিতে করিতে এই যুগ নিঃশেষিত হইল। আর্য্যেরা এই সকল জয় লাভের কথা সগর্ব্বে ঋক্‌বেদ মন্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং দেবতাদের নিকট অধিকতর ধন ও নূতনতর অধিকারের জন্য প্রার্থনা এবং দস্যুদের বিনাশের জন্য যাচ্ঞা করিয়াছেন। প্রকৃতিতে যাহা কিছু উজ্জ্বল, চিত্ত-মোহনকারী ও গৌরবযুক্ত, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া হিন্দুগণ তাঁহাদের পূজা প্রদান এবং তাঁহাদের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য যে, সমস্ত আর্য্য সম্প্রদায় তখন একজাতি ভুক্ত ছিলেন। আর্য্যদের মধ্যে কোন জাতি-বিচার ছিলনা বটে, কিন্তু আর্য্য, অনার্য্য জাতি বিচার ছিল। যাজন, কৃষি, যুদ্ধাদি জীবিকা-ভেদজনক বর্ণবিচার তখন সমাজে প্রবেশ করে নাই। বহু-ক্ষেত্রের তেজস্বী অধিপতি একদিকে স্বহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ ও গোচারণ করিতেন; আবার বাহুবলে স্বগ্রাম রক্ষা করিয়া দস্যুদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে সাগ্রহে বহির্গত হইতেন; গৃহে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহারাই তেজস্বী মন্ত্র প্রণয়ন পূর্ব্বক ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিতেন। তখন না ছিল দেবমূর্ত্তি, না ছিল দেবমন্দির। গৃহস্থ মাত্রেই স্বগৃহে অগ্নিস্থাপন করিয়া তাহাতে দুগ্ধ, পিষ্টক, সোমরস উৎসর্গ করিয়া দ্যুতিমান দেবতার নিকট ধন, জন, দেহবল এবং সমৃদ্ধি প্রার্থনা করিতেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তিরাই রাজা ছিলেন। ঋত্বিক রাখিয়া তাঁহারা যজ্ঞ ও বেদপাঠ করাইতেন বটে, কিন্তু তখন বংশানুক্রমে রাজা বা পুরোহিতের প্রথা প্রচলিত হয় নাই।

আর্য্যেরা কোন্ সময়ে এইরূপ পঞ্চনদ অধিকার করিয়া ছিলেন? শ্রীযুক্ত কোলব্রুক ইউরোপীয় সমাজে প্রথমে বেদের একটী বিবরণ প্রচার করেন। তাঁহার মতে খ্রীষ্টাব্দের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বেদ মণ্ডলাদি আকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। বেদবিৎ পণ্ডিতেরা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, ন্যূনাধিক ৫০০ কি ৬০০ বৎসরে

হিন্দু আর্য্যগণ সিন্ধু ও পঞ্চনদ সন্নিহিত প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়া তাহাতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ হইতে ১৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিক যুগ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। এই মত এক্ষণে প্রায় সর্ব্ব পণ্ডিত-সম্মত। ভট্ট মোক্ষমূলর তদীয় নূতনতম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বেদ প্রণীত হইয়াছিল। অধ্যাপক ওয়েবর বলেন, সিন্ধু হইতে গণ্ডকী পর্য্যন্ত ভূভাগ পরাজয়, অধিকার ও কর্ষণায়ত্ত করিয়া হিন্দুত্ব সংস্থাপন করিতে সহস্র বৎসর (পূঃ খ্রীঃ ১৫০০—৫০০) প্রয়োজন হইয়া থাকিবে। অধ্যাপক হুইট্‌নী খ্রীষ্টের ২০০০ হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ঋক্‌বেদ মন্ত্র প্রণয়নের সময় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিতবর মার্টিন হগ খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ২০০০ হইতে ১৪০০ বৎসর পর্য্যান্ত ঋক্‌বেদ প্রণয়ন সময় অবধারণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য বেদবিদ্ পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ হইতে ১৪০০ অব্দ মধ্যে ঋক্ প্রণীত হইয়া থাকিবে, এইটী বহু পণ্ডিত-সম্মত মত। এই কালকে আমরা বৈদিক-যুগ বলিয়া ব্যাখ্যাত করিব।

দ্বিতীয় যুগ।

হিন্দু আর্য্যেরা একবার শতদ্রুতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মর্ষি (গাঙ্গ্য) প্রদেশ প্রবেশ করিতে বিলম্ব করেন নাই। ঋক্‌বেদে গঙ্গা যমুনার নাম উল্লেখ নাই বলিলেও হয়। তাহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, যদিও কোন কোন তেজস্বী ব্যক্তি পঞ্চনদ পরিত্যাগ করিয়া দূরতর গাঙ্গ্য প্রদেশে অধিকার স্থাপন করিয়া থাকিবেন, তথাপি বৈদিক যুগে গঙ্গা যমুনার কথা সাধারণতঃ পঞ্চনদস্থ আর্য্যদের বিশেষরূপে বিদিত ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় যুগে কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে আধুনিক ত্রিহুত পর্য্যন্ত সমগ্র গাঙ্গ্য প্রদেশ হিন্দু অধিকৃত হইয়াছিল। অবিলম্বে ঐ গাঙ্গ্য প্রদেশে অনেক মহাবল পরাক্রান্ত জাতির প্রাদুর্ভাব হয়, এবং সেই সেই জাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দর্শন সাহিত্যাদির চর্চ্চা হইয়া হিন্দু সভ্যতা ও আচার ব্যবহারে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়।

গাঙ্গ্য প্রদেশে যে সকল জাতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বিখ্যাততম জাতি সমূহের কীর্ত্তি কলাপ হিন্দুদের মহা কাব্যাদিতে বিবৃত রহিয়াছে। আধুনিক দিল্লীর চতুঃপার্শ্বে কুরুজাতির রাজ্য সংস্থাপিত হয়। তাহার পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে আধুনিক কানোজের চতুঃপার্শ্বে পঞ্চাল জাতির রাজ্য ছিল। গঙ্গা ও গণ্ডকীর অন্তর্গত স্থানে আধুনিক অযোধ্যা প্রদেশে কোশল রাজ্য সন্নিবেশিত ছিল। গণ্ডকীর পূর্ব্ব পারে আধুনিক মিথিলা বা ত্রিহুত প্রদেশে বিদেহ রাজ্য, এবং আধুনিক বারাণসীর নিকটে কাশী রাজ্য সংস্থাপিত হয়। দ্বিতীয় যুগে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির উদ্ভব হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল, তাঁহারাই তৎকালীন জাতি মধ্যে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

কুরু পাঞ্চালেরা যমুনা গঙ্গা অন্তর্গত প্রদেশে রাজ্য সংস্থাপিত করিয়া জাতীয় তেজস্বিতার যথেষ্ট পরিচয় দেন। তাঁহাদেরই যুদ্ধ বিবরণ হিন্দুদিগের প্রথম মহাকাব্য অর্থাৎ মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতের বর্ত্তমান আকার যে প্রকার, তাহাতে

পরবর্ত্তী যুগ সমূহের অনেক রচনা যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি গাঙ্গ্য প্রদেশের প্রথম যোদ্ধৃজাতিরা কিরূপ সাহসী, সত্যপরায়ণ, তেজস্বী ও প্রতাপান্বিত এবং স্বাধিকার রক্ষার বিষয়ে কিরূপ জাগরুক ছিলেন, মহাভারত পাঠে তাহা স্পষ্ট অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এই সুরম্য গাঙ্গ্য প্রদেশে কয়েক শতাব্দী বাস করিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে একদিকে যেমন বিদ্যাচর্চ্চা ও সামাজিক নীতি পরিবর্দ্ধিত হইল, অন্যদিকে তাঁহাদিগের সাহস, তেজস্বিতা প্রভৃতি বীরগুণ সকল হ্রাস পাইল। যতই নিম্নতর প্রদেশ সমূহে বসবাস করিতে লাগিলেন, ততই যোদ্ধৃ জাতির লক্ষণ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। বিদেহ ও কাশী রাজসভা পণ্ডিতে ও বিদ্বানে পরিপূর্ণ; কিন্তু তৎকালীন গ্রন্থে পূর্ব্ববৎ বীরত্বের লক্ষণ পাওয়া যায় না। কোশলরাজ্যের লোকেরা সুমার্জ্জিত জাতি বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়; রামায়ণে সামাজিক ও পারিবারিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার যথেষ্ট দেখা যায়; পৌরহিত্যের প্রাধান্য হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ লক্ষিত হয়, এবং ধর্ম্মের বাহ্যিক আচার নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধারও নিদর্শন দৃষ্ট হয়, কিন্তু মহাভারতে যে সাহস, বীর্য্য, তেজস্বিতা, এবং স্বাধিকার রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা লক্ষিত হয়, রামায়ণে তাহা ততদূর দৃষ্ট হয় না।

হিন্দুদের ক্রমশঃ সাহস হ্রাস ও তেজোহীনতা নিবন্ধন আধ্যাত্মিক ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হইল। ধর্ম্ম প্রণালীর কতকটা পরিবর্ত্তন হইল। যে সকল তেজস্বী ও সরল ঋক্ উচ্চারণ করিয়া পঞ্চনদের বিজয়ী বীরেরা দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন, তাহা নিস্তেজ কর্ম্মকাণ্ড-প্রিয় গাঙ্গ্য প্রদেশের হিন্দুদের মনঃপূত হইল না। এক্ষণে বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞ পদ্ধতি পূর্ব্বকার অতি সহজ মন্ত্র পাঠ ও সরল যজ্ঞ নিয়মকে যেন আবৃত করিয়া ফেলিল। পুরোহিতের সংখ্যা ও প্রতাপ বৃদ্ধি হইল, এবং অবশেষে বংশানুক্রমে পৌরহিত্যের নিয়ম হইয়া ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি হইল।

পঞ্চনদে থাকিয়া যোদ্ধৃ পুরুষেরা কৃষি ও গোচারণে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু গাঙ্গ্য প্রদেশে যোদ্ধা ও নরপতিদিগের সৈন্য, আড়ম্বর এবং ভোগ বিলাস প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। তাঁহারাও সাধারণ লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক বংশানুক্রমিক ভিন্ন জাতি হইয়া পড়িলেন। ঋক্ বেদে যাহাদিগকে বৈশ্য বা বিশ্ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, যাহাদের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে হিন্দু জাতি গঠিত, পঞ্চনদে থাকিতে তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের যে সাহস বীর্য্য ছিল, এক্ষণে তাহারা সে বীর্য্য ও সামাজিক স্বাধীনতা হারাইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিল। অধীনতা ও অধঃপাতে যাওয়া, একই কথা। ইহার পর হিন্দুরাজ্য সমূহে রাজা ও যোদ্ধাদিগের বীর্য্য লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রকৃতিপুঞ্জের ও জন সাধারণের বীর্য্য, ক্ষমতা বা রাজনৈতিক প্রভাব আর লক্ষিত হয় না। অবশেষে যে সকল অনার্য্যেরা বিজিত হইয়া আর্য্যদের আচার নীতি অনুকরণ করিল, তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইল। কিন্তু কোনও প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান বা শাস্ত্রের জ্ঞান লাভে তাহাদের অধিকার জন্মিল না।

দ্বিতীয় যুগে এই প্রকারে জন্মগত

জাতি প্রণালীর সৃষ্টি হইল। লোক সাধারণের দুর্ব্বলতা ও নির্জ্জীবতাই এই জাতি সৃষ্টির কারণ, এবং এই জাতি সৃষ্টি হইতে সেই দুর্ব্বলতা ও নির্জ্জীবতা আরো দৃঢ়তর হইয়াছে।

দ্বিতীয় যুগে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন, এবং লোক সাধারণ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ নামধারী ব্যক্তিরপদানত হইল। এই যুগের অবসান কালে ক্ষত্রিয়দিগের মনের ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হইল। তখন, দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের কষ্টবহ অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিতে, এবং বিদ্যা, বেদ-পরায়ণতা ও ধর্ম্মজ্ঞানে ব্রাহ্মণদের সমকক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা যে সকল অর্থশূন্য কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বর সৃজন করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষত্রিয়দের অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সত্য ও ধর্ম্ম নির্ণয়ের নূতন পথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। চেষ্টা নিষ্ফল হইল। ব্রাহ্মণের প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিল।

যে যুগে আর্য্যেরা গাঙ্গ্য প্রদেশ অধিকার করেন, তখনই বেদ চতুষ্টয় সংগৃহীত ও মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হয়। যে প্রণালীতে যজ্ঞাদি করিতে হইবে, তাহার সবিস্তার বিবরণ সম্বলিত "ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থাবলী প্রণীত হয়। এই সকল সারশূন্য এবং সুবিস্তৃত গ্রন্থ হইতে উক্ত যুগের পুরোহিতের প্রাধান্য লাভ চেষ্টা ও জন সাধারণের পৌরুষ-হীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংসার হইতে অরণ্যে গমন ইতিপূর্ব্বে অজ্ঞাত ছিল। এই যুগে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ব্রাহ্মণ সমূহের শেষাংশের নাম "আরণ্যক"। তাহাতে বানপ্রস্থ ধর্ম্মের বিবরণ রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের তেজস্বী চিন্তাশক্তির ফল উপনিষদ্ নামে পরিচিত, তাহা এই সময়কার সর্ব্ব শেষ গ্রন্থের মধ্যে গণ্য। এই সকল বেদ-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদ্ মিলিত হইয়া হিন্দুদের শ্রুতি শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত হোরেস্ উইলসন্ বলিয়াছেন যে, ৫০০ বৎসরের অধিক কালে দ্বিতীয় যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন পরিপক্ব হইয়া থাকিবে। এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। এই যুগে শতদ্রু হইতে ত্রিহুত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ গাঙ্গ্য প্রদেশে আর্য্য রাজ্য বিস্তৃত হয়, আর্য্য সভ্যতা ও আচার ব্যবহার প্রচারিত হয়। অনেক পরাক্রমশালী রাজবংশের উদয়, হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ডের বিস্তর আড়ম্বর বৃদ্ধি, বংশানু-ক্রমিক জাতীয় নিয়ম হইয়া সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তন, পুরোহিত সম্প্রদায়ের আধিপত্য সংস্থাপন ও দৃঢ়ীকরণ দ্বারা ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের প্রতিবাদ, এবং বিবিধ মত ও চিন্তা-সম্বলিত ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদাদি গ্রন্থ সমূহের সৃষ্টি হয়। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১৪০০ হইতে ১০০০ অব্দ পর্য্যন্ত এই যুগের ব্যাপ্তিকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় যুগকাল নির্ণয় সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তৎ সম্বন্ধে এই উপক্রমণিকা ভাগে দুই একটী কথা বলিলে বাহুল্য হইবে না। এই যুগের সর্ব্ব প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা কুরু পাঞ্চালদিগের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ মহাভারতে বিবৃত হইয়াছে। এই যুগের সর্ব্ব প্রধান সাহিত্য বিষয়ক ঘটনা বেদ সংগ্রহ। লোক পরম্পরাগত জনশ্রুতি এবং মহাভারতেরও

উক্তি যে, বেদ-সংগ্রহকারক দ্বৈপায়ন ব্যাস কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধের সমকালীন লোক।

জনশ্রুতি আছে, যখন বেদ সংগ্রহ করা হয়, তখন দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ন অবস্থিতি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বেণ্টলী এবং আর্কডিকন প্রাট নামক দুই জন ইউরোপীয় জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন, যে, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১১৮১ অব্দে এই প্রকার অয়ন নির্ণয় হইয়া থাকিবে।

এক পুরুষে এবং এক ব্যক্তি কর্ত্তৃকই যে বেদ সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা না হইতে পারে। অনেক বেদবিদ্ পণ্ডিতের সহায়তায় এবং সম্ভবতঃ একাধিক পুরুষে ঐ সংগ্রহ কার্য্য সমাপ্ত হইয়া থাকিবে। অতএব যদি ১১৮১ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে বেদ সংগ্রহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া অয়ন নির্দ্ধারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী বেদ সংগ্রহ সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আমরাও দ্বিতীয় যুগের কাল এই সময় নিরূপণ করিয়াছি।

এখন কুরু পাঞ্চালদিগের যুদ্ধের কথা বলা হইতেছে। ভারতবর্ষের নানা রাজবংশের ইতিহাস পুরাণে এই প্রাচীন যুদ্ধের কথার উল্লেখ আছে, এবং এই সকল পুরাণের কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্যও বটে। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং মগধ বংশের ইতিহাস হইতে অবগত হই যে, বুদ্ধ এবং কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধের মধ্যে ৩৫ জন রাজা রাজপদ পাইয়াছিলেন। প্রত্যেক রাজার রাজত্ব সময় ২০ বৎসর হিসাব করিলে, এই গণনায় খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যুদ্ধের সময় নির্ণীত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা জানি যে আলেকজাণ্ডর ভারতবর্ষে আসিবার অনুমান ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৩৭০ পূর্ব্ব খ্রীষ্টাব্দে নন্দ রাজা মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে যে, নন্দের ১০১৫ বৎসর পূর্ব্বে পরীক্ষিত জন্ম গ্রহণ করেন। এই হিসাবে পরীক্ষিৎ ১৩৮৫ খ্রীঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং অনুমান ১৪০০ পূঃ খ্রীঃ অব্দে কুরু-পাঞ্চালদিগের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

তৃতীয়তঃ, আমরা জানি যে খ্রীষ্টের পর প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা কনিষ্ক কাশ্মিরে রাজত্ব করিতেন, এবং তদীয় উত্তরাধিকারী অভিমন্যু সম্ভবতঃ উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাশ্মীর ইতিহাস-লেখক বলেন, কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধ ও অভিমন্যুর রাজত্ব এতদুভয় মধ্যে ৫২ নৃপতি ১২৬৬ অব্দ রাজত্ব করেন। এই গণনানুসারে ও খ্রীষ্টের পূর্ব্বে দ্বাদশ শতাব্দীতে মহাভারতীয় যুদ্ধের কাল নির্ণয় হয়।

যে সকল সন তারিখ প্রদত্ত হইল, পাঠকদিগকে তাহা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বলিনা। তবে পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণ হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে অনুমান ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কুরু পাঞ্চালদিগের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। আমরা ত দ্বিতীয় যুগের কাল এই সময় নিরূপণ করিয়াছি। ১৪০০ হইতে ১০০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় যুগ।

প্রথম যুগকে আমরা বৈদিক যুগ বলিয়াছি। দ্বিতীয় যুগকে আমরা মহাকাব্যের যুগ বলিতে পারি। কারণ মহাভারত ও রামায়ণ লিখিত কুরু-পাঞ্চাল

ও কোশল-বিদেহ জাতিগণ এই সময়ে গাঙ্গ্যপ্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন।

তৃতীয় যুগ।

তৃতীয় যুগ হিন্দু ইতিহাসের মহাপ্রতিভান্বিত ও গৌরবপূর্ণ সময়। এই সময়ে আর্য্যেরা গাঙ্গ্যপ্রদেশ বা মধ্যদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তৎ তৎ দেশে স্বাধিকার বিস্তার করিলেন, এবং হিন্দু আচার নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়া আসমুদ্র ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করিলেন। দ্বিতীয় যুগে মগধ দেশে হিন্দু সভ্যতা সম্যক-রূপে প্রচলিত হয় নাই;—তৃতীয় যুগে এই মগধ দেশই নূতন সভ্যতায় বলিষ্ঠ হইয়া যে কোশল বিদেহ প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য জয় করিয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে অপ্রতিহত ও অদ্বিতীয় গৌরব সংস্থাপন করিল। সকল গর্ব্বিতজাতি কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধে মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং যে সকল প্রাচীনতর জাতি সিন্ধুতীরে আর্য্য সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎ তৎ বংশীয়েরাও এক্ষণে দুর্দ্দমনীয় মগধ রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিলেন। সেকাণ্ডার সাহের সমসাময়িক চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব হইতে বিহার পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্ত মগধ শাসনাধীন করিলেন; এবং তদীয় পৌত্র মহাবীর অশোক রাজা প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ একছত্র করিলেন। অশোকের সময়ে তৃতীয় যুগের শেষ এবং চতুর্থ বা বৌদ্ধ যুগের আরম্ভ।

দক্ষিণ প্রদেশসমূহে যে সকল রাজত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা অধিকতর যশস্বী হইয়াছিল। তন্মধ্যে অন্ধ্রবংশ দাক্ষিণাত্যে প্রতাপান্বিত হইয়া নানা প্রকার ধর্ম্ম শাস্ত্রের সৃষ্টি করিলেন এবং তৎপরে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন। তদধিক দক্ষিণ প্রদেশে আর্য্যেরা প্রাচীন দ্রাবিড় জাতির সংঘর্ষে আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে কয়েকটী রাজত্বের সৃষ্টিপাত করিলেন। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে তৃতীয় শতাব্দীতে চোল, চের ও পাণ্ড্যরাজ্যের প্রাদুর্ভাব হয়।

পশ্চিমে আরব সমুদ্রের উপকূলে সৌরাষ্ট্র নামে একটী আর্য্য রাজ্য সংস্থাপিত হইল। পরন্তু সমুদ্রের অপর তীরস্থ লঙ্কা আবিষ্কৃত হইলে তাহা হিন্দু বণিকদিগের বাণিজ্যের একটী প্রধান বন্দর হইল; অবশেষে রাজাধিরাজ অশোকের পুত্র লঙ্কায় আগমন করিয়া লঙ্কাবাসীদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করাইলেন।

একদিকে রাজ্যবিস্তার, অন্যদিকে অসংখ্য শাস্ত্র সঙ্কলন, এই যুগের কার্য্য ও সাহসিকত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ শব্দাড়ম্বর পূর্ণ ও সুবিস্তীর্ণ কর্ম্মকাণ্ড প্রণালী সংক্ষিপ্ত হইয়া "সূত্র" সকল রচিত হইল। এই রূপে উত্তরে দক্ষিণে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সূত্রপ্রণয়ন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত নিরুক্ত, ছন্দঃ, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিদ্যার সবিশেষ চর্চ্চা হইতে লাগিত। এই সময়ে যাস্ক নিরুক্ত প্রণয়ন এবং পাণিনি ব্যাকরণ রচনা করিলেন। যে প্রণালীতে যজ্ঞীয় বেদী পরিমাপ ও প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহার নিয়ম নির্দ্ধারণ হইতে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রতত্ত্ব শাস্ত্রের (geometry) আবিষ্কার হইল।

উপনিষৎ নামক গ্রন্থে যে সমস্ত গভীর আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার ও চরম ফল আমরা এই তৃতীয় যুগে দেখিতে পাই। খ্রীষ্টাব্দের ৭০০ কি ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে কপিল আবির্ভূত হইয়া সাংখ্যদর্শন প্রচার করি-

রেন। পরে খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতম বুদ্ধ এই সাংখ্যদর্শনের কঠোর ন্যায় যুক্তির সহিত তাঁহার হৃদয়ের বিশ্বব্যাপী দয়া এবং মনুষ্য জাতির জন্য প্রীতি যোগ করিয়া যে ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, অদ্যাপি পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোকে সেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মে আত্মার তৃপ্তি লাভ করিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম দীনদরিদ্রের মধ্যে অতি মন্দগতিতে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। কারণ বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণদিগের প্রবর্ত্তিত জাতিভেদ প্রণালীর বিরোধী। খ্রীষ্টের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে অশোক রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, এবং সেই সময় হইতে ঐ ধর্ম্ম শীঘ্রই সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। সুতরাং খ্রীষ্টীয় পূর্ব্ব ৩য় শতাব্দী হইতে চতুর্থযুগ বা বৌদ্ধ যুগের আরম্ভ।

পাঠকবর্গ দেখিতে পাইলেন, তৃতীয় যুগের কাল নির্ণয় করা কষ্টকর নহে। মহারাজা অশোক খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২৬০ অব্দে সম্রাট্ হয়েন এবং ২৪২ অব্দে ধর্ম্মগ্রন্থ নিরূপণ করিবার জন্য প্রকাণ্ড বৌদ্ধসভা আহ্বান করেন। ইতিপূর্ব্বে গৌতমের মৃত্যুবর্ষে ৪৭৭ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে এবং তাহার শত বৎসর পরে অর্থাৎ ৩৭৭ অব্দে এইরূপ দুই সভা আহূত হয়। কিন্তু অশোক ২৪২ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে যে ধর্ম্মসভা আহ্বান করিলেন, তদ্দ্বারা নিরূপিত ধর্ম্ম গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষে, এবং ভারতসীমা অতিক্রম করিয়া প্রচারিত হইল। সুতরাং ২৪২ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় যুগের শেষ ও চতুর্থ যুগের আরম্ভ বলিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, খ্রীষ্টের পূর্ব্বে দশম শতাব্দীতে দ্বিতীয় যুগের শেষ। সুতরাং দশম শতাব্দী হইতে ২৪২ অব্দ পর্য্যন্ত তৃতীয় যুগের ব্যাপ্তিকাল। এই কালে কপিলাদি দার্শনিকগণ হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন; অতএব আমরা এই কালকে দার্শনিক যুগ বলিতে পারি।

চতুর্থ যুগ

মহারাজ অশোক সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একাধিপতি ছিলেন ও গুর্জ্জর হইতে উৎকল পর্য্যন্ত আসমুদ্র ভারতবর্ষের গিরিকন্দরে, প্রস্তর স্তম্ভে ও পর্ব্বতশৈলে বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশ-বাণী প্রচার করিলেন। তিনি জীবহিংসা নিবারণ করিলেন; সুবিস্তৃত রাজ্য মধ্যে মনুষ্য-পালিত পশুর জন্য ঔষধ ও পথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন; পিতা মাতা ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা নিরূপণ করিয়া জ্ঞাপন করিলেন, এবং দেশ হইতে দেশান্তরে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত দীন ধনী, সকলের নিকট বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রচারকদিগকে প্রেরণ করিলেন। অশোক রাজার প্রস্তর-খোদিত অনুশাসন হইতে আমরা অবগত হই যে, তিনি সিরিয়া, মিশর, মাসিডন, সাইরিণী ও ইপাইরস দেশের গ্রীক রাজাদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সেই সেই দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। অশোকের ধর্ম্মপ্রচারকগণ সিরিয়া ও পালেষ্টিন দেশে যে ধর্ম্মনীতি প্রচার করেন, সেই ধর্ম্মনীতি হইতেই তাহার দুই শত বৎসর পরে যিশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মনীতির উৎপত্তি।

খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৩২০ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের সময় যে মৌর্য্যবংশের উদয় হয়, অশোকের পর সে বংশ অনেক দিন তিষ্ঠিতে পারে

নাই। ইহার পরে শুঙ্গ ও কন্ব নামে অন্যান্য দুই বংশের উদয় হয়। তাহার পরই অন্ধ্র-জাতির অভ্যুদয়। অন্ধ্র বংশীয়েরা দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া মগধ হস্তগত করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে প্রভুত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক ৪৫০ বর্ষ রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২৬ অব্দ হইতে খ্রীষ্টাব্দ ৪৩০ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব কাল। তাঁহারা প্রায় সকলেই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বী ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এই বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানি উভয় সমভাবে চলিতেছিল। ধর্ম্ম-নির্য্যাতন করা অবিদিত ছিল বলিলে হয়। অন্ধ্র-বংশের পর গুপ্তবংশের উদয় হয়; তাঁহারা অনেকেই হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন; কিন্তু বৌদ্ধদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধমঠ সংস্থাপনের জন্য তাঁহারা ভূম্যাদি দান করিয়া গিয়াছেন।

ইতি মধ্যে বিদেশীয় জাতিরা ক্রমাগত ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তুরাণীয় আক্রমণকারীদের তাড়না পাইয়া বাক্‌ত্রিয়ার গ্রীকেরা খ্রীষ্টের পূর্ব্বে দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ আক্রমণ, তথায় রাজ্য স্থাপন, ও গ্রীক সভ্যতা প্রচার করিয়া ছিলেন। তৎপরে ইউ-চি বংশীয় তুরাণী জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া কাশ্মীরে পদার্পণ করেন। কাশ্মীরাধিপতি কনিষ্ক ইউ চি বংশীয় নৃপতি ছিলেন; তিনি গুজরাট ও আগ্রা হইতে কাবুল ও কাশগর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মবালম্বী ছিলেন এবং কাশ্মীরে উত্তর দেশীয় বৌদ্ধদের এক বৃহৎ সভা আহ্বান করেন। ইহার পর কাম্বোজ এবং কাবুলের অন্যান্য জাতি বহুসংখ্যায় ভারতবর্ষ প্রবেশ করে; এবং তাহাদের পদানুসরণ পূর্ব্বক অসংখ্য হূন জাতীয়েরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া খ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে পশ্চিমভারতবর্ষে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে। সম্রাট অশোকের পর ক্রমাগত ছয় কি সাত শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিদেশীয়গণ প্রবেশ করিতে লাগিল। কিন্তু ভারতাক্রমণকারীরা সকলেই ভারতে অধিকার লাভ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় লোকের মধ্যে পরিগণিত হইয়া গেল।

সম্রাট অশোকের দিন হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধদের চৈত্য, স্তূপ ও বিহার ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধ চৈত্যাদি আর দৃষ্ট হয় না। ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম অর্থাৎ পৌরাণিক ধর্ম্মের আবির্ভাব হইতে লাগিল, এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দু মন্দির নির্ম্মিত হইতে লাগিল। অতএব আমরা অশোকের সময় হইতে খ্রীষ্টের পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত চতুর্থ অর্থাৎ বৌদ্ধ যুগ বলিব।

অশোকের আহুত সভা যে ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করেন, বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে তাহাই সর্ব্বপ্রধান মহামূল্যবান। ত্রিপিটক নামক এই গ্রন্থ পালি অক্ষরে লিখিত, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের আদি ইতিহাসের উৎকৃষ্টতম উপকরণ।

বৌদ্ধ যুগের হিন্দু ধর্ম্ম প্রণালী ও চিন্তা-শক্তি মনুসংহিতায় আবদ্ধ রহিয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্ম সূত্র সংগ্রহ করিয়া মনুসংহিতা লিখিত। কিন্তু ধর্ম্মসূত্র সকল বিভিন্ন মতাবলম্বী ঋষিদের কৃত। মনুর সংহিতায় এই বিভেদের কোনই পরিচয় নাই।

তিনি সমগ্র আর্য্যজাতির জন্য সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন। যখন মনুসংহিতা প্রণয়ন হয়, তখনও পৈতৃক ব্যবসায় অনুসারে হিন্দুরা নানা জাতিতে বিভক্ত হয়েন নাই। পুরোহিত ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন সমগ্র হিন্দুজাতি বৈশ্য নামে পরিচিত ছিলেন। মনু যে কয়েকটী শঙ্কর বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা চণ্ডাল প্রভৃতি অনার্য্য জাতি। কামার, কুমার, স্বর্ণকার, তন্তুবায় প্রভৃতি লোকদিগকে মনু বর্ণশঙ্কর বলেন নাই,—ইহারা বৈশ্য। আধুনিক ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলকেই বর্ণশঙ্কর বা শূদ্র বলিতে বড়ই ব্যস্ত!

পঞ্চম যুগ।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান সময়কে হিন্দু ইতিহাসের পঞ্চম যুগ বা পৌরাণিক যুগ বলা যায়। খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ হইতে ১২০০ অব্দ অর্থাৎ মুসলমান কর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার পর্য্যন্ত এই যুগের ব্যাপ্তিকাল।

এই সময়ে অনেক শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই বিদেশীয়েরা ভারত আক্রমণ করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অবশেষে এই দুঃখের প্রতিশোধ করিবার উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব হইল। সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অদ্বিতীয় সম্রাট্ উজ্জয়িনীর নরপতি মহাত্মা বিক্রমাদিত্য কোরুর যুদ্ধ ক্ষেত্রে শকাদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বাহির করিয়া দিলেন, এবং হিন্দুর স্বাধীনতা স্থাপন করিলেন। তাঁহার আনুকূল্যে হিন্দুর প্রতিভা ও বিদ্যার চর্চ্চা নবজীবন পাইল ও নূতন আকারে হিন্দুধর্ম্ম অবির্ভূত হইল।

বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ২৫০ বৎসর অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ হইতে ৭৫০ অব্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের মহাগৌরবান্বিত যুগ। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আদৃত গ্রন্থ কাব্য সমুদায় এই সময়ে লিখিত হয়। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাসদ হইয়া অনুপম কাব্য নাটক রচনা করেন। অভিধান-প্রণেতা অমরসিংহ নব রত্নের এক রত্ন ছিলেন। ভারবি কালিদাসের সমসাময়িক ছিলেন, অথবা কালিদাসের অনতিপরে আবির্ভূত হয়েন। বিক্রমাদিত্যের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় শীলাদিত্য ৬১০ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, এবং রত্নাবলী নাটক তাহার আমাত্যবর্গের মধ্যে কাহারও রচিত হইবে ও তাঁহার নামে পরিচিত। দ্বিতীয় শীলাদিত্যের সময় দশকুমার চরিত রচয়িতা দণ্ডী জীবিত ছিলেন। কাদম্বরী-প্রণেতা বাণভট্ট তাঁহার সভাসদ মধ্যে গণ্য ছিলেন। বাসবদত্তা-রচয়িতা সুবন্ধু বাণভট্টের সমসাময়িক লোক। এই রাজার রাজত্ব সময়েই শতক-প্রণেতা ভর্ত্তৃহরি ভট্টিকাব্যরচনা করিয়াছিলেন।

তাহার পর যশোবর্ম্মন্ খ্রীষ্টীয় ৭০০ হইতে ৭৩০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন, সুবিখ্যাত ভবভূতি এই রাজার সময়ে তাঁহার অতুল্য নাটক সমূহ প্রণয়ন করেন। মহাভারত ও রামায়ণ দ্বিতীয় যুগ হইতে অল্পে অল্পে রচিত হইয়া আসিতেছিল, এই যুগেই তাহা পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল। আমরা যে অষ্টাদশ পুরাণ দেখিতেছি, এই যুগেই তাহাও প্রণীত হয়।

সার্দ্ধদ্বিশত কালমধ্যে হিন্দু বিজ্ঞানের আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলিরও উদয় হয়। আর্য্যভট্ট খ্রীষ্টীয় ৪৭৬ অব্দে জন্ম

গ্রহণ করিয়া তদীয় জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার পশ্চাৎ বরাহমিহির জন্মগ্রহণ করিয়া বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে গণ্য হয়েন। খ্রীষ্টীয় ৫৯৮ অব্দে ব্রহ্মগুপ্তের জন্ম; তিনি উপন্যাসক বাণভট্টের সমসাময়িক ছিলেন। বিদ্যার গৌরবে ও বুদ্ধির প্রতিভায় এই সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর সবিশেষ উজ্জ্বল। তাহার পর দ্বিশত বর্ষ ঘোর তমসাচ্ছন্ন। ৭৫০ হইতে ৯৫০ অব্দ পর্য্যন্ত ইতিহাস সম্পূর্ণ নীরব! কোন প্রতাপান্বিত সম্রাট্ কি কোন প্রতিভাশালী কবি, কি কোনও তেজস্বী বিজ্ঞানবেত্তা এই দ্বিশত বর্ষের মধ্যে আবির্ভূত হয়েন নাই।

কিন্তু এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কি প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল, আমরা অন্যান্য উপায়ে তাহার আভাস পাইতেছি। এই যুগে পুরাতন প্রতাপশালী রাজবংশীয়েরা বিলুপ্ত হইল এবং প্রাচীন জাতি সমূহ অধোগতি প্রাপ্ত হইল। ইউরোপে যেরূপ রোম রাজ্যের অধঃপাত হইয়া ফিউডাল রাজন্যবর্গের উদয় হয়, ভারতবর্ষেও সেইরূপ সমুদয় পুরাতন রাজবংশের লোপ হইয়া এক নূতন রাজন্যবর্গের উদয় হইল। তাঁহারা আধুনিক ভারতবর্ষের রাজপুতগণ! খ্রীষ্টের ৯৫০ অব্দে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র রাজপুত প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। উজ্জয়িনী ও কাণ্যকুব্জে বিক্রমাদিত্যের বংশীয়দের সিংহাসনে তাঁহারা অধিরোহণ করিলেন, এবং পশ্চিম ভারতের ও গুজরাটের বল্লভী বংশীয়দের রাজ্য তাঁহাদের হস্তগত হইল। তাঁহারাই বিপদের সময়ে ভারতরক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং গজ্নীপতি সুলতান মাহমুদের ভারতাক্রমণের সময় তাঁহারাই দেশ রক্ষায় সযত্ন হইলেন।

এই যুগে কেবল এক অভিনব রাজবংশের উদয় ও ক্ষমতা প্রাপ্তি হইল, তাহা নয়; আধ্যাত্ম জগতেও এক প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন ঘটিল। বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার বংশীয়দের সময়ে হীনপ্রভ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ ছিলনা। বিক্রমাদিত্য হিন্দুদের প্রতি অনুগ্রহ করিতেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের নির্য্যাতন করিতেন না। তাঁহার অনেক সভাসদ্, এমন কি, একতম রত্ন অমরসিংহ বৌদ্ধ ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের বংশীয়েরা কেহবা বৌদ্ধের কেহ বা হিন্দুর উপর অনুগ্রহ করিতেন, কিন্তু কাহারও নির্য্যাতন ছিল না। রত্নাবলী রচয়িতা দ্বিতীয় শীলাদিত্য নিষ্ঠাবান্ বৌদ্ধ ছিলেন, চীন পরিব্রাজক হোয়েন সাঙ ভারতে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই যুগে নির্য্যাতন-কথা কাহারও কল্পনায় প্রবেশ করে নাই। স্বাভাবিক নিয়মে হিন্দুয়ানি নবজীবন পাইয়া প্রাধান্য লাভ করিতেছিল, এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের অল্পে অল্পে অবনতি হইতেছিল। কিন্তু ৭৫০ হইতে ৯৫০ অব্দ মধ্যে বৌদ্ধদিগকে নির্য্যাতন, তাঁহাদের চৈত্য, বিহার ও গ্রন্থ সমূহের অগ্নিদাহ, এবং বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করার বিশেষ প্রমাণ আছে। ৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম্মের পরমশত্রু শঙ্করাচার্য্যের জন্ম। তাঁহার গ্রন্থে যে নির্য্যাতন-স্পৃহা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তৎকালীন নরপতিরা সেই রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং মুমূর্ষু বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ করিলেন।

নবোত্থিত রাজপুত জাতি যে বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে ভারতবর্ষ হইতে তিরোহিত করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কোথা হইতে এই রাজপুত জাতির অভ্যুদয় হয়, তদ্বিষয়ে নানা মত উদ্ভাবিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হোরেস উইলসন, কর্ণেল টড এবং অন্যান্য অনেক পণ্ডিতেরা বলেন যে, যে সকল বিদেশীয় আক্রমণকারীগণ (শকাদি জাতিরা) নানারূপে ভারত প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং যাঁহাদিগকে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাড়না করিয়াছিলেন, তাঁহারাই রাজপুতানার মরুভূমিতে বাস স্থাপন করেন এবং আধুনিক রাজপুতগণ তাঁহাদেরই সন্ততি। সে যাহা হউক, রাজপুতদের হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ অতি আধুনিক ঘটনা। বেদ উপনিষদাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাজপুত নাম দৃষ্ট হয় না। নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ কবিলে অপর ধর্ম্ম-নির্য্যাতন স্পৃহা বলবতী হয়, রাজপুতদের তাহাই হইল। কেহ অভিনব হিন্দু বলিয়া তাঁহাদিগকে ঘৃণা করে, এজন্য তাঁহারা সূর্য্য চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন, এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের এই দাবী মঞ্জুর করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিনাশ ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার কার্য্য সিদ্ধ করাইয়া লইলেন। রাজপুতগণ যে কোন দেশ জয় করিলেন, বৌদ্ধ সেই দেশেই চৈত্য-বিহার ধ্বংস করিয়া হিন্দুমন্দির ও দেব-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। খ্রীষ্টের দশম শতাব্দীর মধ্যে রাজপুতগণ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই রাজা হইলেন, এবং প্রতিমা পূজা রূপ ভিত্তির উপর নূতন আকারের হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইল।

ইউরোপ ও ভারতবর্ষের প্রাচীনকালের ইতিহাসের সৌসাদৃশ্য অতি বিস্ময়জনক। রোমীয় সম্রাটেরা যেমন রোম-আক্রমণকারী বর্ব্বরদিগের গতি প্রতিহত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিক্রমাদিত্যও তদ্রূপ শকদিগকে ভারত প্রবেশে বাধা দিয়াছিলেন। শত শত বৎসর পর্য্যন্ত রোম ও হিন্দুরা স্বদেশ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষ উভয়ত্র আক্রমণকারিদের জয় হইল, এবং প্রাচীন রাজত্ব ও প্রাচীন জাতিগণ হীনবল হইল। উভয়ত্র এইরূপ পরাজয়ের পর জাতীয় ইতিহাস নীরব, অথবা কেবল অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনের কথায় পরিপূর্ণ। ঘোর অমানিশির অন্ধকারের পর সূর্য্যোদয়ের ন্যায়, ইউরোপে ফিউডাল রাজন্যবর্গ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যেমন পুরোহিত কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সেই ধর্ম্ম বিস্তার করিলন, ভারতবর্ষেও নবহিন্দুরাজপুতক্ষত্রিয়েরা নবোৎসাহে পৌরাণিক হিন্দুয়ানি ও পুরোহিত-প্রাধান্য স্থাপন করিতে লাগিলেন।

এস্থলেই সৌসাদৃশ্যের শেষ নয়। ইহার পর ফ্রান্স স্পেন প্রভৃতির নরাধিপতিরা যেমন মুসলমানদের হস্ত হইতে আত্ম রক্ষা করিতে ব্যস্ত হইলেন, ভারতবর্ষের রাজপুতগণ তেমনি মুসলমানদের আক্রমণে বাধা দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে সময়ে ইংলণ্ডপতি সিংহবীর্য্য রিচার্ড তৃতীয় ক্রুসেড যুদ্ধে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে দিল্লীপতি পৃথুরায় মুসলমান-আক্রমণকারী মহম্মদ ঘোরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইউরোপে খ্রীষ্টান রাজন্যবর্গ মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া তাড়িত করিলেন, কিন্তু ভারত-

বর্ষে রাজপুত রাজন্যবর্গ পরাজিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিলেন। ১১৯৩ ও ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদঘোরী দিল্লী ও আজমীর, কানোজ ও কাশীর নরপতিদিগকে পরাজয় করিলেন; এবং তাহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমান অধীনতা স্বীকার করিল।

এই পঞ্চম পৌরাণিক যুগের ব্যাপ্তিকাল খ্রীষ্টীয় ৫০০ অব্দ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত। আমরা ইতিপূর্ব্বে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। সংবৎ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রচলিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পূর্ব্বের পণ্ডিতগণ বিবেচনা করিতেন যে, পূর্ব্বশতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য ও কবি কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আধুনিক পুরাবেত্তাদের গবেষণায় বিক্রমাদিত্যের যশসৌরভ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু তাঁহার প্রাচীনত্বের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা হইয়াছে। তদীয় অভ্যুদয় কাল সম্বন্ধে অধুনা কিঞ্চিৎ মাত্র সন্দেহ নাই। বিক্রমাদিত্য ও তদীয় সভারত্ন কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এস্থলে দুই এক কথা বলিয়া নিরস্ত হইব।

বরাহমিহির বিক্রমাদিত্যের একতম রত্ন ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। তিনি যে জ্যোতিষশাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেই তিনি নিজের সময় নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন,—সে সময় খ্রীষ্টের পর ষষ্ঠ শতাব্দ। অমরসিংহ অন্যতম রত্ন। তিনি বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করেন, এবং পঞ্চশতাব্দির পর এই মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহাও নির্ণীত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক হোয়েন সাঙ বলেন, বিক্রমাদিত্যের পর প্রথম শীলাদিত্য রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন, এবং ঐ প্রথম শীলাদিত্য হোয়েন সাঙের ভারত গমনের ষষ্ঠি বর্ষ পূর্ব্বে রাজত্ব করেন। ইহা হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেন, তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবধারিত হয়। কাশ্মীর ইতিহাস-লেখক কহ্লণ পণ্ডিত বলেন যে, কাশ্মীরের কনিষ্ক রাজার পর ত্রিংশৎ জন রাজা রাজ্য করেন, তৎপর উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য ও কাশ্মীরে মাতৃগুপ্ত রাজা হয়েন। কনিষ্কের প্রচলিত মুদ্রা হইতে এবং অন্যান্য প্রমাণ হইতে আমরা অবগত হই যে, তিনি খ্রীষ্টের জন্মের পর শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। অতএব বিক্রমাদিত্য ও মাতৃগুপ্ত যে খ্রীষ্টের অনুমান পাঁচ শত বৎসর পর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

তবে সম্বৎ কি? ও শকাব্দই বা কি? সম্বৎ বিক্রমাদিত্যের অব্দ নহে,—মালব জাতির একটি বহুৎকাল প্রচলিত অব্দ। শকাব্দ শালীবাহনের অব্দ নহে, কাশ্মীরের তুরণীয় (অর্থাৎ শক) নরপতি কনিষ্কের অব্দ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কনিষ্কের নাম সকল বৌদ্ধদেশে প্রসিদ্ধ, এবং শকাব্দ নামক তাঁহার অব্দ তিব্বত ও ব্রহ্ম, সিংহল ও যবদ্বীপ প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সকল ঘটনার কাল নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে কয়েক বৎসর অগ্রপশ্চাৎ হইতে পারে। পাঠ-সৌকর্য্যার্থে নিম্নে প্রধান প্রধান ঘটনার তারিখের তালিকা প্রদত্ত হইল।

১। বৈদিক যুগ।

১। সিন্ধুপ্রদেশে আর্য্য নিবাস স্থাপন খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২০০০ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত।

২। ঋগ্বেদ প্রণয়ন ঐ

২। মহাকাব্যের যুগ।

৩। গাঙ্গ্যপ্রদেশে আর্য্যনিবাস খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১৪০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত।

৪। চন্দ্রায়ন নির্ণয় (lunar zodiac) „ ১৪০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত।

৫। বেদসংগ্রহ „ ১৪০০ „ ১২০০ „

৬। কুরু পাঞ্চালের প্রাদুর্ভাব সময় ১৪০০ হইতে ১২০০ পর্য্যন্ত।

৭। কুরু পাঞ্চাল যুদ্ধ „ ১২৫০

৮। কোশল, কাশী ও বিদেহ রাজ্যের প্রাদুর্ভাব „ ১২০০ হইতে ১০০০ পর্য্যন্ত।

৯। ব্রাহ্মণ প্রণয়ন „ ১৩০০ হইতে ১১০০ পর্য্যন্ত।

১০। উপনিষৎ প্রণয়ন „ ১১০০ „ ১০০০ „

৩। দার্শনিক যুগ।

১১। আর্য্যদের সমগ্র ভারতজয় খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ১০০০ হইতে ২৪২ অব্দ পর্য্যন্ত।

১২। যাস্ক „ ৯ম শতাব্দী সম্ভবতঃ।

১৩। পাণিনি „ ৮ম শতাব্দী সম্ভবতঃ।

১৪। সূত্র নানা ঋষি প্রণীত ৮০০ „ ৩০০ „

১৫। সুল্ব সূত্র (ক্ষেত্রতত্ত্ব বা Geometry). ৮ম শতাব্দী।

১৬। কপিল ও সাংখ্যদর্শন „ ৭০০

১৭। অন্যান্য দর্শন ৬০০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত।

১৮। গৌতম বুদ্ধ ৫৫৭ হইতে ৪৭৭ „

১৯। মগধ-রাজ বিম্বসার ৫৩৭ „ ৪৮৫ „

২০। অজাতশত্রু „ ৪৮৫ হইতে ৪৫৩ „

২১। প্রথম বৌদ্ধসভা (মহাসঙ্ঘ) „ ৪৭৭

২২। দ্বিতীয় বৌদ্ধসভা „ „ ৩৭৭

২৩। মগধের রাজা, নয়জন নন্দ ৩৭০ হইতে ৩২০

২৪। মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ হইতে ২৯১ „

২৫। মগধরাজ বিন্দুসার ২৯১ হইতে ২৬৩ „

২৬। উজ্জয়িনীর সামন্ত, অশোক ২৬৩ হইতে ২৬০ পর্য্যন্ত।

২৭। সম্রাট অশোক „ ২৬০ হইতে ২২২

২৮। তৃতীয় বৌদ্ধসভা (মহাসঙ্ঘ) „ ২৪২

২৯। মহেন্দ্র কর্ত্তৃক সিংহল প্রবেশ „ ২৪০

৩০। কাত্যায়ন খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৪র্থ শতাব্দী।

৩১। পাতঞ্জলি „ ২য় শতাব্দী

৩২। অন্ধ্র রাজ্য সংস্থাপন „ ৬০০ সম্ভবতঃ।

৩৩। চোল, চের ও পাণ্ড্যরাজ্য ৪০০ সম্ভবতঃ।

৩৪। আর্য্যকর্ত্তৃক বাঙ্গলা ও উৎকলাধিকার „ ৫০০ হইতে ২০০ অব্দ।

৪। বৌদ্ধ যুগ।

৩৫। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্য খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ২৪২ অব্দ হইতে খ্রীষ্টের পর ৫০০ অব্দ পর্য্যন্ত।

৩৬। মগধে মৌর্য্যবংশ „ খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ৩২০ হইতে ১৮৩ পর্য্যন্ত।

৩৭। মগধে সুঙ্গ বংশ „ ১৮৩ „ ৭১ „

৩৮। মগধে কণ্ব বংশ „ ৭১ „ ২৬ „

৩৯। মগধে অন্ধ্র বংশ „ ২৬ হইতে খ্রীষ্টের পরে ৪৩০ পর্য্যন্ত

৪০। পরাশর কৃত জ্যোতিষ „ ২০০

৪১। গর্গ কৃত জ্যোতিষ „ ১০০

৪২। জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত সমুদয়, খ্রীষ্টের পর ২০০ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত।

৪৩। গুপ্ত সম্রাটগণ „ ৪০০ „ ৫০০ „

৪৪। বাকৃত্রিয়াদের (বাহ্লিক) ভারতাক্রমণ, খ্রীষ্টেরপূর্ব্বে ২য় ও ১ম শতাব্দী।

৪৫। ইউ-চিদের ভারতাক্রমণ খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ও পরে প্রথম শতাব্দী।

৪৬। কনিষ্কের কাশ্মীরে রাজত্ব ও শকাব্দ প্রচলন খ্রীষ্টের পরে ৭৮ অব্দে।

৪৭। সৌরাষ্ট্রে সাহ রাজাদের শাসন „ ১৫০ হইতে ৩০০ পর্য্যন্ত।

৪৮। কাম্বোজ অর্থাৎ কাবুল কান্দাহারবাসী কর্ত্তৃক ভারত প্রবেশ „ ২০০ „ ৪০০ „

৪৯। গৌর হূনজাতি কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ „ ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দী।

৫। পৌরাণিক যুগ।

৫০। পৌরাণিক ধর্ম্ম খ্রীষ্টাব্দ ৫০০হইতে১২০০

৫১। বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িণী ও আর্য্যাবর্ত্ত শাসন „ ৫১৫ „ ৫৫০

৫২। কোরুর সন্ধে বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক শক পরাজয় " ৫৪০

৫৩। কালিদাস, অমরসিংহ ও বররুচি " ৫২০ হইতে ৫৫০

৫৪। ভারবি, বিষ্ণুশর্ম্মা, চরক ও সুশ্রুত ৫৫০ হইতে ৬০০

৫৫। আধুনিক হিন্দু জ্যোতিষ কর্ত্তা আর্য্য-ভট্ট " ৪৭৬ " ৫৩০

৫৬। বরাহমিহির " ৫০০ " ৫৫০

৫৭। ব্রহ্মগুপ্ত " ৫৯৪ " ৬৫০

৫৮। আর্য্যাবর্ত্ত সম্রাট দ্বিতীয় শীলাদিত্য (হর্ষবর্দ্ধন) " ৬১০ " ৬৫০

৫৯। দণ্ডী „ ৫৭০ „ ৬২০

৬০। বাণভট্ট, সুবন্ধু, ভর্তৃহরি ও ভট্টিকাব্য „ ৬১০ „ ৬৫০

৬১। হোয়েন সাঙ কর্ত্তৃক শীলাদিত্যের সভা-দর্শন, খ্রীষ্টাব্দ ৬৪০।

৬২। আর্য্যাবর্ত্তের নরপতি যশোবর্ম্মা, ভব-ভূতি „ ৭০০ হইতে ৭৩০ পর্য্যন্ত

৬৩। পশ্চিম ভারতের বল্লভী রাজগণ ৪৭০ হইতে ৭২০ পর্য্যন্ত।

৬৪। প্রাচীন রাজবংশের অধোগতি ও রাজ-পুতের প্রাদুর্ভাব „ ৭৫০ হইতে ৯৫০ „

৬৫। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব „ ৭৮৮ হইতে ৮৫০ „

৬৬। বৌদ্ধদিগকে নির্য্যাতন „ ৭৫০ „ ৯৫০

৬৭। আর্য্যাবর্ত্তে রাজপুতের আধিপত্য ও পৌরাণিক হিন্দুয়ানি সংস্থাপন „ ৯৫০ হইতে ১২০০

৬৮। দাক্ষিণাত্যে চালুক্য রাজবংশ „ ৫০০ „ ১২০০

৬৯। বাঙ্গালার পালরাজবংশ „ ৮৫০ „ ১১৫০

৭০। বাঙ্গালার সেনরাজবংশ ১০০০ „ ১২০৪

৭১। উৎকলে কেশরী বংশ „ ৪৭৬ „ ১১৩২

৭২। উৎকলে গাঙ্গ্যবংশ „ ১১৩২ „ ১৫৩৪

৭৩। কর্ণাটে বল্লাল বংশ „ ১১শ শতাব্দীতে

৭৪। ওরাবাঙ্গুলে কাকতি বংশ „ ১২০০ হইতে ১৩২৩

৭৫। বিজয়নগর রাজবংশ „ ১৩৪৪ „ ১৫৬৫

৭৬। ভাস্করাচার্য্য „ দ্বাদশ শতাব্দীতে।

৭৬। জয়দেব, শ্রীহর্ষ, মাঘ „ দ্বাদশ শতাব্দীতে

৭৮। সায়নাচার্য্য „ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে।

৭৯। মুসলমানদিগের দাক্ষিণাত্য বিজয় „ ১২৯৬ হইতে ১৫৬৫

৮০। মুসলমানদিগের কাশ্মীর বিজয় „ ১৫৮৬

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন-ইতিহাস নামক ইংরাজি পুস্তক, বিলাত-প্রত্যাগত বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় অনুবাদ করিতেছেন এবং তাহা শ্রীযুক্ত দত্ত মহোদয় সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া বর্ত্ত-মান প্রস্তাব লিখিতেছেন। এই দুই মহাত্মা নব্যভার-তের জন্য যে পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অতুলনীয়। বিধাতা ইহাঁদিগের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল করুন। ন, স।

সম্মতির বয়স ও স্বদেশীয়দিগের নিকট নিবেদন। *

এতদ্দেশীয় বালিকাদিগের সম্মতির বয়স সম্বন্ধে আমরা পুনঃ পুনঃ যাহা বলিয়াছি, তৎসম্বন্ধে অনেক গুলি যথার্থ স্বদেশহিতৈষী ও বিজ্ঞ লোক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, যাহা আছে, তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? হরি মাইতির ন্যায় ঘটনা সর্ব্বদা হয় না; এটী ব্যতিক্রান্ত উদাহরণ মাত্র। পক্ষান্তরে অল্প বয়সে কন্যা পাত্রস্থ করিলে অনেক সুবিধা আছে। দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকিলে ধর্ম্মনীতির হানি হইতে পারে। এইটীই এই সকল লোকে প্রধান তর্কস্বরূপ ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহারা আরও বলেন, ব্যবস্থাপকসভায় আমাদিগের যথার্থ প্রতিনিধি নাই। সকল বিষয়ের ঠিক তর্ক হওয়া সম্ভব নহে। আর একবার গবর্ণমেণ্টকে আমাদিগের সামাজিক বিষয়ের উপরে হস্তক্ষেপ করিতে দিলে তাহার সীমা কোথায় থাকিবে? শেষোক্ত তর্কটী কেহ কেহ সবিশেষ গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করেন।

আমরা স্বদেশীয়দিগকে প্রশান্তচিত্তে সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। দুই শত বৎসর হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বারম্বার স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিবেন। তাঁহারা এই অঙ্গীকার পালন করেন নাই, কোন্ ব্যক্তি ইহা বলিবেন? এক জন লোক সম্প্রতি বলিয়াছেন, আমাদিগকে চিরকাল একটী নিকৃষ্ট জাতি রাখা যদি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখন আমাদিগের সভ্যতা ও উন্নতির সম্বন্ধে উৎসাহ দিতেন না। বিদেশীয় লেখকেরা বলেন যে, এ দেশে বিদ্যার উৎসাহ দিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের পতনের উপায় করিতেছেন। তথাপি ইংরাজজাতির মহত্ত্ব ও সম্মানের বিষয়, সাধারণ্যে ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, তাঁহারা এই বিপদে পড়িতে প্রস্তুত আছেন। তথাপি তাঁহারা একটী ভীরু অসভ্য ক্রীতদাস জাতিকে শাসন করিবেন না। গবর্ণমেণ্টকে লইয়া যতদূর কথা, তাহাতে তাঁহাদিগের সাধুতার উপর সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। ভারতবর্ষীয়দিগের চেষ্টায় বিধবা বিবাহের আইন হইয়াছে। বস্তুতঃ সমাজ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যখন যাহা করিয়াছেন, দেশের প্রধান প্রধান লোকের সম্মতি লইয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তবে একটী বিষয় আমাদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে, লর্ড ওয়েলেসলিই এই প্রকারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির ব্যাখ্যা করি-

---

* অন্যান্য প্রবন্ধ রাখিয়া সহচরের এই সুন্দর প্রবন্ধটী আমরা উদ্ধৃত করিলাম। এরূপ একজন প্রাচীন, বিজ্ঞ, চিন্তাশীল সম্পাদকের কথা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, আশা করি। সহচর হিন্দুসমাজের মুখপাত্র। আমাদের কথা অপেক্ষা ইঁহার কথার অধিক আদর হইবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। ন, স

য়াছিলেনঃ—"গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার উত্তরাধিকারের নিয়ম রক্ষা করিবেন। কিন্তু যেস্থলে এই ব্যবহার ও নিয়ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম, মানব জাতির উপকার এবং কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধী হইবে, তথায় গবর্ণমেণ্ট স্বাধীনভাবে কাজ করিবেন।" এক্ষণে কোন্ স্ত্রীলোক গঙ্গাসাগরে সন্তান ফেলিতে সম্মত হন? কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন এইরূপ হৃদয়বিদারক কার্য্য করিতে তাঁহারা সঙ্কুচিত হইতেন না। সহমরণ সম্বন্ধেও এই ভাব ছিল। কিন্তু এখন; সেদিন পর্য্যন্ত বাণফোঁড়া চলিয়াছে। কিন্তু বোধ হয় এক্ষণে যে সকল লোক বয়স্ক হইয়াছেন, তাঁহারা পিঠ, জীব প্রভৃতি ফোঁড়ার বর্ণনা শুনিলে শিহরিয়া উঠিবেন। অথচ আমরা বাল্যকালে চড়কিদিগের এই সকল অস্বাভাবিক কার্য্য দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতাম। এই সকল প্রথা স্বাভাবিক ধর্ম্মের,—যে ধর্ম্ম সমস্ত জগতে প্রচলিত আছে, তাহার বিপরীত। কিন্তু আমরা জানি, যখন লর্ড বেণ্টিঙ্ক সহমরণ উঠাইবার উদ্যোগ করেন, তখনও ধর্ম্মের নামে বিস্তর আপত্তি হইয়াছিল। তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করেন। এক্ষণে লোকে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। কিন্তু লর্ড বেণ্টিঙ্কের কার্য্যকালে যে আশঙ্কা হয়, তাহা কি কার্য্যে পরিণত হইয়াছে? বরং ইহা কি সত্য নহে যে, শাসন কর্তৃপক্ষ নিতান্ত বিপাকে না পড়িলে আমাদিগের সমাজ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন না? তাঁহারা স্বদেশে যাহা করেন, ভারতবর্ষে তাহা করিতে চাহেন না। গবর্ণমেণ্ট চক্রান্ত করিয়া আমাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিবেন, অথবা সামাজিক বিপ্লব ঘটাইবেন, এই আশঙ্কা যাঁহারা করেন, তাঁহারা ইতিহাসকে মান্য করেন না।

এক্ষণে কি হইতেছে? তোমরা ধর্ম্মের সহিত দেশের রাজনীতিক উন্নতি দেখিতে চাহ কিনা? রাজনীতিক উন্নতি কেবল শিক্ষার উপরে নির্ভর করেনা। যে দেশে অসীম সভ্যতা, জ্ঞান ও বিদ্যার বিমল জ্যোতি বিদ্যমান সেদেশ বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে কি নিরাপদে থাকিতে পারে? ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর। অপেক্ষাকৃত অসভ্য রোমানেরা সাতিশয় সভ্য গ্রীকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। আবার রোমানেরা প্রাচীনতম কালে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেও গথ, ও হুনদিগের নিকটে পরাজিত হইয়াছিলেন। তৎপরে ইদানীন্তনকালে আইস। তুরস্কদিগের দ্বারা রোমানদিগের পূর্ব্ব সাম্রাজ্য নষ্ট হইয়াছে। আমাদিগের দেশ প্রথমতঃ সুলতান মামুদ, তৎপরে পাঠান মোগল প্রভৃতির রণক্ষেত্রে কতবার পরাজিত হইয়াছে। তৈমুর অসভ্য তাতার ছিলেন, কিন্তু তোমার সভ্য ভারতবর্ষীয়গণ কি করিতে পারিয়াছিলেন? এমন কি, কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকটে জ্ঞানবাপী বলিয়া একটী পচা বিল্বপত্রপুষ্পপরিপূর্ণ স্থান আছে। প্রবাদ এই যে, কালাপাহাড়ের ভয়ে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর,—সংহারকর্ত্তা—জ্ঞানবাপীতে পলাইয়া ছিলেন। এতদূর আমাদিগের জাতীয় অধোগতি হইয়াছে। ইহার কারণ কি? অবশ্যই অনেক কারণ আছে; কিন্তু প্রধান

কারণ এই যে,যে জাতি আমাদিগের দেশকে উৎসন্ন দিয়া আমাদিগেকে অধীনতা শৃঙ্খলে রাখিয়া আসিতেছেন, শারীরিক বলে তাঁহারা সাধারণতঃ আমাদিগের অপেক্ষা প্রধান। ইতিহাস বলেন,—চিকিৎসকেরা অনুকূল সাক্ষ্য দিতেছেন, প্রাচীন হিন্দু স্ত্রীলোকেরা যথার্থ যৌবন প্রাপ্ত না হইলে বিবাহ করিতেন না। প্রথম মুসলমান আক্রমণ ও আনুষঙ্গিক অত্যাচার প্রবল হইলে অল্পবয়সে স্ত্রীলোকদিগকে পাত্রস্থ করিয়া এক জন রক্ষাকর্ত্তার অধীনস্থ করিবার প্রথা স্থাপিত হয়। সেই প্রথা এখনও চলিয়া আসিতেছে। যে পুরাণ ও অন্য অন্য গ্রন্থের এত দোহাই দেওয়া হয়, সেই পুরাণকে মধ্যস্থ মান। জানিবে, আমরা যাহা বলিতেছি, আর্য্য পিতামহগণ তাহাই করিতেন। তোমরা সেই যথার্থ হিন্দু আর্য্য পিতামহগণের অনুকরণ করিবে, না গোলামের ন্যায় কতকগুলি ইদানীন্তনকালের স্বার্থপর পুরোহিতের কথা শুনিয়া কাজ করিবে? আমরা যাহা বলিতেছি, যদি কেহ তাহা প্রাচীনকালের আর্য্য পিতামহগণের অনুমোদিত নহে বলিয়া সাব্যস্ত করেন, আমরা তৎক্ষণাৎ ভ্রম স্বীকার করিয়া আত্মমতের পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইব।

বিবি ফিপসন বহুকাল এদেশে চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি এক জন স্ত্রীলোক। তিনি যেমত স্বজাতীয়দিগকে চিনিবেন, কোন পুরুষ তাহা পারিবেন না। সম্প্রতি এই চিকিৎসায়ত্রী বোম্বাই[illegible] বলিয়াছেন? তিনি বলেন যে পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহার সংস্কার হয় যে, ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকেরা ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বে পুষ্পবতী হন। কিন্তু এখানে আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, পঞ্চদশবর্ষীয়া ভারতবর্ষীয়া বালিকা একাদশবর্ষীয়া ইংরাজ বালিকার ন্যায় অপ্রস্ফুটিত। ডাক্তার চার্লস ধাত্রিবিদ্যায় বিশারদ ছিলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন যে, যৌবন সম্বন্ধে শীতপ্রধান দেশীয় ও ভারতবর্ষীয় বালিকাদিগের মধ্যে প্রভেদ নাই। বিবি ফিপসন বলেন, কেবল ঋতুমতী হইলে যৌবন কাল হয় না। যতদিন শরীরের শেষবৃদ্ধি না হয়, ততদিন সে স্ত্রীলোককে যুবতী বলা ভ্রম। কিন্তু আমাদিগের দেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোক সামান্য ঋতুর পূর্ব্বেই স্বামীগৃহে যান, একথা কি অপ্রকৃত? অকালে স্বামীসহবাস নিবন্ধন অকালে অপক্ক সন্তান জন্মে। শরীরের বৃদ্ধির সময় সন্তান জননী হওয়ায় ইহাদের শরীর দুর্ব্বল হয়। অল্পকাল মধ্যে প্রসবের ক্ষমতা লোপ পাইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিদের এই কথা। এক জন ভূয়োদর্শী স্ত্রীচিকিৎসক এইরূপে আমাদিগকে বলিয়াছেন, "যদি কোন কারণে কখন ইংরাজ রাজত্ব যায়, তবে নিশ্চয় জানিবে তোমাদিগের অপেক্ষা বলবান আর এক জাতি আসিয়া তোমাদিগের উপরে প্রভুত্ব করিবে।" যাহাতে আমাদিগের শরীর বলবান হয়, এই চেষ্টা কি দুশ্চেষ্টা? যদি গবর্ণমেণ্ট ও ইংরাজজাতির দুরভিসন্ধি থাকিত, তাহা হইলে ত আমাদিগকে দুর্ব্বল রাখা তাঁহাদিগের স্বার্থ হইত। অতএব স্বদেশীয়গণ! কুসংস্কার ও কাল্পনিক ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগের যথার্থ স্বার্থ হারাইও না। কার্য্যতঃ এক্ষণে ব্রাহ্মণ কায়স্তের কন্যাগণের ১২। ১৩। ১৪ বৎসরে বিবাহ হইতেছে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর

লোকেরা ৫। ৬। ৭ বৎসরের অধিক ঘরে অবিবাহিত কন্যা রাখেনা। এই সকল লোকের প্রতি কটাক্ষ করা কি আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে? হিন্দু ধর্ম্মের যথেষ্ট স্থিতি স্থাপকতা গুণ আছে। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা নির্ব্বোধ লোক ছিলেন না। যদি প্রাচীন কালের স্ত্রীলোকেরা অষ্টাদশ বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিতেন, এখনও তাহা হইবে না কেন? এক্ষণে সতীত্বের কি এত কম মূল্য হইয়াছে? তাহা নহে। অকালে বালিকাদিগকে "কিলাইয়া কাঁঠাল" পাকান হয় বলিয়া এক্ষণে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের আস্বাদ পাইতেছেন। অতএব সাহস ও অধ্যবসায় অবলম্বন কর। পিতৃভূমির মঙ্গলের চেষ্টা পাও। যাহাতে আমাদিগের দেহ বলিষ্ঠ হয়, তাহার উপায় করিতে হেলা করিও না। "বীরপ্রসবিনী হও" বলিয়া পূর্ব্বতন ঋষিগণ স্ত্রীলোকদিগেকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। চেষ্টা কর, সেইকাল আবার আসিবে। আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র,—যথার্থ হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ কর—আপনার বিবেচনা কর,—দেখিবে বিবি ফিপসন প্রভৃতি তোমাদিগের যথার্থ মঙ্গল কামনা করিয়া পরামর্শ দিতেছেন। আমাদিগের সনাতন ধর্ম্ম আর্য্য পিতামহদিগের ধর্ম্ম কোন প্রকার উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে না। পরীক্ষা কর, পরের মুখে ঝাল খাইও না।

সহচর।

ভারতীয় মুদ্রা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

আমি যত প্রকার ধাতু মুদ্রা দেখিয়াছি, তাহাদের সকলাপেক্ষা ইংরাজের মুদ্রা দেখিতে অতি সুন্দর এবং পরিষ্কার। ভারতবর্ষীয় ইংরাজ মুদ্রার ধাতু বিশুদ্ধ নহে বটে, কিন্তু গঠন এবং আকৃতিতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইংরাজের পয়সা, টাকা বা মোহর গলাইলে অনেক "খাদ" পাওয়া যায়, অন্যান্য মুদ্রায় সেরূপ নাই। বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের পয়সা, টাকা, আধুলি, গিনি, মোহর ইত্যাদি যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনি কারুকুশলতায় পরিপূর্ণ। ইংরাজের নজর অর্থাৎ দৃষ্টি বোধ হয় বাহিরের চাকচিক্যতার বিশেষ পক্ষপাতী। যাহা হউক, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাবের অবতারণায় যে সকল মুদ্রার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহাদের অবশিষ্ট কতক গুলির বিবরণ বর্ত্তমান প্রস্তাবে সন্নিবিষ্ট করা যাইতেছে। যত গুলি মুদ্রা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাদের সকলের সমগ্র বিবরণ এখনও অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই, এই জন্য অনেক গুলি ধাতবীয় মুদ্রার আদৌ উল্লেখ করা যাইবে না।

অবকাশ ও সুবিধা মত সময়ান্তরে অন্য প্রস্তাবে (যদি পারি) অবশিষ্ট মুদ্রাগুলি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিব।

টানা দামুড়ী—টানা নগরী বোম্বাই প্রেসীডেন্সীর মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা এক্ষণে প্রথম শ্রেণীর ডিসট্রিক্ট রূপে পরিণত হইয়াছে। বোম্বাই সহরের কলের জল টানাব নিকটবর্ত্তী টান্‌সা কারখানা হইতে রত্তনা হইয়া থাকে। বহু বৎসর ব্যাপিয়া পর্টুগীজেরা টানা নগরীতে রাজত্ব করিয়াছিল। ইংরাজের বর্ত্তমান জেল খানা, পূর্ব্বে পর্টুগীজের সুদৃঢ় দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইত। সালসেট্ দ্বীপের এই স্থানেই সূত্রপাং। পর্টুগীজ শাসন সময়ে টানার হিন্দু রাজা অতি ক্ষুদ্রাকার তাম্র মুদ্রা প্রচলন করেন, ঐ মুদ্রার নাম টানা দামুড়ী, ইহা এখন অপ্রচলিত অবস্থায় পতিত। ইংরাজের অর্দ্ধপয়সা প্রায় ইহার অনুরূপ। এই পয়সার একদিকে মহারাষ্ট্র ভাষায় "টানা দামুড়ী" এবং সম্বৎ লিখিত আছে; অন্যদিকে পর্টুগীজের খ্রীষ্টীয় অব্দ এবং Portugeza de Tanaso অক্ষর কয়েকটি দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায়, এই মুদ্রার বহুসংখ্যক এখন গোয়া নগরীর দুর্গে রক্ষিত হইতেছে। যে রাজার সময়ে এই মুদ্রার প্রচলন হয়, তাহার নাম চূড়ামণি রাও, ইঁহারই প্রসিদ্ধ আত্মীয় (সর্দ্দার মুরারী রাও) মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সীর অন্তর্গত অনন্তপুর জিলার অধীন গুতী পাহাড়ে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

বুর্হানপুর।—মধ্য ভারতের অন্তঃপাতী গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনীন্ শুলার রেলওয়ে লাইন মধ্যে বুর্হানপুর অতীব প্রাচীন, প্রশস্ত ও প্রধান নগর। খান্দেশের তুর্ক বীর। নশীর খাঁ ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর স্থাপন করেন; ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দে আকবর ইহা স্বরাজ্য ভুক্ত করিয়া লয়েন; তদন্তর ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ইহা নিজামের হস্তগত হয়। কালপ্রভাবে মহারাষ্ট্র পুরুষগণ প্রবল হইয়া মুসলমানের হস্ত হইতে এই প্রাচীন নগরীকে উদ্ধার করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বুর্হানপুর ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। তুর্কী, মোগল, পাঠান, আফ্‌গান, মহারাষ্ট্র, পিণ্ডারী, রোহিল্লা, আরবী, ফরাশী, ইংরাজ, প্রভৃতি কেহই এখানে রাজত্ব বিস্তার করিতে ক্রটি করেন নাই। অনেকের বিশ্বাস, ইংরাজের ভাবতাগমনের পূর্ব্বে এদেশে জলের কল ছিলনা। মুসলমানদিগের সময়ে বুর্হানপুরে যে অত্যাশ্চর্য্য, রমণীয় এবং কৌতুককর জলের কল ছিল, তাহা এখনও সুন্দর রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে; ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে মেরামত করাইয়া ব্যবহার করিতেছেন। বুর্হানপুর তাপ্তী নদীর উপরে অবস্থিত। এই নদীর উপরে এক প্রকাণ্ড প্রাচীন দুর্গ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এক মুসলমান নবাব (পুরের খাঁ) এখানে বাস করিতেন। অনেকে বলেন, পুরের খাঁ জাহাঙ্গির বাদসাহের উপপত্নী-পুত্র। যাহাই হউক, পুরের খাঁর সমসাময়িক তাম্র মুদ্রা এখনও পাওয়া যায়। ইহা জয়পুরের পয়সার প্রায় অনুরূপ। তিনভাগ তাম্র এবং একভাগ রৌপ্যে ইহা নির্ম্মিত। পয়সার এক দিকে এক মসজিদের অর্দ্ধ প্রতিকৃতি এবং অপর দিকে নবাবের নাম। প্রথম জেম্‌সের রাজত্ব কালে, সার টমাস রো নামক ইংলণ্ডীয় দূত সর্ব্ব প্রথমে বুর্হানপুরে জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন,

জাহাঙ্গীর সে সময়ে এখানে ছিলেন। ইতিহাসে লিখিত আছে, জাহাঙ্গীর বাদসাহ ১০১ টি সুবর্ণ মুদ্রা এবং ১০১ টি বুর্হানপুরীয় তাম্র মুদ্রা রো সাহেবকে উপহার দেন। আমার নিকট যে পয়সাটি আছে, তাহার নিম্ন ভাগের অক্ষর পড়া যায় না, সুতরাং 'সন' সম্বন্ধে কিছু ঠিক করিতে পারি নাই।

গদাধরী পয়সা—বোম্বাই হইতে এই স্থান প্রায় ২৭০ ক্রোশ। গদাধর নগর জি, আই, পি, রেলওয়ের একটি প্রধান ষ্টেসন। বাণিজ্যের জন্য ইহা প্রসিদ্ধ। জব্বলপুরের ইহা নিকটবর্ত্তী। ইংরাজীতে ইহাকে Gadarwara কহা গিয়া থাকে। ইহার প্রকৃত নাম গদাধর নগর। ফরাসী বীর ডিউপ্লের সময়ে বৈশ্য-জাতীয় (বণিক) গদাধর হঠাৎ প্রবল হইয়া আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ঐ নগরের পূর্ব্বতন নামের পরিবর্ত্তে আপনার নামানুসারে ইহাকে গদাধর নগর বলিয়া প্রচার করেন। এই প্রদেশের পূর্ব্বনাম কৌয়াপুর ছিল। গদাধর এক প্রকার পয়সার প্রচলন করেন। গদাধরের রাজত্ব কাল মোটে ২২ বৎসর, সুতরাং কেবল ২২ বর্ষের জন্য ঐ পয়সা চলিয়াছিল। এই পয়সা গোলাকার এবং রাজপুতানার অন্তর্গত ভীলোয়াড়া প্রদেশের পয়সার মত দেখিতে কদাকার এবং ওজনে খুব ভারি। এক একটা পয়সা প্রায় সার্দ্ধ দুই তোলা। আমি নিজে পারস্য ও উর্দ্দু জানি, কিন্তু এই পয়সার খোদিত অক্ষর এত জঘন্য যে, ইহার এক বর্ণও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই। গদাধরী পয়সা এখনও স্থানে স্থানে চলে।

ভোঁস্‌লা পয়সা—বেরাবের রাজধানী অমরাবতী। ইহা অতীব প্রাচীনা নগরী। তন্ত্র শাস্ত্রে এই নগরীর উল্লেখ আছে। ইলীচপুর এবং চিকলদহ পর্ব্বতের মধ্যদেশে এই নগরী অবস্থিতা। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় এক ক্রোশ। ইংরাজ শাসনের অথবা ইংরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্যান্ত ইহা হিন্দুরাজন্যের অধীন ছিল। ভোঁস্‌লা রাজাগণ ইহা শাসন করিতেন। পিণ্ডারীদিগের আক্রমণ হইতে নগরীকে রক্ষা করিবার জন্য রাজাগণ ৪ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া সহরের চতুর্দ্দিকে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছেন, ঐ প্রচীর এখনও সুন্দর রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইয়াদগিরি যাদোবা ভোঁস্‌লা নামক রাজা আপনার রাজত্ব কালে এক প্রকার পয়সার প্রচলন করেন। এই পয়সা অষ্টকোণ। ধাতু বিশুদ্ধ তাম্র। অনেক দিনের নির্ম্মিত পয়সা, অনেক মলিনতায় পরিপূর্ণ, কিন্তু ঔজ্জ্বল্য এখনও দেদীপ্যমান। ইহার একদিকে রাজার নাম এবং গাভী মূর্ত্তি; অপর দিকে মহাদেবের মন্দিরের প্রতিকৃতি, একটি ত্রিশূল এবং শকাব্দা।

মুলুক বাহাদুরী।—হায়দ্রাবাদ রাজ্যে গুলবর্গা বা কুলবর্গা এক প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা অতীব প্রাচীন নগর। নিজাম ষ্টেট রেলওয়ের ইহা এক বিখ্যাত ষ্টেশন। বাণিজ্য, ব্যবসা, অট্টালিকা, ধন, ধান্য, সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয়ে গুলবর্গা নগরী বিশেষ শোভাময়ী। পূর্ব্বে ইহাই হায়দ্রাবাদ রাজ্যের রাজধানী ছিল। জন সংখ্যা ৪০ সহস্র। পূর্ব্বতন নিজামের যখন ইহা রাজধানী ছিল, তখন এই স্থানে নিজাম বাহাদুর

চতুষ্কোণীয় এক প্রকার তাম্র মুদ্রার প্রচলন করেন। ইহার অক্ষর ছাঁচে ঢালা নহে, খোদাই করা। নিজাম সম্রাটেরা নিজাম-উল্-মুলুক্ এই উপাধিতে খ্যাত, এই জন্য এই পয়সাকে গুলবর্গা মুলুক বাহাদুরী পয়সা বলে। বর্ত্তমান সময়ের হায়দ্রাবাদী পয়সা এইরূপ নহে, কিন্তু গুলবর্গার পয়সা এখনও চলে। ইহার ওজন ইংরাজী এক পয়সা হইতে কিঞ্চিৎ কম, ধাতু তাম্র। "রুস্তম খাঁ-নিজাম্-উল্-মুলুক্-বাহাদুর-সাঁহান্ সাঁ" এই কথাগুলি পারস্য অক্ষরে খোদিত আছে। অপর দিকের অক্ষর পড়িতে পারা যায় না। এই প্রকারের পয়সা এখন নির্ম্মিত হয় না। প্রাচীন পয়সার সংখ্যা খুব কম।

রোয়াশী পালম্।—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, ইণ্ডিয়ান্ মিড্‌লাণ্ড রেলওয়ের মধ্যে, বান্দা জিলার অন্তঃপাতী, যমুনা ও পৈশানী নদীদ্বয়ের তটদেশে কারুই নগর বিশেষ স্বাস্থ্যকর এবং নানা কারণে প্রসিদ্ধ। ১৮৫৭ অব্দের ঘোরতর সিপাহী বিদ্রোহ কালে কারুইয়ের রাজা বিদ্রোহী বলিয়া বন্দী হয়েন এবং তাঁহার বহু মূল্যবান প্রাচীন হীরা মাণিক্যাদি কলিকাতার হামিল্টন কোম্পানী বিক্রয় করিয়া গবর্ণমেণ্টের কোষাগার পূর্ণ করেন। এখন যে প্রকাণ্ড প্রস্তর অট্টালিকায় গবর্ণমেণ্টের ট্রেজরী এবং কালেক্টরী কাছারী হইতেছে, পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদিগের ইহা দুর্গ এবং প্রাসাদ ছিল। রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতাগণ যুদ্ধে পরাজিত হইলে অধিবাসীরা পলায়ন করিয়া রেওয়া রাজ্যে গমন করেন। বর্ত্তমান সময়ে সাত সহস্র লোক এখানে বাস করে। হিন্দু রাজত্ব কালে এক জন মুসলমান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি দয়ালু, ধর্ম্মভীরু, স্বদেশ-হিতৈষী, সুপণ্ডিত এবং মহাবীর বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। ইংরাজ রাজপুরুষ ইহাঁকে বিদ্রোহের মূল বিবেচনা করিয়া প্রাণ দণ্ডের আদেশ দেন। ঐ মন্ত্রী "নবাব" আখ্যায় অভিহিত হইতেন। রাজাগণ "রোয়াশ্" উপাধিতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এই জন্য কারুই নগরের প্রাচীন পয়সা "রোয়াশী পয়সা বলিয়া বিখ্যাত। এই পয়সা গোলাকার, ওজন এক তোলা, ধাতু তাম্র। উর্দ্দু ভাষায় "পালম্" শব্দে "তোলা" বুঝায়। পয়সার এক দিকে রোয়াশ্ ও নবার অর্থাৎ "রোয়াশ্-ই-নেওযার্" এই কথাগুলি উর্দ্দু অক্ষরে লিখিত, অন্য দিকে উর্দ্দ অক্ষরে "কিল্লা-ই বাবা-কারুই। সাল ১২০৩" এই কথাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকূট তীর্থ কারুই নগর হইতে তিন ক্রোশ মাত্র, এই তীর্থ সাবিত্রী নদীর উপরে স্থিত। ক্রমাগত পর্ব্বতের মধ্য দিয়া ঐ তীর্থে যাইতে হয়। চিত্রকূট তীর্থে রোয়াশী পয়সা অধিক পরিমাণে দেখা যায়।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

ময়ূরভঞ্জ।

উড়িষ্যার ১৯ উনবিংশতি গড়জাত বা করদ রাজ্য মধ্যে ময়ূরভঞ্জ আয়তনে, লোক সংখ্যায় এবং রাজস্ব বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৪৩৫২ বর্গ মাইল।* লোক সংখ্যা প্রায় চারিলক্ষ, এবং রাজস্ব পাঁচ লক্ষ টাকা।

ইহার উত্তর সীমা ধলভূম ও সিংভূম, দক্ষিণ সীমা বালেশ্বর জিলা ও নীলগিরি নামক করদ রাজ্য। পূর্ব্বসীমা মেদিনীপুর ও বালেশ্বর জিলা। এবং পশ্চিম সীমা কেন্দুঝর নামক করদ রাজ্য।

অপরাপর গড়জাত রাজ্যের ন্যায় ময়ূরভঞ্জও পর্ব্বতময়; এবং ভূমিজ, বাথুরি, সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি আদিম জাতির আবাস।

ময়ূরভঞ্জ সম্প্রতি চারিভাগে বিভক্ত; সদর বারিপদা, পাঁচপীড়, বাওনঘাটী; এই তিন মহকুমার মধ্যস্থিত সুবিস্তৃত মালভূমি, শিমলী পাল।

কথিত আছে যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এই রজ্যে ময়ূরধ্বজ উপাধিধারী এক আদিম জাতীয় রাজার অধিকার ছিল। ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান ভঞ্জ বংশ ইহাতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর রাজবংশের জয়সিংহ নামক জনৈক ক্ষত্রিয়, আদিসিংহ ও জ্যোতিসিংহ নামক স্বীয় তনয়দ্বয় সমভিব্যাহারে জগন্নাথ দেবের দর্শন উপলক্ষে পুরীধামে আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যার সেই সময়ের রাজা জয়সিংহকে সদ্বংশজাত জানিয়া আপন তনয়ার সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ আদিসিংহের পরিণয় সম্পাদন করিলেন। এই বিবাহের পর জয়সিংহ পুত্রদ্বয় ও পুত্রবধূ সহ বাটী যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, ময়ূরধ্বজ রাজার উৎপীড়নে প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়াছে। এই সুবিধা পাইয়া সুক্ষত্রিয় জয়সিংহ নানা উপায়ে আদিম জাতীয় প্রজাগণের প্রীতি লাভ করিলেন, এবং তাঁহাদের সাহায্যে ময়ূরধ্বজকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া এই রাজ্যে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া বাওনঘাটী নামক স্থানে গড় নির্ম্মাণ করিলেন। ময়ূরভঞ্জের অপরাপর অংশ জমিদারগণের অধিকারে রহিয়া গেল।

জয়সিংহ বিশ বৎসর রাজত্ব করেন। পিতার মৃত্যুর পর আদিসিংহ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্ববাহুবলে কেন্দুঝর পর্য্যন্ত অধিকার ও প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন, এবং আধুনিক পাঁচপীড় মহকুমার অন্তর্গত আদিপুর নামক স্থানে স্বনামে একটী পল্লী স্থাপন পূর্ব্বক গড় নির্ম্মাণ করিয়া নিজে ময়ূরভঞ্জ শাসন করিতে লাগিলেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কেন্দুঝরের অধিপতি করিলেন। তদবধি কেন্দুঝরের রাজা অপুত্রক হইলে ময়ূরভঞ্জবংশীয় কোন ব্যক্তি এবং ময়ূরভঞ্জের রাজা অপুত্রক হইলে কেন্দুঝরের রাজার কোন সন্তান রাজ্য প্রাপ্ত হইবার প্রথা চলিয়া আসিয়াছিল। ইংরাজ বাহাদুর ১৮৬২ সালে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করাতে কেন্দুঝর বিদ্রোহী

* প্রায় ময়মনসিংহ জিলার সমান।

হইয়াছিল। জ্যোতিঃসিংহের নাম অনুসারে তদ্‌নির্ম্মিত গড় জ্যোতিঃপুর নামে বিখ্যাত। আদিপুর ও জ্যোতিপুরে সিংহবংশের কুলদেবতা কীচকেশ্বরীর * মন্দির আছে এবং তথায় নানা প্রকার খোদিত প্রস্তর দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রস্তরের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের কোন সম্পর্ক আছে কি না, জানি না।

আদিসিংহ আপন বাহুবলে সমস্ত জমিদারদিগকে একে একে পরাস্ত করিয়া ময়ূরধ্বজের অধিকৃত সমস্ত রাজ্য করতলস্থ করিলেন। এই রূপে ময়ূরধ্বজের দর্প ভঞ্জন করিয়া নিজে "সিংহ" পরিবর্ত্তে "ভঞ্জ" উপাধি গ্রহণ করিলেন, অধিকৃত রাজ্যের ময়ূরভঞ্জ নাম প্রদান করিলেন এবং ময়ূরধ্বজের "ময়ূরচিহ্ন" স্বীয় রাজচিহ্ন বলিয়া স্বীকার করিলেন। এইরূপ জনপ্রবাদ ময়ূরভঞ্জে প্রচলিত আছে।

আদিভঞ্জ রাজকার্য্য শাসন সুবিধার জন্য ময়ূরভঞ্জকে ২২ ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন করিয়া সরবরাকার নিযুক্ত করিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে, রাজ্যবিস্তারে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সরবরাকারী পদ পাইয়া পুরস্কৃত হইলেন। ইহারা রাজাকে প্রতি বর্ষে "পেসকস" নামে কর প্রদান করিয়া স্ব স্ব সরবরাকারী মধ্যে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন। যখন যে সরবরাকার অবাধ্য বা বিরোধী হইল, তাহার বিভাগ খাস হইয়া শাসিত হইতে লাগিল। এই রূপে ২১ বিভাগ খাসে আসিয়াছে কপ্তিপদা (১) সরবরাকারের দখলে আছে।

সজনাগড় বা নীলগিরি বিদ্রোহী হইয়া স্বতন্ত্র গড়জাত বলিয়া গণ্য হইয়াছে; খিচিং, হল্‌দিপকুর ও কোল্‌হান সিংভূম জিলার অন্তর্গত হইয়াছে। আদিপুর, মসীপুর, কবঞ্জিয়া, রতনপুর ও ঠাকুরমুণ্ডা এই পাঁচ বিভাগ বা পীড় "পাঁচপীড়" নামক মহকুমার অন্তর্গত হইয়াছে। বাওনঘাটী ও শিমলীপাল দুই স্বতন্ত্র মহকুমা। উপরভাগ, বনহাটি, রগুনিয়া, হরিপুর, ওলমরা প্রভৃতি দশটী পরগণা লইয়া সদর বারিপদা মহকুমা গঠিত হইয়াছে।

আদিভঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া এই রাজ্যে ৪৩ জন ভঞ্জ বংশীয় রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। বাহুল্যতায় তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিলাম না।

রাজধানী বারিপদায় প্রস্তরময় এক জগন্নাথ মন্দির আছে। পুরীর মন্দির ভিন্ন ঈদৃশ জগন্নাথ মন্দির উড়িষ্যায় আর নাই বলিয়া অনেকের ধারণা। রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ ষোড়শ শতাব্দীতে বারিপদায় রাজধানী স্থাপন ও এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। যখন মহারাষ্ট্রদিগের হস্ত হইতে ইংরেজ বাহাদুর উড়িষ্যা অধিকার করেন, তখন সুমিত্রা দেবীভঞ্জ ময়ূরভঞ্জে প্রভুত্ব করিতেছিলেন। ১৮১০ সালে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সপত্নী যমুনা দেবীভঞ্জ তিন বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করাতে ভঞ্জবংশের নিয়মানুসারে কেন্দুঝর রাজবংশের ত্রিবিক্রমভঞ্জ ময়ূরভঞ্জে রাজপদ প্রাপ্ত হয়েন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্রোহী হওয়ায় নীলগিরি, কোহ্লান, হল্‌দিপুখুর ও খিচিং, এই চারিটী বিভাগ এখন ময়ূরভঞ্জের অধীন

* স্থানীয় ভাষায় কিঞ্চকেশ্বরী বলে।

(১) কপ্তিপদার জমিদার ২৭০৲ মাত্র পেসকুস দেন, কিন্তু তাঁহার আয় ৩০০০৲ হইবে।

নহে। মহারাজা যদুনাথ ভঞ্জ রাজস্ব খাসে আদায় করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তজ্জন্য বেতনভোগী সর্দ্দার নিযুক্ত করেন। ৫০ বৎসর এই নিয়মে কার্য্য চলিতেছে। যদুনাথ অতি প্রতাপশালী শাসনকর্ত্তা ছিলেন; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহার সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েন।

রাজা শ্রীনাথভঞ্জের কুশাসন সময়ে বাওনঘাটী ও উপরভাগ বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজ শাসনে আসিয়াছিল। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জ রাজত্ব পাইয়া সুশাসন স্থাপন করিলে তাঁহাকে তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। ১৮৮২ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদবধি ময়ূরভঞ্জ ইংরেজ শাসনাধীন হইয়াছে। নাবালগ রাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ সুশিক্ষিত ও সুচতুর, ইংরেজী ও সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন। ১৮৯১ সালে রাজত্ব পাইবেন।

ময়ূরভঞ্জের প্রজার অবস্থা অতি উত্তম। বাস্তু ভূমি ও রবিশস্য জন্মে। এইরূপ ভূমির জন্য কর অতি সামান্য, নাই বলিলেও হয়। শারদ ধান্য জমির করও বেশী নয়। তসর, লাক্ষা প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। গাড়ী শকট চলিবার পাকা রাস্তার অভাব নাই। রাস্তার ধারে ধারে ৭।৮ ক্রোশ অন্তর পথিকদের রাত্রি-বিশ্রাম করিবার ঘরও আছে। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য চিত্ত মুগ্ধকর। একটী এণ্ট্রান্স স্কুল, ৪টী মধ্য শ্রেণী বিদ্যালয় এবং প্রায় ৫০টী প্রাইমারী বিদ্যালয় ও পাঠশালা রাজার ব্যয়ে চলিতেছে।

ময়ূরভঞ্জে, ভূমিজ, ভূইয়া, বাথুরি, পুরাণ প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা উপবীত ধারণ করে, এবং চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শ্রীকৃষ্ণের যে নন্দবংশে জন্ম, তদ্বংশীয় অনেক গোপ ময়ূরভঞ্জে আছে। তাঁহারা কিন্তু উপবীত ধারণ করেন না।

ময়ূরভঞ্জের নদী সমূহে স্বর্ণ এবং পর্ব্বত সমূহে লৌহ পাওয়া যায়। *

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

বল্লাল চরিতম্।

(সমালোচনা)

"পেনু যদি আজ ভরত সঙ্গ,
অভিনব কিছু দেখাব রঙ্গ॥"

কবিচূড়ামণি কালিদাস মস্তক হইতে বাগ্দেবীর রূপ বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অদ্য আমরা ভারতীর বরপুত্রের পবিত্র পদ স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসারে "টাইটেল" পেজ হইতে এই গ্রন্থের সমালোচনা আরম্ভ করিব। ভরসা করি পাঠকগণ অদ্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

ইহার টাইটেল পেজটী এইরূপ;—

* অনেকে মনে করেন, খ্রীষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের প্রাদুর্ভাব; তাঁহার দুই তিন শত বৎসর পরে রাজপুতদের অভ্যুদয়। এই গণনানুসারে পঞ্চম শতাব্দী হইতে উৎকলে কেশরী বংশের সঙ্গে সঙ্গে ভঞ্জবংশের উদয়, বিশ্বাস হয় না।

বল্লালচরিতম্—শ্রীযুক্ত গোপালভট্ট বিরচিতম্—শ্রীযুক্তানন্দভট্ট বিরচিত পরিশিষ্ট সহিতম্—শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্যেন অনুদিতম্—প্রেসিডেন্সি কালেজ সহকারী সংস্কৃতাধ্যাপকেন-শ্রীহরিশ্চন্দ্র কবিরত্নেন সংশোধিতম্—কলিকাতা রাজধান্যাম্ গিরিশ বিদ্যারত্ন-বর্ত্মস্থ চতুর্ব্বিংশ-সংখ্যক সদ্মনি—গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে শ্রীশশীভূষণ ভট্টাচার্য্যেন মুদ্রিতম্ শ্রীহরিশ্চন্দ্র - কবিরত্নেন প্রকাশিতঞ্চ ইত্যাদি।”

এক ভট্টমূল গ্রন্থ প্রণেতা, দ্বিতীয় ভট্ট পরিশিষ্ট লেখক, তৃতীয় ভট্ট অনুবাদক ও মুদ্রাকর, চতুর্থ ভট্ট সংশোধক ও প্রকাশক। এইরূপ চতুর্ভট্ট যোগ দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, এই যোগের ফল না জানি কি একটা লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড হইবে; প্রকৃত পক্ষেও তাহাই বটে।

“শ্রীযুক্ত” ও শ্রী” দেখিয়া ভাবিলাম, ভট্ট চতুষ্টয় সকলেই জীবিত, কিন্তু ভূমিকা ও গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম “শ্রীযুক্ত” ভট্টগণ বহুদিন হইল নরলোক হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেত-লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু “শ্রী” সংযুক্ত ভট্টযুগল অদ্যাপি ভব সংসারে লীলাখেলা করিতেছেন। প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্রগণ সাবধান। তোমাদের গুরু মহাশয়ের অবিধানে “শ্রীযুক্ত” অর্থ—মৃত।

গিরিশ বিদ্যারত্নের লেন ২৪ নং ভবনের পরিবর্ত্তে এইরূপ সংস্কেরিকেরি ঝাড়িবার প্রয়োজন এই ভট্টযুগ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। টাইটেল পেজ উল্টাইয়া দেখিলাম, সার্টিফিকেট একতাড়া অর্থাৎ আড়াই গণ্ডা, সার্টিফিকেট সকল গুলিই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়গণের প্রদত্ত। তৈলবট দ্বারা এই আড়াই গণ্ডা সার্টিফিকেট হাসীল করা হইয়াছে কিনা, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। কিন্তু কোন কোন মহাত্মা অনুরোধে পড়িয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কেহ বা স্বীয়নাম জাহির করিবার জন্যও সার্টিফিকেট দিয়াছেন। সর্ব্বশেষে সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সার্টিফিকেট দেখিতে পাইলাম। হরিশ্চন্দ্র ও শশীভূষণ ভট্টযুগল বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুত্রযুগল। পুত্রের প্রকাশিত গ্রন্থে পিতার সার্টিফিকেট ভট্টগণের একটি ফল বলিতে হইবে। এই অদ্ভুত গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের গর্ভ হইতে একবারে আড়াই গণ্ডা সার্টিফিকেট সহ ভূমিষ্ট হইয়াছেন। সমালোচকের বিচারে এই সকল সার্টিফিকেট প্রমাণ স্বরূপ কখনই গ্রহণ করা যাইতে পারেনা, অতএব তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর।

তদনন্তর ভূমিকা। “বার হাত কাকুড়ের তের হাত বিচি।” অক্ষর গণনা করিলে বোধ হয় মূলগ্রন্থ হইতে ভূমিকার অক্ষর সংখ্যান্যূন হইবে না।

ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে যে, বল্লাল সেনের গুরু গোপাল ভট্ট ১৩০০ শকাব্দে মূল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আর নবদ্বীপাধিপতির আদেশে ১৫০০ শকাব্দে আনন্দ ভট্ট দ্বারা ইহার পরিশিষ্ট রচিত হইয়াছে।

কলিকাতার যুঙ্গী (যুগী) কুলতিলক পদ্মচন্দ্র নাথের পুত্র “বাবু চন্দ্রকুমার নাথ মহাশয়” এই গ্রন্থের সত্বাধিকারী। তিনি কবিরত্ন ভট্টকে এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিবার জন্য অর্পণ করিয়াছিলেন। কবিরত্ন ভট্টের অবকাশ না থাকাতে তিনি তাঁহার অনুজভট্টকে ইহার অনুবাদের

ভারার্পণ করেন। এক সময় ব্রাহ্মণ শূদ্র সংযোগে চণ্ডাল জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, আর এই ঘোর কলিকালে যুঙ্গীভট্ট মিলনে "বল্লালচরিত" নামক অদ্ভুত গ্রন্থের উৎপত্তি।

আমরা বাল্যকালে দিদিমার নিকট একটুকু ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্দ্বারা অবগত আছি যে, ১৩০০ শকাব্দে ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭৮০ হিজরি অব্দে খ্যাতনামা পাঠান নরপতি সামস্ উদ্দিন আবুল মোজাফর ইলিয়স সাহার পুত্র আবুল মোজাহেদ সেকন্দর সাহ বাঙ্গালা দেশ শাসন করিতেছিলেন; সুতরাং ১৩০০ শকাব্দে বল্লালের গুরু গোপালভট্ট দ্বারা মূলগ্রন্থ রচিত হওয়ার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

নবদ্বীপের রাজবংশের ইতিহাসও আমরা একটুকু জ্ঞাত আছি। নবদ্বীপ রাজবংশের স্থাপনকর্ত্তা ভবানন্দ সমদ্দার হুগলীর কাননগুই দপ্তরে কার্য্য করিয়া "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৫২৮ শকাব্দে তিনি ১৪টি পরগণার জমিদারি সত্ব ও "চৌধুরী" উপাধী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৫৩৫ শকাব্দের ফরমাণ দ্বারা তিনি ওখড়া প্রভৃতি ৪টি পরগণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় নবদ্বীপ নগরী তাহার হস্তগত হয়। ভবানন্দের প্রায় এক শতাব্দী পর তাঁহার উত্তর পুরুষগণ "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৫০০ শকাব্দে নবদ্বীপাধিপতির অনুমত্যনুসারে এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট রচিত হওয়ার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যুঙ্গী হিতৈষী অর্থপিশাচ—ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তত্ত্বানভিজ্ঞ কোন আধুনিক ভট্ট দ্বারা এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সমালোচকের বিচারে তিনি জালের জন্য দণ্ডিত হওয়ার উপযুক্ত পাত্র।

প্রাচীন আর্য্যগণ যে জীবনচরিত রচনায় কিরূপ সক্ষম ছিলেন, হর্ষচরিতই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। গুণবান-গুণগ্রাহী, বিদ্বান—বিদ্যোৎসাহী "পরমেশ্বর পরম মাহেশ্বর নিশঙ্কশঙ্কর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন দেবের গুরু স্বীয় শিষ্যের কুৎসা কীর্ত্তন করিবার জন্য "বল্লাল চরিত" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কোন সুবোধ ব্যক্তি ইহা বিশ্বাস করিতে পারে? মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে বল্লালের চরিত্র বর্ণনা কিছুই নাই। ইহার পূর্ব্ব খণ্ড ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতির কুলজিগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। উত্তর খণ্ড আদ্যোপান্ত একটি অদ্ভুত কাণ্ড।

ইহাতে আছে কি—"বল্লালের রাজ্যে লোকসমূহের পাপাচারণ, সুবর্ণ বণিকদিগের অবশ্যতা, বল্লভানন্দের বিদ্রোহ, উহার দমন চেষ্টা, যোগীদিগের সহিত বিরোধ, বলদেব ভট্ট ও যোগীরাজের বচসা, যোগিরাজ কর্ত্তৃক বলদেবের নিষ্কাসন, যোগীদিগের দমনার্থ বল্লালের নিকট ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধ, বল্লাল সেনের ক্রোধ ও তাঁহার, সুবর্ণবণিক ও যোগিদিগের জাতিপাতনার্থ প্রতিজ্ঞা, সুবর্ণবণিকদিগের কর্ত্তৃক দাসত্ব কার্য্যে প্রতিবন্ধকতাচরণ, উহার প্রতিকারার্থ বল্লালের চিন্তা, দাস্য কর্ম্মে কৈবর্ত্তদিগের নিয়োগ। * কৈবর্ত্তদিগের চিহ্ন ধারণ শূদ্রের পক্ষে কাষ্ঠমালা ধারণের আবশ্যকতা, যোগীদিগের মধ্যে কতগুলির বল্লালের রাজ্য-

* মিথ্যা কথা। সেনরাজাদিগের রাজধানী প্রদেশে —পূর্ব্ববাঙ্গালায় কৈবর্ত্তগণ অনাচরণীয় সুতরাং বল্লালের প্রতি দোষারোপ করা অন্যায় হইয়াছে। গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানেই কৈবর্ত্ত আচরণীয়। ইহা গঙ্গার মাহাত্ম্য, বল্লালের নহে।

ত্যাগ ও কতগুলির চিহ্নত্যাগ ইত্যাদি * *” মনুরবংশাবলী, দক্ষ কন্যাগণ, ও রুদ্র ও রুদ্রাণী-দিগের নাম যোগীদিগের শ্রেণী ভেদ রুদ্র-দিগের বংশ, বিন্দুনাথের জন্ম (এই বিন্দুনাথ হইতে যোগীদিগের উৎপত্তি) তৎপর ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে শঙ্কর জাতি সমূহের উৎপত্তি বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

আমাদের প্রথম আপত্তি এই—যোগী ও (যুঙ্গী) যুগী একজাতি নহে। যাহাদের জন্ম মৃত্যু লীলা খেলা সমস্তই মারহাট্টা ডিচের মধ্যে হইতেছে, ধান্য বৃক্ষ নামক মহাবৃক্ষের আকৃতি বর্ণন করিতে যাহাদের গলদ্‌ঘর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাঁহারাই বোধ হয যোগী জাতির সংবাদ না জানিতে পারেন। বাঙ্গালার পশ্চিম প্রান্তস্থিত হুগলী বর্দ্ধমান হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালার পূর্ব্ব সীমান্ত-স্থিত ত্রিপুরা পর্য্যন্ত যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, আমাদের দেশে যোগী নামক এক জাতি লোক বাস করে, ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ইহারা প্রধানত সন্ন্যাসী বেশে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এজন্য পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ইহাদিগকে “খেলান্ত যোগী” অর্থাৎ ছদ্মবেশী যোগী এবং পশ্চিম বাঙ্গালায় ইহাদিগকে “সন্ন্যাসী যোগী” বলিয়া থাকে। আমাদিগের দেশীয় যুঙ্গী (যুগী) গণ সেই কুলুৎপন্ন বিন্দুনাথের বংশধর বলিয়া পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত হইয়াছে। আমাদের বিবে-চনায় তাহাদের এরূপ যত্ন নিতান্ত ঘৃণা-জনক।

ভগবান মনু বলিয়াছেন, মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে যে সকল জাতির নামোল্লেখ করা হয় নাই, ব্যবসায় দ্বারা তাহাদের জাতি নির্দ্দেশ করিতে হইবে। যদি ব্যবসায় দ্বারা যুঙ্গী (যুগী) জাতির উৎপত্তি নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে বোধ হয় ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না যে, তন্তু-বায় ও কোন প্রকার নীচজাতির সংযোগে যুগী জাতির উৎপত্তি। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে যুঙ্গী (যুগী) জাতির উৎপত্তি বৃত্তান্ত অন্যরূপ লিখিত হইয়াছে। তদ্‌পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বেশধারীর (ছদ্ম সন্ন্যাসী অর্থাৎ খেলান্তযোগীর) ঔরসে গঙ্গা-পুত্রজাতির রমণীর গর্ভে যুঙ্গী অর্থাৎ যুগী জাতির উৎপত্তি।

বল্লালচরিত প্রণেতার অসাধু ব্যবহার প্রদর্শন জন্য এস্থলে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে তিনটী ও বল্লালচরিত হইতে ৪ টি শ্লোক উদ্ধৃত করিব।

লেটাত্তীবর কন্যায়াং গঙ্গাতীরে চ শৌনক।
বভূব সদ্যো যো বালো গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০৭ ॥
গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্যেণ বেশধারিণঃ।
বভূব বেশধারীচ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১০৮॥
বৈশ্যাত্তীবর কন্যাযাং সদ্যঃ শুণ্ডী বভূবহ।
শুণ্ডী যোষিতি বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রকশ্চবভূবহ ॥ ১০৯ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ১০ ম অধ্যায়।

তৎপর বল্লাল চরিত শ্রবণ করুন—

লেটাত্তীবর কন্যায়াং গঙ্গাতীরে চ নিশ্চিতম্।
বভূব সদ্যো যো বালো গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯০ ॥
গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্যেণ বেশধারিণঃ। *
বভূব বেশধারীচ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯১ ॥
ব্রহ্মপুত্র কুলে যুঙ্গা বসতি বাদ্যকারকঃ।
সংস্কার বিহীনশ্চৈব শৌচাচার বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৯২ ॥
বৈশ্যাত্তীবর কন্যায়াং সদ্যঃ শুণ্ডী বভূবহ।
শুণ্ডী যোষিতি বৈশ্যাত্তু পৌণ্ড্রক শ্চাপ্যজায়ত ॥ ৯৪ ॥

বল্লাল চরিতম্। ৪২, ৪৩ পৃষ্ঠা।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শৌনকঋষিকে সম্বো-

* শশীভূষণ ভট্ট “বেশধারিণ” শব্দের অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়া ইহাকে নটস্থির করিয়াছেন। বিদ্যার দৌড় না হবে কেন?

ধন করিয়া জাতিবৃত্তান্ত বলা হইয়াছে। এজন্য ১০৭ শ্লোকের প্রথম চরণের "শৌনক" শব্দটী উঠাইয়া দিয়া বল্লাল চরিতের ৯০. শ্লোকের প্রথম চরণে "নিশ্চিতঃ" শব্দ বসান হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ১০৯ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের "পৌণ্ডু কশ্চ বভূবহ" পদটি উঠাইয়া বল্লালচরিতের ৯৩ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে "পৌণ্ডু-কশ্চাপ্যজায়ত" সন্নিবেশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত উক্ত পুরাণের উল্লিখিত ১০৭, ১০৮, ১০৯ শ্লোকের সহিত বল্লাল চরিতের উল্লিখিত ৯০, ৯১, ৯৩ শ্লোকের মধ্যে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পাঠকগণ দেখুন, বল্লালচরিত-লেখক কি আশ্চর্য্য কৌশলে ৯২ শ্লোকটি মধ্যস্থলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বোধ হয়, গ্রন্থকার ভাবিয়া ছিলেন, যুগী দিগকে একবারে উড়াইবা দিবার উপায় নাই। "সূয্যিমামার" দেশে বরাত দেওয়া হউক, কে তাহার খবর লইবেন। কিন্তু গ্রন্থকারের দুর্ভাগ্য বশত সমালোচক "ব্রহ্ম-পুত্রকুলের" খবর বিশেষ রূপে রাখেন। তথায় বাদ্যকারক যুগী জাতি নাই। পশ্চিম বাঙ্গালায় যুগীগণ যে ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, পূর্ব্ব বাঙ্গালার যুগীগণ সেই ব্যবসায় অবলম্বী।

এই গ্রন্থে এইরূপ আগ্রম, বাগ্রম পাগলামী ঢের আছে। কিন্তু তাহার প্রত্যেক বিষয়ের সমালোচনা করিবার আমাদের অবকাশ নাই। আমরা বাঙ্গালায় ইতর জাতি সমূহের উন্নতির সমূহ পক্ষপাতী, কিন্তু এরূপ ঘৃণিত পন্থা কেহ অবলম্বন করিলে আমরা তাহাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। একেত বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন গ্রন্থগুলিকে মাটী করিয়াছেন। তাহার পর আবার এ সকল কুকাণ্ড কেন?

উপসংহারে আমরা আর একটী কথা উল্লেখ করিব, তাহা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা।

এক নির্ব্বোধ জমিদার পুত্র "হেণ্ডনোট" কাটিয়া টাকা উপার্জ্জন করিত এবং বলিত "বাবা কি কল করিয়া গিয়াছেন নাম দস্তখত করিলেই টাকা পাওয়া যায়।" আমাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বলিতে পারেন, "প্রাচীন পিতৃপুরুষগণ কি সুন্দর কৌশল করিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থা দিলেই টাকা পাওয়া যায়।"

বল্লালচরিতের ভূমিকার ।৶০ পৃষ্ঠার টীকায় লিখিত—হইয়াছে যে, "বল্লাল রাজার রাজ্যে তাঁহার আজ্ঞায় ইহাঁদের (যোগীদিগের) যজ্ঞসূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা বাহির সিমুলিয়া নিবাসী পরম-পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর ৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও নবদ্বীপের প্রধান পণ্ডিত ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন এবং দেশ দেশান্তরের পণ্ডিত মণ্ডলীর শাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থানুসারে ইহাদের বংশধরেরা সন ১২৮৪ সালের ২৪ ফাল্গুন তারিখ হইতে বিধি পূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ক্রমশ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেছেন।"

৺ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও অন্যান্য কয়েক জন পণ্ডিতের প্রদত্ত একখণ্ড মুদ্রিত ব্যবস্থা পুস্তক আমরা পাঠ করিয়াছি। যদি ঐ ব্যবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তবে তৎসম্বন্ধে আমাদের প্রধান আপত্তি এই যে—

(১) কোন প্রামাণ্য গ্রন্থ (স্মৃতি শ্রুতি) দ্বারা এই ব্যবস্থা সমর্থিত হয় নাই;

(২) পণ্ডিতেরা অর্থ লোভে যে কোন ব্যবস্থা দিলে সমগ্র হিন্দুজাতি তাহা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিবে কেন!

(৩) ব্যবস্থা যোগীদিগের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।

(৪) যুঙ্গী (যগী) জাতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

"নদীয়ার চাঁদ" ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ব্যবস্থা আমরা দর্শন করি নাই। কিন্তু "বিদ্যারত্নখুড়" বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট বিশেষ রূপে পরিচিত। বঙ্গের শিরোভূষণ মহানুভব বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেনযে "বিদ্যারত্ন খুড়" ব্যবস্থা দানে দাতাকর্ণ ছিলেন। তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যেরূপ ব্যবস্থা প্রার্থনা করিতেন, তিনি মুক্ত হস্তে সেই রূপ ব্যবস্থা প্রদান করিতেন। কোন এক জমিদার পরিবারে পৌষ্যপুত্রের কলহে "বিদ্যারত্নখুড়" উভয় পক্ষে ব্যবস্থা প্রদান পূর্ব্বক অনেক টাকা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এরূপ কীর্ত্তিকাহিনী দিগন্তব্যাপী। এবম্প্রকার লোকের ব্যবস্থার মূল্য এক কপর্দ্দক হইতে পারে না। আমরা "ব্রজবিলাস মহাকাব্যের" সূচনাটি এইস্থলে উদ্ধৃত করিয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" করিব।

ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন বেহুদা পণ্ডিত।
আপাদ মস্তক গুণ রতনে মণ্ডিত॥
শুভক্ষণে তারে মাতা ধরিল উদরে।
নাহি দেখি সম তাঁর ভুবন ভিতরে॥
বুদ্ধির তুলনা নাই যেন বৃহস্পতি।
রূপের তুলনা নাই যেন রতিপতি॥
রসিকের চূড়ামণি সর্ব্ব গুণাকর।
সুশীলের শিরোমণি দয়ার সাগর॥
সুবোধের অগ্রগণ্য দানে কর্ণপ্রায়।
যেই যে বিধান চায়, সেই তাহা পায়॥
এবিষয় কেহ নাহি তাঁহার সমান।
একমাত্র তিনি নিজ উপমার স্থান।
তাহার গুণের কিছু করিব বর্ণন।
অবহিত চিত্তে সবে করহ শ্রবণ॥

পাঠকগণ "ব্রজবিলাস" পাঠ করিলে "বিদ্যারত্ন খুড়র" কীর্ত্তি কলাপ অবগত হইতে পারিবেন। এবম্প্রকার পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা কোন সুবোধ ব্যক্তি গ্রাহ্য করিতে পারেন না।

ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণ নূতন স্মৃতি প্রস্তুত করিয়া বলিতেছেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ,কর্ণ হইতে যোগী, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য,পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি।

মুখেন উৎপত্তি বিপ্রঃ কর্ণে যোগী তাথৈব্যচ।
বাহুঃ ক্ষত্র উরুর্ব্বৈশ্যঃ পাদৌ শূদ্রোযাতিস্তথা॥

স্মৃতিশাস্ত্রের অবমাননাকারী এবম্প্রকার "ব্রাহ্মণ পুঙ্গব" দিগকে পাগলা গারদে প্রেরণ করা উচিত কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

হা বিধাতঃ ইহারাই হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক ও হিন্দু সমাজের নেতা। এইরূপ মহারোগাক্রান্ত সমাজের কি পুনরুদ্ধারের আশা আছে!

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ

বাঙ্গালার জমিদার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

সভ্য জগতে উচ্চশ্রেণী দেশের মুকুট-মণি হইলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীই প্রকৃত শক্তিশালী। উচ্চশ্রেণী অথবা ভূস্বামিগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহাদের উন্নতির পথ রোধ করিতে সক্ষম হইতেছেন না। শিক্ষা ও সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত এ দেশেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন। আমাদের বঙ্গদেশ ভূস্বামি-প্রধান স্থান। বঙ্গালার ভূম্যধিকারিগণের পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান অবস্থার বিষয়ই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

হিন্দুজাতির প্রকৃত ইতিহাস নাই; সুতরাং হিন্দু রাজত্ব সময়ে জমিদার শ্রেণীর অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সুনিশ্চিত পরিজ্ঞাত হইবার উপায় নাই। পুরাণাদিতে যে সকল সামন্ত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিগণের নামোল্লেখ আছে, তাঁহাদের অধিকৃত ভূমির সহিত তুলনায় বর্ত্তমান সময়ের প্রধান প্রধান জমিদারদিগের অধিকৃত ভূমি অল্পায়তন হইবে না। তবে তৎকালের সামন্ত-রাজা প্রভৃতির অতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ এবং স্ব স্ব অধিকৃত রাজত্বের প্রকৃতিপুঞ্জের উপরে অসীম ক্ষমতা ছিল, বর্ত্তমান সময়ে তাহার শতাংশের একাংশও নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

মুসলমান রাজত্ব সময়েও জমিদার শ্রেণীর অবস্থা বর্ত্তমান কালের ন্যায় হীন ছিলনা। বাদসাহ আক্‌বরের সময়ে রাজস্ব সচীব রাজা তোড়লমল কর্ত্তৃক জরীপ ও বন্দোবস্ত শেষ হইলে কর আদায়ের সুবিধা ও দেশের শান্তি রক্ষার জন্য প্রাচীন ভূস্বামী এবং প্রভুভক্ত উপযুক্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বন্দোবস্তী ভূমি সকল জিম্বা করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সকল ভূস্বামী এবং কর্ম্মচারিগণ জিম্বদার শব্দে অবিহিত হইতেন। পারস্য "জিম্বাদার" শব্দ অপভ্রংশ হইয়া "জমিদার" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল জমিদারগণ অধিকৃত স্থানের শান্তি রক্ষার জন্য সর্ব্বথা বাধ্য ছিলেন। দস্যু তস্কর প্রভৃতির দণ্ড করিতে সক্ষম ছিলেন। প্রজাদিগের সর্ব্বপ্রকার আবেদনের বিচার ও মীমাংসা করিতেন। এতদ্ভিন্ন প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারিগণের জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকারী হইত, সুতরাং ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হইলেও স্থাবর সম্পত্তি বিভক্ত হইত না। নানকার, খামার, চাকরাণ ভূমি প্রভৃতির রাজস্ব ছিলনা। সায়ারী জমা ভূম্যধিকারিগণের প্রাপ্য ছিল।

বাদসাহী আমলে রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত ছিল না। প্রায় ভূম্যধিকারীই যথা সময়ে রাজকর প্রদান করিতেন না। এক এক ভূস্বামীর নিকট বহু টাকা রাজস্ব বাকী পড়িলে রাজ কর্ম্মচারিগণের চৈতন্য জন্মিত। সময়ে সময়ে জমিদারগণ রাজস্বের জন্য অন্ধকারাবৃত দুর্গন্ধময় কারাগারে অপরিসীম যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ রাজস্ব একেবারে না দিয়াও সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। রাজদরবারে কর্ম্মচারীদিগের

অযথা প্রাধান্য ছিল। যে সকল ভূম্যধিকারী উক্ত কর্ম্মচারীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাঁহারাই রাজস্বের দায় হইতে মুক্ত ছিলেন; পক্ষান্তরে কর্ম্মচারীদিগের বিরাগভাজন হইয়া বহু ভূস্বামীকে কারাগারে ভীষণ যন্ত্রণায় প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে। কর-আদায়ের সুশৃঙ্খলা থাকিলে বাদসাহগণ নিশ্চিন্ত থাকিতেন, অপিচ এই কলঙ্কেও কলঙ্কিত হইতে হইত না।

মুসলমান রাজত্বের অবসান এবং ইংরাজ রাজত্বের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠে। অরাজকতা উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে সকল শ্রেণীর লোকের গৃহে গৃহে বিচরণ করিয়াছিল। ডেলহৌসী প্রভৃতির সর্ব্ব সংহারিণী নীতি ভারতকে উৎসন্ন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। দেশের আপামর সাধারণ হইতে স্বাধীন রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধার্ম্মিক মাত্রেরই সর্ব্বনাশ, কেবল দুই এক জন অধার্ম্মিক পাষণ্ডের সুখের পৌষমাস উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সময়ে বাঙ্গালা দেশে (১১৭৬) ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বহু লোক অর্দ্ধাহারে অথবা অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করে। বহুলোক অখাদ্য আহার করিয়া, রোগ ভুগিয়া ইহজগত হইতে প্রস্থান করে। উদরের দায়ে অনেকে স্ত্রী পুত্র কন্যা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছিল। এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের বৎসরেও কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত কর আদায়-কারক দুর্বৃত্ত মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায় করা হইতে বিরত থাকা দূরে থাকুক, অধিকন্তু শতকরা দশটাকা বৃদ্ধি হারে খাজনা আদায় করে। দুর্ভিক্ষের দরুণ ফৌৎ ফেরারী প্রজার খাজনাও বাকী প্রজা হইতে ভীষণ অত্যাচারের সহিত আদায় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। দুর্ভিক্ষে ও রেজা খাঁর অত্যাচারে বাঙ্গালার একতৃতীয়াংশ লোক শমন ভবনে গমন করিয়াছিল। ইংরাজ এই অত্যাচার বিবরণ অবগত হইয়াও রাজস্ব ক্ষতির আশঙ্কায় সহসা কোনও প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন নাই।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজগণ জয়ী হইলেও ১৭৬৫ খ্রীঃ হইতেই এদেশে তাঁহাদের রাজত্বের সূত্রপাত হয়। উক্ত খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত পক্ষে এদেশ শাসন করিতে আরম্ভ করেন। ইংরাজ রাজত্বের শৈশবকালেই দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী দেশ এক প্রকার উৎসন্ন করে। কুশাসনে, সম্ভবাতিরিক্ত অর্থ লোভ, রাজপুরুষগণের অবিবেচনায় উৎসন্নের শেষ সীমায় যাইয়া উপস্থিত হয়।

ইংরাজ সমুচিত অর্থ লাভের সহিত দেশের সুশাসনে কুণ্ঠিত নহেন। অনায়াসলভ্য উৎসন্ন প্রায় বিরাট রাজত্বের অরাজকতার কাহিনী লণ্ডনে যাইয়া পঁহুছিল। ডাইরেক্টরগণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মস্তিষ্ক ক্ষয়কারী বহু চিন্তার পর এদেশে দশশালা বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিলেন। এই বন্দোবস্তে প্রজা সুখী হইল, জমিদারেরও আয় বৃদ্ধি হইল। আপাততঃ সর্ব্বাপেক্ষা রাজাই সমধিক লাভবান হইলেন। আশাতীত রাজস্ব লাভের সহিত তিনি দেশে শান্তি সংস্থাপনে সক্ষম হইলেন। প্রজা ও জমি-

দারের স্বত্ব নির্দ্ধারিত হওয়ায় কোন পক্ষেই আপত্তির কারণ রহিল না। সর্ব্ব মঙ্গল-প্রদ দশশালা বন্দোবস্ত অবশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হইল। ডাইরেক্টরগণের মস্তিষ্ক-ক্ষয়কারী চিন্তা পরিণামে সুফল প্রদান করিল। কঠোর "সূর্য্যাস্ত" আইনের কৃপায় তাঁহাদের রাজস্ব আদায়ে আর কোনও বিঘ্ন বাধা রহিল না, কিন্তু দেশের গণ্য মান্য প্রধান ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে অনেকের বিস্তৃত ভূমি সকল হস্তচ্যুত হইল। *

স্থায়ী বন্দোবস্তের বীজ বাঙ্গালার উর্ব্বর ক্ষেত্রে রোপিত হইল। নব অঙ্কুর দেখিয়া প্রজা ও জমিদার দুই হস্ত তুলিয়া ইংরাজ রাজকে আশীর্ব্বাদ করিল। লোক সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত ভূমির আদর ও মূল্য বৃদ্ধি স্বাভাবিক, সুতরাং জমিদারের খাজানাও বাড়িতে লাগিল। কিন্তু এ সময়ে রাজার রাজস্ব বাড়িল না। এদিকে অর্থের মূল্য স্বাভাবিক নিয়মে হ্রাস হইতে লাগিল, ধানের মণ ছয় আনা আট আনা ছিল, এখন এক টাকা হইল। প্রজার উপর জমিদারের খাজানা বৃদ্ধির উপায় ছিল, লেখা বাহুল্য জমিদার সেই সুযোগে স্বীয় ক্ষতি পূরণ করিলেন। কিন্তু স্থায়ী বন্দোবস্তে রাজার রাজস্ব সমভাবে রহিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রূপ বৃক্ষ এক্ষণে বিশালতা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতে লাগিল। রোডসেস্, পবলিক্-ওয়ার্ক-সেস্ প্রভৃতি অসংখ্য সেস্ রূপ শাখায় বৃক্ষটী শোভিত হইয়াছে। ফুল পূর্ব্বেই ধরিয়াছিল, এক্ষণে তাহা ফলে পরিণত হইয়াছে। বৃক্ষ এক, কিন্তু ফল দুই জাতীয়। একটী আঁটি শূন্য লেংড়ার আম, দ্বিতীয়টী মহাকাল অর্থাৎ মাকাল। প্রথমটী ইংরাজ লইতেছেন, নিরতিশয় আগ্রহের সহিত দ্বিতীয়টী আমরা গ্রহণ করিতেছি।

বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি পাদপগুলির শাখা প্রশাখা কালে যেমন প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হয়, স্থায়ী বন্দোবস্ত রূপ বৃক্ষের সেরূপ শাখাগুলিও কালে প্রকাণ্ড মহীরুহের আকারই যে ধারণ করিবে, চিন্তাশীল মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

পূর্ব্বে জমিদার ও প্রজার মধ্যে পরস্পর যে সদ্ভাব ছিল, নানা কারণে বর্ত্তমান সময়ে সে সদ্ভাব আর নাই। সাধারণ প্রজাগণ জমিদারকে যেমন হর্ত্তা কর্ত্তা বলিয়া জানিত, তেমনই আবার আশ্রয়দাতা, স্নেহশীল ও পরমোকারী বলিয়া মনে করিত; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে জমিদারের অনুগত ও অনুরত ছিল। শরণাগতের প্রতি দয়া প্রকাশ মানুষের সাধারণ ধর্ম্ম। জমিদারগণ অত্যন্ত প্রজাবৎসল ছিলেন। তাঁহারা প্রজাদিগকে সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। প্রজার সুখে সুখী হইতেন, প্রজার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। সময়ের পরিবর্ত্তনে বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্টের নব নব আইন কানুনের মহিমায় জমিদার ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাবের পরিবর্ত্তে, বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। নূতন প্রজাসত্ব ও খাজানা বিষয়ক আইন, সেই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঘন ঘন আহুতি প্রদান করিতেছে। আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না, ভাবিয়াও ভাবিতেছি না, কেবল দগ্ধ হইতেছি।

শিক্ষার দোষেই বল, আর সময়ের পরি-

* কৃষ্ণনগরের রাজা, দিনাজপুরের রাজা, নাটোরের রাজা ও তারপাশার মহাশয়েরা প্রভৃতি।

বর্ত্তনেই বল, বাঙ্গালার অধিকাংশ ভূম্যধিকারিগণ ঋণগ্রস্ত। পাশ্চাত্য সভ্যতার আপাত মনোরম চাকচিক্যময় বাহ্যাড়ম্বর গুলি জমিদারদিগকে ক্রমেই অন্তঃসার শূন্য করিতেছে, তাহার উপর আবার ফাকা উপাধির প্রলোভন!! মিত্ররাজা, করদ রাজা, পেন্সন প্রাপ্ত রাজাদের ছাড়িয়া দিলেও, রাজ্যশূন্য দিল্লী দরবারের রাজা, জুবিলির রাজা, দানের রাজা, অদানের রাজা, কে, সি, এস্, আই, মহারাজায় দেশ সমাচ্ছন্ন। সহরে, পাড়াগাঁয়ে, অলিতে গলিতে, হাটে বাজারে সর্ব্বত্র রায় বাহাদুর। যে দেশে এত 'বাহাদুর', সে দেশে আবার কাপুরুষ কোথায়? শারদীয় মেঘের ফাকা গর্জ্জনের সঙ্গে কবি রাজকৃষ্ণের এই মহামহিম, প্রবাল প্রতাপান্বিত রাজা বাহাদুরদের কথা মনে পড়িয়াছিল।

"কিসের কিসের বাধা? সাহেবে চাহিলে চাঁদা,
সহস্র অযুত লক্ষ অনা'সে বিলায়,
হায় একি অবিচার, কার টাকা হয় কার,
পর ধনে পোদ্দারির এই ব্যবসায়
ধনীরা প্রজার ধনে ধনীত্ব ফলায়।
'রাজা' রায় বাহাদুর, লভিতে বাঙ্গালী শূর,
ছিছিরে জীবন কাটে ইংরাজ সেবায়!
খানিক কাগজ দিয়ে, রাশি রাশি টাকা নিয়ে
চতুর ইংরাজ বেশ চাতুরী খেলায়!
* * * *
এদিকে নিজের শিরে, ছিছিরে, ছিছিরে ছিরে
বিলাতী পাদুকা ধিক্ বহে লয়ে যায়,
* * * *
হাত পা সকলি আছে, তবু বিলাতের কাছে
কি লজ্জা ঢাকিতে লজ্জা বস্ত্রখানি চায়!
* * * *
বাঙ্গালী বিষম বোকা বিশাল ধরায়!"

মিতব্যয়ী, মিতাচারী, সুশিক্ষিত ভূম্যধিকারী ঋণ প্রাপ্ত না হইলেও উপাধিলোভ-শূন্য কিনা, বলিতে পারিনা। যাহাহউক্, "লজ্জা ঢাকিবার জন্য বস্ত্র চাওয়ার" লজ্জা দূর করা দূরে থাকুক্, তাঁহাদের ধন ভাণ্ডার সামান্য অভাব মোচন করিতেও উন্মুক্ত নহে।

"সুই সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে
দিয়াশলাই কাটী তাও আসে পোতে"!

পূর্ব্বে বলিয়াছি, চির স্থায়ী-বন্দোবস্তে আমরা যে ফল লাভ করিয়াছি, তাহা 'মাকাল'। দেশের সুশিক্ষিত কুবেরদিগের ধনরাশি সেই মাকাল ফল লাভের জন্য ব্যয়িত হইতেছে। তাঁহারা তালুকের পর তালুক, পরগণার পর পরগণা ক্রয় করিবেন, বহু বৎসরেও সেই মূলধন পুনরায় গৃহে আসে কি না সন্দেহ, কোম্পানীর কাগজের তাড়ায় লোহার সিন্দুক পূর্ণ করিবেন, তথাপি অশেষ লাভজনক স্বদেশের মঙ্গলকর বাণিজ্য ব্যবসায়ে ধনের সদ্ব্যবহার করিবেন না।

ইংরাজ আজ প্রায় সমস্ত ভারতের অধিপতি। একই রাজার অধীনে, একই শাসনে শাসিত বোম্বাই ও কলিকাতার তুলনা কর, দেখিবে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাঙ্গলার সর্ব্বনাশ করিয়াছে কি না? বোম্বাই আটী শূন্য লেংড়ার আম পায় নাই, পাইবেও না, কিন্তু আমাদের ন্যায় মাকাল সংগ্রহ করেনা। বাঙ্গলার জমিদারগণ অলসতার সজীব প্রতিমূর্ত্তি? ইহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া গদি তাকিয়ায় বসেন, আর আলবোলায় অম্বরি তামাক্ টানিতে টানিতে ঋণ অথবা মোকর্দ্দমার বিষয় ভাবেন, আর ভাবিতে ভাবিতেই ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

প্রবন্ধের মুখবন্ধে বলিয়াছি, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন। সে শক্তি কিরূপ ধীর গতিতে সঞ্চিত হইতেছে, তাহা প্রবন্ধান্তরে লিখিব। এই শ্রেণীকেও লক্ষ্য করিয়া কবিবর রাজকৃষ্ণ তাঁহার "শারদীয় জলদ খণ্ডে" যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

"————বাঙ্গালী মাত্রেই অই,
নিরেট পাগল মেষ সন্দেহ কি তায় ?
নাশিতে দেশের দুখ, বাক্যে হয় শত মুখ
কবন্ধের মত কিন্তু কাজের বেলায় !
* * * * *
বালক ক্রীড়ার মত, সভা করে কত শত
বক্তৃতা বিতর্ক তর্ক যেমনি ফুরায়
আকাশ কুসুম সম শেষটা দাঁড়ায় !
কারে বলে দেশোন্নতি,নাহি জানে একরতি
সকলি সম্পন্ন করে কথায় কথায় !"

আমরা মুখে যেমন রোখা, কাজে তেমন সোখা নই। বৃক্ষের মধ্যে যেমন এরণ্ড, পক্ষীর মধ্যে যেমন আরসুলা, সভ্যজাতি সমূহের মধ্যে বাঙ্গালী সেই স্থান লাভ করিয়াছে কি না, তাহাও সন্দেহের কথা। *

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪০)

দক্ষিণাপথে—রামানন্দ সঙ্গোৎসব।

রামানন্দ রায় উত্তর করিলেন, আমি এ সব তত্ত্বের কি জানি ? তুমি যাহা বলাইতেছ, শুক পাখীর ন্যায় তাহাই বলিয়া যাইতেছি। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; হৃদয়ে প্রেরণা দিতেছ, জিহ্বায় তদুপযোগী কথাও ফুটাইতেছ; আর আমার মুখ বীণা যন্ত্রের ন্যায় বাজিয়া যাইতেছ।

শ্রীচৈতন্য রামানন্দের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, ভক্তিতত্ত্বের কিছুই জানি না, সার্ব্বভৌমের সহবাসে আমার হৃদয় নির্ম্মল হইলে তাঁহাকে কৃষ্ণ ভক্তিতত্ত্ব কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, রামানন্দ ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি কেহ জানে না। তোমার মহিমা শুনিয়া তোমার নিকট ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করিতে আসিয়াছি। তুমি এখন আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়া স্তুতি করিতেছ, এই কি তোমার উচিত ? সন্ন্যাসী, পরম হংস হইলেই হয় না। যিনি শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব জানেন, তিনিই গুরু। শূদ্র ও কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইলে পরম গুরুর পূজা পাইবার যোগ্য। আমাকে সন্ন্যাসী জ্ঞানে বঞ্চনা করিও না। রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব বলিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর।

* ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে বাঙ্গলার জমিদারদের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষরূপে জানিতে হইলে আদর্শ ভূমাধিকারী রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর প্রণীত "জমিদারি কার্য্য সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী" পাঠ কর।

রামানন্দ রায় মহা ভাগবত ও প্রেমিক হইয়াও গৌরের ব্যাকুলতা ও অনুরাগ দেখিয়া ভাবপ্রেমে টলমল করিতে লাগিলেন এবং অনুরাগ ভরে বলিয়া উঠিলেন, 'বুঝিলাম তুমি সূত্রধার, আমি নট; তুমি যেমন নাচাবে, আমাকে তেমনি নাচ্‌তে হবে। তুমি বীণাধারী, আমার জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি যেমন বাজাইবে, তাহাকে তেমনি বাজিতে হইবে। শুন! শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, পরম ঈশ্বর, সর্ব্ব অবতারী ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্ব্বৈশ্চর্য্য, সর্ব্ব মাধুর্য্য, সর্ব্ব রস পরিপূর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাঁহার অপ্রাকৃত নব যৌবন, তিনি চির নূতন পরম সুন্দর। অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত অবতার সকলের আশ্রয়। যত ভক্ত, যত সাধক [illegible] সকলের ভক্তি ও প্রীতির আশ্রয়ও বটেন ও বিষয়ও বটেন। যত রস, যত ভক্তি, যত তত্ত্ব, সব তাঁহাতেই পর্য্যবসিত। তিনি পরম পুরুষ, উজ্জ্বল শ্যাম রসময়; কি পুরুষ, কি যোষিৎ, কি স্থাবর জঙ্গম, সকলেরই চিত্তাকর্ষক; এমন কি আপনার মাধুর্য্যে আপনি বিভোর হইয়া আপনাকে আপনি আলিঙ্গিতে চাহেন।

শ্রীচৈতন্য প্রেমাবেগে বলিলেন, বুঝাইয়া বল।

রামানন্দ উত্তর করিলেন, সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের আনন্দেই সৃষ্টিলীলা। শ্রুতি বলিতেছেন, আনন্দ রূপ ঈশ্বর হইতেই সৃষ্টির আরম্ভ! আনন্দরূপেই স্থিত এবং আনন্দরূপেই পর্য্যবসিত। তিনিতো আপন আনন্দে আপনি মাতোয়ারা। তবে আবার লীলা কেন?

ইহার উত্তর এই যে, জীবকে সেই আনন্দের মধুর রস আস্বাদন করাইতে। শ্রুতি তাঁহাকেই 'রস' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনন্দ রূপ লীলা-তত্ত্ব ও রস-তত্ত্বের সহিত প্রকটিত হইলেই কৃষ্ণ রূপ নিষ্পন্ন হয়। যাহা খাঁটি রস তাহাই অমৃত, আর যাহা অমৃত, তাহাই চির নূতন, তাহাতে জরা বার্দ্ধক্য, ক্ষয়, বিনাশ কিছুই নাই। আবার যাহা লীলা, তাহাই পরম সুন্দর সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক, পরম কল্যাণময়, অরূপ রূপমাধুরী পূর্ণ। এখন দেখুন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক, পরম সুন্দর, নবকিশোর অপ্রাকৃত পুরুষ কিনা? আনন্দ রূপ হইতে সৃষ্টি-লীলা, ইহাতেই বুঝা যায়, তিনিই সকল অবতারের অবতারী, সকল কার্য্য কারণের মূল কারণ, সকল বৈকুণ্ঠ, সকল ব্রহ্মাণ্ড ও সকল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর। জড় জগতের অতীত ধামের নাম শ্রীবৈকুণ্ঠ, তাহার তিনটী প্রকার ভেদ আছে। মথুরা জ্ঞান রাজ্য, দ্বারিকা ঐশ্বর্য্য ধাম, আর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রজধাম মাধুর্য্য পরিপূর্ণ। সেই ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলার স্থান। সেখানে তিনি অপ্রাকৃত গোপ বালক বা শ্রীনন্দ-নন্দন, পিতা মাতার অকপট বাৎসল্যে ক্রীড়নাক। সেখানে তিনি পরম সুন্দর হৃদয় সখা, বিপদ সম্পদ, রোগ শোকের একমাত্র বন্ধু। সেখানে ঐশ্বর্য্য বা চিদ্‌বিভূতির লেশ মাত্র নাই। অথচ দাস্য সেবার পরম পাত্র। আর সেখানে তিনি শৃঙ্গার রসময় নব নাগর। তাঁহাতে আত্ম পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেও হৃদয়ের আবেগ যায় না, সকল দিয়াও আত্তি ফুরায় না। এইতো শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব সংক্ষেপে বলিলাম। সহস্র ২ জিহ্বা হইলেও কৃষ্ণের গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। বলিতে বলিতে রায় রামানন্দ অধৈর্য্য

হইলেন। গৌরও অবহিত ভাবে শুনিতে লাগিলেন।

রামানন্দ রায় বলিলেন, এখন শ্রীরাধিকার তত্ত্ব কিছু বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান। যথা চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি। প্রথমটী অন্তরঙ্গা, দ্বিতীয়টী বহিরঙ্গা ও তৃতীয়টী তটস্থা। ইহার মধ্যে অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিই তাঁহার স্বরূপশক্তি। যে শক্তি ঈশ্বর স্বরূপে না থাকিলে, ঈশ্বরত্ব অসম্ভব হয়, তাহারই নাম চিচ্ছক্তি। এই শক্তি ঈশ্বরতত্ত্বে ওতপ্রোতরূপে চিরবিরাজিত। জীবশক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি কখন ঈশ্বরতত্ত্বে প্রকটিত থাকে, কখন বা থাকে না, সে জন্য তাহা তটস্থা। আর মায়াশক্তি ভগবান হইতে প্রকটিতা হইয়া ভগবৎ স্বরূপে আপনার প্রভাব বিস্তার না করিয়া তাহার বাহিরে থাকে, এজন্য তাহা বহিরঙ্গা। একথার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের পূর্ণ ও অনন্ত-শক্তি কিছু সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হয় নাই। অত্যল্পাংশ মাত্র বিশ্ব রচনায় লিপ্ত থাকায় সৃষ্ট পদার্থমাত্রে কাজেই অপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। এই অপূর্ণতা নিবন্ধনই উহারা ভ্রান্তি বা মোহের অধীন হইয়াছে। ইহার নামই মায়াশক্তি। সে যাহা হউক, স্বরূপ চিচ্ছক্তিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের 'সৎ বা 'নিত্যত্ব' প্রকাশিকা শক্তির নাম সন্ধিনী; 'চিৎ' বা চৈতন্য প্রকাশিকা-শক্তির নাম সম্বিৎ; আর আনন্দ বা আহ্লাদ প্রকাশিকা-শক্তির নাম 'হ্লাদিনী'। শক্তি ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব জানা যায় না; সুতরাং এই সকল শক্তি বা প্রকৃতিই আমাদিগকে পরম পুরুষ-শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া দিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরের আনন্দ-রূপই লীলার মূল কারণ। সুতরাং এই হ্লাদিনী শক্তিই কৃষ্ণকে আহ্লাদ দান করে, অথবা সুখরূপ কৃষ্ণ হ্লাদিনী দ্বারা লীলা সুখসম্ভোগ করিয়া থাকেন। আবার ভক্তগণও এই হ্লাদিনী দ্বারা সুখরূপ কৃষ্ণের সুখ আস্বাদন করিয়া থাকেন। অতএব জানা যাইতেছে, ভগবানের যাবতীয় শক্তির মধ্যে হ্লাদিনীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। হ্লাদিনীর সার অংশ অর্থাৎ হ্লাদিনী হইতে সুখাস্বাদন করিলে ভগবৎ হৃদয়ে বা ভক্ত হৃদয়ে যে স্থায়িভাব অঙ্কিত হয়, তাহার নাম আনন্দ চিন্ময় রস; যাহার অপর নাম প্রেম। এই প্রেম আবার প্রগাঢ় হইলে যাহা স্থায়ী হয়, তাহার নাম মহাভাব। শ্রীরাধিকা এই মহাভাব স্বরূপিনী বই আর কিছু নন। এই মহাভাব সমস্ত চিন্তার সার চিন্তা বা চিন্তামণি। চিন্তামণিই শ্রীরাধিকার প্রকৃত স্বরূপ, আর ললিতাদি সখীনিচয় তাঁহার কায়ব্যূহ। শ্রীরাধার প্রাকৃত কায়া নাই। আবর্ত্তিত কৃষ্ণস্নেহই তাঁহার উজ্জ্বল বর্ণ। কারুণ্য রসের তারল্য বা চির নবীন রসের ও লাবণ্যরসের অমৃত জলে রাধারূপ যেন পুনঃ পুনঃ স্নাত হইয়াছে। লজ্জারূপ শ্যাম-সাটী ও কৃষ্ণানুরাগ রূপ রক্তসাটী পর্য্যায়ক্রমে রাধা-দেহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে; প্রণয় বা মান কঞ্চুলিকার বক্ষ সমাচ্ছাদিত। সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম, প্রণয়-চন্দন এবং স্মিত কান্তি-কর্পূরে শ্রীঅঙ্গ বিলেপিত ও শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল রস মৃগমদে চর্চ্চিত। প্রচ্ছন্ন মান তাঁহার বেণী-বিন্যাস, আর রস শাস্ত্রে যাহাকে নায়িকার ধীরা ধীরাত্মক গুণ বলে, তাহা তাঁহার উত্তমাঙ্গের পট্টবাস; অনুরাগ তাঁহার অধরের তাম্বুল রাগ; প্রেম কৌটিল্য নয়-

নের কজ্জল। সুদীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষাদি সঞ্চারিভাব, ও [illegible] রসশাস্ত্রের বিংশতিভাব তাঁহার শ্রীঅঙ্গের ভূষণ। ত্রৈলোক্যে যত গুণ শ্রেণী আছে, তাহা তাহার অঙ্গের পুষ্পমালা; সৌভাগ্য রূপ চারু তিলক ললাটে সমুজ্জ্বল, আর প্রেম-বৈচিত্র্য রত্নাদিতে মণ্ডিত কলেবর। তিনি মধ্য বয়স্কা হইলেও কিশোরী। নিজাঙ্গ-সৌরভ-পর্য্যঙ্কে কৃষ্ণলীলা-বিভাসিনী মনোবৃত্তি সখীনিচয়ে পরিবৃতা হইয়া শ্রীরাধিকা সদা শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গ চিন্তা করিতেছেন; কৃষ্ণনামগুণযশঃ শ্রবণ করিতেছেন এবং কৃষ্ণনামগুণযশঃ কীর্ত্তন করিতেছেন। তিনি নিরন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে উজ্জ্বল রসের মাধুর্য্য আস্বাদন করাইতে যত্নবতী। রাধার ন্যায় সৌভাগ্য-শালিনী কে? তাঁহার ন্যায় সুন্দরী ও কলাবতীই বা কে হইতে পারে? শ্রীরাধিকার গুণ শ্রীকৃষ্ণই সংখ্যা করিতে পারেন না, তা জীব ছার কি বলিবে?

শ্রীগৌরাঙ্গ উত্তর করিলেন, ইহাতে কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণলীলার গৌরবই অধিক বুঝা যাইতেছে। লীলাময়ী শ্রীরাধিকা হইতে আনন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় মধুর রস আস্বাদন করিয়া বিভোর হইতেছেন, তাহাতেই শ্রীরাধার এত গৌরব। আচ্ছা এই যে কৃষ্ণলীলা মনোবৃত্তি রূপ সখীর কথা বলিলেন, ইহা কোন্ তত্ত্ব?

রায় রামানন্দ বলিলেন যে, সৃষ্ট জীবকে স্বীয় আনন্দরস আস্বাদন করান, লীলা-প্রকাশের যেমন এক উদ্দেশ্য, তেমনি লীলার উজ্জ্বল মাধুর্য্য রস আস্বাদন করিয়া স্বকীয় পূর্ণানন্দকে উচ্ছ্বাসিত করা অপর উদ্দেশ্য। বিন্দু সিন্ধুসঙ্গমে যেমন সুখী হইবে, আবার সিন্ধুও বিন্দুর বিন্দু দান পাইয়া ততোধিক সুখী হইয়া থাকেন। জীবের প্রেম ভগবানে, ভগবানের প্রেম জীবে; এই বিনিময়ে কি অপূর্ব্ব আনন্দ-লহরীই উঠিয়া থাকে? পরা প্রকৃতি ও মহা-ভাবময়ী শ্রীরাধিকা ভিন্ন এই সুখ-লহরী তুলিতে কাহারও সাধ্য নাই। কিন্তু কৃষ্ণ-লীলার মহাভাবময়ীর বিকাশ তো সখীর সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না। মহা-ভাবকে পরিপুষ্ট করে কে? লীলাময়ের আনন্দ চিন্ময় রসের যত কিছু বৃত্তি আছে, তাহারা মঙ্গল, সৌন্দর্য্য, শোভা, সুচিত্র, সুভাব, সুহাস্য, প্রণয়, অনুকূলতা প্রভৃতি যাহা কিছু লীলাময়ী সদ্‌বৃত্তি, তাহারাই নিরন্তর মহাভাবের পরিপোষিণী। যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গিণীসঙ্গমে মহানদী পরিপুষ্টা হইয়া প্রধাবিতা হয়, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ চিন্ময় ভাবলহরী মহাভাবে সঙ্গতা হইয়া উহাকে নিরন্তর সম্বর্দ্ধন করিয়া থাকে। আনন্দ রসের এই সকল খণ্ডই ললিতাদি সখী প্রকৃতি। ইহারা মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার পরিবারবর্গ হইয়াও তাহা হইতে অভিন্নাত্মিকা, বলিতে কি, ইহারাই শ্রীরাধিকার কায়ব্যূহ রূপিণী। রাধাকৃষ্ণের সুখ বিভু স্বপ্রকাশ হইলেও চিদ্-বিভূতি রূপিণী সখীদিগের সাহায্য ব্যতীত ক্ষণমাত্রও রসপুষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাই সখীতত্ত্ব বা গোপীতত্ত্ব।

শ্রীচৈতন্য প্রেম-বিহ্বল বাক্যে বলিলেন, এসকল তত্ত্ব ত শুনিলাম। এক্ষণে রাধা কৃষ্ণের প্রেম বিলাস বর্ণন করিয়া অভিলাষ পূর্ণ কর।

রামানন্দ উত্তর করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ধীর ললিত নায়ক, তিনি নানা রসে রসিক, নিত্য

নবীন, পরিহাস-বিশারদ এবং সদানন্দ। যখন নব জলর শ্যাম সুন্দর অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে হৃদয়ে উদিত হইয়া ডাকিতে থাকেন, তখন কি আর গৃহে মন ফিরিতে চায়! রাধা সঙ্গে নিরন্তর কাম ক্রীড়াই তাঁহার কার্য্য।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, উত্তম কথা, কিন্তু ইহার পর আর যদি কিছু থাকে, বর্ণন করিয়া পরিতৃপ্ত কর।

রায় উত্তর করিলেন, ইহার পর আর কি আছে জানিনা, তবে প্রেমের বিবর্ত্ত বিলাস নামে যে এক লীলা আছে, তাহা শ্রবণে তুমি সুখী হইবে কি না, বলিতে পারিনা। এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড-হর্ম্ম্যে লীলারূপী কাম, শিল্পী পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত জতুতে শ্রীরাধিকার মহাভাবময়ী প্রকৃতি জতু যখন উভয়ের নবানুরাগরূপ হিঙ্গুল বর্ণ প্রেমাগ্নি দ্বারা গলাইয়া অভিন্ন রূপে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলে, তখনই প্রেমের বিবর্ত্ত বিলাস হয়। বর্ষা কালীন প্রগল্ভা নদীর গৌরবর্ণ জল, জলধির সুনীল জলে মিশিয়া একাকার হইয়াও ঈষৎ রেখায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। এই বলিয়া রামানন্দ রায় প্রেমভরে স্বরচিত এক গীত গাইলেন।

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল; অনু দিন বাড়ল অবধি না পেল। না সো রমণ না-হাম রমণী; দুঁহ মনোভাব পেশলজানি। এ সখী সে সব প্রেম কাহিনী, কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি। না খোঁজলু দূতি, না খোঁজলু আন; দুঁহকা মিলনে মধ্যেতে পাঁচ বাণ। অবশুই বিরাগ তুহ ভেলি দোতি! সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি।

এই কথা শুনিতেই শ্রীচৈতন্য প্রেম বিহ্বলচিত্তে স্বহস্তে রাম রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন এবং প্রেমাবেগ সংযত হইলে কহিলেন, এখন কামতত্ত্ব কি, বলিলেই সাধ্য নির্ণয় সমাপ্ত হয়। রামানন্দ রায় উত্তর করিলেন, লীলা সুখ আস্বাদিতে ভগবানের যে সুতীব্র কামনা, তাহারই নাম কাম। ইহা কেবল এক মহাভাবময়ী রাধিকাতেই পরিতৃপ্ত হয়, অন্যত্র তাহা তৃপ্ত হইতে পারে না। অস্মদাদি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনাকে কাম বলা যায় বটে; কিন্তু তাহা আমাদের নরকের কারণ মাত্র। ভগবৎ সেবার জন্য যে সুতীব্র বাসনা বা লোভ, তাহার নাম কাম নহে, ইহা নির্ম্মল প্রেম। জীবকে কামে মজায়, প্রেমে ভজায়। গোপীদিগের নিঃস্বার্থ প্রেম কেবল কৃষ্ণকে সুখ দিতে! তাহাতে কাম গন্ধ নাই, সুতরাং উহা প্রেম। ভগবান্ যখন গোপীদিগের ও শ্রীরাধিকার এই সুনির্ম্মল প্রেম আস্বাদন জন্য সুতীব্র লালসা-যুক্ত হয়েন, তখনই তাঁহাকে শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তি বলা যায়।

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, সাধ্য বস্তু এই পর্য্যন্তই, তাহাতে সন্দেহ নাই, তোমার অনুগ্রহে এসব বুঝিলাম। সাধন বিনা তো সাধ্য বস্তু লাভ হইতে পারে না, অতএব কৃপা করিয়া উহা পাইবার উপায় বলিয়া দাও?

রামানন্দ উত্তর করিলেন, আমি তোমার ক্রীড়ার পুতুল, যা বলাইতেছ, তাই বলিতেছি। আমার মুখে তুমিই বক্তা, আবার তুমিই শ্রোতা। সাধনের রহস্য কথা বর্ণন করি, শুন। রাধা কৃষ্ণের এই গূঢ় লীলা, ঐশ্বর্য্য ভাবের তো কথাই নাই, মাধুর্য্য ভাবেও জানা যায় না, দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবেরও অগোচর। একমাত্র সখী দিগেরই ইহাতে অধিকার। সখীরাই এই

লীলা পুষ্টি করিয়া বিস্তার করেন, আবার তাঁহারাই ইহা আস্বাদন করেন। সখীদিগের আনুগত্য ভিন্ন ইহা পাইবার উপায় নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সখীদিগের প্রেম নিঃস্বার্থ! তাঁহারা কৃষ্ণলীলার সুখ আস্বাদন করিতে চাহেন না! শ্রীকৃষ্ণ সহ রাধিকার মিলন করাইয়াই অধিক সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীরাধা ব্রজ-কুমুদ-বিধু শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কল্পলতা, আর সখীগণ সেই লতিকার যেন পত্র পুষ্প। লীলামৃত জলে এই লতিকা অভিসিঞ্চিত হইলে, পল্লবাদি তাহাতেই সবর্দ্ধিত হইয়া থাকে! তাহাদের জন্য পৃথক সিঞ্চনের প্রয়োজন হয়না, এই নিঃস্বার্থ গোপি-প্রেম লাভ করিতে না পারিলে রাধা কৃষ্ণের যুগল ভাব লাভের উপায়ান্তর নাই। বেদ ধর্ম্ম, লোক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, জাতি, কুল, ধন, মান, ভয়, ভাবনা, যোগ তপস্যার আশা ছাড়িয়া দিয়া সুতীব্র অনুরাগ-ময়ী ভক্তি পথে সিদ্ধ ভাবময়ী কোন গোপীর ভাবে আপনাকে অনুপ্রাণিত করিয়া তত্তৎ গোপীভাবামৃত লাভ করিতে হয়; সাধক দেহে গোপীর সিদ্ধ দেহ আরোপ করিয়া গোপীর আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। তবে কালে সিদ্ধিলাভ করিয়া রাধা কৃষ্ণের যুগল ভাব লাভে সমর্থ হইতে পারা যায়।

এই কথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য রামরায়কে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রেমাবেশে উভয়ে গলাগলি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ভাবের জমাটে কোন্ দিক্ দিয়া রাত্রি পোহাইয়া গেল, কেহই বুঝিতে পারিলেন না। বিদায়কালে রামরায় বলিলেন "যদি আমাকে কৃপা করিতে এখানে আসিয়াছ, তবে দিন দশ থাকিয়া আমার পামর মনকে পরিশুদ্ধ কর।"

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন "তোমার গুণ শ্রবণে যেমন আসিয়াছিলাম, তেমনি রাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব শুনিয়া কৃতার্থ হইলাম। বুঝিলাম, রাধাকৃষ্ণ প্রেমরসের তোমাতেই সীমা। দশদিন কি, আমি যত দিন বাঁচিব তোমার সঙ্গ ছাড়িতে পারিব না। নীলাচলে দুই-জনে একত্র থাকিয়া মধুর কৃষ্ণ কথায় কাল কাটাইব। ইহার পর সেদিনকার জন্য রাজা রামানন্দ রায় বিদায় হইয়া গেলেন। পরদিন সন্ধ্যার পর উভয়ে আবার মিলিত হইলে অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিদ্যা মধ্যে কোন্ বিদ্যা সার?' রামানন্দ উত্তর করিলেন, —কৃষ্ণ ভক্তি বিনা আর বিদ্যাই নাই।" শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ কীর্ত্তি বড়?

উত্তর। "কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যার খ্যাতি।"

প্রশ্ন। "শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি কি?"

উত্তর। "যার রাধাকৃষ্ণ প্রেম আছে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা ধনী।"

প্রশ্ন। "দুঃখের মধ্যে গুরুতর কি?"

উত্তর। "কৃষ্ণভক্তি বিরহের ন্যায় আর দুঃখ নাই।"

প্রশ্ন। "মুক্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"

উত্তর। "যাহার কৃষ্ণপ্রেম আছে।"

প্রশ্ন। "গানের শ্রেষ্ঠ কি?"

উত্তর। "রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি গীত।"

প্রশ্ন। "শ্রেয়ঃ কি?"

উত্তর। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ বিনা জীবের শ্রেয়ঃ নাই।"

প্রশ্ন। "স্মৃতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি?"

উত্তর। কৃষ্ণ নামগুণ লীলাই প্রধান স্মরণ।

প্রশ্ন। ধ্যেয়ের মধ্যে কি ধ্যান কর্ত্তব্য?

উত্তর। "রাধাকৃষ্ণ পদাম্বুজ ধ্যান।"

প্রশ্ন। কোন্ স্থানে বাস কর্ত্তব্য ?"

উত্তর। "ব্রজলীলার স্থানে।"

প্রশ্ন। "শ্রেষ্ঠ শ্রবণ কি ?"

উত্তর। "রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই কর্ণ রসায়ন।"

প্রশ্ন। "শ্রেষ্ঠ উপাস্য কি ?"

উত্তর। "রাধাকৃষ্ণ যুগল নাম।"

প্রশ্ন। মুক্তি বাঞ্ছাকারী ও ভক্তি বাঞ্ছাকারীর মধ্যে প্রভেদ কি ?"

উত্তর। "যেমন স্থাবর দেহ ও দেব দেহ; অরসজ্ঞ কাক নিম্বের তিক্ত ফল খায়, আর রসজ্ঞ কোকিল আম্র মুকুলের মাধুর্য্য পান করে, এই প্রভেদ।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর নৃত্য কীর্ত্তনে রজনী অবসান হইলে রামানন্দরায় স্বস্থানে গমন করিলেন। আট দশ দিন এমনি করিয়া কাটিয়া গেলে রামানন্দ রায় গৌরের প্রেমাবেগ ও অপূর্ব্ব ভাব-লহরী যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। এক দিন রাত্রিতে রামরায় গৌর চরণে নিবেদন করিলেন "এই কয় দিনে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, কত তত্ত্বই আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হইল। আমি জন্মেও এত তত্ত্ব কখন জানিতাম না। বুঝিলাম, ভগবান্ নারায়ণ যেমন ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তুমি কৃপা করিয়া অলক্ষিতে এত তত্ত্ব আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করিয়া দিয়াছ। এ শক্তি অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন কাহারও নাই; তিনি বাহিরে কাহাকে কিছু না বলিয়া হৃদয়ে বস্তুতত্ত্ব উন্মীলিত করিয়া দেন। এখন আমার মনে একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, কৃপা করিয়া তাহা অপনয়ন করিয়া দাও।

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, কি? রামানন্দ উত্তর করিলেন, বলিব? প্রথমে তোমাকে সন্ন্যাসীরূপ দেখিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি যেন, শ্যাম রূপ; আর যেন তোমার সম্মুখে এক কাঞ্চনময়ী পঞ্চালিকা রহিয়াছে; তাঁহার গৌর কান্তির আভায় তোমার সর্ব্বাঙ্গ যেন অচ্ছাদিত। আবার দেখিতেছি, যেন তুমি বংশীবদন শ্যামসুন্দর রূপে ভাবময় সচঞ্চল আঁখিতে আমাকে দেখিতেছ। ইহার কারণ কি, আমাকে অকপট ভাবে বল। এ যে দেখি, বড়ই চমৎকার। গৌরচন্দ্র উত্তর করিলেন "রাধা কৃষ্ণে তোমার কি না প্রগাঢ় প্রেম, সেই জন্য এরূপ দেখিতেছ। প্রেমিক মহাজন গণ প্রেম-নেত্রে স্থাবর জঙ্গমেও শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি দেখিতে পান; স্থাবর জঙ্গমের মূর্ত্তি তাঁহাদের নেত্রগোচর হয় না; সর্ব্বত্রই ইষ্টদেব স্ফূরণ হইয়া থাকে। শুন নাই কি শাস্ত্রে লিখিত আছে, ভাগবতোত্তম ব্রহ্মরূপাধিষ্ঠানে সকলেই পরিপূর্ণ দেখেন; তাঁহার নিকট তরুলতা পত্রপুষ্প সকলই আপনাদের মধ্যে প্রকাশমান পরমেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া যেন মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে। তুমি রাধাকৃষ্ণের মহা প্রেমিক ভক্ত; সর্ব্বত্র রাধাকৃষ্ণ দর্শন করা তোমার পক্ষে কিছুই বিচিত্র নয়।

যখন এই আলাপ হইতেছিল, তখন উভয়েই প্রেমে ভরপুর। রামানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশিয়া বলিয়া উঠিলেন, প্রভু, আমার কাছে আর চালাকি করিওনা। আমি সব বুঝিয়াছি। শ্রীরাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করিয়া গূঢ়রূপে নিজ রস আস্বাদন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়া

অনুসঙ্গে ত্রিভুবন প্রেমে ভাসাইলে, এখানে আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়া আবার কপট ব্যবহার করিতেছ কেন?

গৌরচন্দ্র উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, রামরায়! আমিও এক পাগল, আর তুমিও এক পাগল। আমরা সকেলই সমান পাগল। আমার পাগলামি শুনিলে লোকে উপহাস করিবে, সে জন্য কোথায়ও কিছু বলি না। তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমার গৌরদেহ নয়; রাধাঙ্গ স্পর্শন জন্য গৌরাঙ্গ হইয়াছে। শ্রীরাধিকা তো ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা আর কাহাকেও স্পর্শ করেন না। আমি তাহার ভাবে স্বীয় আত্মা অনুভাবিত করিয়া কৃষ্ণ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতেছি। একথা অন্যের গোপ্য হইলেও তোমার কাছে লুকাইতে পারিনা। কথা গোপনে রাখিও, লোকে শুনিলে উপহাস করিবে। এই বলিয়া গৌরচন্দ্র নাকি রামানন্দকে রসরাজ, মহাভাব, দুই রূপে বিবর্ত্তিত অপূর্ব্ব রূপ দেখাইয়াছিলেন। রামানন্দ সেরূপ দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলে, গৌর তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া ধরিয়া রাখিলেন। মূর্চ্ছাবসানে রামানন্দ রায় গৌরের সন্ন্যাসী রূপ দেখিয়া পূর্ব্ব-দৃষ্ট রূপ স্বপ্ন দর্শনের ন্যায় ভাবিয়া বিস্মিত হইলেন।

এই রূপ প্রেমালাপে, রস লীলা তত্ত্ব বিচারে, অপরূপ দর্শনে, কৃষ্ণ কথা-রঙ্গে শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগরে রাজা রামানন্দের সহিত দশরাত্রি অতিবাহিত করিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, তামা, কাঁসা, রূপা, সোনা, রত্ন চিন্তামণি মিশ্রিত কোন খনি পাইয়া খুড়িতে থাকিলে লোকে যেমন ক্রমে ক্রমে উত্তম বস্তু লাভ করে, তেমনি রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্যে এ কথা ও কথা হইতে হইতে কতই মূল্যবান তত্ত্ব কথা আলোচিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। দামোদর স্বরূপের কড়চা অনুসারে তিনি চরিতামৃতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহারই ছায়া লইয়া এই পরিচ্ছেদের বৃত্তান্ত লিখিত হইল। রসরাজ মহাভাব মূর্ত্তি দর্শনে রামানন্দের মূর্চ্ছা ও রাধাঙ্গ স্পর্শনে গৌরচন্দ্রের আত্ম প্রকাশ সম্বন্ধে কথা বার্ত্তা কিভাবে হইয়াছিল, তাহা সুরসিক পাঠক আপন আপন আলোকে বুঝিয়া লইবেন।

দশম রাত্রের শেষে গৌরচন্দ্র রামানন্দের নিকট বিদায় চাহিয়া বলিলেন, তুমি বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে যাইবার উদ্যোগ কর; এদিকে আমিও তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অচিরে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। উভয়ে এক সঙ্গে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণ আলাপনে সময় কাটাইব। পরস্পর গাঢ় আলিঙ্গনের পর রামানন্দ রায় বিদায় হইয়া গেলে গৌরচন্দ্র শয়ন করিলেন এবং রজনী অবসানে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধানান্তে বিদ্যানগর পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় চলিয়া গেলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

মন্ত্রি-অভিষেক।*

শক্তিশালী সহোদরদ্বয়,—দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের শান্ত ছায়ায় বিচরণ করেন, ক্রীড়াও কার্য্য করেন;—সম্প্রতি রাজনীতির রঙ্গাকাশে সমুদিত;—দৃশ্য সুন্দর,—বঙ্গভূমি আশা করে, উহা কার্য্যকরও হইবে। প্রখরবুদ্ধি পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর বৃটিশ-বঙ্গের প্রথম রাজ নৈতিক দলের প্রধান ব্যক্তি। ঠাকুর বংশ আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য আলোক বিস্তারের "পায়োনিয়ার"। দ্বারকানাথের বংশধরগণ বংশের মুখ, উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বল-তর করিতেছেন।

সাহিত্য, সংসারে থাকিয়া, সংসার-কোলাহল হইতে দূরে থাকে। সাহিত্যের কামনা—শান্তি। স্বভাবতই সে কামনা। সুতরাং সাহিত্য-সেবকগণ রাজ নীতির কোলাহলময় কোন্দলে কদাচিৎ যোগ দিয়া থাকেন। কিন্তু সংসারের লোকে তাঁহাদের রাজনৈতিক মতামত শুনিতে এবং জানিতে সর্ব্বদাই কৌতূহলাক্রান্ত। তাহার কারণ সুস্পষ্ট।

সাহিত্য-সেবক ও সাহিত্যকারের চিন্তা, অন্যান্য অনেক শ্রেণীর লোকের চিন্তা অপেক্ষা স্বভাবতই সুদূর-ব্যাপিনী। সে চিন্তা দ্বারা রাজনৈতিক প্রশ্ন-বিশেষ বা ঘটনা-বিশেষ কিরূপ ভাবে গৃহীত ও চিন্তিত হয়, তাহা জানিতে কাহার না বাসনা হইয়া থাকে? পুনশ্চ,—সাহিত্য-কার সদা সর্ব্বক্ষণ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত; অথচ তাঁহাদের বৈষয়িক ব্যাপারে,—তাহাদের সাময়িক কোন্দল কোলাহলে একরূপ নির্লিপ্ত। কাযেই কৌতূহল আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

রাজনীতির দৈনিক সংগ্রামে, সাহিত্যের উপাসক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনেক সময়েই প্রবেশ করেন না, প্রায়ই তাহা হইতে তাঁহারা 'প্রচ্ছন্ন' থাকেন; কিন্তু রাজনীতির, কেবল রাজনীতির কেন, সকল নীতিরই মূল বীজ বপন করেন তাঁহারা। তাঁহারা অনভিব্যক্ত অধিনায়ক,—অদৃশ্য অভিনেতা।

চেলসির রুদ্ধ-দ্বার কুটীর-কক্ষে কার-লাইল ধ্যান-নিমগ্ন, কিন্তু কে বলিবে, মানবীয় কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের নৈতিক বাক্য কাললাইল কর্তৃত্ব করেন নাই? ভারতীয় আর্য্যঋষি নিবিড় অরণ্য-নিবাসে লুক্কায়িত থাকিয়া সাম্রাজ্য শাসনের সর্ব্ব-ময় প্রভুত্ব করিতেন। সাহিত্যের স্বভাব-জাত সন্ততি রুশো ও ভিক্তর হুগো;—তাঁহারা, সাহিত্য মাত্র উপজীবী,—কিন্তু রাজনৈতিক জগতে কি মহা আলোড়নই না উত্থিত করিয়া গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

সাহিত্যাচার্য্যগণ রাজনীতির উন-কোটি, খুটী নুটী লইয়া নাড়া চাড়া করেন না; কিন্তু যাহা রাজ-নীতির বা প্রজা-নীতির মৌলিক পদার্থ, তাহা সাহিত্য হইতে অলক্ষ্যে উদ্ভূত ও বিবর্দ্ধিত হইয়া জন সাধারণের মধ্যে অলক্ষ্যে বিস্তার লাভ করে।

পৃথিবীতে যাঁহারা প্রভূ শক্তিসম্পন্ন, তাঁহারাই প্রয়োগ কর্ত্তা। প্রয়োগ ক র্তা রাজা,

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক বক্তৃতা।

সাম্রাজ্য-শাসন-সচীব এবং সমাজের অধিনেতৃগণ। সাহিত্য বিজ্ঞানে উদ্ভাবন করে, শিল্পে সংগঠন করে;—শাসয়িতা-গণ করেন প্রয়োগ। সংসারের প্রয়োগ-কর্ত্তাদিগের পদবী সর্ব্বোচ্চ। শিল্প-বিজ্ঞানের আবিষ্কার, সাহিত্যের সত্য, সংসারে প্রযুক্ত ও প্রচারিত না হইলে তাহা প্রায় কিছু-নয়ের মধ্যে,—অতএব তাহা,—সমাজের হিতার্থে বা সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি অর্থে,—কার্য্যে প্রযুক্ত ও কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া জন সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। শিল্প ও বিজ্ঞানের কীর্ত্তি ও সাহিত্যের মুক্তি, প্রচার করেন, কার্য্যে পরিণত ও প্রয়োগ করেন,—শাস-য়িতা, সচীব ও সামাজিকগণ। ইঁহারা কর্ম্মী। কর্ম্মীর হস্তে সভ্যতার অনুষ্ঠান, কবির মস্তিষ্কে তাহার উপাদান। কবি অর্থে বৈজ্ঞানিক, শিল্পী ও সাহিত্যকার কোম্পা-নীকে বুঝিবে।

কবিবর বায়রণ, কবি অপেক্ষা কর্ম্মীর পক্ষপাতী ছিলেন। বায়রণ এবং শেলি উভয়ই ঘোর প্রজা-তান্ত্রিক ছিলেন। মহাকবি মিলটন প্রজা-নৈতিক রাজ্যের কেবল সেবক নহেন, সম্পাদকত্ব করিয়া-ছিলেন। মিল্টন কবি এবং কর্ম্মী। বায়রণ এবং শেলির নাম কর্ম্ম জগতে প্রকাশ্যে প্রচা-রিত তত নহে। না হউক। বায়রণ এবং শেলির নাম য়ুরোপীয় সাধারণ তন্ত্রের সুক্ষ্ম-দেহে গভীর অঙ্কিত। বায়রণ এবং শেলি নীরবে রাজনৈতিক সংস্কারের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাম্য স্বাধীনতার যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ফুল-ফল-বান বৃক্ষে পরিণত হইতে এখনও বহু যুগ বাকী আছে।

অসাধারণ লোক অপেক্ষাকৃত অতি অল্পই জন্মেন। কিন্তু সংসারে অসাধারণকেও সাধরণ কার্য্য করিতে হয়, —করা উচিত,—না করা প্রত্যবায়। সেক্ষপীয়র অসাধারণ কবি। কিন্তু সাধারণ কার্য্য,—সাধারণের অতি সামান্য কার্য্যও সেক্ষপীয়র করিয়া গিয়াছেন। করিয়া গিয়াছেন বলিয়া কি সেক্ষপীয়র অসাধারণ নহেন? কবি হইলেই যে তাঁহাকে ঘর গৃহ স্থালীর কিছুমাত্র কর্ম্ম করিতে নাই, ক্রমাগত "কুঞ্জ-কাননে" বসিয়া কোকিলের ডাক শুনিতে হয়, এমনতর কোন কথা নাই। কবিরও কর্ম্মী হওয়া উচিত।

সেক্ষপীয়র, মিল্টন মহা কর্ম্মী। আমাদের ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র কবিকঙ্কণও কোন্ কর্ম্মী নহেন? তিনি রাজনৈতিকও কোন্ নহেন?—প্রজানৈতিকও কোন্ নহেন? কবিকঙ্কণ বাঙ্গালীর কবি, ঐতিহাসিক, পুরোহিত, প্রতিনিধি,—সব। যেমন পুরী, তেমনি পুরোহিত, যেমন প্রকৃতির লোক, তেমনি প্রতিনিধি;—তাহার অন্যথা হয় নাই বলিয়া যাহারা নাসিকা কুঞ্চিত করে, তাহারা নির্ব্বোধ। মুকুন্দরাম যদি মন্দ হয়েন, সে দোষ মুকুন্দরামের নহে, সে দোষ তৎকালিক বাঙ্গালী-জগতের মনুষ্যের।

বৃহতের সহিত ক্ষুদ্রের তুলনা করিলে বলা যায়, বায়রণ শেলির ন্যায় আমাদের হেম নবীনও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অলক্ষ্যে কিঞ্চিৎ কার্য্য করিয়াছেন। আনন্দমঠের কবিও কিঞ্চিৎ করিয়াছেন। স্বীকার করুন বা না করুন, বাঙ্গালীর অদ্যকার এই কংগ্রেস উপরোক্ত কবি-কার্য্য পরম্পরার নিকট কিয়ৎপরিমাণও ঋণী।

ঠাকুর ভ্রাতৃ-যুগল সৎ প্রকৃতির সুসন্তান,

—সদ্বিদ্যায় শিক্ষিত;—তাঁহারা সম্পদের সুলালিত ক্রোড়ে বর্দ্ধিত ও পালিত। অতএব স্বভাবতঃ এবং শিক্ষা বশতঃ তাঁহারা সুখ-সরলতার সুস্বাদু দুগ্ধময়। তাঁহারা সংসার ক্লেশের ন্যায় বিষয়ীর বৈষয়িক চতুরালীতেও অনভ্যস্ত। শুনিয়াছি, তাঁহাদিগের 'সঙ্গ' সংসারের সাধারণ 'সঙ্গ' হইতে বিলক্ষণ স্বতন্ত্র,—সাধারণতঃ দৈনিক পৃথিবীর তুলনায় তাঁহাদের অধিবাসিত পৃথিবী টুকু যেন একটু অভিনব।

জীবন-যাত্রার জ্যোৎস্নাময় পথের পথিক, তাঁহারা নৈসর্গিক শোক-সন্তাপ অবশ্যই সহ্য করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই,—কিন্তু কঠোর সংসারে সন্তরণ-কারী জীবের যাহা অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্ট,—সেই অনিবার্য্য নিত্য অভাবের দারুণ দংশন কখনও সহ্য করেন নাই;—স্বতঃ করেন নাই,—পরতঃ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া হয়ত অনুভবও করেন নাই। সেই জন্যই বোধ হয় কবি রবীন্দ্রনাথ কবি মুকুন্দ রামের কাব্যে কবিতা উপভোগ করিতে সম্যক সক্ষম হয়েন না। কল্পনার কবি, কার্য্যের কবিকে বুঝেন না, ইহা এক আক্ষেপ। কিন্তু সে আলোচনার অবকাশ এখানে নাই।

স্বাভাবিক বুদ্ধিশক্তি সর্ব্বত্রই সমান কার্য্য করে। বিচক্ষণতা ধর্ম্মমঞ্চের ন্যায় বৈষয়িক বেঞ্চেও বিচক্ষণতা। সাহিত্য-সেবক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিগত কতিপয় বৎসর হইতে ব্রাহ্ম সমাজের উপাচার্য্য;—সম্প্রতি তিনি "জমিদার পঞ্চায়তের" সম্পাদক। জমিদার পঞ্চায়ত" এক বৈষায়িকী সভা। ব্রাহ্মসমাজস্থ বেদিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; বৈষায়িকী সভার সম্পাদক রূপেও তিনি অল্প বিচক্ষণতার আভাস দেন নাই। 'বিষয়কার্য্যে' অতীব তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া যাঁহারা বিশিষ্ট এবং অনবরত বিষয়-ব্যাপারে নিরত, তাঁহাদের কাহারও কাহারও অপেক্ষা বিষয় ব্যাপারে নূতন ব্রতী জমীদার পঞ্চায়তের সম্পাদক দ্বিজেন্দনাথ ঠাকুর পঞ্চায়তের কার্য্যপ্রণালী পরিচালনা কল্পে অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন।

বিষয়ীরূপে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম দৃষ্ট পাঞ্চায়ত গৃহে। পরন্তু তিনি 'মরকত-গৃহে প্রজা-নৈতিক রাক্ষসী সভার সভাপতি। দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক বক্তৃতার আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। অতএব এস্থলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই পাঠকের সম্মুখ রীতিমত উপস্থিত করি। কারণ তিনিই এ প্রবন্ধের প্রধান নায়ক।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য 'মনোনয়ন' পদ্ধতির খণ্ডন ও 'নির্ব্বাচন' প্রস্তাবের অনুমোদন জন্য উপরি উক্ত প্রজা-সভা। সভার সভাপতি দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর;—সভায় সম্রাজ্ঞীর কলিকাতা-নিবাসী অগণিত সংখ্যক প্রজা সমুপস্থিত;—সভার বহুতর বক্তাদিগের মধ্যে রবীন্দ্র নাথ জনৈক বক্তা। বক্তাদিগের অনেকেই ইংরাজীতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন;—স্বয়ং দ্বিজেন্দ্র নাথও ইংরেজীর দৌরাত্ম্য পরিহার করিতে পারেন নাই; কিন্তু রবীন্দ্র নাথের বক্তৃতা বাঙ্গালায়। ইহা বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলা ভাষার অহঙ্কার এবং রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট গৌরব।

রবীন্দ্রবাবুর এই রাজ-নৈতিক বক্তৃতা "মন্ত্রি-অভিষেক" নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বোধ করি ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম রাজনৈতিক

সন্দর্ভ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি আধ-সাহিত্যিক, আধ-রাজ-নৈতিক ও সামাজিক রকমের বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহার নাম,—(স্মৃতি-শক্তি যদি আমাদিগকে প্রবঞ্চিত না করিয়া থাকে) "হাতে-কলমে"। হাতে-কলমে বিদ্রূপে ও রহস্য-রসিকতায় রগ-রগে।" সুকোমল কবিতার উৎস রবীন্দ্র-নাথ বিদ্রূপ করিতেও বিশিষ্ট-হস্ত। "তাঁহার হাতে কলমে" ছোটখাট গোছের একখানা ব্যঙ্গ কাব্য। 'হাতে-কলমের' লেখক রাজ-নৈতিক গলাবাজির প্রতি এবং তথা কথিত Constitutional agitation এর প্রতি এমনতর এক কটাক্ষ করিয়াছিলেন যে, সে কটাক্ষ,—সে কোমল—কুটিল কটাক্ষ অনে-কের আমরণ মনে থাকিবার কথা। কিন্তু 'হাতে কলমের' লেখক এবং মন্ত্রি-অভি-ষেকের বক্তার, এই কতিপয় বৎসরমাত্র সময়ে যেন কিঞ্চিত ভিন্নতা ঘটাইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইল। এই 'ভিন্নতা'—সাময়িক স্রোত ধরিয়া হিসাব করিলে উন্নতিরই দিকে বলিতে হয়।

'হাতে-কলমের' কর্ত্তা রবীন্দ্রনাথ যাহার দোষ ঘোষণা করিয়াছেন, মন্ত্রি-অভিষেকের বক্তা রবীন্দ্রনাথ তাহারই অতি সুন্দর সমর্থন করিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বাঙ্গালী বড় 'বাক্যবাগীশ' হইয়া উঠি-য়াছে বলিয়া অনেকে ব্যঙ্গ করে। সাহেবরা ত করেনই,—স্বদেশীয় বিজ্ঞেরাও করেন;—হাতে কলমের কবিও খুব কঠিন-রূপে করিয়াছিলেন; করার যে কারণ নাই, তাহা বলিতেছি না; তবে মন্ত্রি-অভিষেকের বক্তা সে বিষয়ে কি বক্তৃতা করিয়াছেন শুনুন;—

"ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকমণ্ডলী "ষড়যন্ত্রকারী বাবু সম্প্রাদায়" "মুখ-সর্ব্বস্ব বাক্যবীর" ইত্যাদি বিশেষণের মধ্যে আপন গাত্র জ্বালা নিহিত করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সশব্দে আমাদের প্রতি (বাক্যবাণ?) নিক্ষেপ করিতেছেন। আমরা হাসিয়া বলিতেছি, কথা তোমরাও কিছু কম বল না। তোমরা যদি আরম্ভ কর ত আমরা কি তোমাদের সঙ্গে কথায় আঁটিয়া উঠিতে পারি! তোমাদের কাছেই আমাদের শিক্ষা। কথার বারব শক্তিতেই ত তোমা-দের এত বড় রাজ নৈতিক যন্ত্রটা চলিতেছে। কথা ভরা রাশি রাশি পুঁথি জাহাজে করিয়া প্রতিনিয়ত আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছ, এতদিন মুখস্থ করিয়াও যদি দুটো কথা কহিতে না শিখিলাম, তবে আর কি শিখিলাম। তোমাদের নিকট হইতে শিখি-য়াছি, কথাই তোমাদের উনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মাস্ত্র। কামান বন্দুক ক্রমশঃ নীরব হইয়া আসিতেছে।"

ইহার মধ্যে একটু মিষ্ট ব্যঙ্গ আছে, তা থাকুক। কথা উনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্মাস্ত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেকালেও কথার 'কেরামত' কম ছিল না। কথার জোরে বিষ নামিত, কথার তোড়ে ভূত ছাড়িত;—তোমার "মন্তর—তন্তর" সেও বাক্যন্ত্রের বায়বীয় শক্তি হইতে উদ্ভূত।

'মন্ত্রি-অভিষেক' নামটী বেশ। এবং অর্থটা একটু "আগ বাড়াইয়া" ধরিলে, নামটা বক্তব্য বিষয়টীর কতক কাছাকাছিও বটে।

রাজকার্য্য চলে আইন-কানুনে। আমা-দের এখানকার আইনকানুন তৈয়ারি হয় লাটসাহেবদের সভায়। সভায় অবশ্য সভ্য থাকে, সভ্য নহিলে আর সভা কি? এখন

ধর লাটসাহেবরা হো'লেন রাজা। আইন তৈয়ার করার সভার সভ্যেরা কাজেই লাট-সাহেবরূপ রাজার মন্ত্রী। এই মন্ত্রী মহাশয়েরা রাজকার্য্য বা অকার্য্যের উপর বড় একটা মন্ত্রণা দিতে অধিকারী নহেন;—কোন একটা আইন তৈয়ার হওয়ার সময় সে বিষয়ে আপন আপন মতামত জানাইতে সক্ষম। তা সে যা হউক, ইহারা এক রকমের মন্ত্রী বই কি?

এই রকমের মন্ত্রী মহাশয়দিগকে প্রচলিত প্রথা অনুসারে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, লাট সাহেব অর্থাৎ রাজা; এখন সেই মন্ত্রীদের কতক কতককে নিযুক্ত করিতে চাই আমরা, প্রজা। ইহা লইয়া গণ্ডগোল,—কথা বার্ত্তা, কংগ্রেস্ এবং আমাদের আলোচ্য রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা। পরন্তু ইহা লইয়াই লর্ড ক্রস এবং মিঃ ব্রাডলার "বিল"। ক্রসের 'বিল' বলে, মন্ত্রি-অভিষেক করিবেন রাজা, ব্রাডলার বিল বলে, তাহা করিবে প্রজা।

কিন্তু আমাদের পাঠকবর্গ ত আর মূর্খ নহেন যে, ঐ সর্ব্ব-শিক্ষিত-জন-বিদিত এবং আলোচিত বিষয় অত অধিকতর খোলসা করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইতে হইবে?

ক্রসের বিলে নির্ব্বাচন প্রচলনের অভাব বলিয়াই তাহার প্রতিবাদ; নতুবা তাহাতে ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সম্বন্ধে অনেক উন্নতির কথা আছে। আক্ষেপের বিষয়, সেই সকল উন্নতির কথা গুলির উল্লেখ আদপেই কেহ করিতেছেন না। রবীন্দ্র বাবুও করেন নাই।

রবীন্দ্র বাবু তাহার উল্লেখ করেন নাই; মিষ্টার ব্রাডলার 'বিল' সম্বন্ধেও বিশেষ কোন কথা কহেন নাই। সংক্ষিপ্ত কথায় তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে, যখন আমরা ভারতীয় প্রজা নির্ব্বাচন প্রণালী একান্ত ব্যগ্রতার সহিত আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, তখন তাহা প্রদান করা ইংরাজ রাজের সর্ব্বতোভাবে উচিত। কারণ তদ্দ্বারা প্রকৃতি-পুঞ্জের সন্তোষ উৎপাদিত হইবে। শাসন-কার্য্যে সন্তোষ পদার্থটী উপেক্ষার যোগ্য নহে।

ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারত শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতবর্ষেরই উন্নতি;—রবীন্দ্র বাবু এই কয়েকটী কথাকে 'জ্যামিতিক' স্বতঃ-সিদ্ধ এবং স্বীকার্য্য বলিয়া ধৃত করিয়া তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকার্য্যের উপর তাঁহার সব কয়টা যুক্তি, তর্ক স্থাপিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবুর যুক্তি এইরূপ;—

"ভারত শাসনের মুখ্য উদ্দেশ্য ভারত-বর্ষের উন্নতি। সেই উন্নতির জন্য ভারত-বর্ষীয় কতকগুলি মন্ত্রীর সাহায্য প্রার্থনীয় হইয়াছে। অতএব ইহা সহজেই মনে হয় যে, আমরা ভারতীয় লোক সেই সকল ভারতীয় মন্ত্রীদিগকে আপনারা নিজে নির্ব্বাচন করিয়া দিলে কাজটাও ভাল হইবে, আমাদের মনেরও সন্তোষ হইবে।"

ইহা কবি-হৃদয়ের উপযুক্ত সরল যুক্তি, তাহাতে অবশ্য কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্র বাবু তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন;—

* * ভরসা করিয়া বলিতে পারি, এমন অবিশ্বাসী এ সভায় কেহই নাই, যিনি বলিবেন, ভারতের উন্নতিই ভারত শাসনের মুখ্য লক্ষ্য নহে।"

পুনশ্চ তিনি বলিতেছেন;—

* * আমরা যদি স্থির চিত্তে পর্য্য-

ধান করিয়া দেখি, তবে ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আমরা এত বহুল সুফল লাভ করিয়াছি যে, তাহার নিঃস্বার্থ উপকারিতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কৃতঘ্নতা মাত্র।”

ভারতের উন্নতি কল্পে ভারত শাসিত হইতেছে এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টে ভারতবর্ষ বহুল সুফল লাভ করিয়াছে, ইহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় আমরাও স্বীকার করি; আমাদের ন্যায় অনেকেই স্বীকার করেন। তবে রবীন্দ্রনাথ বাবুর ‘স্বীকার্য্যে’ এবং আমাদের স্বীকার্যে কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য আছে। কারণ “অবিশ্বাসী” ও “কৃতঘ্ন” হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার আশঙ্কা সত্বেও আমরা সবল ভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে সঙ্কুচিত নহি যে, ভারতের উন্নতি ভারত শাসনের উদ্দেশ্য হইলেও তাহা “মুখ্য উদ্দেশ্য” নহে;—গৌণ উদ্দেশ্য। পরন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট-অনুষ্ঠিত ভারত-উপকার “নিঃস্বার্থ” বা “নিষ্কাম” নহে,—তাহা স্বার্থমূলক ও সকাম। কারণ তাহাই স্বাভাবিক এবং তজ্জন্য আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিন্দু মাত্রও নিন্দনীয় নহেন। যদি এ সময়ে, বা যে কোন সময়েই হউক, এ দেশে হিন্দু রাজার হিন্দু গবর্ণমেণ্ট থাকিত, তাহা হইলে তাহার অনুষ্ঠিত ভারত-উন্নতিও গৌণ উদ্দেশ্যমূলক এবং তৎকৃত উপকারও স্বার্থ-সঙ্কুল হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রবাবুর ‘রাজ-নীতির’ মূল কথাতেই আমাদের যখন কিঞ্চিৎ মত ও বিশ্বাস পার্থক্য হইতেছে, তখন তিনি সেই মূল হইতে যে সকল শাখা প্রশাখা উত্থিত করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ ঐকমত্য হইবারও সম্ভাবনা নাই। সে বিষয়ে বাক্য ব্যয় করাও বিফল বিবেচনা করি।

উপস্থিত বিষয় প্রসঙ্গে আমাদের যদি কোনও বক্তব্য থাকে, তাহা এই যে, যদি ক্রশের বিল বিষয়োপযোগী না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাডলার বিলও বিষয়োপযোগী হয় নাই। আমাদের বিবেচনায়, উহারা উভয়ই “এক ভস্ম আর ছার” ইত্যাদি। ব্রাডলার বিলে প্রতিনৈধিক নির্ব্বাচন আছে বটে, কিন্তু সে থাকা না থাকা। তদ্দ্বারা আসল কার্য্য এক পদও অগ্রসর হইবে না,—একটা হৈ চৈ হইবে বটে।

ব্রাডলার বিলে ‘নির্ব্বাচন’ আছে যেন নির্ব্বাচনেরই জন্য, শাসন-কার্য্যের সংস্কারের জন্য নহে। ব্রাডলার বিল ও কংগ্রেসের কথা একই। কংগ্রেসও এ সম্বন্ধে চাহিতেছেন কেবল ‘নির্ব্বাচন’, সুশাসন নহে। কারণ প্রজা-নির্ব্বাচিত শত সংখ্যক সদস্যের মত যদি একমাত্র সভাপতির ইঙ্গিতে ‘রদ’ হইয়া যায়,—তবে আমাদের সেই নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের সফলতা কোথায়? তাঁহারা কার্য্যতঃ যে “সাক্ষী-গোপাল” সেই সাক্ষী-গোপালই ত রহিয়া গেলেন। সাক্ষী-গোপালের সাধ কি আজও আমাদের মিটে নাই!!!

রবীন্দ্র বাবু বলিতেছেন;—

“এমন দুরাশাও আমরা করিতেছি না যে, আমাদের প্রতিনিধিদের হস্তে রাজ ক্ষমতা থাকিবে। তাঁহারা কেবল নিবেদন করিবেন মাত্র, বিচারের ভার, কার্য্যের ভার তোমাদের।”

হায়! এই অধিকার-মাত্র-বিহীন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া ভারতভূমি নিজের

কি উপকার সাধন করিবেন, আমরা জানি না! আর ইহার জন্য,—এই নাম মাত্র নির্ব্বাচনের জন্য, কেন বৃথা "জলধি বন্ধন" হইতেছে, তাহাও বুঝিতে পারি না!! এ সম্বন্ধে বরং প্রতিবাদিত বিলের কোন কোনও ধারা মন্দের ভাল।

কংগ্রেস যে প্রকৃতির 'নির্ব্বাচন' চাহিতেছেন, ও দেশকে চাহাইতেছেন, তাহা ত গেল এই। পরন্তু নির্ব্বাচনের নিজের বস্তুগত আলোক ও অন্ধকার আছে। আলোক অপেক্ষা অন্ধকারের পরিমাণ অল্প ও নহে। রবীন্দ্র বাবু আলোকের কথা কহিতে গিয়াছিলেন, আলোকের কথাই কহিয়াছেন। অন্ধকার তাঁহার বক্তৃতায় অকথিতই আছে। না থাকিলে চলিতও না। আলোক অন্ধকার দুয়ের বিচার করিয়া কথা কহিতে হইলে নির্জ্জনে বসিয়াই তাঁহাকে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতে হইত; মরকত-গৃহে তিনি বক্তা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেন না।

আমরা লর্ড ক্রসের বিলের অনুমোদন করি না; মিষ্টার ব্রাডলার বিল পাশ হইলে আমরা কৃতার্থ হইব, এমন কথাও সজ্ঞানে বলিতে পারি না। তবে লর্ড ক্রসের বিল পাশ হইলে যে দেশ অচিরাৎ উৎসন্ন যাইবে বলিয়া মহা "হুলস্থূল" পড়িয়া গিয়াছে, ইহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হই। মরকত-গৃহের সভায় রবীন্দ্র বাবু যে "রেজুলিউসন্‌টী" "চালনা" করিয়াছিলেন, তাহা এই উৎসন্ন বিষয়ক,—

"That this meeting views with apprehension and alarm the introduction of Lord Cross's India Councils' Bill into the British Parliament and desires to record *its* firm conviction that if this measure be passed into law in its present shape, it will create deep and widespread discontent and injure the vital interests of the Indian Nation." ইত্যাদি।

সপক্ষ সমর্থনের জন্য সর্ব্বথা অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তাহা আমরা জানি; কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর ন্যায় রাজনীতির বে-পেসাদার চিন্তাশীল ব্যক্তি কিরূপে দ্বিধাশূন্য হইয়া উপরি-উক্ত 'রেজুলিউসন' প্রচার করিলেন, ভাবিলে একটু বিস্মিত ও লজ্জিত হইতে হয়। ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান অবস্থা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—সে অবস্থা আমাদের অনুমোদনীয়, আশানুরূপ ও সন্তোষকর না হইলেও তদ্দ্বারা দেশ একেবারে অবশ্য উৎসন্ন যায় নাই, পক্ষান্তরে তাহা আমাদিগকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করিয়া প্রতিনিধি-প্রণালীর শাসন সম্বন্ধে অন্ততঃ আকাঙ্ক্ষা করিতেও উপযুক্ত করিয়াছে। লর্ড ক্রসের কাউন্সিল বিলের যাহা উদ্দেশ্য, তদ্দ্বারা ব্যবস্থাপক সভার বর্ত্তমান অবস্থা উন্নত বই অবনত হইবে না; অতএব লর্ড ক্রসের কাউন্সিল বিল আইনে পরিণত হইলে দেশ কেন কথিতরূপ রসাতলে যাইবে, বুঝিয়া উঠা যায় না। লর্ড ক্রসের বিলের প্রতিবাদে ও প্রতিনিধি প্রণালীর প্রার্থনায় আমরা নিজেও যোগ দিতেছি,—কিন্তু যাহা সত্য তাহা সত্যের অনুরোধেও বলা উচিত। অত্যুক্তিতে অসারতাই প্রকাশ পায়, আসল কার্য্যও নষ্ট হয়।

লর্ড ক্রসের বিলের লিখিত সংস্কার কেহ চাহেন না, সে সংস্কারে শিক্ষিত সম্প্রদায় কহিতেছেন, সর্ব্বনাশ হইবে;—সম্ভবতঃ

বিল 'সেরেস্তা জাতই' হইবে।* সে বিল 'সেরেস্তা জাত' হইবে,—ব্রাডলার বিল পাশ হওয়া পরের কথ, পারলামেণ্টে পেশও হইবে না।† প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলন হইল না, ব্যবস্থাপক সভায় গবর্ণমেণ্ট-প্রস্তাবিত সংস্কারও আমরা করিতে দিলাম না। অবস্থা যাহা ছিল, তাহাই রহিল, অথচ আমরা 'দ্বাপাদাপি' করিয়া মরিলাম। কত অর্থ সামর্থ অনর্থক ব্যয় করিলাম।

বলিবে, লর্ড ক্রসের বিল আমাদেরই আন্দোলনের ফল;—আমরা সে বিল গ্রাহ্য ও গ্রহণ করিলাম না;—আমাদেরই আন্দোলনে পুনরায় অধিকতর অধিকার সংযুক্ত বিল প্রসবিত হইবে। ভাল, তোমাদের এই যুক্তি ভ্রম-সঙ্কুল নয় কে বলিল? লর্ড ক্রসের বিল আমাদের আন্দোলনে উৎপাদিত বলিয়া যদি যথার্থই তোমাদের ধারণা হইয়া থাকে, তাহা একটা মহা ভ্রম, সে ভ্রমের উপর আর অধিক নির্ভর করা উচিত হইতেছে না।

রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন আবশ্যক, তাহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের যে রূপ অবস্থা, তাহাতে উৎকট আন্দোলনে বড় বেশি কাজ হইবে না। আমাদের কাংগ্রেসিক আমলে আন্দোলনটা কিছু উৎকট রকম হইতেছে; ইহা অনেকেরই বিবেচনায় বিড়ম্বনা। লর্ড ক্রসের বিলের প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে আমরা তুমুল আন্দোলন উত্থিত করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না;—

* এ প্রবন্ধলেখার পর তাহাই হইয়াছে।

† হয় নাই। পুনরায় ব্রাডলা আর এক বিল প্রস্তুত করিয়াছেন।

কাযেই সে আন্দোলন জীবিত রাখিতে চাহিতেছি। অঙ্গে-বঙ্গে-কলিঙ্গে, কংগ্রেসে আন্দোলন চলিবে; বিলাতেও আমরা আন্দোলন করিব। যতদিনে আমরা উচ্চতর রাজনৈতিক অধিকার না পাই, আন্দোলন ছাড়িব না। কিন্তু এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে যে আন্দোলনেরও আন্দোলনত্ব থাকিবে না। সংসারে সকল দ্রব্যের ন্যায় আন্দোলনের এ কার্য্যে মহা আকর্ষণ, তাহার নূতনত্ব;—অধিকাংশের মধ্যে সারত্ব অপেক্ষা অভিনবত্ব অধিক কার্য্যকরী হয়। পরন্তু একটা ধারাবাহিক ও অবিশ্রান্ত আন্দোলন উত্থিত করিয়া রাখা রাজা প্রজা উভয়েরই পক্ষে অমঙ্গল, ইহাও আমাদের বিবেচনা করা উচিত। আন্দোলনে উভয়েরই অশান্তি,সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

প্রজার ন্যায় রাজা ও রাজপুরুষগণও রক্ত মাংসে গঠিত মনুষ্য। তাঁহাদেরও মেজাজ আছে, খেয়াল আছে,—আশক্তি ও বিরক্তি আছে। রবীন্দ্রনাথ বাবুর কথায় তাঁহারাও "নিমন্ত্রণে যান, বিনীত সম্ভাষণে আপ্যায়িত হন, লন্‌-টেনিস খেলেন, মহিলাদের সহিত মধুরালাপ করেন।" অতএব তাঁহারা আমাদের অনন্ত আন্দোলনে একান্ত আপ্যায়িত হইবেন, তাহাও নয়? বলিবে "তাঁহারা আপ্যায়িত না হউন, আশঙ্কিতও হইবেন।" আচ্ছা? আশঙ্কিত হইয়া আমাদিগকে অধিকার প্রদানের পরিবর্ত্তে আঘাত করিতেও ত পারেন। রবীন্দ্র বাবু যাহাই বলুন, মনুষ্য প্রকৃতির অতীত বলিয়া কেহই বিবেচনা করে না। রাজভক্ত প্রজাদের পক্ষে ক্রমাগত রাজ-তক্ত বিচলিত করা কর্ত্তব্যও নহে।

বিলাতি আন্দোলনের উপর আজ কাল আমরা কিছু অতিরিক্ত বিশ্বাস করিতেছি। এ বিশ্বাসেরও বিশিষ্ট কারণ দেখি না। বিলাতি প্রজার পারলামেণ্টে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন অধিকার আছে এবং তাঁহাদের কোন কোন সম্প্রদায়ের কতক কতক লোক আমাদের প্রেরিত বক্তাদিগকে আদর আপ্যায়িত করিয়া থাকেন, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন কার্য্য সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা কোথায়? মিষ্টার দাদা ভাই নোরোজী ও মিষ্টার লালমোহন ঘোষ বহু বৎসর তাঁহাদের আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া বিলাত প্রবাস করিলেন, কত বক্তৃতা দিলেন ও করতালি প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু কই কার্য্য ত কিছুই হইল না। বিলাতি নির্ব্বাচকগণ সর্ব্বত্রই আত্ম-স্বার্থের বশীভূত, অধিকাংশ স্থলে আত্ম-স্বার্থ ও উৎকোচের বশীভূত। আমরা উৎকোচের আয়োজন করিলেও যে তাঁহাদের মন পাইব, তাহারই বা স্থিরতা কি? আমরা অনেক সময়ে "লিবারাল" ও "রেডিকাল" সম্প্রদায়ের নিকট হইতে আশা প্রাপ্ত হইয়া থাকি; কিন্তু সে আশা পাই, যখন তাঁহারা শাসন-শক্তি হইতে বিচ্যুত; যে মুহুর্ত্তে তাঁহারা রাজ্যের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, সে মুহুর্ত্তেই পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হইয়া মতান্তর প্রাপ্ত হয়েন। যখন উদার প্রকৃতি বড় বড় মেম্বর ও মন্ত্রিগণ সম্বন্ধেই এই কথা, তখন সাধারণ নির্ব্বাচকদিগের প্রদত্ত আশ্বাস সম্বন্ধে আর অধিক কথা কি? ফলতঃ ইংলণ্ডে আমরা করতালি পাইলেও পাইতে পারি, কিন্তু কার্য্য কদাচিৎ পাইবার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞতাতে যতটা ইঙ্গিত করে, তাহাতে ইহাই বুঝাইতেছে। তবে "আশা বৈতরণী নদী।" ইংলণ্ডে আন্‌-মোক্তার রাখার উপযোগিতা আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

উপসংহারে বক্তব্য, আমাদের আলোচিত রবীন্দ্র বাবুর এই বক্তৃতা বাজারের সাধারণ রাজনৈতিক প্রবন্ধ হইতে অনেক উচ্চ শ্রেণীর; ইহাতে "রূপ রস গন্ধ স্পর্শ আছে।" কাজেই ইহা চিত্তাকর্ষক।

রাজনৈতিক কার্য্য-ক্ষেত্রে রবীন্দ্র বাবুকে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। আমরা আশা করি, তিনি সে ক্ষেত্রে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।*

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।
মালঞ্চ-সম্পাদক।

প্রেমের দায়, না কর্ত্তব্যের টান্?

মানুষের দুর্ব্যবহার দেখিলে, আর মানুষের ধারে যাইতে ইচ্ছা হয় না। মানুষকে ভালবাসা, মানুষের স্বভাব। বিধাতার কি এক গুপ্তলিপি মানুষের মুখে প্রতিভাত, তাহার আকর্ষণবলে মানুষ মানুষের ধারে যাইতে বাধ্য। এই জগৎ প্রেমের লীলা-ভূমি। মানুষ, মানুষকে ভালবাসিবে—প্রতি মানুষের ভিতরে বিধাতার প্রদত্ত যে বিশেষত্ব বিদ্যমান, তাহা গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইবে, ইহাই যেন বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা।

* এই প্রবন্ধ লেখার পর লর্ড ক্রসের বিল পারলামেণ্টের মহা সভায় লীন হইয়া গিয়াছে; ব্রাডলা বাহাদুরের প্রথম বিল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; দ্বিতীয় বিল প্রস্তুত হইয়া পথে ঘাটে বিতর্কিত হইতেছে;—অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, কিন্তু আমাদের মূল কথা "মন্ত্রি-অভিষেক" পূর্ব্বে যে স্থানে ছিল, এখনও ঠিক সেই স্থানেই আছে। অতএব আমাদের প্রবন্ধ এত কাল পরেও অপরিবর্ত্তিত ভাবে প্রকাশিত হইল।

নচেৎ মানুষকে দেখিয়া, মানুষ কখনও ভুলিত না। মানুষ, মানুষের ভিতরের ও বাহিরের দুর্ব্যবহার দেখিয়া তিক্ত বিরক্ত হইতেছে, তবুও মানুষের কাছে অবিরত ধাবিত। বিধাতার লীলা এইরূপ, কিন্তু তবুও পৃথিবীতে প্রেম-খেলার ঘর ভাঙ্গিতেছে,—স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ, পিতা পুত্রের বিচ্ছেদ,—ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ও বন্ধু-বিচ্ছেদে জগৎ অস্থির। আপন বলিয়া মানুষকে ধরি, কোল দেই, শরীরের রক্ত জল করিয়া উপকার করি, মানুষ তবুও বুকে ছুরি মারে! হা, জগৎ, এ কি চিত্র!! যে যার যত উপকার করিতেছে, সে যেন তার তত শত্রু। সম্প্রদায়-গত বিবাদের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায়, এই শস্য-শ্যামলা পৃথিবী, নানাবিধ ঝগড়া বিবাদের লীলাক্ষেত্র,—দিন দিন বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। হায়, মানুষ চায় বা কি, পায় বা কি? শুনিয়াছি, এক দিন প্রাতঃস্মরণীয়, বঙ্গের উজ্জ্বল-তম রত্ন মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট এক জন লোক উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, অমুক লোক আপনার নিন্দা করিয়াছে এবং আপনার অনিষ্ট চেষ্টায় রত আছে।"

এই কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে চিন্তা করিলেন, এবং তার পর বলিলেন—"সে ব্যক্তির আমি কখনও কোন উপকার করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না—তবে কেন সে আমার নিন্দা করিবে বা অনিষ্ট চেষ্টা করিবে?"

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই কথার অর্থ এইরূপ যে, যে মানুষের উপকার করিবে, সে-ই তোমার নিন্দা-ঘোষণা ও অনিষ্ট-চেষ্টা করিবে! উপকারীর প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞচিত্ত হইয়া থাকার পরিবর্ত্তে অনিষ্ট-চেষ্টা! এ কথা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। দেখিয়া শুনিয়া বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের ধারণা হইয়াছে, এদেশ অকৃতজ্ঞতারূপ মহা কলঙ্ক-সাগরে যখন নিমগ্ন হইয়াছে, তখন এদেশের আর নিস্তার নাই। তিনি এখন সকল প্রকার উন্নতি সম্বন্ধেই সংশয়ী হইয়াছেন। কিন্তু তবুও অকাতরে দুঃখী দরিদ্রকে দান করেন, বহু বিধবাকে ভরণপোষণ করেন, অসহায়ার কথা শুনিলে অশ্রুতে ভাসেন! এ এক কি অপরূপ ব্যাপার!! ইহা কি প্রেমের দায়, না কর্ত্তব্যের টান?

মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব বা প্রতিনিধি স্বরূপ বলিয়া শাস্ত্র বিশেষে উল্লিখিত হইয়াছে। মানুষের সৎগুণ রাশির বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিকই মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি-স্বরূপ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মানুষের হিংসা বিদ্বেষ, স্ত্রীলো-কের প্রতি অত্যাচার, উপকারীর প্রতি শত্রুতাচরণ, শত্রুর প্রতি জাতক্রোধ, অন্য ধর্ম্ম মতাবলম্বীর প্রতি ঘৃণা—পরের প্রতি অনিষ্ট আচরণ,—প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ইত্যাদি নানা দুব্যবহারের কথা স্মরণ হইলে মানুষকে পশু অপেক্ষাও হেয় বলিয়া বোধ হয়। ঘোরতর কপটতার আবরণে আচ্ছাদিত মানুষ, দিবা রাত্রি, মানুষকে ঠকাইতেছে, মানুষকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িতেছে! মানুষকে অবিশ্বাস করাও মহাপাপ—কিন্তু যেরূপ পৃথিবীর গতি, মানুষকে বিশ্বাস করাও দায়। মানুষ বারম্বার প্রতারিত হইয়াও আবার মানুষের কাছেই যায়। ইহা কি প্রেমের দায়, না কর্ত্তব্যের টান?

মানুষ আর যাইবেই বা কোথায়? মানুষ ছাড়িয়া, মানুষ কোথায় দাড়াইবে? নানা বিঘ্ন-পরিপূর্ণ এই সংসারে বাস করিতে হইলে এক দিকে যেমন বন্ধুর সাহায্যের প্রয়োজন, সূক্ষ্ম এবং পবিত্র ধর্ম্মরাজ্যে যাইতে হইলেও, সেখানে, অভিজ্ঞদের সুহৃদের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু জুডাস স্কেরিয়টের ন্যায় বন্ধুর অনিষ্ট সাধনে রত নয়, এমন লোক পৃথিবীতে কিছু দুর্লভ। প্রকৃত বন্ধুত্ব, এই স্বার্থ-পূর্ণ পৃথিবীতে আকাশ-কুসুম। মানুষ বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও আবার বিষ-পান করিয়াই দিবানিশি মজিতেছে। ছাড়িতে চাহিলেও ছাড়িতে পারে না। এ এক বিষম মোহ, এ এক ভয়ানক প্রলোভন! জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবার জন্যই বুঝি বিধাতার এই সৃষ্টি!

ভালবাসা—স্বর্গের কুসুম;—ভালবাসা

—নরকের ঢেউ!! যে সৌন্দর্য্য মানুষকে স্বর্গে লইবার জন্য, সেই সৌন্দর্য্য অপর দিকে মানুষকে নরকে ডুবাইবার অস্ত্র! রূপ দেখিয়া মানুষ বিধাতায় মজে, রূপে মজিয়া মানুষ নরকের আশ্রয় লয়। যার মন যেমন, তার ভাগ্যে তাই। ভালবাসা সৃষ্টির অতি মধুর জিনিস;—এমন জিনিস আর সৃষ্টিতে আছে কি না, জানি না। কিন্তু অপর দিকে যত অনর্থের মূল, এই ভালবাসা। ভালবাসার খাতিরে মানুষ ধর্ম্ম ডুবায়, কুল ত্যজে, চরিত্র হারায় নরহত্যা করে;—কি না করে, আমি জানি না। ভালবাসার খাতিরে পৃথিবী নরশোণিত-পাতে পূর্ণ। ভালবাসা না করিতে পারে, এমন অপকর্ম্ম নাই। ব্যভিচারী, কুলটা, স্বৈরিণী, এ সকল অপবাদই ভালবাসার খাতিরে। এক মানুষের বুকে অপর মানুষ অন্যের ভালবাসার খাতিরে ছুরি মারে! স্বর্গ আর নরক—এক বস্তুতে!

পৃথিবীর সকল জিনিসেরই দুটি দিক আছে;—একটা ভাল, একটা মন্দ। মানুষ দেবতা, মানুষ পশু। এমন ভাল জিনিস নাই, যাহার মন্দ নাই। এমন যে পবিত্র সৃষ্টি—ফুল, তাহারও দুই দিক আছে। এমন যে সুমিষ্ট কোকিলের স্বর—তাহারও দুই দিক। এমন যে রমণীর সৌন্দর্য্য—তাহারও দুই দিক। ফুল, কোকিলের স্বর, রমণীর রূপ—কাহাকেও স্বর্গে তুলিতে, কাহাকেও নরকে লইয়া যাইতে। তুমি বলিবে, যার মন কলুষিত, সেই এই সকলের দ্বারায় নরকে যায়। কথা ঠিক বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখত,—কত মানুষের মন কলুষিত?—কত লোক মজিতেছে?—কত লোক ডুবিতেছে? পৃথিবী তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ কর, বুঝিবে ভাল লোক দুর্লভ। তবে কি ফুল ফুটিবে না, পাখী গাইবে না, রমণী বেড়াইবে না? তুমিইত বল, "রমণী সর্ব্বনাশের মূল,—বেশ্যা-সংশ্লিষ্ট থিয়েটার নরকের পথ।" তোমার মন কলুষিত বলিয়া কি এ কথা বলিতেছ না? বেশ্যাও যাঁহার সৃষ্টি, তুমিও তাঁহারই সৃষ্টি। বেশ্যা অপরাধিনী, আর তুমি কি কাজে, কি চিন্তায় অপরাধী নও? তুমি অপরাধী ভাই, তোমার ভগ্নীকে, বিধাতার কন্যাকে অপরাধিনী মনে করিয়া ঘৃণা করিতেছ? তাহাকে তোমার সমাজ বা তুমি যে ডুবাইয়াছ, তাহা ত একবারও ভাবিলে না! এদিকে তুমিই ধার্ম্মিকতার ভান করিয়া বেড়াও? ধিক, তোমার ধর্ম্মে! তোমার মন যে কলুষিত, সে কথাটা নিজের সম্বন্ধে বলিলে না; অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিলে! তবেই দেখ, ভাল মন্দ সর্ব্বত্রই কি না! তুমি, আমি, সে—কে ভাল, কে মন্দ; এ বিচার না করিয়া, বিচার কর না কেন, "আমি মন্দ, সেই ভাল!—আমারই যত দোষ, তার দোষ নাই।" হায়, তাহা হইলে এই হতভাগ্য পৃথিবী আজ সোণার পৃথিবী হইত। তোমাকে কে কি বলিয়া গালাগালি দিয়াছে, তুমি তাই ভাবিয়াই অস্থির। তোমায় কে কবে নিন্দা করিয়াছে, সেই চিন্তাতেই তুমি বিভোর। তোমার ধর্ম্মকে কে কবে তুচ্ছ করিয়াছে, তাহা লইয়াই তুমি ব্যস্ত। একবারও তার গুণ ভাবিলে না? ভাবিলে না—তোমার দোষ আছে বলিয়াই সে গালি দিয়াছে; অথবা গালি দিয়া ত সে বন্ধুর কাজই করিয়াছে! মহাজনেরা বলেন, যে দোষ দেখায়, সে-ই বন্ধুর কাজ করে। তোমার দোষ না থাকে, তাতেই বা তোমার ক্রোধের বিষয় কি? কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দেও না কেন? যে গালাগালি দিয়াছে, নয় তাকে ক্ষমাই কর। তুমি তার পরিবর্ত্তে তার চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ-পিণ্ড চট্‌কাইয়া সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছ; এ যে তোমার কি অভিনব ধর্ম্ম-প্রচারের ধুয়া, আমি কিছুতেই বুঝিলাম না। তোমার ঐ অহঙ্কার-মূলক (Moral-indignation) নীতি-ঘৃণাটাকে (?) কর্ম্মনাশার জলে কিছুতেই ফেলিতে পারিলে না, অথচ ধর্ম্মের বড়াই কর! আমার ধারণা ছিল, যে ধার্ম্মিক, সে বুঝি নিন্দা বা গালাগালিতে টলে না।—সে বুঝি এ সকলের অতীত। সে বুঝি পুণ্যভূমিতে পাদচারণা করে। অহো দুর্ভাগ্য, আজ দেখিতেছি, ধার্ম্মিকের ক্রোধ, হিংসা আরো বেশী। ভাল

মন্দ যে সর্ব্বত্রই বিজড়িত, বিমিশ্রিত, এ কথাতে আর সন্দেহ রাখিতে পারিতেছি না।

আমি যতই সূক্ষ্মরূপে জগতকে পরীক্ষা করিতেছি, ততই দেখিতেছি, সকল বস্তুই এখন মন্দের দিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। মানুষ এমন পশুত্বে চলিয়াছে,—ধার্ম্মিক যাহারা, তাহারাই এখন অধিক অধার্ম্মিক। মানুষের সৎগুণ রাশি এখন মহা পাপ-রাহু গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। সত্য, পুণ্য, নীতি, ধর্ম্ম, চরিত্র হুজুগপ্রিয় কলিযুগে অন্তর্হিত হইয়াছে। কপটতা, প্রবঞ্চনা—এখন মানুষের ব্যবসা। সে-ই বড়, যে মানুষকে অধিক ঠকাইতে পারে। অন্য দেশের কথা বলিতে পারি না—এখন ভারতবর্ষ পশুর লীলাচল হইয়া উঠিয়াছে। ব্যভিচারের স্রোতে, ভ্রূণ হত্যার স্রোতে, হিংসা বিদ্বেষের স্রোতে ভারত প্লাবিত। যে দিকে চাই, দেখি, আমরা রাশি রাশি পশু এই ভারতের সর্ব্বনাশ করিতেছি। কে কাকে দেখে, কে কাকে ধরে, স্বার্থ স্বার্থ করিয়া সকলে অস্থির!!

বাল্যকাল হইতে কত লোককে আপনার বলিয়া বুকে ধরিয়াছি, প্রাণে ছুরি মারে নাই, এমন বন্ধু বিরল। জীবন দিয়া জীবন পাইবার চেষ্টা করিয়াছি, বিনিময়ে পাইয়াছি—ছাই। যাহাদিগের উপকার করিয়াছি—দেখিয়াছি, তাহারাই কিছু দিন পর প্রধান শত্রু। সমাজ-সংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি,—পাইয়াছি, লোকের গালাগালি। দেখিয়া শুনিয়া, এমন সাধ হইয়াছে—চুপ করিয়া বসি। তোমার মধুর বন্ধুত্ব চাই না, তোমার ঐ মন-ভুলানে ভালবাসা চাই না, আড়ম্বরময় দেশ-সংস্কার চাই না—চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চাই। কিন্তু কেমন যে বিষম মোহের ঘোর,—লোক কাঁদিতেছে, শুনিলেই প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। যে শতবার বক্ষে আঘাত করিয়াছে, সে দ্বারে আসিলে আবার তাকে বুকে না তুলিয়া থাকিতে পারি না। যে শতবার ঠকাইয়াছে, আবার কাঁদিয়া অভাব জানাইলে তাকেও কিছু না দিয়া থাকিতে পারি না। আমি কি এক বিষম মোহে পড়িয়াছি, ভাবিয়া ভাবিয়া সারা হইতেছি। হিন্দুসমাজ বল, ব্রাহ্মসমাজ বল; ধনী বন্ধু বল, দরিদ্র বন্ধু বল;—সকলের ব্যবহার দেখিয়াই অবাক হইয়াছি! আমিও তাদেরই এক জন। তারাও আমার ব্যবহার দেখিয়া নাকি অবাক হইয়াছে। আমিও নাকি তাদের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছি! ইচ্ছা লইয়া কথা নয়; ইচ্ছা, মানুষ দেখে না—সুতরাং বন্ধুরাও যে আমাকে "অধঃপতিত" ভাবিয়া অশ্রুবর্ষণ করিবেন, আশ্চর্য্য কি? অশ্রুবর্ষণের সহিত তাঁহারা অনিষ্ট চেষ্টাও করিতেছেন,—মহত্বের কত পরিচয় দিতেছেন! আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি—আর অবাক হইতেছি। কোথাও যাইব না, ভাবি। ভাবিতে না ভাবিতে দেখি, অন্যত্র যাইয়া উপস্থিত হইয়াছি। কাহাকেও আপনার ভাবিব না, মনে ভাবি,—দেখি, ভাবিবার পূর্ব্বেই অন্যকে আপনার ভাবিয়া বসিয়াছি। ঠকিয়া, প্রতারিত হইয়া কত বার অন্যের তিরস্কার শুনিয়াছি—কিন্তু যত বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তত বারই অধিক ঠকিয়াছি। ঠকিয়া ঠকিয়া জেরবার হইয়া ভাবিতেছি—এ প্রেমের দায়—না কর্ত্তব্যের টান?

প্রেমের দায়ও না, কর্ত্তব্যের টানও না। এ এক মহাজনের মহা খেলা। ঋণ শোধ দিতে আসিয়াছি, আজীবন ঋণই শোধ দিতে হইবে। জীবন দিলেও ঋণের শেষ নাই। আছি ইহারই জন্য—মরণের দেশে যাইব, ইহারই জন্য। আশা, ভরসা, প্রত্যাশা, সব বিসর্জ্জিত হইয়াছে—এখন ভবের তীরে বসিয়া জীবনের ভাটী বেলায় ঋণ শোধিতে বসিয়াছি। মানুষের কাছে কত ঋণী ছিলাম, হিসাব কেতাব কিছুই নাই। যত শোধিতেছি, তত লোক ছুটিয়া আমার নিকট আসিতেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন আমার দিকে ছুটিতেছে। আমার ক্ষুদ্র বুকে সকলকে পূরিতে পারিতেছি না—তাই কেহ যাইতেছে, কেহ আসিতেছে। যে দিন আমার ঋণ শোধ হইবে, সেই দিন আমি মহাযাত্রা করিব। সেই দিন সকলে আমার সপিণ্ডীকরণ করিও।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কলনের বাল্য-জীবনী।

এই মহাপুরুষ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী কেণ্টাকি প্রদেশের অন্তঃপাতী নোলিন ক্রীক নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অশৈশব দরিদ্রতার চির দুঃখময় ক্রোড়ে লালিত পালিত হন। তিনি বাল্যকাল হইতে দারিদ্র্যের দুঃসহ ভারে নিপীড়িত হইয়াও, স্বকীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, চরিত্র ও প্রতিভা বলে পৃথিবীর সভ্যতম প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরূঢ় হন। তিনি আত্ম বিদ্রোহানলে দহ্যমান জন্মভূমিকে নির্ভীক-চিত্তে ও প্রশান্ত হৃদয়ে রক্ষা করিয়া, ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ (যুক্ত রাজ্য) হইতে সমূলে জঘন্যতম দাসত্ব-প্রথাকে উৎপাটিত করেন। আমেরিকার কৃষ্ণবর্ণ দাসদিগের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক, উপাংশুঘাতকের নিষ্ঠুর হস্তে স্বীয় পবিত্র জীবন, ধার্ম্মিক চূড়ামণি মহাত্মা খ্রীষ্টের ন্যায় উৎসর্গীকৃত করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা যথোচিতরূপে রক্ষা করিতে গিয়া, তিনি নরাধম বিদ্রোহীর হস্তে নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন দিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। যত দিন পৃথিবীতে মনুষ্য বসতি করিবে, যত দিন ভূমণ্ডলে সাম্য ও স্বাধীনতার সম্মান থাকিবে, যত দিন নরলোকে আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশ-হিতৈষিতা, বিশ্বজনীন প্রেম ও সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব শব্দ বর্ত্তমান থাকিয়া অভিধানের পত্র উজ্জ্বল করিবে,—তত দিন প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কলন স্বদেশ-হিতৈষিগণের অগ্রণী বলিয়া জগতে প্রীতি ও ভক্তির পবিত্র পুষ্পাঞ্জলী পাইতে বঞ্চিত হইবেন না, তত দিন দেবতার ন্যায় সভ্য জগতের গৃহে গৃহে পূজিত হইতে থাকিবেন, তত দিন ভূমণ্ডলস্থ নর নারী এক বাক্যে তাঁহার স্বর্গীয় অমর আত্মার উদ্দেশে গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অকৃত্রিম অনুরাগ উপহার দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। জর্জ ওয়াসিংটন ব্যতীত এমন মহাপুরুষ স্বাধীনতার লীলাভূমি আমেরিকায় আর কখনও আবির্ভূত হইয়াছেন কি না সন্দেহ স্থল।

কেণ্টাকির অন্তর্গত হার্ডিন প্রদেশে নোলিন ক্রীক্ নামে একটী সামান্য স্থানে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ভাবী অধিপতি শুভক্ষণে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম সময়ে তাঁহার পিতা টমাস লিঙ্কলনের বয়স ৩১ এবং তাঁহার মাতার ২৬ বৎসর বয়স ছিল। তাঁহারা উভয়ে যে সামান্য গৃহে বাস করিতেন, তাহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে নির্ম্মল বায়ু সঞ্চারণের নিমিত্ত দ্বার কি গবাক্ষ কিছুই ছিল না। সেই কুটীরের সমীপে অন্য কোন প্রতিবেশীর বাসস্থল ছিল না। তাহার চতুর্দ্দিকের ভীষণ অরণ্যে নানাবিধ হিংস্র জন্তু নিরাপদে বাস করিত।

টমাস অনুমাত্রও লিখিতে পড়িতে জানিত না। শৈশবকালেই তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু ঘটিলে, টমাস দুরবস্থা ও দরিদ্রতার সহিত অনন্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। এই নিমিত্ত কোনও বিদ্যালয়ে পদার্পণ

করিতে এক দিনের-জন্যও তাঁহার ভাগ্যে অবসর ঘটে নাই। টমাসের পত্নী কিছু কিছু পড়িতে পারিতেন বটে, কিন্তু পত্রাদি লিখিতে পারিতেন না। বিদ্যা, বুদ্ধি, উদারতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি কোন বিষয়েই টমাস নিজ পত্নীর সমকক্ষ ছিলেন না বলিয়া পতির উপর টমাস পত্নীর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি অতি কষ্টে পত্নীর নিকট নিজের নাম লিখিতে অভ্যাস করিয়া, নিরক্ষরতার অপবাদ হইতে মুক্ত হন।

বালক আব্রাহামের যখন ৪ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতা অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর ও রমণীয় একটী স্থানে আসিয়া সপরিবারে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সমবয়স্ক যে ৬।৭ জন প্রতিবেশী বালক ছিল, অল্প কালের মধ্যেই আব্রাহাম বুদ্ধি কৌশলে তাহাদের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এখানে তিনিপাঠশালায় সামান্য লেখা পড়া আরম্ভ করিয়া, অতি অল্প কালেই গুরু মহাশয়ের আয়ত্তাধীন যাবতীয় বিষয় শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। আব্রাহাম জ্যেষ্ঠা ভগিনী সারার সহিত পাঠশালায় প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। এই পাঠশালা তাঁহার পিতার বাসস্থান হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। চারি পাঁচ বৎসরের শিশু লেখা পড়া শিক্ষার জন্য প্রত্যহ আট মাইল পথ যাতায়াত করিত !!! কি অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায় ! কি প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা !

প্রতি রবিবার ও অন্যান্য দিনের অবসর সময়ে টমাসপত্নী পতি, পুত্র ও কন্যাকে বাইবল গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন। পড়িতে শিখিবার পূর্ব্বে বিদুষী মাতার নিকট হইতে এইরূপে শুনিয়া, আব্রাহাম সেই অমূল্য ধর্ম্ম পুস্তকের অনেক উপদেশ ও উপন্যাস শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতার পুস্তকাগারে আব্রাহাম যে তিন খানি কীটদংষ্ট্র ও অযত্নরক্ষিত পুস্তক পাইলেন, পাঠশালায় অবস্থান কালে অতি মনোযোগের সহিত ক্রমে তাহা পড়িতে ও শিখিতে লাগিলেন। সেই তিন খানি পুস্তক এই ;—বাইবল, ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর, ডিলোয়ার্থের বানান পুস্তক।

পূর্ব্বোক্ত পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে, আব্রাহাম গৃহে বসিয়া বাইবল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বাইবলের উপন্যাসাংশ গুলি তাঁহার কোমল মনকে সমধিক আকৃষ্ট করে। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও তাহার তৃপ্তির হ্রাস হইত না। বাইবলের ন্যায় বহুমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ যাঁহার বাল্য জীবনকে প্রথম হইতে গঠিত ও পরিচালিত করে, তিনি যে যৌবনে শৌর্য্য, বীর্য্য, নির্ভীকতা, উদারতা, সততা, সহৃদয়তা, মহানুভাবতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক মানব জাতির অশেষবিধ উপকার সাধন করিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ?

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে টমাস দাসত্ব ব্যবসায়ের পাপে পরিপূর্ণ কেণ্টাকি প্রদেশ ছাড়িয়া ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে যাইয়া বসতি করিতে মনস্থ করিলেন। ইতি পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ানা প্রদেশ (যুক্তরাজ্যের United State) অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা হইতেছিল। মহাসভা কংগ্রেসে ঘোরতর তর্ক বিতর্কের পর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ানা যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখানে কেণ্টাকির ন্যায় জঘন্যতম দাস ব্যবসায়ের প্রথা প্রচলিত ছিল না। এই নিমিত্ত দলে দলে দীন দরিদ্র লোক নূতন প্রদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে

লাগিল। টমাস দাসত্ব প্রথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি জানিতেন যে, হেয়তম দাসত্ব প্রথা যে যে স্থানে প্রচলিত আছে, সেই স্থানে উৎপীড়ন ও অবনতির এক শেষ ঘটিয়া থাকে। তিনি নিরক্ষর হইলেও বুদ্ধিহীন ও হৃদয়-শূন্য ছিলেন না। কেণ্টাকি দাস ব্যবসায়ীদিগের পাশবিক ও অমানুষিক অত্যাচারের অন্যতম রঙ্গভূমি ছিল। কার্টার নামে টমসের পরিচিত জনৈক কৃষক ইতি পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ানার অন্তর্গত স্পেনসার কাউণ্টিতে উপনিবিষ্ট হন। তিনিও তথায়ই নিজের বাসস্থল মনোনীত করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কেণ্টাকি ছাড়িয়া নূতন স্বাধীন প্রদেশে যাওয়ার টমাসের অন্যতর কারণ ছিল। দাসব্যবসায়িগণ অন্যায় পূর্ব্বক দরিদ্র কৃষকদিগের জমি ইত্যাদি কৌশলে স্বাধিকারভুক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইত না। কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া যাহারা মানব জাতির অমূল্য স্বাধীনতা রত্ন অপহরণ করিয়া আপনাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিত, জমীজমা হরণ তাহাদের পক্ষে নিতান্ত সামান্য বিষয়। টমাস এই আকস্মিক বিপৎপাত উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই সেই স্থান সত্বর পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহার যে কিছু সামান্য ভূমি সম্পত্তি ছিল, তাহা তিন শত ডলার (প্রায় সাড়ে সাত শত টাকা) মূল্যে বিক্রয় করিলেন। মূল্যের মুদ্রার মধ্যে বিশ ডালার নগদ লইলেন। বাকী টাকার পরিবর্ত্তে দশ বেরেল (৪০০ গেলেন ৫০ মণ) মদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। জমীজমার বিনিময়ে হুইস্কি মদ! কি অদ্ভুত বিনিময়!! এই মদ বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহার দ্বারা ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ ও জমীজমা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন। জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ কর্ত্তন ও আহরণ করিয়া টমাস নিজ হস্তেই নৌকা নির্ম্মাণ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত মদ ও গৃহনির্ম্মাণের উপযুক্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া টমাস জলপথে একাকী ইণ্ডিয়ানা অভিমুখে ক্ষুদ্র নৌকা বাহিয়া চলিলেন। স্ত্রীপুত্রাদিকে কেণ্টাকির বাটীতেই রাখিয়া গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ওহিও নদীর গর্ভে তাঁহার ক্ষুদ্র নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে, তাঁহার ভবিষ্যতের আশা ভরসা বিনষ্ট হইল। তীরবর্ত্তী লোকদিগের সাহায্যে তিনি নৌকা খানির সহিত তিন বেরেল মদ নদীগর্ভ হইতে উত্তোলিত করিতে সমর্থ হইলেন। তাহা নৌকায় উঠাইয়া নির্ভীক চিত্তে ও আশ্বস্ত মনে টমাস টমসনের খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন। গন্তব্য স্থানে পদব্রজে যাওয়ার জন্য টমাস একজন ভারবাহী গরুর অধিস্বামীকে দ্রব্যাদি বহনার্থ নিযুক্ত করিলেন। ভাড়ার পরিবর্ত্তে গোস্বামী নৌকা খানি গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। কিছু দূর যাইয়াই তাহারা উভয়ে দেখিতে পাইলেন যে, সেখানে জনমানবের যাতায়াতের কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই। টমাস সঙ্গীর সহিত, কুড়ালি দ্বারা সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন অবিশ্রান্ত ঘোরতর পরিশ্রমের পর তাঁহারা আঠার মাইল পথ গমন করিয়া একটী ক্ষুদ্র কুটীর দেখিতে পাইলেন। তথায় বিশ্রাম করিয়া গৃহস্বামী উড সাহেবকে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন: পরে উড়ের সহিত দুই মাইল গমন করিয়া টমাস

আপন ভাবী বাসস্থল মনোনীত করিলেন। উডের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, দুই মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে, ছয় মাইল দূরে উত্তর দিকে এবং আট মাইল দূরে পশ্চিম দিকে তিন ঘর কৃষক বসতি করে। তাঁহার সমস্ত জিনিসাদি উডের কুটীরে রাখিয়া টমাস পদব্রজে কেণ্টাকীর পূর্ব্বতন বাড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অবিলম্বে সপরিবারে মনোনীত নূতন বাসস্থলে যাওয়ার উদ্যোগ হইল। শয্যাদি দ্রব্যসহ সপরিবারে টমাস সওয়া শত মাইল সাত দিনে অতিক্রম করিয়া ভাবী বাসস্থানে উপনীত হইলেন। টমাসের যে দুইটী ভারবাহী অশ্ব ছিল, তাহার পৃষ্ঠে কখন চড়িয়া, কখন হাঁটিয়া লিঙ্কন-পত্নী পুত্র কন্যা সহ স্বামীর অনুগমন করিলেন। মৃত্তিকাই তাঁহাদের রাত্র কালের এক মাত্র শয্যা এবং আকাশ তলই এক মাত্র আশ্রয় ছিল।

টমাস তাড়াতাড়ি একটী অতি সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ানার দুঃসহ শীত কোন ক্রমে যাপন করিলেন। উপযুক্ত সময়ের অভাবে কুটীরের তিন দিক্ বদ্ধ এবং এক দিক খোলা রাখিতে হইয়াছিল। পর বৎসর এক খানি বাসোপযোগী প্রশস্ত কুটীর নির্ম্মিত হয়। এই কুটীর দৈর্ঘ্যে ১৮ ফিট ও প্রস্থে ১৬ ফিট বিস্তৃত ছিল। এই সামান্য কুঠরীতে আব্রাহাম সন্তুষ্টচিত্তে জীবনের দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করেন। কুটীর নির্ম্মাণ, কাষ্ঠ কর্ত্তন, জঙ্গল আবাদ, শস্যরোপণ, ক্ষেত্র কর্ষণ, ঢেঁকি নির্ম্মাণ প্রভৃতি পিতার অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যে আট বৎসরের বালক টমাসের এক মাত্র সাহায্যকারী ছিল। এই অষ্টম বর্ষ বয়স হইতে যৌবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত কুঠার আব্রাহামের নিত্য সহচর ছিল। প্রত্যহ কুঠার পরিচালন করাতে অল্পকালের মধ্যেই আব্রাহাম অতি বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কাষ্ঠ কর্ত্তন ও ছেদনাদি কার্য্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। ইণ্ডিয়ানার বনবাসী দরিদ্র কৃষকগণ বন্য জন্তু শিকার করিয়া অনেক সময় জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিত এবং বন্য পশুর উপদ্রব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিত। বাল্যকালেই লিঙ্কন পিতার নিকট পশু পক্ষী শিকার করিতে শিক্ষা করেন। সেই নিবিড় বনদেশের মধ্যবর্ত্তী কুটীরের নিকটে কোথাও পানীয় জল ছিল না। জ্যেষ্ঠা ভগিনী সারার সহিত লিঙ্কন এক মাইল দূরে অবস্থিত একটী নির্ঝরিণী হইতে সমস্ত পরিবারের ব্যবহার্য্য জল প্রত্যহ আনয়ন করিতেন।

তত্রত্য অশিক্ষিত নিরক্ষর দরিদ্র লোকের মধ্যে ধর্ম্ম, সাধুতা ও সচ্চরিত্রতার বিশেষ অভাব ছিল। সময় সময় তাহারা সুযোগ ক্রমে অপরের দ্রব্যাদি চুরি করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা অধিক পরিমাণে মদ্য পান করিয়া সময় সময় পশুবৎ আচরণ করিত। এই সকল লোকের সংসর্গে সর্ব্বদা থাকিয়া কিসে আব্রাহাম সাধু, সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক রহিবে, পুত্রবৎসলা মাতা সর্ব্বদাই তাহা চিন্তা করিতেন। পুত্রকে তিনি সময় সময় অনেক সুন্দর ও সরল উপদেশ প্রদান করিয়া, তাঁহার নৈতিক জীবন গঠন করিয়াছিলেন। মদ খাওয়া সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,—"বৎস, মদ পান করিতে আরম্ভ করিয়াই লোকে মাতাল হয় ও পশুবৎ আচরণ করে। তুমি কখনও মদ্য পান করিওনা! তাহা হইলে তোমাকে

কখনও মাতাল হইতে হইবেনা।" আমরণ পুত্র মাতার এই সরল উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের অধিপতিত্বে বরিত হইয়াও চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে মদ্য পান করিতে অস্বীকৃত হন। এমন নৈতিক সাহস ও প্রগাঢ় মাতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই তিনি জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে টমাস স্পেরো লিঙ্কলন-পরিবারের প্রতিবেশী হইল। টমাস স্পেরোর পত্নী বেটসি লিঙ্কন-পত্নীর শৈশবের প্রতিপালিকা ছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে বেটসির ভগিনীপুত্র হ্যাঙ্কস্‌কে সমবয়স্ক সহচর ও বন্ধু পাইয়া আব্রাহাম অত্যন্ত সুখী হইলেন।

কেণ্টাকিতে হেজেলের পাঠশালায় আব্রাহাম যে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, এখানে গৃহে বসিয়া পিতার পুস্তকাগারের পূর্ব্বোক্ত তিনখানি পুস্তকের সাহায্যে অবসর ক্রমে তাহার উন্নতি বিধান করিতে ত্রুটি করিলেন না। অন্য পুস্তকের অভাবে এই তিন খানি পুস্তক পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিলেন। শীতের দুঃসহ প্রকোপ প্রশমনের জন্য গৃহের মধ্যে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইত, বালক লিঙ্কন রাত্রিকালে সেই প্রদীপ্ত আলোকের নিকট বসিয়া পাঠ করিতেন। কুটীরে অন্য-আলো ব্যবহৃত হইত না। নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আনিয়া, দরিদ্র কৃষকগণ তদ্দ্বারা শীতের ক্লেশ দূর করিত, কাঠের নির্ম্মিত লাঠির অগ্রভাগ পোড়াইয়া বৃক্ষের বল্কল এবং প্রস্তর খণ্ডাদিতে লিখিয়া আব্রাহাম হাতের অক্ষর দুরস্ত করিতেন। শীতকালে যষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা বরফের উপর লিখা অভ্যাস করিতেন; গ্রীষ্মকালে পিতার বাগানে বসিয়া মৃত্তিকাতে লিখিয়া কালী কলম ও কাগজের অভাব দূর করিতেন!! এইরূপে তিনি পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দররূপে লিখিতেও অভ্যাস করিলেন। পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে করিতে আব্রাহাম পূর্ব্বোক্ত তিন খানি (বাইবল, ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর ও ডিলোয়ার্থের বানান) সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি নূতন নূতন গ্রন্থ পড়িতে উৎসুক হইলেন। এই সময়ে সহসা মৃত্যুভয় উপস্থিত হইয়া তাঁহার জ্ঞান লাভে কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমূহ বিঘ্ন উৎপাদন করিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে "দুগ্ধরোগ" নামে ভীষণ সংক্রামক রোগ আবির্ভূত হইয়া প্রতিবেশীদিগের অনেককে অকালে কালগ্রাসে পাতিত করিল। লিঙ্কলন পরিবারের অকৃত্রিম সুহৃৎ স্পেরো সাহেব ও তাঁহার পত্নী একই সময়ে উক্তরোগের প্রবল আক্রমণে শয্যাশয়ী হইল। তথায় ৩০।৪০ মাইল দূরের মধ্যেও কোনও চিকিৎসক ছিলনা। প্রতিবেশীবর্গের সেবা শুশ্রূষা ভিন্ন কোনও রোগের যথোচিত প্রতীকার লাভ অসম্ভব ছিল। টমাস ও তাঁহার পত্নী পীড়িত স্পেরো পরিবারের যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে লাগিল; অবশেষে টমাস তাহাদিগকে আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে আনয়ন করিলেন। তাহার সমস্ত যত্ন চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কিছুতেই রোগের

উপশম ঘটিল না। স্পেরো ও তাহার পত্নী কিয়ংদিনের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইয়া রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল। টমাস স্বহস্তে কবরাধার (coffin) প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে সমাহিত করিলেন। স্পেরো পরিবারের সেবা শুশ্রূষার জন্য অনেক মানসিক উদ্বেগ ও শারিরীক কষ্ট সহ্য করিয়া কিছু দিনের মধ্যেই টমাসের পত্নী সেই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলেন। ৫ই অক্টোবর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কুটীরের মধ্যে অপরিজ্ঞাত শোকদুঃখ আনয়ন করিলেন। টমাসের ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে বিষাদপূর্ণ শোকের গভীর উচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। বালক আব্রাহামের মুখে শোকের কালিমাময় রেখা অঙ্কিত হইয়া উঠিল। পরিবারের অশ্রুজলে সিক্ত ভূগর্ভে টমাসপত্নীর সুকোমল দেহ নিস্তব্ধে সমাহিত হইল। ধর্ম্মযাজকের কোনও সময়োচিত অনুষ্ঠান হইতে পারিল না।

শোকে দুঃখে বর্ষাধিক গত হইল। এলকিন্স নামে জনৈক ধর্ম্মযাজক টমাসের কুটীর হইতে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থান করিতেন। মৃত পত্নীর আত্মার সদ্গতির জন্য যথাবিহিত প্রার্থনা করিতে, টমাস তাঁহাকে আহ্বান করিতে মনস্থ করিলেন। একদা সন্ধ্যাকালে তিনি বালক আব্রাহামের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং পাদ্রি সাহেবের নিকট এক খানি অনুরোধ পত্র লিখিতে তাঁহাকে আদেশ করিলেন। দশমবর্ষীয় বালক অল্পকালের মধ্যেই পিতার আদেশ পালন করিয়া, টমাসকে স্বরচিত পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পূর্ব্বে টমাসের পরিবার ও পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহই সামান্য লেখা পড়াও জানিত না। আজ পুত্র আব্রাহামকে অনায়াসে পত্র লিখিতে দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিলনা। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিরক্ষর কৃষিজীবী হওয়া অপেক্ষা এরূপে পত্রাদি লিখিতে ও পড়িতে পারা শ্রেয়স্কর। টমাস হৃষ্টচিত্তে আপনার প্রতিবেশীগণের মধ্যে কুলতিলক পুত্রের এই অসাধারণ ক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার সমবয়স্ক বালকদিগের কথা দূরে থাকুক, সেই প্রদেশের এক চতুর্থাংশ যুবক ও বৃদ্ধ বোধ হয় এইরূপ পত্র লিখিতে পারিত না। এই ঘটনার পর হইতে দূরবর্ত্তী বন্ধুবান্ধবগণের নিকট পত্র লিখাইবার জন্য প্রতিবেশীগণ অনেক সময়ে বালক আব্রাহামের নিকট আসিত। এইরূপে তাঁহার রচনাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং হস্তাক্ষরও ক্রমে ক্রমে অধিকতর সুন্দর হইয়া উঠিল।

তিন মাস পরে উক্ত অনুরোধ পত্র অনুসারে পাদ্রি এলকিন্স টমাসের বাসস্থলে অশ্বারোহণে উপনীত হইলেন। কুটীরের দুই মাইল দূরে আব্রাহাম পাদ্রি সাহেবকে দেখিয়া পুলকিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি প্রশ্নকর্ত্তা বালকের লিখিত পত্র পাইয়াছিলেন কিনা? বালক স্বয়ং এমন সুন্দর পত্র লিখিয়াছে বলিয়া পাদ্রি এলকিন্স বিস্মিত হইয়া লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। বালক পাদ্রি সাহেবকে পিতার নিকট লইয়া গেল। টমাস পাদ্রি সাহেবের আগমনে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে মৃত পত্নীর প্রেতাত্মার সদ্গতির জন্য কবরস্থানে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ

করিলেন। রবিবার পাদ্রি সাহেব কবর-স্থানে প্রার্থনা ও উপাসনা করিয়া একটী হৃদয়গ্রাহী করুণভাব-পূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় আব্রাহামের মন সাতিশয় আকৃষ্ট ও বিগলিত হইল। বালক অতি মনোযোগের সহিত সেই বক্তৃতার সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। বাল্যকাল হইতেই আব্রাহাম সবিশেষ চিন্তাশীল ছিলেন। অন্যান্যের ন্যায় কিছু পড়িয়া বা শুনিয়া তাঁহার সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধি তৃপ্তি লাভ করিত না। প্রতি কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন; ইহাতে তাঁহার বিচারশক্তি বাল্যকাল হইতেই বিশেষরূপে পরিচালিত হইয়া পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিল। এই ঘটনার পূর্ব্বে তিনি দুই তিন জন আগন্তুক পর্য্যটক পাদ্রির সরল উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন বক্তৃতায়ই তাঁহার মন এতদূর আকৃষ্ট হয় নাই। মাতৃবিয়োগের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত লিঙ্কলনের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সারা রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকার্য্য ভ্রাতার সাহায্যে সম্পাদন করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে বালক লিঙ্কলন সমস্ত গৃহকার্য্য শিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এতদূর বলবতী ছিল যে, তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, সেই কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে শিক্ষা না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না। বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৫ হইতে ১৮ ঘণ্টা কাল অনবরত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াও তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। ১৫। ১৬ বৎসর বয়সের সময় তিনি প্রদর্শন করেন যে, প্রতিবেশী কৃষকগণ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাইত।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে লিঙ্কলনের পিতা টমাস পুনরায় বিবাহ করিলেন। পূর্ব্বস্বামী জনসনের ঔরসজাত দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র বিধবা মাতার সঙ্গে সঙ্গে টমাসের কুটীরে আগমন করিল। তিনি সঙ্গে করিয়া বাক্স, সিন্দুক ও চেয়ার প্রভৃতি প্রভূত গৃহসজ্জা দরিদ্র স্বামীর কুটীরে আনয়ন করিলেন। এই বিবাহের নিমিত্ত টমাস কিংবা তাঁহার পুত্র কন্যা কাহাকেও কোন কালে অসুখী হইতে হয় নাই। টমাসের নব বিবাহিতা পত্নী সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই বিমাতার চরিত্র গুণে লিঙ্কলন তাঁহাকে স্বীয় মাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে আপনার সহোদর ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিতে আরম্ভ করিলেন। বালকের অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতা দর্শনে বিমাতা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন এবং কিসে তাঁহার লেখা পড়ার সুবিধা হইতে পারে, সাধ্যানুসারে তৎপ্রতি যত্নবতী হইলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিমাতার প্রতি লিঙ্কলনের অচলা ভক্তি অব্যাহত ছিল।

পুত্রের উন্নতির প্রতি টমাসও উদাসীন ছিলেন না। নিজের এমন অর্থ-সম্বল ছিলনা যে, ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়া প্রিয়তম পুত্রকে পড়াইতে পারেন। কিন্তু তিনি ধার করিয়া আনিয়া পুত্রের দুর্নিবার্য্য জ্ঞান-পিপাসার তৃপ্তি বিধান করিতে লাগিলেন। বিংশতি মাইল দূরে পিয়ার-রসন নামে এক ব্যক্তি বাস করিত।

টমাস তাহার নিকট হইতে সুকবি বানিয়ানের বিরচিত Pilgrim's Progress নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আনয়ন করিয়া পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অবিলম্বে লিঙ্কলন এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত করিলেন। দ্বিতীয় বারে তাহার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত পঠিত হইলে সুপ্রসিদ্ধ উপাখ্যান Esop's Fable তাঁহার হস্তগত হয়। লিঙ্কলন এই দুই খানি পুস্তক পাঠে এতদূর নিবিষ্ট হইয়া উঠিলেন যে, আবশ্যকীয় গৃহ ও কৃষিকার্য্যে নিতান্ত অমনোযোগী হইয়া পড়িলেন। এই জন্য টমাস সময় সময় অলস ও অমনোযোগী বলিয়া পুত্রকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাম্‌জের লিখিত ওয়াসিংটনের জীবনচরিত ও Robinson Crusoe তাঁহার হস্তগত হয়। রবিনসন ক্রুসো পড়িয়া তিনি ডিফোর রচনা ও বর্ণনার চাতুর্য্যে মুগ্ধ হন। পিতার কুটীর হইতে দুই মাইল দূরে ইতিমধ্যে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ডরসি নামক একজন নামমাত্র শিক্ষক বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের অধ্যাপনা কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। লিঙ্কলন এখানে বানান ও পাটীগণিত শিক্ষার নিমিত্ত ভর্ত্তি হইলেন। হাতের লেখা, বর্ণবিন্যাস, রচনা ও পুস্তক পাঠে লিঙ্কলন শিক্ষক অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ছিলেন না। কয়েক সপ্তাহ পরেই অশিক্ষিত শিক্ষকের দোষে বিদ্যালয়টী উঠিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তিনি আরও দুইটী একবিধ ক্ষণস্থায়ী পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া লেখা পড়া শিক্ষা করেন।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রফোর্ড নামক অপর একজন শিক্ষিত ব্যক্তি (পূর্ব্বে ডার্সির পাঠশালা যেখানে ছিল, ঠিক সেই স্থানে একটী পাঠশালা খুলিলে, লিঙ্কলন শিক্ষার্থী হইয়া সেই পাঠশালায় যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। তিনি লিঙ্কলনের গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাহার পিতার নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অতি দুরূহ ও কঠিন বলিয়া তিনি বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রকেই রচনা শিক্ষা দিতেন না, কিন্তু লিঙ্কলনের মানসিক উন্নতি বিধানে মনোযোগী হইয়া ক্রফোর্ড তাঁহাকে গদ্য ও পদ্য রচনা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রচনার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে তিনি ক্রফোর্ডের নিকট বক্তৃতা দেওয়াও অভ্যাস করেন। তাঁহার এরূপ প্রখরা স্মৃতিশক্তি ছিল যে অধীত পুস্তক ও শ্রুত বক্তৃতা হইতে অনেক অংশ অবিকল বলিয়া বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র ও সহচরদিগকে অনেক সময়ে আমোদিত করিতেন। তিনি জীবজন্তুর প্রতি কখনও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদিগের এবম্বিধ নিষ্ঠুর কার্য্যে বাধা দিতেন এবং অনেক সময়ে তাহাদের অনেককে নিষ্ঠুরতার জন্য অতি তীব্র ও মর্ম্মভেদী তিরস্কার করিতেন। জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার একান্ত অনুচিত এই বিষয়ে তিনি এক সুন্দর ও সরল বক্তৃতা দিয়া স্বীয় হৃদয়ের অপরিসীম মহত্বের পরিচয় প্রদান করেন।

একদা লিঙ্কলন বিদ্যালয়ে যে হরিণ শাবক ছিল, তাহার শৃঙ্গ দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তিনি সরলভাবে আপনার দোষ শিক্ষক ও অপরাপর ছাত্রগণের নিকট প্রকাশ করিয়া সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন।

ওয়াসিংটনের ন্যায় তিনি অসত্য ও মিথ্যাকে বাল্যকাল হইতেই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। পাঁচ বৎসরের বয়সের সময় ওয়াসিংটন পিতার বাগানে প্রবেশ করিয়া বালসুলভ চপলতার উপরোধে পিতৃরোপিত চেরিবৃক্ষ হস্তস্থিত নবনির্ম্মিত কর্ত্তরিকা দ্বারা ছেদন করেন ও অকপটে পিতার নিকটে আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া সত্যনিষ্ঠ পিতাকে পরিতুষ্ট করেন। লিঙ্কলনের সত্যনিষ্ঠায় তাঁর শিক্ষকও সম্ভবত বিশেষ তুষ্টি লাভ করেন।

লিঙ্কলন শুদ্ধরূপে বর্ণবিন্যাস করিতে বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। কি শিক্ষক, কি ছাত্র, কেহই কখনও মনে করিত না যে, তিনি বানানাদি সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইবেন। এই বিষয়ে অতি কৌতুকাবহ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। একদা শিক্ষক ক্রফোর্ড বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে "de-fied শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ fide, কেহ fyd, কেহ fyde এবং কেহ fyed বলিয়া বানান করিল। কেহই শব্দটী শুদ্ধরূপে বানান করিতে পারিল না দেখিয়া, শিক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তাহাদিগকে সারাদিন কয়েদ থাকিবার আদেশ করিলেন। সেই শ্রেণীতে রাবি নাম্নী বালিকা অধ্যয়ন করিত। লিঙ্কলন তাহার প্রতি একটু অনুরক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া ছাত্রদের দুর্গতি দেখিয়া হাসিতেছিলেন। রাবির দিকে চাহিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া শিক্ষকের অজ্ঞাতসারে আপনার একটী চক্ষুতে (eye) অঙ্গুলী রাখাতে চতুরা বালিকা বুঝিতে পারিল যে, শেষোক্ত defyed শব্দের y অক্ষরের স্থলে i হইবে। লিঙ্কলনের ইঙ্গিত অনুসারে বালিকা শব্দটী শুদ্ধরূপে বানান করিয়া নিজকে ও সহাধ্যায়ী বালকগণকে কয়েদ-মুক্ত করিল।

এইরূপে অল্প কালের মধ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে লিঙ্কলনের সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব সংস্থাপিত হয়। আপনার মধুর উপদেশ, বচন বিন্যাস ও অন্যান্য নানা উপায়ে তিনি সহচর ছাত্রদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতেন। তাহাদের মধ্যে কোনও বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে আপোষে তাহা মিটাইয়া দিতেন। এই জন্য ছাত্রগণ 'শান্তি-সংস্থাপক বলিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিত ও সবিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিত। তাঁহার রাজপদ প্রাপ্তির অনতিবিলম্বে যুক্তরাজ্য যে ঘোরতর গৃহবিবাদে দাসত্ব প্রথা লইয়া (১৮৬০-৬৪ খৃঃ) দগ্ধীভূত হয়, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা নিবারণে সমর্থ হন নাই এবং আপনার 'শান্তিসংস্থাপক' নামের সার্থকতা বিধান করিয়া বিনা রক্তপাতে স্বদেশের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হন নাই। কারণ স্বাধীনতার চিরকলঙ্ক দাসত্ব প্রথা প্রচলিত রাখিয়া আমেরিকাকে নরকের গভীর অন্ধকারে চির কালের জন্য নিমজ্জিত করিতে, দক্ষিণ দিগস্থিত কেরোলিনাদি প্রদেশ সকল বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তিনি উত্তরস্থ দাসত্ব প্রথার চির-বিরোধী প্রদেশ সমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় আমেরিকার যুক্ত রাজ্য হইতে সমূলে দাসত্ব উন্মূলিত করিয়া ৬০ লক্ষ কৃষ্ণবর্ণ দাসকে স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক বর্ণভেদের বৈষম্য দূরীভূত করেন, এবং সর্ব্বতোভাবে সাম্য মৈত্রী ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমেরিকাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার লীলাভূমিতে পরিণত করেন।

চারি বৎসর ঘোরতর যুদ্ধের পর দক্ষিণস্থ প্রদেশ সকল পরাজিত হইয়া সর্ব্বত্র ন্যায় ও সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের ক্রোধ ও জিঘাংসা পরিতৃপ্ত হইল না। যে দেবোপম মহাপুরুষ আমেরিকাকে ন্যায় ও সাম্যের মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দাসত্ব প্রথার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হইতে চিরকালের জন্য স্বদেশের উদ্ধার সাধন করেন, অবশেষে তাঁহার অমূল্য হৃদয়শোণিত পান না করিয়া সেই পাশবিক জিঘাংসা পরিতৃপ্ত হয় নাই। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট ব্যতীত এমন মহাপুরুষ আর কয়জন আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের পদরেণুতে পৃথিবীকে পবিত্রীকৃত করিয়াছেন এবং চিরদুঃখী ও দরিদ্রের উদ্ধারার্থ আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা জানি না।

লিঙ্কলন ক্রফোর্ডের নিকট ভদ্র সমাজে রীতি নীতি শিক্ষা করেন। বিদ্যালয় গমনের অল্পকাল পরেই তিনি ত্রৈরাশিক ব্যতীত পাটীগণিতের সমুদায় বিষয় শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। শিক্ষকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি ত্রৈরাশিক ও সমানুপাত আয়ত্ত করিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী ডেভিড টারণহাম কহিয়াছেন যে, "শিক্ষকদিগের যতটুকু বিদ্যা থাকিত, তাহা শিক্ষা না করিয়া আব্রাহাম কখনও কোন স্কুল পরিত্যাগ করেন নাই।"

ক্রফোর্ডের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্কলন তিন বৎসর পর্য্যন্ত গৃহে বসিয়াই অতি যত্নের সহিত, দৈবাৎ যখন যে পুস্তক পাইতেন, তাহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে ৫ মাইল দূরে ছোয়ানী নামক একজন শিক্ষক একটী বিদ্যালয় খুলিলে তিনি তাহাতে কয়েক দিন পাঠ করিয়া ১৮ বৎসর বয়সে ছাত্রজীবন সমাপন করেন। ক্রমে ক্রমে ৫টী পাঠশালায় লিঙ্কলন মোটে এক বৎসরেরও ন্যূন সময় অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন!! আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেণ্টকে এইরূপ সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াই আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভারবি।

বাল্মীকি, ব্যাস, জগতের আদর্শ কবি। তাঁহাদের পরে নাম করিতে হইলে, কালিদাসই প্রথম চিন্তাপথে উপস্থিত হন; তার পর ভারবি। ভারবির অন্য কাব্য ছিল কি না, জানিবার উপায় নাই; কিন্তু তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয় অতি উচ্চ দরের মহাকাব্য। ইহার কবিতা গুলি যেমন মাধুর্য্যময়, তেমনই ভাবপূর্ণ। বৃথা অতিশয়োক্তি দ্বারা তিনি স্বকীয় কাব্যকে দূষিত করেন নাই। তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় যেমন কুশলী মানবের চিত্তবৃত্তি পরিজ্ঞানেও ততোধিক কৃতী। তাঁহার নির্দ্দোষ কবিতার নানা গুণ সত্ত্বেও পূর্ব্বতন সমাজে যে তিনি তত প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই; তাহা মন্তব্য দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে! প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

তাবদ্ভাভারবের্ভাতি, যাবন্মাঘস্যনোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ক মাঘঃক্কচ ভারবিঃ॥

ইহা বোধ হয়, যমক ও অনুপ্রাসপ্রিয়

পাঠকদিগের উক্তি হইবে; নতুবা ভাবের পক্ষপাতী পণ্ডিতসমাজ, কদাচ তাঁহাকে মাঘ ও শ্রীহর্ষের নিম্নে আসন প্রদান করিবেন না। তাঁহার গভীরার্থ কবিতাগুলি পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাব উপস্থিত হয়। তাঁহার লেখনী কখনও বীর-রসে প্রমত্ত হইয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে, কোন স্থানে বা আদিরসের কুসুম-সৌরভ বিতরণ করিয়া যুবজনের চিত্তবৃত্তির অনুবর্ত্তন করিয়াছে, কোথাও শান্তি-সলিল প্রক্ষেপ দ্বারা বীর-হৃদয়েও বৈরাগ্য জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছে। মানবহৃদয়ের মনস্বিতা, তেজ, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণগুলি যেন তাঁহার সুপরীক্ষিত ছিল; তাই যেখানে যে ভাবটী সুসঙ্গত, সেখানে সেইটী বিন্যাস করিয়াছেন।

তাঁহার কাব্যের নায়ক নায়িকার গুণ সমূহ চর্চ্চা করিবার পূর্ব্বে ইতিবৃত্তটী প্রকটিত করা উচিত। পাণ্ডবগণ পাশক ক্রীড়ায় পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া, বনে আসিয়াছেন। সর্ব্বদা বিপক্ষদিগের কথা তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরুক। শত্রুরা কিরূপ রাজ্য-শাসন করিতেছে, জানিবার জন্য দ্বৈতবনে অবস্থান কালে একজন বনেচর পাঠাইয়াছিলেন। সে আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট সুযোধনের প্রজাপালনের অতি সুশৃঙ্খলা বর্ণন করিল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী-গৃহে গিয়া, ভ্রাতাদের নিকট সমুদয় বলিলে, প্রথম যাজ্ঞসেনী, পরে বৃকোদর অতি ওজস্বিভাবে নিজ দুঃখ জ্ঞাপন পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য উত্থিত হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজও নীতিযুক্ত বাক্য দ্বারা যখন প্রোক্ত বাক্যের উত্তর প্রদান করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সেখানে উপনীত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে মন্ত্রদীক্ষিত করিয়া তপস্যার আদেশ করিয়া চলিয়া গেলেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের আদেশে, ব্যাস-নির্দ্দিষ্ট বনেচরের সহিত হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিরাত, ইন্দ্রকিল পর্ব্বত প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেল। অর্জ্জুন সেখানে তপস্যা আরম্ভ করিলে, পর্ব্বতবাসীরা দেবরাজকে সংবাদ প্রদান করিল। দেবরাজ, অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ পরীক্ষার জন্য অপ্সরাদিগকে পাঠাইলেন। কিন্নরীগণ অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গেল। তখন স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া অর্জ্জুনকে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু পার্থ, বৈরশোধন না করিয়া মুক্তিও শ্রেয়স্কর নহে, বোধ করিয়া ইন্দ্রের বাক্যে সম্মত হইলেন না। ইন্দ্র আত্ম-পরিচয় দিয়া মহাদেবকে আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। অর্জ্জুন পুনরায় কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। মুনিগণ মহাদেবকে অর্জ্জুনের তপঃপ্রভাবের বিষয় বলিলেন। পরে কিরাতরূপী মহাদেবের সহ অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম হয় এবং মহাদেবকে জানিতে পারিয়া অর্জ্জুন স্তব করেন এবং মহাদেবের প্রসাদ স্বরূপ পাশুপতাস্ত্র লাভ করিয়া প্রত্যাগত হন।

এই মহা কাব্যের নায়ক, অর্জ্জুন। আলঙ্কারিকেরা নায়কের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে অর্জ্জুনকে ধীরোদাত্ত নায়ক বলা যাইতে পারে, কারণ শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, উদারতা প্রভৃতি নায়কের যে সকল সাধারণ গুণ উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ধীরো-

দান্ত নায়ক, আরও কতক গুলি গুণে মণ্ডিত, সে সকল এই যথাঃ—ত্যাগশীলতা, কৌলীন্য, দক্ষতা, তেজস্বিতা, পাণ্ডিত্য, সচ্চরিত্রতা ইত্যাদি। অর্জ্জুনে এই সকল গুণের কোনটী কিরূপ ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত কবিতা গুলি দ্বারা তাহা কতকটা বুঝা যাইতে পারে। বনেচরেরা দেবরাজের নিকট গিয়া অর্জ্জুনের প্রকৃতি বর্ণন করিতেছে। যথাঃ—

উরুসত্ত্বমাহ বিপরিশ্রমতা,
পরমং বপুঃ প্রথয়তীব জয়ং,
শমিনোঽপি তস্য নবসঙ্গমনে
বিভুতানুসঙ্গিভয়মেতি জনঃ ॥৩৫। ষষ্ঠ সর্গ।

আয়াস করিলেও শ্রমবোধ নাই, ইহাতেই তাঁহার মহাসত্ত্বতা প্রকটিত হইতেছে; আর আকার দেখিলেই জয়শীল বলিয়া বোধ হয়। যদিও শান্তিপ্রিয় তপস্বী, কিন্তু তাঁহার সহিত প্রথম সমাগমে, লোকে একটী ভয় প্রাপ্ত হয়, উহা প্রভুত্বের স্বাভাবিক সহচর।

প্রভবতি ন মনঃ কদম্ববায়ৌ,
মদনধ্বরেচ শিখণ্ডিনাং নিনাদে।
জনইব ন ধৃতেশ্চ চাল জিষ্ণুঃ,
নহি মহতাং সুকরঃ সমাধিভঙ্গঃ ॥ ২৩।
দশম সর্গ।

কদম্ব সংসর্গী বায়ু প্রবাহিত হইলে এবং মদমত্ত ময়ূরের মধুর নিনাদে, অর্জ্জুনের অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল না; সামান্য জনের ন্যায় তিনি ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হয়েন নাই। যেহেতু মহান্ ব্যক্তিদের সমাধিভঙ্গ, সুসাধ্য নহে। আবার অপ্সরাগণ অর্জ্জুনকে নানারূপে প্রলোভিত করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলনা, তখন বলিতেছে;—

যদি মনসি শমঃ কিমঙ্গচাপং,
শঠ বিষয়াস্তব বল্লভা ন মুক্তিঃ।
ভবতু দিশতি নান্য কামিনীভ্যঃ,
তব হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরাবকাশং ॥৫৫। ১০ম সর্গ।

তোমার মনে যদি শান্তিই থাকিবে, ওহে তবে ধনু কি জন্য? হে শঠ! বিষয়ই তোমার প্রিয়; মুক্তি তোমার স্পৃহণীয় নহে। তাহা হউক, তোমার কোন হৃদয়েশ্বরী তোমার হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, সেই অন্য কামিনীদের অবকাশ প্রদান করিতেছেনা। আবার তাপসরূপী সহস্র লোচনের উপদেশে সম্মত না হইয়া স্থির অধ্যবসায় অর্জ্জুন বলিতেছেন;—

বিচ্ছিন্নাভ্র বিলায়ং বা বিলীয়ে নগমূর্দ্ধনি।
আরাধ্য বা সহস্রাক্ষমযশঃশল্যমুদ্ধরে॥ ৭৯।
১১শ সর্গ।

বায়ু-তাড়িত অভ্র যে প্রকার আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এই পর্ব্বতে লয় পাইব, অথবা সহস্র-লোচনকে আরাধনা করিয়া, অযশ শল্য উদ্ধার করিব।

আবার যে সময় বিদ্ধ বরাহের অঙ্গ হইতে, শর লইয়া অর্জ্জুন প্রত্যাগত হইতেছেন, সে সময় ছদ্মরূপী মহাদেবের দূত কিরাত আসিয়া, এই বান আমার প্রভুর, এই কথা বলায় অনেকক্ষণ উভয়ে বাদানুবাদ হইল, তার পর অর্জ্জুন বলিতেছেন;—

অসিঃ শরা বর্ম্ম ধনুশ্চ নোচ্চৈকং,
বিবিচ্য কিং প্রার্থিতমীশ্বরেণতে।
অথাস্তি শক্তিঃ কৃতানবযাচ্ঞয়া,
নদূষিতঃ শক্তিমতাং স্বয়ং গ্রহঃ ॥২০।১৪শ সর্গ।

“খড়্গ, বান, কবচ, উৎকৃষ্ট ধনু, ইহার মধ্যে কোন বস্তু তোমার প্রভু বিবেচনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। অথবা যদি শক্তি থাকে, যাঞ্চারইবা প্রয়োজন

কি? বীরদিগের স্বয়ং গ্রহণ, নিন্দনীয় নহে।” ইহা কি অল্প বিক্রমের পরিচয় দিতেছে। কোথায় সুদূর হিমালয় শিখর, কোথায় ইবা সহচর পর্য্যন্ত শূন্য, নিঃসহায়, একাকী অর্জ্জুন। কোন্ ব্যক্তি শত্রু-বেষ্টিতস্থানে এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে?

নায়কের বিষয় যাহা কিছু উদ্ধৃত হইল, ইহাতেই নায়কোচিত গুণের উৎকর্ষতা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। এখন এই কাব্যের নায়িকা দ্রৌপদী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা আবশ্যক। কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির মালতী কি সীতা, বানভট্টের মহাশ্বেতা অথবা কাদম্বরী, হর্ষদেবের সাগরিকা, কিম্বা শ্রীহর্ষের দময়ন্তী যে ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত, দ্রৌপদী সে উপাদানে গঠিতা নহেন। প্রোক্ত নায়িকারা, কেবল কোমলতারই আধার, কিন্তু ভারবির দ্রৌপদীতে কর্ত্তব্যবুদ্ধির কঠোরতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। তিনি বীরের উপযুক্ত ভার্য্যা, রাজ্যের উপযুক্ত রাজ্ঞী, প্রেমিকেরও উপযুক্ত প্রণয়িণী। যখন বনেচর দুর্য্যোধনের রাজ্য শাসনের চরমোৎকর্ষ বর্ণন করিয়া গেল, তখন দ্রৌপদী বলিতেছেন;—

ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোচিতং,
ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনং।
তথাপি বক্তুং ব্যবসায়য়ন্তিমাং
নিরস্তনারীসময়া দুরাধয়ঃ ॥২৮। প্রথম সর্গ।

যদিও ভবাদৃশ বীরগণের প্রতি স্ত্রীজন কর্ত্তৃক উপদেশ অনুচিত এবং তিরস্কার তুল্য, তথাপি প্রমদাজনের লজ্জাভঙ্গ জন্য যে মানসিক ব্যথা, তাহাই আমাকে বলিবার জন্য প্রবৃত্ত করিতেছে।

ভবন্তি মে তর্হি মনস্বি গর্হিতে,
বিবর্ত্তমানং নরদেব বর্ত্মনি।
কথং ন মন্যুর্জ্জ্বলয়ত্যুদীরিতঃ,
শমীতরুং শুষ্কমিবাগ্নিরুচ্ছিখঃ ॥৩২। ১ম সর্গ।

হে নরদেব! আপনি মনস্বিজন কর্ত্তৃক বিগর্হিত পথের অনুসরণ করিয়াছেন। ঊর্দ্ধশিখা বহ্নি বিশুষ্ক শমীতরুর ন্যায়, প্রদীপ্ত ক্রোধানল আপনাকে কেন দগ্ধ করিতেছে না।

অবন্ধ্যকোপস্য বিহন্তুরাপদাং
ভবন্তি বশ্যাঃস্বয়মেব দেহিনঃ।
অমর্ষশূন্যেন জনস্য জন্তুনা
ন জাতহার্দ্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ ॥৩৩। ১ম সর্গ।

যাহার কোপ বন্ধ্যা প্রাপ্ত হয় না, প্রাণিগণ আপনা হইতেই সেই আপদ নিবারণক্ষম ব্যক্তির বশতাপন্ন হয়। ক্রোধশূন্য হইলে, কি শত্রু কি মিত্র কেহই আদরও করে না।

দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশাততঃ,
সমূলমুন্মূলয়তীব মে মনঃ
পরৈরপর্য্যাসিতবীর্য্যসম্পদাং,
পরাভবোহপ্যুৎসব এব মানিনাং॥৪১।১ম সর্গ।

যেহেতু শত্রু কর্ত্তৃক আপনার এই দশা হইয়াছে, তজ্জন্যই আমার অন্তঃকরণ ব্যথিত। বিপক্ষ দ্বারা যাঁহাদের বলবীর্য্য বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাদৃশ অভিমানী ব্যক্তিদের (সহ্য করিয়া) পরাভবও উৎসব বলিতে হইবে।

পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাঃ,
সুদুঃসহংপ্রাপ্য নিকারমীদৃশং।
ভবাদৃশাশ্চেদধিকুর্ব্বতে রতিং,
নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা ॥ ৪৩।

তেজস্বীদিগের অগ্রগণ্য, আপনাদের ন্যায় যশোধন ব্যক্তিরাও যদি এইরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ অবলম্বন করেন, তবে দেখিলাম, মনস্বিতা আশ্রয়শূন্য হইয়া বিনষ্ট হইতে চলিল।

এই মহাকাব্য বীররস প্রধান; আদি ও শান্তিরস অপ্রধানরূপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ঋতু, শৈল, বন, যুদ্ধপ্রয়াণ, মন্ত্রণা প্রভৃতি যাহা আবশ্যক, কবি সে সমুদয়ই অতি সুচারুরূপে ইহাতে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের সময় হইতে যে যমক অনুপ্রাস ও চিত্রময় কবিতা লেখার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, ইনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; কিন্তু ভারবি, যমক ও অনুপ্রাস সৃষ্টিতে তত উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই; এ বিষয়ে মাঘভট্ট অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। চিত্রময় শ্লোক রচনায় মাঘ ও ভারবি উভয়ই সমানধর্ম্মা। নিম্নে ভারবিকৃত একটী চিত্রময় কবিতা উদ্ধৃত হইল। এই শ্লোকটী যে দিক হইতে পাঠ করা যাইবে, তাহাতে তুল্য আকার ও তুল্য অর্থ প্রকটিত হইবে।

[সর্ব্বতোভদ্র।]

দে	বা	কা	নি	কা	বা	দে
বা	হি	কা	স্ব	কা	হি	বা
কা	কা	রে	ভ	রে	কা	কা
নি	স্ব	ভ	ব্য	ভ	স্ব	নি

১৫ শ সর্গ-২৫ শ্লোক।

এ সকল গেল পুরাতন সংস্কার, কিন্তু একটী বিষয়ে ভারবি আধুনিক পাঠকবর্গের নিকট নিতান্ত অভিযুক্ত। তিনি অনুচিত আদিরস বর্ণনা দ্বারা যে কয়েকটী সর্গ কলুষিত করিয়াছেন, উহা না করিলে তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাকাব্য হইত। তাঁহার ন্যায় আর একজন মনস্বী কবি ভবভূতি উত্তর চরিতাদি নাটকে নিতান্ত প্রয়োজনীয় স্থলেও অতি সাবধানে আদিরসের অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ অনবগুণ্ঠন আদিরস বর্ণনা করা প্রাচীন কবিদিগের একটী মহাদোষ! মাঘভট্ট ও ভারবির অনুকরণ করিতে বসিয়া নিতান্ত অশ্লীল বর্ণনা দ্বারা শিশুপাল বধের ৪টী সর্গ নিতান্ত অপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা হউক, এই দুই একটী সামান্য দোষ মহাকবি ভারবির পক্ষে তত কলঙ্কের বিষয় নহে। ইহা পাঠকগণ উপেক্ষাও করিতে পারেন। কারণ তাঁহার এই নারিকেল ফলসদৃশ কবিতা যদি আমরা অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পারি, তাহা হইলে ইহাদ্বারা বহু উপকারের সম্ভাবনা, কিন্তু উপরে উপরে পাঠ করিলে অর্থাৎ অর্থের গভীরতারূপ ত্বক্ ভেদ না করিতে পারিলে ভারবির রসে একান্তই বঞ্চিত হইতে হয়। ভারবির জীবনবৃত্ত জানিবার জন্য অনেকের ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। কিন্তু তাঁহার ইতিবৃত্ত অতীব অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমরা সেই তিমির ভেদ করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, বারান্তরে উহা প্রকটিত করা যাইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মা।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার। *

খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ যেরূপ পরাক্রান্ত ও দিগন্তব্যাপী, তাহাতে বোধ হয়, অদূরদর্শী লোকেরা মনে করিবে, পরিশেষে খ্রীষ্টধর্ম্মই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবীকে পরাভূত

* নবজীবনে প্রকাশিত প্রস্তাবের পর হইতে আরম্ভ।

করিবে; বস্তুতঃ পৃথিবীর মহাখণ্ড চতুষ্টয়ে খ্রীষ্টীয় প্রচারক দ্বারা তাঁহাদিগের মণ্ডলী সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং অসংখ্য নর নারী তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া উক্ত ধর্ম্মেরই জয় বিঘোষণা করিতেছে। পৃথিবীর এ অভিনয়, সভ্যতা ও জ্ঞানোন্নতির বিরোধী কি না, জানি না; ধর্ম্ম জানেন, আর সমাজতত্ত্বদর্শী লোকেরা বলিতে পারেন। ঈশ্বর সৃষ্ট সকলেই, কে তাহা অস্বীকার করিবে? কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ইহুদি কি আর্য্যজাতীয় ধর্ম্ম, "নিরূপণ কেহই করেন নাই। আমি তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু ইহা কতদূর প্রতিপন্ন করিতে পারিব, বলিতে পারি না।

খ্রীষ্টীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের পরম বিড়ম্বনা বাইবল; বাইবল বিজাতীয় শাস্ত্র। ইহাতে খ্রীষ্টোপাসকগণের যেরূপ সত্যদৃষ্টি সঞ্চালিত হয়, আমার সে চক্ষু নাই, সে জ্ঞান বুদ্ধি নাই, সেই হেতু ইহুদি শাস্ত্রকে ঈশ্বরাদিষ্ট বলিতে প্রাণে আঘাত লাগে। খ্রীষ্ট কে? তিনি গোলকের ঈশ্বর, অথবা যিরুশালমের মেসায়া? তিনি আর্য্য কি ইহুদি? তিনি কি যিহুদা দেশীয় যাজক? তিনি কে? হিন্দুস্থানী হিত বাক্য প্রসিদ্ধ আছে যে, "আগে দর্শন ঢালি, পিছে গুণ বিচারি" মথি লিখিত পুস্তকের একবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, যিশু যিরুশালম্ নগরীয় মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ পোদ্দারদিগের মুদ্রার আসন এবং কপোত-ব্যবসায়ীগণের আসন উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "আমার পিতার প্রার্থনা-গৃহ দস্যুর গহ্বর করিও না।" বাইবলে খ্রীষ্টের এরূপ অসৌম্য ভাব আর কদাপি দৃষ্ট হয় না; তাঁহার এই ভাব দৃষ্টে আপাতত তাঁহাকে যিহুদীয় রাব্বুনি বলিয়া ধরিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ। সমুদ্র-তরঙ্গমালা-বেষ্টিত দ্বীপে, মহা অরণ্যানি মধ্যে, সুবিশাল পর্ব্বতময় স্থানে, সুদীর্ঘ জনপদে অথবা রাজবর্ত্মে যে খ্রীষ্টের নাম প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাঁহার পরিচয় স্থল বাইবল। অপর স্থল পালিষ্টিন্ দেশ। তিনি পিতা মাতার সহিত সেই দেশে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং প্রৌঢ়াবস্থায় নব ধর্ম্ম ও নব দীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর পাপ ও সন্তাপ হরণ করেন। সেই পালিষ্টিনের বৃত্তান্ত মধ্যে খ্রীষ্টের কার্য্যকলাপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমস্ত ভুবন ব্যাপিয়া যাঁহার বিপুল মাহাত্ম্য সুবিস্তৃত আছে, তিনি যেই হউন, ভূমণ্ডলের এক জন অদ্বিতীয় মহাজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি পালিষ্টিন কি ভারতবর্ষ, পুরাকালিক আঁধার-স্তর ভেদ করিয়া তাহা নিরূপণ করিতে না পারিলে জগতের অন্ধকার কোন ক্রমেই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। সমালোচকগণ তৎসম্বন্ধে নানা রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও তাঁহাদিগের পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া নিহিত অনুসন্ধানে অনুরক্ত হইয়াছি, কিন্তু মনুষ্য ভ্রমাদি পরিশূন্য কখনই নহে, এই হেতু আমার সে ভ্রম বিজ্ঞ লোকেরা উপেক্ষা করিবেন, কোন বিষয় সত্য হইলে তাহা ইতিবৃত্তেরই মহা মঙ্গলকর ঘটনা বলিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। কিন্তু আমার সে আশা অতি অল্প, কারণ পুরাকালিক বিশ্বাসের কথা মনে উদয় হইলে আমি একেবারে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়ি; বাইবলের মতে মনুষ্য ও ঈশ্বরে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ঈশ্বর মনুষ্যের সহিত কথা কন, মনোগত ভাব তাহাদিগকে জ্ঞাপন করেন,

এই বিশ্বাসের উপর সম্পূর্ণ রূপেই বাইবল গঠিত হইয়াছে। এপ্রকার বিশ্বাস পাশ্চাত্যে যেরূপ সাধারণ, ভারতে তত নহে, এতদ্দেশীয় দর্শন শাস্ত্রই তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে।

"ইচ্ছায় আপন, করিলেন সৃজন,
আপনি গোপন তার।"

ইউরোপের দর্শন শাস্ত্র নাই, পূর্ব্বে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি; এতদ্দেশীয় দর্শন লইয়া ইউরোপ দার্শনিক, নবজীবনে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী পাঠে সম্যক বুঝিতে পারিবেন। হিব্রু জাতির দর্শন শাস্ত্র ছিল না, দর্শনের মূল পদার্থ গুলিও বাইবলে বিচারিত হয় নাই। এক ঈশ্বর মূল পদার্থ বলিলে দর্শনের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না। যাহাই হউক, পাশ্চাত্যগণ বাইবল্-বিশ্বাস বশত, স্বর্গীয় বিশ্বাস অপেক্ষা শাস্ত্রীয় বিশ্বাসকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই জন্য তদ্বিরুদ্ধে কোন লোকেই তর্ক করিতে ইচ্ছা করেন না। আমি অগ্রে বলিয়াছি যে, খ্রীষ্টোপাশকেরা যে চক্ষে বাইবলের সত্য সন্দর্শন করেন, আমার সে চক্ষু নাই। এ পাপ চক্ষে যাজকগণের ভ্রম-কল্পিত কথা দৃষ্ট হয়। স্বর্গীয় বিশ্বাসে ভ্রম আছে, শাস্ত্রীয় বিশ্বাসে ভ্রম নাই, এ কথা যদি আমি বলি, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টা বিশ্বস্ত এবং কোন্‌টা অবিশ্বাস্য, বাইবলের সম্যক আলোচনা ভিন্ন কি হটাৎ বলা যাইতে পারে? আমি ■ সম্বন্ধে কোন বিশেষ নির্দ্ধারিত মতে উপনীত হইতে পারিলাম না। আমার সামান্য বিবেচনায় এই মাত্র বোধ হয় যে, বাইবল-ভক্ত লোকেরা শাস্ত্রীয় বিশ্বাস স্বর্গীয় মনে করেন। তাঁহাদের মতে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না! কারণ খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরে প্রভেদ আছে কি? এস্থলে শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের আর একটি তেজের কথা হইল, সুতরাং শাস্ত্রানুমোদিত বিশ্বাসের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের জন্মভূমি অর্থাৎ তাহার কার্য্যের পরিচয়-স্থল পালিষ্টিনের বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে অবতারণা করিতেছি। খ্রীষ্টের মৃত্যুর ষাইট বৎসর মধ্যে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত-লিপি সমাপ্ত হইয়াছিল, এই ষাইট বৎসরের ভিতর তাঁহার গোপন স্থানের, ক্রুশের, জন্মস্থানের ও হত্যাস্থানের কোন বিবরণ ইবাঞ্জিলিষ্টগণ নিউটেষ্টমেণ্টে প্রকাশ করেন নাই। লোকে কি তখন খ্রীষ্টজীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনা-স্থানের কোন তত্ত্বই রাখিত না, অথবা জীবনচরিত-লেখকদিগের ঐ সকলের উপর মোটেই ভক্তি ছিল না? দাউদের মৃত্যু বিষয়ে পিতর ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ মৃত্তিকাগত হইয়াছে, কিন্তু তিনি অদ্যাপি আমাদের প্রাণে কবরস্থ আছেন। কিন্তু খ্রীষ্টের মৃত্যু বিষয়ে পিতরের শোকার্ত্তহৃদয় হইতে একটিবার ঐরূপ শোকোচ্ছ্বাস উদ্ভূত হয় নাই। পৌল খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং স্বর্গারোহণ বিষয়েই প্রাণ ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যু বা স্বর্গারোহণ-স্থানের বিশেষ বৃত্তান্ত একেবারে উল্লেখ করেন নাই। ইঁহারা কি তবে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ ঘটনাস্থান গুলিকে ভক্তি করিতেন না? অথবা তৎকালে লোকের ঐ সকল স্থানের প্রতি ভক্তি ছিল না? অথবা পালিষ্টিনে মোটেই খ্রীষ্টের কবর ছিল না? এই সকল প্রমাণ দ্বারা যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, উপরোক্ত

সময়ে উহাদের প্রতি লোকের কোন আনুগত্য ছিল না, তখন উহাদের সত্যতা বিষয়ে কি প্রতিপাদন হইতে পারে? গলগথা অটলান্টিক মহাসাগরে কিম্বা ভূটানে, এ পাপ প্রশ্নের মীমাংসা শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা কখনই প্রতিপন্ন হইবে না। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র এ সম্বন্ধে নীরব।

আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিয়াছিলেন? বাইবলে কেবল আস্তাবলে জন্মের উল্লেখ আছে। অগষ্ট কৈশরের অনুমতিক্রমে সমস্ত রোম সাম্রাজ্যের মনুষ্য গণনা হইয়াছিল, সিরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তা সাইরিনিয়াস্ সেই হেতু লোকদিগকে আপন আপন নগরে যাইতে আদেশ করেন, মেরী ঐ জন্য বেথলেহমে নীতা হইয়াছিলেন, কিন্তু পান্থাবাসে স্থানাভাব জন্য মেরি আস্তাবলেই সন্তান প্রসব করেন। বাইবলের এ ব্রহ্ম-বাক্য খ্রীষ্টোপাসক মাত্রেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু পরে প্রদর্শিত হইবে, এ সম্বন্ধে খ্রীষ্টোপাসকগণের কেমন মতভেদ আছে। সেই হেতু বলিতেছি, খ্রীষ্ট জীবদ্দশায় পালিষ্টিনের কোথায় কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। বাইবলের মধ্যে যাহার নিদর্শন নাই, পালিষ্টিনে আবহমান কাল খ্রীষ্টোপাসকদিগের তাহাতেই পরম বিশ্বাস আবদ্ধ রহিয়াছে। খ্রীষ্ট ইহুদী ছিলেন, তাঁহার কবর ইহুদিদিগের স্বদেশে বর্ত্তমান আছে, ইহা আপনিও জানেন, আমিও শুনিয়াছি, কিন্তু তিনি যে স্থানে ক্রুশে হত হইয়াছিলেন, বাইবেলে সে স্থানের নির্দ্দেশ কি আছে? এ সমস্ত স্থান বিদেশীয় যাজকেরাই নিরূপণ করিতে জানেন। এক্ষণে ঐ দেশ মুসলমানদিগের হস্তগত। খ্রীষ্টকবরের প্রতি লোকের অসীম ভক্তি জন্য বহুদূরবর্ত্তী দেশ হইতে অসংখ্য তীর্থযাত্রী এবং ভ্রমণকারী ঐ দেশে উক্ত কবরের উপর প্রার্থনা করিতে আইসে। কিন্তু প্রাচীন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেতিহাসে এ সকল স্থানের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হয় নাই (১) এই হেতু যোধিয়া দেশ অযোধ্যা কি জুডিয়া? ইহা আণ্ডামান দ্বীপে, কি ভারতবর্ষে, নিশ্চয় কিরূপে বলিব?

এক হাজার পাঁচ শত বৎসর যিরুশালম মূর্খতা, কুসংস্কার ও প্রতারণার বাস্তুভূমি হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খ্রীষ্টীয় শতাব্দে খ্রীষ্টোপাসকগণের পালিষ্টিনে কোন প্রতিপত্তি ছিল না। উপাসনা গৃহাদি যে ছিল না, উহা অসম্ভব কথা নহে। (২)

চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দে রোমের সম্রাট কনস্টান্টাইন্ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিপোষক হইয়া ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করেন; এই সূত্রে জানা যায় যে, উক্ত সময়ে ইউরোপের মধ্যে একটা নূতন ধর্ম্মতন্ত্রের পত্তন হইয়াছিল, এবং রোমীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর যাজকগণের অপরিসীম প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রোমে কোন্ সময়ে বা কাহা কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পেটৌ (Petou) নাম্না জনৈক লেখক রোমীয় বিসপগণের কালনিরূপক একটা তালিকা প্রস্তুত করেন। রোমীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিবৃত্তেও লিখিত

(1) "That they erected their churches on places consecrated by miracles, and especially on Calvary and over our Lord's Sepulchre, is a more questionable position. There is at least no trace of it in the New Testament, nor in the history of the primitive church." Osborn's Holy Land. VII.

(2) "That for the lapse of more than fifteen centuries, Jerusalum has been the abode not only of mistaken piety but also of credulous superstition, not unmingled with pious fraud." Ibid VIII.

হইয়াছে যে, পিতর রোমের প্রথম বিশপ ছিলেন। সাতান্ন খ্রীষ্টাব্দে শত্রুদ্বারা তিনি নিহত হইলে ইটুরিয়াস্থ লিনিয়স্ তৎপদে নিয়োজিত হন। তৎপরে ক্লেমেন্স রোমান্ রোমের বিশপ হন। যাজকদিগের এ ইতিবৃত্তের মূল নিরাকৃত হওয়া অতি অসম্ভব।

৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে কনস্তান্তাইনের মাতা হেলেনা সর্ব্বাদৌ খ্রীষ্টের প্রসিদ্ধ ঘটনা সম্বন্ধীয় স্থান নিরূপণে সচেষ্টিতা হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে নানা বিদেশীয় যাজকগণ পালিষ্টিনে আসিয়া ঐ কার্য্যে যোগ দেন। ঐ সময়ে উক্ত বিদেশীয় যাজকগণ অধিকাংশ মূর্খ ছিল। বিশেষতঃ তাহারা ঐ দেশ প্রচলিত "অরমিয়" ভাষা জ্ঞাত ছিল না। পালিষ্টিনের অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তাহারা সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ বলিয়া অপরিচিত দেশীয় লোকের নিকট ও তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী বিশপগণের নিকট যাহা অবগত ছিল, তাহাই মাত্র উল্লেখ করিয়াছে। ঐ বর্ণনা অত্যন্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর। (৩)

চতুর্থ শতাব্দ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দ কেবল জনপ্রবাদ বৃদ্ধি এবং প্যালিষ্টিনের প্রসিদ্ধ ঘটনা-স্থান নিরূপণ কার্য্যেই পরিসমাপ্ত হয়। সপ্তম খ্রীষ্টীয় শতাব্দে মুসলমানগণের যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় পালিষ্টিনের অধিবাসীদের কষ্টের আর সীমা ছিল না। যাজকগণ উক্ত স্থানের এই বিপন্ন দশা দর্শন করিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও সসব্যস্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই স্থানেই পালিষ্টিনের যাজকদিগের উৎসাহ-বহ্নি নির্ব্বাণ হইল। যে সকল কল্পিত স্থানাবিষ্কার অগ্রে হইয়াছিল, তাহাই চির প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পূজ্য হইয়া গেল।

নিউইয়র্ক-নিবাসী প্রসিদ্ধ লেখক ডাক্তার রবিন্সন সাহেব স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, পালিষ্টিনের ইতিহাস এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত সম্যক আলোচনা দ্বারা আমার এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, তথায় এক্ষণে খ্রীষ্টের কবর, মৃত্যু ও জন্ম স্থানাদি সম্বন্ধে যে সকল স্থল প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীগণ যে যে স্থানের বর্ণন করেন, তাহা প্রকৃত ঘটনা স্থান নহে। উহা যাজকগণের প্রতারণার কৌশলমাত্র। রোমের রাজমহিষী বৃদ্ধা হেলেনার ক্রুশাবিষ্কার যেরূপ, খ্রীষ্টের কবর ও মৃত্যু স্থানাদি নির্ণয়ও সেই রূপ ভণ্ডামী মাত্র। ত্রাণকর্ত্তা যিশুর কবর বা মৃত্যুস্থান নিরূপণ করা, সকল চেষ্টার অতীত হইয়া পড়িয়াছে (৪)। খ্রীষ্টের জন্মস্থান আরও

(3) "So all the reports and accounts we have of the Holy City and its Sacred places have come to us from the same impure source. The fathers of the Church in Palestine, and their imitators, the monks, were themselves for the most part not natives of the country. With few exceptions, they knew little of its topography, and were mostly unacquaintad with the Aramean, the vernacular language of the common people. They have related only what was transmitted to them by their predecessors, also foreigners ; or have given opinions of their own, adopted without critical inquiry, and usually without much knowledge. In this way and from all these causes, there has been grapted upon Jerusalem and the Holy Land a vast mass of tradition, foreign in its source, and doubtful in its character, which has flourished luxuriantly aud spread itself out widely over the western world. * * * * That all ecclesiastical tradition respecting the ancient places in and around Jerusalem and throughout Palestine is of no value, except * * * " Ibid VIII.

(4) "In every view which I have been able to take of the question, both topographical and historical, whether on the spot or in the closet, and in spite of all my previous prepossessions, I am led irresistibly to the conclusion that the Golgotha and the Tomb now shown in the church of the Holy Sepulclre are not upon the real places of the crucifixion and resurrection of our Lord. The alleged discovery of them by the aged and credulous Helena, like her discovery of the cross, may not improbably have been the work of pious fraud. * * * If it

দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার। পালিষ্টিনে খ্রীষ্টের জন্মস্থান সম্বন্ধে যাহা নিরূপিত আছে, তাহা পর্ব্বতগুহা, আস্তাবল নহে। তত্রত্য খ্রীষ্টোপাসকগণের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে, খ্রীষ্ট পর্ব্বত-গুহায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শতাব্দের মধ্য সময়ে যষ্ঠিন মার্টর স্পষ্ট রূপেই বলিয়াছেন, খ্রীষ্টের পর্ব্বত-গুহায় জন্ম হইয়াছিল। বেথলেহমের নিকট ঐ পর্ব্বতগুহা অবস্থিত। তৃতীয় শতাব্দেও ঐ রূপ জনপ্রবাদ ছিল, কারণ ওরিগেন্ বলিতেছেন যে, খ্রীষ্টের পর্ব্বতগুহায় জন্ম, ইহা সর্ব্বসাধারণে অবগত ছিল, যাহারা খ্রীষ্টের শিষ্য নহে, তাহারাও উহা স্বীকার করিতেছে। চতুর্থ শতাব্দের প্রারম্ভে ইউসিবিয়স্ লিখিয়াছেন, হেলেনের পালিষ্টানে যাইবার অগ্রে তিনি খ্রীষ্টের জন্মস্থানের উপর একটী গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সব বড় বড় মাতব্বর যাজক কি মিথ্যা বলিতে পারেন? কিন্তু ইবাঞ্জিলিষ্টগণ ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত, বাইবলে আস্তাবলের উল্লেখ তাঁহারাই করিয়াছেন। খ্রীষ্টের উন্মস্থান সম্বন্ধে বাইবেল এবং পরবর্ত্তী যাজকগণের মতের বিরোধ দেখা যায়। বিষয়টী সম্পূর্ণই অন্ধকারাবৃত, সন্দেহ নাই। দেশস্থ লোক সকলে স্থান প্রাপ্ত হইল কিন্তু মেরীর স্থানাভাব হইয়াছিল; অতি আশ্চর্য্য কথা! ইহাতে ঈশ্বরের নিগূঢ় মর্ম্ম কিছু থাকিতে পারে।

কোথা হইতে রোমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম আসিয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই। কনস্তান্তাইনের হস্তেই ইহার নানা রূপ গঠিত হইয়াছিল। কনস্তান্তাইন খ্রীষ্টধর্ম্মের স্রষ্টা বলিলেও বলা যায়। কিন্তু তাঁহার ঐ ধর্ম্ম রোমে সৃষ্টি হইবার বহু পূর্ব্বে জ্ঞস্তিক ধর্ম্মাবলম্বীগণ রোমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জ্ঞস্তিক ধর্ম্মের অসাধারণ প্রাধান্য খ্রীষ্টীয়-ধর্ম্মে। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের অসাধারণ প্রাধান্য জ্ঞস্তিক ধর্ম্মে আছে, এ কথা শুনিতে পাই না। জ্ঞস্তিক ধর্ম্মই বা কি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মই বা কি? দুইটী পৃথক ধর্ম্ম, কিন্তু একের উপর অন্যের অসাধারণ প্রাধান্য লাভের হেতু কি? বুঝিতে পারিলাম না।

পালিষ্টিনের প্রাচীন পর্ব্বতভেদী পুরী সকল দৃষ্টে জানা যায়, অতি দূরবর্ত্তী কালে তথায় বৌদ্ধধর্ম্মাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল অক্ষয় বৌদ্ধকীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিতে বৌদ্ধধর্ম্মের কখনই বিনাশ নাই। পালিষ্টিনের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে মহারাজা অশোকের ধর্ম্মানুশাসন লিপি আর একটী অদ্বিতীয় প্রমাণ।

শ্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবভূতি ও প্রকৃতি।

ভবভূতির প্রকৃতি-উপাসনা প্রদর্শন করিতে হইলে, তাঁহার যাদৃশী বর্ণনায় উহা সম্যক্ প্রতিবিম্বিত, তাহার আংশিক সমালোচনা আবশ্যক; বিশেষতঃ রচনা শক্তি

be asked, where then are the true sites of Golgotha and the Sepulchre to be sought? I must reply, that probably all search can only be in vain." Ibid.

বর্ণনার প্রধান সহায় বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান অসঙ্গত নহে। অতএব আমরা প্রথমত তদীয় রচনা ও বর্ণনা শক্তির আভাস প্রদান করিব।

ভবভূতির রচনা শক্তি অতি বিস্ময়কর, তাঁহার ন্যায় ভাষাধিপত্য অন্য কোন কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না। অতি দুরূহ পদ-সমন্বিত অতি দীর্ঘ সমাস তদীয় লেখনী হইতে অনায়াসে প্রসূত হইয়াছে; তদীয় কাব্যে লৌকিক ও বৈদিক শব্দ এবং প্রণালী অলক্ষিতভাবে অতি সহজে মিশ্রিত হইয়া বহুস্থলে অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নবজলধরের আমন্দ্র গর্জ্জনে মন যেরূপ পুলকিত হয়, ভবভূতির স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠনাদে চিত্ত তেমনই সন্তর্পিত ও পুলকিত হয়। এমন প্রগাঢ়, এমন গাম্ভীর্য্যময়, এমন তুঙ্গতরঙ্গময় রচনা সংস্কৃত ভাষাকে আর অলঙ্কৃত করে নাই। নবীন জলধর সংঘ দিগন্তপ্রসারিণী ভূধরশৃঙ্গসংহতি ও তদীয় রচনা মনকে তুল্যভাবে মোহিত করে। উক্তবিধ রচনা যখন পর্ব্বতাদি প্রকাণ্ড ও বিশাল বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যকোন পদার্থই সম্ভবে না।

"এতাশ্চন্দনাশ্বকর্ণ সরল পাটল প্রায়তরু গহনা; পরিণত মালূর সুরভয়ঃ স্মারয়ন্তি খলু তরুণকদম্বজম্বুবনারুদ্ধান্ধকার গুরুনিকুঞ্জ গভীরগহ্বরোদগার গোদাবরীরব মুখরিত বিশাল মেখলাভুবো দক্ষিণারণ্য ভূধরান্।"

চন্দন অশ্বকর্ণ সরল ও পাটলাভূমিষ্ঠ বৃক্ষ দ্বারা গহন ও পরিপক্ক মালূর ফল দ্বারা সুরভিত এই সকল অরণ্য গিরি ভূমি, তরুণ কদম্ব ও জম্বুবন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অন্ধকারাবৃত বিশাল নিকুঞ্জস্থ গভীরগহ্বর হইতে উদ্‌গীর্ণ গোদাবরী জলপ্রবাহে প্রতিধ্বনিত বিশাল মেখলাভূমি শোভিত দক্ষিণারণ্যস্থ ভূধর সমূহকে স্মারিত করিতেছে।

বর্ণনা শক্তি পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, সম্প্রতি আমরা রচনা-কৌশল প্রদর্শন জন্য নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

গুঞ্জৎ কুঞ্জ কুটীর কৌশিক ঘটা
ঘুৎকার সংবল্গিত ক্রন্দৎ-ফেরব
চণ্ডতাৎকৃতিভৃত প্রাগ্‌ভারভীমৈস্তটৈঃ।
অন্তঃশীর্ণ করঙ্ককর্পর পয়ঃ সংরোধ কূলঙ্কষ।
স্রোতোনির্গম ঘোরঘর্ঘর রবা পারে শ্মশানং সরিৎ॥

মাধব মালতীর প্রণয়ে নিরাশ হইয়া আত্মবিসর্জ্জনার্থে শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইলেন। তিনি খড়্গহস্তে পিশাচ ও বেতালাদির ভয়াবহ বিভীষিকা দর্শন করিতে করিতে শ্মশান-পার্শ্বস্থ নদীতটে উপস্থিত হওয়ামাত্র সমস্ত বিভীষিকা সহসা অন্তর্হিত হইল; তখন সেই গাঢ় অন্ধকার মধ্যে মানব-সঞ্চার রহিত শ্মশান-প্রান্তে পেচকের ঘুৎকার, শিবাগণের অশুভ ও দীর্ঘতাৎকৃতধ্বনি এবং শবকঙ্কালে প্রতিহত প্রবাহা শৈবলিনীর ঘোর ঘর্ঘররব আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। উক্ত শ্লোকে কবি এই ভাব প্রকাশিত করিয়াছেন। উহার পর্য্যালোচনায় এলফিনষ্টন্ বলিয়াছিলেন * "ভবভূতির বিস্ময়কারী বর্ণ-

* "Among his most impressive descriptions is one, where his hero repairs at midnight to a field of tombs, scarcely lighted by the flames of the funeral pyres and evokes the demons of the place, whose appearance, filling the air with shrill cries and unearthly forms, is painted in dark and powerful

নার মধ্যে শ্মশান বর্ণনাও একটী প্রধান। নিশীথ সময়ে নায়কের শ্মশান ঘাটে গমন, চিতাগ্নি দ্বারা কথঞ্চিৎ আলোকিত অন্ধকারময় শ্মশান, ক্ষীণালোকে প্রকটিত পিশাচগণের অমানুষ আকৃতি, গগনব্যাপী কর্কশনাদ, অতি প্রগাঢ় ও অত্যুজ্জল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে; পরন্তু পিশাচগণের আকস্মিক অন্তর্দ্ধানের পরেই নির্জ্জনতা, সমীরণের সোঁ সোঁ নাদ, নদী স্রোতের কর্কশধ্বনি, পেচকের উদাসকারী রব এবং শৃগালের অতি দীর্ঘ শব্দ, ভূতসঙ্গ-প্রসূত ভয় হইতেও যেন অধিকতর ভয়াবহ।"

উক্ত শ্লোকস্থ দীর্ঘ সমাস সংবলিত, ঘুৎকার, চণ্ড, তাংকৃত, ভৃত, প্রাগ্‌ভাব, ভীম, ঘর্ঘর এবং শ্মশান এই কয়েকটী পদ ভীতি সঞ্চারের প্রধান সহায়; এই কয়েকটী পদবন্ধনের কৌশল আরও বিস্ময়জনক। এই কয়েকটী শব্দই প্রায় মহাপ্রাণ বর্ণময়, পরন্তু সেই মহাপ্রাণ বর্ণময় শব্দ শ্লোকের মহাপ্রাণ স্থান ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যেরূপ বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ অল্পপ্রাণ, শ্লোকের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ডকেও তদ্রূপ অল্পপ্রাণ বর্ণময় করতঃ কবি পদবিন্যাসের চরম কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষত শ্লোকের ধ্বনিও শবাস্থি-প্রতিহত প্রবাহা স্রবন্তীর কর্কশনাদানুকারী।

প্রতিকূলবর্ণতা দোষ প্রদর্শন সময়েও কাব্য প্রকাশকার "প্রাগপ্রাপ্তনিশুম্ভ" এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "রৌদ্ররসে বিকটবর্ণত্বও দীর্ঘসমাসত্ব অনুকূল, সুতরাং ভবভূতি উক্ত শ্লোকে ক্রোধব্যঞ্জক তিন পদেই বিকটবর্ণ ও দীর্ঘসমাস যুক্ত করিয়াছেন, অথচ চতুর্থ পদে ক্রোধ বর্ত্তমান নাই বলিয়া সেই স্থানে সেই পদেই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।"*

কবি স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি "বশ্যবাক্" "দেবীভারতী তাঁহাকে বশগা কামিনীর ন্যায় সেবা করিয়া থাকেন,‡ সুতরাং ভাষাধিপত্য ও রচনাকৌশল বর্ণনা শক্তির সহায় হইয়া ভবভূতি-কাব্যের পরমোৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছে। বর্ণনাশক্তি কবিমাত্রেরই পরীক্ষার স্থল, কিন্তু ভবভূতির যে বর্ণনায় প্রকৃতির বিপ্রলম্ভময় ভাব প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতি-প্রেমিক সহৃদয়গণের অতিশয় প্রীতিপ্রদ ও অনুমোদিত। উক্ত সহৃদয়গণ বলেন,—অরণ্য, ভূধর প্রভৃতি সঞ্চারের বর্ণনা করিতে হইলে মনুষ্যের অবতারণা না হইয়া প্রকৃতির সন্তান, বনবিহারী ও বনবাসী বিহঙ্গ, বিটপী ও মৃগাদির আনুষঙ্গিক বর্ণনাই প্রশস্ত। মনুষ্য স্বভাবের সন্তান হইলেও সে অতি বিকৃত, তাহার শরীর স্পৃষ্ট সমীরণ স্পর্শেও কাননের বিজনতা জীবনা দেবতা সন্ত্রস্তচিত্তে বহু-

---

colours; while the solitude, the moaning of the winds, the hoarse sound of the brook, the wailing owl, and the longdrawn howl of the jackal, which succeed on the sudden disappearance of the spirits, almost surpass in effect, the presence of their supernatural terrors."

Elphinstone's History of India.

* রৌদ্রে বিকটবর্ণত্বং দীর্ঘ সমাসত্বঞ্চ উচিতং।

যথা (ভবভূতি)

১। "প্রাগ্‌প্রাপ্তনিশুম্ভ শাম্ভবধনুর্দ্বৈধাবিধাবির্ভবৎ—

২। যেনানেন জগৎসুখণ্ডপরশুঃ।—

যত্রতুন ক্রোধস্তত্র চতুর্থপদাবিধানে তাদৃশ শব্দ প্রয়োগঃ।

কাব্যপ্রকাশ।

‡ বশ্যবাচঃ কবেঃ কাব্যং সাচ রামাশ্রয়া কথা॥

"যং ব্রহ্মণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ত্ততে।"

উত্তরচরিত।

বিল্যাস কানন, কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম কানন-বল্লীই-রোমাঞ্চ।

উক্ত গাম্ভীর্যময় বর্ণনা নিবহে স্পষ্ট লক্ষিত হয়, কবি নির্জ্জন বনে, গভীরঃ নিকুঞ্জে প্রকৃতির সহিত অতিরহস্য সম্ভাষণে সমর্থ হইয়াছিলেন; তাঁহার দিব্য নয়নে, নির্জ্জন আরণ্য ভূমিতে প্রকৃতির দিব্য মধুরিমা অতি স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইত। প্রকৃতি নিভৃত গিরিভূমিতে, নির্ধূম অগ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে অত্যল্প শিখা বিস্তার করত কবির চিত্ত হরণ করিত। কবি প্রতি সান্তে প্রকৃতির উন্মাদয়িত্রী জ্যোৎস্না অবলোকন করত কৃতার্থ হইতেন। তিনি প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্যে বিলীন হইয়াই স্বভাব বর্ণনার কূলঙ্কষ প্রবাহ অভিস্যন্দিত করিয়াছেন। কবি প্রকৃতির গম্ভীর ভাবেই প্রমত্ত ছিলেন। স্বভাবের কি এক বিশ্বব্যাপক ভাব তাঁহার অন্তঃকরণ নির্জ্জিত করিয়াছিল, কবি ঐ ভাবের উপাসনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কবি যেন বিশাল অরণ্য মধ্যে, গাঢ়নীল শৈল মালায় উপবেশন করত শিশুর ন্যায় উদ্বেল চিত্তে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। তিনি স্বকীয় কাব্যে প্রকৃতির প্রশান্ত, বিষাদ ও বিপ্রলম্ভময় কোন ভাবের উপাসনা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতি আদ্যন্তই প্রশান্ত। ক্রমশঃ—

শ্রীবসন্ত কুমার রায়।

সাহিত্য এবং সমাজ।

সাহিত্যের দুই অবস্থা। প্রথমাবস্থায় সাহিত্য মানুষের কণ্ঠাগ্রে বাস করে, দ্বিতীয়াবস্থায় সাহিত্য লিখিত হয়। ঋগ্বেদ পৃথিবীর সর্ব্বাদিম গ্রন্থ। ইহা বহু শতাব্দী ধরা যুগযুগান্ত মানবকণ্ঠে নিহিত ছিল। বেদ-মন্ত্র সকল গীতিময়। মুখস্থ করিবার সুবিধার জন্যই আদিম সাহিত্য সকল গীতাকারে রচিত হয়। জেন্দ ভাষার আদিম গ্রন্থ জেন্দ-আবেস্তা গীতিময়। ইহা বয়সে ঋগ্বেদের প্রায় সমতুল্য। মোজেসের অপূর্ব্ব উপদেশ-মালা ও প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি দেশ-ভ্রষ্ট ইহুদাগণ যত্নে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। ঈশার উপদেশ সমূহ হিব্রু ভাষায় গীতাকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশা নিজ হস্তে এক অক্ষর লিখিয়া গিয়াছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঈশার প্রাথমিক শিষ্যগণ প্রায়ই নিরক্ষর ছিলেন। ঈশার অমূল্য উপদেশ সকল শিষ্যকণ্ঠ হইতে হিব্রু ভাষায় লিখিত হয়।

আদিমাবস্থায় সাহিত্য সুধু মানুষের মুখের সম্পত্তি ছিল বলিয়াই পৌরোহিত্য-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। দীর্ঘ দীর্ঘ উপদেশ সমূহ মুখস্থ করিতে প্রায়ই জন-সাধারণের সুযোগ ও সুবিধা হয় না। কাজেই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে সেই সকল সম্পত্তি যত্নে কণ্ঠাগ্রে সঞ্চিত করিতে হয়। এই বিশেষ ব্যক্তি সকল বা তাঁহাদের পরবর্ত্তী শিষ্যগণ কালক্রমে পুরোহিতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। সময়ে পৌরোহিত্য বংশানুক্রমিক হয়। পুরাকালে মিসরদেশে এবং আধুনিক

ইয়ুরোপ পৌরহিত্যের প্রাধান্য থাকিলেও ভারতবর্ষের ন্যায় কুত্রাপি ইহার প্রবলাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারীর প্রথা পৌরহিত্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী ফল। দুই কারণে এই ফল উৎপন্ন হয়। অসুবিধা, অমনোযোগ ও অনভ্যাস বশত সাধারণ জনগণ আপনা হইতেই শাস্ত্রাধিকার উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছুক হয়। সেই উপযুক্ত পাত্র চিরন্তন পৌরহিত্য ব্যবসায়িগণই মনোনীত হন। অপর দিকে পুরোহিতগণ চিরাবলম্বিত ব্যবসায় সম্পূর্ণ রূপে হস্তগত রাখিতে এবং জন-সাধারণের উপরে আধিপত্য স্থাপন জন্য স্বার্থান্ধ হইয়া ধীরে ধীরে শাস্ত্রাধিকার অপরের অপ্রাপ্য করিতে চেষ্টা করেন। জগতে যে খানেই বিশেষ ব্যক্তি সাধারণের দত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্থানেই ক্ষমতার এইরূপ অপব্যবহার হইয়াছে। রাজত্ব সাধারণ-দত্ত ক্ষমতা মাত্র। কিন্তু রাজা এখন প্রভু সাধারণ-জনগণ অধীনস্থ ভৃত্যের অধম। ভারতের ব্রাহ্মণ জ্ঞানে ধর্ম্মে অলঙ্কৃত হইয়াও মানবপ্রকৃতির এ নীচ ভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

নেতা যাহা করেন, অল্পজ্ঞান নীতব্যক্তি তাহার অনুকরণ করে, ইহা মনুষ্য-প্রকৃতির একরূপ সাধারণ সূত্র। পুরাকালে ব্রাহ্মণজাতি সমাজ মধ্যে যে অধিকার-ভেদ ও জাত্যভিমানের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই জাতিভেদ-প্রথা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়া ভারত-সমাজকে সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

লিখিবার সঙ্কেত বা বর্ণ মালার আবিষ্কারের পরে সাহিত্য লিখিত ভাষায় পরিগণিত হয়। তখনও পূর্ব্বের অভ্যাস এবং সাধারণ রুচি বশত লেখক বা রচনা-কারকের হৃদয়ে মন্ত্রাদির রচনা গীতাকারে স্ফূরিত হয়। বিশেষত লেখা সৃষ্টির প্রথম যুগে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের গীতিময় মন্ত্রাদি মনুষ্য কণ্ঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ-বদ্ধ করাই তৎকালীন লেখকদিগের বিশেষ কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য লেখা সৃষ্টির পরেও বহুকাল সাহিত্য গীতিময় অবস্থায় থাকে।

মানব-হৃদয়ের সহজাবস্থার উচ্ছ্বাসই গীতি। এইজন্য শিশুর প্রথম স্ফূরিত আধ আধ ভাষা মধুর গীতিময়, আদিম বৈদিক ঋষিগণের অলঙ্কার পরিচ্ছদ-হীন উলঙ্গ ভাষা মহাদেব বা তান্‌সিয়ানের সঙ্গীত নিপুণতাকে চিরতরে হেয় করিয়াছে। শিশু বলে, "দিন নিবিল, রাত ঢাকিল, আকাশে পাখী ভাসিয়া গেল।" আদিম ঋষি বলিতেন, "সুবর্ণ-ভূষিতা উষা দেবীকে ধরিতে তরুণ তপন অরুণ রথে ধাবমান হইয়াছেন।" মানুষের হৃদয় সহজ অবস্থা ছাড়িয়া যখন পাষাণ হয়, তখন গীতি ভোলে। প্রাচীন গ্রীস্ দেশে প্রবাদ ছিল, প্রেমের দেবতা অন্ধ শিশু। তিনি দিবসে বিমান-বক্ষে রঙ্গিল মেঘের শয্যায় শুইয়া ঘুমান এবং রাত্রিতে চন্দ্রের কিরণ ধরিয়া ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। একদা কোন বড় মানুষের চিত্র-শালিকায় ছবি দেখিতে গিয়াছিলাম। ইতালি দেশীয় খ্যাতনামা চিত্রকরদিগের অনেক মনোমোহন চিত্র দেখিয়া যুগপৎ নয়ন মন চরিতার্থ করিলাম। তাহার এক খানি ছবিতে দেখিলাম, এক পরম রূপসী রমণীর গোলাপস্তূপ-বিনিন্দিত গ্রীবার উপরিদেশে একটী পক্ষধারী মনোহর পরী শিশু

বসিয়া দুই খানি ক্ষুদ্র করে রমণীর দুইটী চক্ষু চাপিয়া ধরিয়াছে। এই শিশু, প্রেমের দেবতা। প্রেমের দেবতা যাহার স্কন্ধে চাপিয়াছেন, তাহাকে দৃষ্টিহীন অর্থাৎ অন্ধ করিয়াছেন। প্রেম অন্ধকার, প্রেমিক অন্ধ।

প্রেম বা অনুরক্তিই মানব-হৃদয়ের সহজ অবস্থা। প্রেমিকের হৃদয় মীনাহত প্রশান্ত হ্রদ-বক্ষের ন্যায় স্থির এবং মনোহর। হিংসা কলহাদি আসুরিক ভাব এ অসীম-প্রসার স্বর্গ ধামে অসম্ভবনীয়। গীতি প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ের সুধানিঃসারিণী ভাষা মাত্র। সুতরাং গীতি অন্ধকার, গায়ক অন্ধ।

অনেকে বলেন, অনুষ্টুব ছন্দই সংস্কৃতের গদ্য ভাষা। বস্তুত কাদম্বরী, বাসবদত্তা, দশকুমারচরিত, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ ব্যতীত সংস্কৃতে বিশুদ্ধ গদ্য রচনাময় পুস্তক দুর্ল্লভ। সংস্কৃত নাটকাদিতে সহজ কথা বার্ত্তা থাকিলেও তৎসমুদয়কে বিশুদ্ধ গদ্যময় গ্রন্থ বলা যায় না। প্রাচীন ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ সকলই ছন্দ বন্ধে বিরচিত। ভারতীয় শিক্ষা-প্রণালী বোধ হয় ইহার অন্যতম কারণ। অলিখিত বেদের সময়ে ঋষিগণ যেমন বেদ মুখাগ্রে রাখিতেন, ভাষা লিখিত হইলেও সেই প্রথার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। স্বর ও উচ্চারণ বিষয়ে আর্য্য-ঋষিদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকাতেই তাঁহারা শিষ্যদিগকে প্রথমে গ্রন্থের আবৃত্তি উত্তম রূপে শিক্ষা দিতেন এবং মুখস্থ না হইলে আবৃত্তি অনর্গল ও তাহাতে শিষ্যগণের উত্তম অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। মুখস্থ করিবার সুবিধার জন্যই দর্শনাদি সূত্রাকারে ও সাহিত্য সকল ছন্দ বন্ধে রচিত হইত।

গীতি ভাবজগতের রাজা হইলেও, সত্য বিবরণ প্রকাশের অনুপযোগী। ঘটনার অবিকল বসন-ভূষণ-হীন উলঙ্গ মূর্ত্তি অঙ্কনে কবির তুলিকা সুনিপুণ নয়, এ কথা বলিলে বোধ হয় কবিগণের অগৌরব প্রচার করা হয় না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, ছন্দ বা সূত্র মাত্রই কি গীতি? সূত্রের সঙ্গে কবিত্বের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না। ছন্দ গীতির দেহ, ভাব প্রাণ। ভাব-হীন ছন্দ কবিত্বের মৃত দেহ মাত্র। ছন্দের বিশেষ বাঁধা বাঁধিতে অনেক সময়ই কবিত্বকে উদ্বন্ধন-যাতনা সহ্য করিতে হয়। কবিবর শ্রীমধুসূদন দত্ত তৎকাল-প্রচলিত অন্নদামঙ্গলি মিত্রাক্ষর ছন্দকে মাতৃভাষার পায়ের নিগড় বলিয়াছেন। ভাবের অন্ধকারময় উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে, সুধু ছন্দ ভাষাকে "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"র ন্যায় নীরস ও কঠিন করিয়া ফেলে। এই জন্য সংস্কৃত ভাষার কবিগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে নায়কের অশ্বক্ষুরোত্থিত রজোরাশিতে সিন্ধু গর্ভকে স্থলে পরিণত করিয়াছেন, ভট্ট নারায়ণ প্রস্তর কঠিন ভাষায় কাব্যকলঙ্ক ভট্টি লিখিয়াছেন, এই কারণেই বানভট্টের অতুলনীয় প্রতিভা লৌহবর্ম্মে আবৃত হইয়া সাধারণ জনগণের দুষ্প্রাপ্য হইয়া রহিয়াছে। গৌতম, কপিল উভয়ই প্রতিভা এবং জ্ঞানে অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁহাদের মনীষা যে বজ্র নির্ম্মিত পেটকে নিবদ্ধ রহিয়াছে, সাধারণ জনমণ্ডলী দূরের কথা, অসাধারণ ধীমানের পক্ষেও তাহা উন্মোচন করিয়া রত্নোদ্ধার করা সাতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাপার। শাস্ত্রের আদেশ অসংখ্যা-র্থক, উপপুরাণ, পুরাণ, মহাপুরাণ সকল পরী, দানব এবং দেবলোকের স্বপ্নময়

ভাষায় লিখিত। ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে, সমাজক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই পথের সংখ্যা অগণ্য। কেনই বা এ সমাজকে স্বেচ্ছাচার এবং অধোগতি দ্রুতবেগে আলিঙ্গন করিবে না? কেন ভারত অনাচারে, কুসংস্কারে, পাপে প্রোথিত হইবে না? শাস্ত্রের কূটার্থ সাহায্যে পাপ এবং অনাচারকে সৎকাজ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, কয় জন এই আপাতমধুর আস্বাদনে আপনাকে বঞ্চিত রাখিতে ইচ্ছুক হয়? লোকনিন্দা ও গ্লানির হাত এড়াইতে পারিলে, জগতের কয় জন মানুষ স্বেচ্ছাচারকে মাথার মুকুট না করিয়া থাকিতে পারে? সংস্কৃত সাহিত্যের ফল ভারতসমাজের উপরে যেরূপ ভাবে প্রসারিত হইয়াছে, তাহার সামান্য আংশিক আভাস দিতে হইলেও এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। বেদ উপনিষদের কথা তো অতি দূরের, অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাভারত এক খানি মহাকাব্যমাত্র হইয়াও সমাজকে যেরূপ তোল পাড় করিয়াছে, তাহা ভাবিলে সুধু অবাক হইয়া থাকিতে হয়। মহাভারত একটী নূতন সমাজ গঠন করিয়া ভারতে সামাজিক যুগান্তর ঘটাইয়াছে, ইহা বলিলেও কিছুই হইল না। পূর্ব্বোক্ত যৎসামান্য কথা কয়টী দ্বারা সেই মহা ব্যাপার, সেই যুগ যুগব্যাপী সুফল কুফল বুঝাইবার চেষ্টা করাও অতি ধৃষ্টতা।

ভারতবর্ষের মধ্যে আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালী পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রসর। প্রচলিত দেশীয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গলা ভাষাই এখন উন্নতিশীল। বাঙ্গলা ভাষাই কালে সমগ্র ভারতের সাধারণ ভাষা হইবে, কাহাকে কাহাকে এইরূপ আশা করিতেও দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, যদি ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীকে কেহ কোন বিষয়ে আজ কাল শ্রেষ্ঠত্ব দিতে প্রস্তুত হয়, তবে সে শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ, বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষার কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন। সাহিত্যে বা লেখার মধ্যেই জাতীয় চরিত্র অঙ্কিত থাকে। কোন জাতির চিন্তাশীলতা, ধীমত্তা, স্বাধীনচিন্তা, সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির ঔৎকর্ষ্য সেই জাতির লিখিত গ্রন্থ পাঠে যেমন সহজে জানা যায়, অন্য উপায়ে তদ্রূপ অবগত হওয়া যায় না। যে জাতির ভাষা মূল্যবান্ গ্রন্থ রাজিতে পরিশোভমান, সে জাতি যে একটা বড় জাতি, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। বাঙ্গালী মাতৃভাষায় ও ভাষান্তরের পত্রিকাদিতে সচরাচর বহুতর বিষয়ের যেরূপ আলোচনা করিয়া থাকেন ও অনেক দিন হইতে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে এ জাতিকে ভারতীয় অপরাপর জাতির অপেক্ষা কতকগুলি বিষয়ে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠতর আসন প্রদান করিতে প্রায় কেহই কুণ্ঠিত নন। বিশেষত ইতি মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর প্রশংসা পাইবার কথঞ্চিৎ অধিকারও জন্মিয়াছে।

জাতীয় ভাষা জাতির সাধারণের সম্পত্তি। পরকীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া বহু আয়াসসাধ্য। এইজন্য তাহা চিরদিনই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লোকের অধিকারাধীন থাকে। মানুষ শৈশব হইতেই জাতীয় ভাষায় হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে শিখে। জাতির প্রয়োজন ও প্রকৃতির অনুসারে জাতীয় ভাষা রচিত হয়। দেশভেদে মানব-প্রকৃতির প্রভেদ স্বীকার করিলে, ভাষাভেদও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এক প্রকৃতির মানুষের ভাষায় অপর প্রকৃতির

মানুষ কখনও প্রকৃত হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। পক্ষান্তরে জাতীয় ভাষার উচ্চ ভাব সকলও জাতির অজ্ঞব্যক্তি-গণ অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারে। জাতীয় ভাষায় অতি উন্নত বিষয় সকলের আলোচনা করিলেও জাতির আপামর সাধারণে তাহাতে কিছু না কিছু পরিমাণে যোগ দিতে পারে। পরকীয় ভাষায় অতি সহজ ও সরল বিষয়ের অবতারণা করি-লেও জাতির অনেকের পক্ষেই তাহা সম্পূর্ণ অবোধ্য হয়। সুতরাং সেই আলো-চনার ফল জাতির সর্ব্বাংশে বিস্তৃত হইতে পারে না। পরকীয় ভাষা আয়াস-কর-শিক্ষা-সাপেক্ষ বলিয়া যখনই সেই ভাষার শিক্ষা বন্ধ হয়, তখনই তাহা দেশ হইতে উঠিয়া যায়। এইজন্য পরকীয় ভাষায় কোন গ্রন্থাদি লিখিলে যুগযুগান্ত তাহা জাতির সম্পত্তি থাকে না। অবশ্য জাতীয় ভাষা যুগে যুগে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহা জাতির সম্পত্তি থাকে। পারস্য ও আরব্য ভাষা যেমন ইতিমধ্যেই হিন্দু জাতির নিকট এক প্রকার চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, ঋগ্‌বেদের সংস্কৃত বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইলেও তাহার তদ্রূপ দশা ঘটে নাই। আর এক যুগের জাতীয় ভাষার অস্থিমাংস দ্বারাই পরবর্ত্তী যুগের জাতীয় ভাষার দেহ গঠিত হয়। বস্তুত আধুনিক যুগের জাতীয় ভাষা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের জাতীয় ভাষার সন্তান সন্ততিমাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ভাষাগত বিধি ব্যবস্থা ও ভাব সকল আপনা হইতেই পরবর্ত্তী যুগের ভাষায় অনুবাদিত হয়। কথায় কথায় পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষার মজ্জাগত সত্য সকলের উদাহরণ আসিয়া পড়ে। সুতরাং এক যুগের জাতীয় ভাষার স্রোত পরবর্ত্তী কোন যুগেই একবারে বিলুপ্ত হয় না। পরকীয় ভাষায় ও জাতীয় ভাষায় তদ্রূপ কোন সম্বন্ধ না থাকাতেই সচ-রাচর এক জাতির ভাষা অপর জাতির মধ্যে চিরস্থায়ী হয়না। এই জন্যই পরকীয় ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া সময় ক্ষয় করিলে জাতির বিশেষ কিছুই লাভ হয় না। এই সকল কারণে জাতীয় ভাষার চর্চ্চায় ও উন্নতি সাধনে জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। "হেমি-ল্টন কোম্পানি" আমাদের দেশে দোকান করিয়াছেন। সেই দোকানে বহুসংখ্যক বহু-মূল্য মণি মুক্তা আছে। অথচ তাহা আমাদের দেশের সম্পত্তি নয়। কারণ আজই যদি প্রয়োজন বশত "হেমিল্‌টন কোম্পানি" দোকান তুলিয়া দেশে চলিয়া যান, তাহার মণিমুক্তা তাঁহারই সঙ্গে স্বদেশে চলিয়া যাইবে। তদ্রূপই ইংরেজের যে সকল সাহিত্য-রত্ন আমাদের দেশে বিস্তৃত ভাবে রহিয়াছে, দেশীয় লোকের মস্তক হইতে যে সকল ইংরেজি সাহিত্য বাহির হইতেছে, তৎ সমুদয়ও ইংরেজের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে হইতে অন্তর্হিত হইবে। তখন তাহার প্রসূত ফল কিছু দিনের জন্য এদেশে থাকিবে বটে, কিন্তু জাতীয় প্রকৃতির বহি-র্ভূত বলিয়া তাহাও বহুদিন তিষ্ঠিতে পারিবে না, আমরা পুন-র্মূষিক হইব। সকল বিদেশীয় ভাষার সঙ্গেই আমাদের এই রূপ সম্বন্ধ। কেবল বিদেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে আপনাদের দেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে যাহা সঞ্চিত করা যায়, তাহার সুফল কখনো বিনষ্ট হয় না। আবার পরকীয় ভাষায় প্রকৃত মৌলিকতা প্রকাশ করাও সুসাধ্য নয়। এক কবি অপর কবির

হৃদয়ের ভাষায় কখনই কবিতা লিখিতে পারেন না, এক জন ধর্ম্মপিপাসু অপর ধর্ম্ম-পিপাসুর প্রাণের ভাষায় প্রার্থনা করিতে পারেন না। এই দুইটী দৃষ্টান্তের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত কথাটীর সুযুক্তি নিহিত আছে। মৌলিকতাই লেখকের প্রতিভার পরি-মাপক, ইহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। পরন্তু স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক ভাব-সম্পন্ন গ্রন্থ দ্বারাই ভাষা উন্নত হয়। কোন জাতির জাতীয় ভাষা উন্নত বলিলে যেমন জাতি-টাকেও উন্নত বুঝা যায়, তেমনই, কোন জাতি জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন করি-তেছে, ইহা শুনিলেও, সেই জাতি উন্নতি-মার্গে আরোহণ করিতেছে, বুঝা যায়। বাঙ্গালী জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন জন্য কি করিতেছেন এবং এ পর্য্যন্ত কি করিয়া-ছেন, এখন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক্।

বাঙ্গলা সাহিত্যের জীবন-কালকে কয়ে-কটী অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। জয়দেবের পর-বর্ত্তী সময় হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবলাধিপত্যের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যুগ গণনা করা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাস-ময় লেখনী বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাথমিক অবতারণা যেরূপ মধুর সঙ্গীত ধ্বনিতে সমা-ধান করিয়াছে, তাহা অতি মনোমোহন। বোধহয়, পৃথিবীর কোন ভাষার সাহিত্যই এইরূপ মনোজ্ঞ বেশে রঙ্গক্ষেত্রে প্রথম অবতরণ করে নাই। অবতারণার পরেই বীণা বংশী শিঙ্গারবে বৈষ্ণব কবিগণ মাতৃ-ভাষার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সে সম্বর্দ্ধনাও অপূর্ব্ব। গোবিন্দ দাস-প্রমুখ অসংখ্য বৈষ্ণব কবি বহুকাল ব্যাপিয়া মাতৃ ভাষার মঙ্গল-গীতি গাইয়া জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিশ্বোন্মাদিনী প্রেম-গীতিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশব জীবন পরিপূর্ণ। এমন প্রেমের মহোচ্ছ্বাস, মহাভাবের প্রবল স্রোত অপরের যৌবনেও দুর্ল্লভ। সাত্ত্বিক বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশব জীবনে যে অমৃতের মহাসিন্ধু রচনা করিয়াছিলেন, পাপভারাক্রান্ত বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যবশত চৈতন্যধর্ম্মের মন্দীভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাই শেষে গরলে পরিণত হইয়াছে। অনেকে বলেন, নিত্যানন্দের প্রচারই গৌরাঙ্গের মহাভাব-পূর্ণচন্দ্রকে মেঘাবৃত করিয়াছে, তাঁহারই প্রচারে বাঙ্গালী বৈষ্ণব, "মাছের ঝোল, কামিনীর কোল, হরি হরি বোল" সার করিয়াছে, ব্যভিচার ও নেড়া নেড়ীতে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব শাস্ত্রাভিজ্ঞ, তাঁহারাই এ প্রবাদের সত্যতা বা অমূলকতা নির্দ্ধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র, আমরা শুনা কথামাত্র লিখিলাম। কিন্তু মহা-প্রভু যখন পুরুষোত্তমে বাস করিতেছিলেন, তখন বঙ্গদেশ হইতে অদ্বৈত প্রভু দুঃখ করিয়া তাঁহাকে যে তর্জ্জাটী লিখিয়াছিলেন, তাহা এই ;—

"বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল,
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল,
বাউলকে কহিও দেশ হইল বাউল,
বাউলকে একথা কহিল বাউল।"

এই তর্জ্জা পাঠে বুঝা যায় যে, চৈতন্য জীবিত থাকিতেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বঙ্গদেশে বিকৃতি লাভ করিয়াছিল। কেহ কেহ ইহাও অনুমান করেন যে, অদ্বৈতের এই পত্র পাইবার পরে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি শ্রীক্ষেত্রের গোপীনাথের মন্দির

হইতে অন্তর্দ্ধান হন। মহাপ্রভু নীলাচলে বাসকালে নিত্যানন্দের প্রতি বঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচারের ভার দিয়াছিলেন, ইহাতে বিন্দু-মাত্রও সন্দেহ নাই। যে নিতাই গৌরাঙ্গের দক্ষিণ বাহু ছিলেন, যে নিতাই এক সময়ে ভাবোন্মত্ত গোরাচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় অরণ্যে অরণ্যে ও দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যে নিত্যানন্দ জগাই মাধাইর উদ্ধাররূপ মহাব্যাপারে অসীম প্রেম ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহা হইতে কেন যে দুর্ভাগা বঙ্গের বিপদ্-পাত হইল, তাহা ভাবিলেও হৃদয় বজ্রাহত হয়, প্রাণ বিদীর্ণ হয়। যাহা হউক্, বৈষ্ণব সাহিত্যের উচ্চ মর্ম্ম সাধারণ বৈষ্ণবগণের অবোধ্য হওয়াতে দেশের ও বৈষ্ণব সমাজের চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাব উচ্চ ও আধ্যাত্মিক হইলেও তাহা রূপকাকারে লিখিত। নর-নারীর প্রেমবিলাস ও হাবভাবে শরীর গঠন করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ সেই অনিত্য দেহে পরম আধ্যাত্মিকতার মহাপ্রাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অবোধ বৈষ্ণবগণ সত্যের ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হইতে না পারিয়া সুধু অসত্য অনিত্য বস্তু লইয়া পাপসাগরে ঝাঁপ দিয়াছে, আপনারাও ডুবিয়াছে, দেশকেও ডুবাইয়াছে, এই সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের একরূপ মৃতদশা উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গের অনেক সুসন্তান এই মহারত্ন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টাকে সাধুবাদ। কিন্তু দুর্ব্বলচরিত্র বাঙ্গালী-কর্ত্তৃক এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে কি না, তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা কঠিন।

বৈষ্ণব সাহিত্য বা বাঙ্গলা ভাষার প্রথম যুগের সাহিত্যের সমালোচনাতে আমরা একটী সুন্দর উপদেশ পাইতেছি। প্রথম কথা সত্যকে রূপকাবরণে আবৃত করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নীরস মোহান্ধকারাচ্ছন্ন প্রাণের চক্ষুতে উলঙ্গমূর্ত্তি সরল সত্যের প্রখর জ্যোতি অনেক সময়ই অসহনীয় হয়। এইজন্য তাহাদিগকে সত্যের পানে আকৃষ্ট করিতে অনেক মহাপুরুষ রূপকের আশ্রয় লইয়া থাকেন। বিশেষত, অতি সহজে পাইলে সাধারণ জনগণের নিকট সত্যের মূল্য এবং আদর যেন কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। এইজন্য অনেকে সত্যকে রূপকের কঠিন আবরণে আবৃত করেন। কিন্তু অনেক সময়ই জনসমাজের উপরে তাহার বিপরীত ফল ফলে। সাধারণত, মানুষ রূপকের গর্ভস্থ মূল তত্ত্ব অবধারণ করিতে না পারিয়া সহজার্থই গ্রহণ করে এবং তাহা হইতে মূল সত্য কালে বিকৃত আকারে পরিণত হয়। বিকৃত সত্য মানব-সমাজের উপরে অতি বিষময় ফল প্রসব করে। সত্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, অতি ধীরে ধীরে কার্য্যকর হইলেও সেই সৌন্দর্য্যের মানসাকর্ষণী শক্তি আছে, সত্য প্রচারকের এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। সৌন্দর্য্যের ন্যায় সত্যের মহামূল্যতাও অতি স্বাভাবিক। কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টাতে সত্যের স্বাভাবিক মূল্যবত্তায় অনাস্থা প্রকাশ করা হয়। যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছ, তাহাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় জনসমাজের নিকট উপস্থিত কর, তাহা যদি প্রকৃত সত্য হয়— প্রকৃত স্বর্গীয় আলোক হয়, তবে তাহার জয়ের জন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে হইবে

না। সত্যের জয়-পতাকা সত্যের সেনাপতি স্বয়ং ভগবান স্বহস্তে ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে ধাবিত হন। সত্যের জয় মানবীয় চেষ্টার অতীত, সম্পূর্ণ নৈসর্গিক।

দ্বিতীয় কথা, অতি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবকেও সাধারণ মানবীয় বাসনার কুৎসিৎ বর্ণে রঞ্জিত করিলে, তাহা হইতে সাধারণত জন-সমাজের মহদপকার সংঘটিত হয়। প্রথমত, এক দল মানুষ স্বভাবতই স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন। কখনো অল্প শিক্ষা, কখনো বা স্বভাব ইহার কারণ হয়। তাহারা ঐন্দ্রিক লালসার নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক গূঢ় ভাব গ্রহণ না করিয়া আপাততোবোধ্য সহজ ভাবই গ্রহণ করে। এই জন্য সাধারণ বৈষ্ণবগণ রাসাদির স্থূল ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব সমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছে, দেশের আপামর সাধারণের চক্ষে রাধা কৃষ্ণের প্রেম সামান্য মানবীয় অবৈধ প্রেমমাত্রে পরিগণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানে উচ্চাসন লাভ করিলেই অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হয় না। এই জন্য, এক দল লোক রূপকের মর্ম্মার্থ বুঝিলেও উপরে উপরে ভাসিতে থাকে। রূপকে বাহ্যাকর্ষণ বা লালসার উদ্দীপনা থাকিলে তাহা তাহাদিগকে সহজে চরিত্রের অধোদেশে লইয়া যায়, লালসার উদ্দীপক শব্দ শুনিলেই তাহাদের ইন্দ্রিয়-বাসনা জাগরিত হয়। এইরূপ জ্ঞানীর পক্ষে রূপকের জটিলতা অজ্ঞানীকে ভুলাইয়া বাসনা চরিতার্থ করিবার দ্বার স্বরূপ হয়। বৈষ্ণব-শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকারী গোস্বামীদিগের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ অনেক সময়ই এ কথার সমর্থন করে।

আবার যাঁহারা লালসার অতীত হইয়াছেন, চরিত্রে অটল হইয়াছেন, জ্ঞানে প্রাজ্ঞ হইয়াছেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য সত্যকে কেনই বা পার্থিব সাজে সাজাইয়া মনোমোহন করিতে হইবে? যাহা হউক, বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যে যেরূপ প্রতিভা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরবর্ত্তী কোন যুগেই তাহা দৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণব কবিগণই বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্ব প্রথমে জীবনচরিত, গভীর দার্শনিক তত্ত্ব, কাব্য ও সঙ্গীত লিখিয়াছেন। বৈষ্ণবগণই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রবর্ত্তক, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। যদিও চণ্ডীদাস চৈতন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি এক জন বৈষ্ণব ছিলেন এবং ভাগবতানুমোদিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই তাঁহার বর্ণনার বিষয় ছিল। এই জন্য তাঁহাকেও আমরা বৈষ্ণব লেখকগণের মধ্যেই পরিগণিত করিলাম।

বাঙ্গলা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ বৈষ্ণব যুগের পরবর্ত্তী যুগে পাঁচজন বিখ্যাত অবৈষ্ণব কবি বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে জীবন যাপন করিয়াছেন। কীর্ত্তিবাস, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ, মুকুন্দ নারায়ণ ও ভারতচন্দ্র। এই পাঁচ জনই দ্বিতীয় যুগের প্রধান বাঙ্গালা সাহিত্য সেবক। কীর্ত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের প্রস্তাব সম্বন্ধীয় মৌলিকতা না থাকিলেও রচনার সারল্য ও পারিপাট্য অতি মনোজ্ঞ। সামান্য মুদী হইতে ভদ্র সন্তান পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সকলেই কীর্ত্তিবাস ও কাশীরামের প্রসাদে আজ বাল্মীকি এবং ব্যাসের সুধা-নিঃসারিণী লেখনীর অপূর্ব্ব ফল অতি সহজে উপভোগ করিতেছে। তাহারই ফলে বাঙ্গালার সামান্য স্ত্রীলোকও দুই চারিটা শাস্ত্রের কথা

বলিতে পারে। বস্তুত কীর্ত্তিবাস ও কাশী-রাম বাঙ্গালী হৃদয়ে চিরদিন রাজত্ব করি-বেন। কথক ও গায়কের মুখ হইতে শুনিয়া সামান্য সংগ্রহ-পুস্তক লিখিয়াও তাঁহারা একটী বিস্তীর্ণ জন-সমাজের পরিচালন কার্য্যে যেরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, জগতে অসাধারণ প্রতিভা এবং মৌলিকতার পরিচয় দিয়াও অল্পসংখ্যক গ্রন্থকারই এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিয়াছেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীকে একখানি উপা-দেয় মহাকাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি ইহাতে যেমন রচনাচাতুর্য্য, তেমনই কবি-প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা একখানি মৌলিকতাপূর্ণ সামাজিক কাব্য-গ্রন্থ—তৎকালীন বঙ্গসমাজের আচার ব্যবহারের একখানি অপূর্ব্ব দর্পণ বা আলেখ্য। চণ্ডী এক সময়ে গৃহে গৃহে গীত হইত। এখন আর সে দিন নাই। রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির জগতে যেমন আমরা ইংরেজের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, পদ-ধূলি লেহন করি, সাহিত্যজগতেও আমরা সেইরূপ ইংরেজের উদ্বমিত পদার্থরাশির প্রসাদ পাইয়া কৃত কৃতার্থ হই। চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণের এবং মুকুন্দরামের সম্পূর্ণ মৌলিক ও কবি-প্রতিভা-পূর্ণ দোষোৎপন্ন ভাবামৃত আমাদের মত নর-পিশাচের নিকট কখনই সমাদৃত হইতে পারে না। উচ্ছিষ্ট কণ্টক- ভোজী কুক্কুরের নিকট দেবভোগ্য নৈবিদ্যের আদর কখনই সম্ভবে না। আমাদের শরীরের প্রতিরক্তবিন্দু অধীনতার পূতিগন্ধ- দূষিত। আমাদের স্ত্রী পুত্র দেশ অপরে রক্ষা করিবে, আমরা সুখে ঘর বাঁধিয়া নিদ্রা দিব, আমাদের সামাজিক কুনীতি দুর্নীতি অপরে শোধন করিবে, আমরা পরমপূজ্য আর্য্য-সন্তান বলিয়া বাহবার চীৎকার তুলিব, আমাদের বস্ত্রাদি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য অপরে সংগ্রহ করিবে, আমরা ব্যবহার করিয়া জগতের ভার বৃদ্ধি করিব, অপরে পড়াবে, আমরা পরকীয় ভাষায় ময়না ও টিয়াপাখীর মত কথা কহিব, বক্তৃতার কোলাহল তুলিব, এই আমাদের জীবনের ব্রত। "শেলি" কবে হাসিয়াছিলেন, "ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ" কেমন করিয়া কাসিতেন, "টেনিসন্‌" কেমন করিয়া পা ফেলেন, ইহাই মুখস্থ করিবার আমরা সময় পাই না, কখন আর দেশের কবিবৃন্দের কথা ভাবিব? দেশের ভাষা, স্বাধীন চিন্তা, আমাদের কেন ভাল লাগিবে? "ট্রাফাল্‌গারে" নৌযুদ্ধে "নেল্‌সন" কেমন করিয়া মরিয়াছিলেন, "ওয়াটার্লুর" মহাযুদ্ধে "নেপোলিয়ন" কিরূপে বন্দী হইয়াছিলেন, "ওয়েলিংটন" কিপ্রকার ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, ইহা তো আমরা অতি যত্নে কণ্ঠাগ্রে সঞ্চিত করিয়াছি, তবে আর দেশে কখন কে ছিল না ছিল, কে কি করিয়াছিল কি না, তাহা জিজ্ঞাসা কর কেন? বাঙ্গালার যদি কখন দিন ফেরে, তবে একদিন এই সকল পূজ্যপাদ দেশীয় কবিবৃন্দের সমাদর বাড়িবে, নতুবা আজি-কার মত চিরদিনই তাঁহাদের কথা পাড়িয়া অরণ্যে রোদন করিতে হইবে।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ একখানি বিদ্যা-সুন্দর রচনা করিয়াছিলেন। ভক্ত রাম-প্রসাদের মালসী বাঙ্গলা ভাষার একখানি অপূর্ব্ব অলিখিত সাহিত্য। বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা এবং ভক্ত রাম প্রসাদ একই ব্যক্তি কিনা, নিশ্চিত রূপে জানা যায় না। রাম প্রসাদের মালসী এখন প্রসাদসঙ্গীত নামে

গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। রামপ্রসাদের সঙ্গীতা-বলী ধর্ম্ম রাজ্যের অপূর্ব্ব রত্ন। ইহা শুনিলে পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয়, নাস্তিক বিশ্বাসী হয়। ইহার রচনাও অতি সরল এবং আপামর সাধারণের বোধ্য। রামপ্রসাদও বাঙ্গালীর হৃদয়ের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদের মালসীতে অনুকরণের লেশও নাই।

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, আরো কত কি হিজি বিজি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের লিখিত। ভারতচন্দ্র ছন্দ বন্ধ এবং লিপি-চাতুর্য্যের জন্য যদি গুণাকর উপাধি পাইয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। মুকুন্দ রামের চণ্ডী পড়িয়া অন্নদামঙ্গল হাতে করিলে নূতন কল্পনার জগতে ভারতচন্দ্রকে অতি হীন বোধ হয়। কবিরঞ্জনের বিদ্যা-সুন্দরের প্রস্তাব লইয়া ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর লিখিত। ভারত বিদ্যাসুন্দরে আদিরস রূপ হলাহল সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন। ইংরেজ কলঙ্ক "রেনল্ড্‌সকে" বিদ্যাসুন্দর-লেখক ভারতচন্দ্র অশ্লীল ভাবের অবতারণায় অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। তিনি হলাহল সমুদ্র মন্থন করিয়া মহাপাপ পিশাচের এক ভীষণ মূর্ত্তি উত্তোলিত করিয়াছেন, যে বিদ্যাসুন্দর হাতে করিয়াছে, তাহারই ঘাড়ে সে দানব চিরন্তরে চাপিয়া বসিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কবি-গণ একভাবে সমাজে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র আর এক ভাবে বাঙ্গালীর স্মরণীয় হয়েছেন। বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কত নর নারী পাপের অতল সমুদ্রে ডুবিয়াছে, কে জানে? সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গ-রমণীগণ লেখাপড়ায় সাধারণত অনভিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহাদের উপরে এ বিষময় ফল অধিক পরিমাণে ফলিতে পারে নাই। কিন্তু ব্যভিচারদোষ যে বাঙ্গালী পুরুষের নিকট দোষ বলিয়াই গণ্য নয়, বরং পুরুষোচিত কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় বিদ্যাসুন্দরেরই গুণে। মলমূত্রে মেতরের ঘৃণা কম কেন? অভ্যাসের গুণে। শত-কণ্ঠে পাপের গুণ গাইবে, পাপের ইতি-হাস-দগ্ধ লৌহশলাকায় হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঁকিবে আর পাপ তোমার অভ্যাস পাইবে না, কে বলিল? সদ্গ্রন্থ যেমনই জনসমাজকে উন্নত করে, অসদ্গ্রন্থ তেমনই মানব সমাজকে অধঃপাতে লইয়া যায়। কেহ কেহ বিদ্যাসুন্দরের কুৎসিত ভাবের নিম্নেও আধ্যাত্মিকতা দেখিতে পান। আমরা এরূপ নরকনিহিত আধ্যাত্মিকতাকে দূর হইতে শত সহস্র প্রণিপাত করি। অনেকে হীরামালিনীর হাব ভাব ঠমক্ ঝমক্ চমক্‌কে ভারতের প্রতিভার অদ্ভুত ফল বলেন, আমরা বলি, এমন প্রতিভার মুখে আগুন। রুচির বিদ্রোহকারী, জগতের সকল লোককে ম্লেচ্ছ-সম্বোধনকারী, সনাতন ধর্ম্মের নিশান-ধারী "বঙ্গবাসী" পত্রিকার দলবল ভারতের শুভপ্রার্থী হলাহল নবীন চিত্রবিচিত্র গ্রন্থ পাত্র পূর্ণ করিয়া বিদ্যালয়ের অবোধ ছাত্র-দিগকে পর্য্যন্ত অমৃত বলিয়া পান করাইতে-ছেন, আর কিছু কিছু পয়সা আদায় করিতে-ছেন। ইহাঁরা বঙ্গের সুসন্তানই বটে! বলি, এত পাপে দেশ প্রোথিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়াও কি তোমাদের পাপের পিপাসা, অর্থের লালসা দূর হইবেনা? রুচি বেচারি পৃথিবীতে জন্মিয়া তোমাদের চরণে যে শত অপরাধ করিয়াছে, ইহাতে আর ভুল কি? বটতলার অস্পষ্ট ছাপায়, যাত্রায়, নাটকে বিদ্যাসুন্দর বহুকাল হইতেই দেশের সর্ব্বত্র বিস্তারিত রহিয়াছে। ইহাই

পরে আবার তাহার নূতন বাহনের কি প্রয়োজন হইয়াছিল, জানিনা।

কবিওয়ালাগণের কবি বঙ্গীয় সাহিত্যের সাময়িক কলেবর বৃদ্ধি সম্বন্ধে দ্বিতীয়, তৃতীয় উভয় যুগেই বিশেষ কার্য্য করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে সময় সময় উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সে সকলের অধিকাংশই গ্রন্থবদ্ধ না হওয়াতে সময়ের সঙ্গে লোপ পাইতেছে। নিধুর টপ্পা এবং দাশরথির পাঁচালী এক সময়ে অতি আদরের জিনিষ ছিল, এখনও সর্ব্বত্র প্রশংসিত। কিন্তু কবিওয়ালাগণ লাল ছড়া এবং অশ্লীল তর্জ্জায় এক সময়ে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ভারতচন্দ্রই তাহা অশ্লীল ভাবের দ্বার খুলিয়া দিয়া দেশের লোকের এই কুৎসিত রুচি বাড়াইয়া দিয়াছেন। কবিওয়ালার ছড়া ও তর্জ্জাদি তাঁহারই কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। কি পরিতাপের কথা! এক সময়ে বারোয়ারি ও দুর্গোৎসবাদিতে এ দেশের পুরুষ রমণী একত্র হইয়া কবিওয়ালার কুৎসিত গালিগালাজ শুনিতে একটুও কুণ্ঠিত হইতেন না, এখনও এ প্রথা একবারে নির্ম্মূল হয় নাই। যে কথার আভাসে কাণে হাত দিতে হয়, আর সেই কুৎসিত কথা একটী ভদ্রলোক মাতা ভগ্নী স্ত্রী পুত্র কন্যা শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তিদিগকে লইয়া অকাতরে শুনিতেছেন এবং বাহবা দিতেছেন! হায়! ইহার অপেক্ষাও কি অমানুষিক কার্য্য আছে? এই দেশের লোক কি চরিত্র এবং সুরুচির দাবি করিতে পারে? যাহা হউক, এইরূপে বঙ্গ সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ ভারতের অশ্লীল ভাষা এবং কবিওয়ালার কুৎসিত গালি গালাজ রাশির নিম্নে সমাহিত হইয়াছে, বাঙ্গালীর চরিত্র রূপ প্রাসাদ ভগ্ন এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলীসাৎ হইয়াছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের তৃতীয় যুগের দ্বার ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রথম উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই দ্বার দিয়া বঙ্গমাতার অনেক সুসন্তান রঙ্গ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এই যুগের প্রথম হইতেই বঙ্গের রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্ম নীতি, রুচি ও ব্যবহার সমস্তই ইংরেজি ভাবের ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মুসলমান বিজেতাগণ ভারতের শস্য শ্যামল ভূভাগে আধিপত্য স্থাপন করিয়াই কৃতার্থ-ম্মন্য হইয়াছিলেন, ভারতের মানসিক জগৎ একরূপ অস্পৃষ্টই ছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইংরেজগণ এদেশের মৃত্তিকার সঙ্গে দেশবাসীর মন প্রাণ হৃদয় সকলই অধিকৃত করিয়াছেন। সামান্য আহারে, পরিচ্ছদে, এমন কি শুদ্ধ নিশিথিনী গর্ভস্থ প্রণয়ী প্রণয়িনীর মধুর বিশ্রমালাপে পর্য্যন্ত ইংরেজের লোহিতাভ শুভ্র মূর্ত্তির ছায়া পতিত হইয়াছে। সাহিত্য আর কোন ছার। যে ব্যক্তি ইংরেজের ভাষায় কল্পনা করে, ইংরেজের মাথায় চিন্তা করে, ইংরেজের মুখে কথা বলে, তাহার লিখিত সাহিত্য যে ইংরেজ-সাহিত্য-কারের বমিত উদ্বমিত পদার্থ মাত্র হইবে, তাহা অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করাই মূঢ়তা। এই যুগে বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে অনেক প্রতিভা-ভাস্বর জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সমুদয়ই চন্দ্রের ন্যায় উপগ্রহ মাত্র, তন্মধ্যে একটীও সূর্য্য বা মূল নক্ষত্র নাই। বস্তুত, যিনিই যত লিখুন, যিনিই যত প্রতিভার পরিচয় দিউন. কিছুই যেন ইংরেজির ছায়া কলঙ্কিত না হইয়া আপন পায়ে

ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারেনা। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সময়কে পশ্চাতে রাখিয়া অক্ষয়-কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন চন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতি অনেকেই আসরে নামিয়াছেন, অনেকেরই গান খুব জমিয়াছে। কিন্তু চণ্ডী-দাস, গোবিন্দ দাস, মুকুন্দ রামের প্রতিভার ছায়াও কেহ মাড়াইতে পারেন নাই। সতীর প্রেম এবং কুলটার প্রেমে যত তফাত্, এ উভয় দলের কাব্যরসেও তত তফাৎ তফাৎ ভাব। যাহাহউক্, এ বিষয় আমাদের ঠিক সমালোচ্য নয়।

তৃতীয় যুগের সাহিত্যে খুব মৌলিকতা না থাকিলেও, তাহা বঙ্গ সমাজকে এক নূতন ভাবে আলোড়িত এবং আন্দোলিত করিয়াছে। এই আলোড়ন কার্য্যে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা এবং স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্তের গ্রন্থাবলীই সর্ব্ব প্রধান। স্বর্গগত মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের বক্তৃতা এবং উপদেশ প্রথমে ধর্ম্মতত্ত্বাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত, পরে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাও পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের উচ্চ নৈতিক ভাব উচ্চ শিক্ষিতদিগের চরিত্রেই প্রতিফলিত হইতে পারে। অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত-দিগের চরিত্রের উপরে দেশীয় সাহিত্যের প্রভাবই কার্য্যকারী হয়। এদেশে কয়টী নীতিমান উচ্চ শিক্ষিত লোক এতৎ পূর্ব্বে দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেন, তাহা আমরা ভাল রূপে জানিনা। কিন্তু অক্ষয় কুমারের গ্রন্থ পড়িয়া এদেশের সহস্র সহস্র নরনারী যে সুনীতি ও সুসংস্কারের মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন, ইহাতে ভুল নাই। আজ কাল অনেক বাঙ্গালীকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে শুনা যায়; ইয়ুরোপের সভ্য জাতির মধ্যেও অনেক অসভ্যোচিত কুসংস্কার আছে। সংস্কারের এত তীক্ষ্ণ জ্ঞান কি অক্ষয় কুমারের যত্নের ফলেই আমরা লাভ করি নাই? অশ্লীল কবির ছড়া, পুনর্ব্বিবাহের গান, বাই খেমটার নাচ গান যে অতি জঘন্য রুচির কার্য্য, ইহা কি অক্ষয় কুমার দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণে অঙ্কিত করেন নাই? মদ্য মাংসের প্রতি অশ্রদ্ধা, অকপট বন্ধুতা ও পবিত্র আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের প্রতি অনুরাগ কি অক্ষয় কুমারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে হৃদয়ে সঞ্চয় করেন নাই? প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাষায় যেমন যুগান্তর ঘটাইয়াছেন, বিধবা বিবাহ প্রতি-পোষক ও বহু বিবাহের প্রতিরোধক গ্রন্থাদি লিখিয়া সামাজিক কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিতেও তদ্রূপ ভূয়োসী চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র ও তৎ সহযোগীদের লেখনী বঙ্গ সমাজের যে উপকার করিয়াছে, তাহা বহু শতাব্দীর পরে বঙ্গের ভবিষ্য ইতিহাস-লেখক গম্ভীর সমাহিত চিত্তে ভাবিয়া লিখিবেন, এ হাল্কি ভাষায়, এ বিদ্রূপের দিনে আমরা তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিয়া তাহার গৌরব নষ্ট করিব না। অতি নীরবে সমাজ হইতে বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ অন্তর্হিত হইতেছে, জাতি-ভেদের কঠোর নিয়মের মূল বন্ধন শিথিল হইয়াছে, মান-বের ধর্ম্ম বিশ্বাস অতি সূক্ষ্মরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সমাজ সংস্কারে ও উদার ধর্ম্ম মতে সমাজ প্রতি দশ বৎসরে উন্নতির এক একটী ধাপ অতিক্রম করিতেছে দিন দিনই আবার বাঙ্গালীর মনে সত্যনিষ্ঠা এবং স্ত্রী পুরুষ অভেদে চরিত্রবত্তার আদর বাড়িতেছে, জ্ঞানানুশীলন এবং যৌক্তিকতার প্রতি

অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, ন্যায় বিচার এবং সত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, আত্ম মর্য্যাদা এবং বিবেকের স্বাধীনতা মানব মনকে জাগরিত করিতেছে, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান উন্নতির ইতিহাস-লেখককে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই যে সুলক্ষণ সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার মূল কারণ কি? ইংরেজের জ্ঞান বিজ্ঞান পাঠে ও তাঁহাদের সংস্রবে দেশীয় শিক্ষিত লোকের এ বিষয়ে অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু ঐ একটী ঘটনা মাত্রই ইহার মূল কারণ নয়। ইতি পূর্ব্বে যে মহাত্মাদিগের কার্য্য কলাপের অতি সামান্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল, তাঁহাদের মহতী চেষ্টার ফলেই যে বঙ্গ সমাজে এই সকল উন্নতির সুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গের সুলেখক এবং সুসন্তান বঙ্কিমচন্দ্রও বর্ত্তমান জীবনে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার "বঙ্গদর্শন" মাতৃভাষার প্রতি দেশবাসীর প্রাণে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার করিয়াছে, ইহার "আনন্দ মঠ" ও "সীতারাম" দেশের লোককে অনেক সুশিক্ষা প্রদান করিতেছে, ইহার "ধর্ম্মতত্ত্ব" ধর্ম্মের দিকে দেশবাসীর চিত্তাকর্ষণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গীত এবং কবিতার রাজ্যে রবীন্দ্র নাথ এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রচুর সুরুচি ও সদ্ভাব আনয়ন করিয়াছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ধনে মানে যেমন দেশবিখ্যাত, মাতৃভাষার উন্নতি সাধনেও বঙ্গবাসীর নিকট বাঙ্গালার ইতিহাসে তেমনই চিরস্মরণীয়তা লাভ করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্বলন্ত গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ গ্রন্থ এবং স্বনাম-খ্যাত দ্বিজেন্দ্রনাথের "তত্ত্ববিদ্যা" প্রভৃতি বঙ্গভাষার অমূল্য অলঙ্কার। ঠাকুর-সাহিত্য-ভাণ্ডার সুরুচি, সদ্ভাব, চিন্তা ও কবিত্বের সমাবেশ ক্ষেত্র। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, কয়েক বৎসর হইতে যেন দেশের ভাল দিকে গতি কিছু মন্দীভূত হইয়াছে। সমাজের সুসংস্কার এবং ভাল কাজে এত বিদ্রূপ ও শিথিলতার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে যে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। দিন দিনই যেন সমাজের সর্ব্বাঙ্গে এই রোগ ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে কিছু দিন পূর্ব্বে দেশের লোক অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। এ শ্রদ্ধার মূলে যে ভ্রম ছিল, তাহা নহে। বস্তুতই তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র অনেক পরিমাণে নির্ম্মল স্বভাব ছিলেন। মিথ্যা, ব্যভিচার ও অন্যায়াচারের উপরে সত্য সত্যই তাঁহাদের বিদ্বেষ ছিল। দেশের যে কোন সৎকাজে ও সুসংস্কারে তখন ইঁহারাই প্রধান অস্ত্র স্বরূপ হইতেন। আর যেন সে দিন নাই।

সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকাগুলির এমন দুর্গতি হইয়াছে যে, তাহারা যেন সময়ের স্রোতের সহিত চলিতে না পারিয়া পশ্চাৎপাদ হইবার উপক্রম করিয়াছে। আবার "সঞ্জিবনী", "বঙ্গবাসী" ও "সময়" প্রভৃতিতে সেই ঈশ্বর গুপ্ত এবং গুড়্ গুড়ে ভট্টাচার্য্যের মেয়েলি কোঁদল উপস্থিত। "সোমপ্রকাশ", "সাধারণী", "নববিভাকর" প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় ভাষার সাপ্তাহিক পত্রগুলি ক্রমে ক্রমে হীনতেজ ও অন্তর্হিত হইতেছে। বঙ্গদর্শনের সময়ানুপাতে উন্নত সাময়িক পত্রিকারও প্রায়

অভাব। কয়েক বৎসর হইতে সময়োপযোগী উচ্চ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট সাহিত্যও অল্পই বাহির হইতেছে। বরং তৎপরিবর্ত্তে চিনিবাসচরিত, পাঁচুঠাকুর, মডেলভগ্নী, বেশ্যাচরিত, কলিকাতারহস্য প্রভৃতির ন্যায় অতি জঘন্য রুচির চিন্তাবিহীন, নিম্নশ্রেণীর পুস্তকেরই আদর বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিছু দিন হইল, বঙ্গের একজন প্রধান লেখকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, দাম না উঠিলে বই লিখিয়া লাভ কি? বস্তুত কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বহু পরিশ্রম করিয়া যে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, সমাজে অদ্যাবধি তাহার কিছুমাত্র যথোপযুক্ত আদর হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য দ্বারাই সহজে সমাজের গতি নির্ণীত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি বড় মন্দ দিকে গড়াইয়াছে। উপহারের জোরে অরুচি, কুরুচি সকলই বিকাইয়া যাইতেছে। কুলোক এবং কুলেখকেরই পসার বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভাল লোক এবং ভাল লেখকেরা উপহাররূপ ঘুষ দিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের লেখারও আদর বাড়িতেছে না। এই জন্য খ্যাতনামা লেখকদের মধ্যে অনেকেই কাগজ কলম তুলিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু সাহিত্যের এইরূপ দুর্গতিতে দেশের সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর নীতিজ্ঞান এবং রুচির অপকৃষ্টতা প্রমাণিত হইতেছে। সমাজের এ অবস্থা যে অধোগতির, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অধোগতির মূল কারণ কি এবং কি উপায়ে ইহা দূরীভূত হইতে পারে, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

অনেকে বলেন, বঙ্গবাসী প্রভৃতির ন্যায় পত্রিকার প্রভাব বৃদ্ধিই এইরূপ ঘটিবার একটী প্রধান কারণ। এই কথার মূলে প্রচুর সত্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী কথা ভাবিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও হয়। ঐ সকল পত্রিকা যাঁহাদের কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, তাঁহারা কোনরূপেই দেশের গণ্য, মান্য বা বিখ্যাত লোক নহেন। ঐ দলের অধিকাংশ লোকই অর্দ্ধশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত এবং নগণ্য। ইঁহাদেরই কথায় যে সমাজের গতি ফিরিয়া দাঁড়ায়, সে সমাজ কতদূর উন্নত, তাহা এক কথাতেই বুঝা যাইতে পারে। তবে যদি বল, উপহারের জোরে তাঁহাদের কথা তাঁহারা লোকের কাণে তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং লোক তাহা শুনিয়া অধঃপতিত হইয়াছে। প্রথম কথা, ঘুষের লোভে যে জনসমাজ সদসদ্বিবেচনাহীন হইতে পারে, তাঁহারা নিজেরাই দুর্ব্বল। দ্বিতীয় কথা, উপহারের পূর্ব্বেই বঙ্গবাসী দেশে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আমাদের মনপ্রাণের অপকৃষ্টতা আরো প্রমাণিত হইতেছে। আমরা দুর্ব্বল, আমাদের রুচি ও আশয় বিষয় অতি অপকৃষ্ট, তজ্জন্যই মন্দ সাহিত্য প্রচারিত ও আদৃত হয়। সুতরাং বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকাই আমাদের অধোগতির প্রধান কারণ নয়, বরং তাহা আমাদের অধোগতির লক্ষণ-প্রকাশক।

অনেকে বলেন, উপর্য্যুপরি দেশের অনেক বড় লোকের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বড়ই ক্ষতি হইয়াছে। কৃষ্ণদাসাদির ন্যায় বড়লোকদিগকে হারাইয়া বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার কিছুমাত্র ক্ষতি হইয়াছে, বলা যায় না। বাবু কৃষ্ণকৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মত লোকের মৃত্যুতে বঙ্গভাষা সত্য সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুতে বঙ্গ সমাজ ও সাহিত্য দুইই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যে মহাত্মার মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবীর ক্ষতি হইয়াছে, সেই গৌরবান্বিত কেশবচন্দ্রকে হারাইয়া বঙ্গমাতা যে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে আর ভুল কি? পরন্তু রাজনীতি-বিশারদ কৃষ্ণদাসাদির মত লোকের হানিতেও যে আমাদের সমাজের বাহু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েকটী লোকের হাতের উপরে যে সমাজ দাঁড়াইয়া থাকে তাঁহার নিজের হাঁটুতে বল নাই, ইহাই প্রমাণিত হয়। লোকের ত মরণ আছেই, সুতরাং বড়লোকের আশ্রিত সমাজেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। এই পতনেও সমাজের বা দেশের দুর্ব্বলতা প্রমাণিত হয়।

বস্তুত, আমরা শিশুর মত পরের হাত ধরিয়া "হাঁটি হাঁটি পা পা" করিয়া, এক পা, দুই পা উন্নতির পথে চলিতেছি মাত্র। আমাদের আভ্যন্তরীণ এবং স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা প্রচুর। যে যাহা বলে, আমরা তাহাই শুনিয়া হুজুগে মাতিয়া গড্ডালিকা-প্রবাহে ছুটিতে, নাচিতে ও খেলিতে থাকি। গম্ভীর চিন্তা শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, হৃদয়ের প্রসারিতা হইতে আমরা অনেক দূরের জীব। এইজন্য আমাদের প্রকৃতি জলের মত। আমাদিগকে যে যেমন ঘটনা রূপ পাত্রে স্থাপিত করে, আমরা তাহারই আকার ধারণ করি, বস্তুত আমাদের জাতীয় একটী নির্দ্দিষ্ট বিশেষ আকার নাই। কুলোকেরা এই মহা সুযোগ পাইয়া দিন দিন নূতন নূতন হুজুগ তুলিয়া অনায়াসে দুই পয়সার সঙ্গে সঙ্গে নাম ও পসার কিনিয়া লইতেছে। ভাল লোকেরা এই ঠগীর ঠকাম হাঁ করিয়া দেখিতেছেন।

আমরা অধঃপাতিতই, আমাদের অধঃপতনের নূতন কোন কারণ নাই। বহুকাল হইতে অধোদিকে আহত হইয়া যে বেগ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আমাদিগকে দিন দিন অধঃ হইতে অধোতে লইয়া যাইতেছে। শূন্য-স্থিত ভাঁটার ন্যায় যে খুষি আমাদের গতি ফিরাইতেছে। আমরা কখনও উন্নতির স্বপ্ন দেখিতেছি, কখনও অধঃপতন কল্পনা করিয়া কাঁদিতেছি। এই অধঃপতিত জাতির উদ্ধার অবশ্যই ভগবানের হাতে, তাহাতে ভুল নাই। কিন্তু ভগবানের ক্রিয়া মানবের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হয়। সেই শক্তি কখন্ কোন্ মানবে অবতীর্ণ হইবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং মানবের কর্ত্তব্যেরও শেষ নাই।

মাতৃভাষার উন্নতি সাধন এবং মাতৃ-ভাষায় ভাল ভাল সদুপদেশ ও উদ্দীপনা পূর্ণ গ্রন্থ প্রচার দ্বারা যে জাতীয় চরিত্র উন্নত হয়, ইহাতে আমরা বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করি না। অক্ষয় কুমার দত্ত-প্রমুখ দেশীয় গ্রন্থকার বঙ্গসমাজের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না বা অস্বীকার করিব না। সমাজগঠন ও সমাজের উন্নতি সাধনে সাহিত্যের অতুলনীয় শক্তি এ দেশে এবং অপর দেশে যুগে যুগে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্যই এই প্রবন্ধের প্রথমে নানা সময়ের সাহিত্যের কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করিয়াছি। বঙ্গসমাজের উন্নতিও যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উপরে নির্ভর করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজ কাল মাতৃভাষার সেবাব্রতে অনেকেই সময় ব্যয় করিতেছেন। এ অতি শুভ লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল প্রতিভা-সম্পন্ন সৎলোক বাঙ্গালা সাহিত্যের আপাত উপস্থিত দুর্দ্দিন দেখিয়া লেখনী সংযত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বদ্ধপরিকর হইয়া রঙ্গক্ষেত্রে নামিতে আমরা সানুনয়ে আহ্বান করিতেছি। অনেক সুপণ্ডিত বাঙ্গালী বিদেশীয় ভাষার চর্চ্চায় যে পাণ্ডিত্য ও যে চিন্তা ক্ষয় করিতেছেন, তাহা কি মাতৃভাষার উন্নতি কল্পে ব্যয় করিলে ফল কম হইবে? মাতৃভাষার উন্নতির গর্ভেই জাতীয় মহাসমিতির শক্তি এবং সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি নিহিত। দেশ কি সত্য সত্যই প্রতিভা-সম্পন্ন সাধু সজ্জন শূন্য হইয়াছে? বঙ্গবাসী ভদ্র সন্তান মণ্ডলীর ও পাঠকবৃন্দের কি রুচি ও মানসিক অবস্থা সত্য সত্যই হীন হইয়াছে? এ দেশে কি চিরদিনই কুরুচি, মিথ্যা ও অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইবে? বাঙ্গালা-সাহিত্য কি চিরতরে কতকগুলি দায়িত্বহীন গ্রন্থকারের অর্থ ও প্রশংসা লাভের যন্ত্র মাত্রই থাকিবে?

আমরা বলি, যতদিন দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুলোকের হাতে সাহিত্যের সমগ্র ভার না পড়িবে, ততদিন সমাজের কল্যাণ হইবে না। যেন তেন উপায়ে কিছু অর্থ বা পসার লাভের জন্য যাঁহারা গ্রন্থ লিখেন, তাঁহাদের মত সমাজশত্রু অল্পই আছে। সাহিত্য এক মহাযোগসাধনা, ইহার রচয়িতা নিন্দা, প্রশংসা এবং অর্থ-লালসার অতীত মহাযোগী হইবেন। অনেকে বই লেখাকে একটা ব্যবসায় মাত্র মনে করেন, অনেকে হাতের লেখা ছাপায় তুলিয়াই কৃতার্থ হন। কিন্তু হাতের লেখা ছাপায় তুলিয়া শত সহস্র লোকের নিকট পাঠান যে কত দায়িত্বের কাজ, তাহা একবারও ভাবেন না। একটী কথা লিখিবার পূর্ব্বে তাহা মানব মনের উপরে কিরূপ কাজ করিবে, শতবার ভাবা উচিত। সাহিত্যই সমাজের সঞ্জীবনী মন্ত্র, সাহিত্য সত্য সত্যই মৃতপ্রাণে জীবনীশক্তি সঞ্চারে সমর্থ। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ স্থলেই আমাদের সাহিত্য কুলোকের কুবাসনা সাধনের যন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। যে সাহিত্য-সমাজ-দেহের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত রঙ্গালয়ের নাট্যামোদ এবং প্রতি সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব আনন্দের ভিতর দিয়া সমাজের অস্থি মজ্জা ও প্রতি রক্তবিন্দু গঠন করে, তাহার দুরবস্থাতে দেশের কি ক্ষতি হইতেছে, একবার সকলে ভাবিয়া দেখুন।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪০)

অতঃপর গৌরচন্দ্র যে সব তীর্থ দর্শন করিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা তাহার আনুক্রমিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই, সংক্ষিপ্ত রূপে ইতস্ততঃ উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তৎকালে কর্ম্মী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ, রামানুজ সম্প্রদায়, শ্রীবৈষ্ণব মধ্বা-

চার্য্য মঠের তত্ত্ববাদী প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ছিল; তাহাদের সকলকেই শ্রীচৈতন্য তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীন করিলেন। বিদ্যানগরের পর শ্রীচৈতন্য গোতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে মহেশ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। গোদাবরীর নামান্তর গৌতমী। বোধ হয়, গোদাবরীর শাখান্তর বৈনগঙ্গাই এখানে গৌতমী গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহার পর তিনি আহোবালেম্ নগরে যাইয়া রামানুজ প্রতিষ্ঠিত মঠ ও নৃসিংহ বিগ্রহ দর্শন করিয়া সিদ্ধবট নামক স্থানে রামসীতা দেখিলেন। সিদ্ধবটে একটী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অতিথি সৎকার করিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ নিরন্তর রাম নাম জপ করিত। এখান হইতে গৌরচন্দ্র স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দ দর্শন করিয়া ত্রিমঠে যাইয়া বামনমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ত্রিমঠ হইতে তিনি পুনর্ব্বার সিদ্ধবটে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত রামজপী ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কিন্তু এবারে এক আশ্চর্য্য দেখিলেন যে, ঐ বিপ্র তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত রাম নাম ছাড়িয়া এখন নিরন্তর কৃষ্ণ নাম জপিতেছে। আহারান্তে চৈতন্যদেব তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিল "তোমার প্রথম দর্শন প্রভাবে আমার চিরদিনের অভ্যাস ঘুচিয়া এই নূতন অভ্যাস হইয়াছে। তোমাকে কৃষ্ণনাম করিতে দেখিয়া আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক একবার 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়াছিলাম। সেই হইতে রাম নামের পরিবর্ত্তে আমার জিহ্বা হইতে কেবল কৃষ্ণ নামই স্ফূরিত হইতেছে ও আমার চিরকালের স্বভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পরব্রহ্ম বাচক রামনামের ও কৃষ্ণনামের মহিমা ব্যাখ্যা করিয়া কৃষ্ণনামের গৌরবাধিক্য বর্ণন করিল এবং বিনীতভাবে নিবেদন করিল যে 'আপনাকে কৃষ্ণ স্বরূপ মনে হইতেছে।' তখন শ্রীচৈতন্য তাহাকে কৃপা করিয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে বৃদ্ধ কাশীতে আসিয়া শিব দর্শন করিলেন। এবং তথা হইতে নিকটবর্ত্তী কোন এক সম্ভ্রান্ত গ্রামে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই গ্রামে তৎকালে ব্রাহ্মণ সজ্জন বহুবিধ লোকের বাস ছিল। তার্কিক, মীমাংসক, দার্শনিক, মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক প্রভৃতি নানা পণ্ডিতগণ এখানে বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন। ইহা ভিন্ন এখানে বৌদ্ধদিগেরও এক আশ্রম ছিল। কথিত আছে, এই সকল পণ্ডিতদিগের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিয়াছিল, এবং তিনি স্বীয় অসাধারণ শক্তি প্রভাবে সকলকে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গৌরের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোক বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। ইহা শুনিয়া বৌদ্ধাচার্য্য বিচার-জিগীষু হইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে গৌরের নিকট আসিয়া নব প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার নয় প্রশ্নের বিচার্য্য বিষয় এই :—

১। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নহেন, তিনি অনন্ত জ্ঞানবস্তু মাত্র। ২। জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহা অবিদ্যা সমুৎপন্ন। ৩। অহং তত্ত্ব কি? ৪। পরলোকের অস্তিত্ব সম্ভবে কি না? ৫। বুদ্ধ দৃষ্টি লাভের উপায় কি? ৬। নির্ব্বাণ-তত্ত্ব কি? ৭। বৌদ্ধ দর্শন। ৮। বেদাদি অপৌরুষেয় কি রূপে? ৯। সগুণ ও নির্গুণবাদের প্রকৃতি কি? লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য স্বীয় অসাধারণ

তর্কশক্তি প্রভাবে এই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বৌদ্ধ মতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া উপস্থিত শ্রোতমণ্ডলী অবাক হইয়া গেলেন এবং বৌদ্ধাচার্য্য লজ্জায় অধোবদন হইলেন। গৌরের বিষ্ণুভক্তির কথা শুনিয়া কতকগুলি দুষ্ট বৌদ্ধ তর্কে হারিয়া গিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে নিযুক্ত করিয়া এক থালিতে কতক অপবিত্র অন্ন পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিতে আনিতেছিল, কিন্তু রামকৃষ্ণ, হরিনাম উচ্চারণ করিতে বলিলে তাহারা ঐরূপ করিল। তখন বৌদ্ধাচার্য্য চৈতন্য লাভ করিয়া গৌরকে বিনয় মিনতি করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী দেখিয়া বিস্মিত হইল। এই প্রস্তাবের মূলে কত টুকু সত্য আছে, জানি না। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এখানে উল্লিখিত হইল।

মহাপ্রভু উপরোক্ত স্থান হইতে ত্রিপদী ত্রিমল্লে যাইয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণু বিগ্রহ দর্শন করতঃ ব্যঙ্কটগিরি হইয়া ত্রিপদী নগরে রাম সীতা দেখিতে পাইলেন। মান্দ্রাজের উত্তর পশ্চিমে ত্রিপতির পর্ব্বত। ইহারই শৃঙ্গ বিশেষের নাম ব্যঙ্কটাদ্রি। ব্যঙ্কটগিরি মান্দ্রাজের ৩৬ ক্রোস উত্তরে অবস্থিত। শকাব্দার একাদশ শতাব্দীতে এখানে রামানুজাচার্য্য শিবমন্দির অধিকার করিয়া বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপিত করেন। ত্রিপদী নগর ত্রিপতির পাহাড়ে অবস্থিত। এখানেও রামানুজ প্রতিষ্ঠিত রামমূর্ত্তি রহিয়াছে। তাহার পর গৌরচন্দ্র পানা নরসিংহ দর্শন করিয়া শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে আসিয়া শিব পার্ব্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণ দেখিতে পাইলেন। মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বর্ত্তমান চেঙ্গল পট্টু জেলায় পেলার নদী তীরে কঞ্জীভরম্ বা কাঞ্চীপুরম্ নগর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাকেই বৈষ্ণব গ্রন্থে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণু কাঞ্চী নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম বর্ত্তমান চিঙ্গল পট্টু ও আর্কট জেলার স্থানে স্থানে এই সকল তীর্থ দর্শন করিলেন, যথাঃ—ত্রিমল্ল, ত্রিকালহস্তী, পক্ষতীর্থ, বৃদ্ধকাল পীতাম্বর ও শিয়ালী ভৈরবী।

গুলি দুষ্ট বৌদ্ধ তর্কে হারিয়া গিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে যুক্তি করিয়া এক থালিতে কতক অপবিত্র অন্ন পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিতে আনিতেছিল, কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা! হঠাৎ এক বৃহদাকার পক্ষী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া সেই থালি ঊর্দ্ধে লইতে গেলে বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় পড়িল। থালিখানি তেরছে পড়াতে আচার্য্যের মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল; আচার্য্য ধরায় পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। বৌদ্ধগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের কোপে ঐরূপ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া মিনতি করিয়া তাঁহাদের গুরুকে বাঁচাইতে বলিতে লাগিল। গৌর তাহাদিগকে আচার্য্যের কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে

তাঞ্জোরের উত্তর পূর্ব্বে শিয়ালী নগর দৃষ্ট হয়, এখানে ভৈরবীর মূর্ত্তি আছে। অনন্তর শচীনন্দন কাবেরী নদীর তীরে মহাবন, দেবস্থান প্রভৃতি স্থানে মহাদেব দর্শন করিয়া শৈবদিগকে বৈষ্ণব করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কুম্ভকর্ণ তীর্থ, পাপনাশন তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া

প্রেমে বিহ্বল হইলেন। মাছরার পূর্ব্বদিকে শ্রীগৌরঙ্গ দ্বীপ কাবেরী নদীর ছুইটী শাখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। কথিত আছে যে, রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক রঙ্গনাথ বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শ্রীবাসদ্বীপ রামানুজ বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থস্থান, রঙ্গনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন ও নৃত্যকরিয়া প্রেমে বিহ্বল হইলেন দেখিয়া বেঙ্কট ভট্টনামে সেই স্থান-বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ গৌরের প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইলেন এবং কীর্ত্তনাবসানে যত্নের সহিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন। বেঙ্কট ভট্ট শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক। তাঁহারা তিন সহোদর—ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কট ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী। বেঙ্কটের পুত্র গোপাল ভট্ট তৎকালে বালক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেম চেষ্টা দেখিয়া বেঙ্কট এতই মুগ্ধ হইলেন যে, ভোজনান্তে তাঁহাকে বলিলেন যে, সম্প্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত। এই চাতুর্ম্মাস্যে তীর্থ পর্য্যটন অসম্ভব। অতএব আমি নিবেদন করি যে, এই চারিমাস আপনি এখানে থাকিয়া সুখে সময়াতিপাত করুন্। শ্রীচৈতন্য তাঁহার হইলে বেঙ্কট ভট্ট নিজগৃহে তাঁহার বাস-স্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া অতিভক্তির সহিত গৌরের সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ভট্টগৃহে চারিমাস কাল সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে কাবেরীতে স্নান করিয়া রঙ্গনাথ দর্শন করা, দুই সন্ধ্যার সেখানে হরিনাম সংকীর্ত্তন ও নৃত্যাদি বিলাস করা, ভট্টের সহিত ভগবদ্বিষয়ক কথোপকথন ও হাস্য পরিহাস করা, তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পরিণত হইল। বেঙ্কট ভট্টের স্বগোষ্টি-বর্গ গৌরের অলৌকিক চরিত যতই দেখিতে লাগিল, ততই তাহাদের তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি হইতে লাগিল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণসজ্জন ও অপরাপর লোক তাঁহার মধুর ভাবে মুগ্ধ হইয়া কতই আত্মীয়তা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সকলেই কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়া গেল। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ শ্রীচৈতন্যকে স্বগৃহে আহারের নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে নিমন্ত্রণ সংখ্যা এতই অধিক হইয়া পড়িল যে, চারি মাসকাল এক এক দিন করিয়া খাইয়াও গৌরচন্দ্র সকল নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বালক গোপাল ভট্ট সর্ব্বদা গৌরের সঙ্গে কালযাপন করেন ও তাঁহার ইচ্ছা প্রতিপালনে তৎপর থাকেন। থাকিতে থাকিতে গৌরের অপরূপ রূপমাধুরী, অলৌকিক প্রেমভক্তি এবং সুমধুর ব্যবহার তাঁহার শৈশব অন্তঃকরণে চিরমুদ্রিত হইয়া গেল; আর অপনীত হইল না। ইহার পর ইনি পিতা মাতার স্বর্গারোহণে গৃহ পরিজন ছাড়িয়া সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে গোপালভট্ট ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামীরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

রঙ্গনাথের মন্দিরে এক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন প্রাতে গীতা পাঠ করিত। ব্রাহ্মণ মূর্খ, ব্যাকরণজ্ঞানে বঞ্চিত; যাহা উচ্চারণ করিত, সকলই অশুদ্ধ ও বিকৃত। তাহা শুনিয়া কতলোক তাহাকে পরিহাস করিত, কেহ

গালি দিত ও নিন্দা করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ সে সব গ্রাহ্য না করিয়া আবিষ্টচিত্তে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা যতক্ষণ সমাপ্ত না হইত, ততক্ষণ ছাড়িত না। আরও আশ্চর্য্য এই যে, সেই মূর্খ ব্রাহ্মণ যাহা পড়িত, তাহার এক বর্ণও সে যে বুঝিতে পারিত, তাহার পাঠ শুনিয়া ইহা কেহই মনে করিতে পারিত না। অথচ অধ্যয়নকালে তাহার নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভিজিয়া যাইত, পুলকে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইত, কম্প, হুঙ্কার, স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক লক্ষণ সকল দেখা যাইত। শ্রীচৈতন্য দেবালয়ে যাইয়া প্রতিদিন এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। এক দিন তাহার পাঠ সমাপ্ত হইলে গৌর তাহাকে নিভৃত স্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার গীতা পাঠে এত সুখ হয়, ইহার কারণ? আপনি ইহার কি অর্থ আস্বাদন করিয়া থাকেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিল 'আমি মূর্খ, শব্দার্থজ্ঞান আমার কিছুই নাই; অশুদ্ধ শুদ্ধ কিছুই জানি না। কিন্তু যতক্ষণ পড়িতে থাকি, ততক্ষণ দেখি যেন অর্জ্জুনের রথে শ্যামল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ অশ্ববল্গ ধারণ করিয়া মৃদু মধুর বাক্যে অর্জ্জুনকে হিতোপদেশ দিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার আনন্দাবেগ হয়। এই জন্য লোকের উপহাস সহিয়াও আমি গীতা পাঠ ছাড়িতে পারি না।"

শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের এই সরল ও অকৃত্রিম বিশ্বাস দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন "গীতা পাঠ আপনারই সার্থক, ইহাতে আপনিই শ্রেষ্ঠ অধিকারী" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমালিঙ্গন পাইয়া ব্রাহ্মণের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, তাহার মন নির্ম্মল হইল এবং সে গৌরের মহিমা বুঝিতে পারিয়া চারি মাস কাল ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কৃতার্থ হইয়া গেল।

বেঙ্কট ভট্টের সঙ্গে গৌরের সখ্যভাব দিন দিন গাঢ়তর হইতে লাগিল। বেঙ্কট এক জন সোজা লোক; লক্ষ্মীনারায়ণে অগাধ বিশ্বাসী। গৌরচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সময়ে সময়ে কত পরিহাসই করিলেন। এক দিন তিনি হাসিতে হাসিতে ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি হইয়াও গোয়ালার ছেলে কৃষ্ণকে কেন ভজিতে চাহিয়াছিলেন? আর ইহাতে তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মই বা কিরূপে রক্ষা হইল?" ভট্ট গম্ভীরভাবে উত্তর করিল "কৃষ্ণ ও নারায়ণ, একই তত্ত্ব। কেবল কৃষ্ণেতে লীলাধিকা এই মাত্র। ইহাতে লক্ষ্মী নারায়ণের ভার্য্যা হইয়াও কৃষ্ণ ভজন করিতে চাহায় তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের হানি হইতে পারে না। আমার মোটা বুদ্ধিতে তো এই বুঝি, ইহাতে পরিহাস করিতেছ কেন?"

শ্রীচৈতন্য ততোধিক পরিহাসব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন "আচ্ছা তা যেন হ'লো; কিন্তু শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, লক্ষ্মী কৃষ্ণ সঙ্গে রাসকেলি করিতে অধিকার পান নাই। অথচ শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়া ব্রজদেবীর দেহ লাভ করিয়া রাসে অধিকারিণী হইয়াছিলেন; ইহার কারণ কি?"

ভট্ট এবারে কিছু মুস্কিলে পড়িয়া দিশা না পাইয়া উত্তর করিলেন "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; ভগবানের অগাধ লীলার কি বুঝি? তুমি যদি বুঝাইয়া দাও, তবে কৃতার্থ হই।"

গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ মাধুর্য্য পূর্ণ ও সর্ব্ব চিত্তা-

কর্ষক। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এমন কেহ নাই যে, তাঁহাকে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে। অথচ মাধুর্য্য গুণে ব্রজবাসী জন কখন পুত্র জ্ঞানে তাঁহাকে উদুখলে বাঁধে, কখন সখা জ্ঞানে খেলায় হারাইয়া তাঁহার কাঁধে চড়ে, আবার কখন সামান্য নাচক জ্ঞানে তাঁহাতে আসক্ত হয়; অথচ কেহই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। ব্রজজন ভিন্ন এ লীলায় অন্যের অধিকার নাই। সেই জন্য শ্রুতিগণকেও ব্রজদেবীর শরীর লইয়া এই লীলা সুখের অধিকার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা না করিয়া দেবীদেহে রাসবিলাস অভিলাষ করিয়াছিলেন; তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। কৃষ্ণ আমার গোয়ালা, গোপীগণ তাঁহাব প্রিয়সী। দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন না। এখন বুঝলে তো, তোমার লক্ষ্মী কেন রাস পান নাই।"

বেঙ্কট ভট্টের মনে এত দিনে এই অভিমান হইল যে, নাবায়ণই স্বয়ং ভগবান এবং তাঁহার ভজনই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে গৌরের মুখে নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবাধিক্য শুনিয়া তিনি ম্লান মুখে নীরব হইয়া থাকিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিয়া পরিহাসটীকে আরও গভীর করিবার জন্য বলিলেন "ভট্টজি! সন্দেহ করিও না। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান; নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যরূপ বিলসিত বিগ্রহ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের এই অসাধারণত্ব হেতু নারায়ণের শক্তি লক্ষ্মীর কৃষ্ণের প্রতি এত তৃষ্ণা। অথচ নারায়ণ গোপীদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে একটুও সমর্থ নহেন। কোন সময়ে গোপীদিগকে কৌতুক করিতে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ ধরিয়াছিলেন; কিন্তু গোপীরা তাহা দেখিয়া মুখ ফিরাইয়াছিলেন।

এই সব কথা শুনিয়া বেঙ্কট ভট্টের মুখ শুকাইয়া গেল এবং কৃষ্ণ অপেক্ষা স্বীয় অভিষ্ট নারায়ণের অপকর্ষতা শুনিয়া তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। পরম কারুণিক শ্রীচৈতন্য তাঁহার দুঃখ নিবারণ জন্য পরিহাস রাখিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বন্ধো! দুঃখ করিও না। আমি তোমাকে পরিহাস করিয়াছি। নারায়ণে তোমার অবিচলিত বিশ্বাস দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বাস্তবিক কথা এই যে, ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ বুদ্ধি করা মহা অপরাধের কথা। যেমন একই মণি আঁধারাদি ভেদে নীল, লোহিত, পীত, নানা বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া পৃথকরূপে শোভা ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি উপাসনাভেদে একই ভগবান নানা ভক্তের চিত্তে বিশ্বাসানুরূপ নানা রূপে প্রতিভাত হইয়া দেখা দেন। ইহাতে লক্ষ্মী ও গোপী, কৃষ্ণ ও নারায়ণে ভেদ করিবার কোন কারণই নাই। পরিহাস করিয়া তোমার প্রাণে যে ক্লেশ দিলাম, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।"

এই কথা শুনিয়া বেঙ্কট ভট্ট হর্ষোৎফুল্ল নয়নে গৌরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ হইয়াও তাঁহার অসাধারণ ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "আমি অতি পামর জীব; ধন্য আমি যে লক্ষ্মী নারায়ণের কৃপায় তোমাব এখানে শুভাগমন হইয়াছে। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর; তাই কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও ভক্তিতত্ত্ব শুনাইয়া কৃতার্থ করিলে।" ভট্ট এই বলিয়া গৌরের চরণে পড়িলেন ও গৌরও তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে সুখী করিলেন।

এইরূপে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। বেঙ্কট ভট্ট সগোষ্ঠিবর্গে কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। তখন শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং নীলাদ্রির শৃঙ্গ বিশেষ ঋষভ পর্ব্বতে আসিয়া নারায়ণ দর্শন করিলেন। এখানে আসিয়া গৌরচন্দ্র শুনিলেন যে, মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য ও তাঁহার গুরু ঈশ্বর পুরীর অধ্যাত্ম ভ্রাতা পরমানন্দ পুরী তথায় চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিতেছেন। গৌর অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং একত্র কৃষ্ণ কথা রঙ্গে তিন দিন পর্য্যন্ত যাপন করিলেন। পরমানন্দ পুরী বলিলেন "আমি সম্প্রতি পুরুষোত্তম দেখিয়া বঙ্গদেশে গঙ্গা স্নানে যাইব।" গৌর বলিলেন "আপনার নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে আমার ইচ্ছা; আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়া বঙ্গদেশ হইতে যদি পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবে ভাল হয়; তাহা হইলে আমিও তত দিন সেতুবন্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার সহিত মিলিত হইতে পারিব।" ইহার পর পুরী মহাশয় পুরুষোত্তমে চলিয়া গেলেন এবং গৌরচন্দ্র শ্রীশৈলে আসিয়া শিবদুর্গা দর্শন করিয়া কামকোষ্ঠি বা বর্ত্তমান কম্বুকোলম নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই নগর তাঞ্জোরের উত্তর পূর্ব্ব একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। ইহা প্রাচীন কোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। কামকোষ্ঠি হইতে গৌরচন্দ্র দক্ষিণমথুরা বা মাদুরা নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই নদী ভিগে নদীর তীরে, কিন্তু বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন যে, মাদুরা নগরে গৌরচন্দ্র কৃতমালা নামক নদীতে স্নানাবগাহন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ভীগের নামই কৃতমালা হইবে। সে যাহা হউক, এই নগরে একটী রামভক্ত ব্রাহ্মণ গৌরকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব ভবনে লইয়া গিয়া বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাকাদির কোনই আয়োজন করিল না। তাহা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, পাক হইল না কেন? ব্রাহ্মণ রামভাবে বিভোর ছিল, উত্তর করিল, কি করিব মহাশয়! আমার অরণ্যে বাস, বনের মধ্যে তো পাক সামগ্রী কিছু পাওয়া যায়না। লক্ষ্মণ বন্যশাক, ফল মূল আনিতে গিয়াছেন। তাহা আসিলে সীতা ঠাকুরাণী রন্ধন করিবেন। গৌরচন্দ্র তাহার উপাসনার ভাব দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ আস্তে ব্যস্তে পাক করিয়া অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে উপবাসী থাকিল। গৌর সুধাইলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল যে, জগদাত্মা জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবীকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছেন, একি প্রাণে সয়? আমার জীবনে কাজ নাই, জলে প্রবেশিয়া মরিব?" চৈতন্যদেব তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "আপনার বুঝিবার ভুল হয়েছে; সীতার মূর্ত্তি প্রকৃত নয়। উহা চিদানন্দময়ী। তাহা স্পর্শ করিবার শক্তি দূরে থাকুক, প্রকৃত চক্ষু দর্শন করিতে সমর্থ নহে। রাবণের সাধ্য কি সীতাকে হরণ করিতে? সে সীতাকে স্পর্শ করিতে গেলে সীতা অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন। মায়াময়ী সীতাকৃতি রাবণ ছুইয়াছিলেন মাত্র। আমার এই ব্যাখ্যা ঠিক, আপনি বিশ্বাস করিয়া দুঃখ দূর করুন।"

ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলে গৌরচন্দ্র দুর্ব্বেসন নগরীতে রঘুনাথ, মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দেখিয়া সেতুবন্ধে যাইয়া ধনুতীর্থে স্নান করিলেন। কৃতমালার সাগর সঙ্গমস্থানে সেতু-বন্ধ অবস্থিত। সেখানে নৌকায় উঠিয়া ধনু প্রণালী পার হইয়া রামেশ্বর দ্বীপে যাইতে হয়। গৌরচন্দ্র রামেশ্বর শিব দর্শন করিয়া বিশ্রামান্তে বিপ্রসভায় কূর্ম্ম পুরাণ শুনিতে গেলেন। সেখানে পতিব্রতা উপাখ্যান মধ্যে রাবণ কর্ত্তৃক মায়া সীতাহরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া নিজের ব্যাখ্যার শ্লোক প্রমাণ পাইয়া তাঁহার পরিচিত রামভক্ত ব্রাহ্মণদিগের সই পুথি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। তদন্তর তিনি পুনরায় দক্ষিণ মথুরায় আসিয়া সেই পুস্তক রামদাসকে দিলে সে অতি আনন্দিত হইল এবং নানা প্রকারে গৌরচন্দ্রের স্তব করিয়া সেদিন অতিথি সংকার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিল। শ্রীচৈতন্য এখন তাম্রপর্ণী নদীর তীরে তীরে পাণ্ড্য রাজ্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান টীনিভেলী জেলা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং দক্ষিণ মথুরা উহার রাজধানী ছিল। এই স্থানে বহুতর হিন্দু কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎপরে গৌরচন্দ্র এই সব স্থানে দেখিলেন;—নয় ত্রিপদী, চিয়ড় তালা, তিলতাঞ্চী, গজেন্দ্র মোক্ষণ, পানাগড়ি, চামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয় পর্ব্বতে অগস্ত্যাশ্রম, কন্যাকুমারী এবং আমলীতলা। তৎপরে গৌরচন্দ্র মালাবর উপকূলে মল্লার বা মালাবর দেশে আগমন করিলেন। এই দেশ এখন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী জেলা, প্রধান নগর কালীকট। এখানে আসিলে গৌরের একটী বিপদ উপস্থিত হইল। তৎকালে এ দেশে ভট্টমারী বা ভর্ত্তৃহরি নামে এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী লোক ছিল। উহারা ভর্ত্তৃহরিকে স্বীয় সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করে এবং স্ত্রী পুত্র, পশ্বাদি পশু এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল। ভট্টমারীগণ তাহাকে সুন্দরী স্ত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া ধন ঐশ্বর্য্য দিবে বলিয়া ভুলাইয়া আপনাদের দল মধ্যে আনিয়া রাখিয়া দিল। শ্রীচৈতন্য জানিতে পারিয়া ভট্টমারীদিগের আড্ডায় গিয়া বলিলেন, "দেখ তোমরাও সন্ন্যাসী, আমিও সন্ন্যাসী। তবে আমার ব্রাহ্মণকে তোমরা আট্‌কাইয়া রাখ, এ কি ভাল হয়?" এই কথা শুনিয়া দস্যু প্রকৃতি ভট্টমারীগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহাকে মারিতে আক্রমণ করিল। কিন্তু কে জানে কি আশ্চর্য্য, তাহাদের অস্ত্র সকল হাত হইতে পড়িয়া পরস্পরের গায়ে আঘাত লাগিল। ইহাতে ভট্টমারীগণ কে কোন্ দিকে পলাইতে লাগিল; তাহাদের স্ত্রী পুত্র কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল, একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এই সুযোগে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণদাসকে দেখিতে পাইয়া তাহার চুলে ধরিয়া বলে টানিয়া লইয়া দৌড়িতে লাগিলেন এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়া সেই দিনেই পয়স্বিনী বা পাপনাশিনী নদীর তীরস্থ কোন ভদ্র গ্রামে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে আদি কেশব মন্দিরে শ্রীচৈতন্য নৃত্য কীর্ত্তন করাতে তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া বহু লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এখানে তিনি "ব্রহ্মসংহিতা" নামক ভক্তিপূর্ণ এক আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাইয়া অতি যত্নের সহিত

লেখাইয়া লইলেন। পরবর্ত্তী সময়ে এই গ্রন্থ ও কৃষ্ণ কর্ণামৃত তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার পক্ষে অমোঘাস্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল। ইহাতে গোবিন্দ মহিমা ও কৃষ্ণতত্ত্ব অতি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ" ইত্যাদি শ্লোক ব্রহ্মসংহিতার। দুঃখের বিষয় এই যে, এমন মূল্যবান গ্রন্থের প্রথম পাঁচ অধ্যায় ভিন্ন অবশিষ্টাংশ এখন পাওয়া যায় না। তৎপরে গৌরচন্দ্র মধ্বাচার্য্যের দীক্ষা স্থান অনন্ত পদ্মনাভে আসিয়া অনন্তেশ্বর শিব দেখিলেন এবং তথা হইতে শ্রীজনার্দ্দন দেখিয়া পয়োষ্ণি বা পুর্ত্তি নামক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত দেব স্থানে আসিলেন। তৎপরে তিনি শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গপুরে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শিংহারী মঠে আসিলেন। এই স্থানে কোচিন দেশে তাঙ্গভদ্রা নদী তীরে অবস্থিত এবং এখানে শঙ্করাচার্য্য সরস্বতীর পাদ পীঠের নিকট ভারতী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ তুলব দেশে চতুঃসন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রধান স্থান উদিপী নগরে আসিয়া-উড়ুপ কৃষ্ণ দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। এই স্থান সমুদ্র হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে স্থিত। উড়ুপ কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, কোন বণিকের অর্ণবপোত দ্বারিকা হইতে আসিতে তুলব দেশের উপকূলে সমুদ্র মধ্যে জলমগ্ন হয়। এই পোত মধ্যে গোপীচন্দন মৃত্তিকার মধ্যে বাল গোপাল মূর্ত্তি লুক্কায়িত ছিল। মধ্বাচার্য্যকে স্বপ্নাদেশ হওয়ায় তিনি উহা আনিয়া উদিপী নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। মধ্বাচার্য্যের অনুবর্ত্তীগণকে তত্ত্ববাদী বলা যায়। তত্ত্ববাদীগণ গৌরকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞানে প্রথমে বড় একটা গ্রাহ্য করে নাই; পরে তাঁহার প্রেমভক্তি প্রভাব দেখিয়া সম্মান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে সাধ্য সাধন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তত্ত্বাচার্য্য কহিলেন "শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিয়া পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন।" গৌর তাঁহাদিগকে শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভক্তের পক্ষে কর্ম্ম ও মুক্তি দুইই পরিত্যজ্য। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তিযোগে প্রেম ও সেবা লাভই পরম সাধন। তখন তত্ত্ববাদীগণ বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ইহার পর গৌরচন্দ্র নিম্নলিখিত তীর্থ স্থান দর্শন করিলেন;—ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ বিশালা, পঞ্চাপ্সরা, গোকর্ণ. শিব, দ্বৈপায়নি, সুপারক, কোলাপুরের দেবালয়াদি এবং পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুর।" পাণ্ডারপুর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ভীম নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা বিঠল বা বিথুল ভক্তদিগের প্রধান স্থান। এখানে বিঠল বা বিথুল দেবের মন্দির আছে।" শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ মন্দিরে নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। বিঠল-ভক্তগণ বিঠল দেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাদিগকে এক প্রকার বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। পুণ্ডলিক নামক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সময়ে মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরী ঐ গ্রামে কোন ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য এই শুভ বার্ত্তা পাইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে যাইয়া পুরীকে দর্শন করিলেন এবং প্রেমাবেশে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীরঙ্গ পুরী গৌরের প্রেম পুলক অশ্রু কম্প দেখিয়া প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, "শ্রীপাদ! উঠ; তোমাকে দেখিয়া মনে

হইতেছে যে, আমার ইষ্টদেবের সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে ; নইলে এরূপ প্রেম লক্ষণ তো অন্যত্র সম্ভবে না।" শ্রীচৈতন্য বিনীত ভাব ঈশ্বরপুরীর সম্বন্ধ জ্ঞাপন করিলে উভয়ে প্রেমানন্দে গলাগলি নৃত্য কীর্ত্তন ও ভাবাবেশে ক্রন্দন করিলেন। এক দিন শ্রীরঙ্গ পুরী তাঁহার জন্মস্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নবদ্বীপের নাম করিলেন। পুরী ইহাতে উত্তর করিলেন "আমি আমার গোঁসাইর সঙ্গে একবার নদীয়ায় গিয়াছিলাম এবং জগন্নাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। জগন্নাথ পত্নী শচীদেবী রন্ধন কার্য্যে অদ্বিতীয়া; তিনি আমাদিগকে অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিলেন, তাহার আস্বাদ এখনও ভুলিতে পারি নাই। আহা তাঁহাদের এক যোগ্য পুত্র অতি অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শঙ্করারণ্য নাম লইয়া দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে এই তীর্থে আসিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।" শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, "পূর্ব্বাশ্রমে শঙ্করারণ্য আমার ভ্রাতা এবং জগন্নাথ আমার পিতা।" কৃষ্ণকথা আলাপনে ও এইরূপ প্রসঙ্গে পাচ সাত দিন কাটিয়া গেলে শ্রীরঙ্গ পুরী দ্বারকা তীর্থ দর্শনে গমন করিলেন। শ্রীচৈতন্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের অনুরোধে আরও চারি দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া পর্য্যটনার্থে বহির্গত হইলেন এবং বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্যে কৃষ্ণা নদীর তীরে তীরে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এক গ্রামে আসিয়া ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর মধ্যে "কৃষ্ণকর্ণামৃত" নামক কৃষ্ণলীলা বিষয়ক মধুর গ্রন্থ অধীত হইতেছে, শুনিতে পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া গেলেন। এবং অনুসন্ধানে গ্রন্থকর্ত্তা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনের কথা শুনিতে পাইয়া আবিষ্ট হইলেন এবং অতি যত্নের সহিত তিনি ঐ গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। সিদ্ধান্ত বিষয়ক ব্রহ্ম সংহিতা এবং লীলা বিষয়ক কৃষ্ণকর্ণামৃত, এই দুই গ্রন্থ পাইয়া চৈতন্য দেব মহা আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তদিগকে উপহার দিবেন বলিয়া অতি যত্নের সহিত রাখিয়া দিলেন। তৎ পরে তিনি কৃষ্ণার তীর হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে নানা রাজ্য ভ্রমণ করিতে করিতে তাপী বা তাপ্তী নদীর তীরে মাহেশ্বতীপুর নামক গ্রামে আসিয়া নদীতে অবগাহন করিলেন। কৃষ্ণা হইতে তাপ্তী বহুদূরে অবস্থিত। মাহেশ্বতীপুরে আসিতে শ্রীচৈতন্যে যে যে স্থান দিয়া আসিয়াছিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ নাই। বোধ হয় তিনি বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্য ভ্রমণ করতঃ বেরার ও নাগপুরের মধ্যদিয়া তাপ্তী তীরে আসিয়া থাকিবেন। ইহার পর নানা দেশ পরিদর্শন করিতে করিতে গৌরচন্দ্র নর্ম্মদা নদীধারে আগমন করিলেন এবং ধনুতীর্থ দর্শন করিয়া নির্ব্বিন্ধ্যা বা বর্ত্তমান কালী সিন্ধু নদীতে স্নানাবগাহন করিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি পৌরানিক ঋষ্যমূখ পর্ব্বত দেখিয়া দণ্ডকারণ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানকার বনমধ্যে অতিবৃদ্ধ, অতিস্থূল ও অতিউচ্চ সপ্ত তাল বৃক্ষ ছিল ; কথিত আছে শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে আলিঙ্গন করায় তাহারা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। এথান হইতে শ্রীচৈতন্য রামায়নোল্লিখিত পম্পাসরোবরে স্নান করিয়া পঞ্চবটীবনে গমন করিলেন এবং তথা হইতে বর্ত্তমান আহম্মাদাবাদ

নগরের উত্তর পশ্চিম নাসিক ত্র্যম্বক বা নাসিক নগরে গমন করিয়া ব্রহ্মগিরি হইয়া গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান কুশাবর্ত্তে গমন করিলেন। এখানে গোদাবরীর সপ্ত শাখা মিলিত হইয়া গোদাবরী নামে প্রবাহিত হইতেছে। সপ্ত গোদাবরী দর্শন করিয়া গোদাবরীর ধারে ধারে নানা দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে চৈতন্য প্রভু পুনরায় বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রীতে আসিয়া রাজা রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুনর্মিলনে উভয়েই মহা আনন্দিত হইলেন এবং গৌরচন্দ্র রামানন্দকে স্বীয় তীর্থ বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত উপঢৌকন দিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, তুমি যে সব সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে আমাকে শুনাইয়াছ, এই দুই গ্রন্থ তাহাই সাক্ষ্য দিতেছে। রামানন্দ রায় গৌরের সঙ্গে গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া সুখী হইলেন এবং নকল করিয়া লইয়া আসল গ্রন্থ গৌরকে ফিরাইয়া দিলেন। পুনরায় দুই বন্ধুতে পাঁচ সাত দিন রাত্রিতে নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। রামানন্দ বলিলেন, তোমার ইচ্ছানুসারে আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম, মহারাজ দয়া করিয়া আমাকে নীলাচলে যাইতে আদেশ দিয়াছেন। আমি যাইবার উদ্যোগ করিতেছি।

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, আমিও তো সেই জন্য এখানে আসিয়াছি।

রাজা বলিলেন, আমার এখনও সব কাজ সারা হয় নাই। বিশেষতঃ আমার সঙ্গে হাতী ঘোঁড়া সৈন্য কোলাহল থাকিবে। তোমার তাহা ভাল লাগিবেনা। তুমি আগে যাত্রা কর, আমি দিন দশেকের মধ্যে সব সমাধান করিয়া তোমার অনুগমন করিতেছি। ইহার পর শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগর হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্ব পরিচিত পথে হাঁটিতে হাঁটিতে আলালনাথে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং সঙ্গী কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ দ্বারা নিত্যানন্দাদির নিকট আগে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া নিজে পাছে পাছে যাইতে লগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহার দর্শন পাইয়া সুখ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথের প্রধান পাণ্ডা ও উৎকল রাজের ইষ্টদেব কাশী মিশ্র প্রভৃতি বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোক সমুদ্র তীরে তাঁহার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং সকলে একত্র জগন্নাথ দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের আলয়ে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন ও বন্ধুগণের নিকট তীর্থ যাত্রা বৃত্তান্ত বলিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যের জীবনে এই তীর্থ ভ্রমণ এক মহা ব্যাপার। যখন রেলওয়ে ছিল না, রাস্তা ঘাট ভাল ছিল না, সে সময় একাকী পদব্রজে ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পূর্ণ দুর্গম পথে এত দেশ ভ্রমণ করা কম পুরুষত্বের পরিচায়ক নহে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ।

(৩৮২ পৃষ্ঠার পর।)

বঙ্গজ কুলাচার্য্যগণ বলেন, মহারাজ বল্লালসেন দেব বঙ্গজ কায়স্থদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা, কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র এবং অচলা। আমরা ঘটকদিগের এই বাক্য সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ "মধ্যল্য" শ্রেণী চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা রাজা দনুজমর্দ্দন দেব কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার সহিত বল্লালের কোনরূপ সংশ্রব নাই। ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহারাজ বল্লালসেন সপ্তবিংশ বংশীয় কায়স্থকে বিশেষরূপে সম্মানীত করিয়া তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। কুলীন ও মহাপাত্র বা সন্মৌলিক। যাঁহারা নবগুণ সম্পন্ন তাঁহারা কুলীন, যাঁহারা সপ্তগুণ সমন্বিত, তাঁহারা সন্মৌলিক। তদ্ব্যতীত অন্যান্য মৌলিক কায়স্থগণ অচলা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপপতি দনুজমর্দ্দনের শ্রেণী বিভাগ কালে মৌদ্গল্য দত্তদিগকে মধ্যল্য শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু বল্লালের সময় দত্তের কুল নষ্ট হয় নাই। এইজন্য অদ্যাপি বিক্রমপুর সমাজে কাঠালীয়ার দত্তগণ অর্দ্ধ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। আদিশূর কিম্বা বল্লালের সময় দত্তদিগের কুল নষ্ট হইবার কোনও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি না। পরবর্ত্তী ঘটকগণ নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় লিখিয়াছেন।

"দত্তবংশ সমুদ্ভূতা নারায়ণো মহাকৃতিঃ।
চকার স নৃপতিঃ তং নিষ্কুলং বিনয়াদ্ধীনং॥

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন দেবের শাসনপত্রেও যে নারায়ণ দত্তের কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে, সেই নারায়ণদত্ত আদিশূর কিম্বা বল্লাল কর্ত্তৃক নিষ্কুল হইয়াছিলেন। ইহা নিতান্তই অজ্ঞের প্রলাপ বলিতে হইবে। ভূগর্ভ হইতে তাম্রশাসন ও প্রস্তর লিপি সমূহ আবিষ্কৃত হইয়া কুলাচার্য্যদিগের সর্ব্বজ্ঞত্ব লোপ করিবে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, বল্লালের সময়ে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত (মৌদ্গোল্য) এই পঞ্চবংশীয় কায়স্থ কুলীন শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাগত দশরথ বসুর দুই পুত্র পরম বসু ও কৃষ্ণ বসু। পরম বঙ্গদেশে ও কৃষ্ণ বসু দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করিতেছিলেন। উত্তর কালে কৃষ্ণ বসুর বংশে আলঙ্কার নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাঢ় দেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। তদনুসারে অলঙ্কারের সন্তান সন্ততীগণও বঙ্গজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। কিন্তু বল্লাল কৃত মর্য্যাদা স্থাপন কালে পরম বসুর উত্তর পুরুষ লক্ষ্মণ ও পূষণ বঙ্গজ বসুদিগের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। *

* ঘটকদিগের কুলজীগ্রন্থে কান্যকুব্জাগত দশরথ বসুর পুত্র পরম বসু ও কৃষ্ণ বসু। পরম বসুর পুত্র লক্ষ্মণ ও পূষণ। ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী গণনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে (সেনরাজগণ ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আদিশূরের প্রায় তিন শতাব্দীর পর বল্লাল আবির্ভূত হন। এরূপ স্থলে আদিশূরের সমসাময়িক দশ-

কান্যকুব্জাগত মকরন্দ ঘোষের দুই পুত্র সুভাষিত ও পুরুষোত্তম। সুভাষিত ঘোষ বঙ্গে ও পুরুষোত্তম ঘোষ দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করিতেছিলেন।‡ কুলাচার্য্যদিগের মতে সুভাসিতের দুই পুত্র, মহাকীর্ত্তি ও চতুর্ভুজ। মহারাজ বল্লাল সেন দেব ঘোষ বংশের শিরোভূষণ চতুর্ভুজকে কৌলিন্য প্রদান করেন। মহাকীর্ত্তি নিষ্কুল। এ স্থলে আদিশূরের সমসাময়িক মকরন্দের পৌত্র চতুর্ভুজকে বল্লালের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। সুতরাং এই বংশাবলীও বিশুদ্ধ নহে।

কান্যকুব্জাগত বিরাটগুহের উত্তর পুরুষ দশরথ গুহ বল্লাল দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই দশরথের ও তাঁহার ভ্রাতাগণের উত্তর পুরুষগণ বহুকালান্তে রাঢ় দেশে গমন করিয়াছিলেন, এজন্য দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে কুলীন গুহ নাই। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বিরাট গুহের উত্তর পুরুষ—বল্লালের সমসাময়িক দশরথ গুহকেই কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের অন্যতম অবধারণ করিয়াছেন। এবং আপনাদের অনভিজ্ঞতা গোপন করত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রচার করিবার মানসে লিখিয়াছেন যে, "গুহ" শব্দ শ্রবণে আদিশূরের সভাসদ্গণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই; এজন্যই "দশরথগুহ" আদিশূরের সভা পরিত্যাগ করিয়া এক বারে "বঙ্গদেশে" যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাগত কালিদাস মিত্রের উত্তর পুরুষ অশ্বপতি হইতে বঙ্গজ ও শ্রীধর হইতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় মিত্রদিগের উৎপত্তি। ইহারা উভয়ই বল্লালের সমসাময়িক।

কান্যকুব্জাগত মৌদ্গোল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্তের উত্তর পুরুষ নারায়ণ দত্ত বল্লালের সমসাময়িক, ইনি বল্লাল দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। খোদিত লিপি সমূহ পাঠে অবগত হওয়া যায়, এই মহাত্মা লক্ষ্মণসেন দেবের সময়ে বাঙ্গালায় মহাসন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। ব্রাহ্মণ কুলজ মহাত্মা উমাপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, কায়স্থ-কুলভূষণ মহাত্মা নারায়ণ দত্ত রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্য দ্বিতীয় স্থানে সমারূঢ় ছিলেন। এরূপ একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী কৌলিন্য প্রাপ্ত হন নাই, ইহা আমরা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারিনা। সেন রাজাদিগের শাসন কালে পুরুষোত্তমের বংশধর কোনও প্রধান ব্যক্তি দক্ষিণ রাঢ়ে ছিলেন না। উত্তর কালে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ ভরদ্বাজ গোত্রজ দত্তদিগকে পুরুষোত্তমের বংশধর বলিয়া তাহাদিগকে সন্মৌলিক শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিয়াছেন, এবং তদাবধি তাঁহারা "অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি" এই অপূর্ব্ব কথা দেশ মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে মদ্গোল্য গোত্রজ পুরুষোত্তমের সহিত ভরদ্বাজ গোত্রজ বালির দত্তের কি সম্পর্ক হইতে পারে, তাহা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে পারিলাম না। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ

রথের পৌত্র কখনই বল্লালের সমসাময়িক হইতে পারে না। ঘটক মহাশয়গণ প্রাচীন বংশাবলী সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া কাহাকে যে কাহার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন নির্ণয় নাই।

‡ বঙ্গজ ঘটকদিগের মতে মকরন্দ ঘোষের দুই পুত্র সুভাষিত ও ভবনাথ। কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটকদিগের মতে মকরন্দের দুই পুত্র সুভাষিত ও পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তমের পুত্রের নাম ভবনাথ।

যখন অবগত হইলেন যে, পুরুষোত্তম দত্তকে তাঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রজ বলিয়া দত্তের আদিপুরুষ অবধারণ করিয়াছেন, ইনি প্রকৃত পক্ষে মদ্‌গোল্য গোত্রজ ছিলেন। সুতরাং তখন তাঁহারা এক "কিন্তু" খাটাইয়া বলিলেন "বঙ্গজ কুলাচার্য্য গ্রন্থে স এব মৌদ্‌গল্য গোত্রঃ।" কিন্তু বঙ্গজ কুলাচার্য্যগণ পুরুষোত্তম দত্তকে মুক্তকণ্ঠে মৌদ্‌গল্য গোত্রজ লিখিয়াছেন। তাঁহারা রাঢ়ী ঘটকদিগের ন্যায় "কিন্তু" খাটাইয়া বলেন নাই যে, "দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগ্রন্থে স এব ভরদ্বাজ গোত্রঃ।" ইহার দ্বারা বঙ্গজ কায়স্থ-কারিকা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকা অপেক্ষা প্রাচীন ও সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।*

রাজা দনুজমর্দ্দন দেব কৃত শ্রেণীবিভাগ।

"চন্দ্রদ্বীপ শিরস্থানং যথা কুলীন মণ্ডলং।"

রাজা দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা। বিখ্যাত মুসলমান ইতিহাস তবকত-ই-নাসিরি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহম্মদ বখতিয়ার খিলজি নবদ্বীপ অধিকার করিলে, রায় (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণসেন দেব বঙ্গের রাজধানী সমতট নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত ইতিহাস-লেখক মিনহাজ সিরাজ বলেন, ৬৪০-৪২ হিঃ অব্দে রায় লক্ষ্মণসেন দেবের বংশধরগণ বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন। জইয়ে বারনি প্রণীত তারিখে ফিরোজসাহি নামক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৬৮০ হিঃ অব্দে গৌরের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা "সুলতান মখিসুদ্দিন তুগ্রল" সম্রাট বলবন কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যৎকালে জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় সেন রাজবংশজ সুবর্ণগ্রামাধিপতি, বলবন বাদসাহকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন, এই দনুজরায়ই পশ্চাৎ পাঠানদিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া সমুদ্র উপকূলে গমন করত চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা দনুজরায় "সমাজপতি" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বল্লাল-নির্দ্ধারিত প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কায়স্থদিগকে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

১। কুলীন :—১ ঘোষ, ২ বসু, ৩ গুহ, ৪ মিত্র।

২। মধ্যাল্য :—৫ দত্ত, ৬ নাগ, ৭ নাথ, ও ৮ দাস।* মধ্যাল্য কুলীনদিগের আশ্রয় স্থান। ইহাদের সহিত আদানপ্রদান করিলে তাহাদের কুলের কোন হানি হয় না।

৩। মহাপাত্র :—(ক) ৯ সেন, ১০ সিংহ ১১ দেব, ১২ রাহা। এই চারি ঘর শ্রেষ্ঠ মহাপাত্র কুলীনের বিশ্রাম স্থান, ইহাদের সর্ব্বদা কুলকার্য্য হওয়া উচিত। ইহাঁদের সহিত আদানপ্রদান করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হয় না।

মহাপাত্র :—(খ) ১৩ কর, ১৪ দাস, ১৫ পালিত, ১৬ চন্দ, ১৭ পাল, ১৮ ভদ্র, ১৯ ধর, ২০ নন্দী, ২১ কুণ্ড, ২২ সোম, ২৩ রক্ষিত, ২৪ কুর, ২৫ বিষ্ণু, ২৬ আদ্য, ২৭ নন্দন। এই সকল মহাপাত্রগণ ৯,

---

* এস্থলে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণ প্রবন্ধ-লেখককে বঙ্গজ কায়স্থ কুলজ বিবেচনা করিতে পারেন। এই জন্যই ইহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যে, প্রবন্ধ-লেখক দক্ষিণ রাঢ়ীয় চৌলা সমাজের সিংহ বংশজাত।

* কেবল মদ্‌গোল্য দত্তই মধ্যাল্য, অন্যান্য গোত্রজ দত্তগণ সর্ব্বদা কুলকার্য্য করিলে মহাপাত্র শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারেন।

১০, ১১, ১২ সংখ্যক মহাপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ নিম্ন হইলেও ইহারা উৎকৃষ্ট কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য নিকৃষ্ট কায়স্থগণ "অচলা" আখ্যা প্রাপ্ত হন।

৪। অচলা:—হোড়, স্বর, ধরণী, বাণ, আইচ, পৈ, শূর, শাল, ভঞ্জ, বিন্দ, গুই, বল, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, ছই, রুদ্র, গুড়, আদিত্য, পীল, খিল, গুপ্ত, চাঞী, বন্ধ, শাঞি, হেস, সুমন্তু, গণ্ড, বাণ, রাহুত, দাহক, দান, গণ, অপ, মান, খাম, ক্ষেম, তোষক, বৈ, ঘর, বেদ, ভূত, অর্ণব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শক্তি, সঙ্গ, ক্ষমা, আশ, বর্দ্ধন, হেম, বন্ধ, অঞ্জ, কীর্ত্তি, শীল, ধনু, গুণ, যশ, মনন, দাড়িক, চাকি, শ্যাম, পুঞি, গণ্ড, নাদক, বোই, হোম, চাশক, ঢোল, দত্ত, ইত্যাদি কায়স্থগণ অচলা বলিয়া খ্যাত। মতান্তরে ৬৪ ঘর কায়স্থ অচলা শ্রেণীতে গ্রথিত হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতিদিগের সামাজিক আধিপত্য সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ উত্তরকালে যখন বসুবংশীয়গণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন ও সমাজপতির আসন অধিকার করেন, তৎকালে বঙ্গজ কায়স্থগণ প্রধানত চারি সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন যথা—

চন্দ্রদ্বীপ শিরস্থান, যশোহর বাহুস্বরূপ,
উরুদ্বে বিক্রমপুরঃ পাদৌ ফথয়াবাদকঃ॥
গুহ্যানি বাজবশ্চৈব অন্যস্থানঞ্চ পুরীষং।

বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের শিরস্থান চন্দ্রদ্বীপ। যশোহর ইহার বাহু স্বরূপ। মহারাজ প্রতাপাদিত্য দ্বারা যশোহর সমাজ গঠিত হইয়াছিল। বিক্রমপুর এই সমাজের উরু; সুবিখ্যাত ভৌমিক চাদরায় ও কেদার রায় এই সমাজের সমাজপতি ছিলেন। ফতেয়াবাদ অর্থাৎ ভূষণা এই সমাজের পদস্বরূপ, বীরবর মুকুন্দরাম রায় ইহার সমাজপতি ছিলেন। বাজু (ঢাকা, ময়মনসিংহ) এই সমাজের গুহ্যদেশ ও অন্যান্য স্থান পুরীষ তুল্য। বঙ্গজ কায়স্থদিগের কুলবিধি কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

কুলকর্ম্ম কুলীনস্য কন্যায়াঞ্চ সমন্বিতং।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ সপর্য্যো চ প্রশস্তকাঃ॥
নাস্তি দূরে সমীপেচ ঋণগ্রস্থে চ দুর্জ্জনে।
ব্যাধিসক্তে চ মূর্খে চ ষণ্ঠ সুকন্যা নদিয়তে॥
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুলত্যাগ স্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেচ কুলকর্ম্ম চতুর্ব্বিধং॥
স্বপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমং।
কন্যা ভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরং॥
কুলীনায় সুতাং দদ্যাৎ কুলীনস্য সুতাং লভেৎ।
পর্য্যায় ক্রমত শ্চৈব স এব কুলদীপকঃ॥
বিপর্য্যয়ে কুলং নাস্তি ন কুলংরণ্ড পিণ্ডয়োঃ।
পোষ্য পুত্রে কুলং নাস্তি ডেঙ্গরেচ কুলক্ষয়ং॥
সম্বন্ধ মচলৈঃ সার্দ্ধং কুর্য্যাশ্চ যদি কুলীনাঃ।
কুলং নষ্টং তথা তেষাং দূষিতঞ্চ কুলং ভবেৎ॥
অচৈতন্য মোহভাবং প্রাপ্নুয়ুস্তে কুলাধমাঃ।
তেষাং কুলস্য প্রমাদং নৈব সঙ্কোমি বর্ণিতং॥
ভ্রষ্টস্থান নিবাসী চ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ।
পদচ্যুতোঽপি তৎকুলেঃ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥
কুর্য্যাচ্চেৎ কুল কর্ম্মানি তত্রকুলে ক্রমাগতঃ।
কুলজশ্চ সমাখ্যাতঃ কথ্যতে গ্রন্থকারকৈঃ॥
ভ্রষ্টস্থান নিবাসীচ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ।
নৃপতিনাং পদং প্রাপ্য স্বস্থানেচ নিবাসিন॥
কুর্য্যাচ্চেত কুল কর্ম্মানি কায়স্থ স্বান্নভোজিনঃ।
কুলজাশ্চ ইতিখ্যাতাঃ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥
যদি পোষ্য পুত্রে কন্যা কুলীনঃ প্রদদেৎ কচিৎ।
ভ্রষ্ঠ কুষ্ঠ ফলং ভবেৎসহি মহাপাত্র সমো ভবেৎ॥

প্রমাদং তস্য কুলস্য নৈব শক্নোমি বর্ণিতং।
নহি প্রজায়তে সিদ্ধিঃ সহস্র কুলকর্ম্মভিঃ॥
কুলীনায় সুতাং দদ্যাৎ যো গৃহ্ণাৎ কুলীনাৎ সুতাং।
কুর্য্যাচ্চেৎ কুলকর্ম্মাণি তত্র কুলে যথাক্রমং॥
দানাদিগ্রহণদোষাৎ বর্জ্জয়েৎ বিধি পূর্ব্বকং।
গঙ্গাশ্রুত কুলং তস্য কথ্যতে কুলভূষণেঃ॥
কুলীনস্য সুতাভাবাৎ পুত্র পর্য্যায় নির্বৃতেঃ।
প্রসন্তান্যপকর্ম্মানি ক্ষমাপানি তথৈবচ॥
কুলীনস্যাশ্রয় স্থানং বিরতে স্থানমেবচ।
কুলজশ্চ মধ্যল্যশ্চ মহাপাত্রশ্চ তস্তবেৎ॥
তৈঃ সার্দ্ধং যদি সম্বন্ধং কুর্য্যাচ্চ কুলীন কচিৎ।
তদা ন কুলহীনঃ সকুলকর্ম্মাচরেদ্যদি॥
কুলকর্ম্ম যদি ভবেৎতস্য ত্রিপুরুষাবধি।
তদাকুলস্য রক্ষস্যাদন্যথা চ কুলক্ষয়ং।
আম্মোচিত গৃহ কবি চতুর্ভাবানি প্রাপ্নুয়াৎ।
ক্রমশশ্চাপি কুলীনো বিধিভিঃ কুলকর্ম্মভিঃ॥
কুলজেন সহকর্ম্মঃ কুর্য্যাচ্চেৎ কুলীন যদা।
তদাপ্নুয়াৎ চোপ ভাবং তদ্বক্ষেত্বপকর্ম্ম চ॥
মধ্যল্যেন ক্ষমং ভাবং মহাপাত্রেন চাপকং।
প্রাপ্নুয়াচ্চ কুলীনোয়ং তত্তৎকর্ম্মানুসারতঃ॥
কুলীন শ্রেষ্ঠবংশেন ইতর কুলীনো যদা।
দানাদি কুলকর্ম্মাণি কুর্য্যাচ্চ বিধি পূর্ব্বকং॥
তদেতর কুলীনশ্চ সন্তাব প্রাপ্নুয়াৎ তথা।
তৎকর্ম্ম সৎকর্ম্ম ভবেৎ তৎ পক্ষেচ মহাযশঃ॥
কুলজোবা মধ্যল্যো বা মহাপাত্রশ্চ বা তথা।
সম্বন্ধঞ্চ যথা কুর্য্যু কুলীনেন সমংকিল॥
সম্ভাব প্রাপ্নুয়ুস্তে চ বিধিভিঃ কুলকর্ম্মভিঃ।
ভাবযুক্তানি কর্ম্মানি সৎকর্ম্মাণি তথা কিল॥
ত্যক্ত্বাচ কুলসম্বন্ধং লোভাচ্চ যদি কুলীনাঃ।
মধ্যে ত্রিপুরুষাণস্ত ন কুর্য্যুশ্চ কুলক্রিয়া॥
পুরুষানুক্রমাদেবং রতাস্যুরপকর্ম্মণি।
ভবেযুস্তে কুলচ্যুতাঃ অচলানাং সমাভবেৎ॥
এতৈঃ সহাপি সম্বন্ধং কুর্য্যাচ্চ কুলীনো যদি।
প্রাপ্নুয়াৎ কর্ম্ম ভাবেন অপভাবং তথাত্যপং॥
মধ্যে ত্রিপুরুষানস্ত দৌহিত্রা দোষমাবহেৎ।
কুলীনস্য কুলং নষ্টং দুষিতঞ্চ কুলংভবেৎ॥

বঙ্গজ কুলীন কায়স্থের কুল কন্যাগত। স্বপার্য্যায় * আদান প্রদান প্রশস্ত। অতিদূরে, অতিনিকটে, ঋণগ্রস্থে, দুর্জ্জনে, ব্যাধিযুক্তে, মূর্খে কন্যাদান করিবে না। আদান, প্রদান, কুশত্যাগ এবং ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, এই চারি প্রকারে কুলীনের সম্বন্ধ স্থির হইবে। স্বপর্য্যায়ে দান ও গ্রহণ উত্তম। কন্যাভাবে কুশত্যাগ অথবা পরস্পরের প্রতিজ্ঞা দ্বারা সম্বন্ধ স্থির রাখিবে। যিনি পর্য্যায়ক্রমে কুলীনে কন্যাদান ও কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিবেন, তিনি কুলদীপক বলিয়া গণ্য হইবেন। বিপর্য্যায়, রণ্ডাকন্যা ও পোষ্যপুত্রের কিম্বা ডেঙ্গরের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুল নষ্ট হইবে। অচলের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুল নষ্ট ও দূষিত হয়। তদ্বারা কুলীন অচৈতন্য ও মোহ ভাব প্রাপ্ত হইবেন। সেই দোষ বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। সদ্বংশজাত ভ্রষ্টস্থানে বাস করিলে কৌলিন্য হইতে চ্যুত হইবে, কিন্তু তদ্বংশীয়গণ ক্রমাগত কুলকার্য্য করিলে কুলজ বলিয়া গণ্য হইবেন। স্বস্থানবাসী রাজপদ বিশিষ্ট ব্যক্তি ভ্রষ্টস্থানে বাস করিয়া স্বপাকী হইলে ক্রমাগত কুলকর্ম্ম দ্বারা কুলজ বলিয়া গণ্য হইবেন। পোষ্যপুত্রে কন্যাদান করিলে কুল নষ্ট হইবে এবং দাতা মাহাপাত্রভাবাপন্ন হইবেন এবং সহস্র কুলকর্ম্মের দ্বারাও সেই দোষ খণ্ডন হইবে

---

* দক্ষিণ রাঢী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ পর্য্যায় লইয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, অথচ পর্য্যায়ের বিচমল্লায় গলদ দেখা যাইতেছে। বংশাবলীর প্রথমভাগ বিশুদ্ধ নহে সুতরাং এরূপ পর্য্যায় গণনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

না। যে কুলীন বংশ পরম্পরায় দোষ গুণ বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বদোষ পরিহার করত কুলীনে আদান প্রদান করিবেন, তাঁহার কুল গঙ্গাশ্রুত বলিয়া কথিত হইবে। পর্য্যায় অনুসারে পুত্র ও কন্যার অভাব হইলে উপ, ক্ষম ও অপকর্ম্ম প্রশস্ত হইবে। কুলীনের আশ্রয় ও বিরাম স্থল কুলজ, মধ্যাল্য ও মহাপাত্র। কুলীন তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ করিয়া যদি তিন পুরুষের কুলক্রিয়া করেন, তাহার কুল নষ্ট হইবে না। কিন্তু তিন পুরুষের মধ্যে কুলকার্য্য না করিলে কুলক্ষয় হইবে। কুলীনগণ কুলকর্ম্মদ্বারা আত্ম, উচিৎ, গ্রহ ও কবি এই চারি ভাব প্রাপ্ত হইবেন। কুলজের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলীন উপভাব প্রাপ্ত হন এবং ঐ কর্ম্ম উপকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে। মধ্যাল্যের সহিত ক্রিয়া করিয়া ক্ষম ভাব ও মহাপাত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়া কুলীন অপভাব প্রাপ্ত হইবেন। কুলজ, মধ্যাল্য ও মহাপাত্র কুলীনের সহিত সম্বন্ধ করিলে তাহা তাহাদের পক্ষে সৎ সম্বন্ধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহারা সৎভাব প্রাপ্ত হইবেন। লোভ বশত কুলীন তিন পুরুষ মধ্যে কুলক্রিয়া না করিয়া পুরুষানুক্রমে অপক্রিয়ায় রত হইলে, তিনি কুলচ্যুত এবং অচল তুল্য হইবেন। এই কুলীনের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলীন ক্রিয়ার ভাবানুসারে অপভাব ও অত্যাপভাব প্রাপ্ত হইবেন। তিন পুরুষের মধ্যে দৌহিত্র দোষ বর্ত্তিলে কুলীনের কুল নষ্ট ও দূষিত হইবে।

বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনদিগের মধ্যে মিত্রদিগের কুল নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে চারি ঘরের পরিবর্ত্তে তিন ঘর কুলীন হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঠালীয়ার দত্তগণ অর্দ্ধকুলীন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।

আসক্তি ও অনুরাগ।

মাতাল না হইয়া যে মদ খাইতে পারে, সেই মদ খাইতে জানে। নেশায় প্রকৃতিবিপর্য্যয় ঘটায়। অনুরাগের সহিত যার আসক্তি নাই, সেই ভালবাসিতে জানে। দর্পণে প্রতিকৃতি প্রতিভাত হয়, দর্পণের স্বচ্ছতা গুণে। যদি প্রতিকৃতি দর্পণে লাগিয়া যাইত, দর্পণের স্বচ্ছতা থাকিত না। প্রতিকৃতি প্রতিফলিত আর হইত না।

আসক্তি অনুরাগকে সীমাবদ্ধ করে। স্থান কাল পাত্রের গণ্ডিতে ঘেরিয়া ফেলে। সসীম অনুরাগ কলঙ্কিত, আসক্তি অনুরাগের কলঙ্ক। আসক্তি কর্ম্মের প্রাণ, কিন্তু জ্ঞানের বিষ। গৃহস্থ কর্ম্মী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী। কর্ম্মেতে অনুরাগ, জ্ঞানেও অনুরাগ; কর্ম্মে আসক্তিকলঙ্কিত অনুরাগ, জ্ঞানের অনুরাগে আসক্তি নাই।

আসক্তি-শূন্য অনুরাগ ব্যভিচারী নহে। ব্যভিচার আসক্তির অতিমাত্রা জনিত, অভাব জনিত নহে। দর্পণে অনেক প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয়, তজ্জন্য দর্পণকে কেহ

ব্যভিচারী বলেনা। একটীকে ধরিয়া যে আর একটীর জন্য হাত বাড়ায়, সেই ব্যভিচারী। যে কাহারই জন্য হাত বাড়ায় না, যাহার গৃহে অতিথি অনেক, কুটুম্ব কেহ নাই, সে ব্যভিচারী নহে, সে গৃহস্থ নহে, সে সন্ন্যাসী।

নেশা না হইলে মদ খাইয়া সুখ কি? আসক্তিহীন অনুরাগ নপুংসক। সে অনুরাগে—অনুরাগীরও সুখ নাই, অনুরক্তিতেরও সুখ নাই। সুখ দুঃখ মৃৎসমুদ্রের পাঁয়া ফল। এই কষ্টিপাথরে সকলেই পরীক্ষিত। অসার কল্পনা, শূন্যে শূন্যের পরীক্ষা, প্রলাপীর উদ্গার। সুখ নাই, অনুমানেও নাই।

যখন অহঙ্কারে আপনাকে জগতের কেন্দ্র করি, তখন আমার সুখ দ্বারা জগতের পরিমাণ করি। যখন আমার সুখ জগতের মানদণ্ড হয়, তখন অসুখে সুখ ভ্রম হইলেও তাহারই দ্বারা পরিমাণ পরিসমাপ্ত হয়। আবার সেই অহঙ্কারে নীতি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অনীত কর্ম্ম কর্ত্তব্যে পরিগণিত হয়। নেশার সার—অহঙ্কার। স্থল জল আকাশ পাতাল ধর্ম্ম অধর্ম্মের পার্থক্য অপনোদনে ইহার তুল্য আর নাই।

তোমার সুখকেও মানদণ্ড করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যখন বালক ছিলে, পুতুল দিয়া ভুলাইয়াছি। দর্পণে চাঁদ দেখাইয়া চাঁদের অভাব মিটাইয়াছি। যৌবনে দুটা ফুল দিয়া, একটু হাসি দিয়া, একটু খোষামুদী করিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইয়াছি। তোমার অহঙ্কার সন্তুষ্ট করিলেই তোমার সুখ হয়। অহঙ্কার প্রমত্ত সার অসার বুঝেনা। সুখের মানদণ্ড ভাঙ্গিয়াছে। অন্য তুলায় ভাল মন্দ বিচার করিতে হইবে।

আর এক অসার কল্পনা বিবেক। গোবরে পদ্ম ফুল ফোটে, লোকে যখন জানিত, হস্তীর মাথায় গজমুক্তার জন্ম যখন বিশ্বাস করিত, তখন বিবেকের জন্ম। প্রাক্তন-লব্ধ বহুদর্শিতা বা জন্মগত জ্ঞান রাশি বিবেক নহে। বিবেক ভগবানের আদেশ কথা, ইসারা। পূতিগন্ধময় পয়োনালীজাত কীটের হৃদয়ে নাকি সে পরশমণির জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়? কেহ দেখে নাই, শুনে নাই, তবুও নাকি হয়? শিক্ষা সাধনার আবশ্যক নাই, হেমন্তের শিশির, বর্ষার জল ও বসন্তের বায়ুর ন্যায় সকলেই তাহা অনায়াসে লাভ করে। অথচ কেহই স্বীকার করেনা যে পাইয়াছে, দেখিয়াছে, শুনিয়াছে। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ধর্ম্মে অধর্ম্মে আমিও কখন দেখি নাই, আর কেহ দেখিয়াছে, তাহার মুখেও শুনি নাই। কেহ কেহ বলেন, স্বাতি নক্ষত্রের জলের ন্যায় সেই কহিনুরের আলোক লগ্ন সাপেক্ষ, অসম সমবায়ে ঘটেনা। যাহা দেখি নাই, তাহা আছেও বলিতে পারি না, নাইও বলিতে পারিনা। কে বলিবে, ভূতপ্রেত আছে কি না? কিন্তু একটু বলিতে পারি, প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার প্রয়োজন, সে এমন অসূর্য্যম্পশ্যা হইলে চলেনা ও আমার তাহাতে কাজ চলে না। নিত্য কার্য্যের জন্য, নিত্য ব্যবহারপযোগী অন্য কিছু আছে। সে কথা থাক্।

তোমার সুখ হইবে বলিয়া তোমাকে ভালবাসি নাই; যখন ভাল বাসিয়াছিলাম, জ্যামিতির স্বীকার্য্য স্বতঃসিদ্ধ স্মরণ হয় নাই। যে হেতু, অতএব ভাবিবার সময় পাই নাই। বলিও না, স্বার্থপরতা। নিজে সুখী হইব, একথা ভাবিবার অবসর পাই নাই

অন্য পদার্থের কেনা-বেচার লাভ লোকসান হিসাবের সময় হয়, ভালবাসিতে যদি সে সময় পাইতাম, যদি ভালবাসিলে এত হয় জানিতাম; তবে হয়ত—কিন্তু তখন ভাবিবার সময় ছিল না, ক্ষমতা ছিল না, ইচ্ছা ছিল না। তোমার সুখও ভাবি নাই, আমার সুখও ভাবি নাই। ইচ্ছা করিয়াও ভালবাসি নাই। অনিচ্ছায়ও নহে।

প্রেমে পবিত্র করে। অনুরঞ্জিতকে মনুষ্যত্বের অতীত করিয়া দেবত্বে পরিণত করে। অনুরাগী ব্রহ্মচারী। আসক্তি মনুষ্যোচিত, পশুত্বের অনেক উপরে। আসক্তি মনুষ্যকে উপরে উঠিতে দেয় না।

আসক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। যে উপরে উঠিবে, তাহাকেই টানিয়া নীচে ফেলিবে। গার্হস্থ্য জীবন অতিমানুষিতার প্রশ্রয় দেয় না। সকলই নিয়মিত ধারাবদ্ধ, অনিয়ত অতিমানুষী প্রগল্‌ভতা শান্ত সলিল রাশি উদ্বেলিত করে। চাঞ্চল্য স্থির জীবনের বিসম্বাদী। এজন্য সে গণ্ডির বাহিরে কাহাকেও যাইতে দেয়না। মাধ্যাকর্ষণে সকলকে বাঁধিয়া রাখে। আসক্তি গার্হস্থ্য জীবনের উপযোগী। সে গৃহস্থকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে, দুঃখ বিপদ বিসম্বাদের ঝটিকায় গৃহস্থকে রক্ষা করে। আসক্তি না থাকিলে মনুষ্য মনুষ্যত্ব হারাইত।

কিন্তু সে কীট জীবনের প্রয়োজন কি? যাহা লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই লইয়া চলিলাম। যে লতা পল্লব এত দিন দেহ সুশোভিত করিয়াছিল, একে একে সকলই বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় তলায় আসিয়া পড়িল। তাহাদের বুকের উপর দিয়া চলিতে হইল। আশা, ভরসা, উৎসাহ, কোথায় অদৃশ্য হইল। পৃষ্ঠাস্থি চূর্ণিত হইল। বিবাদ বিচ্ছেদ বিপদে সকলই বিসর্জ্জন দিয়া বিজয়ার অন্ধকারে চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছি। এ জীবন ছাড়িয়া যাইলে দুঃখ কি? ভালবাসিয়া যদি রক্ষা করিতে না পারিলাম, সে ভালবাসার লাভ কি?

আসক্তি মনুষ্যকে দুর্ব্বল করে। অনুরাগে বলবৃদ্ধি হয়। নিরাসক্ত অনুরাগী কুজ্ঝটিকার উপরে অনাহত-দৃষ্টি, অবদ্ধ বাব। তিনি অনুরঞ্জিতের প্রকৃত উপকারী, তাহার অনুরাগ সার্থক, সফল ও সুখপ্রদ।

তিনি উপরে থাকিয়া দূর হইতে বিপদের সমাগম অনুভব করেন। অসীম বলে তাহা পর্য্যুদস্ত করিয়া আত্মীয়কে রক্ষা করেন। আসক্তি চক্ষের জ্যোতিঃ অপহরণ করে, হাতের বল কমাইয়া দেয়। আত্মীয়কে বুকে পিঠে হাতে তুলিয়া যুদ্ধ করিবার ইহার সামর্থ্য, সুবিধা কিছুই থাকে না। সে সকলকে বুকে চড়াইয়া কাদার উপরে গড়াইতে থাকে। এইরূপে মনুষ্য জীবন অতীত হয়।

নিরাসক্ত অনুরাগী সংসারের উপরে, স্বর্গের দুয়ারে দেববলে বলবান। ইন্দ্রিয় সীমার অতীত, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বব্যাধি হরণক্ষম মহাপুরুষ। মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করিলে উপরে উঠা যায়, নীচেও নামিবার ক্ষমতা থাকে।

হাসি কান্না জীবনের বৈচিত্র্য-মূল। হাসি কান্না আসক্তি হেতু। নিরাসক্ত, এই বৈচিত্র্যময়ী কুয়াসার বাহিরে, নিরনুরাগ—জীবন্মৃত, অনাসক্ত অনুরাগ মোহের অতীত, শক্তির মূল, মোক্ষের নিদান।

জীবন অতি ক্ষুদ্র। পৃথিবী পঙ্কে পর্ণ। পৃথিবীর পাখী যতই উড়ুক না কেন, আকাশের উপরে উঠিতে পারে না। বিশ্রা-

মের জন্য, খাইয়া বাঁচিবার জন্য আবার নীচে নামিয়া আসিতে হয়। স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি কলঙ্কিত। যাহাকে ভালবাসে, তাহার মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেনা। কে কবে বলিয়াছে, আমি ইহাকে ভাল বাসি, এ আমাকে ভালবাসে, কিন্তু ইহার মঙ্গল অপরকে ভালবাসিলে, তারই দিকে ইহাকে ঘুরাইয়া দি।

প্রণয়িনী আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতেছে, তুমি আমাকে ছাড়িওনা! কে তাহাকে বুঝাইয়া অন্যের হাতে দিতে পারিয়াছে? স্বার্থ স্বার্থ পৃথিবীর ভিত্তি গরলে গঠিত। ধন জন মান অকিঞ্চিৎকর, আপাত মনোরম্যে সকলই মুগ্ধ। মাতাল ঘুরিতেছে, অসীম সমুদ্রের একটী বুদ্‌বুদে মানুষ প্রতারিত। আশা ভরসা, সুখ সম্পদ আপাত মনোহারী যে ছাড়াইতে পারিয়াছে, সেই অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। সেই এই সকল অধিকার করিয়াছে, যে হৃদয়কে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছে। যে হৃদয় বিসর্জ্জন দিয়াছে, সেই হৃদয়বান। আসক্তি—অক্ষতা কুমারী জীবত্রাতার জন্মদায়িনী। অতি অপূর্ব্ব কল্পনা, অনাবিল সত্য, অন্ধকারে উষার জন্ম, মেঘে তড়িতের অভ্যুদয়। আসক্তি অক্ষত অনুরাগ-রঞ্জিত-জ্ঞান, এইত প্রেম।

এই প্রেম তোমাকে দিতে চাহি, কিন্তু পারি কৈ? মাধ্যাকর্ষণের টানে আমার প্রেম ভূতলে পড়িয়া ধূলায় গড়াইয়া কলঙ্কিত হইয়াছে। তাহা তোমাকে কি বলিয়া দিব? আমি শিষ্য হইয়া তোমার চরণতলে বসিলাম। আমাকে শাসিত কর; তোমার উপযোগী করিয়া লও। পূজা করিতে আমার জন্ম, ভালবাসিতে নহে।

মানে লজ্জা, স্নেহে ভয়, ভাবে দুঃখ। পুত্র কন্যার জন্য লোকে অনরত্ব পরিহার করে। মৃত্যুর দাসত্ব স্বীকার করে। পুরুষ রূপে তোমার ক্ষমতা অন্যকে হাসাইতে পিতা রূপে প্রার্থী তুমি অন্যের হাসি দেখিতে।

যখন ছেলেটী পাইয়াছিলাম, বুকে তুলিয়া হাসিয়াছিলাম, যাঁহার ছেলে তাঁহাকে ফিরাইতে কাঁদিলাম কেন?

আসক্তি মনুষ্যকে স্বার্থ-পরায়ণ করে। ধন্য সে, যে সংসারে জড়ায় নাই। তাহার অটুট রাজত্ব। জ্ঞান ও অনুরাগ, উভয়কে ধূলী কুয়াসার উর্দ্ধে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

জন্মভূমি। *

'বঙ্গবাসীর রত্নপ্রসূ মুদ্রাযন্ত্র হইতে নিত্য নূতন রত্নরাজি প্রসূত হইতেছে। "বঙ্গবাসী" স্বয়ং সাহিত্য-সংসারে ক্ষুদ্র দেহ অবতীর্ণ হইয়া কাল সহকারে প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে 'দৈনিক' ও 'হিন্দী বঙ্গবাসী'র উৎপত্তি দ্বারা সাহিত্যের সমুন্নতি সাধন করিয়াছে। তদ্ভিন্ন রামায়ণ, মহাভারত, বিংশতি স্মৃতিসংহিতা,

* মাসিক পত্র। প্রথম ভাগ—প্রথম সংখ্যা।

অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-পুরাণাদির সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত ও বঙ্গ সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছে এবং কালাচাঁদ, নডেল ভগিনী প্রভৃতি উপন্যাসাদির প্রচার দ্বারা সুকুমার-সাহিত্য-সেবী পাঠকগণেরও পাঠলিপ্সা অনেক পরিমাণে চরিতার্থ করিয়াছে। প্রত্যুত 'বঙ্গবাসী'র অধ্যক্ষগণ নানাবিধ উপায়ে বঙ্গ সাহিত্যের পরিচর্য্যা করার নিমিত্ত তাঁহারা বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

'বঙ্গবাসী'র সকলই ছিল—অভাবের মধ্যে, কেবল মাসিক পত্রিকা। আজি "জন্মভূমি"র অবতারণা দ্বারা তাহার সে অভাবও তিরোহিত হইল। আমরা অনেক সময় মনে মনে ভাবিয়াছি, "বঙ্গবাসী"র সাময়িক পত্র-বিভাগে সাপ্তাহিক, দৈনিক, ত্রৈবিক কি—ভাষান্তরিক ভাবও দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু উহার মাসিক মূর্ত্তি প্রকটিত হয় না কেন? আমরা এখন বুঝিলাম, উহার অধ্যক্ষগণের অন্তরে "মাসিক পত্র প্রকাশের কল্পনা"ও জাগরূক ছিল, কেবল যথোপযোগী উদ্যোগ অভাবে "সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত" হয় নাই। এত দিনে তাহাদিগের "উদ্যোগ শেষ হইল"—বঙ্গভূমে "জন্মভূমি"ও জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। কি কারণে বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, নবজীবন, প্রচার, প্রভৃতি পত্রের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে,—কি কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র সকলের উত্থানের সঙ্গেই পতন হইয়াছে—হুঙ্কারের সঙ্গেই হাহাকার উঠিয়াছে—কি উপায়ে, কিরূপ উদ্যোগে, কি কি গুণ থাকিলে, মাসিক পত্র যথানিয়মে চালান যায়—এই সকল মহাতথ্য সবিশেষ জানিয়া তদুপযোগী মহান্ উদ্যোগ করা সত্ত্বেও "জন্মভূমির" অকাল-বিলয় ঘটিবে কি না—সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাই বলিতে পারেন। তবে এরূপ অবস্থায়, বিলয় ঘটিলেও, "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ" বলিয়া উহার অধ্যক্ষগণ মনকে প্রবোধ দিতে পারিবেন। যাহাই হউক, আমাদিগের জন্মভূমির এই অসাড় নির্জীব অবস্থায়—বঙ্গসন্তানের বিকৃতমস্তিষ্কতা প্রযুক্ত, বঙ্গভাষার প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধার অবস্থায় "বঙ্গবাসী"র উদ্যোগে বঙ্গভূমে এই 'জন্মভূমি'র জন্ম বড়ই আনন্দকর। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, ইনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জন্মভূমির উন্নতিকল্পে ও মাতৃভাষার মর্য্যাদা রক্ষায় ব্যাপৃত থাকুক।

আমরা 'জন্মভূমি'র দীর্ঘজীবন প্রয়াসী বলিয়া উহার 'সূচনা' হইতেই দুই এক কথার সমালোচনা করিব।

"বঙ্গবাসী" পত্রিকা বঙ্গবাসী মাত্রেরই গৌরবের পদার্থ; বাস্তবিক উহা লোক-শিক্ষা বিস্তারে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়াছে, অল্পমূল্যে সমাচার বহন পক্ষে 'সুলভ' প্রথম প্রবর্ত্তক হইলেও, 'বঙ্গবাসী'ই তৎসম্বন্ধে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; উহার সহযোগী ও পদানুসরণকারী নানা পত্রের 'পতন' ও 'হাহাকারে'র পর 'সঞ্জীবনী' ও 'সময়' টিঁকিয়া গেলেও এবং লোকশিক্ষা সাধন পক্ষে ইহারাও যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করিলেও, 'বঙ্গবাসী'কেই এ কার্য্যের পথপ্রদর্শক বলিতে হইবে। কিন্তু কালক্রমে 'বঙ্গবাসী'র প্রতি লোকের ক্রমশঃ শ্রদ্ধা কমিতেছে;—'বঙ্গবাসী'র আত্মম্ভরিতাই ইহার একমাত্র কারণ। আমরা প্রথমাবধিই 'বঙ্গবাসীর'র পক্ষপাতী, উহার যুক্তি-তর্কের সঙ্গেও আমাদিগের অধিকাংশ স্থলে ঐক্য

আছে, কিন্তু উহার ইদানীং ভাব আমাদিগেরও কিঞ্চিৎ অরুচিকর বোধ হয়। সংসারে সকলের ঐকমত্য একেবারে অসম্ভব—উহা কখন হয় নাই, কখন হইবে এমনও বোধ হয় না। অতএব 'বঙ্গবাসী'র সকল মতের সঙ্গেই যে সকলের মত মিলিবে, ইহা মনে স্থান দেওয়াই ভ্রান্তি; আর 'বঙ্গবাসী'র সকল মতই যে অভ্রান্ত এবং তদ্বহির্ভূত সমস্ত মতই ভ্রান্ত,—ইহা মনে করা অসাধারণ আত্মম্ভরিতার পরিচয়;—ব্যাস-বুদ্ধ-পতঞ্জলি, মনু-পরাশর-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষীগণও যে কখন এরূপ মনে স্থান দিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। কোন কোন বিষয়ে "বঙ্গবাসী"র সমীচীন মত ও উহার বর্ণনা (tone) গুণে লোকের কর্ণশূল হইয়া উঠে। লোকশিক্ষা যাহার ব্রত, কটুভাষী হওয়া তাহার পক্ষে কখনও কর্ত্তব্য নহে। মিষ্ট উপদেশে যে উপকার সংসাধিত হয়, শ্লেষময় ব্যঙ্গোক্তি বা ঘৃণাব্যঞ্জক টীট্‌কারিতে তাহার শতাংশের একাংশ ফলও জন্মে না, বরং তাহাতে শ্রোতার গাত্রদাহ বর্দ্ধিত করে,—শত্রুতার পথ প্রসারিত করে। যুক্তিমার্গানুসারে অননুরঞ্জিত ভাষায় যে সত্য প্রকাশিত হয়, অতিরঞ্জনের দোষে, সে সত্য প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, মৌলিক যুক্তিজালও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই দোষে 'বঙ্গবাসী'র উপদেশ কাহারও কর্ণে বড় বাজিতেছে না,—'বঙ্গবাসী'-স্তম্ভেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই কংগ্রেসের কথা;—যে সকল কারণে কংগ্রেসের সহিত 'বঙ্গবাসী'র সহানুভূতি নাই, অনেকেই সে সকল কারণ উপলব্ধি করিয়া থাকে এবং তৎসম্বন্ধে 'বঙ্গবাসী'র সহিত অনেকের মতেরও মিল আছে। কিন্তু দুইটী প্রকৃত কথার সঙ্গে 'বঙ্গবাসী' দুইশ'টা শ্লেষময় বাগ্‌জাল বিস্তার করেন, সুতরাং কংগ্রেসপক্ষীয়দিগের মত পরিবর্ত্তন করা দূরে থাকুক, তাহাতে 'বঙ্গবাসী'-পক্ষীয়দিগেরও বিরক্তি জন্মে। এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কথা;—নিতান্ত স্বেচ্ছাচারের কাল পড়িলেও, আজি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি অনেক হিন্দুর যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে,—কিন্তু সে কেবল যথার্থ ব্রাহ্মণের প্রতিই আছে, সূত্রগুচ্ছধারী ব্রাহ্মণপদবীধারী ব্যক্তিমাত্রের প্রতি নহে। 'বঙ্গবাসী' এ শ্রেণীর হিন্দুকেও অহিন্দু বলেন, হয় ত তাঁহাকে 'বাবু' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া বিষম টিট্‌কারি প্রকাশ করেন। 'বঙ্গবাসী'র এ কিরূপ যুক্তি, আমরা ভাবিয়া পাই না। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আর কশাই-কালী-প্রতিষ্ঠাতা পতিতপাবন শিরোমণি যদি উভয়েই ব্রাহ্মণ বলিয়া সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েন, তবে সেরূপ হিন্দুধর্ম্মে কাহার আস্থা জন্মিবে? 'বঙ্গবাসী' যে মহাভারতের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে উপদেশ দেন, সেই অমূল্য গ্রন্থই বলিতেছে,—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য না করিল, সে শূদ্রাপেক্ষাও অধম, আর যে শূদ্র শমদমাদি গুণ সংযুক্ত, সেও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য।* ইহার পরেও

* "যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুরিতাচারী হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে বর্ত্তমান থাকে, সে শূদ্র হয়, এবং যে শূদ্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উদ্যমাম্বিত, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি; কেননা ব্রাহ্মণ হইবার কারণ একমাত্র সচ্চরিত্র।"

—বঙ্গবাসীর শাস্ত্রবিভাগ প্রকাশিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ; ৪৮৮ পৃঃ।

অপিচ অন্যত্র। "সত্য, দান, অক্রোধ, অনৃশংস্য, অহিংসা ও দয়া * * * যে শূদ্রে * * থাকে এবং যে ব্রাহ্মণে তাহা না থাকে, সে শূদ্র শূদ্র নয়

ব্রাহ্মণ-পদবী-ধারী মাত্রকেই ব্রাহ্মণোচিত ভক্তি প্রকাশ করিতে বসিলে কি সেই আর্য্যগ্রন্থেরই অবমাননা করা হয় না? বেদ পুরাণ, স্মৃতিশ্রুতি প্রভৃতি দুরূহ বিষয় সকল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের আলোচ্য নহে; বেশ কথা, কিন্তু ঐ পতিতপাবন শিরোমণির আলোচনায় অধিকার আছে, আর সংস্কৃত সাহিত্যবিৎ সংযতচিত্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তাহাতে অধিকার নাই—ইহাই কি শাস্ত্রের বিধান?—এইরূপ নানা কারণে 'বঙ্গবাসী'র কথা অযৌক্তিক ও অরুচিকর বোধ হয়, এবং সেইজন্যই উহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ক্রমশঃ কমিতেছে।

"আমরা 'জন্মভূমি'র আলোচনা করিতে বসিয়া 'বঙ্গবাসী'র অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। তাহর এক কারণ আছে,—'জন্মভূমি' "বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত" এবং 'সূচনা' হইতেই যেরূপ দেখা যাইতেছে, 'বঙ্গবাসী'র সহিত এক সুরে সংমিলিত। "কাণ টানিলেই মাথা আসে";—'বঙ্গবাসী'র দোষ-গুণের কথা বলিলেই, 'জন্মভূমি'রও দোষ গুণ বুঝা যাইবে, এই বিবেচনায় আমরা 'বঙ্গবাসী' সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। পূর্ব্বকথিত আত্মম্ভরিতার পরিচয় 'জন্মভূমি'র 'সূচনা'তেই দেদীপ্যমান,—জানি না, সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে উহা কতদূর বর্দ্ধিত হইবে। আপন মুখে আপন ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া পুরুষার্থ নহে; কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যাইলে সহজেই তাহা সাধারণের হৃদয় কর্ষণ করে এবং সেই গুণ বা ক্ষমতার জন্য লোকেই সাধুবাদ করিয়া থাকে। জগতের অক্ষয় কবি কালিদাসও কবিত্ব-স্রোতে গা ঢালিয়া, "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ূপেনাস্মি সাগরং" বলিয়া, আপনার হীন বলের জন্য বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর 'জন্মভূমি'র জন্মদাতৃগণ আসরে অবতীর্ণ হইয়াই, বঙ্গদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, প্রচার যাহা করিতে পারেন নাই, তাহাই করিবেন বলিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা নিতান্তই শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ।

তার পর ঘৃণা ও শ্লেষ।—'নব্যভারত, ও 'ভারতী'র প্রতি বিচক্ষণ একটু ভ্রুকুটী বিক্ষেপ হইয়াছে। উক্ত পত্রিকাদ্বয়, যথাক্রমে, 'ব্রাহ্মদলের' ও 'ব্রাহ্ম পরিবারের' পত্র বলিয়া তাহাদিগের নিয়মিত প্রকাশরূপ মহদ্গুণও 'জন্মভূমি'র বিবেচনায় "ধর্ত্তব্যই নহে।" কলিযুগের শেষে হিন্দুধর্ম্মের এতই রূপান্তর হইয়াছে, এতদিন আমাদিগের সে জ্ঞান ছিল না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, অধিক কি - কলির প্রারম্ভেও, হিন্দুরা পরম শত্রুরও গুণ ব্যাখ্যা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, আর আজ 'জন্মভূমি' সেই "হিন্দুর * * শিক্ষা সম্পূর্ণ" করিতে অবতীর্ণ হইয়া, ধর্ম্ম বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ পার্থক্য হেতু, এক জনের প্রকৃত গুণ প্রকাশেও সঙ্কুচিত। তদ্ভিন্ন উক্ত বাক্যে সত্যেরও কিঞ্চিৎ অপলাপ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, উক্ত পত্রিকাদ্বয় 'ব্রাহ্মদলের' ও 'ব্রাহ্মপরিবারের' পত্র নহে উঁহাদিগের স্বত্বাধিকারীগণ এবং কোন কোন লেখক, ন্যূনাধিক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, উহারা

এবং সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। * * * অপৌরুষেয় সত্য বেদবাক্য চতুর্বর্ণেরই হিতকর। * * * পুরুষ যে পর্য্যন্ত বেদে সংযুক্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত শূদ্র সম থাকে। * * * যে পুরুষেতে সুসংস্কৃত চরিত্র দৃষ্ট হয়, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি।" ঐ ঐ ৪৩৮ পৃষ্ঠা।

নিরবচ্ছিন্ন 'ব্রাহ্মদলের' বা 'ব্রাহ্ম পরিবারের' মুখপাত্র নহে। লেখকদিগের মধ্যে আমরা অনেককে জানি—তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বী নহেন, এবং অনেক প্রবন্ধে ব্রাহ্ম মত-বিরোধী তীব্র সমালোচনাও প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি; প্রত্যুত, ঐ উভয় পত্রে নিরপেক্ষ ভাবে সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের লেখকগণের প্রবন্ধই প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং "প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।" আর প্রকৃত পক্ষে উহারা 'ব্রাহ্মদলের' ও 'ব্রাহ্ম পরিবারের' পত্র হইলেই বা ক্ষতি কি?—ধর্ম্ম বিশ্বাস মনুষ্য মাত্রের সমান নহে;—হইলে, নাস্তিক, আস্তিক, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, এবং এইরূপে এক এক ধর্ম্মের মধ্যে শত শত সম্প্রদায়ভেদ থাকিত না। সকলে এক উপায়ে ভগবানকে পাইবে না জানিয়াই করুণাময় সর্ব্বান্তর্যামী স্বয়ং অভয় দান করিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।"

উক্ত পত্রিকাদ্বয় 'তত্ত্ববোধিনী' বা 'বেদব্যাসে'র ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত নহে; উহাতে হিন্দুর মত-বিরোধী কোন প্রবন্ধ থাকে, আমি হিন্দু—তাহা পড়িব না বা তাহার উপদেশে চলিব না। কিন্তু তাই বলিয়া যে, তাহাতে প্রকাশিত দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য বা অপর সাধারণ হিতকর প্রবন্ধ মাত্রেই পাঠ্য বা ধর্ত্তব্য নহে—ইহা কিরূপ যুক্তি? যদি ব্রাহ্মদলের পত্র বলিয়া তাহা ধর্ত্তব্য না হয়, তবে হিন্দুদলের পত্র বলিয়া 'জন্মভূমি'ও অনেকের ধর্ত্তব্য না হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে, "জন্মভূমির লোক শিক্ষাব্রত সম্পূর্ণ হইবে কিসে?—তাহার পঞ্চাশ হাজার গ্রাহকই বা জুটিবে কিরূপে?—আর যদি চিন্তাশীল ¶ পাঠকগণ কর্ত্তৃক উহা পঠিত না হইয়া কেবল মুদীর দোকানেই শোভা পায়, তবে 'জন্মভূমি'র প্রকৃত মর্য্যাদাই বা রক্ষিত হইবে কিরূপে?—আর যদি হিন্দু ভিন্ন অপরের রচিত প্রবন্ধ মাত্রই অপাঠ্য হয়, তবে 'জন্মভূমি, হিন্দু-মাহাত্ম্য গাহিতে না গাহিতেই হিন্দুমত-বিরোধী, বিলাত-প্রত্যাগত, "ভারতেশ্বরীর সহিত পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত Mr. T. N. Mukherjir প্রবন্ধ সাদরে আপন অঙ্গে স্থান দিলেন কি বলিয়া?

আর এক কথা। ধীর ও প্রশান্ত ভাবে সংশিক্ষা দেওয়াই সাধু লোকের কার্য্য। সৌম্য মূর্ত্তিই হিন্দুর প্রধান লক্ষণ। সর্ব্ব-জীবে নিষ্কাম ভাবে দয়া প্রকাশই হিন্দুর একমাত্র অনুষ্ঠেয়। এ সকল উপদেশ আমরা সময়ে সময়ে বঙ্গবাসী হইতেই শিক্ষা করিয়াছি। এখন মুখে এক উপদেশ, কার্য্যে তাহার বিসদৃশ ভাব করা সদ্বিবেচকের কার্য্য নহে। ব্রাহ্ম মতিভ্রান্ত হইয়া গন্তব্যচ্যুত হইয়া থাকে, যুক্তিপূর্ণ সদুপদেশ দ্বারা তাহাকে সংপথে আনিতে চেষ্টা করাই প্রকৃত সহৃদয়ের কার্য্য। যদি তাহাকে আদৌ না ধরিলে, তাহার প্রতি আদৌ চাহিয়া না দেখিলে, তবে সেত অসৎ হইতে অসত্তর পথে ধাবমান হইবে। ব্রাহ্ম নিজ পত্রিকায়, বা নিজ প্রবন্ধে,

---

¶ কংগ্রেস সভায় শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয় কর্ত্তৃক যে অর্থে "চিন্তাশীল" কথা ব্যবহৃত হইয়াছিল, আমরা সে অর্থে উহা ব্যবহার করি নাই; 'জন্মভূমি'স্থ 'বেদান্ত-দর্শন'-ব্যাখ্যাকার তদীয় প্রবন্ধের উপসংহারে উহা যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আমরাও সেই অর্থে ব্যবহার করিলাম।

মিথ্যা যুক্তি, অসার তত্ত্ব বা অধর্ম্মকর প্রস্তাব উত্তাপিত করে, তাহা দেখিয়া, তাহা পড়িয়া তাহার সরল প্রতিবাদ কর, প্রকৃত যুক্তি, সারতত্ত্ব, প্রকৃত ধর্ম্মোদ্দীপক ভাব তাহার সম্মুখে ধর—তবে তাহার মোহ ঘুচিবে, হিন্দুধর্ম্মের অবিনশ্বর বিজয় নিশান উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে উড্ডীয়মান হইবে। যদি সে প্রবন্ধ চক্ষেই না দেখিলে, তবে তাহার অসারতা বুঝিবে কিরূপে?—মতিভ্রান্তের সদ্গতি সম্পাদনই বা করিবে কিরূপে? যে হিন্দু সে ত হিন্দু আছেই, তাহার জন্য কষ্ট কেন? যে হিন্দু ছিল, এখন কালবিপর্য্যয়ে মতিভ্রান্ত হইয়া অহিন্দু হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় হিন্দু করিতে পারিলেই ত হিন্দুর কার্য্য হইবে,—হিন্দুর মাহাত্ম্য রক্ষিত হইবে। আমরা তাই বলি, অসূয়া আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করিয়া, শ্লেষ ব্যঙ্গ পরিহার করিয়া অভিমান মাৎসর্য্য ভুলিয়া গিয়া, ধীর ভাবে আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হও, মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা বাক্যে আপন ক্রোড়ে সকলকে স্থান দাও, আর্য্যঋষিগণের কথিত সারতত্ত্ব সকল সরলহৃদয়ের অবিকৃত ভাবে সকলের নিকট উদ্ঘাটিত কর,—প্রকৃত জন্মভূমির কার্য্য হইবে,—স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া উহার প্রতি অধম সন্তানের শ্রদ্ধা জন্মিবে; নচেৎ অনেকেই দূর হইতে নমস্কার পূর্ব্বক "Dear, damn'd native land, good bye!" করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবে। পাশ্চাত্য দার্শনিক হইলেও Herbert Spencer এর মতেই আজকাল নীতি শিক্ষা দেওয়া ভাল, নচেৎ প্রহার ও তিরস্কারের বলে বালক বিগড়াইয়া যায়, সংস্কৃত হয় না।

আমরা জন্মভূমির সূচনা লইয়াই অনেক কথা বলিলাম। উহার উদ্দেশ্য মহৎ—সন্দেহ নাই; এখন তাহা কার্য্যে পরিণত হইলেই পরম সুখী হইব। উহার অন্যান্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

'হিন্দুরমণী'র প্রতি আমাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি আছে; প্রত্যুত হিন্দুরমণীর সতীত্ব গুণেই আমরা আজ পর্য্যন্ত হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইতেছি। আর্য্যশাস্ত্রে "স্ত্রী জাতির ও ভার্য্যার মর্য্যাদা" যথেষ্ট পরিমাণে বিহিত থাকিলেও, কি জন্য বর্ত্তমান অবস্থায়, "বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাধীনতা হইতে স্ত্রীজাতিকে অন্তরে" রাখা হয়,—একথা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিলে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের সম্পূর্ণতা বুঝিতে পারিব। "বাল্যবিবাহ" প্রসঙ্গে বঙ্গবাসীর স্তম্ভে এ কথার কতক আলোচনা হইতে দেখিয়াছি; কিন্তু, যত দূর স্মরণ হয়, তাহাতে স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখার কারণ ব্যাখ্যাত হয় নাই। আর্য্য শাস্ত্রেরই বিধান—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"

অথচ, বর্ত্তমান (প্রাচীন?) হিন্দুরা স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী কেন, এ শিক্ষা বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর, এ সকল বিষয় আমরা "জন্মভূমি"র নিকট শিক্ষাপ্রার্থী। স্ত্রী পুরুষের আশ্রয়—আশ্রিত ভাবে আমাদিগের মতদ্বৈধ নাই, ইদানীং সাম্যবাদিদিগের ন্যায় আমরা স্ত্রীজাতিকে সকল বিষয়ে সম্যক্ স্বাধীনতা দিতেও প্রস্তুত নহি। তবে সামঞ্জস্যের সহিত সংস্কার

সাধন করিতে দোষ কি? * সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় অবরোধ ও অবগুণ্ঠন প্রথার প্রয়োজন কি? আমরা যতদূর জানি, ভারতের প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালে এ সকল প্রথা পূর্ণমাত্রায় ছিল না, মুসলমান শাসন কালে তদানীন্তন পাশব প্রকৃতির লোকদিগের উৎপীড়নে এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এখন সেরূপ উৎপীড়নের আশঙ্কা নাই, তথাপি ঐ প্রথা সমাজে অপ্রতিহত প্রভাবে কার্য্য করিতেছে কেন? একজন রসপ্রবীণ কবি বলিয়াছেন—

"ঘোমটা টানা, যায় না জানা,
ভিতরে কেমন কাজ;
* * * *
মনটি ভাল, হলেই হ'ল
কাজ কি অত লাজ?*

কবির এই সমাজ-সংস্কার চিন্তায় আমরা পরম মুগ্ধ। এইরূপ ও অন্যান্য সামান্য বিষয়ে স্ত্রীজাতিকে, সম্ভবমত, স্বাধীনতা দিলে ক্ষতি কি—জন্মভূমির নিকট আমরা এ সকল তথ্য শিখিতে চাই।

'মহাবিদ্যাসাধন' সাধনপ্রিয় হিন্দুর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য, "ভক্তের আরাধ্য বস্তু এবং কাব্যপ্রিয় ব্যক্তির প্রিয়তম পদার্থ"—তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কবিবর রসিকচন্দ্র প্রবীণ বয়সে প্রগাঢ় ভক্তিভাব-বিমিশ্রিত রসে জন্মভূমির পাঠকমাত্রকে সেই 'মহাবিদ্যাসাধন' শিক্ষা দিয়া প্রকৃত ভক্তের কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান রুচির বাজারে এ সাধন বঙ্গীয় পাঠকের কতদূর চিত্তাকর্ষক হইবে—বলিতে পারি না। আজ কাল যখন সহজেই লোকে 'ন্যাংটা গা' ন্যাংটো পা, দেখিয়া সিহরিয়া উঠে, তখন "বিপরীত রতাতুরা দিগম্বরী" মহাবিদ্যাগণের কেবল দিগম্বর ভাব দেখাইলে, লোকের অরুচি ভিন্ন ভক্তি জন্মিবার অল্পই সম্ভাবনা। আজ কাল ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের কথা তুলিলেই লোকে বলিয়া বসে—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

এখন আর সে ধ্রুব প্রহ্লাদের ভক্তির কাল নাই; এখন যুক্তি, তর্ক দর্শন ভিন্ন লোকে কিছু বুঝিতে চাহে না, বিশ্বাস করিতে চাহে না, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও তাই এখন বৈজ্ঞানিক মতে 'ধর্ম্মব্যাখ্যা' করিতে বসিয়াছেন। আমরা তাই বলিতেছিলাম, দশ মহাবিদ্যার বাহ্যিক ভাব এখন সকল লোকের চিত্তাকর্ষক হইবে না,—কাল-তারা ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণকে অশেষবিধ ভক্তিবাচক বিশেষণে বিশেষিত করিলেও এখন তাঁহারা সকলের ভক্তি উদ্দীপন করিতে পারিবেন না। এখন উহাঁদিগের আভ্যন্তরিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করা সমধিক সমীচীন বোধ হয়; কবি হেমচন্দ্র তাহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার দশমহাবিদ্যার পার্শ্বে 'কবিবর' রসিকচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা কিরূপ আসন পাইবেন, বলিতে পারি না।

'তারাচাঁদ সদ্দার' এর উপাখ্যান বেশ উপদেশপ্রদ। আজকাল সঙ্গসন্তান যেরূপ হীনবল ও অকৃতজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইতেছে,

---

* সংস্কার ও সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমাদিগের বারন্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

* সাতনরী।—ছোট বৌ ১৯। ২১ পৃঃ।

তাহাতে তারাচাঁদের সাহস ও বিক্রম এবং সর্ব্বোপরি অকৃত্রিম প্রভুপরায়ণতা বাস্তবিক শিক্ষার সামগ্রী। ইহার সঙ্গে ক্রমশঃ আমরা পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত সঙ্কলিত ভারতীয় "আর্য্যকীর্ত্তি" শুনিতে পাইলে সমধিক সুখী হইব। 'বঙ্গবাসী'র প্রথমাবস্থায় এইরূপ উপাখ্যান পাঠে আমরা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। কালাচাঁদ, মডেলভগিনী প্রভৃতি উপান্যাস-রচয়িতা বঙ্গসাহিত্য সংসারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন; বঙ্গভাষার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ব এবং সমাজ-চিত্র গঠনেও তিনি বিলক্ষণ পটু। তাঁহার প্রণীত 'রাধানাথ' উপন্যাসও উপন্যাস-পাঠকের বিশেষ তৃপ্তিকর হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সকল উপন্যাসই কেমন এক ছাঁচে ঢালা;- তাঁহার নানাচাতুর্য্যময় উপকথার স্রোত কেমন একই ভাবে প্রবহমান—

"অবিরাম-গতি নদী বাধা নাহি মানে।
বিরাম যে কি তা' নদী কভু নাহি জানে॥"

মডেল ভগিনী, কালাচাদ, চিনিবাস, বাঙ্গালীচরিত—সকলেরই কেমন একই ভাব, একই ভাষা, একই ছন্দ, একই ছাঁচ। আখ্যায়িকার কথঞ্চিৎ রূপান্তর থাকিলেও, সকলগুলি কেমন একই উপাদানে সংগঠিত। উহাদিগের মধ্যে যে কোন একখানি গ্রন্থ পড়িলেই সকলগুলি পাঠ করার ফল পাওয়া যায়। সংক্ষেপতঃ, ইংরাজি সাহিত্যে Reynolds উপন্যাসকারের যে আসন লাভ করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে "রাধানাথ"-রচয়িতাও সেই আসনের যোগ্য। আমরা জন্মভূমির অঙ্গে তাঁহার হস্তপ্রসূত দুই এক খান Ivanhoe, Kenilworth বা Adam Bede এর ন্যায় নবন্যাস দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি একজন সুরসিক, সন্দেহ নাই; কিন্তু অনেকস্থলে 'কবিবর' রাজকৃষ্ণের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'-গত যণ্ডামার্কের ন্যায় রস গড়াইয়া যায়। পাশ্চাত্য রসিকেরা বলেন—

"Brevity is the soul of wit"

কথাটা, বোধ করি, আমাদিগের প্রাচ্য রসিকেরাও বড় অগ্রাহ্য করিতে পারেন না; 'রাধানাথে' কিন্তু brevity অপেক্ষা Tantologyই অধিক—এক "দাড়িম্বদশনী দেবী"র নামকরণ অধ্যায়েই চূড়ান্ত নিদর্শন লক্ষিত হইবে।

'বেদান্ত-দর্শন' আমাদিগের জন্মভূমির উপাদেয় সৃষ্টি। "জীব ব্রহ্মের ঐক্য" প্রতিপাদন, "যাগ যজ্ঞাদি ও শম দমাদির প্রয়োজনীয়তা" নির্দ্ধারণ, "জীবন্মুক্তি ও নির্ব্বাণ মুক্তির স্বরূপ" নির্ণয়, "পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতি-সমন্বয় প্রভৃতি 'গভীর বিষয়' সকল জ্ঞান-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেরই জ্ঞাতব্য। আমাদিগের উল্লিখিত মহান্ তত্ব সকল "ধারণা করিবার উপযুক্ত শক্তি না থাকিলেও" ব্যাখ্যাকার স্বীয় যথাশক্তিতে উহার যেরূপ ব্যাখ্যা করিবেন, আমরাও যথাশক্তি তাহা বুঝিতে ও তাঁহার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব। আমরা সংসারের কীট, আমাদিগের সকল কার্য্যই প্রায় বিড়ম্বনাময়; এরূপ অবস্থায়, সংসারের সারতত্ব বুঝিতে গিয়া 'বিড়ম্বনা' ভোগ করাও অবাঞ্ছনীয় নহে। এই বেদান্তদর্শনই নব-প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের অস্থি মজ্জা-প্রাণ; অন্ততঃ ব্রহ্মবাদীরা ইহাই বলিয়া থাকেন। "পরস্পর-বিরুদ্ধ শ্রুতি-সমন্বয়"ই যখন সেই বেদান্তদর্শনের অন্যতম প্রতিপাদ্য, তখন 'জন্মভূমিস্থ' 'বেদান্তদর্শন' দ্বারা আধুনিক হিন্দু ও ব্রাহ্মদলের পরস্পর বিরুদ্ধ মত-সমন্বয় দেখিতে পাইলে আমরা পরম সুখী

হইব,-'জন্মভূমি'রও মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে।

'পঙ্গপাল' ও 'ভারতে সুবর্ণ'—উভয়ই বঙ্গের বর্ত্তমান সাময়িক প্রসঙ্গ এবং তত্তৎ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞদিগের দ্বারা তাহা সুচারুরূপে আলোচিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন করা আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতা।

পরিশেষে, পুনরায় বলিতেছি, 'জন্মভূমি'র যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই আমরা আপন জ্ঞান ও বুদ্ধিমতে এবং কর্ত্তব্যানুরোধে উহার দোষ-গুণের আলোচনা করিলাম। কোন কথা অপ্রীতিকর বোধ হইলে, উহার অনুষ্ঠাতাগণ আমাদিগের প্রতি যেন কোনরূপে বিরূপ না হয়েন, ইহাই আমাদিগের বিনম্র প্রার্থনা।

শ্রীপাচকড়ি ঘোষ।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩০৮। মীন যেমন তড়াগাদির জলে জীবিত থাকে, মানবাত্মা সেইরূপ ব্রহ্ম-সত্বা-সাগরের সলিলে জীবিত থাকে। মীনের পক্ষে জল যেমন জীবন, আমাদিগের নিত্য প্রাণের পক্ষে সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ-সাগরে প্রবাহ জীবন। আমরা সেই আনন্দ সাগরে যতই মগ্ন হই, ততই স্ফূর্ত্তি, বল, বীর্য্য ও পবিত্রতা লাভ করি।

৩০৯। সর্ব্বদা নিজ মঙ্গলের জন্য আপনার ছিদ্রান্বেষণ কর, কখন পরছিদ্রান্বেষী হইওনা। যখন কাহার বাক্যে, বা ব্যবহারে তোমার মনঃকষ্ট হইবে, তখন দেখিও, তুমি নিজে কতদূর তাহার কারণ। যদি তোমার বিবেক বলে, তুমি নির্দ্দোষী, তবে তুমি প্রসন্ন চিত্তে তোমার কষ্টদানকারী ব্যক্তির দোষ ক্ষালন্ জন্য মঙ্গলময়ের মঙ্গল পূর্ণ চরণে প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইবে, তাহার প্রতি ক্রোধ দৃষ্টিপাত করিলে তোমার জীবন পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে।

৩১০। সকল কার্য্য কর্ত্তব্য জ্ঞানানুরোধে নিষ্কাম মনে মঙ্গলময়ের মঙ্গলপূর্ণ কৃপার উপর নির্ভর করিয়া সম্পাদন করিবে। সৎক্রিয়ার ফল প্রত্যাশা করিলে স্বার্থপরতা দোষে দূষিত হইতে হইবে।

৩১১। ১১ই মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন হইতেছে। আনন্দের স্রোত বহিতেছে। নহবৎ বাজিতেছে। মনে হইল, আত্মা পরমাত্মার সহিত উদ্বাহ সূত্রে বদ্ধ হইবে। পতিপ্রাণা সতীর ন্যায় সে তাঁহারই মঙ্গলপূর্ণ চরণাশ্রয়ে অবিচ্ছেদে নিত্যকাল বাস করিয়া তাঁহারই সেবা করিবে, ও তাঁহারই আনন্দ, অমৃত, শান্তি, মঙ্গল, পবিত্রতা ও শোভাদি কতই নিত্য সুখভোগ করিতে থাকিবে। ইহারি জন্য এত আনন্দোৎসব, ইহারি জন্য এত বাদ্য বাদন, এত নাম সঙ্কীর্ত্তন।

৩১২। কোন আত্মীয়ের মাতৃ আদ্য-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিয়ম ভঙ্গদিনে ও তাহার পূর্ব্বে তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া আমি তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আজ আপনার জীবনের একটী বিশেষ দিন, এরূপ দিন আর আপনার হইবেনা। যাহার বিয়োগে এক মাসকাল অশুচি থাকিয়া শুচি হইবার এই শেষ দিনে তাঁহাকে মঙ্গল-ময়ী জগজ্জননী তাঁহার মঙ্গলপূর্ণ চরণে স্থান দান করিয়া আমার গৃহে অন্নপূর্ণারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আজ তিনি আপ-নাদিগকে অন্নদান ও পরিবেষণ করিতেছেন। আজ তিনি আপনাদিগকে তাঁহার নিষ্ক-লঙ্ক পবিত্রতা এবং অমোঘ আশীর্ব্বাদ দান করিতেছেন। আজ আপনি নিজ পরিবারসহ পবিত্রতা ভোগ করুন। আপনাকে অন্ততঃ এক বৎসর কাল পবিত্র ভাবে চলিতে হইবে। আপনার সদ্ব্যবহার যেন আপনার প্রিয়া ভার্য্যা ও প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রদ্বয় অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যে সৎপুত্র তাহার পিতৃ বা মাতৃ বিয়োগে এক বৎসরকাল শুদ্ধাচারে অতিবাহন করিতে পারেন, তিনি তাঁহার সেই দীর্ঘ ব্যাপী অভ্যাসের বলে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনে হয়ত সেই পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। কি চমৎকার ঋষিদিগের এই বিধি। ইহা কেমন জ্ঞানগর্ভ ও মধু-ময় ফলোৎপাদক।

৩১৩। পাপ কখন পাপ দ্বারা বিনষ্ট হয় না। পুণ্যই পাপের বিনাশক। তুমি যখনই কাম ও ক্রোধ, ভোগাদি দ্বারা উত্তে-জিত বা আক্রান্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে অনন্যগতিতে পবিত্রস্বরূপের স্মরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট নীরবে পুণ্যবলের জন্য প্রার্থনা করিবে। তাহার পর তোমার মনঃপ্রাণ প্রশান্ত হইলে, তুমি যথোচিত ব্যবহারে সমর্থ হইবে। তুমি কিছুদিন এই রূপে আপনাকে শাসন করিবার অভ্যাস করিলে, পুণ্যপথে পাদচারণা করিতে সমর্থ হইবে। তোমার সেই উন্নত ধর্ম্মজীবন হৃদয়ঙ্গম করিবে যে, পুণ্যই পাপের একমাত্র বিনাশক।

৩১৪। সত্যস্বরূপের যে সকল সত্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে বা হইবে, তাহা অবিনশ্বর, আর মানবীয় ক্ষীণতা দোষে যে সকল তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী অসত্য তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে বা করিবে, তাহা নিশ্চয়ই নশ্বর। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যেন এই নিত্য নিয়ম বিস্মৃত না হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলোন্নতি সাধনে যত্নবান থাকেন।

৩১৫। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা মতে কোন একটী ঔষধের যতই সারভাগ গ্রহন করা যায় (অর্থাৎ আটেনিউএসন (Attenuation) প্রক্রিয়া সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই সেই ঔষধের অসার ভাগ হইতে বিযুক্ত হইয়া তাহার সারাংশ প্রকাশিত হয়, ততই তাহার সূক্ষ্মতা ও বল বাড়িতে থাকে। সেইরূপ মানবাত্মা যতই ধর্ম্ম সাধনরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বিমল হইতে থাকে, (অর্থাৎ তাহার পাপ, তাপ, শোক, সন্তাপ, কামনা, বাসনা, পাশববৃত্তি, অভিমান, অহঙ্কার, আত্মাদর, অহংজ্ঞান, অজ্ঞানতা প্রভৃতি অসার ও স্থূলভাগ বিনষ্ট হয়, ততই সে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া নূতন হইতে নূতনতর বল বীর্য্য লাভ করিতে থাকে।

৩১৬। পিতা গো! পাপেতাপে সদা

আমি মরি জ্বলেপুড়ে। আমায় রাখ রাখ মা গো! তোমার অভয় ক্রোড়ে।

৩১৭। এই বঙ্গদেশে প্রত্যেক নূতন বৎসর আসিবার সময়ে তরুরাজী কেমন মনোহর নূতন বেশ ধারণ করিয়া প্রকৃতিনাথের মহিমা প্রকাশ করিতে থাকে। তাহাদিগের পুরাতন শ্রীহীন বেশ কালসাগরে পতিত হইয়া আধিভৌতিক পদার্থের পুষ্টি সাধন করে। মানব! তুমি কেন না বৃক্ষাদির সে দৃষ্টান্ত অনুকরণ কর। তোমার আত্মার পাপরূপ পুরাতন বেশ কালসাগরে নিক্ষেপ করিয়া তুমি পূণ্যরূপ নব বেশে শোভিত হইয়া নূতন বৎসরে প্রাণেশ্বরের পূজারম্ভ কর! পাদপাদির শিক্ষা অবহেলা করিও না।

৩১৮। সুচতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহাতে যে কিছু সদ্‌গুণ দেখিতে পান, তিনি তাহারই সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। তিনি জানেন যে, একাধারে সকল গুণ থাকে না। তাই তিনি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে গুণের তারতম্য দেখিয়া যাহাতে প্রত্যাশিত গুণের অল্পতা বা অভাব রহিয়াছে, তাঁহাকে তজ্জন্য তাচ্ছল্য করেন না। ভক্ত কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না।

৩১৯। জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করিবার জন্যই বিদ্যা, জ্ঞানও ধর্ম্মচর্চ্চার প্রয়োজন। যে বিদ্যা, জ্ঞান বা ধর্ম্মালোচনায় ঐ আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ না হয়, তাহা বৃথা।

৩২০। একজন চিন্তাশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অল্প পুস্তক পাঠ বা বিদ্যালাভ করিয়া যেরূপ সত্যাবধারণে ও আপনার পবিত্রতা ও উন্নতি সাধনে সমর্থ হন, সেরূপ উৎকৃষ্ট ফল লাভে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া স্থূল বুদ্ধিদোষে দূষিত লোক কখনই সমর্থ হয় না। তাহার জীবন বলদের মত কেবল পুস্তকের বোঝা বাহক হয়। অতএব বেশী পুস্তক পাঠ না করিয়া অধিকতর চিন্তাশীল হও।

৩২১। বহুদর্শিতাজনিত জীবনলব্ধ-জ্ঞান, কেবল পুস্তক পাঠ নিবন্ধন জ্ঞানাপেক্ষা অধিকতর আদরনীয় ও নির্ভর করিবার যোগ্য। এই জন্য বৃদ্ধেরা নানা শাস্ত্র নানা বিদ্যা-বিশারদ না হইলেও তাঁহাদিগের বচন শ্রদ্ধার সহিত গ্রাহ্য হয়। পঞ্চাশৎ বৎসরাধিক না হইলে প্রথমোক্ত জ্ঞান লাভ হয় না।

৩২২। একাধারে সদিচ্ছা ও তাহা পূর্ণ করিবার যথাবশ্যক অর্থ থাকিলে মধুময় ফলোৎপাদন হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সদিচ্ছার বিরোধী আধারে তাহা পূর্ণ করিবার অর্থবল থাকিলে, বিবাদ বিপ্লবাদি উপস্থিত হইয়া অমৃতের পরিবর্ত্তে গরল উঠিতে থাকে! পরস্পর-বিরোধী দুই শক্তির সংঘর্ষণে দুঃখ বই সুখ হয়না। কিন্তু মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে দুঃখ অধিক দিন থাকে না। ঐ দুই শক্তির মধ্যে একের জয় অবশেষে হইয়া দুঃখ দূর হয়।

৩২৩। পবিত্রস্বরূপের যতই পবিত্র সহবাস ভোগ, যতই তাঁহার কৃপাবর্ষণ, যতই তাঁহার উপর নির্ভরতা, ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পাপের প্রকাশ। সেই অপাপবিদ্ধ, পূর্ণ ও অভ্রান্ত স্বরূপ বিনা ঈদৃশ পাপ সকল দেখাইবার কোন পতনশীল ভ্রান্ত ও অপূর্ণ মানুষের সাধ্য নাই। ইহা ভক্ত জীবনের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত।

৩২৪। যতই পাপ, ততই পিতা পুত্রে বিচ্ছেদ। যে পরিমাণে পাপের অবসান ও পুণ্যের উদয়, সেই পরিমাণে পিতৃ চরণে পুত্রের পুনঃ সম্মিলন। আমরা এইরূপে

নিত্য পিতৃ মাতৃ মঙ্গলপূর্ণ চরণে পুনঃ সম্মিলিত হইতে থাকি।

৩২৫। মানুষ কেবল শুষ্ক জ্ঞানবলে স্থূল স্থূল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা, তাঁহার পবিত্র সহবাস ও ভক্তিরসার্দ্র জ্ঞান অভ্যাস বিনা সে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাপ হইতে মুক্তলাভ করিতে পারে না।

৩২৬। যাহার ভিতর যত পাপাসক্তি, ক্রোধের সময় তাহার ভাষা তত ইতর, কটু, অশ্রাব্য ও অপবিত্র হয়।

৩২৭। বিশেষ কারণ না পাইয়া কাহারও চরিত্রে নীচাশয়তা আরোপ করাই নীচাশয়তা। উদার প্রেমিক ভক্ত সন্তোষজনক কারণ অবগত হইলে অপরের প্রতি ক্ষুব্ধ চিত্তে দোষারোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণমনা ও নিতান্ত স্বার্থপর লোকেরাই ইহার বিপরীত আচরণ করে।

৩২৮। লোক সচরাচর নীচ নিম্ন-বৃত্তিরই অধীন হইয়া চলে। অত্যল্প ধার্ম্মিক-গণ ধর্ম্ম বৃত্তির উত্তেজনায় আপনাদিগকে পরিচালিত করেন। সদ্‌বুদ্ধিই ধর্ম্মবৃত্তি। নীচ বিষয়, বুদ্ধি অসদ্‌বুদ্ধির নামান্তর। ইহার বশম্বদ হইয়া কেহই ঔদার্য্য বিশুদ্ধ প্রেম ও সরলতার ভাবগতিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না।

৩২৯। সজনে ব্রহ্মোপাসনা করিবার সময় নিমীলিত নেত্রে মানস চক্ষু দ্বারা দেখিতে হইবে যে, আমি কতগুলি অশরিরী, নিত্য-জ্ঞান-প্রেমধারী ব্রাহ্মসন্তানের সঙ্গে এক প্রাণে প্রাণেশ্বরের মঙ্গলমূর্ত্তি চরণ ভক্তি ও প্রেম-বিগলিত হৃদয়ে পূজা করিতেছি, তাঁহার স্মরণ, মনন, গুণকীর্ত্তন ও তাঁহার নিকট কাতরে সকলের মঙ্গল ও পবিত্রতা লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছি। এইরূপে সজনে উপাসনা না করিলে আমাদিগের জীবন কখনই প্রশান্ত, পবিত্র ও উন্নত হইবেনা, আমরা পরম পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার অমৃতময় ফল লাভে নিশ্চয়ই সমর্থ হইব না, এজন্য আমাদিগকে নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া অনন্যমনা হইয়া স্থিরচিত্তে একাগ্র ভক্তি সহকারে ব্রহ্মোপাসনা করিবার অভ্যাস করিতে হইবে।

৩৩০। যে পাপের জীবনের উপর জয়-লাভ করিয়াছে, সেই বীর।

শ্রীকানাইলাল পাইন।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈদিক যুগ।

আর্য্য হিন্দুদিগের ভারতবর্ষে আবাস।

আর্য্যজাতির আদিনিবাস কোথায় ছিল, সে বিষয়ে বিদ্বমণ্ডলী মধ্যে অশেষ তর্কবিতর্ক হইয়া গিয়াছে, এখনও হইতেছে। ভারত-বর্ষের সীমার বাহিরে আর্য্যজাতির উৎপত্তি, হিন্দু পণ্ডিতগণ একথা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহেন। আর অনেক ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত বাল্টিক সমুদ্রের তীর-বর্ত্তী দেশ আর্য্যদের আদিম উৎপত্তিস্থান

বলিয়া প্রমাণ করিতে বড়ই ব্যস্ত। এই বিষম তর্কের মীমাংসা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; তবে আমরা এইমাত্র বলিতেপারি যে, অধিকাংশ পণ্ডিতের মত এই যে, মধ্য আসিয়াই আর্য্যজাতির আদি নিবাস-ভূমি ছিল।

যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া, পণ্ডিতেরা শেষোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা ভট্ট মোক্ষমূলরের অধুনাতন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথমতঃ, আর্য্য জাতিদিগের দুইটী প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী ভারতবর্ষাভিমুখে, অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে এবং আর একটী ইয়ুরোপের অভিমুখে অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম দিকে। এই দুইটি প্রবাহের সংযোগস্থল, আসিয়া মহাদেশ।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনতম কালের সভ্য-দেশ সমূহ আসিয়া খণ্ডেই অবস্থিত। আর্য্য ভাষা সমূহের মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। সুতরাং আসিয়াখণ্ডের মধ্যে, এবং ঋগ্বেদের জন্ম-স্থান পঞ্জাব প্রদেশ হইতে অনতিদূরে কোনও প্রদেশে আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান হওয়াই সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মধ্য আসিয়া হইতে বার বার অনেক পরাক্রান্ত জাতি উদ্ভূত হইয়া ইয়ুরোপ মহাদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর হূনজাতি ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোগল জাতি তাহার উদাহরণ স্থল। অতএব, প্রাচীন কালেও আর্য্যগণ মধ্য আসিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়া ইয়ুরোপ বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থতঃ, যদি ইয়ুরোপ, বিশেষতঃ স্কাণ্ডানেভিয়া হইতে আর্য্য জাতির উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, আর্য্য ভাষাসমূহে সমুদ্র সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক সাধারণ শব্দ পাওয়া যাইত। এই সকল ভাষায় পশু-বিশেষ বা পক্ষিবিশেষের সাধারণ নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল ভাষায় সমুদ্র বা জলচর জীবের সাধারণ নাম পাওয়া যায় না।

আর্য্যভাষা সমূহে যে সকল সাধারণ শব্দ আছে, তাহার অর্থসংগ্রহ করিয়া, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আদিম আর্য্যজাতির অবস্থার অনেক কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতির সেরূপ কোনও চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা পাইব না। তবে বিভিন্ন পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক আর্য্য জাতি সম্বন্ধায় যে সকল কথা অবিসংবাদিত রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

আধুনিক আর্য্য সমাজে পিতা যেরূপ পরিবারের ভিত্তিস্বরূপ, প্রাচীন আর্য্য-সমাজেও সেইরূপ ছিল। অন্যান্য প্রাচীন জাতির মধ্যে পিতৃপুরুষ উল্লঙ্ঘন করিয়া মাতা হইতে বংশের পরিচয় দিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়; অথবা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব পুরুষ অনুক্রমে নির্ণীত না হইয়া নারী অনুক্রমে নির্ণীত হয়, এবং বিবাহ প্রণালীর শৈথিল্যের অন্যান্য প্রমাণও পাওয়া যায়। আর্য্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-গণ আর্য্য জাতির ইতিহাসে এইরূপ কোনও পদ্ধতির অস্তিত্ব দেখিতে পাইবেন না। পরন্তু, আর্য্য সমাজে পিতা গৃহের পাতা ও ভরণকর্ত্তা; মাতা স্নেহময়ী, গৃহিনী ও পালয়িত্রী। দুহিতা গাভী

দোগ্ধ্রী; বিবাহ সমাজের বন্ধন রজ্জু।

আদিম আর্য্যদিগের মধ্যে অনেক প্রকার বন্য ও পালিত পশু পরিচিত ছিল। গাভী, ষণ্ড, বলদ, মেষ, ছাগ, শূকর, অশ্ব, বৃক, শশক, হংস, কাক, বর্ত্তিকা ও পেচক প্রভৃতি পশু পক্ষীর সাধারণ নাম আর্য্য-ভাষাসমূহে পাওয়া যায়। (যথা গো=Cow; উক্ষ=ox ইত্যাদি।

আদিম আর্য্যগণ নানা রূপ শিল্প কার্য্যেরও কিছু কিছু জানিতেন, তাহার প্রমাণও আর্য্য ভাষা সমূহে পাওয়া যায়। গৃহ ও নগর নির্ম্মাণ, জল পথে গমনা গমনের জন্য নৌকানির্ম্মাণ এবং সামান্য রূপ বাণিজ্য পদ্ধতি আর্য্য-দিগের পরিচিত ছিল। তাঁহারা সেচন ও বয়ন কবিতে জানিতেন ও পশুলোম ও চর্ম্ম হইতে পরি-ধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন। সূত্রধরের ব্যবসায়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, এবং বস্ত্রাদি ধৌত ও রঞ্জিত করিবার প্রণালীও আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বলা বাহুল্য যে, আদিম আর্য্যেরা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেন। কৃষিকার্য্য হইতেই, তাঁহাদের কর্ষক-ধাত্যর্থ-মূলক আর্য্য নাম হইয়া থাকিবে। লাঙ্গল, শকট প্রভৃতি কৃষিকার্য্যের উপকরণ সমূহের সাধারণ নাম আর্য্য ভাষা সমূহে পাওয়া যায়। অতএব, এই উপকরণগুলি, আদিম আর্য্য জাতির পরিচিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যবাদি পেষণ করিয়া তাহা রন্ধন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। পালিত গো মেষাদি হইতে দুগ্ধ ও মাংসের সংস্থান হইত। কৃষি কার্য্যই অধিকাংশ লোকের জীবিকা ছিল বটে, তথাপি, অনেকেই কৃষকের অনেকে কৃষকের ন্যায় এক স্থানে না থাকিয়া, গো মেষাদি সহ, দেশ দেশান্তরে নূতন ও উর্ব্বর চারণ ভূমির উদ্দেশে ভ্রমণ করিতেন।

তাদৃশ প্রাচীন সময়ে, সচরাচর প্রায়ই যুদ্ধ ঘটিত। তখন, যুদ্ধ কালে অস্থি, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহৃত হইত। ধনুর্ব্বাণ, খড়্গ, ও বল্লভ যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল।

প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অতএব স্পষ্টই বোধ হয়, তাঁহারা সভ্যতার কতকটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। অয়স্-নামে আর একটী ধাতুও আর্য্যদিগের পরিচিত ছিল। প্রাচীন আর্য্য ভাষায় "অয়স্" লৌহ কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তৎ কালে কিরূপ শাসন প্রণালী প্রচ-লিত ছিল, তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। সমাজে বৃদ্ধ ও অগ্রণী ব্যক্তিদের যে বিশেষ প্রাধান্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধা-রণ লোকেরা, তাঁহাদিগেকে "পতি" অর্থাৎ পালন কর্ত্তা, "বিশ্‌পতি" অর্থাৎ লোক-পালক, এবং "রাজা" অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রভু বলিয়া মানিত। সভ্য মনুষ্যের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে ন্যায় অন্যায়ের বিচার চলিত এবং প্রচলিত আচার ও স্বজাতির মঙ্গলের বিরুদ্ধ কার্য্য অবিধি বলিয়া গণ্য হইত।

প্রকৃতির সুন্দর ও বিস্ময়কর পদার্থ দেখিয়া আর্য্য জাতির সরল হৃদয়ে যে স্বাভা-বিক ভাবের সঞ্চার হইত তাহা হইতেই তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময় আকাশ (দ্যৌঃ) তাঁহাদের চির বিস্ময় ও উপাসনার বিষয় ছিল। সূর্য্য, ঊষা, অগ্নি, পৃথিবী, বাত্যা, মেঘ, বজ্র, তাঁহারা এ সকলেরই উপাসনা করিতেন

ধর্ম্ম ভাব তখন অতি সরল ও অকপট ছিল। দেবতাদের সম্বন্ধে পুরাণ ও ইতিহাস এবং তাঁহাদের বৈবাহিক সম্পর্কাদি তখনও কল্পিত হয় নাই। যাগযজ্ঞের আড়ম্বর তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আর্য্যজাতি সমূহের তেজস্বী পিতৃপুরুষেরা, প্রকৃতির সুন্দর ও বিস্ময়কর প্রাকৃতিক কার্য্য পরম্পরাকেই স্বাভাবিক ভক্তিসহকারে সম্মান করিতেন, কৃতজ্ঞ ও উৎসাহিত চিত্তে তাঁহাদের স্তুতি করিতেন।

আর্য্যেরা, আহার্য্য, গোচরভূমি, ও অভিনব রাজ্য লোভে দলে দলে আদিম গৃহ পরিত্যাগ করিতেন। আর্য্যজাতি সমূহের পিতৃপুরুষেরা, কত অগ্রে বা কত পরে, এইরূপে আদি স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি অবধারিত হয় নাই, এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই। বোধ হয়, আর্য্যেরা প্রথমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া, এক দল ইউরোপ এবং অন্য দল দক্ষিণ আসিয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। এই বিচ্ছেদের পর, আর তাঁহাদের দুই দলের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই। ইউরোপ-যাত্রী আর্য্যেরা পাঁচ জাতিতে বিভক্ত হইয়া, ইউরোপের পাঁচ অংশে অধিকার স্থাপন করিলেন। কিন্তু কোন্ জাতি কখন্ এইরূপে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। কেল্ট জাতীয়েরা, স্বেচ্ছায় হউক বা টিউটন্ প্রভৃতি জাতির তাড়নায় হউক, ফরাসি, আয়র্লণ্ড, ব্রিটেন এবং বেলজিয়ম অর্থাৎ ইউরোপের পাশ্চাত্যতম দেশ সমূহে বাসস্থাপন করিলেন। টিউটন্ জাতীয়েরা মধ্য ইউরোপে বাস করিলেন এবং রোম রাজ্য পতনের পর সমগ্র ইউরোপ জয় করিবার চেষ্টা করিলেন।

দক্ষিণ আসিয়া-যাত্রী আর্য্যেরা দক্ষিণ দিকে চলিয়া, সপ্ত সিন্ধু বা পঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিলেন। হিন্দু ও ইরানি (পার্সি) জাতি তখনও এক সঙ্গে ছিলেন। দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখী আর্য্যেরা সপ্তসিন্ধু দেশে আসিয়া, সংস্কৃত ও জেন্দ, এই দুই ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন কোনও এক সাধারণ ভাষার ব্যবহার করিতেন। তদনন্তর ধর্ম্ম বিষয়ে বিবাদ হওয়াতে, তাঁহারা দুই স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত হইলেন। 'দেবোপাসক' হিন্দুরা পঞ্জাবে রহিলেন, আর 'অসুরোপাসক' ইরাণীয়েরা পারস্যে গমন করিলেন। *

এই দেবোপাসক হিন্দু আর্য্যেরাই জগদ্বিখ্যাত ঋগ্বেদের প্রণেতা। মানব জাতির যত গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে ঋগ্বেদের ন্যায়, কৌতূহলোদ্দীপক ও উপদেশজনক গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। কেবল আর্য্য জাতি সমূহের প্রাচীনতম আচার প্রণালীর এবং অধুনাতন লৌকিক প্রবাদাদির মূল বলিয়াই যে ঋগ্বেদের এরূপ সম্মান, তাহা নহে।

ঋগ্বেদের সমাদর লাভের এতদপেক্ষা অনেক গুরুতর কারণ আছে। মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস-লেখক, এই ঋগ্বেদে মনুষ্যের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের কারণ দেখিতে পাইবেন। কেবল মাত্র এক বেদ পাঠেই জানা যায়, কিরূপে মনুষ্য-হৃদয় সর্ব্ব প্রথমে প্রকৃতির সমুজ্জ্বল ও জ্যোতির্ম্ময়, শক্তিশালী ও বিস্ময়কর

* অনেকে বলেন, সিন্ধুনদে আগমন করিবার পূর্ব্বেই হিন্দু ও ইরাণীদের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক মতভেদ উপলক্ষে মনোবাদ জন্মে। এবং হিন্দুরা ইরাণীদের কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পঞ্চনদে প্রবেশ করেন। মহাপণ্ডিত শ্রীযুত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের এই মত।

ক্রীয়ার স্তব স্তুতি করে। ব্যাধি ও বিপত্তি-ভয়ে দুর্ভাগ্য জাতিদের ধর্ম্মের উৎপত্তি। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় দ্যৌঃ, লজ্জাবতী ঊষা, উদীয়মান সূর্য্য, জাজ্জ্বল্যমান অগ্নি, প্রকৃতির উজ্জ্বল ও চিত্তমুগ্ধকর পদার্থপুঞ্জ নয়নগোচর করিয়া, আর্য্যদের সরল হৃদয়ে গভীর ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা-ব্যঞ্জক স্তুতি, ও সাধুবাদ-পূর্ণ গাথা সকল আপনি যেন তাঁহাদের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। সেই হৃদয়-নিঃসৃত গাথাই ঋগ্বেদ-সংহিতা।

কিন্তু ঋগ্বেদের সমাদর ও গৌরবের আরও বিশিষ্ট কারণ রহিয়াছে। কি প্রকারে মানব হৃদয়ে, প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির নিয়ন্তা ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মে, ঋগ্বেদ তাহার প্রমাণ স্বরূপ। কারণ ঋগ্বেদের ঋষিরা, অনেক সময়ে প্রাকৃতিক বস্তুর স্তব করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। তাঁহারা চিন্তাশক্তির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া, সূর্য্য, আকাশ, বাত্যা, বজ্র,—সকলই এক অজ্ঞেয় পরমেশ্বরের প্রকাশ চিহ্ন মাত্র, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের শেষাংশের অনেক মন্ত্রে এই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

যদি সমস্ত মানবজাতির নিকট ঋগ্বেদের এত আদর হয়, তবে আর্য্যজাতি সমূহের নিকট ইহার মূল্য যে কত অধিক, তাহার পরিমাণ করা দুষ্কর। ঋগ্বেদ আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ। আর্য্যেরা পৃথিবীর নানা স্থানে যে সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা প্রাচীনতম, ঋগ্বেদে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। আর্য্যজাতি সমূহের প্রাচীনতম দেবদিগের নাম এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের Zeus, রোমকদিগের Jupiter, টিউটনদিগের Tiu, ঋগ্বেদের দ্যৌঃ ভিন্ন আর কেহ নহেন। Uranos ঋগ্বেদের বরুণ, Daphne ঋগ্বেদের দহনা অর্থাৎ ঊষা, Prometheus ঋগ্বেদের প্রমন্থ অর্থাৎ অগ্নি।

হিন্দুদের নিকট ঋগ্বেদসংহিতা মহা আদরের গ্রন্থ। ঋগ্বেদে আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা রহিয়াছে, কি প্রকারে দেবতাগণ ও তাঁহাদিগের উপাখ্যান আখ্যায়িকা প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে, ঋগ্বেদ পাঠে এ সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে। অতি প্রাচীনতম সময় হইতে অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির মানসিক ভাবের বৃত্তান্ত, ঋগ্বেদ না পড়িলে, বুঝিতে পারা যায় না। উদয়কালীন, মধ্যাহ্ন ও অস্তগামী সূর্য্যই পুরাণে বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের বজ্র পুরাণে মহেশ্বর রূপ ধারণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ধর্ম্ম স্তোত্র পুরাণে ব্রহ্মা রূপ ধারণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, রাম ও কৃষ্ণ, দুর্গা ও লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্ত্তিক, এই সকল দেবতার উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই।

কেবল আধ্যাত্মিক কেন, ঋগ্বেদ পাঠে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ও অনেক জানিতে পারি। ঋগ্বেদে হিন্দুসমাজের যেরূপ চিত্র রহিয়াছে, তাহাতে জাতিভেদ ছিল না, বিধবার পুনর্ব্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুর পিঞ্জরচারিণী ছিলেন না, ও তাঁহারা বাল্যাবস্থায় বিবাহ করিতেন না।

ঋগ্বেদে ১০২৮ সূক্ত ও দশ সহস্র ঋক্‌। যে প্রাকৃতিক দেবতাদের উদ্দেশে সূক্ত[illegible]লি রচিত হইয়াছে, তাঁহাদের সবিশেষ বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

স্তুতি-মন্ত্রগুলি প্রায়ই অতি সরল। মন্ত্র-প্রণেতারা যজ্ঞ করিয়া সোমরস প্রদান করিতেন এবং গাভী ও ধন জনাদি বৃদ্ধির আশায় এবং কৃষ্ণত্বক্ দাসদিগের জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতেন। এই সকল প্রার্থনায়, দেবতাদের প্রতি, মন্ত্র-প্রণেতাদের সরল ও অকপট বিশ্বাসের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের মন্ত্র দশ মণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম ও দশম মণ্ডল ভিন্ন অপর আট মণ্ডল আট জন ঋষির রচিত। একজন ঋষি বলিতে বোধ হয়, সেই ঋষির বংশীয় ব্যক্তি অথবা তদনুসারী শিষ্যপরম্পরা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রণেতা গৃৎসমদ। এই গৃৎসমদ ও শৌনক একই ব্যক্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃতীয় মণ্ডলের প্রণেতা বিশ্বামিত্র; চতুর্থ মণ্ডলের প্রণেতা বামদেব; পঞ্চম মণ্ডলের প্রণেতা অত্রি; ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রণেতা ভরদ্বাজ; সপ্তম মণ্ডলের প্রণেতা বশিষ্ঠ; অষ্টম মণ্ডলের প্রণেতা অঙ্গিরা। প্রথম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত; দশম মণ্ডলেও ১৯১ সূক্ত। ইহা নানা কাল্পনিক ঋষির প্রণীত বলিয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে।

মন্ত্রের ভাষা ও অন্যান্য বিষয় বিচার করিয়া তাহাদিগকে প্রাচীন ও অপ্রাচীন, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সে চেষ্টা যে কখনও ফলবতী হইবে, তাহা বোধ হয় না। তথাপি ঋগ্বেদের পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন যে, দশম মণ্ডল অপর নয় মণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা যেন ঋগ্বেদের পরিশিষ্টস্বরূপ। দশম মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তই অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন। এই সকল সূক্তে চিন্তাশক্তির বিকাশ ও উন্নতি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অতি জটিল অবস্থায় পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল সূক্তে পরলোকের বর্ণনা, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার মন্ত্র এবং সকল দেবতার দেবতা একমাত্র পরব্রহ্মের আভাস রহিয়াছে।

রোগ প্রতীকারের উদ্দেশে রচিত যে সকল মন্ত্র রহিয়াছে, তাহা অপ্রাচীন। অথর্ব্ব বেদ যে ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন নয়, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অথর্ব্ব বেদে এরূপ মন্ত্র অনেক আছে। আবার দশম মণ্ডলের অনেক মন্ত্রের প্রণেতা স্ব স্ব নাম গুপ্ত রাখিয়া মন্ত্রগুলি দেবতাদের নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদের রচিত বলিলে এই সকল মন্ত্র প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে, বোধ হয় এইরূপ অভিপ্রায়।

ঋগ্বেদের মন্ত্র সকল আবহমানকাল পুত্র পৌত্রাদিক্রমে অথবা গুরু শিষ্যপরম্পরায় শ্রবণমাত্রে আবদ্ধ ছিল। যে সময় মন্ত্রগুলি মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হয়, সেই সময়ে দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে, সেই সময়েই তাহা সংগৃহীত ঋগ্বেদের শেষভাগে সংযুক্ত হইয়া যায়।

ঋগ্বেদের সংগ্রহকার্য্য দ্বিতীয় যুগে সমাপ্ত হইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় যুগের অবসান হইবার পূর্ব্বেই, ঋগ্বেদের সূক্ত, ঋক্, পদ ও অক্ষর পর্য্যন্তের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ঋক্ সংখ্যা ১০,৪০২ অথবা ১০৬২২। পদসংখ্যা ১৫৩, ৮২৬ এবং অক্ষর সংখ্যা ৪৩২০০০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষি, গোচারণ ও বাণিজ্য।

অধুনাতন হিন্দুদের ন্যায় প্রাচীন হিন্দুদেরও কৃষিকার্য্যই প্রধান জীবিকা ছিল।

ঋগ্বেদেও ভূয়োভূয়ঃ তাহার উল্লেখ করিয়াছে। যে আর্য্যশব্দে হিন্দুদের পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগকে দাস ও আদিম নিবাসী হইতে শ্রেয়ান্ বলিয়া পরিচয় দিতেন; সেই শব্দ কর্ষণ-বোধক ধাতু হইতে উৎপন্ন; ইরাণ্ বা পারস্য হইতে এরিণ্ বা আয়র্লণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যভূমে এই শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য্যশব্দ দ্বারা আপনাদিগের পরিচয় দিতেন, ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ঋষিরা যে আর্য্যশব্দের ধাতুগত অর্থ বিস্মৃত হয়েন নাই, ঋক্বেদের অনেক সূক্তে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। একটী উদাহরণই এস্থানে যথেষ্ট হইবে। "হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা (চাষ করাইয়া) যব বপন করাইয়া ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, এবং বজ্রদ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া, তাহার প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছ। মণ্ডল ১১।৭২।

ঋগ্বেদে চর্ষণ (১ মণ্ডল ৩।৭) এবং কৃষ্টি (১ মণ্ডল ৪।৬) নামক যে দুইটী শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা কৃষিবাচক চৃষ বা কৃষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। জাতিবাচক অর্থে স্পষ্ট ব্যবহার না থাকিলেও ঐ দুই শব্দ মনুষ্য অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত।

ঋগ্বেদে কৃষি সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে যে মন্ত্রের দেবতা ক্ষেত্রপতি, তাহাই অতি প্রসিদ্ধ। নিম্নে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে। (৪র্থ মণ্ডল, ৫৭ সূক্ত)।

১। "আমরা বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্রপতির সহিত ক্ষেত্র জয় করিব; তিনি আমাদিগকে গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন।"

২। "হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃত তুল্য, মাধুর্য্যোপেত ও প্রভূত (জল) দান কর। যজ্ঞের স্বামিগণ আমাদিগকে সুখী করুন।"

৩। "ওষধি সমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোক সমূহ, জল সমূহও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা (শত্রু কর্ত্তৃক) অহিংসিত হইয়া তাহাকে অনুসরণ করিব।"

৪। "বলীবর্দ্দ সমূহ সুখে বহন করুক, মনুষ্যগণ সুখে কার্য্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্র সমূহ সুখে বদ্ধ হউক, এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর।"

৫। "হে শুন! হে সীর! তোমরা আমাদিগের এই স্তুতি সেবা কর, তোমরা দ্যুলোকে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার দ্বারা এই পৃথিবীকে সিক্ত কর।"

৬। "হে সৌভাগ্যবতী সীতা! তুমি অভিমুখী হও; আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর।

৭। "ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুক, পূষা তাঁহাকে পরিচালিত করুন। তিনি জলবতী হইয়া বৎসরের পর বৎসর (শস্য) দোহন করুন। *

* এই দুই ঋকে সীতাকে স্ত্রীরূপে বর্ণনা করিয়া প্রচুর শস্য প্রদানের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সীতা অর্থ—ফলে যে কর্ষণ চিহ্ন রাখিয়া যায়। যজুর্ব্বেদে এই সীতার স্তুতি রহিয়াছে। যখন আর্য্যেরা

৮। "ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক; রক্ষকগণ বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জ্জন্য মধুর জল দ্বারা (পৃথিবী) সিক্ত করুন)। হে শুনসীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।"

কৃষকের সামান্য আশা ভরসা এরূপ অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করিয়া, ঋগ্বেদ ভিন্ন অপর কোন্ সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়? ঋগ্বেদের সংহিতায় এই এক বিশেষত্ব এবং মনোহারিত্ব রহিয়াছে। দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধের বিবরণই হউক, পরম সহায় ইন্দ্রের স্তুতিই হউক, অথবা সামান্য কৃষকের গানই হউক, ঋগ্বেদ যেমন আমাদিগকে তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ অথচ সরল নিষ্কপট হৃদয়ের সঙ্গী করিয়া দেয়, কোন অপ্রাচীন গ্রন্থে তাহা হইবার নয়।

কৃষি সম্বন্ধে আর একটা মন্ত্রের কিয়দংশ এ স্থলে অনুবাদ করিতেছি। (১০ মণ্ডল, ১০১ সূক্ত)।

৩। "লাঙ্গলগুলি যোজন কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর; এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর; আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। শৃণিগুলি নিকটবর্ত্তী পক্ক শস্যে পতিত হউক।

৪। "লাঙ্গলগুলি যোজিত হইতেছে। কর্ম্মকারগণ যুগ সমস্ত পৃথক করিতেছে। বুদ্ধিমানগণ দেবোদ্দেশে সুন্দর স্তব পড়িতেছেন।

৫। "পশুদিগের জলপান স্থান প্রস্তুত কর। বরত্রা যোজনা কর। এই উদ্রিক্ত, অক্ষয় ও সৌকার্য্যযুক্ত গর্ত্ত হইতে জল সেচন করি।

৬। "পশুদিগের জলপান স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। এই উদ্রিক্ত, অক্ষয় জলপূর্ণ গর্ত্তে সুন্দর চর্ম্মরজ্জু বিদ্যমান আছে। অক্লেশে জল সেচন করা যায়। ইহা হইতে জল সেচন কর।"

৭। "ঘোটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করে এতাদৃশ রথ প্রস্তুত কর। এই জলপূর্ণ পশুদের জলাধার এক দ্রোণ প্রমাণ হইবেক। ইহাতে প্রস্তর নির্ম্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্যদের পানোপযোগী জলাধার স্কন্দ পরিমাণ হইবেক। ইহা জলপূর্ণ কর।"

পঞ্জাব প্রদেশে কূপ-জল না হইলে জল সেচন ও কৃষিকার্য্য অসম্ভব, সুতরাং মনুষ্য ও গবাদির জলপানের জন্য কূপ খনন করা হইত। আবার উদ্ধৃত মন্ত্রে ঋগ্বেদ-সময়ে কৃষিকার্য্যে অশ্ব ব্যবহৃত হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আধুনিক ভারতবর্ষে এই আচার লোপ পাইলেও অদ্যাপি ইউরোপ খণ্ডে কৃষিকার্য্যে অশ্বের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

দশম মণ্ডলের ২৫শ সূক্তের ৪র্থ ঋকে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে কূপের উল্লেখ রহিয়াছে। "হে সোম! যেরূপ কলসগুলি জল উত্তোলন করিবার জন্য কূপের মধ্যে যায়, তদ্রূপ আমাদের স্তব সমস্ত তোমাতে যাইতেছে।" উক্ত মণ্ডলের ৯৩ সূক্তে কূপ হইতে কি প্রকারে জল উত্তোলন করা হইত, তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। "যেরূপ

সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়া বন বিনাশ করিয়া তাহাতে সীতা পরিচালিত করিলেন, তখন লাঙ্গলচিহ্ন সীতা মনুষ্য আকার ধারণ করিয়া অবশেষে দাক্ষিণাত্য জয় বিবরণ পূর্ণ রামায়ণের নায়িকা রূপে স্থান পাইলেন।

ঘটীচক্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্র পশ্চাৎ ভাবে উঠিতে থাকে, আমার স্তবগুলিও তদ্রূপ।" ১৩শ ঋক্। অদ্যাপি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই উপায়ে জল উত্তোলিত হয়। অনেকগুলি ঘটী রজ্জুতে একাদিক্রমে বদ্ধ করিয়া একটী চক্রের সাহায্যে কূপে অবতরণ করাইয়া তাহা পূর্ণ করা হয়। চক্র যেমন ঘুরিতে থাকে, ঘটী জলপূর্ণ হইয়া উপরে আনীত হয়। ঋগ্বেদে ইহার নাম ঘটীচক্র; অদ্যাপিও এই নামে তাহা পরিচিত।

দশম মণ্ডলের ৯৯ সূক্তের ৪র্থ ঋকে দ্রোণে পয়োনালী পরিপূর্ণ করিয়া ক্ষেত্র সেচন করিবার উল্লেখ রহিয়াছে। "তিনি মেঘের দিকে গমন করিয়া মেঘে ভ্রমণ পূর্ব্বক উর্ব্বরা ভূমিতে প্রচুর জল সেচন করেন। সেই সকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হইয়া ঘৃত তুল্য জল বহাইয়া দেয়; তাহাদের চরণ নাই, রথ নাই, দ্রোণিই তাহাদিগের অশ্ব।" পুনরপি উক্ত মণ্ডলের ৬৮ সূক্তের প্রারম্ভে রহিয়াছে, "জল সেচনকারী কৃষাণগণ পক্ষীদিগকে শস্য ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার সময় কোলাহল করে।"

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি—কৃষিকার্য্যের যেরূপ প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, গোচারণের উল্লেখ তাদৃশ পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। পূষা, গোপাল বা মেষ পালের দেবতা; তাহাদের নিকট পূষা সূর্য্যস্বরূপ। মধ্য আসিয়ায় থাকিতে এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াও আর্য্যেরা যে গো মেষাদির চারণভূমি অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ যাত্রা করিতেন, ঋগ্বেদে তৎসম্বন্ধে কিংবদন্তী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ৪২ সূক্তে রহিয়াছে;—

১। "হে পূষা! পথ পার করাইয়া দাও। (বিঘ্নহেতু) পাপ বিনাশ কর; হে মেষপুত্র দেব! আমাদিগের অগ্রে যাও।

২। "হে পূষা! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী যে কেহ আমাদিগকে বিপরীত পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দাও।

৩। সেই মার্গপ্রতিবন্ধক, তস্কর কুটিলাচারীকে পথ হইতে দূরে তাড়াইয়া দাও।

৪। "যে কেহ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) উভয়ই হরণ করে এবং অনিষ্ট সাধন ইচ্ছা করে, হে পূষা, তাহার পরসন্তাপক দেহ, তোমার পদের দ্বারা দলিত কর।

৫। "হে শত্রুবিনাশী ও জ্ঞানবান্ পূষা! যেরূপ রক্ষণাদ্বারা পিতৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলে, তোমার সেই রক্ষণা প্রার্থনা করিতেছি।

৬। "হে সর্ব্বধনসম্পন্ন, অনেক সুবর্ণায়ুধযুক্ত লোকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূষা! তুমি অনন্তর ধনসমূহদিগকে শোধন কর।

৭। "বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাও, সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদিগকে লইয়া যাও। হে পূষা! তুমি এই [পথে] আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

৮। "শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়। হে পূষা! তুমি এই [পথে] আমাদের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

৯। "[আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে] সক্ষম হও। (আমাদিগের গৃহ ধনে) পরিপূর্ণ কর। (অন্য অভীষ্ট বস্তুও) দান কর।

(আমাদিগকে) তীক্ষ্ণতেজা কর। আমাদের উদর পূরণ কর। হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

১০। "আমরা পূষাকে নিন্দা করি না, সূক্তদ্বারা স্তুতি করি, আমরা দর্শনীয় পূষার নিকট ধন যাচ্ঞা করি।"

দশম মণ্ডলের ১১৯শ সূক্তে গাভীদিগকে বাহির করিয়া গোষ্ঠে নেওয়া এবং পুনরায় বাটীতে ফিরাইয়া আনা সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে। তাহা হইতে কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি।

৪। "যিনি গোপাল অর্থাৎ রাখাল, তাঁহাকে আমি আহ্বান করিতেছি, তিনি এই গাভীদিগকে বাহির করিয়া লইয়া যান, গোষ্ঠে [illegible] করান, তিনি ফিরিয়া আসুন, বাটীতে ফিরাইয়া আনুন, ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিক বিচরণ করাইয়া দিন।

৫। "যে রাখাল চতুর্দ্দিকে গাভীর অন্বেষণ করে, বাটীতে ফিরাইয়া আনে, ইতস্ততঃ বিচরণ করায়, সে যেন নিরুপদ্রবে বাটীতে ফিরিয়া আসে।

৮। "হে নিবর্ত্তন (গোচারণকারী পুরুষ) গাভীগণকে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করাও এবং ফিরাইয়া লইয়া এস। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং চারিদিকে বিচরণ করাইয়া ফিরাইয়া লইয়া এস।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সূক্তসমূহে আর্য্য দেশের চতুঃপার্শ্বে উপদ্রবকারী শত্রুদের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহারা আদিম পরিচিত জাতিভুক্ত লোক; আর্য্য গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী বনে লুক্কায়িতভাবে বাস করিত এবং অবসর পাইলে আর্য্যদের গবাদি চুরি ও অন্যান্য প্রকারে উপদ্রব করিত। ইতঃপশ্চাৎ ইহাদের সবিশেষ বিবরণ লিখিত হইবে।

ঋগ্বেদ দেবতাদের স্তব সংগ্রহ। তাহার মধ্যে পণ্যবাণিজ্যের অধিক উল্লেখ থাকা সম্ভব নয়। তথাপি যাহাতে তাৎকালীক বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নীতি অবগত হইতে পারি, ঈদৃশ বর্ণনা কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। টাকা ধার দেওয়ার নিয়ম সুপ্রচলিত ছিল। এক স্থানে ঋষিরা নিজদের ঋণাবদ্ধতার দুঃখ অতি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। (স্মরণ রাখা উচিত যে, ঋগ্বেদে ঋষিরা পরবর্ত্তী কালের সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থগত মুনি নহেন; তাঁহারা বিষয়ী গৃহস্থ লোক)। এক স্থানে লিখিত আছে, একবার কোন বস্তু বিক্রয় হইলে, পুনর্ব্বার সেই বিক্রয় অতিক্রম করিয়া আর বিক্রয় হইতে পারে না। চতুর্থ মণ্ডল, ২৪ সূক্তে ৯ম ঋক, যথা—

"(কেহ) অনেক (পণ্যের) দ্বারা অল্প ধন প্রাপ্ত হয়, পরে (ক্রেতার নিকট) গমন করতঃ "আমি বিক্রয় করি নাই" বলিয়া অবশিষ্ট মূল্য প্রার্থনা করে। বিক্রেতা 'অনেক দিয়াছি' বলিয়া অল্প মূল্য অতিক্রম করিতে পারে না। সমর্থ হউক বা অসমর্থ হউক, বিক্রয়কালে যে কথা বলে, তাহাই থাকিয়া যায়।"

উদ্ধৃত ঋক্ হইতে বোধ হয় যে, ক্রয় বিক্রয়ে মুদ্রা ব্যবহার করিবার প্রথা তৎকালে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক স্থানে ঋষিরা শত স্বর্ণ মুদ্রা দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন। "এরুণ আমাকে শত (সুবর্ণ), বিংশতি গো এবং শকট বাহনক্ষম অশ্বদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। ৫।২৭।২। এই কথা নিশ্চয় যে, এই সকল ঋকে কোন নির্দ্ধারিত মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু সে মুদ্রা প্রকৃত মুদ্রা (coined money) নহে; কেবল নিরূপিত ওজনের সুবর্ণ ছিল

মাত্র। অনেক স্থলে নিষ্ক বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। "আমি কক্ষীবান তাঁহার নিকট শত নিষ্ক, শত লক্ষণ যুক্ত অশ্ব ও শত বলীবর্দ্দ গ্রহণ করিলাম।" কোথাও ইহার অর্থ মুদ্রা কোথাও বা আভরণ। এই দুই অর্থ পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ অতি প্রাচীন কাল হইতে মুদ্রাকে অলঙ্কার স্বরূপ ব্যবহার করা ভারতবর্ষের রীতি রহিয়াছে।

অনেক স্থলে সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ রহিয়াছে। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তে ভুজ্যুর ও অশ্বিদয় কর্ত্তৃক তাহার প্রাণ রক্ষার বর্ণনা আছে। "কোন ম্রিয়মান মনুষ্য যেরূপ ধন ত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র (অতি কষ্টে তাঁহার পুত্র) ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদিগের নৌকা সমূহ দ্বারা তাহাকে ফিরিয়া আনিয়াছিলে, সে নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না।" * ৩ ঋক্। এই মণ্ডলের ২৫ সূক্তে বরুণ "অন্তরীক্ষগামী পক্ষীদিগের পথ জানেন এবং সমুদ্রের পথ জানেন" বলিয়া বর্ণনা রহিয়াছে। ৪র্থ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে ধনলাভার্থ সমুদ্র গমনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

"৬। হে দ্যাবা পৃথিবী দ্বয়! যেমন ধন লাভেচ্ছু ব্যক্তিরা (সমুদ্র মধ্যে) গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে, সেইরূপ আমি অবিলম্বিত কার্য্য লাভের জন্য অহিবুধ্ন্য নামক দেবতার সহিত তোমাদিগকে স্তুতি করি।"

সপ্তম মণ্ডলের ৮৮ সূক্তে ৩ ঋকে বশিষ্ঠ বলিতেছেন—"যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম; সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ (নৌকারূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।"

সমুদ্র গমন সম্বন্ধে ঋগ্বেদে এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু সমুদ্র গমন করিবে না, করিলে অপকার্য্য হয়, ঋগ্বেদের কুত্রাপি এরূপ কথা নাই।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

* সায়নাচার্য্য বলেন, তুগ্রনামে অশ্বিদিগের প্রিয় একজন রাজর্ষি ছিলেন, তিনি দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য আপন পুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌকায় প্রেরণ করেন। সমুদ্রে অনেক দূরে গিয়া সেই নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন। তাঁহারা ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনাদের পোতে অবস্থান করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তাহাদিগকে তুগ্রের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন।

কামাতুরদের জন্য মানব ধর্ম্মশাস্ত্র নহে।

১। গর্ভাধান।

মনু লিখিয়াছেন;—

গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥ ২। ২৭

"গার্ভ" হোম বা গার্ভসংস্কার সমূহ এবং জাতকর্ম্ম চৌড় মৌঞ্জীনিবন্ধন দ্বারা দ্বিজ বা হিন্দুদের বৈজিক ও গার্ভিক দোষ স্খালন হয়।

সন্তান গর্ভে থাকিতে যে সংস্কার, তাহা গার্ভ সংস্কার। মনু অন্যত্র বলিয়াছেন;—

নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতঃ বিধিঃ।
তস্যশাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়োনান্যস্যকস্যচিৎ॥২।১৬

"নিষেক হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশানে দাহ পর্য্যন্ত মন্ত্রানুসারে সংস্কার যে ব্যক্তির বিধি রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রে অধিকারী, অপর লোকেরা শাস্ত্রের অধিকারী নহে।"

মনুর মতে "গার্ভ সংস্কার" মধ্যে নিষেক সর্ব্ব প্রথম। টীকাকার মেধাতিথি নিষেক শব্দের গর্ভাধান অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু টীকাকার মেধাতিথি অপেক্ষা শতসহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ স্বয়ং শাস্ত্রকারেরা নিষেক সংস্কারের যে অর্থ ও ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। মহর্ষি বিষ্ণু বলিয়াছেন—

"গর্ভস্য স্ফুটতা জ্ঞানে নিষেককর্ম্ম। ১ স্পন্দনাৎ পুরা পুংসবনম্। ২। ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তোন্নয়নম্। ৩। সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অর্থাৎ গর্ভ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট জানিতে পারিলে নিষেক কর্ম্ম। স্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন। ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন এই কথাই কবিতা করিয়া মহর্ষি শঙ্খ লিখিয়াছেন;—

"গর্ভস্য স্ফুটতা জ্ঞানে নিষেকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ততস্তু স্পন্দনাৎকার্য্যং সবনন্তু বিচক্ষনৈঃ॥ ২। ১

মহর্ষি অঙ্গিরা লিখিয়াছেন;—

পূর্ব্বশ্চ স্রাবিতো যশ্চ গর্ভো যশ্চাপ্যসংস্কৃতঃ।
দ্বিতীয়ো গর্ভসংস্কারাস্তেন শুদ্ধি বিধীয়তে॥৬৭

"প্রথম গর্ভ যদি অসংস্কৃত হইয়া স্রাবিত হয়, তবে দ্বিতীয় গর্ভে গর্ভসংস্কার করিবে। তাহা হইলে বিশুদ্ধি হয়।"

তবে এই হইল যে, নিষেক সংস্কার এমন সময়ে হইবে যে, তাহা না হইতেই গর্ভস্রাব সম্ভব ছিল। মহর্ষি বিষ্ণু ও শঙ্খের মত (গর্ভস্য স্ফুটতা জ্ঞানে নিষেকঃ) অঙ্গিরাবাক্যে দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। মহর্ষি ব্যাস লিখিয়াছেন;—

গর্ভাধানং প্রথমত স্তৃতীয়ে মাসিপুংসবঃ
সীমন্তশ্চাষ্টমে মাসিজাতে জাতক্রিয়া ভবেৎ॥১।১৬,১৭

প্রথম মাসে গর্ভাধান, তৃতীয় মাসে পুংসবন, অষ্টম মাসে সীমন্ত; সন্তান জন্মিলে জাতকর্ম্ম।

কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন, একমাস মধ্যে গর্ভ হইয়াছে কি না, তাহা জানা যায় না, সুতরাং প্রথমত শব্দের অর্থ প্রথম মাস নয়। যদি প্রথম মাস জানা না গেল, তবে তৃতীয় ও অষ্টম মাস কি প্রকারে গণনা হইবে? ব্যাস, গর্ভের প্রথম মাস নির্দ্ধারণ করা যায়, বিশ্বাস করিয়া প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম মাস ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল স্থানে বিষ্ণু ও শঙ্খ "গর্ভের স্ফুট জ্ঞানে" এবং "স্পন্দনের পূর্ব্বে" এইরূপ বিধি করিয়াছেন। কুমারী ভার্য্যার প্রথম রজোদর্শনে গর্ভাধান-সংস্কার মনু, বিষ্ণু, শঙ্খ, অঙ্গিরা ও ব্যাস, কেহই এই কথা বলেন নাই।

মনু যে নিষেক সংস্কারের কথা লিখিয়াছেন, যে সময়ে সেই নিষেক সংস্কার হওয়া উচিত, বিষ্ণুসংহিতা ও শঙ্খ সংহিতায় তাহার সময় নির্দ্দেশ রহিয়াছে। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যে কোন সময়ে উপযুক্ত বর মিলিবে, তখনই বিবাহ দিবে। সুতরাং ঋতুমতী হইয়া অনেক কন্যার বিবাহ হইত। বাঙ্গালাদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের অনেকের রজস্বলা হইলে বিবাহ হয়। প্রথম রজোদর্শনে নিষেক-সংস্কার কখনই মনুর অভিপ্রেত অর্থ নহে। এবং

শঙ্খ ও বিষ্ণুমতে এই প্রকার কদর্থ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

ব্যাসাদি কৃত ধর্ম্ম শাস্ত্রে নিষেক শব্দ নাই। তাঁহারা গর্ভাধান শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য, মনুর ব্যবস্থা—

"নিষেকাদিশ্মশানান্তোস্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়া"

যাজ্ঞবল্ক্য ১।১০

উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম॥ ১।১১

ঋতু হইলে গর্ভাধান, স্পন্দনের পূর্ব্বে সবন, ষষ্ঠ বা অষ্টমে সীমন্ত এবং প্রসবে জাতকর্ম্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন, "ঋতুকালে গর্ভাধান সংস্কার হইবে।" প্রথম ঋতুতেই গর্ভাধান, এইরূপ অর্থ না করিয়া বিবাহের পর প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান, এই অর্থ করিলে কোনও প্রকারে কদর্থ হয় না। তবে কিনা যাজ্ঞবল্ক্য অবজঙ্কা অবস্থায় কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত, বক্ষ্যমাণ শ্লোকে এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যা মৃতাবৃতৌ।১।৬২

কন্যা ঋতুমতী হইলে কন্যাদাতার ভ্রূণহত্যাপরাধ হয়।

জিজ্ঞাসা করি, "গর্ভাধানম্ ঋতৌ"— প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান, এই অর্থ কি করিয়া হইবে? ঋতুকালে অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ষোড়শ দিনমধ্যে গর্ভাধান সংস্কার হইবে, অনৃতুকালে অর্থাৎ এই ষোল দিন অতিক্রান্ত হইলে আর গর্ভাধান সংস্কার হইবে না, ইহাই প্রকৃত অর্থ।

মনুর ব্যবস্থা "ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ" টীকায় মেধাতিথি তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঋতুকালে স্ত্র্যভিগামী হইবে, কিন্তু অনৃতুকালে স্ত্রীগমন করিবে না। "গর্ভাধানম্ ঋতৌ" এই বিধির অর্থ এই যে "ঋতুকালে গর্ভাধান হইবে, অনৃতু কালে গর্ভাধান সংস্কার হইবে না।" প্রথম ঋতু বা দ্বিতীয় ঋতু বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের শাস্ত্রে কোন নির্দ্দেশ নাই। "সমে যজেত" অর্থ সমদেশে যজ্ঞ করিবে, বিষমদেশে যজ্ঞ করিবে না। তদনুসারে "ঋতু কালাভিগামীস্যাৎ" অর্থ ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, অনৃতুকালে স্ত্রীগমন করিবে না। "গর্ভাধানম্ ঋতৌ" বিধির অর্থ ঋতুকালে গর্ভাধান সংস্কার হইবে, অনৃতু কালে গর্ভাধান সংস্কার হইবে না। "সমে যজেত" এই সূত্রের এইরূপ কেহ ব্যাখ্যা করেন নাই যে, যত সমদেশ আছে, তন্মধ্যে যে সমদেশ সর্ব্ব প্রথমে দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহাতে যজ্ঞ করিবে। সুতরাং "ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ" সূত্রে "প্রথম" ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, অথবা "গর্ভাধানম্ ঋতৌ" ইহার "প্রথম" ঋতুতেই গর্ভাধান করিবে, ঈদৃশ ব্যাখ্যা কোনও মতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

নিষেক সম্বন্ধে দুই মত দৃষ্ট হইতেছে। এক মতে গর্ভ নিশ্চয় হইয়াছে, জানিলে অথবা গর্ভের প্রথম মাসে সংস্কার। বিষ্ণু, শঙ্খ ও মনু এই মতের পোষক। অপর মতে গর্ভ হউক, এই ইচ্ছা করিয়া যে কোন ঋতুতে প্রথম স্ত্রী-সঙ্গম হয়, সেই ঋতুতে গর্ভাধান সংস্কার হইত। যাজ্ঞবল্ক্য * এই মতের প্রবর্ত্তক। যে শাস্ত্রই অনুসরণ কর, স্ত্রীর "প্রথম" ঋতুতে গর্ভাধান সংস্কার না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, ইহা কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রেত নয়। †

* ব্যাসকেও এই মতের পোষক স্বীকার করা যাইতে পারে।

† এই সুযুক্তিপূর্ণ তর্ক সম্বন্ধে অন্যান্য পণ্ডিতগণ কি বলেন, আমরা জানিতে চাই। ন, স।

কুমারী কাহাকে বলে ?

মনু বলিয়াছেন—

রেতঃসেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ ॥ ১১।৫৯

স্বযোনি, কুমারী, অন্ত্যজা, সখি স্ত্রী, পুত্র স্ত্রী, ইহাদের সঙ্গে রেতঃসেক হইলে গুরুতল্প পাপ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

সখিভার্য্যাকুমারীষু স্বযোনিষ্বন্ত্যজাসু চ।
সগোত্রাসু পুত্রস্ত্রীষু গুরুতল্প সমংস্মৃতম্ ॥
আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ ॥
ছিত্বালিঙ্গং বধস্তস্য সকামায়াঃ স্ত্রিয়া অপি ॥ ৩।২৩৩

সখিভার্য্যা গমন ও কুমারী গমন, আচার্য্য পত্নী গমনে গুরুতল্প অপরাধ হয়। এই সকল স্ত্রীলোক সকামা হইলেও অপরাধীর লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ড হইবে।

মনুর টীকাকার মেধাতিথি "কুমারী" শব্দের "অনূঢ়া স্ত্রী" অর্থ করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সেই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কুমারী শব্দের "অনাগতার্ত্তবা," প্রথম বয়োবিশিষ্ঠা, এই রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে কি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দ সমূহের অর্থ এত অনিশ্চিত যে, কল্পনা বলে কোন একটা অর্থ অবলম্বন করিলেই হইল? পুরাণেতিহাসাদি-ব্যবহৃত শব্দের অর্থ নির্ণায়ক অনেক কোষ রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল কোষ সৃষ্টি হইবার অনেক পূর্ব্বে দুই মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি বেদসংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এক ব্যক্তি শব্দের ধাতু প্রত্যয় ও অর্থ নির্ণয় করিয়া ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদব্যাস ঈশ্বরাবতার বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস না থাকিতে পারে, কিন্তু আপামর সকলের নিকট পাণিনি মহেশাবতার বলিয়া আদৃত। বেদব্যাস ভ্রম ক্রমে ছাড়িয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা কোন মন্ত্র আর ঋক্-বেদে নূতন প্রবেশ করাইতে পারি না, অথবা পাণিনি-সম্মত ধাতু প্রত্যয় ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কোন শব্দের অভিনব অর্থ করিতে পারি না। পাণিনি বলিয়াছেন "আচার্য্যাণী" শব্দের অর্থ "আচার্য্যের স্ত্রী" এবং "আচার্য্যা" শব্দের অর্থ "স্বয়ং ব্যাখ্যাত্রী।" যদি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভার্য্যাকে আচার্য্যা বলি, আর পণ্ডিতা রমাবাইকে আচার্য্যাণী বলি, তবে পাণিনির অবমাননা অথবা পাণিনি-জ্ঞান-শূন্যতার পরিচয় প্রদান করা হয়। মেধাতিথি গোবিন্দ রাজ তো অতি সামান্য লোক; সায়নাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্যকেও পাণিনি ধৃত অর্থ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইয়াছে। পাণিনি উনাশি সূত্রে কহিয়াছেন "পুবশ্চ হ্রস্বঃ ১৬৪। পঞ্চম পাদঃ" অর্থাৎ পূ ধাতুর উত্তর "ক্র" প্রত্যয় হয়, আর দীর্ঘ উ হ্রস্ব হয়। এইরূপে "পুত্র" শব্দ উৎপন্ন। কল্পনা বলে পুং নামে নরকের আবিষ্কার করিয়া ত্রৈ ধাতুর উত্তর ডচ্ প্রত্যয় করিলে বাহাদুরি প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু পাণিনিকে অশ্রদ্ধা করা হয়।

পাণিনি বলেন "বয়সি চ।৩।২।১০। উদ্যমানার্থং সূত্রম্। কবচহরঃ, কুমারঃ।" এখন যদি আমি বলি, কুমার শব্দ বয়োবাচক নহে, কিন্তু বিবাহ-বাচক, আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে?

পাণিনি বলেন "প্রথমে বয়সি।৪।১।২০। প্রথম-বয়োবাচিনোঽদন্তাৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্ স্যাৎ। কুমারী।" কুমার শব্দের উত্তর প্রথমবয়স বুঝাইতে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্ প্রত্যয় হয়। এখন

যদি পাণিনিকে তুচ্ছ করিয়া বলি, কুমারী শব্দের অর্থ "প্রথম বয়োবিশিষ্টা স্ত্রী" নহে, কুমারী অর্থ "অনূঢ়া স্ত্রী," মূর্খ ছাড়া কে আমার কথায় আস্থাস্থাপন করিবে? তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় যে সকল ব্যক্তিরা ঋক্‌বেদোল্লিখিত আর্য্যের সন্তান অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রোল্লিখিত দ্বিজের সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, এবং মহেশ্বরাগত-পাণিনি-প্রোক্ত-অষ্টাধ্যায়ী যাঁহাদের কণ্ঠস্থ, তাঁহারা কখনই মেধাতিথি সম্প্রদায়ের কপোলঃকল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়া পাণিনির মস্তকে পদাঘাত করিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায় ব্রাহ্মণকে "দ্বিজ" বলে; কিন্তু মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজ শব্দের অর্থ "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।" কুমারী শব্দও বাঙ্গালী গ্রন্থকারেরা অনেকে অনূঢ়া অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তবে কি প্রচলিত বাঙ্গালা অর্থ গ্রহণ করিয়া মন্বাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের অর্থ করিতে হইবে? পল্লবগ্রাহিতা আর কাহাকে বলে?

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, কুমারী-সহবাস ভগিনী-সহবাস তুল্য মহাপাপ। দণ্ড, মুষ্কচ্ছেদন বা লিঙ্গচ্ছেদন পূর্ব্বক প্রাণবধ। একি সম্ভব কথা, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাকরণ জানিতেন না, অথবা পাণিনি মানবশাস্ত্র ও যাজ্ঞবল্ক্যের শাস্ত্রাদির ভাষা বুঝিতেন না?

মনুর মতে সকামা কন্যাদূষণের শাস্তি অর্থদণ্ড। যাজ্ঞবল্ক্য মতে

কন্যাদূষণশ্চৈব পরিবেদক যাজনম্। ৩।২৩৮

* * * * *

ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষাম্ একৈকম্ উপপাতকং।

৩।২৪১

কন্যাদূষণ প্রভৃতি অপরাধ উপপাতক মধ্যে গণ্য। তাহার শাস্তি চান্দ্রায়ণ।

উপপাতক শুদ্ধিঃস্যাৎ এবঞ্চান্দ্রায়নেন বা। ৩।২৬৫

তবে দেখুন, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য এই দুই ব্যবস্থাকারের মতে কুমারীগমন ও কন্যাগমনের দণ্ডেতে কত তারতম্য। রাজপুরুষেরাই শাস্তি বিধান করুন, আর সামাজিক শক্তির কেন্দ্রীভূত বিদ্বন্মণ্ডলিই শাস্তি বিধান করুন্, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ে বলিতেছেন, কুমারীগমনে মুষ্কচ্ছেদন বা লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ড, আর কন্যাগমনে লঘুশাস্তি। কন্যা ও কুমারী শব্দ একার্থক হইলে, তাঁহারা কি দণ্ডের এত তারতম্য করিতেন? কুমারী "প্রথম বয়োবিশিষ্টা স্ত্রী" আর কন্যা "অনূঢ়া স্ত্রী" এই অর্থ গ্রহণ করিলে মনু ও পাণিনিতে বিরোধ হয় না, অথবা যাজ্ঞবল্ক্য বা মনুকৃত বিধি সমস্ত পরস্পর বিসংবাদী হয় না। শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিরোধী ব্যক্তিরা পুনর্ব্বার পাণিনি সূত্র ও মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেখুন্। সামান্য টোলের ছাত্রের ন্যায় টীকা টীপ্পনী চাঁ মান্য করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকারকের মস্তকে পদাঘাত করিবেন না।

বিধবাবিবাহ-প্রচারক পরাশর বলিতেছেন;—

সাদন্তি চাগ্নিহোত্রাণি গুরুপূজা প্রণশ্যতি।

কুমার্য্যশ্চ প্রসূয়ন্তে তস্মিন্ কলিযুগে সদা ॥১।৩১

এই কলিযুগে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবসন্ন হয়, গুরুপূজা নষ্ট হয়, আর কুমারী অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসব করে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে কুমারীগমন ছিল, তাহার দণ্ড মুষ্কচ্ছেদন করিয়া প্রাণ বধ। কলিযুগে কুমারীর সন্তান হইতে লাগিল। কলির এমনি মাহাত্ম্য! কুমারীর সন্তান সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন—

কুমারী সম্ভবস্তেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ১।১০

চণ্ডাল ত্রিবিধ। ১। কুমারী স্ত্রীর সন্তান। ২। সগোত্রাজাত সন্তান। ৩। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণী জাত সন্তান। "কুমারী সম্ভব" কথনই "কানীন পুত্র" হইতে পারে না। পাণিনি কুমারী শব্দের "প্রথম বয়োবিশিষ্টা" স্ত্রী অর্থ করিয়াছেন। কানীন শব্দের বক্ষমাণ ব্যাখ্যা পাণিনিতে দেখিতে পাই। "কন্যায়াঃ কনীন চ।৪।১ ১১৬। চকোঽপবাদোঽণ। তৎ সন্নিযোগেন কনীনাদেশশ্চ। কানীনো ব্যাসঃ কর্ণঃ। অনূঢায়া এবাপত্যমিত্যর্থম্।" অনূঢাকে কন্যা বলে। ব্যাস ও কর্ণ উভয়ে কানীন পুত্র ছিলেন, তাঁহারা কেহই চণ্ডাল নহেন। যে ধৃষ্ট ব্যক্তি বলে, ব্যাস চণ্ডাল ছিলেন, তাহাকে পুষ্প চন্দনে পূজা করিব, না পাদুকা মাতায় ভূষিত করিব?

স্ত্রীলোকের প্রথম বয়স্ কি? মনু ৯ অধ্যায়ে স্ত্রীলোকের বয়স তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কৌমার, যৌবন ও স্থবির রজোদর্শন পর্য্যন্ত কৌমার, রজোদর্শন হইতে রজো-নিবৃত্তি পর্য্যন্ত যৌবন, রজোনিবৃত্তি হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থবির বা বার্দ্ধক্য।

পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ মনু ৯।৩

কৌমারে অর্থাৎ রজোদর্শন যত দিন না হয়, ততদিন পিতা; যৌবনে অর্থাৎ রজোদর্শন হইতে যত দিন স্বাভাবিক মাসিক নিবৃত্তি না হয়, ততদিন স্বামী; এবং তাহার পর পুত্রগণ স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। স্ত্রীলোকদিগকে যেন স্বতন্ত্রা হইয়া থাকিতে না হয়।

বর কন্যার বিবাহ সময়।

পিতা, কন্যার রজোদর্শনের তিন বৎসর মধ্যে তাহার বিবাহ দিবেন। কিন্তু উপযুক্ত বর পাইলে অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। আর উপযুক্ত বর পাইতে বিলম্ব হইলে উক্ত তিন বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়া বিবাহ হইলেও দোষ নাই; এমন কি, উপযুক্ত বর না পাইলে কন্যা আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবেক, মনু এরূপ ধর্ম-নিয়ম বিহিত করিয়াছেন। যথা;—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম। ৯। ৯০।

কুমারী ঋতুমতী হইলেও, তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে। অপিচ—

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবেনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।৯।৮৯

"ঋতুমতী কন্যাও আমরণ পিতৃ গৃহে অবস্থান করিবে, তথাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক গুণহীন বরকে কখন কন্যা দান করিবে না।" ঋতু হইবার পূর্ব্বেই দান করিতে হইবে, মনুর ব্যবস্থা এরূপ নয়।

বরের বয়স সম্বন্ধে মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন, চতুর্ব্বিংশ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ—

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥৩।১
গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম ॥৩।৪

গুরুগৃহে ৩৬ বর্ষ ত্রৈবেদিক ব্রত আচরণ করিবে, ৩৬ বর্ষ না হইলে ১৮ বৎসর, তাহা না হইলে ৯ বর্ষ, অথবা যে পর্য্যন্ত ব্রত গ্রহণ সমাপ্ত না হয়, ততদিন গুরুগৃহে এই ব্রত আচরণ সমাপন করিয়া গুরুর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্নান করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইবে,

এবং তখন সুলক্ষণান্বিত সবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ করিবে।

গুরুর নিকট পাঠ সমাপনের পূর্ব্বে ভার্য্যাগ্রহণ করা কোনও শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত নয়। পূর্ব্বকালে গুরুগৃহে থাকিয়া যুবকদের চরিত্র দোষ জন্মিত না। আজ কাল পিতৃগৃহে থাকিলেও শিশুদের চরিত্র দোষ জন্মিবে, এই আশঙ্কায় তাহাদের পাঠ-ব্রত সমাপন না হইতেই গুরুর অনুমতি গ্রহণ না করিয়া বালক অবস্থায় বিবাহ দেওয়া হয়। মনু বলুন আর পরাশর বলুন, কোনও প্রাচীন কি আধুনিক শাস্ত্রকারের মতে পুরুষের বাল্য বয়সে, পাঠব্রত সমাপনের পূর্ব্বে, বিবাহ ধর্ম্ম-বিবাহ নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কন্যাসম্বন্ধে মহর্ষি মনুর সার ব্যবস্থা এই যে, উপযুক্ত বর না পাইলে কন্যার বিবাহ দিবে না, এবং পাঠব্রত সমাপন না করিয়া বিবাহ করিবে না। পুরুষের বিবাহ বয়স কোনও শাস্ত্রকার পরিবর্ত্তন করেন নাই। মনু বলিয়াছেন, "কালেঽদাতা পিতা বাচ্যো"—উপযুক্ত বর মিলিলেও যথা কালে কন্যা সম্প্রদান না করিলে পিতা দোষী। মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা আরো পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—

> যাবচ্চ কন্যাম্ ঋতবঃ স্পৃশন্তি
> তুল্যৈঃ সকামাম্ অভিযাচ্যমানম্।
> ভ্রূণানি তাবন্তি হতানিতাভ্যাং
> মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ ॥ ১৭ অধ্যায়।

তুল্য বর কন্যাকে যাচঞা করিতেছে, অর্থাৎ উপযুক্ত বর মিলিতেছে, এবং কন্যাও তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত আছে, এমন অবস্থায়ও পিতা মাতা যদি কন্যা সম্প্রদান না করে, এখন কন্যা ঋতুমতী হইয়া থাকিলে পিতা মাতা ভ্রূণহত্যারূপ পাপে লিপ্ত হয়েন। সুতরাং উপযুক্ত বর না পাইলে এবং সম্মতা না হইলে কন্যা রজস্বলা হইলেও পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকেরা দোষভাগী নহেন।

কিন্তু মনু ও বশিষ্ঠের পরবর্ত্তী মহর্ষিদের বিধি অনেক সঙ্কীর্ণ। মনু ও বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, কন্যার রজোদর্শনের তিনবৎসর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবে, যদি উপযুক্ত বর মিলে। অপর শাস্ত্রকারেরা বলেন, সদৃশ অভিরূপ বর মিলুক আর না মিলুক, রজোদর্শনের পূর্ব্বে অবশ্যই কন্যার বিবাহ হওয়া চাই; নতুবা পিতা ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন। এই শ্রেণীর শাস্ত্রকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন যে, মনুকে তো একেবারে পায়ে ঠেলা যায় না, তবে দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে যদি কন্যা ঋতুমতী হয়, তবে পিতা মাতা ভ্রাতা দোষ ভাগী হইবেন না। কিন্তু দ্বাদশ বর্ষের পরে কন্যা (অনূঢ়াবস্থায়) ঋতুমতী হইলে পিতা মাতার ভ্রূণহত্যা পাপে আর নিষ্কৃতি নাই।

শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে মহর্ষি পরাশর কাহারও অপরিচিত নহেন; পরাশর—

> নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে ॥ ৪। ২৭

পতি নষ্ট, মৃত, প্রব্রাজিত, ক্লীব ও পতিত হইলে নারীগণ পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন, এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। পরাশর যেমন বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী, আবার তেমনি রজোদর্শনের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহের বিশেষ উদ্যোগী। তিনি বলিয়াছেন—

> অষ্টমবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
> দশবর্ষা ভবেৎকন্যা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা ॥ ৭।৬

প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম॥ ৭।৭

"অষ্টবর্ষা বালিকাকে গৌরী, নববর্ষা বালিকাকে রোহিণী, দশবর্ষা বালিকাকে কন্যা এবং তদূর্দ্ধ বয়স্কা বালিকাকে (ঋতুমতী না হইলেও) রজস্বলা বলা যায়। দ্বাদশ বর্ষ বা তদধিক বয়সে যদি কন্যা (অনূঢ়াবস্থায়) ঋতুমতী হয়, তবে "পিতর" পিতা মাতা ভ্রাতা সেই রজঃ পান করেন।" সুতরাং কন্যা চতুর্দ্দশ, ষোড়শ বা ততোধিক বর্ষ পর্য্যন্ত রজস্বলা না হইয়া পিতৃগৃহে রহিলে পরাশর মতে পিতার কোন দোষ স্পর্শ হয় না। মহর্ষি যম কন্যার দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে কন্যার রজোদর্শনের পাপ হইতে পিতাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

প্রাপ্তে দ্বাদশামবর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম॥ ২২

যম ও পরাশর ভিন্ন আর সমস্ত আধুনিক শাস্ত্রকারদের মত এই যে, যে বয়সেই হউক, পিতৃগৃহে কন্যার রজোদর্শন হইলেই পিতা মাতা ভ্রাতা ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন। মুসলমানদের অধিকার কালে এই সকল (আধুনিক) শাস্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে।

মহর্ষি বশিষ্ট বলিয়াছেন "কুমার্য্যৃতুমতী ত্রিবর্ষাণ্যুপাসীতোর্দ্ধং ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেৎ তুল্যাম্। (সপ্তদশ অধ্যায়।)"

কন্যা ঋতুমতী হইয়া পিতা মাতার অনুমতি অনুসারে বিবাহ করিলে স্বামী স্ত্রী কাহারও দোষ হয় না। ঋতুমতী কন্যা বর্ষত্রয় অপেক্ষা করিয়া পিতা মাতার অনভিপ্রায়ে স্বয়ং স্বামী বরণ করিলে বরকন্যা কেহই দোষভাগী হয় না। মহর্ষি মনু ও বশিষ্ট রজোদর্শনের ৩ বৎসর পরে কন্যাকে স্বয়ম্বরা ক্ষমতা দিয়াছেন। *

মহর্ষি বিষ্ণু বলিয়াছেন,—

ঋতুত্রয়ং উপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরম্।
ঋতুত্রয়ে অতীতে তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা॥ ২৪।৪০।

কন্যা ঋতুত্রয় অপেক্ষা করিয়া স্বয়ং স্বামী বরণ করিবে। কারণ ঋতুত্রয় অতীত হইলে কন্যার আত্মপ্রভাব (majority) জন্মে। এইরূপ স্বয়ং স্বামী বরণ করিলে বর কন্যা কেহই দোষভাগী হয় না।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন;—

অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যাম্ ঋতাবৃতৌ
সমস্যাভাবে দাতৃণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরা॥ ১।৬৪

কন্যা ঋতুমতী হইয়া অনূঢ়া থাকিলে কন্যাদাতা প্রতিঋতুতে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হয়েন। কন্যাদাতা না থাকিলে কন্যা স্বয়ং স্বামী বরণ করিবে।

কন্যার স্বয়ম্বর ক্ষমতা এখানে খর্ব্ব হইয়া আসিল। বশিষ্ট ও মনু বর্ষত্রয় এবং বিষ্ণু ঋতুত্রয় অতিক্রান্ত হইলে কন্যাকে স্বয়ম্বর ক্ষমতা দিয়াছেন। যদি দাতার অভাব হয়, তবেই যাজ্ঞবল্ক্য মতে কন্যা স্বয়ম্বরা হইতে পারে। কিন্তু স্বয়ম্বর বিবাহে বিবাহিত বর ও কন্যা কেহই দোষভাগী নহে।

কোন কোন আধুনিক শাস্ত্রকার শুধু পিতা মাতাকে ভ্রূণহত্যা ও নরক গমন ভয় প্রদর্শন করিয়া নিবৃত্ত হয়েন না। কন্যা বৃষলী বা শূদ্রা বলিয়া গালি দিয়াছেন। জাতির শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ কুলীন মহাশয়েরা এই সকল অভিনব শাস্ত্র বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন

---

* ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে ২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কন্যার স্বয়ম্বর ক্ষমতা জন্মেনা।

না। কুলীন কন্যাদের মধ্যে শত শত "বৃষলী" রহিয়াছে।

মহর্ষি যম স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন ;—

যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ
অসংভাষ্যোহপাঙক্তেয়ঃ সবিপ্রো বৃষলীপতিঃ ॥ ২৪

যেই মদমোহিত ব্রাহ্মণ ঋতুমতী কন্যা বিবাহ করিবে, সে শূদ্রা বিবাহ করিল বলিয়া জানিবে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিবে না, তাহার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করিবে না।

মহর্ষি পরাশরের বিধিও তদনুরূপ ;—

যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞান মোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহপাঙক্তেয়ঃ সবিপ্রোবৃষলীপতিঃ ॥ ৭।৯

যেই অজ্ঞান মোহিত ব্রাহ্মণ ঋতুমতী কন্যা বিবাহ করে, সে শূদ্রার স্বামী, সে অসম্ভাষ্য ও অপাঙক্তেয়। *

মহর্ষি যম বলেন, ঋতুর প্রাক্‌কালে কন্যা দান করিবে। এমনও ঘটিয়াছে যে, বিবাহ সময়ে কন্যা ঋতুমতী হইয়াছে।

মহর্ষি আপস্তম্ব নিয়ম করিয়াছেন—

বিবাহে বিততে যজ্ঞে সংস্কারে চ কৃতেতথা।
রজস্বলা ভবেৎ কন্যাং সংস্কারস্তু কথং ভবেৎ ॥
স্নাপয়িত্বা তদা কন্যাং অন্যৈর্বস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম।
পুনঃ প্রত্যাহুতিংহুত্বা শেষং কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥ ৭।৯, ১০

প্রশ্ন এই, বিবাহ যজ্ঞ বিতত হইয়া সংস্কার হইবার সময় যদি কন্যা রজস্বলা হয়, তবে কি প্রকারে সংস্কার হইবে?

উত্তর। কন্যাকে তখন স্নান করাইয়া ও অন্য কাপড় পরাইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাহুতি করিয়া বাকী যে সকল কর্ম্ম থাকে, তাহা শেষ করিবে।

প্রথমতঃ কথা হইল যে, রজোদর্শনের তিন বৎসর মধ্যে কন্যা সম্প্রদান সময়, যদি উপযুক্ত বর মিলে। উপযুক্ত বর মিলিলে ইহার পূর্ব্বেও কন্যা সম্প্রদান করা যাইতে পারে; উপযুক্ত বর না পাইলে কন্যা চিরকাল পিতৃগৃহে রহিবেক। আর রজোদর্শনের তিন বৎসর পর ঋতুমতী কন্যা স্বয়ং স্বামী বরণ করিতে পারে। স্বয়ংবর বিবাহ প্রশস্ত প্রথা, তদ্দ্বারা বর কন্যা কেহই দোষ ভাগী হয় না। কিন্তু উপযুক্ত বর সত্বেও কন্যা-দাতা সকামা কন্যা দান না করিলে দোষী হইবে; যদি উপযুক্ত বর না মিলে, তবে কন্যাদাতার কোন দোষ নাই। মহর্ষি মনু ও বশিষ্ঠ এই প্রশস্ত বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন।

ইহার পরবর্ত্তী মহর্ষিদের মত অল্পে অল্পে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। গুণহীন হউক, সবর্ণ বর হইলেই উপযুক্ত বর হইল, এই যেন তাঁহাদের বিধি। আর রজোদর্শনের পূর্ব্বে যে প্রকারে হউক, কন্যা সম্প্রদান করিতেই হইবে। না করিলে পিতা মাতা ভ্রূণহত্যা অপরাধে অপরাধী হইবেন। তবে দুই এক ঋষি অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে যদি কন্যা ঋতুমতী হয়, তবে দোষ নাই। অনেক দিন স্বয়ংবর বিধি প্রচলিত রহিল। আধুনিক ঋষিরা নিয়ম করিলেন, সে কি কথা? ঋতুমতী কন্যাকে সম্প্রদান না করিয়া কন্যা-দাতার ভ্রূণহত্যা-পরাধ হইবে, আর ঋতুমতী কন্যাকে বিবাহ করিয়া বর সুখে কাল কাটাইবে? তাহা কখনই হইবে না, যে ব্যক্তি ঋতুমতী

---

* "পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন, ৬, ৭, ৮ ও ৯ শ্লোক স্বার্থ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের রচিত। প্রাচীন কালের বিবাহ প্রথা পর্য্যালোচনা করিলে এই শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়।" বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত পরাশর-সংহিতা, ৪৫ পৃষ্ঠা।

কন্যা বিবাহ করিবে, সে অসম্ভাষ্য ও অপাঙক্তেয়, আর ঋতুমতী কন্যা—

সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া হরংস্তাং ন বিদূষ্যতি।

বিষ্ণুসংহিতা। ২৪।৪১ *

ঋতুমতী কন্যা বৃষলী অর্থাৎ শূদ্রা স্বরূপ, তাহাকে হরণ করিলে কোন দোষ হয় না।

৪। স্ত্রীগমন।

ঋষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন "বৃত্তে রজসি গম্যা স্ত্রী গৃহ কর্ম্মনিচৈন্দ্রিয়ে" ঋতুকালের রজঃ নিবৃত্ত হইলে (পঞ্চম দিবস হইতে) স্ত্রীলোক গৃহকার্য্য ও ঐন্দ্রিয় কর্ম্মের উপযুক্তা হয়।

ঋষি আপস্তম্বেরও এই বিধি। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ পর্ব্বাবর্জং স্বদারে বা। ১২ অধ্যায়।" পর্ব্ব-বর্জে ঋতুকালে স্বদার গমন করিবে।

মহর্ষি গৌতম বলেন, "ঋতাবুপেয়াৎ সর্ব্বত্র বা প্রতিষিদ্ধ বর্জ্জন্। ৫ অধ্যায়।" সর্ব্বত্র স্ত্রীর ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, কিন্তু প্রতিষিদ্ধ দিনে নহে। কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বত্র 'ঋতৌ' শব্দের বিশেষণ, সর্ব্বত্র ঋতৌ পদের অর্থ 'প্রতি ঋতুতে'। যদি ইহা প্রকৃত অর্থ হয়, তবে মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত এই বিরোধের সূত্রপাত। কিন্তু 'সর্ব্বত্র' সকল অবস্থায় "ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, অনৃতুকালে স্ত্রীগমন করিবে না;" এই অর্থ প্রকৃত অর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন;—

ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ স্বদার নিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদব্রতো রতিকাম্যয়া ॥৩।৪৫

স্বদার-নিরত ব্যক্তি সদা (পুত্র কামনায়) ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে। আর রতি কামনায় পর্ব্ব দিন ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রীগমন করিবে।

মূলে "পুত্র কামনায়" নাই। কিন্তু পর্ব্ব বর্জ দিনে রতি কামনায় স্ত্রীগমন হইতে ঋতুকালে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন অনুমান করা যাইতেছে।

'ঋতু কালাভিগামী স্যাৎ'—এই পদের অর্থ কি? প্রত্যেক ঋতুতে স্ত্রীগমন করিবে, অথবা যে কোন ঋতুকালে হউক পুত্র কামনায় ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, না ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন করিবে না? মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের টীকাকার অর্থসৌকর্য্যার্থে একটী অতি উৎকৃষ্ট শাস্ত্রীয় উদাহরণ দিয়া 'ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ' বিধির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক ব্যবস্থা "সমে যজেত" অর্থাৎ সমদেশে যাগ করিবে। সমদেশ তো অনেক আছে। তবে কি প্রত্যেক সমভূমিতে যাগ করিতে হইবে? না, যে সমভূমি সর্ব্বপ্রথমে চক্ষুগোচর হয়, সেই সমভূমিতেই যাগ করিতে হইবে। না, যাগ করিবার সময় অতিক্রান্ত না হওয়ার পূর্ব্বে যে সকল

---

* কোন কুলীনবিদ্বেষী চণ্ডাল বিষ্ণুসংহিতায় এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবে। রজোদর্শনের ঋতুত্রয় পরে কন্যাকে স্বয়ং স্বামিবরণ ক্ষমতা দিয়া মহর্ষি বিষ্ণু কি বলিবেন, রজস্বলা কন্যা হরণ করিলে দোষ হয় না? যদি ইংরেজ রাজত্ব না থাকিত, উদ্ধৃত শ্লোক শাস্ত্র হইলে, বাঙ্গালা দেশের রজস্বলা কুলীন কন্যাদের দশা কি হইত? আর মহীশূর, বরদা, রাজপুতানা প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যে রজস্বলা কন্যা হরণ করিলে কি শাস্তি হয় না? ইংরেজদের আসিবার অনেক পূর্ব্বে দেবীবর ঘটকের মেল বন্ধন হেতু কুলীন কন্যাদের রজস্বলা হইয়া বিবাহ হইত। কোন ব্যক্তি কি রজস্বলা কন্যাকে হরণ করিয়া বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছে?

"সম্মতির আইনের পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদে যাঁহারা প্রবৃত্ত, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কুলীন ব্রাহ্মণ। শত সহস্র রজস্বলা অবিবাহিতা কন্যা যাঁহাদের গৃহে, তাঁহাদের পক্ষে নীরব থাকা কি ভাল নয়।" ন, স।

সমদেশ রহিয়াছে, তাহার যে কোনটী হউক, যাগকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে বাছিয়া লইবে? কিন্তু যাগ করিতে হইলে সমভূমি ভিন্ন অসমভূমিতে যাগ করিতে নিষেধ। ঋতুকালে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা। চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যূনাধিক চত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের ঋতু সময় দেখা যায়। এই পঞ্চবিংশতি বর্ষে ৩০০ তিন শত বার ঋতুকাল উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিবারে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন করিবে, এইরূপ যদি মনুর বিধির অর্থ হয়, তবে, যে অসংখ্য সমদেশ রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক স্থানে যজ্ঞকারীর যাগ করা উচিত। যদি প্রত্যেক ঋতুকালে স্ত্রীগমন হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম না হয়, তবে প্রথম ঋতুকালে অবশ্য স্ত্রীগমন করিবার যে আধুনিক দেশাচার রহিয়াছে, তাহাও শাস্ত্রানুসারে অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য নহে। স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শনে স্ত্রীগমন করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কেহ পাতকী হয় না, আবার স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শনে স্ত্রীগমন না করিলেও কেহ পাতকী হয় না। ২০০ কি ৩০০ বার স্ত্রীর ঋতুকাল উপস্থিত হয়। পুত্রকামী ব্যক্তি তাহার যে কোন সময়ে স্ত্রীগমন করিতে পারেন, ইহাই শাস্ত্রের বিধি। "ঋতু কালাভি গামীস্যাৎ স্বদার নিরত সদা।" সদা অর্থাৎ প্রথম রজোদর্শন হইতে শেষ রজোদর্শন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে পুত্রকামনার যে সময়কে শাস্ত্রকার "ঋতুকাল" নাম করিয়াছেন, সেই সময়ে স্ত্রীগমন করিবে। সেই সময় পরিত্যাগ করিয়া অন্য সময়ে স্ত্রীগমন করিলে রতিকামনায় স্ত্রীগমন হইল, তাহা মনে করিতে হইবে। তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মচর্য্য * ব্রতের পুণ্যসঞ্চয় হয় না।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন —

ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥ ৩। ৪৬

স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ঋতু ষোড়শ রাত্রি, তন্মধ্যে অশুচি চারি রাত্রি অন্তর্গত।

তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ॥ ৩।৪৭।

আদ্য চারি রাত্রি, একাদশী রাত্রি ও ত্রয়োদশী রাত্রি, এই ছয় রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দশ রাত্রি স্ত্রীগমনে প্রশস্তা।

এই স্থানে "সমে যজেত" স্মরণ রাখিবে। এই দশ রাত্রির প্রতি রাত্রিতেই স্ত্রীগমন করিতে হইবে, না করিলে দোষ হয়, এমন কথা নয়। তাহার পর শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেদার্ত্তবে স্ত্রিয়ম্॥ ৩। ৪৮

যুগ্মরাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে পুত্রসন্তান এবং অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে কন্যা সন্তান জন্মে। সুতরাং পুত্রার্থী ব্যক্তি যুগ্মরাত্রিতেই ঋতু কালে স্ত্রীগমন করিবে। পুত্রার্থীর পক্ষে যুগ্মরাত্রি ভিন্ন অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন অনিয়ম বলিয়া সিদ্ধ হইল। ঋতুকালের প্রত্যেক যুগ্ম রাত্রিতেই স্ত্রীগমন করিবে, এমন কথা নয়।

সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ইন্দ্রিয় সংযমের ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া পশুত্ব লাভের জন্য নহে। তাহা বিশদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করাতেই মনু যে বিধি করিয়াছেন, তাহা শুনুন।

নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥ ৩। ৫০।

নিন্দিত (ষট্) রাত্রি, এবং অন্য অষ্ট রাত্রি এই রূপ চতুর্দ্দশ রাত্র পরিত্যাগ করিয়া ঋতুকালে অবশিষ্ট দুই রাত্রির অধিক যে ব্যক্তি স্ত্রীগমন না করেন, তিনি যেখানে সেখানে থাকুন, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও তিনি ব্রহ্মচারী। আর দেখুন, যদি এই দুই রাত্রিতে অমাবস্যা, অষ্টমী, পৌর্ণমাসী ও চতুর্দ্দশী তিথি হয়, তবে স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ।

অমাবাস্যামষ্টমীঞ্চ পৌর্ণমাসীং চতুর্দ্দশীম্।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যমপ্যৃতৌ স্নাতকো দ্বিজঃ॥ ৪। ১২৮

* নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচর্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥ মনু ৩।৫০

"স্নাতক, গৃহস্থ, দ্বিজ (হিন্দু) স্ত্রীর ঋতুকালে অমাবস্যা অষ্টমী, পূর্ণিমা, ও চতুর্দ্দশী এই কয়েক তিথিতে ইন্দ্রিয় সংযম করিবেন।" অরজস্কা-গমনকারীরা বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মটা শুধু কামরিপু সেবার জন্য, অরজস্বলা অবস্থায়ও স্ত্রীকে নিষ্কৃতি দিবে না; স্ত্রীর প্রথম ঋতুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কোন ঋতুকাল যেন স্ত্রীগমনে বাদ না যায়, শুচি অশুচি যেন বিচার করা না হয়, যগ্মাযগ্ম রাত্রি যেন মনে না পড়ে, ইন্দ্রিয় সংযম করিবে, এই বিধি যেন গৃহস্থের জন্য শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই! তাহাদের মতে শুধু ইন্দ্রিয় সেবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র। কিন্তু শুনুন, মনু কি বলিতেছেন;—

যস্মিন্ ঋণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যং অশ্নুতে।
স এব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ॥ ৯।১০৭

যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃঋণ হইতে মুক্তি ও মোক্ষলাভের অনন্ত উপায়, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মজ পুত্র। পণ্ডিতেরা অপর পুত্রদিগকে "কামজ" পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চদশ বর্ষ হইতে অন্ততঃ চত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত ঋতু হয়। ২৫ বর্ষে ৩০০ বার ঋতুকাল উপস্থিত হয়। এই ৩০০ ঋতুকালে ৩০০০ প্রশস্ত রাত্রি। তন্মধ্যে ১৫০০ যুগ্ম রাত্রি। পিতৃঋণ পরিশোধ ও মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ একটী মাত্র ঔরস পুত্র জন্মিবার আবশ্যক। ঔরস পুত্র না হইলেও দত্তক পুত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ইন্দ্রিয়-সংযমের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি আমাদের এই দুর্গোগতি হইল না, অরজস্বলা অবস্থায়ই দুহিতাকে জামাতার পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পাঠাইলে সমাজে নিন্দার ভাগী হইব? পুত্র-কামী না হইয়া স্ত্রীগমন করিবে না; ঋতুকাল ভিন্ন অপর সময়ে স্ত্রীগমন করিবে না; স্বদার অতিক্রম করিবে না; কোনও ঋতুকালে অর্থাৎ কোনও মাসে দুই রাত্রির অধিক স্ত্রীগমন করিবে না; মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে সংলোকের পক্ষে এই ব্যবস্থা। আজ সেই ধর্ম্ম বিকৃত করিয়া আমরা সমাজে কি পশ্বাচারই প্রচলিত করিয়াছি! ঋতুমতী ও অনৃতুমতী বিচার করিবে না, কোনও ঋতুকাল পরিত্যাগ করিবে না; কোনও রাত্রি পরিত্যাগ করিবে না; স্ত্রীর রোগ, শোক, শারীরিক মানসিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিবে না। একটা সামান্য গরু বা শূকরের যে বিচার আছে, অনেক মহাত্মা নরপশুর সেই বিচার নাই; আবার এই মহাপশু ব্যক্তিরাই নির্লজ্জ ভাবে বলিয়া থাকেন, মহর্ষি মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রেই এই পাশব কাণ্ডের নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে! হা ধর্ম্ম !!

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

ফুলরেণু।

প্রেতযোনি।

পাঁচটী বছর আজ—দীপ্ত দিবালোকে
বুকে মেখে দেখিয়াছি—কভু স্বপ্ন নয়!
শারদ সন্ধ্যার শোভা ঊষার আলোকে
দেখেছি সে দেবতার নব অভ্যুদয়!
পাঁচটী বছর আজ—আজো দেখি তারে
অবিকৃত সেই মূর্ত্তি সেই রূপ রাশি,
অধর দু'খানি ঢেউ লোহিত সাগরে,
সুধার জোয়ারে তার প্রাণ যায় ভাসি!
কিন্তু সে কেন যে আজ কাছে নাহি আসে,
একি তবে সে কি নহে আর কোন্ জন?
অথবা "আরেক আমি" দেখিয়া তরাসে,
সরলা সভয়ে বুঝি করে পলায়ন?
কি জানি কেমন মনে লাগিছে সন্দেহ,
আমরা কি আগেকার 'প্রেতযোনি' কেহ?

পত্র।

নেও পত্র ফিরে নেও নাহি চাহি আর,,
অগ্নিময় উপেক্ষায় পূর্ণ প্রতি কথা,
পদাঘাতে করিয়াছ প্রেম প্রত্যাহার,
ফিরে নেও ফিরে নেও দগ্ধ-আত্মীয়তা!

স'রে যাই—চলে যাই দূর পরবাসে,
আর না করিব তব দৃষ্টি কলুষিত,
আর না করিব বায়ু বিষাক্ত নিশ্বাসে,
অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী পাপী কদাচিৎ!
জীবন আমার চির-দগ্ধ-চিতাভূমি,
আমার সম্বল আহা চির অশ্রুজল,
আবার দু'ফোঁটা অশ্রু বাড়াইলে তুমি,
ঝরিবে যাবৎ বাঁচি—নিত্য অবিরল!
বেঁচে থাক, সুখে থাক—এই শেষ কথা,
ফিরে নেও, ফিরে নেও দগ্ধ আত্মবতা।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। প্রসূতি—শ্রীরামমোহন দাস গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী দ্বারা প্রকাশিত। বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ধাত্রীশিক্ষা বঙ্গদেশের আপামর সাধারণের মহা উপকার সাধন করিয়াছে। রামমোহন বাবুর "প্রসূতিও" এই শ্রেণীর গ্রন্থ। প্রসূতিতে সন্তান পালন, রোগনির্ণয়, ঔষধ ও পথ্যের নিয়ম এবং প্রসূতির অবশ্য পালনীয় বিধি ব্যবস্থা সরল ভাষায় অতি পরিষ্কার রূপে লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক দ্বারা ডাক্তারের সাহায্য ভিন্নও প্রসূতি এবং সন্তান চিকিৎসিত হইতে পারে। পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে।

২। অশোকা—(উপন্যাস) শ্রীমতী "বনলতা," "নীহারিকা"ও "আর্য্যাবর্ত্ত" রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। গ্রন্থকর্ত্রী নব্যভারত পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। ইনি এক জন ভাল কবি, কিন্তু ভাল কবি হইলেই যে ভাল উপন্যাস লিখিতে পারেন, গ্রন্থ পাঠে সে পরিচয় পাওয়া গেল না।

৩। হৃদশ্রু—শ্রীকালীহর বসু প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কবিতায় গ্রন্থখানি পূর্ণ। লেখক বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "এই পুস্তকে ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই।" বাস্তবিক তাই বটে, পুস্তক পাঠের সময় গদ্য কি পদ্য পড়িতেছি, ঠিক করা যায় না। গ্রন্থকারের বোধ হয় এই প্রথম উদ্যম;—একপ নব উদ্যম-প্রসূত ফল লোকচক্ষুর গোচরে না আনিলেই ভাল হইত। কবিতাগুলির মধ্যে "ভাতৃবধূর প্রতি" কবিতাটির ভাব ভাল হইয়াছে। "সীতা হরণে লক্ষ্মণের খেদোক্তি" লিখিতে গিয়া গ্রন্থকার কেমন একটা বিকৃত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

৪। বক্তৃতা—কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন পরিব্রাজকের বক্তৃতার সার সংগ্রহ। শ্রীভূদেব কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আনা। কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বক্তা। তাঁহার বক্তৃতাগুলি এরূপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান পুস্তকে "তৃষ্ণার জল" এবং "অন্ধের যষ্টি" নামক যে দুইটী বক্তৃতার সারাংশ লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সহিত স্থানে স্থানে অমিল থাকা সত্ত্বেও একথা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, হিন্দু কি মুসলমান,

ব্রাহ্ম কি খ্রীষ্টান, সকল শ্রেণীর ধর্ম্মার্থীর নিকটই এ পুস্তক আদরনীয় হইবে। তর্কাস্ত্রে জগৎ জিত হয় না, ভাবময় ভক্তি কথায় সকলেরই মন গলিয়া যায়। এ পুস্তকে দুইই আছে, ভাষার লালিত্য আছে এবং ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাস আছে।

৫। পুনর্জ্জন্ম আছে কি না? শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন প্রণীত। কুঞ্জ বাবু অতি সংক্ষেপে এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে গুটিকত যুক্তিযুক্ত কথা লিখিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন, বেশ ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। ক্ষুদ্র পুস্তকে যাহা আশা করা যায়, এ পুস্তকে তাহা আছে।

৬। রমণী—সমর্থকোষ প্রেস হইতে প্রকাশিত। এখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই; তিনি যিনিই হউন, কবিতা লিখিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে। পুস্তকের নামটি "রমণী" না দিয়া "প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের উক্তি" হইলেই ভাল হইত।

৭। বন-প্রসূন—শ্রীরাখাল চন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য ⁄০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে দুটী ধর্ম্ম স্বন্ধীয় প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধ দুটির ভাব মন্দ নয়; কিন্তু ভাবাতে ছাত্র-সুলভ ভাবের গন্ধ পাওয়া যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ অতি বিনীত ও শান্তভাবে লেখা কর্ত্তব্য।

৮। শৈলজা—রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত। এ খানি সামাজিক নাটক। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে বিবাহ-পণ দ্বারা কি কুফল ফলিতেছে, এই নাটকে তাহা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। বৈচিত্র্য রক্ষাই নাটককারের কবিত্ব, এ নাটক-লেখক তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শৈলজাকে দেখিলে হৃদয় ব্যথিত হয়, চক্ষে জল আইসে, আবার অর্থ-পিশাচ কুলাভিমানী চণ্ডাল প্রকৃতির রাম সাধনকে দেখিলেই অবিমিশ্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। সামান্য সামান্য দোষ থাকিলেও চরিত্র-অঙ্কন কার্য্যে লেখকের খুব পটুতা আছে।

৯। শিশুপালন—ডাক্তার বিনোদবিহারী রায়কর্ত্তৃক প্রণীত, রাজসাহী বিনোদ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ।⁄০ আনা। আয়ুর্ব্বেদ মতে কিরূপে শিশুপালন করিতে হয়, এ গ্রন্থে তাহা সংক্ষেপে সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১০। সত্য-সরলা—শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। এখানি নাটক; কিন্তু প্রকৃত নাটকত্ব এ গ্রন্থে দুর্ল্লভ। এ পুস্তক নভেলের আকারে লিখিত হইলেই সুবুদ্ধির কাজ হইত।

১১। কণ্ঠহার—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন প্রণীত। মূল্য ১৲। গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, এ গ্রন্থ তাহার প্রথম উদ্যমের ফল। প্রথম চেষ্টা বলিয়া, এ পুস্তকের কঠোর সমালোচনার প্রয়োজন না থাকিলেও, এ কথা, বলা আবশ্যক যে, এ উপন্যাস পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। ভাষা ভাবের দাসী। ভাব-শূন্য ভাষা ফাকা বন্দুকের আওয়াজের মত কার্য্যকরী নহে। এ পুস্তকে ভাষা আছে, ভাব নাই; বীরত্বের কথা আছে, বীরত্ব নাই; অনেক গুলি চিত্র আছে, বৈচিত্র্য নাই। তার উপর স্থানে স্থানে অনুকরণ দোষও ঘটিয়াছে।

১২। জন্মএয়োস্ত্রী—শ্রীসুরনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এখানি নাটক। কুরুচির ভাণ্ডার এ পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই।

১৩। ভগ্নতরী।—এম্ এম্ মজুমদার কর্ত্তৃক ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। এখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। গ্রন্থকারের ইহা প্রথম উদ্যম, সুতরাং নাম দেন নাই। কবিতার বিষয়গুলি ভালই নির্ব্বাচন করিয়াছেন এবং সুরুচিসম্মত হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ ও সাধু। কালে ভাল লেখক হইলে, তাঁহার লেখনী অনেক সুফল প্রসব করিবে।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আহার্য্য, পরিধেয় ও গৃহোপযোগী দ্রব্য।

কৃষির মধ্যে যব ও গোধূমের প্রচুর চাস হইত এবং এই গুলিই প্রধান আহার্য্য-বস্তু ছিল। যে নামে শস্যগুলির পরিচয় ঋক্-বেদে পাওয়া যায়, আধুনিক সংস্কৃতে তাহা ভিন্নার্থে প্রয়োজিত হয়। সুতরাং তৎ-কালীন শস্যের নির্ণয় করা একটু কঠিন ব্যাপার। আধুনিক সংস্কৃতে যব শব্দে শুধু যব বুঝায়; পুরাকালে যব গোধূমাদি সমস্ত খাদ্য (Grains) বুঝাইত। ধান্য শব্দে ঋগ্বেদে ভাজা যব হইতে প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ বুঝাইত। দেবতাদিগকে ইহা নৈবিদ্য দেওয়া হইত। ঋগ্বেদে ব্রীহির (চাউলের) উল্লেখ নাই।

ঋগ্বেদে যবাদি হইতে প্রস্তুত পক্তি, পুরোডাশ, অপূপ ও করম্ভ প্রভৃতি নানা প্রকার পিষ্টকের উল্লেখ আছে। এই সকলই দেবতাদিগকে নিবেদন করা হইত। "হে ইন্দ্র! তুমি ভৃষ্ট যবযুক্ত, দধিমিশ্রিত সক্তুযুক্ত, পিষ্টকযুক্ত ও উক্‌থবিশিষ্ট আমাদের (সোম) প্রাতঃ সেবনে গ্রহণ কর। হে ইন্দ্র, পক্ক পুরোডাশ গ্রহণ কর।"

পঞ্জাবের আর্য্যেরা যে সেই প্রাচীন সময়ে মাংস ভোজন ও দেবতা-দিগকে ভোজনার্থ মাংস প্রদান করি-তেন, তাহা অনায়াসেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে। গাভী, মহিষ ও বলীবর্দ্দাদির মাংস রন্ধনের প্রণালী ও যজ্ঞে প্রদান করিবার কথা অনেক স্থানে পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে আছে "১২। হে ইন্দ্র, তুমি এই বৃত্রকেই বজ্রপ্রহার কর, গরুর ন্যায় বৃত্রের শরীরের সন্ধিগুলি তির্য্যক্ অবস্থিত বজ্র দ্বারা কর্ত্তন কর।" দ্বিতীয় মণ্ডলের সপ্তমসূক্তে রহিয়াছে, "৫। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের। তুমি বন্ধ্যাগাভী ও বৃষ ও গর্ভিনা গাভী সকলের দ্বারা আহুত হইয়াছ।" পুনশ্চ পঞ্চম মণ্ডলের ** সূক্তে আছে; "৭। ইন্দ্রের মিত্রভূত অগ্নি স্বীয় মিত্র ইন্দ্রের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সত্বর তিন শত মহিষ পাক করিলেন। ৮। হে ইন্দ্র! তুমি তিন শত মহিষের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলে।" পুনরপি ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ১৭ সূক্তে আছে "১১। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন।" এই মণ্ডলের ১৬ সূক্তে আছে, "৪৭। হে অগ্নি! আমরা তোমাকে হৃদয় দ্বারা সংস্কৃত ঋক্ রূপ হব্য প্রদান করিতেছি। কাশালী বৃষভ ও ধেনুগণ তোমার নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ হব্য হউক।" ২৮ সূক্তে আছে "৪। রেণু সকলের উত্থা-পনকারী সামরিক অশ্ব * * যেন যজ্ঞে বিশসনাদি (বলিদানাদি) সংস্কার প্রাপ্ত না হয়।" অপরন্তু দশম মণ্ডলের ২৭ সূক্তে আছে "২। হে ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদের সহিত একত্র স্থূলকায় বৃষকে পাক করি।" ২৮ সূক্তে আছে "৩। হে ইন্দ্র! * * * তাহারা বৃষভ পাক করে; তুমি তাহা ভোজন কর।"

দশম মণ্ডলের ৮৯ সূক্তে গোহত্যা স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে। "১৪। যেরূপ গোহত্যাস্থানে গাভীগণ হত হয়, তদ্রূপ তোমার এই অস্ত্রের দ্বারা নিহত হইয়া বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করে।" গোহত্যা প্রথা বিশেষ রূপ প্রচলিত না থাকিলে তজ্জন্য ভিন্ন-স্থান নির্দ্ধারিত থাকা সম্ভব নহে। ৫১ সূক্তে আছে "১৪। যে অগ্নির উপর বিস্তর ঘোটক, বলবান বৃষ, পুরুষত্ব-বিহীন মেষ আহুতিরূপে অর্পণ করা হইয়াছে, * * * সেই অগ্নির উদ্দেশ্যে মনে মনে চিন্তা করিয়া এই সুন্দর স্তব রচনা করিতেছি।" গোবধ, অশ্ববধ ও মেষবধের প্রমাণ রহিয়াছে। অশ্বভোজনের উল্লেখ অতি কদাচিত পাওয়া যায়। বোধ হয়, আর্য্যহিন্দুরা মধ্য এসিয়া হইতে এই রীতি লইয়া পঞ্জাবে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে আসিলে তাহা এক রকম উঠিয়া যায়। অপ্রাচীনতম সময়ে দিগ্বিজয় করিয়া সম্রাট মহারাজ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতে হইলে অশ্ববধ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত। প্রাচীন সময়ে যাগ পূর্ব্বক অশ্বমাংস ভোজনের যে নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইয়াই যে অবশেষে প্রতাপশালী নৃপতি-বর্গের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপ্রাচীন সময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে যে আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া-কাণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বৈদিকযুগে তাহার কিছুই প্রচলিত ছিল না।

বৈদিক সময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ যে প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইতে, ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলে ১৬২ সূক্তে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ হইলেও নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"১। যেহেতু আমরা যজ্ঞে দেবজাত দ্রুতগতি অশ্বের বীরকর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি। অতএব মিত্র বরুণ, অর্য্যমা, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা এবং মরুৎগণ যেন আমাদিগের নিন্দা না করেন।

"২। সুন্দর স্বর্ণাভরণে বিভূষিত অশ্বের সম্মুখে (ঋত্বিকগণ) উৎসর্গার্থ ছাগ ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিবিধ বর্ণ ছাগ শব্দ করতঃ তদভিমুখে গমন করিতেছে, উহা ইন্দ্র ও পূষার প্রিয় অন্ন হউক।

"৩। সকল দেবতার উপযুক্ত ছাগ পূষারই ভাগে পড়ে, উহাকে দ্রুতগতি অশ্বের সহিত সম্মুখে আনা হইতেছে। অতএব দেবতাগণের মহাভোজনের নিমিত্ত অশ্বের সহিত এই অজ হইতে সুস্বাদ্য পুরোডাশ প্রস্তুত করুন।

"৪। যখন ঋত্বিকগণ দেবতাগণের লভ্য হবির্যোগ্য অশ্বকে প্রতি ঋতুতে তিন বার অগ্নির নিকট লইয়া যায়, সেই সময় পূষার প্রথম ভাগের ছাগ দেবতাগণকে যজ্ঞের কথা জ্ঞাপন করিয়া অগ্রে গমন করে।

"৬। যাঁহারা যূপ বৃক্ষচ্ছেদন করে, যাহারা যূপবৃক্ষ বহন করে, যাহারা অশ্বযূপের জন্য চষাল (যূপাগ্রভাগ) প্রস্তুত করে, যাহারা অশ্বের জন্য পাত্র সংগ্রহ করে, আমাদের সঙ্কল্পই যেন তাহাদের সঙ্কল্প হয়।

"৭। আমাদের মনোরথ আপনিই সিদ্ধ হউক, মনোহর পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব দেব-তাগণের আশা পূরণার্থ আগমন করুক। দেবতাগণের পুষ্টির জন্য আমরা উহাকে উত্তমরূপ বন্ধন করিব, মেধাবী ঋত্বিকগণ আনন্দিত হউন।

"৮। যে রজ্জু দ্বারা অশ্বের গ্রীবা বদ্ধ হয়, যাহার দ্বারা উহার পদ বদ্ধ হয়, যে রজ্জু উহার মস্তকে বদ্ধ থাকে, সেই রজ্জ সকল এবং উহাব মুখে যে ঘাস নিক্ষেপ কর হয়, সে সমস্তই দেবগণের নিকট গমন করুক।

"৯। অশ্বের অপক্ক মাংসের যে অংশ মক্ষিকা ভক্ষণ করে, ছেদন কালে বা পবি ষ্কাব করিবার সময ছেদন ও পরিষ্কাব সাধন-অস্ত্রে যাহা লিপ্ত হয়, ছেদকের হস্ত দ্বয়ে এবং নখে যাহা লিপ্ত থাকে, সে সমস্তই দেবগণেব নিকট গমন করুক।

"১০। উদরেব যে অজীর্ণ তৃণ বাহিব হইয়া যায়, অপক্ক মাংসেব যে লেশ মাত্র থাকে, ছেদন কর্ত্তা তাহা নির্দ্দোষ করুন, এবং পবিত্র মাংস দেবতাগণের উপযোগী করিয়া পাক করুন।

"১১। হে অশ্ব! অগ্নিতে পাক কবিবাব সময তোমাব গাত্র হইতে যে রস বাহিব হয়, এবং যে অংশ শূলে আবদ্ধ থাকে, তাহা যেন ভূমিতে পড়িয়া না থাকে, এবং তৃণেব সহিত মিশ্রিত না হয়। দেবতারা লালায়িত হইয়াছেন, সমস্তই তাঁহাদিগকে প্রদান করা হউক।

"১২। যাহাবা চারিদিক হইতে অশ্বেব পাক দর্শন করে, যাহারা বলে উহার গন্ধ মনোহব হইয়াছে, এখন নামাও, এবং যাহারা মাংস ভিক্ষা জন্য অপেক্ষা করে, তাহাদিগের সঙ্কল্প আমাদিগেরই সঙ্কল্প হউক।

"১৩। যে কাষ্ঠ দণ্ড মাংস পাপ পরীক্ষার্থ ভাণ্ডে দেওয়া যায়, যে সকল পাত্রে রস (ঝোল) রক্ষিত হয়, যে সকল আচ্ছাদন দ্বারা উষ্ণতা রক্ষিত হয়, যে বেতস শাখা দ্বারা অশ্বের অবয়ব প্রথমে চিহ্নিত করা হয়, এবং যে ছুরিকা দ্বারা (পরে এই চিহ্ন অনুসারে অবয়ব কর্ত্তিত হয়) ইহারা সকলেই অশ্বের মাংস প্রস্তুত করিতেছে।

"১৪। যে স্থানে অশ্ব গমন করিয়াছিল, যেস্থানে উপবেশন করিয়াছিল, যেস্থানে লুণ্ঠন করিয়াছিল, যাহাদ্বারা উহার পদ বদ্ধ হইয়াছিল, যাহা সে পান করিয়াছিল, এবং যে ঘাস আহার করিয়াছিল, সে সমস্তই দেবতাগণেব নিকট গমন করুক।

"১৫। হে অশ্বগণ, অগ্নি যেন তোমাকে শব্দ করাইতে না পারে, অত্যন্ত অগ্নি সংযোগে প্রতপ্ত সুগন্ধী ভাণ্ড যেন চলিত না হয়। (যজ্ঞের) জন্য অভিপ্রেত, (হোমের) জন্য আনীত সম্মুখে প্রদত্ত বষটকার দ্বারা শোভিত অশ্ব দেবগণ গ্রহণ করুন।

"১৬। অশ্বকে যে আচ্ছাদন-যোগ্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা যায়, উহাকে যে হিরণ্ময় আভরণ সকল প্রদান করা যায়, যদ্দ্বারা তাহার মস্তক ও পাদ বদ্ধ করা যায়, এই সকল বস্তু দেবতাগণের প্রিয়। ঋত্বিকগণ দেবগণকে এই সকল প্রদান করিতেছেন।

"১৬। হে অশ্ব! তুমি সবলে নাসাধ্বনি করতঃ গমনে বিরত হইতে কশাঘাত দ্বারা অথবা তোমাব পার্শ্ব দেশে পদাঘাত দ্বারা যে ব্যথা উৎপন্ন হইয়াছিল, যজ্ঞে শ্রুক দ্বারা যে হব্য প্রদত্ত হয়, সেই রূপ মন্ত্র দ্বারা তোমার সেই সমস্ত ব্যথা আহুতি প্রদান করি।

"১৮। দেবতাগণের বন্ধু স্বরূপ অশ্বের বক্রভূত চতুস্ত্রিংশৎ পার্শ্বাস্থি ছেদনের জন্য স্বধিতি (খড়্গ) গমন করিতেছে। (হে অশ্ব-ছেদক!) এরূপ বুদ্ধি প্রকাশ কর যেন

ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি ছিন্ন হইয়া না যায়; শব্দ করিয়া ও দেখিয়া দেখিয়া ছেদন কর।

"১৯। ঋতুই তেজঃপুঞ্জ অশ্বের একমাত্র বিনাশকর্ত্তা এবং দুইজন তাহাকে ধারণ করেন। হে অশ্ব! তোমার শরীরের যে অবয়ব সকল যথাকালে কর্ত্তন করি, তাহা পিণ্ডাকারে অগ্নিতে প্রদান করি।

"২০। হে অশ্ব! যখন তুমি দেবতাদের নিকট গমন কর, তখন তোমার প্রিয় দেহ যেন তোমাকে ক্লেশ না দেয়। স্বধিতি তোমার অঙ্গে যেন অধিক ক্ষণ না থাকে। মাংসলোলুপ ও অনভিজ্ঞ ছেদক অস্ত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ গুলি অতিক্রম করিয়া তোমার গাত্র যেন বৃথা ছিন্ন না করে।

"২১। হে অশ্ব! তুমি মরিতেছ না; অথবা লোকে তোমায় হিংসা করিতেছে না; তুমি উত্তম পথে দেবতাগণের নিকট গমন করিতেছ। ইন্দ্রের হবি নামক অশ্বদ্বয়, এবং মরুৎগণের পৃষতীনামক বাহন দ্বয়, তোমার রথে যোজিত হইবে। অশ্বিদ্বয়ের বাহন রাসভের পরিবর্ত্তে কোন দ্রুতগতি অশ্ব তোমার রথে সংযুক্ত হইবে।

"২২। এই অশ্ব আমাদিগকে গো ও অশ্ববিশিষ্ট জগৎপোষক ধন প্রদান করুন; আমাদিগকে পুরুষ অপত্য প্রদান করুক; তেজস্বী অশ্ব আমাদিগকে পাপ হইতে বিরত করুক। হবির্ভূত অশ্ব আমাদিগকে শারীরিক বল প্রদান করুক।"

বৈদিক সময়ে সোমরস ভিন্ন অন্য কোন মাদক দ্রব্য পান করা হইত না। প্রাচীন আর্য্যেরা সোমরসের ভক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষে সোম নামে, আর ইরাণে 'হওম' নামে ইহার স্তব পর্য্যন্ত হইত, এবং ঋগ্বেদের একটী সমগ্র মণ্ডল এই সোমের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ভারতের তেজস্বী আর্য্যেরা ইরাণের শান্তিপ্রিয় আর্য্যদের অপেক্ষা এই মাদক সোমরসের বিশেষ আদর করিতেন, এবং ইরাণীয় জেন্দাভেস্তাতে ভারত-আর্য্যদের এই ঘৃণিত সোম-রসাসক্তির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মনে করেন যে, এই সোমরসানুরক্তিই ভারত-আর্য্য ও ইরাণি আর্য্যের (দেব ও অসুরের) বিচ্ছেদের প্রধান কারণ।

যে প্রণালীতে সোমরস প্রস্তুত হইত, নবম মণ্ডলের ৬৬ সূক্তে এবং অপরাপর সূক্তে তাহার বিস্তর বর্ণনা রহিয়াছে। এস্থলে প্রথমোক্ত সূক্তের কতিপয় ঋকের অনুবাদ করিতেছি।

"২। হে সোম! তোমার যে দুইটী পত্র বৃক্ষভাবে অবস্থিত ছিল, তদ্দ্বারা তোমার সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার শোভা হইয়াছিল।

"৩। হে সোম! তোমার চতুর্দ্দিকে লতা অবস্থায় যে সকল পত্র বিদ্যমান, তদ্দ্বারা তুমি তাবৎ ঋতুতে সুশোভিত ছিলে।

"৭। হে সোম! তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হইয়াছে; তুমি আনন্দ বিধান করিতে করিতে ধারারূপে ইন্দ্রিয়ের দিকে যাও এবং অক্ষয় আহার বিতরণ কর।

"৮। সাতটি স্ত্রীলোক অঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে চালনা করিতে করিতে এক স্বরে তোমার বিষয়ে গান করিল, তাহারা কহিল যে, তুমি যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির যজ্ঞ স্থলে সকল কার্য্য স্মরণ করাইয়া দাও।

"৯। যখন তুমি শব্দ করিতে করিতে জলের সহিত মিশ্রিত হও, তখন কয়েকটী অঙ্গুলি একত্র হইয়া মেষলোমের উপর তোমাকে শোধন করিতে থাকে, তৎ-

কালে তোমার ফেণা বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং মেষ লোম হইতে শব্দ উঠিতে থাকে।

"১০। হে সৎ কর্ম্মশালী ও বলশালী সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারাগুলি এরূপভাবে বহিতে থাকে, যেরূপ ঘোটকগণ খাদ্য আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইয়া থাকে।

"১১। কলসের উপর মেষলোম সংস্থাপন পূর্ব্বক অঙ্গুলিবর্গ সুমধুর রসের ক্ষরণকারী সোমকে পুনঃ পুনঃ চালিত করিতে লাগিল।

"১২। সোমরসগুলি কলসের মধ্যে সেইরূপ অন্তর্হিত হইয়া গেল, যেমন নবপ্রসূত গাভীগণ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে।

"১৩। হে সোম! যখন তুমি ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুর সহিত মিশ্রিত হও, তৎকালে জলপ্রবাহিত হইয়া বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে তোমার দিকে যাইয়া থাকে।

"২৯। এই যে সোমরস, ইনি গোচর্ম্মের উপর প্রস্তরের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, ইনি আনন্দ লাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন।"

সিদ্ধিসেবক মহাশয়েরা যে প্রণালীতে সিদ্ধি প্রস্তুত করেন, উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সোমরসও তদ্রূপ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া দুগ্ধের সহিত পীত হইত। ঋগ্বেদের কবিগণ সোমরসের মাহাত্ম্য ও গুণগান করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহাদের তাদৃশ বর্ণনা হইতে অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। নবম মণ্ডলের ১০৮ মন্ত্রে আছে "৩। হে সোম! তোমার উজ্জ্বল কিছুই নাই। তুমি যখন ক্ষরিত হও, তখন দেবতাবংশজাত তাবৎ ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে থাক।" ১১০ মন্ত্রে আছে "৮। প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদের পেয়বস্তু হইয়াছেন। স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে তাঁহাকে দোহন করা হইয়াছিল। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হইলেন, তখন তাহাকে স্তব করিতে লাগিল।" পুনরপি ১১৩ মন্ত্রে আছে "৭। যে ভুবনে সর্ব্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে, হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত ও অক্ষয়ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

নবম মণ্ডলে এইরূপ ঋক্ অনেক রহিয়াছে। কে ভাবিয়াছিল যে, ঋগ্বেদের এই সামান্য সোমরস বর্ণনা হইতে পৌরাণিক সমুদ্র মন্থন ও অমৃত উৎপত্তির উপাখ্যান সৃষ্টি হইয়াছে? সোমরস দেবগণের প্রাচীন পানীয় দ্রব্য; স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে সোমকে দোহন করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে আকাশকে জলীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত, এবং অনেক সময় সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে ভাবময়ী কল্পনার সাহায্যে সমুদ্র হইতে অমৃত মন্থনরূপ পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র হইতে বোধ হয় যে, তৎকালে অনেক প্রকার শিল্পপ্রণালীর বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বস্ত্রবয়ন প্রথা অতি উত্তম রূপে প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকেরা তানাপোড়েন সাহায্যে কাপড় প্রস্তুত করিত। *

* দ্বিতীয় মণ্ডলের ২ সূক্তে আছে "৬। আমাদের সাধু কর্ম্মকারের চিরপ্রদায়ী (অগ্নিরূপ) উষা ও নক্ত-বয়ন কুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায় সাহায্যার্থ পরস্পর গমনাগমন করতঃ যজ্ঞের রূপ নির্ম্মাণার্থ পরস্পরকে আনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত তন্তু বয়ন কার্য্য করুন।" উক্তমণ্ডলের ৩৮ সূক্তে আছে "৪। বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর ন্যায় রাত্রি পুনর্ব্বার আলোককে [illegible] বেষ্টন করিতেছেন।"

ষষ্ঠ মণ্ডলের ৯ সূক্তে "আমি তন্ত (তানা-সূত্র) অথবা ওতু (পড়্যানসূত্র) জানি না, কিম্বা সতত চেষ্টাদ্বারা যে (বস্ত্র) বয়ন করে, তাহার কিছুই অবগত নহি।" যজ্ঞের তন্ত্র ও ওতু জানেন না বলিয়া ঋষি ভরদ্বাজ আক্ষেপ করিয়াছেন। ১০ মণ্ডলের ২৬ সূক্তে আছে "৬। পূষাদেবই * মেষলোমের বস্ত্র বয়ন করেন; তিনিই বস্ত্র ধৌত করেন।"

বোধ হয়, সেই প্রাচীন সময়েও প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন নাপিত ছিল; এবং প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ৪৪ ঋকে অরণ্য-দাহ করিয়া ভূমি পরিষ্কার করাকে কি এক অর্থে ভূমি-কামান বলিয়া বর্ণনা আছে। † সূত্রধরের ব্যবসায়ও প্রচলিত হইয়াছিল; অনেক স্থানে রথ ও শকটের উল্লেখ রহিয়াছে। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩সূক্তে আছে, "১৯। রথের খদির কাষ্ঠের সারকে দৃঢ় কর; রথের শিশপা কাষ্ঠকে দৃঢ় কর। হে দৃঢ় ও আমাদের দৃঢ়ীকৃত অক্ষ! দৃঢ় হও,এই রথ হইতে আমাদিগকে ফেলিয়া দিও না।" চতুর্থ মণ্ডলের ২।১৪ ঋকে রথের এবং ১৬ সূক্তের ২০ ঋকে ভৃগুগণ অর্থাৎ সূত্রধরগণের উল্লেখ আছে। স্বর্ণ, লৌহ, প্রভৃতি ধাতুরও প্রচলন ছিল। পঞ্চম মণ্ডলের নবমসূক্তে ৫ঋকে কর্ম্মকার-গণের ভস্ত্রাদি দ্বারা অগ্নিকে সংবর্দ্ধিত করিয়া অগ্নির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধির বর্ণনা আছে, এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ৪ ঋকে স্বর্ণকারের ধাতু দ্রবীভূত করিবার বর্ণনা রহিয়াছে।

বৈদিক সময়ের স্বর্ণালঙ্কার, লৌহযন্ত্র এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বর্ণনা হইতে তৎকালে কর্ম্মকার ও স্বর্ণকারাদির ব্যবসায়ের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভূয়োভূয়ঃ স্থলে এতাবৎ সম্বন্ধীয় বর্ণনা রহিয়াছে; কিন্তু আমরা যে কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতে তৎকালীন শিল্পাদির আভাস পাওয়া যাইবে। প্রথম মণ্ডলের ১৪০ সূক্তের ১০ ঋকে বর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ আছে; দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩০।৪ ঋকে খৃগলাশব্দের ব্যবহার আছে; তাহার অর্থ তনুত্রাণ *। চতুর্থ মণ্ডলের ৫৩।২ ঋকে 'পিশঙ্গদ্রাপি' উল্লেখ আছে; তাহার অর্থ হিরণ্ময় কবচ। আর উদাহরণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৪।৩ ঋকে সিপ্র শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে; ইহার অর্থ শিরস্ত্রাণ। † ৪র্থ মণ্ডলের ৩৪।৯ ঋকে অংসত্র নামে স্কন্ধকারী ঢাল বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চম মণ্ডলের ৫২।৬ ও ৫৬।১১ ঋকে ঋষ্টি নামক বল্লভ-অস্ত্রের বর্ণনা আছে। পঞ্চম মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে আছে "২। হে সুবুদ্ধিমরুৎগণ! তোমাদিগের বাশী ‡ ও ঋষ্টি ও উৎকৃষ্ট ধনুক, বাণ, তূণীর, শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও রথ আছে।" ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ২৭।৬ ঋকে ত্রিংশৎবর্ম্মী যোদ্ধার, ৭৫।১১ ঋকে পক্ষবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্র, দীপ্তবাণের এবং ৪৭।১০ ঋকে লৌহময় (খড়্গ) ধারার

---

* পূষা মেষপাল ও গোপালের দেবতা, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি।

† "৪। কেশবিশিষ্ট তিনজন (অগ্নি, আদিত্য ও বায়ু) সংবৎসরের মধ্যে যথাসময়ে ভূমি পরিদর্শন করেন। উহাদের মধ্যে একজন পৃথিবীকে কামাইয়া দেন, একজন নিজ কর্ম্ম দ্বারা পরিদর্শন করেন, আর এক জনের রূপ দৃষ্ট হয় না, কেবল গতি দৃষ্ট হয়।

* সায়ন।

† আধুনিক সিরপা বা শিরোভূষণ এই সিপ্র হইতে উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

‡ বাশী অস্ত্রবিশেষ সূত্রধরের বাইশের ন্যায় যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রবিশেষ।

উল্লেখ দেখিতেছি। এই ৪৭ সূক্তের ২৬ ঋকে যুদ্ধোপযোগী রথের এবং ২৯ ঋকে যুদ্ধ-দুন্দুভি বর্ণনা আছে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে যুদ্ধের সাজসজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্রের যে বর্ণনা রহিয়াছে, আমরা পরবর্ত্তী কোন অধ্যায়ে তাহার অনুবাদ করিয়া দিব।

চতুর্থ মণ্ডলের ২। ৮ ঋকে "হেম্যাবান অশ্ব" হইতে অশ্বের সুবর্ণ নির্ম্মিত সজ্জার ব্যবহার ছিল, তাহা জানিতে পারি। চতুর্থ মণ্ডলের ৩৭। ৪, পঞ্চম মণ্ডলের ১৯। ৩ এবং অন্যান্য অনেক স্থলে নিষ্ক নামক স্বর্ণময় কণ্ঠাভরণের উল্লেখ আছে। ৫ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ৪ ঋকে মারুৎগণের দীপ্তির সহিত অঞ্জি, বাশী, স্রক্, রুক্ম (বক্ষস্ত্রাণ) ও খাদির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। উক্ত মণ্ডলের ৫৪।১১ ঋকে পুনর্ব্বার "অংশে ঋষ্টি, পাদদেশে খাদি, বক্ষে রুক্ম এবং শিরে সিপ্রা" বা স্বর্ণ মুকুটের উল্লেখ দেখিতে পাই।

এই সকল উদ্ধৃত মন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যুদ্ধাস্ত্র, সজ্জা ও আভরণাদির প্রস্তুত করণ শিল্পের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৮। ১৮ ঋকে দৃতি নামক চর্ম্মাধারের এবং পঞ্চম মণ্ডলের ৩০। ১৫ ঋকে অস্কর নামক লৌহ-কলসের এবং অনেক স্থলে অযোনির্ম্মিত পুরীর* উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ৪র্থ মণ্ডলের ৩০।২০ ঋকে এবং অন্যান্য মন্ত্রে শতসংখ্যক অশ্মময়ী (প্রস্তর নির্ম্মিতা) নগরীর কথা আছে।

যে সকল প্রস্তরময় ও পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রাচীন আর্য্যেরা স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তথাকার প্রস্তর হইতে অল্প পরিশ্রমে যে স্থায়ী গৃহাদি প্রস্তুত করিতে তাঁহারা অতি অল্প সময় মধ্যে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর গৃহাদি প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত করিতেন, তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি। গৃহ-নির্ম্মাণ প্রণালীর যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪১।৫ ঋকে এবং পঞ্চম মণ্ডলের ৬২। ৬ 'সহস্র স্তম্ভ' সৌধাদিরূপ গৃহের উল্লেখে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্বেদের সময়ে কোন প্রকার মূর্ত্তি বা প্রতিমা গঠন প্রণালী বা প্রস্তর লিখন প্রচলিত ছিল না, একথা নিঃসন্দেহ। বৌদ্ধ যুগের বহুদিনের পূর্ব্বকার কোন প্রকার খোদিত প্রস্তর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। এবং ইউরোপের মিউজিয়ম সমূহে মিসর, বেবিলন, গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষের যে রাশীকৃত প্রস্তর লিখন ও প্রস্তর মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও বৌদ্ধ যুগের বহুদিন পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কোন চিহ্ন নাই।

আমাদের গৃহে যে সকল পশু পক্ষ্যাদি গৃহপালিত হইতেছে, ঋগ্বেদের সময়ে তাহার সমস্তই গৃহে পোষিত হইত। অনেক মন্ত্রে তেজস্বী যুদ্ধাশ্বের বিবরণ রহিয়াছে।

বস্তুতঃ আদিম দাস জাতির সহিত যুদ্ধাদিতে অশ্বের এত প্রয়োজন হইয়া উঠিল এবং তাহার আদর এত বাড়িল যে, দধিক্রানামে শীঘ্রই অশ্ব-পূজা প্রবর্ত্তিত হইল। ৪র্থ মণ্ডলে ৩৮ সূক্তে আছে "৭। সেই অশ্ব সহনশীল এবং বলবান্, এবং সময়ে স্বশরীর দ্বারা কার্য্যসাধন করেন। তিনি ঋজুগামী ও বেগগামী শত্রু সেনামধ্যে বেগে গমন করেন! তিনি ধূলি উৎক্ষেপ করত ভ্রূদেশের উপরে বিক্ষেপ করেন।

"৮। যুদ্ধাভিলাষীগণ দীপ্তিমান অশনির

---

* সপ্তম মণ্ডল ২। ৭ ১৫। ১৪ এবং ৯৫। ১

স্থায় হিংসাকারী এই দধিক্রাকে ভয় করে! যখন তিনি চতুর্দ্দিকে সহস্র লোককে প্রহার করেন, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়া ভীম ও দুর্বার হইয়া উঠেন।

"১০। সূর্য্য যেরূপ তেজঃ দ্বারা জলদান করেন, সেইরূপ দধিক্রাদেব বলদ্বারা পঞ্চ কৃষ্টিকে বিস্তৃত করিয়াছেন। শতসহস্র দাতা বেগবান্ অশ্ব আমাদিগের স্তুতিবাক্য মধুর ফলের দ্বারা সংযোজিত করুন।"

চতুর্থ মণ্ডলের ৪। ১ ঋকে 'অমাত্যের সহিত গজ স্কন্ধারূঢ় রাজার উল্লেখ আছে। পালিত পশুর মধ্যে গাভী, ছাগ, মেষ, মহিষ এবং কুকুরের বর্ণনা আছে! কুকুর ঋক-গ্বেদের সময়ে ভার বহন করিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধবিগ্রহ।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রাচীন আর্য্যেরা পঞ্জাবের আদিম নিবাসীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া সিন্ধু ও তৎসন্নিহিত নদীসমূহের পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত উর্ব্বর ভূমি অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু আদিমনিবাসীরা যে দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজ অধিকার ছাড়িয়া দিল, তাহা নহে। অনার্য্যেরা সমরক্ষেত্রে ও সম্মুখ যুদ্ধে হিন্দুরশৌর্য্য দ্বারা পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপাদ হইলেও আর্য্যদের নবাধিকৃত গ্রাম ও উপনিবেশের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে ও গিরিকন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুদিগকে বিপাকে পাতন, গ্রামলুণ্ঠন ও তাহাদের গাভীচৌর্য্য প্রভৃতি যে কোন উপায়ে হউক উত্তেজিত করিত এবং সময়ে সময়ে বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিত। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিজেতারা বিজিত অনার্য্য জাতীয় সমূহকে একান্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণাচক্ষে দেখিতেন। খ্রীষ্টের সপ্তদশ শতাব্দীর পরে আমেরিকা দেশে বিজিত আদিম জাতিদিগের যে দশা, আর খ্রীষ্টের সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পঞ্জাবে বিজিত অনার্য্য জাতিদিগেরও সেই দশা ঘটিল। আধুনিক সময়ে আমেরিকায় ইউরোপীয় বিজেতাগণ সাহসী ও তেজস্বী আদিমজাতিদিগের নির্ম্মূল করিয়াছেন, প্রাচীন পঞ্জাবে আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে তেমনি নির্ম্মূল করিলেন।

অনার্য্যের সহিত যুদ্ধবিরোধের কথা ঋগ্বেদের অনেক স্থলে রহিয়াছে। তাহার কতিপয় মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "ইন্দ্র বজ্ররূপ অস্ত্র লইয়া বীরকার্য্যে উৎসাহ পূর্ণ হইয়া দস্যুদিগের নগর সমূহ বিনাশ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন। হে বজ্রধারিন্, আমাদিগের স্তুতি অবগত হইয়া দস্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর; হে ইন্দ্র, আর্য্যগণের বল ও যশঃবর্দ্ধন কর।" ১ মণ্ডল ১০৩। ৩।

ইহার পরে মন্ত্রেই সিকা, অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী, ক্ষুদ্রনদী চতুষ্টয়ের তীরবর্ত্তী গুপ্তগৃহে দস্যুদের অবস্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় নদীর আধুনিক নাম জানা যায় নাই। সেই দস্যুবংশে জাত ভীলসর্দার তাঁতিয়া যেমন অধুনাতন সময়ে মধ্যভারতবর্ষে শান্তিপূর্ণ গ্রামে লুণ্ঠনাদি করিয়া বেড়াইত, তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরাও তদ্রূপ গুপ্তগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আর্য্যদিগকে উত্তেজিত করিত। "কুয়ব পরের ধন জানিতে পারিয়া স্বয়ং অপহরণ করে, জলে বর্ত্তমান থাকিয়া স্বয়ং কেন (যুক্ত জল) অপহরণ করে, কুয়বের দুই ভার্য্যা সেই জলে স্নানকরে, তাহারা যেন শিফা-নদীর গভীর নিম্নভাগে হত হয়। অয়্

(অর্থাৎ উপদ্রবকারী কুয়ব দস্যু) জল মধ্যে অবস্থান করে এবং তাহার বাসস্থান গুপ্ত ছিল; সেই শূর পূর্ব্ব অপহৃত জলের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বিরাজ করে। অঞ্জসী, কুলিসী ও বীরপত্নী নদীত্রয় স্বকীয় জলদ্বারা তাহাকে প্রীত করিয়া জলদ্বারা তাহাকে ধারণ করে। বৎসপ্রিয় গোরু যেরূপ গোষ্ঠের পথ জানে, আমরা সেইরূপ সেই অসুরের গৃহেরদিকে যে পথ গিয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। হে মঘবন্! সেই অসুরের পুনঃ পুনঃ কৃত উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।" প্রথম মণ্ডলের ১০৪ সূক্তের ৩,৪, ও ৫ ঋক।

অন্যত্র রহিয়াছে;—"ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন। অসংখ্য বার রক্ষাকারী ইন্দ্র সমস্ত যুদ্ধে তাহাকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য ব্রত-রহিত ব্যক্তিদিগকে শাসন করেন। তিনি (কৃষ্ণ অসুরের) কৃষ্ণ ত্বক্ উন্মোচন করিয়া তাহাকে বধ করেন। তিনি উহাকে ভস্মীভূত করেন। তিনি সমস্ত হিংসকদিগকে দগ্ধ করেন এবং সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করেন।" প্রথম মণ্ডল ১৩০।৮। পুনরপি এই মণ্ডলের ১৩৩ সূক্তে ২ হইতে ৫ ঋকে আছে—"হে (শত্রু) ভক্ষক ইন্দ্র! তুমি হিংসাবতী সেনার মস্তক একত্র করিয়া তোমার বিস্তৃত পদদ্বারা ছেদন কর। তোমার পদ মহা বিস্তীর্ণ। হে মঘবন্! এই হিংসাবতী (সেনার) বল চূর্ণ কর এবং কুৎসিৎ শ্মশানে বা মহাশ্মশানে নিক্ষেপ কর। হে ইন্দ্র। তুমি এইরূপ ত্রিগুণিত পঞ্চাশৎ সংখ্যক সেনা নাশ করিয়াছ। লোকে তোমার এই কার্য্যকে বড় ভাল বলিয়া মনে করে। কিন্তু তোমার পক্ষে এ কার্য্য সামান্য। হে ইন্দ্র! তুমি অতি ভয়ঙ্করী পিশাচীকে * বিনাশ কর, এবং সমস্ত রাক্ষসগণকে নিঃশেষ কর।" "হে ইন্দ্র! অর্চ্চনীয় অন্ন লাভের জন্য কবি তোমার স্তব করিতেছে, তুমি পৃথিবীকে দাসের শয্যা করিয়া দিয়াছ। অথবা তিন ভূমিকে দাসদ্বারা বিচিত্র করিয়াছ, এবং দ্যুর্য্যানি রাজার জন্য কুযবাচকে হনন করিয়াছ। হে ইন্দ্র! নব্য ঋষিগণ তোমার সনাতন প্রবৃদ্ধ বীরকর্ম্মের স্তুতি করে, তুমি অনেক হিংসকদিগকে সংগ্রাম নিবারণের জন্য বিনাশ করিয়াছ। তুমি দেব-রহিত বিপক্ষ নগর সকল ভেদ করিয়াছ এবং দেবরহিত শত্রুর অস্ত্র নত করিয়াছ।" (প্রথম মণ্ডলের ১৭৪ সূক্ত, ৭ ও ৮ ঋক) "হে অশ্বিদ্বয়! জঘন্য শব্দ করতঃ কুক্কুরের ন্যায় যাহারা আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বিনাশ কর। তাহারা সংগ্রাম করিতে চাহে, তাহাদিগকে মারিয়া ফেল। তাহাদিগকে মারিবার উপায় তোমরা জান। তোমাদিগকে যাহারা স্তুতি করে, তাহাদের প্রত্যেক কথা রত্নবতী কর। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার স্তুতি রক্ষা কর।" (প্রথম মণ্ডলের ১৮২ সূক্ত, ৪ ঋক্) "দ্যুতিমান, কীর্ত্তিমান অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন, শত্রুনাশক বলবান্ ইন্দ্র যেন শোক-অনিষ্ঠকারী দাসের প্রিয় মস্তক নিম্নে ক্ষেপণ করেন। বৃত্রহা পুরনাশন ইন্দ্র কৃষ্ণযোনি দাস সেনাকে বিনাশ করিয়াছেন তিনি যেন। যজমানের উচ্চ অভিলাষ পূরণ করেন।" ২ মণ্ডল, ২০ সূক্ত ৬ ও ৭ ঋক।

* এখানে পিশাচ ও রাক্ষস শব্দদ্বারা বোধহয় অনার্য্য বর্ব্বরকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমেরিকায় পূর্ব্বে অশ্বের ব্যবহার ছিল না। স্পেনজাতীয়েরা আমেরিকা জয়কালে এই অশ্ব চালনা করিয়া আদিম নিবাসীদের অন্তরে যৎপরোনাস্তি ভয়ের উদ্রেক করিয়া সহজে জয়লাভ করিয়াছিলেন। আদি আর্য্যদের অশ্বচালনা দর্শনে ভারতীয় অনার্য্যজাতীয়েরাও তদ্রূপ ভয়ে অভিভূত হইত, প্রমাণার্থ অশ্বদেবতা দধিক্রার * স্তুতি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "লোকে যেরূপ বস্ত্রাপহারক তস্করকে দেখিয়া চীৎকার করে, সেইরূপ সংগ্রামে শত্রুগণ ইহাকে দেখিয়া চীৎকার করে। যেরূপ পক্ষিগণ নিম্নাভিমুখে আগমনকারী ক্ষুধার্ত্ত শ্যেনপক্ষীকে দেখিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ, লোকে এই অন্ন ও পশু-লুণ্ঠনকারী দধিক্রাকে দেখিয়া চীৎকার করে। যুদ্ধাভিলাষিগণ দীপ্তিমান্ অশনির ন্যায় হিংসাকারী এই দধিক্রাকে ভয় করে। যখন তিনি চতুর্দ্দিকে সহস্র লোককে প্রহার করেন, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়া ভীম ও দুর্ব্বার হইয়া উঠেন।" চতুর্থ মণ্ডল ৩৮ সূক্ত, ৫ ও ৮ ঋক্।

ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখা যায় যে, কুৎস নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন—; তিনি অনেক কৃষ্ণকায় অনার্য্য বিনাশ করিয়াছিলেন। চতুর্থমণ্ডলের ষোড়শ সূক্তে কথিত আছে, "মায়াবান্ ঋত্বিকশূন্য দস্যুকে বিনষ্ট করিয়া ইন্দ্র কবি-কুৎসের অভিমুখে ধন প্রসাদের জন্য গমন করিয়াছিলেন" (৯ ঋক্); "ইন্দ্র মনে মনে দস্যুবধে কৃতসংকল্প হইয়া কুৎসের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন এবং কুৎসের সখ্যতার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।" ১০ ঋক। ইন্দ্র কুৎসের সাহায্যে "পঞ্চাশৎ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করিয়াছিলেন" (১৩ ঋক্)। চতুর্থ মণ্ডলের ২৮ সূক্তে কথিত আছে যে, ইন্দ্র দস্যুদিগকে সমস্ত সদ্‌গুণ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যের নিন্দনীয় করিয়াছেন, এবং তাহাদিগের বধের জন্যই ইন্দ্র ও সোম মনুষ্যের পূজা গ্রহণ করিতেন। ৪র্থ ঋক্। উক্ত মণ্ডলের ৩০ সূক্ত পাঠে জানা যায়, ইন্দ্র পঞ্চ শতাধিক-সহস্র সংখ্যক দাসকে বিশেষরূপে বধ করিয়াছিলেন। ১৫ ঋক্।

দাস ও দস্যুদের পরাজয় ও বিনাশের কথা পঞ্চ মণ্ডলের ৭০।৩, ষষ্ঠ মণ্ডলের ১৮।৩, ও ২৫ ১ ও ২ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। দস্যুরা যে অজ্ঞাত গুপ্ত স্থানে বাস করিত, ষষ্ঠ মণ্ডলের সূ ৪৭।২০ ঋকে তাহার বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে। "আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে গোচারণভূমি-রহিত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সুবিস্তীর্ণ ধরিত্রী দস্যুগণের আশ্রয় প্রদান করিতেছে। হে বৃহস্পতি! তুমি ধেনুগণের অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদিগকে পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র! এইরূপে পথভ্রষ্ট ত্বদীয় উপাসককে তুমি পথ প্রদর্শন কর।"

ইতিপূর্ব্বে কুয়ব ও আয়ু নামে দুই দস্যুর উল্লেখ করিয়াছি। তাহারা নদীবেষ্টিত গুপ্তস্থানে লুকায়িত রহিয়া সুযোগ পাইলেই আর্য্য গ্রাম সমূহ আক্রমণ করিত। কৃষ্ণ নামে আর একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তির বন্ধন বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বোধহয়, ইহার কৃষ্ণবর্ণ হইতে আর্য্যেরা ইহাকে কৃষ্ণ নাম দিয়াছিলেন। একটী সূক্ত এস্থলে অনুবাদযোগ্য ;— "দশ সহস্র সৈন্যের সহিত দ্রুত গমনকারী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন, ইন্দ্র প্রজ্ঞাদ্বারা

* অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা। সায়ন।

সেই শব্দকারীকে প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্য-দিগের হিতাভিপ্রায়ে হিংসাকারিণী সেনা-দিগকে বধ করিলেন। (ইন্দ্র বলিলেন) দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম, সে অংশুমতী নদীর গূঢ়স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করিতেছে ও সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। হে অভিলাষপ্রদ মরুৎগণ! আমি ইচ্ছাকরি, তোমরা যুদ্ধকর, এবং যুদ্ধে তাহাকে সংহার কর। দ্রুতগামী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর সমীপে দীপ্তিমান হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে। ইন্দ্র বৃহস্পতির সহায় লাভ করিয়া দেবশূন্য আগমনশীল সেনাগণকে বধ করিলেন।" (অষ্টম মণ্ডল, সূঃ৯৬, ঋঃ ১৩—১৫)।

অনার্য্যদিগকে কেবল চীৎকারপ্রিয় ভাষাহীন জীব বলিয়া আর্য্যেরা ক্ষান্ত হয়েন নাই; অনেক স্থলে অনার্য্যেরা মনুষ্যই নয়, এইরূপ ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। "আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যু জাতি আছে, তাহারা যজ্ঞ কর্ম্ম করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদিগের ক্রিয়া স্বতন্ত্র; তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহারকারী (ইন্দ্র)! তাহাদিগকে নিধন কর; সেই দাস জাতিকে হিংসা কর।" (মঃ ১০, সূঃ ২২, ঋ ৮) দশম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, "আমি দস্যু জাতিকে 'আর্য্য' এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি।" (ঋঃ ৩), "দাসজাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ নামক দুই ব্যক্তিকে ভগ্ন করিয়াছি" (ঋঃ ৬), "যখন মনুষ্য সোম প্রস্তুত করিয়া শোধন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে, আমি তখন দাস জাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া দিখণ্ড করি, এই দশার জন্যই সে জন্মিয়াছে।" ঋঃ ৭।

ঈদৃশ অনার্য্য দস্যুদের সহিত প্রাচীন আর্য্যেরা অশেষ যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্তছিলেন। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। অবিশ্রান্ত যুদ্ধ সংগ্রাম করিয়া বিজেতাগণ নবার্জ্জিত রাজ্য রক্ষা, ক্রমশঃ কৃষি ভূমি বিস্তার, নব-গ্রাম স্থাপন, এবং অরণ্য মধ্যে নূতন শাসন ও অধিবাস পত্তন করিয়া আর্য্য-গৌরব বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনার্য্য-দিগকে ঘৃণা করিতেন, সুযোগ পাইলেই তাহাদিগের ধ্বংস সাধন করিতেন। অনার্য্যেরাও সুযোগ পাইলেই এই অত্যা-চারের প্রতিশোধ লইত। তাহারা নদী মধ্যে ও গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত রহিয়া আর্য্যদিগকে অসহায় অবস্থায় পাইলেই লুণ্ঠন করিত, গ্রাম আক্রমণ করিয়া গবাদি অপহরণ করিত, নতুবা তাহা বিনাশ করিয়া চলিয়া যাইত। কখন কখন বহু সংখ্যক ব্যক্তি হঠাৎ আর্য্যদিগকে আক্রমণ করিত। প্রত্যেক সূচ্যগ্র ভূমির জন্য অনার্য্যেরা প্রাণপণে চেষ্টা না করিয়া ছাড়িয়া দেয় নাই। তাহারা বিজেতা আর্য্যদের হোম যাগাদি কার্য্যে বাধা দিত, আর্য্য দেবতা-দিগকে ঘৃণা করিত, এবং আর্য্যদের ধন্যাদি লুণ্ঠন করিত। কিন্তু এত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আর্য্য জাতীয়দের গ্রাম, নগর, অধিবাস, কৃষি চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, নিবিড় অরণ্য কৃষি ভূমিতে পরিণত হইয়া মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও নগর সংস্থাপিত হইল, এবং এইরূপে সমগ্র পঞ্জাবে প্রাচীন আর্য্যদের অধিকার দৃঢ়ীভূত হইল। হয়, এইরূপে পঞ্জাবের সমস্ত অনার্য্য জাতির বিনাশ হইয়া থাকিবে, নতুবা ধ্বংসাবশিষ্ট অনা-র্য্যেরা, ভারতবর্ষের অসংখ্য গিরি-কন্দর

ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবে। অনার্য্যদের মধ্যে দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তিরা কেহ কেহ যে মৃত্যু বা স্বদেশ নির্ব্বাসনের পরিবর্ত্তে আর্য্যদের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, তাহা অনায়াসেই কল্পনা করা যাইতে পারে। ঋগ্বেদে দস্যুদের বর্ণনার মধ্যেও তাহাদের আর্য্য বশ্যতা স্বীকার করার কথা দেখা যায়।

আর্য্য-অনার্য্য যুদ্ধ বিগ্রহের অনেক উদাহরণ সংগৃহীত হইলেও, পরাক্রান্ত বিজেতা সুদাসের যুদ্ধ বিবরণ সম্বন্ধে ৭ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের কতিপয় ঋক অনুবাদ করিতেছি— "৮। দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট মন্দমতিগণ খনন করতঃ অদীনা নদীর কূল ভেদ করিয়া দিয়াছিল। সুদাস মহিমাদ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন। চয়মানের পুত্র কবি পালিত পশুর ন্যায় শয়ন করিয়াছিল। ৯। নদীর জল গন্তব্য প্রদেশাভিমুখেই নদীতে গমন করিয়াছিল; অগন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন করে নাই, এবং সুদাসের অশ্বগম্য প্রদেশে গমন করিয়াছিল। ইন্দ্র, সুদাসের জন্য মনুষ্যগণের মধ্যে অপত্যবিশিষ্ট জল্পক অমিত্রদিগকে অপত্যগণের সহিত বশ করিয়াছিলেন। ১১। রাজা সুদাস যশোলাভের জন্য দুইটী জনপদের একবিংশ জন সেনাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যজ্ঞগৃহে যুবা (অধ্বর্য্য) যেরূপ কুশাছেদন করে, সেইরূপ তিনি শত্রুগণকে ছেদন করেন। শূর ইন্দ্র তাঁহার সাহায্যার্থ মরুৎগণকে প্রসব করিয়াছিলেন। ১৪। অনুর ও দ্রুহ্যুর গবাভিলাষী ষষ্ঠীশত এবং ষট্‌সহস্র ষড়াধিক ষষ্ঠীসংখ্যক পুত্রগণ পরিচর্য্যাভিলাষী সুদাসের জন্য শায়িত হইয়াছিল। এই সমস্ত কার্য্য ইন্দ্রের বীর্য্যসূচক। ১৭। ইন্দ্র তখন দরিদ্র সুদাসের দ্বারা এককার্য্য করাইয়াছিলেন। প্রবল সিংহকে ছাগদ্বারা হত করিয়াছিলেন, সূচীদ্বারা কূপাদির কোণ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমস্ত ধন সুদাস রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন।"

যে কবি অবিনশ্বর ভাষায় সুদাসের এই কীর্ত্তিকলাপের প্রশংসা করিয়াছেন, সুদাস হইতে তিনি তদনুরূপ পুরস্কৃত হইয়া থাকিবেন। কারণ ২২।২৩ ঋকে কবি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছেন যে, দেববান রাজার পৌত্র পিজবনের পুত্র, সুদাসের নিকট দুই শত গো, দুইখানি রথ ও স্বর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট চারিটী অশ্ব পাইয়াছিলেন।

সপ্তম মণ্ডলের ৮৩ সূক্তে সুদাশ দশজন রাজাকর্ত্তৃক হিংসিত হইয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বশিষ্ঠরচিত সূক্তে আমরা জানিতে পারি। এই সূক্তোক্ত যুদ্ধ বর্ণনায় কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা এস্থলে অনুবাদ করিতেছি। "২। যেখানে মনুষ্যগণ ধ্বজা উত্তোলন করতঃ মিলিত হয়, যে যুদ্ধে কিছুই অনুকূল হয় না, যাহাতে দূতগণ স্বর্গ দর্শন করে ও ভীত হয়, সেই সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদের পক্ষ হইয়া কথা কও। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ, ভূমির খণ্ড সকল ধ্বংস প্রাপ্ত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, কোলাহল দ্যুলোকে আরোহণ করিতেছে। সৈন্যের শত্রু সকল আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। হে প্রার্থনা পূর্ণকারী ইন্দ্র ও বরুণ! রক্ষা করিবার জন্য আমাদের নিকট আগমন কর। ৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আয়ুধদ্বারা অনাহত ভেদকে হিংসা করতঃ তোমরা সুদাসকে রক্ষা করিয়াছ, তৃৎসুদিগের

স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছ; যুদ্ধকালে তৃৎসুদিগের পৌরহিত্য সফল হইয়াছিল। ৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! শত্রুর আয়ুধ সকল আমাকে চতুর্দ্দিক হইতে বাধা দিতেছে, হিংসকদিগের মধ্যে শত্রুরা বাধা দিতেছে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর। অতএব যুদ্ধদিনে আমাদিগকে রক্ষা কর। ৬। যুদ্ধকালে উভয় প্রকার লোকেই ইন্দ্র ও বরুণকে ধন লাভার্থে আহ্বান করে। এই যুদ্ধে দশজন রাজাকর্ত্তৃক হিংসিত সুদাসকে তৃৎসুগণের সহিত তোমরা রক্ষা করিয়াছিলে। ৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! দশজন যজ্ঞ-রহিত রাজা মিলিত হইয়াও সুদাসকে প্রহার করিতে সক্ষম হয় নাই। হব্যযুক্ত যজ্ঞে নেতাগণের স্তোত্র সফল হইয়াছিল। ইহাদের যজ্ঞে সকল দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।”

ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তে যুদ্ধাবসানে দুন্দুভির স্তব রহিয়াছে। এই রণবাদ্য যন্ত্রকে নিজ শব্দদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদিগকে ভীত করিতে এবং শত্রুদিগের অন্তরে ভয় সঞ্জাত করিয়া তাহাদিগকে সুদূরে তাড়িত করিতে প্রার্থনা করিতেছেন। সূক্তের শেষাংশে আছে “দুন্দুভি সকল ব্যক্তির নিকট সমরকাল ঘোষণা করিবার নিমিত্ত নিয়ত উচ্চরব করিতেছে। আমাদিগের নায়কগণ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সমবেত হইয়াছেন। হে ইন্দ্র! আমাদিগের রথারূঢ় সৈন্যগণ যেন যুদ্ধে জয়লাভ করে।”

ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে যুদ্ধ সামগ্রী ও যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা রহিয়াছে। প্রাচীন সময় কীদৃশ যুদ্ধাস্ত্র ও বর্ম্ম ব্যবহৃত হইত, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। “১। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে এই রাজা যখন বর্ম্ম পরিধান করিয়া গমন করেন, তখন জীমূতের ন্যায় তাঁহার রূপ হয়। হে রাজন্! তুমি অবিদ্ধ শরীরে জয় লাভ কর, বর্ম্মের সেই মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক। ২। আমরা ধনুঃদ্বারা গাভী জয় করিব। ধনুদ্বারা যুদ্ধ জয় করিব। ধনুদ্বারা তীব্র মদোন্মত্ত (শত্রু সেনা) বধ করিব। ধনুঃ শত্রুর কামনা নষ্ট করুক। আমরা ধনুঃদ্বারা সর্ব্বদিক জয় করিব। ৩। এই ধনু-সংলগ্ন জ্যা সংগ্রামকালে যুদ্ধের সময়ে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া, যেন প্রিয়বাক্য বলিবার জন্যই ধনুর্ধারীর কর্ণের নিকট আগমন করে। এবং স্ত্রী যেমন প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহে, জ্যা সেইরূপ বাণকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহে। ৫। এই তূণীর বহুতর বাণের পিতা; অনেকগুলি বাণ ইহার পুত্র। বাণ তুলিবার সময় এই তূণীর চিশ্বা শব্দ করে, এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠভাগে নিবদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধকালে বাণ প্রসব পূর্ব্বক সমস্ত সেনা জয় করে। ৬। সুসারথি রথে অবস্থান করিয়া পুরস্থিত অশ্বগণকে যেখানে যেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছাকরে, সেই খানেই লইয়া যায়। রশ্মিসমূহ অশ্বের পশ্চাতে থাকিয়া ইচ্ছামত নিয়মিত করে। তাহাদিগের মহিমা কীর্ত্তন কর। ৭। অশ্ব সকল খুর দিয়া ধূলি উড়াইয়া রথের সহিত বেগে গমন করতঃ শব্দ করিতে থাকে এবং পলায়ন না করিয়া হিংস্র শত্রুগণকে পদাঘাতে তাড়ন করে। ১১। (বাণ) সুপর্ণ ধারণ করে; মৃগ শৃঙ্গ উহার দণ্ড। উহা গাভীচর্ম্ম কর্ত্তৃক* সনাহ রূপে বদ্ধ ও প্রেরিত হইয়া পতিত হয়। নেতাগণ

* গোবিকার স্নায়ুসমূহ অথবা জ্যা।

একত্র ও পৃথক রূপে বিচরণ করেন, বাণ সমূহ আমাদিগকে সেই স্থানে সুখদান করুন্। ১৪। হস্তঘ্ন * জ্যার আঘাত নিবারণ করতঃ সর্পের ন্যায় শরীরের দ্বারা প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে এবং সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয় ও পৌরুষশালী হইয়া পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে। ১৫। যাহা বিষাক্ত, যাহার শিরোদেশ হিংসাকারী এবং যাহার মুখ লৌহময়, সেই পর্জ্জন্য ‡ কার্য্যভূত বৃহৎ ইষুদেবতাকে এই নমস্কার।

এই সকল উদাহরণই যথেষ্ঠ। অন্যত্র আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, যোদ্ধারা যে শুধু বর্ম্ম ব্যবহার করিতেন, তাহা নয়। সিপ্রা (শিরঃ মুকুট) ও অংসত্রা নামক এক প্রকার ঢালের ব্যবহার ছিল! বাশী নামে কুঠার ও ঋষ্টি নামে ভল্ল, শাণিত খড়্গাধারা ও ধনুর্বাণ তৎকালিক যুদ্ধাস্ত্র। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পুরাকালে যে কোন যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তৎসমস্তই চতুঃসহস্র পূর্ব্বে আর্য্যদের জ্ঞাত ছিল। দুন্দুভির আহ্বানে সকলে দলবদ্ধ হইয়া পতাকায় অনুগমন করিতেন, এবং রথারোহণ ও অশ্বারোহণে যুদ্ধে প্রবেশ করিতেন।

বৈদিক যোদ্ধা পুরুষেরা যে যুগে যুদ্ধাদি করিয়াছিলেন, তাহা যে অতিবিপদ-সঙ্কুল সময় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। একদিকে আদিম অনার্য্যের বিরুদ্ধে অশেষ যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, অপর দিকে আর্য্যাধিকৃত দেশ সমূহ বিভিন্ন নেতার অধীন হওয়াতে, যখন যে নেতা পরাক্রান্ত হইতেন, তখনই তিনি অত্যাসন্ন দেশকে করায়ত্ব করিতে চেষ্টা করিতেন। যজ্ঞলিপ্ত ঋষিরা শত্রুদিগের জয় লাভের জন্য এবং যুদ্ধে জয়কারী বীরপুত্রের জন্য দেবতাদের নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতেন। যৌবন উপস্থিত হইলেই প্রত্যেকে যোদ্ধা সাজিয়া বাহুবলে স্বীয় গৃহ, ভূমি ও গাভী রক্ষা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। সিন্ধু হইতে সরস্বতী প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রদেশে যে সকল আর্য্য বংশীয় লোকেরা বাস করিতেন, তাঁহারা সকলেই কর্ম্মঠ, সাহসী, যোদ্ধ্ পুরুষ ছিলেন, এবং অনার্য্যদের সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিয়াই তাঁহারা জাতীয় অস্তিত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

এই প্রকার অবস্থার কথা মনে করিতে কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু 'প্রাচীন কালে এমন' জাতি কোথায় ছিল। যাঁহারা স্বাধীনতা রক্ষা, বা অধিকার বিস্তারের জন্য সর্ব্বদা সমর সজ্জায় সজ্জিত না থাকিতেন এবং এই বর্ত্তমান সময়েও, গৌতম, বুদ্ধ ও যীশু খ্রীষ্টের শান্তি-ধর্ম্ম প্রচারের দুই সহস্র বৎসর পরে, এমন জাতি কোথায় আছে যে, প্রতিবেশীর আক্রমণ হইতে আত্ম রক্ষার্থ সতত সমর-সজ্জা না করিয়া কৃষিবাণিজ্যাদি ব্যবসা করিয়া নিরাপদে ফল ভোগ করিতেছেন? যদি ইউরোপে পঞ্চাশৎ বৎসরকাল কোন ঘোরতর যুদ্ধ না হইয়া অতিবাহিত হইয়া, থাকে, অনেকে তাহা বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন। বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপের সমস্ত দেশ আপাদ মস্তক যুদ্ধ সাজে সজ্জিত। বৃহৎ দেশ ও সাম্রাজ্য সমূহে লক্ষ লক্ষ লোক সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, তাহারা স্বগৃহ, পরিবার ও ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া

* ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম্ম বন্ধন করা যায়, তাহার নাম হস্তঘ্ন।

‡ বাণমুখ লৌহে নির্ম্মিত হইত। পর্জ্জন্য বৃষ্টির দেবতা। পর্জ্জন্যইষু বোধ হয় বর্ষাকালে জাত নল।

প্রতিবেশীর সীমন্ত প্রদেশে যাইয়া সপ্তাহ মধ্যে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত! সভ্যতার গুণে মনুষ্য অনেক উপকার লাভ করিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ বা যুদ্ধাস্ত্র এখনও জগতে বিলুপ্ত হয় নাই। প্রতিবেশী জাতিদের সহিত যুদ্ধ করিতে চির প্রস্তুত না থাকিয়া কোন জাতি শান্তিপূর্ণ কৃষি বাণিজ্যের ফল উপ ভোগ করিত পারে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সামাজিক ও গার্হস্থ্য আচার প্রণালী।

(রমণীদিগের সামাজিক অবস্থা।)

ভারতভূমির আদিম নিবাসীদের সঙ্গে এইরূপে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ সংগ্রাম করিয়া প্রাচীন আর্য্যেরা সিন্ধু হইতে সরস্বতী ভূখণ্ডে আধিপত্য স্থাপন করিলেন।

বলা বাহাল্য যে, ঋগ্বেদে সিন্ধুনদ ও তাহার পঞ্চ শাখার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ রহিয়াছে। দশম মণ্ডলে সিন্ধু সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর (৭৫) সূক্ত রহিয়াছে; নিম্নে তাহা সমগ্র অনুবাদ করিতেছি। "১। হে জল সকল! যজমানের গৃহে কবি তোমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহারা সাত সাত করিয়া তিনশ্রেণীতে চলিল; সকল নদীর উপর সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ। ২। হে সিন্ধুনদি! যখন তুমি অন্নশালী (শস্তশালী) প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে, তখন বরুণদেব তোমার যাইবার পথ কাটিয়া দিলেন। তুমি ভূমির উপর উন্নত পথ দিয়া গমন কর। তুমি সকল গমনশীল নদীর উপর বিরাজ কর। ৩। পৃথিবী হইতে সিন্ধুর শব্দ উঠিয়া আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিতেছে। মহাবেগে উজ্জল মূর্ত্তিতে ইনি চলিয়াছেন। ইহার প্রবল শব্দ হইতে জ্ঞান হয় যেন মেঘ হইতে ঘোর রবে বৃষ্টি পড়িতেছে। সিন্ধু আসিতেছেন, যেন বৃষ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতেছেন। ৪। হে সিন্ধু! যেমন শিশু-বৎসের নিকট তাহাদের জননী গাভীরা দুগ্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ আর আর নদী শব্দ করিতে করিতে জল লইয়া তোমার চতুর্দ্দিকে আসিতেছে। যেমন যুদ্ধ করিবার সময় রাজা সৈন্য লইয়া যায়, তদ্রুপ তোমার সহগামিনী এই দুইটী নদী শ্রেণীকে * লইয়া তুমি অগ্রে অগ্রে চালিতেছ। ৫। হে গঙ্গা! হে যমুনা ও সরস্বতী ও শতদ্রু এবং পরুষ্ণি (রাভি), আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী (চেনাব)-সঙ্গতা মরুৎবৃধা নদী! হে বিতস্তা (ঝিলাম) ও সুসোমা-সঙ্গতা আর্জীকীয়া (বিয়াস্) নদী! তোমরা শ্রবণ কর †। হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টমা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। পরে সুসর্ত্তু ও রসা ‡ ও শ্বেতীর সহিত মিলিলে। তুমি ক্রুমু (কুরুম্ নদী) ও গোমতী (গোমাল) নদীকে, কুভা (কাবুল নদী) ও মেহৎনুর সহিত মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি একরথে অর্থাৎ একাত্র যাইয়া থাক্। ৭। এই দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধু সরলভাবে যাইতেছে। তাহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল; তিনি অতি মহৎ; তাহার জল সকল মহাবেগে যাইয়া

---

* পূর্ব্বদিক হইতে শতদ্রু প্রভৃতি আর পশ্চিমদিক হইতে তৃষ্টমা প্রভৃতি এই দুই শ্রেণী নদী আসিয়া সিন্ধুতে পতিত হইয়াছে।

† পঞ্চম ঋকে সিন্ধু নদীর পূর্ব্বদিকের অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। ৬ ষ্ঠ ঋকে পশ্চিম দিকের অর্থাৎ কাবুল প্রদেশের নাম পাওয়া যায়।

‡ Ramha Araxes (?)

চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। যত গতিশালী পদার্থ আছে, ইহার তুল্য গতিশালী কেহ নাই। ইনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্ভুত; ইনি স্থূলকায়া রমণীর ন্যায় সৌষ্টব-দর্শন। "৮। সিন্ধু চির যৌবনা ও সুন্দরী; ইহার উৎকৃষ্ট ঘোটক ও উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি অতি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছেন। ইহার বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, ইহার তীরে সীলমা-খড় আছে, ইনি মধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত। ৯। সিন্ধু ঘোটকযুক্ত অতি সুখকর রথ যোজনা করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা এই যজ্ঞে অন্ন আনিয়া দিয়াছেন। ইহার মহিমা অতি মহৎ বলিয়া স্তব করে। ইনি দুর্দ্ধর্ষ, আপনার যশে যশস্বী এবং মহৎ।"

এই সূক্তে কবি সুদূর দৃষ্টিতে যেন তিনটী বৃহৎ নদীশ্রেণী নয়ন গোচর করিতেছেন। একশ্রেণী উত্তর পশ্চিম, আরেক শ্রেণী উত্তর পূর্ব্ব হইতে ধাবিত হইয়া সিন্ধুতে পতিত হইতেছে; তৃতীয় শ্রেণী গঙ্গা যমুনা নানা শাখা প্রশাখা সহ পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিতেছে। বৈদিক কবিদের ভূভাগ যত দূর পরিজ্ঞাত ছিল, এই সূক্ত তাহার পরিচয় দিতেছে। উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে সিন্ধু নদী ও সালিমান পর্ব্বত শ্রেণী। দক্ষিণে সিন্ধু বা সমুদ্র, পূর্ব্বে গঙ্গ-যমুনা। এতদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ বৈদিক ঋষিদের অজ্ঞাত ছিল।

পঞ্জাব প্রদেশের নদী শ্রেণীকে এক স্থানে সপ্তনদী বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে, আর একস্থলে এই সপ্তনদীর মধ্যে সিন্ধুমাতা এবং সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যদের সেই প্রথম বাস্ত ভূমি পঞ্জাবে অদ্যাপি সিন্ধুনদ ও তাহার পঞ্চ (শাখা) বিতস্তা, অসিক্লী, পরুষ্ণি অর্জিকিয়া ও শতদ্রু) প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু সেই প্রাচীন নদী সমূহ মধ্যে পবিত্রতমা ও দেবতা-সম্মান-প্রাপ্তা সরস্বতী নদীর লোপ হইয়াছে। সরস্বতীর স্রোত রাজপুতানার মরুভূমে লীন হইয়াছে।

রাজা সুদাস দত্ত রথ, অশ্ব ও অন্যান্য পুরস্কার লইয়া ঋষি বিশ্বামিত্র বিপাস ও শুতুদ্রী উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া বেগবতী স্রোতস্বতার ক্রোধ প্রশমনার্থ এক সহস্র স্তব প্রণয়ন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সুদাস নৃপতি মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন, দশজন রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অনেক সূক্তে বর্ণিত আছে। তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও বিদ্যা চর্চ্চায় উৎসাহ দিতেন, এবং বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়বংশীয় ব্যক্তিদিগকে সমভাবে আদর ও সম্মান করিতেন। এজন্য এই দুই বংশের মধ্যে যথেষ্ঠ দ্বেষ চলিত; ইহারপর তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা যাইবে।

ঋগ্বেদে পঞ্জাবীয় নদীসমূহের উল্লেখ পুনঃ ২ মিলে বটে, কিন্তু গঙ্গাযমুনার উল্লেখ কদাচিৎ পাওয়া যায়।

পঞ্জাবই যে ভারতীয় আর্য্যদের আদি স্থান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে তাঁহারা পাঁচ জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। মঃ ১।৭।৯, মঃ ১।১৭৬।৩, মঃ ৬।৪৬।৭ ঋকে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে "পঞ্চক্ষিতির" বা পাঁচটী দেশের উল্লেখ আছে। মঃ ২।২।১০, মঃ ৪।৩৮।১০, ঋকে অন্যান্য স্থানে পঞ্চকৃষ্টি

বা পঞ্চ "কৃষক" সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। এবং মঃ ৬।১১।৪, মঃ ৬।৫১।১১, মঃ ৮।৩২।২২, মঃ ১।৬৫।২৩ ঋকে "পঞ্চজন" বা পঞ্চজাতির উল্লেখ পাইতেছি।

এই সরল হৃদয়, সাহসী, উদ্যমপূর্ণ পঞ্চবংশের লোকেরা পঞ্জাবীয় নদীসমূহের উর্ব্বরকূলে কৃষি ও গোচারণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র আর্য্য হিন্দুগণ এই পঞ্চজন হইতে উৎপন্ন।

পঞ্জাবের এই পঞ্চ জাতির সামাজিক ও গার্হস্থ্য আচার ব্যবহার ও দৈনন্দিন জীবন পর্য্যালোচনারূপ কুতূহলজনক ও আনন্দজনক কার্য্যে আমরা এখন প্রবৃত্ত হইতেছি। এক মনুষ্য হইতে অনেক মনুষ্যকে এবং এক শ্রেণী হইতে আর এক শ্রেণীকে স্পষ্টরূপে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য পরবর্ত্তী সময়ে যে জন্মগত জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, ঋগ্বেদের সময় সেই অশুভকর নিয়ম বিধির কোনও চিহ্ন দেখা যায় না; এবং তৎকালে গোমাংস ভোজনে কোন আপত্তি ছিল না, এবং বণিকগণ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সমুদ্র পথে গমন করিতেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সে সময়ের ঋষিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান তপস্যায় জীবন যাপন করিতেন না, পরন্তু ঋষিরা বিষয়ী লোক ছিলেন, বহু গো ও কৃষিভূমি অধিকার করিয়া যুদ্ধে দস্যুদের দণ্ডবিধান করিতেন এবং গোধন ও যুদ্ধে জয়লাভ ও বীরপুত্র লাভ, স্ত্রী ও পুত্রের কল্যাণের জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতেন। বস্তুতঃ গৃহীমাত্রেই একপ্রকার ঋষি ছিলেন; স্বগৃহে, সাধ্যানুসারে সপরিবারে, স্বীয় দেবতার স্তুতি করিতেন। এই দেবকার্য্যে পুত্রকন্যা সকলেই সাহায্য করিত। এই গৃহি-সমাজের মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্র রচনায় ও কেহ কেহ যজ্ঞের আড়ম্বরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা তাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ সমাদর করিতেন। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র-প্রণেতারাও কোন জন্মগত বা ব্যবসায়গত জাতিভুক্ত ছিলেন না। তাঁহারা সাংসারিক লোক ছিলেন, আর্য্যজাতীয় সমস্ত লোকের সঙ্গে মিশিতেন, তাহাদের সহিত বিবাহাদি আদান সম্প্রদান হইত, তাহাদের সঙ্গে একত্রে ধন ও গাভী অধিকার করিতেন, তাহাদের জন্য যুদ্ধে অগ্রসর হইতেন, বস্তুতঃ তাহাদিগের অন্তর্গত লোক ছিলেন।

একজন বীর ঋষি (মঃ ৫।২৩।২) অগ্নির নিকট "সৈন্য পরাজয়ে সমর্থ" একটী পুত্রের জন্য স্তব করিতেছেন। অন্যত্র (মঃ ৬।২০।১) ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট "সহস্র প্রকার ধন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের অধিকার ও শত্রুনিহন্তা একটী পুত্রের" জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। অন্যত্র (মঃ ৯।৬৯।৮) সংসারী ঋষি হিরণ্য স্তব করিতেছেন "হে সোম! তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমরা ধনসম্পত্তি, সুবর্ণ, ঘোটক, গাভী, যব ও সন্তান সন্ততি প্রাপ্ত হই।" যোদ্ধা ও কৃষক সম্প্রদায় ভিন্ন ঋষিরা, এক ভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন, সমস্ত ঋগ্বেদের মধ্যে কুত্রাপি তাহার প্রমাণ নাই। *

* ঋগ্বেদের সর্ব্বশেষ মণ্ডলের ৯০ সূঃ ১২ ঋকে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতির উল্লেখ আছে সত্য। কিন্তু সূক্তটী আধুনিক, ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশের সমসাময়িক নহে, তাহা ভাষাবিৎ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন। ঋগ্বেদের দশ সহস্র মন্ত্রের মধ্যে অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই, এই শব্দ গুলি কুত্রাপি জাতি বিশেষ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণ

সে সময়ে জাতি বিভাগ ছিল না, তাহা ঋগ্বেদে উহার উল্লেখ না থাকা হইতেই প্রমাণীত হইতেছে। পাঁচ কি ছয়শত বৎসর ব্যাপিয়া ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ প্রণীত হইয়াছিল; ইহাতে আর্য্যদের আচার নীতির ব্যবহার বিশ্বাসের বিস্তর বর্ণনা রহিয়াছে; আর্য্যদের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধসংগ্রাম, বিবাহ ও গার্হস্থ্য রীতিপ্রণালী, স্ত্রীলোকের অবস্থা ও কর্ত্তব্য, যজ্ঞাদি ধর্ম্মাচার, জ্যোতিষ—সকলই বর্ণিত রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সময়ে জাতভেদ ছিল, তথাপি ঋগ্বেদের দশ সহস্র ঋকের কোনও একটী স্থানে এই বিস্ময়কর জাতিভেদ প্রথার কথাটা নাই, তাহা কি সম্ভব? আকারে ঋগ্বেদের এক দশমাংশমাত্র এইরূপ কোনও অধুনিক ধর্ম্মগ্রন্থ আছে কি, যাহাতে জাতিভেদের উল্লেখ নাই?

ঋগ্বেদের সময়ে জাতিভেদের নাস্তিত্ব সম্বন্ধে এই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর প্রমাণ ঋগ্বেদে লক্ষিত হয়। পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় যে "বর্ণ" শব্দ জন্মগত জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্যের (গৌর ও কৃষ্ণের) বিভিন্ন শারীরিক বর্ণ (রং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্যেরা তিন "বর্ণে" বিভক্ত ছিলেন, এমন কুত্রাপি উল্লেখ নাই। (মঃ ৩।৩৪। ৯)। ক্ষত্রিয় শব্দ পরবর্ত্তী সংস্কৃতে জন্মগত জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে; কিন্তু ঋগ্বেদের ইহা বিশেষণ মাত্র, অর্থ "বলশালী"; দেবতাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা আছে। ৭।৬৪।২ ঋকে মিত্র ও বরুণকে 'সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয়' ৭।৮৯ সূক্তের প্রথম চারি মন্ত্রের শেষে বরুণ দেবকে 'সুক্ষত্র' বলিয়া সম্বোধন রহিয়াছে। পুরোহিত জাতি বুঝাইতে আধুনিক সংস্কৃতে বিপ্র শব্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু ঋগ্বেদে "জ্ঞানী" "বিজ্ঞ" এই খানে অর্থে বিপ্র শব্দ দেবতাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ৮।১১।৬ ঋকে "বিপ্রং দেবং অগ্নিং" আছে, অর্থাৎ মেধাবী অগ্নিদেব। পুরোহিত জাতি-বোধক ব্রাহ্মণ শব্দ ঋগ্বেদের শত শত স্থানে শুধু 'ঋক্ প্রণেতা কবি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৭।১০৩।৮ ঋকে "ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত ব্রাহ্মণাসঃ" আছে অর্থ "স্তুতিকারী স্তোতৃ-গণ।" ১০।৭১।৯ ঋকে আছে—"যাহারা দেব স্তুতি করেনা এবং সোমযাগ করেনা, তাহারা পাপযুক্ত হইয়া কেবল লাঙ্গল চালনার উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ যাহারা ইহকাল পর্য্যালোচনা করিত ও স্তুতি অভ্যাস ও সোম যাগ করিত, তাহারাই স্তোতা হইত, জন্মগুণে স্তোতা হইত না! যাহারা ঐ ধর্ম্মাক্রিয়া সাধনে অসমর্থ, তাহারা কৃষক বা তন্তুবায় হইত, জন্মদোষে কৃষক বা তন্তুবায় হইত না।

এইরূপ অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা যায় স্থানাভাবে বিরত রহিলাম। কিন্তু একটী উদাহরণ এস্থলে সংগ্রহ না করিয়া পারিলাম না। ঋগ্বেদ-সুলভ নিষ্কপট ভাবে এক ঋষি সকরুণচিত্তে বলিতেছেন, "দেখ, আমি স্তোত্রকার, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জন-কারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে তৃণ কামনায় ভিন্ন দিকে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধন কামনায় তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব, হে সোম! ইন্দ্রের

বিং পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে। ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। এই সূক্তের ভাবও আধুনিক।

জন্য ক্ষরিত হও।" যাঁহারা বৈদিক সময়ে জাতিভেদ প্রথা ছিল মনে করেন, তাঁহারাই বলুন, যে পরিবারে পুত্র মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি, পিতা বৈদ্য, এবং মাতা ময়দা-ওয়ালী, তাঁহারা কোন্ জাতি ভুক্ত? আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, ঋগ্বেদীয় ঋষিরা বলবান্ যোদ্ধা ছিলেন। বিশ্বামিত্র যেমন মন্ত্র-প্রণেতা ঋষি, তেমনি দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। পরবর্ত্তী হিন্দুরা ঋষি আবার যোদ্ধা, এই কথায় স্তম্ভিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন,পরে গুণবলে ব্রাহ্মণ হইলেন, এইরূপ অতি মনোরঞ্জক পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্য সঙ্গোপনের বৃথা চেষ্টা! আসল কথা এই, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিভেদ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বকালীন ঋক্‌বেদীয় ঋষি, একাধারে পুরোহিত ও যোদ্ধা।

ঋগ্বেদের কুত্রাপি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি অথবা প্রতিমা রক্ষা করিবার জন্য মন্দির, অথবা পূজাদি সম্পাদন করিবার জন্য বিশেষ স্থানে সমবেত হইবার উল্লেখ নাই। প্রত্যেক গৃহই স্বগৃহে গৃহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে সরল ও মনোহর স্তব কীর্ত্তন করিতেন। ঋগ্বেদীয় স্তব আর্য্য জাতীয় সকল ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি ছিল। স্ত্রীলোকেরা এই সকল যজ্ঞে সাহায্য করিতেন, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিতেন, উদূখলে তাহা পেষণ করিতেন, সোমরস বাহির করিতেন, এবং কখন হস্তে মেষলোমে তাহা ছাকিয়া পরিষ্কৃত করিতেন। অনেক স্থানে স্বামী স্ত্রী একত্রে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া প্রার্থনা করিতেন, যেন তাঁহারা এক সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারেন। * এতৎ সম্বন্ধে একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ঋষির (বৈবস্বত মনুর) কয়েকটী কথা পাঠকবর্গের কুতূহল নিবৃত্ত্যর্থ উদ্ধৃত করিতেছি। "৫। ৬ হে দেবগণ! যে দম্পতী একমনে অভিষব করে, সোম শোষণ করে, এবং মিশ্রণ দ্রব্য দ্বারা সোম মিশ্রিত করে, তাহারা ভোজনযোগ্য অন্নাদি লাভ করে এবং মিলিত হইয়া যজ্ঞে উপস্থিত হয়, তাহারা অন্নার্থ কোথাও গমন করে না। ৭। তাহারা দেবগণকে অবলাপ করে না, তোমাদের অনুগ্রহ নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে না, মহা অন্ন দ্বারা তোমাদের পরিচর্য্যা করে। ৮। তাহারা পুত্রবিশিষ্ট, কুমার বিশিষ্ট, স্বর্ণ ভূষিত হইয়া উভয়ে সমস্ত পূর্ণ আয়ু লাভ করে। ৯। প্রিয় যজ্ঞ বিশিষ্ট এই দম্পতীর স্তুতি দেবগণ কামনা করেন; ইহারা দেবগণকে সুখপ্রদ অন্ন প্রদান করে। অমরত্বের জন্য অর্থাৎ সন্ততি লাভার্থ পরস্পর আলিঙ্গন করেন এবং দেবগণের পরিচর্য্যা করেন।" অষ্টম মণ্ডল ৩১ সূক্ত। এইরূপে একত্রে যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন ও সংসার সুখ লাভের কথা ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র রহিয়াছে।†

বিদুষী রমণীগণ নিজেই ঋষি, স্তোত্র-মন্ত্র নিজে প্রণয়ন করিয়া পুরুষদের ন্যায় হোম করিতেন, এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিলে কোন্ হিন্দুর হৃদয়ে আনন্দ না হয়? প্রাচীন

---

* ১। ১৩১। ৩ ঋকে আছে "তোমার সেবক ও পাপদ্বেষী যজমান দম্পতী তোমার (ইন্দ্রের) তৃপ্তির অভিলাষে অধিক পরিমাণে হব্যপ্রদান করতঃ * * * যজ্ঞ বিস্তার করিতেছে। তাহারা গোধন ইচ্ছাকরে এবং স্বর্গ গমনে উৎসুক।" ৫। ৪৩। ১৫ ঋকে আছে "হে অগ্নি! তুমি বলশালী; পরিণীত দম্পতী ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা জীর্ণ হইয়া তোমাকে প্রচুর হব্য প্রদান করিতেছে।"

† স্ত্রীলোকেরা স্তোত্র মন্ত্রে-অনাধিকারিণী, নিরিন্দ্রিয়, শীলস্নেহশূন্যা মিথ্যা পদার্থ, এই পৈশাচিক মত অতি আধুনিক।

কালে স্ত্রীলোকদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে কোন অনিষ্টকর অন্তরায় ছিল না, তাহাদিগকে অন্তঃপুরে বদ্ধ বা অশিক্ষিত রাখিয়া সমাজে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার কোন চেষ্টা করা হইত না। অন্তঃপুরবদ্ধ রমণীর কথা সমস্ত ঋগ্বেদে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পরন্তু সেকালের নারীগণ সমাজে তাহাদের প্রাপ্য স্থান অধিকার করিয়া মর্য্যাদা সহকারে যজ্ঞ সম্পাদনে সহায়তা করিয়া এবং সমাজে স্ব স্ব পবিত্র মহিমা বিস্তার করিয়া কালযাপন করিতেন। যে বিদুষী "ঋষি" বিশ্ববারা ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা করিয়াছেন, হিন্দুমাত্রই সমাদরে তাঁহার চিত্র হৃদয়ে ধারণ করিবেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশ্ববারা নিজে ঋক্-স্তোত্র প্রণয়ন করিয়া নিজে যজ্ঞাহুতি করিতেন এবং দম্পতিরা দেহমনোবাক্-সংযত হইয়া দাম্পত্য জীবন যাপন করুক, নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অগ্নিদেবের নিকট এই প্রকার স্তুতি করিতেন। (৫।২৮।৩)* ঋগ্বেদে এইরূপ অনেক রমণী 'ঋষির' প্রমাণ রহিয়াছে।

সেকালে কন্যামাত্রেরই বিবাহ দিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না। পরন্তু কন্যারা কেহ কেহ আমরণ পিতৃগৃহে অনূঢ়াবস্থায় থাকিত, এবং পৈতৃক সম্পত্তি দাবী করিয়া তাহার অংশভাগী হইত, এইরূপ অনেক প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়।† অন্যত্র (১।১২৪।৪) উষা "যেমন জগতী-জনকে জাগরিত করেন" গৃহিণী তেমনি সর্ব্বাগ্রে জাগরিত হইয়া সকলকে জাগরিত করিতেন এবং গৃহস্থিত সকলকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতেন। এইরূপ গৃহিণীপনার জন্য হিন্দুরমণী সেই প্রাচীন সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত জগতের সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত। তথাপি গুপ্তপ্রসবিনী (২।২৯।১) ভ্রাতৃরহিতা বিপথগামিনী ও পতি-বিদ্বেষিণী দুষ্টাচারিণী ভার্য্যার (৪।৫।৫) উল্লেখ আছে। দশম মণ্ডলের ৩৪।৪ ঋকে কথিত আছে, "পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন, যদি কাহার ধনের প্রতি পাশার লোভ-দৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার পত্নী পর্য্যন্ত ব্যভিচারিণী হয়।"

পিতামাতারা কন্যাদিগকে স্বামিমনন বিষয়ে অধিকার দিতেন; একবারে তাহাদিগের অভিমত না জানিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতেন না। কিন্তু সকল স্থানেই যে কন্যারা সৎ বরে স্বয়ংবর করিতেন, তাহা অনুরক্ত হয়। কিন্তু যে স্ত্রীলোক ভদ্র,

* প্রথম ঋকে আছে "বিশ্ববারা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া এবং দেবগণের স্তবোচ্চারণ পূর্ব্বক হব্যপাত্র লইয়া অগ্নির অভিমুখে গমন করিতেছে।" অত্রিগোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী এই সূক্তের ঋষি। তিনি ৩ ঋকে বলিতেছেন "হে অগ্নি আমাদিগের বিপুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত শত্রুগণকে দমন কর, তোমার দীপ্তি সকল উৎকর্ষ লাভ করুক; তুমি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর, এবং শত্রুগণের পরাক্রম আক্রমণ কর।" বিশ্ববারা স্বদেশ-হিতৈষণায় অনুপ্রাণিত।

† ২।১৭।৭ ঋকের সায়ন ব্যাখ্যা করিতেছেন, "পতিং অলভমানা সতী দুহিতা সমানাৎ আত্মনঃ পিত্রোশ্চ সাধারণাৎ সদসঃ গৃহাৎ * * * যথা ভাগং যাচতে।" ইহা হইতে সপষ্ট অনুমান হয়, অনূঢ়া কন্যা পিতৃসম্পত্তির অংশ পাইতেন। প্রাচীন মনুস্মৃতিতে 'কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ গৃহে থাকুক, তথাপি পিতা তাহাকে গুণহীন বরে সম্প্রদান করিবেন না' এবং অন্যত্র "ভ্রাতারা অনূঢ়া ভগিনীদিগকে স্ব স্ব অংশ হইতে এক চতুর্থাংশ প্রদান করিবেন, না দিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন" এই রূপবিধি আছে।

নয়। কেহ কেহ "কেবল অর্থেই প্রীত হইয়া নারীসহবাসাভিলাষী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়। কিন্তু যে স্ত্রীলোক ভদ্র যাহার শরীর সুগঠন, সেই (কন্যা) অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয়পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিবে।" (১০।২৭।১২) এক সময়ে হিন্দুদের মধ্যে যে স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, আমরা উদ্ধৃত ঋকে তাহারই পূর্ব্বাভাস পাইতেছি। তথাপি কন্যা স্বামিবরণে পিতা মাতার আদেশ উপদেশে চালিত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; এবং তাহা হওয়াও পিতৃবৎসলা কন্যার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এখনকার ন্যায় সেই প্রাচীন সময়েও পিতা মাতা কন্যাকে রত্নালঙ্কারভূষিতা করিয়া সম্প্রদান করিতেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বিবাহ সম্বন্ধীয় আচার এবং স্বামিস্ত্রী প্রতিজ্ঞা বন্ধন সর্ব্বপ্রকারে বিবাহোচিত বলিয়া বোধ হয়। যে প্রণালীতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত, ঋগ্বেদের সর্ব্বশেষ মণ্ডল (৮৫ সূক্ত) হইতে তাহার মনোহর বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকবর্গ প্রথম ঋকে দেখিবেন যে, অস্বাভাবিক বাল্যবিবাহ প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। পরন্তু কন্যাদের যৌবন উপস্থিত হইলে বিবাহ হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। "২১। হে বিশ্ববসু (বিবাহের দেবতা)! এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়াছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্ববসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণযুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকট গমন কর*; সেই তোমার ভাগস্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহার বিষয় অবগত হও। ২২। হে বিশ্ববসু! এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কারদ্বারা তোমাকে পূজা করি। নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামি-সংসর্গিনী করিয়া দাও। ২৩। যে সকল পথ দিয়া আমাদিগের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কণ্টকবিহীন হয়। অর্য্যমা এবং ভগ আমাদিগকে উত্তমরূপে লইয়া চলুন। হে দেবগণ! পতিপত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত হয়। ২৪। হে কন্যা! সুন্দর মূর্ত্তিধারী সূর্য্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বরুণের বন্ধন হইতে তোমাকে মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্ম্মের আবাসস্থানস্বরূপ, এইরূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি। ২৫। এই নারীকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অপর স্থান হইতে নহে। † ২৬। (হে কন্যা) পূষা তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়া এ স্থান হইতে লইয়া যাউন। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বন্ধন করুন। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভুত্ব কর। ২৭। এই স্থানে সন্তানসন্ততি লাভ করিয়া তোমার প্রীতি লাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। এই স্বামীর সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজগৃহে প্রভুত্ব কর। ৩৩। এই বধূ অতি লক্ষণান্বিতা, তোমরা এস, এ সৌভাগ্যবতী অর্থাৎ স্বামীর প্রিয়-পাত্রী হউক, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ

* বিশ্ববসু বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বিবাহ হইয়া গেলে তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব থাকে না।

† অর্থাৎ পিতৃকুল হইতে মোচন করিয়া স্বামিকুলে গ্রথিত করিলাম।

নিজ গৃহে প্রতিগমন কর। ৩৪। এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত। ইহা ব্যবহারের যোগ্য নহে। যে ব্রহ্মনামা ঋত্বিক বিদ্বান,সে বধূর বস্ত্র পাইতে পারে (১) ৩৯। অগ্নি, লাবণ্য ও পরমায়ুঃ দিয়া বনিতাকে প্রদান করিলেন। এই বনিতার পতি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকিবে। ৪০। (হে কন্যা) প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্য সন্তান তোমার চতুর্থ পতি। (২) ৪১। (বর বলিতেছেন) সোম সেই নারী গন্ধর্ব্বকে দিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি ধন-পুত্রসমেত এই নারী আমাকে দিলেন। (৩) ৪১। হে বরবধূ! তোমরা এই স্থানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক হইও না ; নানা খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে আসিয়া পুত্রপৌত্রদিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর। ৪৩। (বরবধূ বলিতেছেন) প্রজাপতি আমাদিগের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন, অর্য্যমা আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত মিলন করিয়া রাখুন! হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদিগের দাসদাসী এবং পশুগণের মঙ্গল বিধান কর। ৪৪। তোমার চক্ষু যেন দোষশূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকরী হও, পশুদিগের মঙ্গলকারিণী হও ; তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপুত্র-প্রসবিনী এবং দেবতাদিগের প্রতি ভক্ত হও। আমাদিগের দাসদাসী ও পশুগণের মঙ্গল বিধান কর। ৪৫। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। ইহার গর্ভে দশপুত্র সংস্থাপন কর। পতিকে লইয়া একাদশ ব্যক্তি কর। ৪৬। বধূর প্রতি) তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশকর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও। ৪৭। (বরবধূ বলিতেছেন) তাবৎ দেবতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয় মিলিত করিয়া দিন। বায়ু, ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন।"

উদাহরণটী সুদীর্ঘ হইলেও পাঠকের পক্ষে তাহা বিরক্তিকর হইবে না।. বিবাহ দিনে যে সমুচিত আচার ব্যবহার হইত, এবং যুবতী নববধূ স্বামি-গৃহে ও স্বামি-হৃদয়ে যে অধিকার প্রাপ্ত হইতেন, এই মন্ত্র হইতে তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারি।

অপরাপর জাতি এবং আপরাপর দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও প্রাচীন সময়ে হিন্দু রাজা ও ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সপত্নী বিদ্বেষ বহু বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল ; এবং ঋগ্বেদের শেষভাগে দশমমণ্ডলের ১৪৫ ও ১৫৯ সূক্তে স্ত্রীরা সপত্নীদিগকে অভিসম্পাত করিতেছেন,তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সর্ব্বশেষ ভাগে এই কুপ্রথা প্রবল হইয়া থাকিবে, কারণ প্রথম নয় মণ্ডলে কদাচিৎ বহু বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১) ঋকবেদের সময়ে আচার এই ছিল। এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে সেই বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল।

(২) মনুষ্য জীবনের সীমা ঋগ্বেদের শতবৎসর বর্ষ। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে এইরূপ উল্লেখ আছে। সহস্র বৎসর ঋষিদের পরমায়ুর গল্প পৌরাণিক সময়কার সৃষ্টি।

(৩) কন্যাকে বোধ হয় সোম ও গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করিয়া পরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত।

দশম মণ্ডলের ১৬২, ১৮৩, ও ১৮৪ সূক্তে গর্ভাধানের উল্লেখ আছে। ৫।৭৮।৭ ঋকে স্মার্ত কর্ম্মের কথা রহিয়াছে। ৩।৩১ সূক্তে উত্তরাধিকারের বিধি সম্বন্ধে যে দুইটী ঋক্ আছে; তাহা আজ গুরুতর বিবেচনায় এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি "১। পুত্রহীন পিতা রেতোধা জামাতাকে সম্মানিত করতঃ শাস্ত্রানুশাসন ক্রমে দুহিতাজাত পৌত্রের নিকট গমন করে। (অপুত্র) পিতা দুহিতার গর্ভ হইবে বিশ্বাস করতঃ প্রসন্ন মনে শরীর ধারণ করে। * ২। ঔরস পুত্র দুহিতাকে পৈতৃক ধন দেয় না। তিনি উহাকে বিবাহ দিবেন। যদি পিতা মাতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া কর্ম্ম করেন, এবং অন্য সম্মানিতা।" তৃতীয় মণ্ডলের ৩১ সূক্ত।

হিন্দুদিগের দায়ভাগের এই প্রথম অঙ্কুর। পুত্র ও কন্যা উভয় বর্ত্তমানে পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, আর পুত্রাভাবে দৌহিত্র অধিকারী। দেখিতে নিম্নোদ্ধৃত ঋকে দত্তক গ্রহণ করিবার সূত্রপাত পাওয়া যায়। "৭। অঋণী ব্যক্তির ধন পর্য্যাপ্ত হয়, অতএব আমরা নিত্যধনের পতি হইব। হে অগ্নি। যেন অপত্য 'অন্যজাত' না হয়। অবেত্তার পথ জানিও না। ৮। অন্যজাত পুত্র সুখকর হইলেও তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে বা মনে করিতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানেই গমন করে। অতএব অন্নবান্ শত্রু নাশক নবজাত পুত্র আমাদের নিকট আগমন করুক।" সপ্তম মণ্ডল ৪র্থ সূক্ত।

এই পরিচ্ছেদে বিবাহ ও দায়ভাগের কথা লিখিয়াছে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কথা আনুষঙ্গিক হইবে না। ঋগ্বেদের যম নরকের দেবতা নহেন, তিনি ন্যায়বান্ ব্যক্তিদের স্বর্গের দেবতা, এবং মৃত্যুর পরে সৎ লোকের পুরস্কার দাতা। দশম মণ্ডলের ১৪ সূক্ত হইতে কতিপয় ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি—"৭। (যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে সম্বোধন করিয়া এই উক্তি) আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে পথ দিয়া যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে যাও। সেই যে দুই রাজা যম আর বরুণ, তাঁহারা সুধা প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর। ৮। সেই চমৎকার স্বর্গধাম পিতৃলোকের সঙ্গে মিলিত হও, ও যমের সহিতও ধর্ম্মানুষ্ঠান ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত নামক গৃহে প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ ধারণ কর। ৯। (শ্মশানদাহ কালে উক্তি) হে ভূত প্রেতগণ! দূর হও, চলিয়া যাও, সরিয়া যাও, পিতৃলোকেরা তাঁহার জন্য এই স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই স্থান দিবা দ্বারা, জল দ্বারা, আলোক দ্বারা শোভিত। যম এই স্থান মৃত ব্যক্তিকে দিয়া থাকেন। ১০। হে মৃত! এই যে দুই [যম দ্বারবর্ত্তী] কুক্কুর, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষুঃ ও বর্ণ বিচিত্র, ইহাদের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাও। তৎপরে যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্ব্বদা আমোদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাহাদিগের নিকট গমন কর। ১১। হে যম! তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর

*পূর্ব্বকালে পুত্র না হইলে কন্যার বিবাহ দিবার সময় জামাতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইত যে, ঐ কন্যার পুত্র কন্যার পিতার হইবে। কন্যার পুত্র দৌহিত্র হইয়াও পৌত্রের কার্য্য করিবে।

আছে, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে, যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়; তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজা! ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগী কর।" বৈদিক যুগে পরকালের সুখসম্বন্ধে লোকের যে প্রকার বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল, পূর্ব্ব উদ্ধৃত সূক্ত হইতে তাহা জানা যাইতেছে।

প্রাচীনকালে মৃতদেহ দাহ না করিয়া সমাধি করিত, এমন কথা কোন্ কোন্ মন্ত্রে পাওয়া যায়? "১০। হে মৃত! এই জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকটে গমন কর। ইনি সর্ব্বব্যাপিনী। ইহার আকৃতি সুন্দর। ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে রাশাকৃত মেষলোমের মত কোমল স্পর্শ হয়েন। তুমি দক্ষিণা দান অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছ। ইনি যেন নিঋতি হইতে তোমাকে রক্ষা করেন। হে পৃথিবী! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইহাঁকে পীড়া দিও না। ইহাঁকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর। ১২। পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হইয়া উত্তমরূপ অবস্থিতি করুন। সহস্র ধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহ-স্বরূপ হউক। প্রতিদিন এই স্থানে তাহারা ইহার আশ্রয় স্থান স্বরূপ হউক।" দশম মণ্ডল ১৮ সূক্ত।

বৈদিকযুগে যে শবদাহ করা হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়—"হে অগ্নি! এই মৃত ব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না, ইহাকে ক্লেশ দিও না। ইহার চর্ম্ম বা ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। হে জাতবেদা! যখন ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক্ক হয়, তখনই ইহাঁকে ইহলোকের নিকট পাঠাইয়া দাও।" ১০।১৬।১

দশম মণ্ডলের ১৮ মন্ত্রে বিধবা বিবাহ বিধেয়, তৎসম্বন্ধে যে সুবিখ্যাত দুইটী ঋক্ রহিয়াছে, এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "৮ হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল! গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু হইয়াছে, চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছেন এবং বিবাহ করিতে প্রস্তুত, সেই পতির পত্নী হও।"

সায়নাচার্য্য তৈত্তিরিয়া আরণ্যকে এই ঋক উদ্ধৃত করিয়া তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি তাহার অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম। উক্তস্থলে যে দিধীষু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় তাহার একভিন্ন দুই অর্থ নাই—স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় স্বামীকে "দিধীষু" বলে। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহাপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের এক প্রবন্ধের শেষাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "বৈদিকযুগে যে বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক অকাট্য যুক্তি ও নিঃসন্দেহ প্রমাণ রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় অতি প্রাচীন সময় হইতে বিধবাবিবাহকারী পুরুষকে "দিধীষু", দ্বিতীয়-পতি বিবাহকারিণী বিধবাকে পরপূর্ব্বা, এবং বিধবার দ্বিতীয়-পতির ঔরসজাত পুত্রকে 'পৌনর্ভব' বলে। এই সকল প্রমাণই যথেষ্ট।"

নিতান্ত দুঃখ ও লজ্জার সহিত উপসংহার-কালে আমরা এই সূক্তের অন্যতম ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। এই ঋকের কোন

অপরাধ নাই, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তন ও দুষ্ট অর্থ কল্পনা করিয়া সতীদাহ নামক কিংবা দাহ-প্রথার সমর্থন চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই নিষ্ঠুর প্রথা ঋগ্বেদ-সম্মত কার্য্য নহে। ১০।১৮।৭ ঋকটী এস্থানে অনুবাদ করিতেছি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর গৃহস্থ নারীগণের পুনরায় গৃহে আসিবার কথা বলিয়াছে মাত্র। "এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রু পাত না করিয়া রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম বস্ত্র ধারণ করিয়া (সকলের) অগ্রে আগমন করুন

মূলে "আরো হন্তু জনয়ঃ যোনিংঅগ্রে" আছে। বিধবা দাহের কথা কুত্রাপি নাই। উদ্ধৃত ঋকের শেষোক্ত "অগ্রে" শব্দকে অগ্নেঃ" এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া, মূলের পরিবর্ত্তন এবং কদর্য্য কল্পনা পূর্ব্বক বাঙ্গালা-দেশের পণ্ডিতেরা জঘন্য বিধবাদাহ প্রথার সমর্থন চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণার্থে কপট ব্যবসায়িগণ প্রাচীন শাস্ত্রের যে ভূরি ভূরি অযথা ও মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও জঘন্য

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

সরস্বতীপূজা। (১)

এক সময় কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আমরা মাটির সরস্বতী পূজা করি কেন? এ দেশে কি এইরূপই সরস্বতীর পূজা হইত? আমি তাহাতে উত্তর দিয়াছিলাম,—না মহাশয়। এই ভারতভূমি যত দিন প্রকৃত সারস্বত আশ্রম ছিল, তত দিন ভগবতী মৃণ্ময়ী ছিলেন না, চিন্ময়ী ছিলেন। যতদিন মা সরস্বতী,—

"পুণ্যদা পুণ্যজননী পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী।
পুণ্যবদ্ভির্নিষেব্যা চ স্থিতিঃ পুণ্যবতাং সদা।
তপস্বিনাং তপোরূপা তপস্যাকাররূপিণী।
কৃতপাপেধ্মদাহায় জলদগ্নিস্বরূপিণী।
যাং নে সরস্বতীতোয়ে মগ্নং নৈমানবৈর্ভুবি।
তদাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং হরিসংসদি॥"

পুণ্যদাত্রী পুণ্যজননী ও পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী ছিলেন, যত দিন মা পুণ্যাত্মা সাধুগণের আরাধ্যা ও স্থিতিরূপিণী ছিলেন, যত দিন তিনি তপস্বিগণের তপস্যারূপিণী ও তপস্যার মূলপ্রকৃতি ছিলেন, তত দিন ভারতবর্ষে তাঁহার চিন্ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির পূজা হইত, ভক্তগণ সেই জ্বলদগ্নিরূপিণী ব্রহ্মময়ীর তেজঃপ্রভায় তৃণকাষ্ঠের ন্যায় সমস্ত কলুষরাশি দগ্ধ করিত, সেই জ্ঞানময় সরস্বতী-সলিলে নিমগ্ন হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন-

(১) এ প্রস্তাবে যে সকল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পাষণ্ডগণের পক্ষে, আর যাঁহারা ভক্তিভাবে বিদ্যাদেবীর পূজা করিয়া থাকেন, সেই পূজনীয় আচার্য্যগণ আমাদের পরমারাধ্য গুরু।

পূর্ব্বক অনন্তকালের জন্য শ্রীহরির সহবাস লাভ করিত। ক্রমে অদৃষ্টচক্রে ভারতবর্ষ সারস্বত আশ্রম ঘুচিয়া পাষণ্ড-ভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল, মা সরস্বতীও আমাদের দুর্দ্দশা ভাবিয়া ভাবিয়া 'মাটি' হইলেন, তাই আমরা এক্ষণে মাটির সরস্বতী পূজা করিয়া থাকি।

খ্যাতনামা স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের দারুময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুমারিঃ॥"

এক ভার্য্যা স্বভাবত বড়ই প্রবলা,
আর ভার্য্যা স্বভাবত বড়ই চপলা;
পুত্র এক বিশ্বজয়ী দুরন্ত মদন,
সমুদ্রে সর্পের শয্যা, বিহঙ্গ বাহন; (২)
এ সব ঘরের দুঃখ দিবা বিভাবরী,
ভাবিয়া ভাবিয়া কাষ্ঠ হয়েছেন হরি।

এইরূপে আমাদের হাতে পড়িয়া সকল দেবতাই মাটি হইয়াছেন, কেহ কাষ্ঠ হইয়াছেন, কেহ বা পাথর হইয়াছেন।

ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাস বলিয়াছিলেন,—

তুলসী পিঁদনে হরি মেলে তো,
মেয়্ পেঁদে কুঁদা আউর্ ঝাড়্;
পাথর্ পূজনে হরি মেলে তো,
মেয়্ পূজে পাহাড়্"॥

(২) 'স্বভাবত বড়ই প্রবলা' ভার্য্যাটি সরস্বতী; 'স্বভাবত বড়ই চপলা' ভার্য্যাটি লক্ষ্মীঠাকুরাণী, ইনি কোথাও স্থির থাকিতে পারেন না। জগন্নাথ অর্থাৎ নারায়ণের এই দুইটি ভার্য্যা। বিহঙ্গ অর্থাৎ গরুড়পক্ষী ইঁহার বাহন। শিবের ভাগ্যে তবু একটা ষাঁড় জুটিয়াছিল, কিন্তু ইঁহার ভাগ্যে একটা চতুষ্পদও জুটে নাই।

"কাষ্ঠলোষ্টেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা"

পূজার পরদিনেই আমরা মা সরস্বতীকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকি; এটা মড়ার উপর খাড়ার ঘা, কেন না আমরা বহুকাল হইতেই মাকে অতল জলে বিসর্জ্জন করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে দুষ্ট সরস্বতী আসিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছেন; তিনিই বৎসর বৎসর মৃণ্ময়ীরূপে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের টোলে আসিয়া দর্শনী কুড়াইয়া থাকেন। পূজার পরদিনেই ভোঁ ভাঁ, কা কস্য পরিদেবনা, টোলে আর সন্ধ্যা দেওয়া হয় না। স্থানভ্রষ্ট শৃগাল, কুক্কুর ও বিড়াল প্রভৃতিরা পুনরায় আসিয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করে। ঐ সকল কৃতজ্ঞ জন্তুরাই আশ্রয়দাতা ভট্টাচার্য্যদিগের নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করে, 'যজন' 'যাজন' 'অধ্যয়ন' 'অধ্যাপন' ও 'দান' প্রকারান্তরে উহারাই সম্পন্ন করে, ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে কেবল 'প্রতিগ্রহ' কার্য্যটি ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ভট্টাচার্য্যেরা অতি দয়ালু, বৎসরের মধ্যে একটি দিন মাত্র ঐ সকল জন্তুর আশ্রমপীড়া উৎপাদন করেন।

আমাদের পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পঠদ্দশায় অধ্যাপকের অনুরোধে মৃণ্ময়ী সরস্বতীর একটি স্তব লিখিয়াছিলেন। সত্যপ্রিয় সুরসিক অধ্যাপক ঐ সুমিষ্ট স্তবটি দেখিয়া আমোদ করিয়াছিলেন। স্তবটি এই,—

মৃণ্ময়ী সরস্বতীর স্তব।

"লুচী-কচুরী-মতিচুর-শোভিতম্।
জিলেপি-সন্দেশ-গজা-বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্॥"

কিন্তু সেই ফলারইবা এখন কোথায়?

লুচি মুচির বাড়ী পাইলেও খাই;-কচুরি চুরি করিতেও রাজি আছি; মতিচুর প্রচুর খাইলেও আশ মিটে না; এ ক্ষুদ্র লিপি জিলিপির মহিমা কি বর্ণিবে? সন্দেশে দ্বেষ কোনও কালেই নাই; বলিতে কি, পেটে ঠাঁই না হইলেও মিঠাই খাইতে পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু পাই কোথা? এখনকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যে দর্শনীটি হস্তগত করিযাই বিদায় করেন। তুমি নিমন্ত্রণে যাও আর নাই যাও, দর্শনীটি কিন্তু তোমাকে দিতেই হইবে, বরং নীলের দাদন হইতে পরিত্রাণ আছে, কিন্তু পূজার দর্শনীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই।

বঙ্গদেশে কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে এরূপ দুর্দ্দশা ছিল না; নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান সকলই তাহার সাক্ষী। এস্থলে তৎকালের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপে রামনারায়ণ নামে এক অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিযাছিলেন। তাঁহার আশ্রম-কুটীরের (৩) চতুর্দ্দিকে বন জঙ্গল থাকায় তাঁহাকে সকলে 'বুনো রামনারাণ' বলিত। পণ্ডিতকুলজীবন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সময়ে সময়ে ভট্টাচার্য্যগণের কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্বচক্ষে তাঁহাদের অধ্যাপনাকার্য্য দেখিয়া গুণোচিত দানে মানে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া আসিতেন। তিনি একদিন বুনো রামনারায়ণের গৃহে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে ছাত্রমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া অধ্যাপনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ অধ্যাপনায় এরূপ উন্মত্ত যে, সম্মুখে স্বয়ং পৃথ্বীপতি আসিয়া দণ্ডায়মান, তাঁহার উদ্বোধই নাই, তিনি তখন বাহ্য নেত্র নিমীলিত করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় নিমগ্ন ছিলেন। রাজা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার পদপ্রান্তে গিয়া প্রণাম করিলে, তাঁহার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাজার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা তাঁহার অধ্যাপনা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া পুরস্কার দিবার মানসে জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়। আপনার কোনও বিষয়ে অসঙ্গতি আছে? রাজার অভিপ্রায় এই যে, সাংসারিক কোনও বিষয়ে অসঙ্গতি অর্থাৎ অভাব থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পূরণ করেন। কিন্তু

(৩) 'কুটীর' শব্দে কুঁড়ে ঘর। একালে 'কুটীর' বলিলে আর কুঁড়ে বুঝায় না। এখন অভিধান উল্টাইয়াছে, এখন 'কুটীর' শব্দে অট্টালিকা, যথা,—'কমল কুটীর', 'শান্তি কুটীর' 'আর্য্যকুটীর' প্রভৃতি। যদি এখন আচার্য্যদিগের বেশভূষা হ্যাটকোট হয়, তবে তাঁহাদের কুটীর সাহেবী বাড়ী না হইবে কেন? পূর্ব্ব কালে আচার্য্যেরা কিন্তু ঐশ্বর্য্যভোগে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। যে চাণক্যের ভ্রূকুটীমাত্রেই পৃথিবীর রাজারা ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, যিনি নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সার্ব্বভৌমপদে স্থাপন করিয়া তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বেশ্বরের সর্ব্বেসর্ব্বা মন্ত্রীর নিজগৃহের ঐশ্বর্য্য দেখ। কঞ্চুকী চাণক্যের গৃহে প্রবেশ করিয়া মনে মনে কহিলেন, আহা। এই রাজাধিরাজের মন্ত্রী মহাশয়ের গৃহের কি ঐশ্বর্য্য!

"উপলশকলমেতদ ভেদকং গোময়ানাম্
বটুভিরুপহৃতানাং বর্হিষাং কূটমেতৎ।
শরণমপি সমিদ্ভিঃ শুষ্যমাণাভিরাভিঃ
বিনমিতপটলান্তং দৃশ্যতে জীর্ণকুড্যম্॥"

শুষ্ক গোময় ভাঙ্গিবার জন্য এই প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে, দ্বিজবালকগণের আনীত এই স্তূপাকার কুশ পড়িয়া আছে, ঘরের দেওয়ালটি জীর্ণ হইয়াছে, চালের উপর যজ্ঞকাষ্ঠসকল শুকাইতে দেওয়ায় তাহার ভারে চালের ধারগুলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

(মুদ্রারাক্ষস)

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৃষ্টি অন্য দিকে, তিনি শাস্ত্রই ভাবিতেছিলেন, উত্তর করিলেন,—হাঁ মহারাজ! আমার পঠদ্দশায় অধীতশাস্ত্রের অনেক স্থলে অসঙ্গতি ছিল বটে, কিন্তু ক্রমাগত সেই সকল বিষয়ের চিন্তা ও অনুশীলন করায়, এক্ষণে আর কোনও স্থলে অসঙ্গতি নাই, যাহা পূর্ব্বে অসঙ্গত বোধ হইত, তাহা এক্ষণে বিশদ হইয়াছে। রাজা কহিলেন, আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনার সাংসারিক বিষয়ে কি কোনও অভাব আছে? ভট্টাচার্য্য তখন গদগদকণ্ঠে কহিলেন, আমার আবার অভাব! মহারাজের দত্ত যে নিষ্কর ব্রহ্মত্র আছে, তাহা হইতেই আমার স্বচ্ছন্দে জীবিকা চলে। যে ধান্য পাই, আমার গৃহিণী তাহা স্বহস্তে কণ্ডন ও রন্ধন করিয়া উপাদেয় অন্ন প্রস্তুত করেন। গৃহিণী প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিবার সময় বাটীর পার্শ্বস্থ তিন্তিড়ী বৃক্ষ (তেঁতুলগাছ) হইতে পত্র চয়ন করিয়া আনেন, এবং তদ্দ্বারা অপূর্ব্ব জুষ (ঝোল) প্রস্তুত করেন। আহা! সেই অন্নব্যঞ্জন অমৃত! অমৃত! অমৃত! আমি, গৃহিণী ও আমার এই ছাত্রগণ তাহা পরমানন্দে ভোজন করি; এবং পুলকিত হইয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করি!

হায় রে! সে শাস্ত্রচর্চ্চা, সে সরস্বতীপূজা কি এদেশে আর হইবে? সে জ্ঞানবুভুক্ষা, সে তন্ময়তা, সে আত্মবিস্মৃতি কি আর দেখিব? "তে হি নো দিবসা গতাঃ" আমাদের সে দিন গিয়াছে।

চিন্ময়ী সরস্বতীর স্তব।

ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥১॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বৎ জীবন্মৃতং পরম্।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমোনমঃ॥২॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী যা তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ॥৩॥
হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমোনমঃ॥৪॥
বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ।
তদধিষ্ঠাতৃদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥৫॥
যয়া বিনাত্র সংখ্যাবান্ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে।
কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ॥৬॥
ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
ভ্রমসিদ্ধান্তরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ॥৭॥
স্মৃতিশক্তির্জ্ঞানশক্তিবুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী।
প্রতিভা কল্পনাশক্তির্যা চ তস্যৈ নমোনমঃ॥৮॥
শ্রেষ্ঠা শ্রুতীনাং শাস্ত্রাণাং বিদুষাং জননী পরা।
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥৯॥
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা কবীনামিষ্টদেবতা।
সচ্চিদানন্দরূপা চ তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ॥১০॥

(ইতি যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণীস্তোত্রম্)

যিনি ব্রহ্মময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, যিনি সর্ব্ববিদ্যার অধীশ্বরী, সেই পরাৎপরা বাগ্‌দেবীকে বারবার নমস্কার। ১। যাঁহার বিহনে এ বিশ্বসংসার জীবন্মৃত হয়, যিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই সরস্বতীকে বারবার নমস্কার। ২। যাঁহার অধিষ্ঠান বিনা সমস্ত জগৎ মূক ও উন্মত্তের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই শব্দব্রহ্মের অধিদেবতাকে বারবার নমস্কার। ৩। তুষার, চন্দন, কমল, কুমুদ, কহ্লার ও চন্দ্রমার ন্যায় যিনি মাধুর্য্যময়ী, যিনি বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই অক্ষয়াদেবীকে বারবার নমস্কার। ৪। বিসর্গ, বিন্দু ও মাত্রা প্রভৃতির মধ্যে যাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান, সেই বর্ণমালার অধিদেবতাকে বারবার নমস্কার। ৫। যাঁহার বিহনে কিছুরই সংখ্যা করা যায় না, কিছুরই ইয়ত্তা হয় না, সেই কালরূপিণী সংখ্যারূপিণী পরম

দেবতাকে বারবার নমস্কার। ৬। যিনি নিখিল বাঙ্ময়ের ব্যাখ্যাস্বরূপা এবং নিখিল ব্যাখ্যার অধিষ্ঠাত্রী, যিনি সমস্ত ভ্রান্তিজালের সিদ্ধান্তস্বরূপা, সেই দেবীকে বারবার নমস্কার। ৭। যিনি স্মৃতিশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি; যিনি প্রতিভা ও কল্পনাশক্তি, সেই মহাশক্তিকে বারবার নমস্কার। ৮। যিনি সমস্ত শ্রুতি ও সমস্ত শাস্ত্রের সর্বোপরি বিরাজমানা, প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই বাণীকে বারবার নমস্কার। ৯। যিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ী, কবিকুলের ইষ্টদেবতা, সচ্চিদানন্দরূপিণী, সেই বীণাপাণিকে বারবার নমস্কার। ১০।

কস্যচিৎ

ঢাকার পুরাতন কাহিনী।

(চতুর্থ প্রস্তাব)

রাজা আদিশূর।

সেন রাজগণের পূর্ব্বতন কালে পূর্ব্ববঙ্গে আদিশূর নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা অভ্যুদিত হন। জন প্রবাদের নির্দ্দেশ অনুসারে, রামপাল নগরীতে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বপ্রকাশিত সংস্কৃত বেনীসংহার নাটকের ভূমিকায় পণ্ডিতবর মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সর্ব্বপ্রথম এই বিষয় প্রচারিত করেন। তিনি কোন্ সময় কিভাবে কোথা হইতে আগমন করেন, বা তাঁহার শাসিত রাজ্য কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল,—আজিও তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে মীমাংসিত হয় নাই। সুতরাং এই সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিদের মত সংগৃহীত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব এবং আমাদের নিকট যে মত অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিব।

যদিও মহারাজা আদিশূরের সম্পর্কে পুরাতত্ত্ববিদগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে, যদিও তাঁহার আবির্ভাব কাল-সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কোন সময় নির্দ্দেশ করা যায় না, যদিও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোনও কথা জানা যায় নাই, যদিও পাল ও সেন রাজবংশের ন্যায় তাঁহার নামাঙ্কিত কোনও মুদ্রা, প্রস্তর-লিপি বা তাম্রশাসন এই সময় পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই—তথাপি প্রাচীন প্রবাদও কুলজী লেখকদিগের মত অনুসারে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আদিশূরের অভ্যুত্থানে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্ব্বার আবির্ভাব ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি সংঘটিত হয়। প্রবল ধর্ম্মবিপ্লব আদিশূরকে বঙ্গের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশ বাঙ্গলার শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছিল। আদিশূরের অভ্যুদয়ে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম উন্মূলনের সবিশেষ চেষ্টা করে। তিনি গৌড় (পশ্চিম বাঙ্গালা ও বঙ্গ (পূর্ব্ববাঙ্গালা) এই উভয় অঞ্চলেই আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে সক্ষম হইয়া-

ছিলেন কি না, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিবার কোনও উপায় নাই। গৌড়ের অন্তর্গত বরেন্দ্র অঞ্চলে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত না হইলে, জনপ্রবাদ অনুসারে তিনি বারেন্দ্র-শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে তথায় স্থাপিত করিতে পারিতেন না। আদিশূর শব্দটী নাম কি উপাধি, তাহাও নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। ইহা নামবাচক শব্দ না হইয়া উপাধিবাচক হওয়াই সম্ভবপর।

আদিশূর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সহায় ও আশ্রয়-দাতা প্রবল-পরাক্রান্ত কান্যকুব্জপতির নিকট প্রার্থনা করিয়া বঙ্গে পাঁচজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সহচর পাঁচজন কায়স্থ আনয়ন করেন। কান্যকুব্জ হইতে আনীত এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই বঙ্গদেশীয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ। কুলজীকারদিগের মধ্যে এই ঘটনার কারণ-সম্বন্ধে বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের "আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে যে চারিটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই স্থলে লিখিত হইল। আদিশূরের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে পশ্চাৎ কৈলাস বাবুর প্রবন্ধের সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(১) আদিশূর পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে উৎসাহ অভাবে বাঙ্গলায় বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বিলুপ্ত হইয়াছে। (২) রাজপ্রাসাদের উপরি গৃধ্রপাত ও রাজ্যে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবোৎপাতের শান্তি কামনায় যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে রাজার সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। (৩) তিনি কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন, এবং রাজ্ঞীর চান্দ্রায়ণব্রত নিষ্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ অসমর্থ হইলে রাজা পত্নীর অনুরোধে সদ্বিদ্বান বেদ-বিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণের নিমিত্ত কনোজপতি বীরসিংহকে পত্র লিখেন। (৪) কাশীর রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আদিশূর বারাণসী হইতে করস্বরূপ পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। (৫) পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কাম্বোজ (ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রান্তরস্থিতগান্ধার) হইতে আনীত হয়। এই সকল বিভিন্ন মতের মধ্যে এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে আদিশূরের সময়ে হিন্দুধর্ম্মের আদিম বাসস্থল উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ হইতে একদল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আগমন করিয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হয়।

সভৃত্য ব্রাহ্মণগণ রাজধানী রামপালে উপনীত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে বহু সম্মাননা করেন এবং পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও চটগ্রাম নামক পাঁচটী গ্রামে তাঁহাদের বাসস্থল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাঙ্গলার আদিম নিবাসী "সপ্তসতী" ব্রাহ্মণদিগের কন্যা বিবাহ করিয়া যে পাঁচটী সন্তান লাভ করেন, তাঁহারাই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ। কিছুকাল পরে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের স্বদেশীয়া পত্নীগণের গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করিলে, আদিশূর তাঁহাদিগকে বরেন্দ্রদেশে সংস্থাপিত করেন। ইঁহাদের সন্তানগণই বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী ঘটকচূড়ামণি

দেবীবরের মতে ক্ষিতীশ (শাণ্ডিল্যগোত্রজ), সুধানিধি (কাশ্যপগোত্রজ), বীতরাগ (বাৎস্যগোত্রজ), তিথিমেধা (ভরদ্বাজ-গোত্রজ), সৌভরি (সাবর্ণগোত্রজ)—এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আগমন করেন। কুলজীগ্রন্থ 'কুলরাম' প্রণেতা বাচস্পতি মিশ্রের মতে এই পঞ্চগোত্রজ পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্র ও ভৃত্যসহ ৯৫৪ শকাব্দে (১০৩২ খ্রীঃ) কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। নবদ্বীপের রাজবংশের ইতিহাস 'ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত' মতে ৯৯৯ শকাব্দে (১০৭৭ খ্রীঃ) এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ (রাঢ়ীয়) ও দামোদর (বারেন্দ্র), সুধানিধির পুত্র ছান্দড় (রাঢ়ীয়) ও ধরাধব (বারেন্দ্র), বীতরাগের পুত্র দক্ষ (রাঢ়ীয়) ও সুষেণ (বারেন্দ্র), তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্ষ (রাঢ়ীয়) ও গৌতম (বারেন্দ্র), এবং সৌভরির পুত্র বেদগর্ভ (রাঢ়ীয়) ও পবাশব (বারেন্দ্র) হইতে যথাক্রমে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রকুল উদ্ভূত হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ উভয়েই সুকবি ছিলেন। ভট্ট-নারায়ণ "বেনীসংহার" নাটক এবং শ্রীহর্ষ "নৈষধচরিত" নামে মহাকাব্য ও "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" নামে দর্শনশাস্ত্রীয় ছয় প্রধান দর্শনের সমালোচনা পুস্তক রচনা করেন। এইরূপে আদিশূরের রাজত্বকালে পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্মবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর সমাজবিপ্লব সংঘটিত হয়, সংস্কৃত সাহিত্যের সবিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হয়, বাঙ্গলাদেশের ভাষা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইতে থাকে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এই সর্ব্ববিধ বিপ্লব কালক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃত হয়। তাঁহারই সময়ে সমাজপতি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গে আনীত হইয়া বঙ্গদেশের বর্ত্তমান সমাজ-বন্ধনের সূত্রপাত করেন। যে রাজা এই সকল বিপ্লবের সূত্রপাত করেন, তিনি অবশ্যই অসাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চ বেদজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে মকরন্দ ঘোষ (সৌকালিন গোত্রজ), দশরথ বসু (গৌতমগোত্রজ), কালিদাস মিত্র (বিশ্বামিত্রগোত্রজ), বিরাট গুহ (কাশ্যপ-গোত্রজ), ও পুরুষোত্তম দত্ত (মৌদ্গল্য-গোত্রজ) নামে কায়স্থদিগের পঞ্চ সমাজ-পতি পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ বঙ্গজ কায়স্থ নামে পরিচিত। তাঁহাদের একশাখা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দক্ষিণ-রাঢ়ে গিয়া কালক্রমে বসতি করিতে থাকেন, তাঁহারাই দক্ষিণরাঢ়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কায়স্থগণ বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী, এই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, আদিশূরের রাজধানী যে রামপালে ছিল, প্রকারান্তরে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে।

মহারাজ আদিশূরের সম্পর্কে প্রচলিত জনপ্রবাদ ও কুলজীগ্রন্থ লেখকদিগের বিভিন্ন মত হইতে কি পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুমান বলে পাওয়া যাইতে পারে, সংক্ষেপে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। 'সম্বন্ধনির্ণয়' নামক বংশাবলীর বিবরণ পুস্তকে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি বরেন্দ্রদেশীয় একটী প্রবাদ অবলম্বনে লিখিয়াছেন যে, আদিশূরের পর তাঁহার পুত্র ভূসুর, তদনন্তর ভূসুরের দৌহিত্র অশোক সেন, সুরসেন ও বীরসেন ক্রমান্বয়ে বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন। এই প্রবাদ তিনি মুরসিদাবাদের কোন কুলজ্ঞ ঘটকের নিকট অবগত হন বলিয়া ডাক্তর রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের নিকট প্রকাশ

করেন। লেখকচূড়ামণি বঙ্কিম বাবুর কোন আত্মীয়ের দ্বারা সম্পাদিত "ভ্রমর" নামে এক খানি মাসিক পত্রিকায় আদিশূর ও তাঁহার বংশধরগণের নামের একটী তালিকা বাহির হইয়াছিল, তাহা লেখকের স্বকপোল-কল্পিত বা সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আবুলফাজলের রচিত "আইনি আকবরি' কি অন্য কোন পুস্তক হইতে গৃহীত—এই সম্পর্কে কোনও কথা তথায় লিখিত ছিল না। আদিশূরের বংশধরদিগের অন্য কোন বৃত্তান্ত আমরা জানি না। বাবু পার্ব্বতীশঙ্কর রায়ের প্রণীত 'আদিশূর ও বল্লাল সেন' নামক পুস্তকে প্রচলিত কিংবদন্তীর বিবরণাদি ভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে কি না, কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

এক্ষণে আমরা আদিশূরের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। পণ্ডিতকুলতিলক ডাক্তর রাজেন্দ্র মিত্রের মত, ডাক্তর হার-নলির 'শতাব্দী সমালোচন' নামক কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটীর শতবার্ষিকী কার্য্যবিবরণী পুস্তকে, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উৎকৃষ্ট 'বাঙ্গলার ইতিহাসে,' ও শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্তের ও রজনীকান্ত গুপ্তের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' পরিগৃহীত হইয়াছে। এই মত এতদূর সুপ্রচলিত হইয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিলে আমরা পাঠকবর্গের নিকট উপ-হাসাস্পদ হইব বলিয়া শঙ্কিত হইতেছি। এই অভিমত ১৮৭৮ খ্রীঃ ডাক্তর মিত্র কর্তৃক 'পাল ও সেন রাজগণ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক পণ্ডিতগণ তাহা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ পুরঃসর সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়াছেন। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ ডাক্তর মিত্রের মতের তথ্যাতথ্য-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া স্বাধীন গবেষণার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিশেষ প্রশংসার কাজ করিয়াছেন। আমরা যত দিন পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান কার্য্যে বিজ্ঞলোকের মত স্বাধীনভাবে, ধীরতা, গাম্ভীর্য্য, বিনয় ও সুযুক্তির সহিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া অভ্রান্ত বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে থাকিব, যত দিন পর্য্যন্ত যথোচিতরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া অন্যের গ্রন্থ হইতে অপহরণ অথবা কোন অনুবাদ ও অনুকরণ মাত্রে আমাদের ইতিহাস আলোচনা নিবদ্ধ থাকিবে,—তত দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় প্রকৃত ইতিহাসের জন্ম এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানের উৎপত্তি ও সমাদর অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। দাম্ভিকতা, বাগাড়ম্বর, বৃথা আস্ফালন, সুযোগমতে বহুভাষাধিকারের পরিচয় প্রদান, স্বকীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনার্থ অন্যায়রূপে অন্যকে তৎকৃত ভ্রমের জন্য আক্রমণ, কঠোর ও নির্দ্দয় ভাবে লেখনী সঞ্চালন প্রভৃতি বহু দোষ কৈলাস বাবুর লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় বটে,—কিন্তু স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া তিনি যে সত্যানুরাগ ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করি। যথা-যোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বথা সমর্থ ও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধারের উদ্যমকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা না করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার ও অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা

হয়। ইতিহাস লেখকের পক্ষে সত্যানুরাগ, অপক্ষপাত, নিরহঙ্কার, সরলতা, সমদর্শিতা ও সুযুক্তিপ্রিয়তা থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রতি কথায় নিজের বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য, অহম্মুখতা ও কপটতা প্রদর্শনের চেষ্টা না পাইয়া, অভিমানশূন্য চিত্তে তাহার সমস্ত প্রমাণ যথাযথরূপে একত্র সংগৃহীত করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। অপর পক্ষের মত অকাট্য প্রমাণ ও সুদৃঢ় যুক্তিতর্কের বলে খণ্ডন করিয়া ধীরভাবে স্বমতের পরিপোষক যাবতীয় প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক নিজের মত সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বিচারকের পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া, বিপক্ষের অযথা নিন্দা কুৎসা প্রকাশ দ্বারা স্বীয় পদের অবমাননার সহিত ইতিহাসের গৌরব ও মাহাত্ম্য নষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। কঠোর ও নির্দ্দয় ভাবে লেখনী সঞ্চালনে নিরপেক্ষ পাঠকের প্রীতি না জন্মিয়া বরং বিরক্তি জন্মে, এবং প্রতিপাদিত সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা জন্মে। যৎসামান্য ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভিমা নেস্ফীত হইয়া, কোনও ভ্রমপূর্ণ মত প্রচারের জন্য বিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ কোনও লেখককে বিদ্রুপ ও উপহাস করা কদাপি উচিত নহে। অনুবাদ ও অনুকরণ এবং পরমুখাপেক্ষিতা ছাড়িয়া কবে আমরা দেশীয় ও বিদেশীয় ইতিহাসের যথোচিত আলোচনাদ্বারা স্বদেশের ইতিহাস পড়িতে ও লিখিতে শিখিব,—কবে আমরা নাটক উপন্যাস, টীকা টিপ্পনী ও বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থাবলী প্রণয়নে সমস্ত শক্তি ও বিদ্যা বুদ্ধির নিয়োগে দেশ প্লাবিত না করিয়া আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইউরোপীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চায় মনোযোগী হইবেন; কবে এই পতিত জাতি বর্ণ,ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভারতের অতীত গৌরব ও মাহাত্ম্যের অনুশীলন দ্বারা আত্মবল বিক্রমের পরিচয় পাইয়া বহুশতাব্দীর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে,—কবে এই হতভাগ্য দেশের অধিবাসীগণ স্ব স্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ও বিরোধ ভুলিয়া একতার মহামন্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সম্পূর্ণ নবজীবন লাভ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে এক বিশাল জাতিতে পরিণত হইবে, এবং এই পতিত জাতির ভাবী সৌভাগ্য ও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কেবল অতীত কালেই যে ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যবসিত হয় নাই, জগৎকে তাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক জাতীয় জীবনে নবযুগের অবতারণা করিবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণ পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ শাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে (বিক্রমপুরে) হিন্দুধর্ম্মানুরক্ত আদিশূরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদিশূর সেনরাজবংশের সংস্থাপক বীরসেন হইতে অভিন্ন ব্যক্তি। এই বীরসেন বা আদিশূর সম্ভবতঃ ৯৮৬ খ্রীষ্টীয় অব্দে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালায় স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপিত করেন। সেনবংশের প্রথম রাজা বলিয়া এই বীরসেন বা শূরসেন আদিশূর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বীরসেন ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্র সামন্ত ও হেমন্ত সেনের রাজ্য পূর্ব্ববঙ্গেই নিবদ্ধ ছিল। তদনন্তর বিজয় (সুখ) সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, মাধব সেন, কেশব সেন এবং লাক্ষ্মণেয় (অশোক) সেনের আধিপত্য সমগ্র বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পালবংশীয় বৌদ্ধরাজগণ

(পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ)

১। গোপাল (৮৫৫-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)
২। ধর্ম্মপাল (৮৭৫-৯৫ খ্রীঃ)
৩। দেবপাল (৮৯৫-৯১৫ খ্রীঃ)
৪। বিগ্রহপাল (প্রথম) (৯১৫-৩৫)
৫। নারায়ণপাল (৯৩৫ ৫৫)
৬। রাজ্যপাল (৯৫৫-৭৫)
৭। ——পাল (৯৭৫-৯৫)
৮। বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়) (৯৯৫-১০১৫)
৯। মহীপাল (১০১৫ ৪০)
১০। নরপাল (১০৪০-৪৬)

(বিহার)

১০। নয়পাল (১০৪৬)
১১। বিগ্রহপাল (তৃতীয়)
স্থিরপাল
বসন্তপাল
মহেন্দ্রপাল
মদনপাল
গোবিন্দপাল

(সেনবংশীয় হিন্দুরাজগণ)

(পূর্ব্ব বঙ্গ ও অনুগঙ্গ বঙ্গ)

১। বীরসেন (আদিশূর) (৯৮৬-১০০৬)
২। সামন্তসেন (১০০৬-১০২৬ খৃঃ)
৩। হেমন্তসেন (১০২৬-৪৬)

(সমগ্র বঙ্গদেশ)

৪। বিজয়সেন (১০৪৬-৬৬)
৫। বল্লালসেন (১০৬৬-১১০৬)
৬। লক্ষ্মণসেন (১১০৬-৩৬)
৭। মাধবসেন (১১৩৬-৩৮)
৮। কেশবসেন (১১৩৮-৪২)
৯। অশোক (লাক্ষ্মণেয়)সেন (১১৪২-১২০৫)

(বিক্রমপুর)

১০। বল্লালসেন (দ্বিতীয়)
১১। সুষেণ
১২। সুরসেন

স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু রমেশ-চন্দ্র দত্ত ও রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহাদের প্রণীত বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে ডাক্তর মিত্রের এই মতই নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিয়াছেন। রজনী বাবু আদিশূরের সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে কোনও কথা উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি বিক্রমপুর ও গৌড়ে সেনরাজগণের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। হিয়াংসাঙের সময় হইতে সেনরাজগণের সময় পর্য্যন্ত (খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত) উত্তরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও দক্ষিণে সমতট (রামপাল-বিক্রমপুর) এই দুইটী স্থলে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল, গৌড় নগরীতে অথবা রাঢ়দেশের দক্ষিণভাগে কস্মিন কালেও যে প্রাচীন বৌদ্ধ বা হিন্দু সময়ে বাঙ্গলার রাজধানী ছিল, এবম্বিধ কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াংসাঙের ভারতবর্ষে অবস্থান কালে বাঙ্গালার রাজধানী সমতট (রামপাল) সাগর তীরে অবস্থিত ছিল এবং নৈষধচরিত রচনা কালেও কবিবর শ্রীহর্ষ বাঙ্গলার রাজধানীর অনতিদূরে সমুদ্র দর্শন করেন—কৈলাস বাবু কোথা হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের সম্বন্ধে প্রচলিত জনপ্রবাদ অনুসারে, বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগে সাগর অবস্থিত ছিল।

রাজকৃষ্ণ বাবুর মতে আদিশূর বা বীরসেনের রাজ্যারম্ভ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ-

ভাগে ঘটে। রমেশ বাবুর মতে বাঙ্গলার পাল রাজবংশ ৮৫০—১১৫০ খ্রীঃ এবং সেনরাজবংশ ১০৬০-১২০৪ খ্রীষ্টীয় অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সেনবংশের প্রথম রাজা আদিশূর। তাঁহার প্রকৃত নাম বীরসেন বা শূরসেন। পক্ষান্তরে ডাক্তর হ্যারনলি অনুমান করেন যে, গৌড়েশ্বর নারায়ণ পালের সময়ে (১০০৬-২৬খ্রীঃ) সেনবংশীয় সামন্ত ও হেমন্ত সেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শ মতে নারায়ণ পাল বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলায় হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এদিকে রাজা মহীপালের অধীনে বিহার, বারানসী ও অযোধ্যাতে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল থাকে। রাজা নারায়ণ পালের উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করিয়া ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় সেন বাঙ্গলায় সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিজয়সেনই আদিশূর নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রচলিত কিম্বদন্তীকে অগ্রাহ্য করিয়া আদিশূরের সময় নির্ণয় প্রসঙ্গে যে অভিনব মত নব্যভারতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার প্রদত্ত যুক্তি ও প্রমাণ নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব স্থাপনের পক্ষে সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট না হইয়া থাকিলেও প্রচলিত জনপ্রবাদ ও পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি যে নির্ভীকতা ও স্বাধীন গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে সবিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। বৎসরাজদেব, তাঁহার পিতা দেবশক্তিদেবের মৃত্যুর পর ৭৮০খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮০৫ খ্রীঃ (৭০২-২৭ শকাব্দ) পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে ২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে কণোজ রাজ্যের সীমা কাশ্মীর ও মালবদেশ হইতে গৌড় দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, কনোজপতিদিগকে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বপ্রধান নরপতি করিয়া তোলে। ১৮৩৭ খ্রীঃ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় নাসিকের এক খানি ৭৩০ শকাব্দের (৮০৮ খ্রীঃ) লিখিত তাম্রশাসনের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত আছে যে, রাষ্ট্রকোটার অধীশ্বর গোবিন্দরাজের পিতা ধ্রুবরাজ গৌড়বিজেতা বৎসরাজকে পরাজিত করেন। এই বৎসরাজকে কান্যকুব্জপতি বৎসরাজ দেব হইতে অভিন্ন অনুমান করিয়া আরও কয়েকটী অপ্রামাণিক অনুমানের সাহায্যে কৈলাস বাবু আদিশূর সম্বন্ধে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কনোজপতি এই বৎসরাজ গৌড় দেশ আক্রমনপূর্ব্বক তত্রত্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে স্বীয় রণবিজয়ী কাম্বোজবংশীয় শিবোপাসক হিন্দু সেনাপতিকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপিত করেন। কনোজরাজের এই সেনাপতির নামই আদিশূর। কনোজ ও মগধের গুপ্ত সম্রাটগণ উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধ রাজবংশকে দূরীভূত করিয়া নবনিয়োজিত হিন্দুরাজার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ও রাজ্য শাসনের নিমিত্ত যেমন ব্রাহ্মণ ও করণ কায়স্থদিগকে উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন, সেইরূপ বৎসরাজও গৌড় জয় করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে আদিশূরের সহিত গৌড়ে প্রেরণ করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই বঙ্গীয় ও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থগণের আদিপুরুষ। বৎসরাজ শৈব ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজা আদিশূরও

শৈব হওয়াই সম্ভব। এই দুইটী অনুমানের কোনও প্রমাণ প্রদর্শন কৈলাস বাবু আবশ্যক বোধ করেন নাই। দিনাজপুর জিলার কোনও অজ্ঞাত স্থানের শিবমন্দিরের স্তম্ভোলিপি হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, তাহা আদিশূর বা তাঁহার উত্তর পুরুষ কোন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, অনুমান করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে "কাম্বোজান্বয়েন গৌড়পতিনা" বাক্যাংশ দৃষ্টে বৎসরাজের কল্পিত সেনাপতি আদিশূরকে কাম্বোজবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথেষ্ঠ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রযোগ ব্যতীত কেবল অনুমানের সাহায্যে ঐতিহাসিক তত্ব আবিষ্কার করিতে গিয়া, কৈলাস বাবুর প্রবন্ধের সারাংশ এবম্বিধ স্বকপোল কল্পিত কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং লেখকের সমস্ত আয়াস নিষ্ফল করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি ৪৭৯ হইতে ১১১৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত (৫৫৭-১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) কনোজের নৃপতিবর্গের নামমালার যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বীরসিংহ নামে কুলাচার্য্যগণের উল্লিখিত কোনও নাম দৃষ্ট হয় না। এই সম্বন্ধে এত সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনার বক্তব্য শেষ না করিয়া, বা বান্ধব পত্রিকার পাঠককে বরাত না দিয়া, বিস্তৃতভাবে কনোজরাজবংসাবলীর যথোচিত আলোচনা পূর্ব্বক কুলজ্ঞিলেখকদিগের ভ্রম প্রদর্শন করা উচিত ছিল। হিন্দু শাসনকালে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে কায়স্থজাতি যে হিন্দু রাজন্যবর্গের শাসন সংক্রান্ত প্রধান পদ গুলি অধিকার করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতেন, কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় প্রধানত (কদাচিৎ দুই এক জন ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য) রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন—আদিশূরের অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে কায়স্থজাতি ভারতের রাজন্যবর্গের প্রধান মন্ত্রী ও মহাসন্ধিবিগ্রহী প্রভৃতি বিশেষ সম্মানিত পদগুলি অধিকার করিয়াছিলেন—রাজসভায় কায়স্থগণ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে উপস্থিত থাকিতেন,—বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, স্মৃতি, জীবনচরিত, ইতিহাস, প্রস্তরলিপি, মুদ্রালিপি, কি তাম্রশাসনাদি হইতে বিশিষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এই সকল কথার যথার্থতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক পাঠকবর্গের নিকট কায়স্থজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি স্বরচিত প্রবন্ধের অঙ্গহীনতা ও অসম্পূর্ণতা কেন দূরীভূত করেন নাই, বুঝিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, আদিশূর কোথা হইতে আসিয়া গৌড় ও বঙ্গদেশ অধিকার করেন, তৎসম্পর্কে কৈলাস বাবুর প্রদর্শিত যুক্তি ও অনুমান সম্পূর্ণ ও যথেষ্ঠ না হইলেও, আদিশূর ও বীরসেন যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। আদিশূরের সময়ে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলপতিরূপে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাঙ্গলায় উপনিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হন, কুলজ্ঞিকাবিদিগের প্রদত্ত বংশাবলী অনুসারে দেখা যায় যে, কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তক মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণের সহিত সেই সমাজপতিদিগের ৮ হইতে ১৫ পুরুষ এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৩৪ হইতে ৩০ পুরুষ অন্তর হইতেছে। ইহা হইতে কৈলাস বাবু আদিশূরকে বল্লাল সেনের অন্ততঃ ৯ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ও বর্ত্তমান সময়ের ৩৮।৩৯ পুরুষ পূর্ব্বতন অনুমান করিয়া, বল্লালের তিন শত বৎসর ও বর্ত্তমান সময়ের এগার শত বৎসর

পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় অব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আদিশূরের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিয়াছেন। এক স্থলে ৯ পুরুষে ৩০০ বৎসর ও অন্যত্র ৩৯ পুরুষে ১৩০০ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১১০০ বৎসর কেন গণনা করিতে হইবে, কৈলাস বাবু তাহার যথোপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করেন নাই। কুলজিকারদিগের মতে আদিশূর এক বৌদ্ধ রাজবংশ জয় করিয়া গৌড়ের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, ৬৯৫ শকাব্দে (৭৭৩খ্রীঃ) গৌড়ে এক জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন"। এই বৌদ্ধ রাজার পরে তাঁহার বিজেতারূপে আদিশূরের আবির্ভাব হওয়া বিচিত্র নহে। ডাক্তর মিত্র ও হারনলি সাহেব আদিশূরের যে সময় অবধারণ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা কুলজীকার ব্রাহ্মণদিগের প্রদত্ত বংশাবলী হইতে কৈলাস বাবু যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, উহা অধিকতর সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে।

সম্রাট আকবরের প্রিয় বয়স্য ও প্রধান মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ আবুলফাজল আকবরের সময়ের ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রাচীন হিন্দুদিগের লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণ ও জনপ্রবাদাদি অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সময়ের ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস স্বরচিত 'আইনি আকবরী' গ্রন্থের ভূমিকারূপে লিখিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের বিবরণে বাঙ্গলার যে রাজবংশাবলী প্রদান করেন, তাহাতে আদিশূর ও তাঁহার বংশধরদিগের পর বৌদ্ধ পাল রাজগণের বংশাবলী এবং তদনন্তর বিজয় (সুখ) সেন রাজবংশের স্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি যে কেবল স্বকপোলকল্পিত কল্পনা বা অনুমানের সাহায্যে তাঁহার সংগৃহীত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা আমরা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে তাঁহার কথায় কোনও কালে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। বহু আয়াস ও পরিশ্রমে তিনি যে সকল লিখিত ও প্রচলিত ঐতিহাসিক বিবরণ ও জনশ্রুতি অবলম্বনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বৃত্তান্ত ও রাজবংশাবলী সংগ্রহ করিয়া স্বরচিত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেন, তাহা বিভিন্ন জাতির ভারতবর্ষ পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ও বিষম রাষ্ট্রবিপ্লবে—ভারতবর্ষের জলবায়ুর দোষে ও মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে—বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। সেই সকল লিখিত ও প্রচলিত বিবরণ এক্ষণে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, মহাত্মা আবুলফাজলের ন্যায় অতি উচ্চদরের এক জন ইতিহাস লেখকের মানও কথা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত একবারে অগ্রাহ্য বা বিশ্বাসের অযোগ্য বলা যাইতে পারে না। আবুলফাজলের লিখিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অনেক ভ্রম থাকিতে পারে। কিন্তু তিনিই ভারতবিজয়ী মুসলমানদিগের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সংগ্রহে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়া যে মহত্ত্ব ও উদারতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য এই মহাত্মার নিকট সর্ব্বদাই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যদি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল রাজগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আদিশূর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই অনুমান কোনক্রমে অযৌক্তিক ও অসম্ভব নহে।

কোন কোন কুলজ্ঞ ও কুলজীলেখক জনশ্রুতি অবলম্বনে সেনবংশীয় মহারাজ

বল্লাল সেনকে আদিশূরের দৌহিত্র, কেহ কেহ বা তাঁহাকে আদিশূরের কন্যাকুল হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে এই জনপ্রবাদকে অমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করার কোনও কারণ দেখিতেছি না। আদিশূর ও সেন রাজগণ বিভিন্ন বংশে না জন্মিলে প্রবাদ মতে তাঁহাদের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন ঘটিতে পারিত না।

এই সমস্ত কারণে বীরসেন ও আদিশূর যে অভিন্ন ব্যক্তি, অথবা আদিশূর যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়েশ্বর পাল রাজগণের ১৩০ বৎসরের পরে পূর্ব্ববঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—বহুমানাস্পদ ডাক্তর মিত্র মহাশয়ের এই কাল্পনিক মত যুক্তির অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে চোলরাজ্যের রাজা কুলোতুঙ্গের সেনাপতিরূপে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের বাঙ্গলা অধিকার এবং কনোজের অধীশ্বর বৎসরাজ দেবের সেনাপতিরূপে কাম্বোজবংশীয় আদিশূরের বঙ্গের রাজাসনে অধিষ্ঠান—বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কৈলাস বাবুর এই দুই অভিনব আবিষ্ক্রিয়ার কোনটাই যথাযোগ্য প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক তিনি নিঃসন্দিগ্ধরূপে ঐতিহাসিক তত্ত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া আমাদের ক্ষীণ বুদ্ধিতে বোধ হয় না। বিশিষ্ট যুক্তি প্রমাণ ভিন্ন কেবল ব্যক্তিগত অনুমানের উপর কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের * রচিত কায়স্থ-কারিকায় লিখিত আছে, আদিশূরের শাসন কালে পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচ জন কায়স্থ ভিন্ন আরও দ্বাবিংশতি জন কায়স্থ বাঙ্গলায় আগমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। আদিশূর তাহাদিগের ২৭ জনকে বসতি করিবার জন্য

---

* প্রায় দুই শত বৎসর গত হইল শাণ্ডিল্য-গোত্রজ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে এই ঘটকচূড়ামণি ধ্রুবানন্দ মিশ্রের জন্ম হয়। তিনি বঙ্গজ কায়স্থদিগের সমাজপতি চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আশ্রয়দাতা রাজার আদেশে বঙ্গজ কায়স্থদিগের বংশাবলী সহ বিশেষ বিবরণ এই 'কায়স্থ-কারিকা' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। কৈলাস বাবু "চন্দ্রদ্বীপের আদি রাজবংশ যে বাঙ্গলার সেন রাজবংশ হইতে উদ্ভূত—এরূপ অনুমান করিবার বিশেষ কারণ প্রাপ্ত" হইয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহার প্রতিশ্রুত ও নব্যভারতের 'ত্রিপুরা রাজ্য' নামক প্রবন্ধের বিজ্ঞাপিত বাঙ্গলার ইতিহাস প্রকাশের পূর্ব্বে তাহা প্রচারিত করিয়া উহার নূতনত্ব বিলোপ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। এই প্রবন্ধ লিখার পর কৈলাস বাবু দনুজমর্দ্দন দেবের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আমরা এস্থলে ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব ১৮৭৪খ্রীঃ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় বাঙ্গলার 'দ্বাদশ ভৌমিকের' অন্যতম চন্দ্রদ্বীপ পতির যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা হইতে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা লিখিয়া কৈলাস বাবুর অনুমানের কারণ আমরা যেরূপ বুঝিতেছি, উহা নির্দ্দেশ করিতেছি।

১২৮০খ্রীঃ সুলতান মগিস উদ্দিন তোগরলের বিদ্রোহ দমনার্থ দিল্লীশ্বর গিয়াসউদ্দিন বলবন বিদ্রোহীর অনুসরণক্রমে সোনারগাঁয় উপনীত হইলে, দনুজ রায় সম্রাটের অভ্যর্থনা করিয়া বিদ্রোহীর দমন বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন। তুগ্রল যাহাতে পশ্চিমে পলাইয়া না যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রতীকার করিতে সম্রাটের নিকট প্রতিশ্রুত হন। চন্দ্রদ্বীপের অধিকার মেঘনা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে এবম্বিধ অঙ্গীকারের অর্থসঙ্গতি হইতে পারে। মগিসউদ্দিন তোগরল সোনারগাঁর বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার রাজধানীতে কোনও হিন্দু নৃপতিকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে দিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণীর উল্লিখিত সোনারগাঁর

২৭ খানি গ্রাম প্রদান করেন। কৈলাস বাবুর প্রবন্ধ হইতে এস্থলে তাহাদের নাম উল্লিখিত হইল। দেবদত্ত ও মহোজা নাগ, চন্দ্রভানু নাথ, চন্দ্রচূড় দাস, জয়ধর সেন, ভূমিঞ্জয় কর, ভূধর দাস, জয়পাল পাল, চক্রধর পালিত, চন্দ্রধ্বজ চন্দ্র, রিপুঞ্জয় রাহা, বীরভদ্র ভদ্র, দণ্ডধর ধর, তেজোধর নন্দী, শিখিধ্বজ দেব, বশিষ্ঠ কুণ্ড, ভদ্রবাহু সোম, বীরবাহু

দনুজরায়কে পূর্ব্বোক্ত সুযুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, ডাক্তর ওয়াইজ চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা ও বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজপতি দনুজমর্দ্দন দে বলিয়া অনুমান করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি বিক্রমপুরবাসী চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামক ভগবতীর প্রিয় উপাসক জনৈক অলৌকিক ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন। বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত সেই সময়ে সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। একদা সভৃত্য চন্দ্রশেখর সাগর যাত্রায় বহির্গত হইয়া স্বপ্নাবেশে ভগবতীর সন্দর্শন লাভ করেন। ভগবতীর আদেশে কতিপয় দেবমূর্ত্তি উদ্ধারার্থ চন্দ্রশেখর ভৃত্যকে নৌকার নিকটে সারগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে আজ্ঞা দেন। দুইবারে যে দুইটী প্রস্তরময়ী দেবমূর্ত্তি দনুজমর্দ্দন প্রভুর আদেশে উত্তোলন করেন, তাহা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ কর্ত্তৃক কুলদেবতারূপে পূজিত হইতেছে। চন্দ্রশেখর ভৃত্যকে কহিলেন যে, 'শীঘ্রই সাগর শুষ্ক হইয়া স্থলে পরিণত হইবে এবং তুমি তথায় রাজা হইবে। আমার নাম অনুসারে এই স্থলের নাম চন্দ্রদ্বীপ রাখিও'। ইহা হইতে চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি হয়।

বর্ত্তমান জিলা বাখরগঞ্জ (সলিমাবাদ পরগণা ভিন্ন) লইয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সংগঠিত হইয়াছিল। আদিশূরের আনীত পঞ্চ প্রধান কায়স্থের আবাসস্থল এখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় চন্দ্রদ্বীপের রাজাগণ বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজপতি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা দনুজমর্দ্দন খ্রীষ্টিয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ থানার নিকটবর্ত্তী কচুয়া নামক স্থানে যে চন্দ্রদ্বীপের বহু সম্মানিত রাজবংশের স্থাপন করেন, ঘটকদিগের মতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেই চন্দ্রদ্বীপে ১৭ জন নরপতি আবির্ভূত হইয়াছেন। কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণের ২৩ পুরুষ গত হইয়াছে বলিয়া ডাক্তর ওয়াইজ ঢাকার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে লিখিয়াছেন। জন প্রবাদ মতে দনুজমর্দ্দন দে বিক্রমপুর হইতে আগমন করেন। রাজা বল্লাল সেনের পর তিনি পুনরায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়া কায়স্থ কুলাচার্য্য ব্রাহ্মণ ঘটকদিগের বাসস্থল উদিলপুরে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। কুলীন কায়স্থদিগের সম্বন্ধ বন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহের ভার ঘটকদিগের প্রতি অর্পিত হয়। রাজকীয় নিমন্ত্রণে ও সভাতে সমবেত হইয়া সম্মান অনুসারে যে কোন স্থানে উপবেশন করিতে অধিকারী হইবে, তাহা নির্ণয় করিয়া সেই সকল নিয়ম যথাবিহিত মতে পালিত হইতেছে কি না, উহা দেখিবার ভার এক দল কায়স্থের প্রতি প্রদান করেন। আজিও তাহাদের বংশধরগণ রাজা দনুজমর্দ্দনের বিধান অনুসারে ঘটকদিগের ন্যায় কায়স্থসমাজে বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্ত হইতেছে।

রাজা দনুজমর্দ্দনের পর তাঁহার পুত্র রমাবল্লভ রায় চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন। রমাবল্লভের পর তাহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভ, তৎপর কৃষ্ণবল্লভের পুত্র জয়দেব রায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার কায়স্থদিগের সমাজপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। জয়দেবের সহোদরা কমলা রাজধানী কচুয়াতে যে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। জয়দেব রায়ের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত দিহরঘটী নিবাসী বসুবংশজ কুলীন পরমানন্দ রায় মাতুলের রাজ্য ও সমাজপতি পদ প্রাপ্ত হন। আবুলফাজলের 'আইনি আকবরী' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১৫৮৩ খ্রীঃ ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত হইতে পরমানন্দ রায় সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পান। ১৫৭৪ খ্রীঃ আকবরের সেনাপতি মুরাদ খাঁ চন্দ্রদ্বীপ আক্রমণ করিয়া তাহা দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরমানন্দের পর তাঁহার পুত্র জগদানন্দ ও পৌত্র কন্দর্পনারায়ণ রায় যথাক্রমে চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন। ১৫৮৬ খ্রীঃ ইংরেজ পর্য্যটক রালফফিচ্ বাকলার রাজা এই কন্দর্প-

সিংহ, ইন্দুধর রক্ষিত, হরিবাহু অক্রূর, লোমপাদ বিষ্ণু, বিশ্বচেতা আঢ্য, মহীধর নন্দন, সমুদয়ে এই ২২ জন কায়স্থ বঙ্গদেশে উপনীত হন। কোনও যুক্তি কি প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কৈলাস বাবু কিরূপে যে সকল "মিত্র, নাগ, পাল, সেন, দত্ত, বর্দ্ধনবংশীয় প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গের সহিত বাঙ্গলার ঐ সকল উপাধিধারী কায়স্থগণের অবশ্যই কোনরূপ ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে" বলিয়া অদ্ভুত সিদ্ধান্ত দ্বারা বাঙ্গলার কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া উঠিলেন,—স্থূল বুদ্ধিতে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ইতিহাসের আলোচনায় তাঁহাকে এবম্বিধ কবিকল্পনার আশ্রয় লইতে দেখিয়া, আমাদের ন্যায় 'নব্যভারতের' (অষ্টম খণ্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা) অন্য কোনও স্থূলবুদ্ধি পাঠক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন কি না, বলিতে পারি না।

আবুলফাজলের মতে আদিশূর কায়স্থ ছিলেন। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বের উপক্রমণিকায় তাঁহাকে দালভ্য মুনির বংশধর ক্ষত্রিয় জাতীয় কায়স্থ বলা হইয়াছে এবং গিরিধর, পৃথ্বীধর, সৃষ্টিধর, প্রভাকর ও জয়ঙ্কর নামে কয়েক জন কাল্পনিক রাজাকে আদিশূর বংশীয় বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। কৈলাস বাবু তাঁহাকে কাম্বোজ বংশীয় ক্ষত্রিয় ও শৈব নরপতি কান্যকুব্জের অধীশ্বর বৎসরাজ দেবের সেনাপতি বলিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

নারায়ণের সভায় উপস্থিত হন। কন্দর্পনারায়ণ কি তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র রায়ের সময়ে, চট্টগ্রামের পর্ত্তুগিজ ও মগদস্যুদিগের ভীষণ উপদ্রবে কচুয়া হইতে মাধবপাশায় রাজধানী নীত হয়। রামচন্দ্র রায় যশোহরের রাজা সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৬৯২ খ্রীঃ প্রতাপাদিত্যের রাজা মানসিংহের হস্তে পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁহার পতিব্রতা তনয়া স্বামী রামচন্দ্র রায়ের দর্শন মানসে পৈতৃক রাজবাটী হইতে যাত্রা করিয়া স্বামীর আদেশ প্রতীক্ষায় পথিমধ্যে যেস্থলে অবস্থিতি করেন, তথায় সেই ঘটনার চিরস্মারকরূপে যে হাট প্রতিষ্ঠিত হয়, অদ্যাপি তাহা "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণনারায়ণ দুর্দ্ধর্ষ মগ ও পর্ত্তুগিজদিগের বিরুদ্ধে অনেকানেক যুদ্ধে ঢাকার নবাবকে বিশেষ সাহায্য করেন। কৃষ্ণনারায়ণ স্বীয় কনিষ্ঠভ্রাতা বাসুদেব রায়ের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। বাসুদেবের পৌত্র নিঃসন্তান হওয়াতে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃস্বসার কি মাতুলের পুত্র ঢাকার নিকটবর্ত্তী উলাইলের উদয় নারায়ণ মিত্র মজুমদার চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন। মুরসিদাবাদের নবাব তাঁহার সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে উদয় নারায়ণ মুরসিদাবাদে নবাবের আদেশে দ্বন্দ্বযুদ্ধে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হন। উদয়নারায়ণের পৌত্র জয়নারায়ণ অতি শৈশবে জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার দুরাচার ও বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী শঙ্কর বক্সী ৭ বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। তদনন্তর তাঁহার মাতা দুর্গারাণী দেওয়ান গোবিন্দ সিংহের সাহায্যে জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করিয়া নষ্টোদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। জয়নারায়ণের পরবর্ত্তী রাজা নৃসিংহ সৌন্দর্য্যের জন্য বাঙ্গলায় সুবিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু শাসনকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ বাকী খাজানার জন্য জমিদারীর কিয়দংশ বিক্রীত হয়। মাধবপাশার রাজবংশ এক্ষণে সামান্য নিষ্কর তালুকদারে পরিণত হইয়া, অতীত গৌরবের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে।

ভালবাসা-কালকূট।

ভালবাসা-কালকূটের কথা আমাকে বলিও না, ভাব তার দাসী, চঞ্চলা নদীর তীরে কলঙ্ক-চন্দন-বৃক্ষমূলে সেই কুসুম-দেহী কোমলাঙ্গীর বাস। সে কালকূট পান করিয়া আমি জর্জ্জরিত হইয়াছি,—আর আমাকে তার কথা বলিও না। সে না করিতে পারে এমন কাজ নাই,—সে যে কি নেশার ভরায়, জানি না, কিন্তু জগৎ তার জন্য পাগল। শিব পাগল সতীর জন্য, সীতা পাগলিনী শ্রীরামের জন্য,—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা এবং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের জন্য পাগল এবং পাগলিনী। কেন, কি জন্য, আমি তাহা বুঝি না। দর্শন নাস্তিবাদ লইয়া, বিজ্ঞান অস্তি বা জড়বাদ লইয়া করকপে প্রতিপন্ন করিল, মনুষ্যের শরীরের অবশেষ নাই, সে মাংস, সে ছায়া, সে পরমাণু সমষ্টি—অথবা শ্মশানের ছাই। মৃত্যুর অপেক্ষা আর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কোথায় পাইবে? সে প্রত্যক্ষবাদ চক্ষের সম্মুখে ধুনাইয়া চমক ভাঙ্গিয়া দেখাইল, বাস্তবিকই মানুষ শ্মশানের ছাই; তবুও, কি জানি কেন, তবুও মানুষের জন্য মানুষ পাগল। শ্যাম বংশী আর বৃন্দাবনে নাই, কিন্তু তবুও শ্রীরাধার কুল ডুবাইল, মান ডুবাইল, জীবন ডুবাইল; হায় হায় আর রহিল কি? আমার সম্মুখে কেহ নাই, পশ্চাতে কেহ নাই—চতুর্দ্দিকে কেবল ফাঁপা নীরবতা, কেবল অনন্তপুরের অনন্ত তৃষ্ণা, আমি কিসে জর্জ্জরিত, আমার প্রাণ দিবানিশি হু হু ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। লোকে বলে "আমি মানুষের ভালবাসা কাড়িয়া লইয়াছি, কিন্তু কাহাকেও ভালবাসা দেই নাই—আমি সজাগ কবি, আমি মাতাইতে জানি, কিন্তু মাতি না। আমি যশের কুহকে, স্বার্থের ধাঁধায়, প্রলোভনের ছলনায় আমি ঘুরি, ফিরি, উঠি, বসি।" বাস্তবিকও আমি তাহাই। বন্ধু, আমাকে ক্ষমা করিয়া, পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাও, আর বৃথা ভালবাসার কথা বলিও না।

বাল্যকাল হইতে আমার বড় অহঙ্কার ছিল, তাই দম্ভ-সহকারে বলিতাম, "লোকের জন্য আমি পাগল হ'ব? না—তা কখনই হইবে না।" এজন্য আমি প্রেমের ঘর বাঁধি নাই—এজন্য ছেলে খেলায় ভুলি নাই। বড় হইয়াও কঠোর তপস্যায়, কর্ত্তব্যের সেবায় পিতা মাতা গুরুজনের স্নেহ, ভ্রাতা ভগ্নীর স্নেহ, স্কুলের সমপাঠিগণের স্নেহ, যৌবনে সঙ্গিগণের স্নেহ, সব স্নেহ ভুলিয়াছি। মাতা কত দিন কাঁদিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন, পিতা নীরবে ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইলেন,—আর যাঁহারা গুরুজন তাঁহারা অনেক করিলেন, অনেক সহিলেন, শেষে আর পারিলেন না, আমাকে বিদায় দিলেন। কলেজে বা স্কুলে পড়িবার সময় সকলে আমার বাড়ী আসিত, আমি কাহারও বাড়ী যাই নাই;—ইহাতেই সব কথা বুঝিতে পারিবে। বাল্য-সুহৃদ "কাও গো" সহোদর "র", যৌবন-সুহৃদ্ "চ, অ, পা, ও অ"—সকলে নিরাশ হইয়া অন্ধকারে কায়া ডুবাইয়া চলিয়া গেল! তাঁহারা সকলে আজ অদৃশ্য পুরে মনপ্রাণ বাঁধিয়াছেন। হায়, হায়, আমি কি পাষাণ? আমি অদ্যও স্বপ্নে তাঁহাদের ছবি দেখিয়া অবাক হই কিন্তু ধরা ছোঁয়া দেই না। হায়, আমি কি মানুষ? না আমি সত্যই পাষাণ। এতদূর পর্য্যন্তও

পাষাণ। কিন্তু অনন্তপুরের অনন্তদ্বারে তপস্যা করিয়া—"ক" হইতে "অ" সকলে মিলিয়া বিশ্বেশ্বরের যোগ ভাঙ্গিয়া মন গলাইয়া অবশেষে প্রেম-বিষ আমার প্রাণে ঢালিয়াছে। "অপরাজিতা" আমাকে কি করিয়া কোন্ তীর্থে কোন্ নৌকায় যেন উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে! সত্যই সে আসিয়াছিল—আর আজ সত্যই সে গিয়াছে? হায় হায়, আমি মানুষ হইলাম, পাখী হইলাম না কেন? আমি উড়িতে অক্ষম, সীমায় আবদ্ধ—অসীম অনন্তপুর কতদূর, কিছুই বুঝিলাম না। সে আমার প্রাণ কাঁদাইল! এতদিন পরে আমি কলঙ্ক-সাগরে ডুবিলাম। মানুষ শ্মশানের ছাই, তাত বেশ বুঝিয়াছি, কিন্তু তবুও আমি তার জন্য পাগল। বন্ধু, তুমি ঠাট্টা করিলে, মুখ বক্র করিলে, কিন্তু আমার প্রাণ ত বুঝিলে না! প্রাণ বুঝা—তোমার কাজ নয়। ঠাট্টা, তিরস্কার, যশ, নিন্দা, প্রশংসা—তোমার হাসিমাখা মুখ বা চক্ষের জল, ওসব আমার নিকট সমান। বন্ধু, বল নগরে—"ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্কসাগরে।" দেখিলাম ত আরো দেখিলাম না কেন? পাইলাম ত আরো পাইলাম না কেন? তার কথা শুনিলাম ত আরো শুনিলাম না কেন, এ সকল বুলি আমার নিকট শুনিবে না। আমার ভাষা—"কি দেখিলাম!" "কি দেখিলাম!" সে অমৃত সাগরের ঢেউ, সে সুধা-সিন্ধুর নবনী, সে চাঁদ ছাঁকিয়া অমিয়া, সে কুসুমজগতের সুষমা, অথবা সে যে কি, আমি তা জানি না। মানুষ, মানুষকে ভুলিয়া তারপর স্বপ্নে দেখে। আমি তাকে আর স্বপ্নেও দেখি না। সে প্রত্যক্ষ, চিরপ্রত্যক্ষ, চির উজ্জ্বল, চির নিকটস্থ। সে দেবীপুরের দেবী-মূর্ত্তি, মাতৃমূর্ত্তি।

ছি, ছি, ছি—মানুষীকে দেবী বলিলাম? ছি, ছি, ছি—এই বলিয়া সব বন্ধু, সব ভাই আজ দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পাগলের বাণী, প্রলাপের উক্তি শুনিতে কেহ আজ কাছে নাই। স্বার্থের পর স্বার্থ, তার পর স্বার্থ—সপ্তম স্বার্থ-দেশের পর তাঁহারা বাড়ী বাঁধিয়াছেন। আমি শুনিতেছি, তাঁহারা আমাকে ঘৃণা করিয়া এখন ভালই আছেন। আমি শুনিতেছি, তাদের ধর্ম্মকর্ম্ম এখন ভালই হইতেছে। কেহ তোষামোদে, কেহ যশে, কেহ প্রশংসা স্তুতিবাদে তাঁহারা দশের মধ্যে একজন হইয়া আজকাল ভাল ভাবেই দিন কাটাইতেছেন। আর আমি? ভবপুরে ভবঘুরে—যেই একাকী, সেই একাকী—কোলে সেই মাতৃমূর্ত্তি! নিমতলার ঘাটে মায়ের রূপ ভাসাইয়াছি—আমার মা এখন নিরাকারা—চিন্ময়ীমূর্ত্তি। তিনি রূপের অতীত—অরূপা, অথবা রূপ জমিয়া মহামায়ার মহারূপ মা আমার, আমি মায়ের, এই একটী কথায় আমার সব বেদ, বাইবেল, কোরাণ পরিসমাপ্ত। তোমার ব্রহ্মাণ্ডবেদ, রাশি রাশি পাঁজাপুঁথি আমার এই একটী কথায়। আমি তর্কযুক্তি জানি না, দর্শনবিজ্ঞান ধুঁইয়া যাহা পান করিতে হয়, তোমরা কর, আমি আর কিছুরই নই, কেবল মায়ের। মা আমার কথা বলেন না, হাসেন না, কিছু দেন না, এইরূপ যত যুক্তি তর্ক থাকে, আমার নিকট লইয়া আসিয়া ভুলাও, আমি অলড়, আমি দেখিয়াছি, পাইয়াছি, তাঁর কথা শুনিয়াছি, আমি কিছুতেই তোমার ঐ সকল কথায় ভুলিব না। তোমার জন্য অবিশ্বাস থাকে, ভাই তুমি তাই লইয়াই থাক; আমি তাহা চাই না। আমার যাহা, আমি তাই লইয়াই থাকিতে চাই। আমি চাই। সেই স্নেহ

বিগলিতা, পাপ-প্রলোভনের অস্পৃশ্যা, পুণ্য-সলিলা ভাগীরথিতে দেহ মন ডুবাইতে। সেই সংসারের অতীতা, অপরাজিতা মাতৃ-মূর্ত্তি লইয়া আমি পাগল হইতে চাই। আমি নির্মেব-হারা যোগী, ভাব-হারা কর্ম্মী, জ্ঞান-হারা শিশু,—আমি সব হারা হইয়া মায়ের হইতে চাই। আমি ছুটিতেছি, ফিরিতেছি, —আমি অস্থির হইয়াছি। আর আমাকে ভালবাসার কথা বলিও না, আমি তার জ্বালায় সংসারে থাকিয়াও সংসার-ত্যাগী সন্যাসী।

তোমাদের ভালবাসার মায়ায় আমাকে আর পায়ে জড়াইও না। ভাই, তুমি অনেক দিয়াছ, এখন একটু ক্ষমা কর। আমি তোমাদিগকে ধরিয়া অনন্তপুরে যাইব, ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু স্বার্থের হাটে আসিয়া হঠাৎ আমার চমক ভাঙ্গিয়াছে, এখন দূর হও। আমি আর ভালবাসিব না। ভালবাসিলে কি হয়, বুঝিয়াছি। আমি সব দিয়াছি, সত্য বলিতেছি, আমি হৃদয়ের সব ঢালিয়াছি, বৃথা শূন্যেরদিকে আর তাকাইও না। যে প্রেম-সিন্ধুতে সকলের প্রীতি, সকলের ভক্তি, বিমিশ্রিত, সেই সিন্ধুরদিকে নয়ন ফিরাও। আর বৃথা মজিও না। বৃথা হলাহল পান করিও না। অনন্তে সান্তকে ডুবাইয়া নির্লোভী, নিস্পৃহ, নিষ্কর্ম্মাযোগী হও। ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিবে, অনন্তের আস্বাদন পাইবে। সান্তে,—সাকারে,—এ ভবপুরে তাহা পাইবে না। আলোকের অতীত ধামে, রূপের অতীত নামে একবার আসক্ত হও, আমি যাহা বলিতেছি, বুঝিবে। আর যশ-মান, দর্শন বিজ্ঞান চাও, সংসারের বাজারে অন্বেষণ কর। ভক্তির শ্রীঅঙ্গন সেখান হইতে অনেক দূর।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪২)

ভক্ত সমাগম।

শ্রীচৈতন্য দক্ষিণাপথে গমন করিলে উৎকল রাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র এক দিন কটক হইতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিলাম গৌড় দেশ হইতে এক মহাত্মা নীলাচলে আসিয়া আপনার গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন ও আপনাকে নাকি বহুকৃপা করিয়াছেন? আমি কি তাঁহার দর্শন পাইতে পারি না?" ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা শুনিয়াছেন, সকলই সত্য; কিন্তু তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, নির্জ্জন স্থানে থাকেন। রাজদর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রাণান্তেও রাজ সমীপে যান না। তথাচ কোন কৌশলে আপনাকে দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।"

রাজা বলিলেন। "জগন্নাথ দর্শন ছাড়িয়া দক্ষিণে যাইবার কারণ কি?"

সর্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, তিনি সামান্য মহাপুরুষ নহেন; সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তীর্থ সকলকে

পবিত্র করিতেই তিনি তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন।

রাজা বলিলেন, আপনি মহা বিজ্ঞ ব্যক্তি; আপনি যখন তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিতেছেন, তখন আপনার কথা অবিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হউক, তিনি আসিলে যেন একবার তাঁহার দর্শন পাই।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন "তিনি অল্প কালেই প্রত্যাগত হইবেন, কিন্তু তাঁহার জন্য একটী বাসার প্রয়োজন। শ্রীমন্দিরের নিকট অথচ নির্জ্জন স্থান হইলেই ভাল হয়। আপনাকে এরূপ একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে।"

রাজা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার ইষ্টদেব কাশী মিশ্রের বাটীতে তাঁহার সুন্দর বাসা হইতে পারিবে। আপনি আমার নামে মিশ্র মহাশয়কে বলিয়া সেই স্থান ঠিক করিয়া রাখুন।"

ভট্টাচার্য্য রাজ সমীপ হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া রাজার ইচ্ছা কাশী মিশ্রকে নিবেদন করিলে কাশী মিশ্র আপনাকে মহা ভাগ্যবান্ মনে করিয়া বাসার স্থান ঠিক ঠাক্ করিয়া রাখিলেন।

প্রতাপ রুদ্র গঙ্গাবংশের শেষ রাজা; ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি উড়িষ্যার সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ইনি প্রথম বয়সে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া ছিলেন। কিন্তু পরে বৈষ্ণব হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মকে একবারে উৎকল হইতে দূরী-ভূত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রভাবে ইঁহার ধর্ম্মানুরাগ আরও সন্দীপ্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্য তীর্থ যাত্রা হইতে আসিয়া প্রথম রজনী সশিষ্যে সার্ব্বভৌমের আলয়ে যাপন করিলেন। রজনী প্রভাতে ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইয়া কাশী মিশ্রের ভবনে লইয়া যাইয়া বলিলেন, এই বাড়ী তোমার জন্য বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। ইহা তোমার পছন্দ হয় তো?

শ্রীচৈতন্য বাসস্থান দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। বাড়ীটী যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি নির্জ্জন, অথচ জগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকট। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'প্রভু! এই বাসা অঙ্গীকার করিয়া কাশী মিশ্রের আশা পূর্ণ কর। এই সময়ে কাশী মিশ্র সগোষ্ঠিবর্গে আসিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃপা করিলেন। এবং বলিলেন, 'আমার এই দেহ তোমাদেরই, তোমরা ইহাকে যেমন করিয়া রাখিতে চাও, রাখ, আমার তাহাতে মতামত কি?'

এই সময়ে নীলাদ্রির প্রধান২ লোক শ্রীচৈতন্যের নিকট পরিচিত হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে উপবিষ্ট হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একে একে এই সকল ব্যক্তির পরিচয় দিয়া দিলেন। যথা:—

জগন্নাথের সেবক জনার্দ্দন, স্বর্ণ বেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লিখনাধিকারী শিখি মাহিতি, প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামে বৈষ্ণব, জগন্নাথের মহাসোয়ার দাস নামক ব্যক্তি, শিখি মাহিতির ভ্রাতা মুরারি মাহিতি, চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি নামক ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুদাস, প্রহররাজ মহাপাত্র এবং পরমানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি। এই সকল লোক এইক্ষণ হইতে শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনুগত হইয়া থাকিলেন। এই সময়ে রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায় চারি পুত্র সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভট্টাচার্য্য

তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভবানন্দ প্রণাম করিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিতে লাগিলেন "রামানন্দের ন্যায় যাঁহার পুত্র, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা কি? তুমি সাক্ষাৎ পাণ্ডু, তোমার স্ত্রী কুন্তী দেবী ও তোমার পাঁচ পুত্র পঞ্চ পাণ্ডব। ভবানন্দ বলিলেন, 'আমি শূদ্রাধম, তাহাতে আবার বিষয়ী, তবে যে তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে স্পর্শিলে, সে কেবল তোমার ঈশ্বর লক্ষণ। যাহা হউক, পঞ্চপুত্র সহ তোমায় আত্ম সমর্পণ করিলাম। এই বাণী নাথ তোমার সমীপেই থাকিবে, যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আপনার জন বিবেচনায় ইহাকে আদেশ করিও, সঙ্কোচ করিলে মহা দুঃখিত হইব। মহাপ্রভু বলিলেন, "তোমাদের কাছে আর সঙ্কোচ কি? তোমরা তো আমার পর নও। দিন পাঁচেকের মধ্যে রামানন্দ আসিবেন, তখন আমার আনন্দ বাঞ্ছার পূর্ণ হইবে।" ইহার পর ভবানন্দকে বিদায় দিয়া শ্রীচৈতন্য বাণীনাথকে নিকটে থাকিতে অনুমতি দিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ছাড়া আর সকল লোক বিদায় হইয়া গেলে শ্রীচৈতন্য তাঁহার দক্ষিণ যাত্রার সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে নিকটে ডাকাইলেন এবং ভট্টমারীতে তাঁহাকে ছাড়িয়া কামিনী কাঞ্চনের লোভে যেরূপে সে পলাইয়া গিয়াছিল ও তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া বলিলেন 'এখন আমি ইহাকে দেশে আনিয়া দিলাম ও বিদায় দিতেছি। উহার যেথানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, আমার নিকট থাকিতে পাইবে না।' এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণদাস কাঁদিতে লাগিল। সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন করিতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

নিত্যানন্দাদি কৃষ্ণদাসের ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া নিকটে রাখিলেন এবং সময়ান্তরে শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'তোমার দক্ষিণ গমন সংবাদে শচী মাতা ও অদ্বৈতাদি নবদ্বীপের ভক্ত সকল উৎকণ্ঠিত আছেন। তোমার আগমন বার্ত্তা দিতে গৌড় দেশে একজন লোক পাঠাইতে চাই; ইহাতে কি অভিপ্রায় হয়? গৌরচন্দ্র বলিলেন, 'তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর'। তখন প্রচুর মহাপ্রসাদ সঙ্গে দিয়া মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন সংবাদ দিতে নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে বঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিয়া শচী মাতাকে ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে সংবাদ সহ মহা প্রসাদ দিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যকে সমাচার প্রদান করিলেন। শুভ সংবাদ পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, আচার্য্য রত্ন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, আচার্য্য নিধি, দামোদর পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, বিজয় দাস, খোলা বেচা শ্রীধর, রাঘব পণ্ডিত, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত মণ্ডলী এই আনন্দের সংবাদে আচার্য্য গৃহে উপনীত হইলে অদ্বৈতাচার্য্য এতদুপলক্ষে দুই তিন দিন উৎসব করিলেন। তখন সকলে নীলাচলে যাইতে যুক্তি দৃঢ় করিয়া একত্রে নবদ্বীপে শচী মাতার ভবনে যাইয়া তাঁহার আজ্ঞা লইলেন। কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ প্রভৃতি ও শ্রীখণ্ড বাসী মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন এই কথা শুনিয়া নীলাচলে প্রভু দর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহাদিগের

সহিত একত্রিত হইলেন। গৌর বিরহে মৃতপ্রায় নবদ্বীপ যেন আবার নব জীবন পাইয়া উঠিল। এই সময়ে পরমানন্দপুরী দক্ষিণাপথ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া শচী-গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শচীমাতা তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত সেবা করিতে ছিলেন। তিনি গৌরের নীলাচলে আগমন শুনিতে পাইয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে গৌরের জনৈক ভক্ত কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া ভক্তমণ্ডলীর গমনোদ্যোগ না হইতে হইতে অগ্রসূচি চলিয়াগেলেন এবং অচিরে নীলা-চলে পৌঁছিয়া গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করি-লেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে পাইয়া প্রণাম করিয়া মহানন্দে বলিলেন 'আপনার সঙ্গে থাকিতে আমার বড় ইচ্ছা, এখন কৃপা-করিয়া নীলাদ্রি আশ্রব করুন।' পুরী উত্তর, করিলেন 'বঙ্গদেশে তোমার আগমন বার্ত্তা পাইয়া শচীদেবী ও ভক্তগণ মহাসুখী হইয়াছেন। ভক্তগণ এখানে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহাদের বিলম্ব দেখিয়া আমি ত্বরিতে চলিয়া আসিয়াছি। তখন গৌরচন্দ্র পুরীর জন্য কাশীমিশ্রের সেই বাড়ীর মধ্যে নির্জ্জনে একখানি ঘর ও সেবার জন্য একটী কিঙ্কর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

দিন দিন কাশীমিশ্রের বাড়ী জমকাইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাতঃকালে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নানা ভক্ত-গণ গৌরাঙ্গ সভায় বসিয়া নানা সংপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। একদিন এমনি সময় স্বরূপ দামোদর আসিয়া গৌরের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইঁহার নিবাস নবদ্বীপে, পূর্ব্বাশ্রমে নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইলে ইনিও অনুরাগে বারাণসী নগরীতে যাইয়া শিখা সূত্র ফেলাইয়া সন্ন্যাসী হইলেন, কিন্তু যোগ-পট্ট গ্রহণ করিলেন না। ইনি পরম বিরক্ত, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত এবং শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনু-রাগী। সন্ন্যাসাশ্রমে ইঁহার নাম স্বরূপ হইল। বেদান্তাদি অশেষ শাস্ত্রে ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর দেখা যায় না। ভক্তিশাস্ত্রে, রসশাস্ত্রে ও কাব্যশাস্ত্রেও ইনি অদ্বিতীয়। ইঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, ইনি সঙ্গীতশাস্ত্রে গন্ধর্ব্ব সম। শ্রীগৌরের নীলাচল আগমন সংবাদ পাইয়া গুরুর অনুমতি লইয়া এই সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি আজ চৈতন্যচন্দ্রের দল আলোকিত করিতে মিলিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য পদ-তলে পতিত স্বরূপকে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া ক্ষণকাল উভয়ে নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে গৌর বলিলেন, 'তুমি যে আসিবে, তাহা আজ স্বপ্নে দেখি-য়াছি। ভাল হ'ল। আমি অন্ধ ছিলাম, আজ চক্ষুরত্ন লাভ করিলাম।'

স্বরূপ কাঁদিয়া বলিলেন, 'প্রভু! আমি তোমার চরণে ঘোর অপরাধী। তা নইলে তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব কেন? আমি তোমাকে ছাড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু তুমিতো ছাড়িলে না, তাই কৃপাপাশ গলায় জড়া-ইয়া বাঁধিয়া আনিলে। এখন আমার অপ-রাধ ক্ষমা করিয়া চরণে স্থান দাও।' তখন স্বরূপ দামোদর নিত্যানন্দাদির চরণ বন্দনা করিলে গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ও পরমানন্দপুরীর সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। স্বরূপ যথাযোগ্য সকলের পাদ-বন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য স্বরূপের জন্য কাশীমিশ্রের বাড়ীর নিভৃত স্থানে একখানি

ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া পরিচর্য্যার্থ একটী ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এখন হইতে স্বরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের প্রধান সভাসদ্ হইলেন। কেহ কোন গীত, শ্লোক বা গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট দেখাইতে আনিলে, উক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা স্বরূপ পরীক্ষা করিয়া না দিলে প্রভুর নিকটে উহা যাইতে পাইত না। স্বরূপ সর্ব্বদা নির্জ্জন সাধনে রত থাকিতেন, বড় একটা কথা কহিতেন না; কেবল নিভৃতে বসিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীত গোবিন্দের সুললিত পদ মহাপ্রভুকে শুনাইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতেন। অল্পদিন, মধ্যেই স্বরূপ সকল ভক্তগণের প্রিয়তম ও মহাপ্রভুর যেন দ্বিতীয় স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

আর একদিন গৌরচন্দ্র সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার নাম গোবিন্দ, আমি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য। সিদ্ধি প্রাপ্তকালে পুরী গোঁসাই আমাকে কৃষ্ণ চৈতন্যের নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাই আপনার নিকট আসিলাম। পুরীর অপর ভৃত্য কাশীশ্বরও তীর্থদর্শন করিয়া শীঘ্র আসিবেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'পুরীশ্বর নাকি আমাকে বড় কৃপা করেন, তাই তোমাকে পাঠাইয়াছেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'পুরী গোঁসাই মহাবিজ্ঞ হইয়া শূদ্রসেবক রাখিলেন কেন?' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'ভগবৎপরায়ণ মহানুভবদিগের চরিত্র সাধারণের বোধগম্য নহে। তাঁহারা বেদধর্ম্ম হইতে প্রেমের ধর্ম্মই গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন, ও স্নেহসেবা পাইলে বেদমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। এই বলিয়া তিনি গোবিন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ও সকলের সহিত যথাযোগ্য পরিচয় করিয়া দিয়া সার্ব্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভট্টাচার্য্য! বল দেখি এখন উপায় কি? গুরুর ভৃত্য আমার মান্য ব্যক্তি। তাঁহাকে কি প্রকারে আপন সেবায় নিযুক্ত করি; অথচ গুরুর আজ্ঞাই বা কিরূপে অবহেলা করি? ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া গুরুর আজ্ঞাই পালনীয় বলিয়া স্বীয়-মত প্রকাশ করিলে শ্রীচৈতন্য গোবিন্দকে নিজ সেবকরূপে অঙ্গীকার করিলেন। সেই হইতে গোবিন্দ গৌরের মহা প্রিয়পাত্র ও প্রধান সেবক হইয়া সকল ভক্তের সমাধান করিতে লাগিলেন। রামাই ও নন্দাই নামে আর দুই ব্যক্তি ও ছোট হরিদাস ও বড়হরিদাস দুই কীর্ত্তনীয়া তাঁহার সাহায্যার্থে নিযুক্ত হইয়া সেবার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

অপরদিনে মুকুন্দ দত্ত গৌরকে সংবাদ দিলেন যে, ব্রহ্মানন্দ ভারতী আসিয়াছেন। গৌরচন্দ্র সম্ভ্রমে বলিলেন 'কোথায়? তিনি গুরু, আমিই তাঁহার নিকট যাইব। এই বলিয়া মুকুন্দের সহিত তিনি ব্রহ্মানন্দের সমীপে যাইয়া উপনীত হইলেন। ভারতীর মৃগচর্ম্ম পরিধেয় দেখিয়া গৌরচন্দ্র মনে মনে কিছু দুঃখিত হইলেন এবং দেখিয়াও যেন দেখেন নাই এইরূপ ভাবে মুকুন্দকে কহিলেন 'তিনি কোথায়?' মুকুন্দ বলিলেন 'এই দেখ সম্মুখে বিদ্যমান।'

গৌর বলিলেন, 'মুকুন্দ! তোমার কি বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে যে একজনকে আর এক-ব্যক্তি বলিতেছো? ভারতী গোঁসাই চর্ম্মাম্বর পরিবেন কেন? 'এই কথায় গৌরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভারতী মনে

মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, সত্যইতো আমি বড় সন্ন্যাসী, এই মনে করিয়াই কি কেবল দাম্ভিকতার জন্য চর্ম্মাম্বর পরি না! ইহাতে ধর্ম্মপথে কিছু সাহায্য হয় না। তবে আর ইহা পরিব না। এই ভাবিয়াব্রহ্মানন্দ ভাবতী তথনই মৃগচর্ম্ম ছাড়িয়া বহির্ব্বাস পরিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলে তিনি গৌরকে আলিঙ্গন দিলেন। তখন উভয়ে শিষ্টাচার আলাপহইতে লাগিল। ব্রহ্মানন্দ গৌরকে সচল ব্রহ্ম বলিয়া স্তুতি করিলে গৌরও তাঁহাকে সচল ব্রহ্ম বলিলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে কৌতুক তর্ক বাধিলে সার্ব্বভৌম ভাবতীর দিক হইয়া গৌরের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন। গৌর বলিলেন 'বিষ্ণু! বিষ্ণু! ভট্টাচার্য্য কি বলিতেছো? অতিস্তুতি সর্ব্বনাশের কারণ। সাবধান এরূপ স্তব আর করিও না। ই'হার পর ব্রহ্মানন্দ সমুদায় ছাড়িয়া গৌর সন্নিধানে বাস করিলেন। ভগবান্ আচার্য্য ও রাম ভট্টাচার্য্য নামে দুই ব্যক্তিও সর্ব্বকার্য্য ছাড়িয়া গৌরের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কতকদিন পরে ঈশ্বরপুরীর অপর ভৃত্য কাশীশ্বর আসিয়া উপনীত হইলেন। ইনি অতি বলবান্ ছিলেন। লগুড় হস্তে লোকের ভিড় ঠেলিয়া গৌরকে জগন্নাথ দর্শন্ করান তাঁহার সেবার কার্য্য নিরূপিত হইল।

একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'যদি অভয় দাও, তাহা হইলে একটী নিবেদন করিতে চাই।' গৌর উত্তর করিলেন, 'নির্ভয়ে বল, উপযুক্ত হইলে শুনিব, নচেৎ নয়।' সার্ব্বভৌম সঙ্কিতভাবে বলিলেন 'রাজা প্রতাপ রুদ্র তোমারে দর্শন করিতে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।' শ্রীচৈতন্য কর্ণে হস্তদিয়া বলিলেন, 'বিষ্ণু! বিষ্ণু। ভট্টাচার্য্য! এরূপ অযোগ্য কথা বলিলে কেন? আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী। আমার পক্ষে রাজদর্শন স্ত্রীদর্শনের ন্যায় অতীব গর্হিত। সার্ব্বভৌম বলিলেন 'কিন্তু রাজা জগন্নাথ সেবক এবং পরমভক্ত।'

শ্রীচৈতন্য। তথাচ রাজা কালসর্পের ন্যায় পরিত্যাজ্য। কাষ্ঠনির্ম্মিত রমণী মূর্ত্তি দেখিলে যেমন বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, তেমনি ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতি দর্শনে ধনতৃষ্ণা প্রবল হইয়া প্রলোভন জন্মিতে পারে। এরূপ কথা আর যেন তোমার মুখে না আইসে। পুনরায় বলিলে আমাকে আর এখানে দেখিতে পাইবে না। সার্ব্বভৌম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন।

কথিত আছে রাজা প্রতাপ রুদ্র শ্রীচৈতন্যের দর্শন জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তিনি সার্ব্বভৌমকে একপত্রে লিখিলেন যে, ভট্টাচার্য্য যেন গৌরভক্তদিগকে তাঁহার নামে অনুনয় করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অনুরোধ করাইয়া মহাপ্রভুর সম্মতি করান। এই পত্রে তিনি আরও লিখিলেন যে, যদি গৌরচন্দ্র তাঁহাকে দর্শন না দেন, তাহাহইলে তিনি রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবেন। সার্ব্বভৌম ঐ পত্র নিত্যানন্দাদিকে দেখাইলে তাহারা প্রথমত এসম্বন্ধে কোন কথা গৌরকে জানাইতে সাহসী নহেন বলিলেন। পরে সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া গৌরের নিকট কেবল এইকথা মাত্র, বলিলেন কোন অনুরোধ করিবেন না বলিয়া নিত্যানন্দ অঙ্গীকার করিলেন। তদনুসারে ভক্তবৃন্দ ঐ পত্রের কথা গৌরের নিকট বলিলে তিনি রুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তবে তোমাদের ইচ্ছা

যে আমি রাজসেবী হইয়া বিষয় ভোগ করি? নিতাই বলিলেন, 'তা নয়, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু রাজা বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার উৎকণ্ঠা নিবারণ জন্য তোমায় একখানি বহির্ব্বাস পাঠাইতে চাই। গৌর তাহাতে সম্মত হইলে একখানি বহির্ব্বাস রাজসমীপে পাঠান হইল। রাজা নাকি মহাপ্রভুর পরিধেয় বলিয়া সেখানিকে মাথায় রাখিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। ইহার পর রাজা রামানন্দ রায় দ্বারা পুনরায় অনুরোধ করিলে গৌর সেবার সম্মত হইয়া রাজার পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং রাজা সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে রামানন্দ রায়ও আসিয়াছিলেন। রামানন্দ নীলাচলে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে গৌরসমীপে যাইয়া দণ্ডবৎ করিলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন এবং সকল ভক্তের সহিত তাঁহার যথা-যোগ্য মিলন করাইয়া দিলে রামানন্দ বলিলেন, তোমার পরামর্শানুসারে বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে তোমার চরণে অবস্থিতি করিব। রাজাকে জানাইলে, রাজা তোমার নাম শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন। আমাকে আমার নির্দ্দিষ্ট বেতন দিবার অঙ্গীকার করিয়া তোমার চরণসেবা করিতে বলিয়াছেন, আর তিনি তোমার দর্শনলাভের জন্য কত মিনতি করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তুমি ভক্ত, তোমাকে যে রাজা এত অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিবেন।' ইহার পর শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে জিজ্ঞাসিলেন, 'রায়! কমলনয়ন দেখিয়াছ তো?' রামানন্দ বলিলেন 'না'। গৌর বলিলেন, 'বড় অন্যায় করিয়াছ, আগে জগন্নাথ দেখিয়া এখানে আসা উচিত ছিল; যাও এখন দর্শন করগে।' রামানন্দ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'কি করিব, চরণ-রথ, হৃদয়-সারথি যেখানে লইয়া যায়, জীবরথী সেইখানেই যায়।' এখন হইতে রামানন্দ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নীলাচলে আসিয়া রাজা প্রতাপ রুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার বিষয় প্রভুকে বলিয়াছিলে কি?' ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'হাঁ' কিন্তু তিনি রাজদর্শন করিবেন না। অধিকন্তু আবার যদি বলি, তাহা হইলে অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, ইহাও বলিয়াছেন।'

ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, জগাই মাধাই প্রভৃতি পাপীকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন; কেবল প্রতাপ রুদ্র ছাড়া আর সকলেই কি তাঁর দয়ার পাত্র? আচ্ছা তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমায় দর্শন দিবেন না। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাঁহাকে না দেখিয়া ছাড়িব না। সার্ব্বভৌম রাজার অনুরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, 'দেব! বিষাদ ছাড়ুন। অবশ্যই আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে। তিনি প্রেমাধীন, আপনার গাঢ় প্রেমের নিকট অবশ্যই পরাজিত হইবেন। আজও রামানন্দ রায় আপনার জন্য বলিয়াছিলেন, তাহাতে মন অনেক নরম হইয়াছে। তবে আপনি এক কাজ করিবেন, রথ যাত্রার দিনে প্রভু জগন্নাথ

বল্লভ উদ্যানে যখন বিহার করিবেন, তখনই দীনভাবে তাঁহার নিকটে যাইয়া ভাগবত আবৃত্তি করিবেন। রাজা বলিলেন, স্নানযাত্রা কবে? ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, আর তিনদিন বাকী আছে! রাজাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া ভট্টাচার্য্য বিদায় হইয়া আসিলেন।

স্নানযাত্রা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য কে জানে কি ভাবিয়া ভক্তমণ্ডলী ছাড়িয়া বিরহ বিহ্বলচিত্তে একাকী আলালনাথে চলিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম এই সংবাদ পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিয়া গৌরের ভক্তগণ আসিতেছে ইত্যাদি অনুনয় বিনয় করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে বাসায় রাখিয়া রাজসমীপে উপনীত হইয়া গৌরের প্রত্যাগমন সংবাদ রাজাকে জানাইলেন। এই সময়ে গোপীনাথ আচার্য্য রাজসভায় আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভট্টাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বঙ্গদেশ হইতে মহাপ্রভুর দুইশত ভক্ত বৈষ্ণব আসিয়া নগরে উপসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাদের জন্য বাসার স্থান ও মহাপ্রসাদ চাই। রাজা বলিলেন, 'পড়িছাকে আদেশ পাঠাইয়া দাও সে যেন সব সরবরাহ করে।' এই বলিয়া প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে কহিলেন, 'মহাপ্রভুর ভক্তদিগকে একে একে আমাকে চিনাইয়া দাও দেখি।' সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'তবে চলুন, প্রাসাদশিখরে আরোহণ করা যাউক, গোপীনাথ সকলকে চিনাইয়া দিবেন। আমি সকলকে চিনিনা। ভক্তদল এই পথ দিয়াই যাইবেন।'

তখন প্রতাপ রুদ্র, সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথ তিনজনে অট্টালিকার উপর উঠিলেন। এমন সময় বৈষ্ণবদলও নিকটস্থ হইল ও পথের অপর পার্শ্বদিয়া স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দ মালা ও মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহাদিগকে আগবাড়াইয়া লইতে আসিলেন। স্বরূপ সর্ব্বপ্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যের গলায় মালা দিয়া প্রণাম করিলেন ও গোবিন্দ মহাপ্রসাদ দিলেন। আচার্য্য গোবিন্দের দিকে তাকাইলে স্বরূপ তাঁহার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীবাস পণ্ডিত আদি সকলকেই মালা প্রসাদ দিয়া স্বরূপ গোসাই অগ্রসারি লইয়া চলিলেন। গোপীনাথ অট্টালিকার উপর হইতে রাজাকে একে একে সকলের পরিচয় দিয়া দিলে রাজা বলিলেন, 'এইরূপ তেজঃপুঞ্জ বৈষ্ণব আর কোথায়ও দেখি নাই, ইঁহাদের প্রেমচেষ্টা, নৃত্যকীর্ত্তন সকলই অদ্ভুত।

সার্ব্বভৌম উত্তর দিলেন, 'এই প্রেমিকদল ও প্রেমসংকীর্ত্তন চৈতন্যের সৃষ্টি। কলিযুগের ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া প্রভু এবারে পাপী আর রাখিবেন না।'

রাজা। যদি চৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ, তবে পণ্ডিতগণ তাঁহাতে বিতৃষ্ণ কেন?

ভট্টাচার্য্য। তাঁহার কৃপা ভিন্ন তো তাঁহাকে চেনা যায় না!'

রাজা। আচ্ছা এই সব বৈষ্ণব জগন্নাথ না দেখিয়া চৈতন্যের বাসারদিকে কেন চলিল?

ভট্টাচার্য্য। প্রেমের রীতিই এই। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। তাই আগে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিবেন। এইরূপ আলাপের পর রাজা অট্টালিকা হইতে নামিয়া কাশীমিশ্র ও পড়িছাকে ডাকাইয়া ভক্তগণের জন্য বাসা ও মহাপ্রসাদ সরবরাহ করিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে ভক্তদল কাশীমিশ্রের ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সে হরিধ্বনি, হুঙ্কার, গর্জন ও উৎসাহ দেখিলে মৃতপ্রাণেও উৎসাহ সঞ্চার হয়। গোপীনাথ ও সার্ব্বভৌম রাজসমীপ হইতে বিদায় লইয়া ভক্তদলের অনুগমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য পথিমধ্যে আসিয়া ভক্তদিগকে দর্শন দিলেন। তখন একটা যে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিল, তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে। শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণকে একে একে প্রেমালিঙ্গন ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া সুখী করিলেন।

মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ বাসুদেব দত্তকে শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তোমার জন্য ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত দুই পুঁথি আনিয়াছি; উহা স্বরূপের নিকটে আছে; চাহিয়া লইয়া পাঠ করিও।' সকলের সঙ্গে মিলন করিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন,আমার হরিদাস কোথায়? কোন ভক্ত উত্তর করিল, 'হরিদাস রাজপথে পড়িয়া কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন, আমি নীচ জাতি। মন্দিরের নিকটে আমার যাইবার অধিকার নাই; কেমন করিয়া প্রভুর দর্শন পাইব? এই সময় কাশীমিশ্র ও পড়িছা আসিয়া বলিলেন, ভক্তগণের বাঁসা ঠিক হইয়াছে ও মহাপ্রসাদান্ন প্রস্তুত। শ্রীচৈতন্য গোপীনাথকে বলিলেন, 'তুমি বৈষ্ণবদিগকে লইয়া বাসায় যাও ও বাণীনাথ! তুমি মহাপ্রসাদ আনাইয়া আমার বাঁসায় রাখ।সকলে একত্র ভোজন করিব। ভক্তদিগকে গৌর বলিলেন, 'এখন বাঁসায় গিয়া দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া সমুদ্র স্নানান্ত আমার এখানে ভোজন করিতে আসিবে।' এই বলিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া তিনি রাজপথে যেখানে হরিদাস পড়িয়া ছিলেন সেখানে উপস্থিত হইয়া হরিদাসকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস বলিলেন, 'ছি প্রভু! আমি নীচ জাতি, আমাকে ছুঁইও না।' শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'তোমাকে স্পর্শ করি পবিত্র হইতে।' এই বলিয়া কাশী মিশ্রকে বলিলেন, 'আমার বাসার নিকট পুষ্পোদ্যানের মধ্যে নির্জ্জনে একখানি ঘর আছে, আমাকে সেইখানি ভিক্ষা দিতে হইবে।' কাশীমিশ্র বলিলেন, 'তোমারই সব, যা ইচ্ছা লইবে। তাহাতে আমাকে জিজ্ঞাসা কেন?' তখন শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে সেই ঘরে লইয়া গিয়া বাঁসা দিলেন ও বলিলেন, এইখানে থাকিয়া হরিনাম করিবে। গোবিন্দ তোমার জন্য প্রত্যহ এখানে প্রসাদ দিয়া যাইবে। আমাকেও এখানে রোজ দেখিতে পাইবে।' নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ প্রভৃতি হরিদাসকে পাইয়া মহা সুখী হইলেন।

এদিকে গৌরচন্দ্র সমুদ্র স্নান করিয়া বাসায় আসিয়া বৈষ্ণবদিগের ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাদিও বাসা লইয়া স্নানান্তে ভোজনের জন্য গৌরের আবাসে উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে যোগ্যাক্রম করিয়া বসাইয়া স্বহস্তে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি না বসিলে কেহ খাইতে চাহেন না, নিত্যানন্দ, পুরী, ভারতী সকলে তোমার অপেক্ষায় হাত তুলিয়া বসিয়া আছেন, তুমি ভোজনে বসো, আমি পরিবেশন করিতেছি।' শ্রীচৈতন্য তখন গোবিন্দের দ্বারা হরিদাসের জন্য প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া ভোজনে বসিলে স্বরূপ, দামোদর ও জগদানন্দ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সকলে হরিধ্বনি দিয়া

মহানন্দে ভোজন করিয়া আচমন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে মাল্য চন্দন দিয়া বিশ্রামার্থে বাঁসায় পাঠাইয়া আপনিও বিশ্রাম করিলেন। স্বায়হ্নে সমস্ত বৈষ্ণব গৌরাঙ্গ সভায় সমাগত হইলে রামানন্দ রায় উপনীত হইলেন। গৌরচন্দ্র রামানন্দের সহিত অদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয় করিয়া দিলে সকলে আনন্দে হরিকথায় ও প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর শ্রীচৈতন্য সর্ব্বভক্ত সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ মন্দিরে গমন পূর্ব্বক সন্ধ্যারতি অন্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আজ গৌরের উৎসাহ দেখে কে? বঙ্গীয় ভক্তগণের সঙ্গে উৎকলের ভক্তগণের মিলনে যে আনন্দ তরঙ্গ উঠিয়াছে, সেই তরঙ্গে গৌর আজ মাতোয়ারা হইয়া উল্লাসে কীর্ত্তনের চারিটী সম্প্রদায় বাঁধিয়া দিলেন। আটখান খোল ও বত্রিস জোড়া করতাল বাজিতে লাগিল। কীর্ত্তনের স্বর নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। নিলাদ্রিবাসী নর নারী ধাইয়া দেখিতে আসিল, রাজা প্রতাপরুদ্র অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া অট্টালিকায় আরোহণ করিয়া দেখিতে শুনিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনের সম্প্রদায় মধ্যে জগন্নাথ-মন্দির বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিলেন এবং অশ্রু কম্প পুলকে ভাসিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। লোক সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। নৃত্যাবসানে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনের সম্প্রদায় লইয়া মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে দাঁড়াইয়া গান করিতে আদেশ দিলেন এবং নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও বক্রেশ্বরকে এক এক সম্প্রদায়ে নাচিতে বলিলেন। তাঁহাদের মহানৃত্যে মন্দিরের প্রাঙ্গণ যেন কম্পিত হইতে লাগিল। এই রূপে সেদিনকার সংকীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীচৈতন্য বাঁসায় আসিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া স্ব স্ব বাঁসায় বিশ্রামার্থে বিদায় দিলেন। বৈষ্ণবেতিহাসে এই কীর্ত্তন বেড়া-কীর্ত্তন নামে অভিহিত হইয়াছে।

নীলাদ্রির পবিত্র ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের হাট বসিয়া গেল। নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে অল্প সংখ্যক ভক্ত লইয়া এত দিন যে লীলা হইয়া আসিয়াছে, তাহাই এখন বৃহদাকারে জগন্নাথ ক্ষেত্রে অভিনীত হইতে চলিল। চারিদিক হইতে নদীসকল প্রবাহিত হইয়া যেমন সমুদ্রে সম্মিলিত হয়, তেমনি ভারতের নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া উৎকলের জগন্নাথ ক্ষেত্রে গৌর-সাগরে মিলিতে লাগিল। বঙ্গের ভক্তগণ এখন হইতে প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে আসিয়া ৪।৫ মাস গৌরের সঙ্গে একত্র থাকিয়া কার্ত্তিক মাসে দেশে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। যাবৎ গৌরচন্দ্র পৃথিবীতে ছিলেন, তাবৎ তাহাদের ইহা ব্রতের ন্যায় হইয়া গেল। ইহার পর তাঁহাদের স্ত্রী বালকগণও আসিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন গদাধর, হরিদাস, মুকুন্দ প্রভৃতি একেবারেই নিলাদ্রি আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। ইচ্ছা করে, এই লীলার হাটে মিশিয়া জনমের ন্যায় আত্ম বিক্রয় করিয়া থাকি।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

পাখী কি গায়—কি চায় ?

১

আসে আর যায় পাখী
কি গায় কি চায়,—
গাহিয়া চাহিয়া চলে যায়।
অস্ফুট ভাষায় কিবা
কহে দিশে দিশে,—
কহিয়া আঁধারে যায় মিশে।

২

রবির উদয়ে আর
রবির গমনে,
একই স্বরে গায় গান
আকুল নয়নে,
ছুটে যায় সুদূর গগনে।

৩

রবির সোণার ভূষা
হেরি নিতি নিতি
যেন আর জেগে ওঠে
সে দিনের স্মৃতি,—
ভেসে যেন আসে কত গীতি !

৪

যেন তার মনে হয়
কি-যেন-কি নাই,
যেন তার বোধ হয়
কি-যেন-কি চাই,—
পাইয়ে যেন বা নাহি পাই।

৫

যেন তাহা মনে হয়
এক দিন ছিল,
যেন তাহা ওই ঠাঁই
ফেলে এসেছিল;—
ফেলে দিয়ে হেথায় পশিল।

৬

ঊষার তপন আর
সাঁঝের তপন
যেন তার সে দিনের
এক এক জন,—
যেন সে স্মৃতির নিকেতন !

৭

যেন সে ওখানে কোথা
করিত হে বাস,
যেন সে গাহিত গান
হোথা বারমাস—
অতীতের বিজন আবাস !

৮

যেন তাহাদের মাঝে
পরাণের আশা,
নয় তার সে দিনের
কত ভালবাসা,
কতই মদিরাময় ভাষা !

৯

যেন কত হাসি, অশ্রু,
কত সুখ দুখ,
ওইখানে হারায়েছে
যেন কার মুখ—
অভাবে আকুল যার বুক !

১০

যেন রবি প্রতিদিন
সেই ছায়া কোলে
নিতি নিতি আসে পাশে
তাই দিবে ব'লে,—
নিতি নিতি যায় পুনঃ ছ'লে।

১১

তাই পাখী প্রতিদিন
দুখ গান গায়,—
গাহিতে গাহিতে উঠে ধায়;
রবির চরণে শুধু
সে দিনটি চায়,—
চাহিতে চাহিতে ডুবে যায়,
অনন্তের আঁধার কোলেতে
কেঁদে কেঁদে আপনা লুকায়!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

যেতে চাই।

"O! to make a pilgrimage
Into Apollo's snug domain,
With a friendly jovial heart
Form a part in th' fervent train."

সকলে চলেছে দেখে আমিও যে যেতে চাই!
আমার এ ক্ষুদ্র 'আমি' অই পথ পানে চাহি'!
সাজিয়া সুন্দর বেশে অই সবে হেসে হেসে
ত্রিদিবের কোন দেশে চলিয়াছে গান গাহি!
আমার এ ক্ষুদ্র 'আমি' ভরসা বেঁধেছে বুকে,
যাত্রিদের পাছু পাছু যাইবে তীর্থের দিকে;—
কিন্তু সে সামান্য প্রাণী বড়ই লাজুক মেয়ে,
চাহিতে অন্যের মুখে লাজে মুখ পড়ে ছেয়ে!
পাছে লোকে কিছু বলে ভয়ে ভয়ে সরে না পা,
—লোকে যদি রাগ করে, আঁধারে সে থাক্ চলা
এক পা ফেলিতে গিয়ে দুই পা পিছা'য়ে আসে,
লাজে ভয়ে জড় সড় দাঁড়া'য়ে দোরের পাশে,
বাহিরে আসিতে যেন করে বুক দুরু দুরু,
একটু একটু যেন কাঁপে পদ কাঁপে উরু—
অঞ্চলে মু'খানি চাপি' চাহিয়া পথের পানে—
অই সবে চলে যায় অই পথে প্রাণ টানে!
আমার এ ক্ষুদ্র 'আমি' যেতে চায় গান গাহি'
পেছনে থাকিয়া দূরে আমিও যে যেতে চাই!
বাসন্তী নীলিমা মাঝে বিমল চন্দ্রমা ভাসে,
মলয়ের সনে মিশি' স্বরগ চন্দ্রিকা আসে,
কলিকার পাশে গিয়ে বাসতার কা'য়ে মাখি'
ঘুমন্ত কোকিল স্বরে স্বরগে তুলিছে ডাকি;—
প্রকৃতি মাধুরিময়ী; অসীম সুষমা যেন
সসীম শরীর ধরি' কবিতার বেশে শোভে!
প্রকৃতির মাধুরিতে বিভল হৃদয় গুলি
পূর্ণ প্রেম অন্বেষণে চলিছে আপনা ভুলি'!
দূরে—অই বহুদূরে কবিতা নন্দন বন
বিকচ কুসুমচয়ে আমোদিত অনুখন;
একটু সুরভি কণা এ ধরায় ছুটে আসি'
ডাকিছে সে বন পানে বিভোরি' মরত বাসী
যত তথা ধায় তারা তত মুগ্ধ, আমোদিত,
তত লুব্ধ, তত আশা ভীতি-ভক্তি-যুত চিত্ত।
আমরা মরতে নর অমর নগর মাঝে,
পাইনা দেখিতে দিব্য কবিকুঞ্জবন রাজে;
অবনীতে শুধু তার মাধুরির সিত ছায়া
আবরি' মানব হৃদ' ধরিয়া প্রেমের কায়া!
হৃদি গুলি বুক বাঁধি ধাইতেছে সে নন্দনে,
কেহ যায়, কেহ ফিরে অর্দ্ধপথে ক্ষুণ্ণমনে,
বিরাম বিশ্রাম নাই—পূর্ণতার দিকে ধায়—
আপনার মাঝে তারা আপনা হারা'য়ে যায়!
স্বর্গের সম্ভাষণ আমিও শুনিতে পাই,
সকলে চলেছে দেখে আমিও যে যেতে চাই!

শ্রীপ্রিয়নাথ।

আঁধারের কীট।

আঁধারের কীট! আঁধারে ডুবিয়া
কতকাল র'বি বল।
যাবি কি আলোকে আঁধার ছাড়িয়া
যাবি যদি আয় চল্।
আঁধারের ছায়া পড়িয়াছে মুখে,—
আঁধারে হৃদয় মাখা;
উপরে আঁধার, ভিতরে আঁধার—
আঁধারে আছিস ঢাকা।

যাবি যদি আয়, আঁধারের কীট!
ছাড়িয়া আঁধার কারা।
দেখিবি আলোক কেমন মধুর—
প্রেমের জোছনা ধারা!
দেখবি আলোকে কতই সুন্দর—
কতই মধুর ছবি!
তৃষিত নয়নে দেখিতে দেখিতে
আনন্দে বিভোর হ'বি।
শুনিবি মধুর সুস্বর লহরী—
অমিয়া মাখান গীত।
শুনিতে শুনিতে সুমধুর গান—
পুলকে পূরিবে চিত।
হ'বি আত্মহারা ভক্তের সহিত
গাহিবি তুইও গান।
বিভুগুণগানে মোহিত হইবি।
মাতিবে তোরও প্রাণ।
ঝর ঝর ঝর ঝরিবে নয়ন—
বহিবে প্রেমের ধারা।
বিভুগুণ গান করিবি কেবল।
পাগল প্রেমিক পারা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি গাবি একমনে
আনন্দে বিভূর গান।
সুখ, শান্তি হৃদে বিরাজিবে সদা
মোহিত হইবে প্রাণ।
আলোকে না গিয়া আঁধারে আছিস্—
আঁধার হৃদয় ল'য়ে!
আঁধারের কীট! যাবি যদি আয়—
কি হ'বে আঁধারে রয়ে?
আয় আয় আয়, আঁধারের কীট!
তাজিয়া আঁধার কারা।
দেখিবি আলোক কেমন মধুর—
বিমল প্রেমের ধারা!!

শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন।

কপাল ভাঙ্গা।

কপাল ভেঙেছে যার সংসারে কি আছে তার?
কবন্ধের দাদা সেই মুখের করম সার।
রবি তার তরে নয় কিরণ যে অন্ধতর,
চন্দ্র তার তরে নয় জ্যোছনাও নিরুত্তর,
তারা অন্ধকারময় প্রকৃতি নীরবতর;
সাধের সংসার খানি মরুভূমি ভয়ঙ্কর।
সুকোমল অনুভূতি হিমাদ্রি পাষাণবৎ,
সুমেরুর সামুদ্রিক নিয়ত তুষারবৎ,
পাশব শার্দ্দুল বৃত্তি সাহারার মরুপ্রায়,
রাবণের চিতাসম হেল্কাগ্নুৎপাতময়;
আকাশের ধূমকেতু প্রচণ্ড অনলময়,
পণ্ডিতের গণীকৃত, করিব উচ্ছ্বাসময়;
স্বর্গের যন্ত্রণা নাশে শত পাশুপত জ্বলে,
সহস্র খাণ্ডব দাহ হৃদয়ের অন্তস্তলে।
ভয়ে ভয়ে কাঁপে মন ত্রিজগত অন্ধকার,
হাসিহীন রবহীন ত্রিজগতে হাহাকার;
দারুণ অগ্নির তাপে পুড়েছে-মুকুলকূল,
ঝড়ে গেছে পাতাগুলি ঝড়িয়া পড়েছে ফুল।
সলিল শুকায়ে গেছে, চারিদিক অগ্নিময়,
আগুনের রাজ্যসৃষ্টি আগুন আকাশময়!
ছোট ছোট প্রাণীশত ছুটিয়া পড়েছে তায়,
আশার বিশাল গাথা চূর্ণ তুর্ণ রেণুময়;
আশাহীন, শান্তিহীন, আগুনের হুহুরব;
জগৎ পরাণী শত ঘনীকৃত রাশি শব!
স্থিরতর মেরুদণ্ড কাঁপিয়া উঠিছে যেন,
সুমেরু কুমেরু গত কুমেরু সুমেরু হেন।
দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা চিরতরে গেছে চলে,
প্রলয়ের মহানাদে বিশাল সমুদ্রোথলে!
সকলি প্রলয় তার, প্রলয়ে আরাম তার?
প্রলয়ের মাঝে শুধু উচ্চতর হাহাকার!!
প্রলয়ে ডুবিবে যদি তবে কোন ভয় তার?
সংসারের মহাজ্বালা বহিতে হবে না আর;

খ্যাতি, মান, গানসহ পরাণ আকাশে মিলে,
ভূতদেহ ভূতে মিলে আলোকে আঁধারে মিলে ;
ভেঙেছে কপাল, তবে ভেঙে যাক্ এই কায়া ;
প্রলয় আঁধারে আত্মা হোক আঁধারের ছায়া !!

শ্রীজি, সেন।

জীবন-গতি।

অনন্ত আকাশ তলে,
শত উর্ম্মি দলে দলে,
উঠিতেছে, পড়িতেছে, হইতেছে লয়।
এ সংসার পারাবারে,
কে তার গণনা করে,
কে ভাবে জীবনগতি চির স্থির নয় !
কোথা হ'তে এ জীবন,
অনন্তের প্রস্রবণ,
কোথা হ'তে বাহিরিল, কেমন সে ঠাঁই।
কোথা হতে আসিয়াছি,
কোথা ভেসে চলিয়াছি ;
জীবনের আদি অন্ত ভাবিয়া না পাই।
কি এক অজ্ঞাত বাস,
বিষম এ মোহ পাশ ;
এ জীবন প্রহেলিকা বুঝিতে না পারি।
কি এক মায়ার ডোরে ;
বাধা জীব চরাচরে ;
কে বুঝিবে সে অগম্য মহিমা তাঁহারি।
কে জানে কেমনে পার,
হইব এ পারাবার,
কে জানে কোথায় প্রাণ মিশাইবে শেষে !
জানি না তবুও কেন,
প্রাণপণ করি হেন,
অনন্ত সিন্ধুর পানে চলিয়াছি ভেসে।
এ মরত ভূমে আসি,
সময়ের স্রোতে ভাসি,
ছুটেছি অনন্ত পানে গতি অবিরাম।
কিন্তু কেন আসিলাম,
কেন ভেসে চলিলাম,
কোথা গিয়ে এ জীবন লভিবে বিরাম ॥
জানিনা এসব কিছু
শুধু মরণের পিছু
আগ্রহে চলেছি ছুটে—অনন্ত পিপাসা।
প্রকৃতির অন্তরালে,
অনন্ত সমাধি তলে,
কি অপূর্ব্ব মহাশক্তি রয়েছে প্রকাশ !!

শ্রীশ্যামাচরণ দে।

সরস্বতী পূজা।

ভারতী আসিছে দেশে, নবীন বাসন্তি বেশে
উদ্‌গত নব কিশলয়,
কুঞ্জে কুঞ্জে ফোটে ফুল গুঞ্জরিছে অলিকুল
মৃদুমন্দ বহিছে মলয়।
কোকিলার উচ্চতান উল্লাস উন্মত্ত প্রাণ
হৃদে জাগে নব সমাচার
ভারতীর বীণা যন্ত্রে মাধুরী বিলাস তন্ত্রে
উথলিছে ভূমানন্দ, আবেশ ঝঙ্কার।
যেদিকে নয়ন যায় শৈশব সঙ্গীত প্রায়
জাগে ভূত আনন্দ কাহিনী।
নিয়তি বন্ধন টুটি প্রাণ যেতে চায় ছুটি
দেখিতে সে স্বপন রজনী।
বাতুল কল্পনা নয় সত্য সত্য সুনিশ্চয়
প্রকৃতির স্ফূরতি মাঝারে,
আদি ভূত স্মৃতি রেখা জলন্ত রয়েছে লিখা
ন'লে কেন জাগিবে অন্তরে ?
নীরব প্রকৃতি মাঝে, এখনো সে বীণা বাজে,
ভারতির স্ফূরতি নিক্কন ;
অভিব্যক্তি অনুভূতি আনন্দ মাধুরী স্মৃতি
আদি কাব্য উচ্ছ্বাস কীর্ত্তন।

কারণ কলিকা টুটি যেদিন হৃদয় ছটী
সমুদিত প্রথম সংসারে,
দোঁহে দোঁহা মুখ চেয়ে, আবেশে উন্মত্ত হয়ে,
আত্মহারা প্রলয় পাথারে।
সেই আত্ম বিনিময় নব প্রেম পরিচয়
প্রকৃতির আদি ভূত, সে প্রেম সঙ্গীত
প্রকৃতির আদি প্রাণে, মিশে আছে সেই তানে,
কত যুগ হয়েছে অতীত।
সৃষ্টি স্থিতি পরিলয়, প্রকৃতির অভিনয়
নিতি নব উৎসব বিলাস,
সেই অনুভূতিময় অনাদি সঙ্গীতলয়
কাল চক্রে নিয়ত বিকাশ।
প্রলয় বিব্রত দেহে, আজি ঐ ঐ বহে
সঞ্জীবনী মলয় পবন,
নবীন জীবন দেশে, ডাকে পিক শাখে শাখে,
উলসিত নিকুঞ্জ কানন।
কুসুমে কুসুমে হাসি, সৌরভ সৌন্দর্য্য রাশি
গুঞ্জে মত্ত মধুপ আকুল;
সপ্ত স্বরে বাঁধি লয়, বাসন্তি সঙ্গীত হয়
শুষ্ক শাখে মুঞ্জরে মুকুল।
দেবতা ত্রিদিব ছেড়ে, পঞ্চমী কৌমুদী ঘেরে
শুনিছে সে অনাদি সঙ্গীত;
প্রেমের জনম কথা, অনন্ত মাধুরী গাথা
আবেশে হৃদয় পুলকিত।
নবীন পীরিতি রাগে প্রকৃতি উঠেছে জেগে
পিক কণ্ঠে প্রেম আবাহন,
কুহু কুহু কুহু ডাকে প্রেমের প্রতিমা জাগে
প্রেমাবেশে পূর্ণিত ভুবন।
দাও আত্ম বলিদান, মিশাও পরাণে প্রাণ
বিশ্ব প্রেমে ছুটিছে জোয়ার;
জাতি ধর্ম্ম ভুলে যাই, এস সবে ভাই ভাই,
খুলে গেছে স্বর্গের দুয়ার।
হিংসা দ্বেষ অভিমানে, ঈর্ষা বিক্ষোভিত প্রাণে,
কেন যত্নে পোষিছ নরক;
পীরিতি স্বর্গের দ্বার, সুখ-শান্তি সবাকার,
প্রেমময় বিশ্ববিনায়ক।

শ্রীরেবতীমোহন রায় মৌলিক।

শিশুর বল।

মরি কি সুন্দর শিশু! প্রফুল্ল আনন,
সরলতা পরিপূর্ণ, জুড়ায় নয়ন।
না জানি কি শক্তি আছে নিকটে উহার,
দুঃখ বিনোদন যাহে হয় সবাকার।
ক্ষুধায় কাতর হলে যবে শিশু কাঁদে,
তখনো কি বল দিয়ে মনপ্রাণ বাঁধে।
কিছুতেই ভীত নয় সদাই নির্ভয়,
জানেনা বোঝেনা কিছু সে যে অসহায়।
অস্ফুট বাক্যেতে তার শক্তি বিরাজিত,
শুনিলে কাহার প্রাণ না হয় মোহিত?
হাসি হাসি মুখখানি বড়ই নির্ম্মল,
দেখি বিমোহিত চিত্ত স্রষ্টার কৌশল।
পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতি আছে প্রাণে তার,
তাহাতেই পরাজিত অখিল সংসার।

উৎকল-ভ্রমণ।

(উৎকলের বৈষ্ণবধর্ম্ম ও চিল্‌কাহ্রদ)

পুরী হইতে কটক ৫৩, চিল্‌কাহ্রদ ২৮ এবং অর্কক্ষেত্র বা কণারক ১৯ মাইল ব্যবধান। পুরী হইতে কটক পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব বাঁধা রাস্তা বিদ্যমান আছে, কিন্তু চিল্‌কা বা কণারক যাইতে হইলে সৈকতময় সমুদ্র তীর ধরিয়া যাইতে হয়,—বাঁধা রাস্তা

নাই, কোনরূপ চটী বা আশ্রয় নাই—মধ্যে মধ্যে গ্রাম আছে, কিন্তু অনেক সময় পরিষ্কার পানীয় জল পর্য্যন্ত পাওয়া দুষ্কর। আমরা চৈত্র মাসের প্রারম্ভেই চিল্কা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রাত্রের আহারান্তে আমরা দুই বন্ধু গো-যানে আরোহণ করিলাম। অল্পসময়ের মধ্যেই পুরী অতিক্রম করিলাম। বিশাল বিস্তৃত পাতালস্পর্শী বালুরাশির ভিতর দিয়া অতি ধীরে ধীরে, শব্দ করিতে করিতে গাড়ী চলিল। এমন ভীষণ পথ আর কখনও দেখি নাই। গাড়ীর চাকা বালিতে পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, গরু আর চলিতে চাহে না। অতি কষ্টে, গাড়োয়ানের তীব্র কষাঘাতে সমস্ত রাত্রি মৃদু মৃদু ভাবে গরু দুটী চলিল বটে, কিন্তু তাহাতে অতি অল্প রাস্তা অতিক্রান্ত হইল। এই পথে ভ্রমণ করিয়া পুরীজেলার কয়েকটী সুন্দর পল্লী দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে, দুই ধারে সমশ্রেণীতে পরস্পর সংলগ্ন বহু মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ অপূর্ব্ব ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রতি পল্লীর শেষে হরি-সঙ্কীর্ত্তনের জন্য সাধারণের ব্যয়ে নির্ম্মিত ধর্ম্ম-মন্দির—তাহার ধারেই তুলসী-মণ্ডপ; এতদ্ভিন্ন প্রতি বাড়ীর সম্মুখেই একটা একটা তুলসী মণ্ডপ বিদ্যমান। আমরা বাঙ্গালার যত পল্লী পরিদর্শন করিয়াছি, সর্ব্বত্রই শাক্ত ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিয়াছি। এমন যে নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান, সেখানেও শাক্তধর্ম্মের প্রাধান্য বিদ্যমান। এ সকল স্থান দেখিয়া ধারণা হইয়াছে, বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালীকে আজও পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই। এমন কি, অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর নর নারীদিগকে বাদ দিলে, অতি অল্প সংখ্যক বৈষ্ণব পরিবার দেখা যায়। বৈষ্ণবধর্ম্ম, মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমমূলক ধর্ম্ম যেন জ্ঞানীর জন্য নয়—কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য? উৎকল পরিভ্রমণ করিলেও এ কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যে ধর্ম্ম বাঙ্গালীকে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই, সে ধর্ম্ম উড়িষ্যাকে অতি সুকৌশলে পরাজয় করিয়াছে। ইহাতে উড়িষ্যার শিক্ষা-হীনতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উৎকলবাসী নরনারী যে বাঙ্গালী অপেক্ষা চরিত্রবান, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণ একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা সাধারণ একজন অশিক্ষিত উৎকলবাসী যে অধিক ধর্ম্মপিপাসু, সেবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। ভাল বল, আর মন্দ বল, উড়িষ্যার নিম্ন শ্রেণীর নরনারী এখনও ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। আর বাঙ্গালার নিম্ন শ্রেণী অশিক্ষার ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন থাকিয়াও উচ্চশ্রেণীর অনুকরণে শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্মহীনতার রাজ্যে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গলার মিথ্যা মকদ্দমার বৃদ্ধিতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলার উচ্চ শ্রেণীর চরিত্র-প্রহেলিকা সাধারণ নরনারীর চরিত্রকে অতি কঠিন সমস্যায় নিমগ্ন করিতেছে। একথা কলিকাতার নিম্নশ্রেণী সম্বন্ধেও খাটে। শুনিয়াছি, কলিকাতাতে যে সকল উৎকলবাসী থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি ঘৃণিত কাজে লিপ্ত। কলিকাতা-নিবাসী নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী যে কতদূর অধঃপতিত, যাহারা স্থির চিত্তে দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর উড়েদিগকে ঘৃণা করিতে পারেন না। সামাজিক বিষয়েও, পাণ্ডাদিগকে বাদ দিলে, উৎকলবাসীরা অনেক বিষয়ে উন্নত। অনেক লোকের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নাই, অনেকের মধ্যে

বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় বাঙ্গালার সমাজ সমূহ, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর সমাজ সমূহ যে কতদূর অধঃপতিত হইয়াছে, স্থির চিত্তে অনুসন্ধান করিলে গভীরদুঃখে প্রাণ সমাচ্ছন্ন হয়। ভ্রূণ-হত্যা বল, অসম-বিবাহ বল, ব্যভিচার বল, এ সকল কলঙ্ক বাঙ্গলার ধর্ম্ম ও নীতিকে কর্ম্মনাশার জলে ডুবাইয়া দিতেছে। বাঙ্গলার উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তবুও অন্তঃপুর প্রথা বিদ্যমান, সুতরাং বিধবাগণ কতক সুরক্ষিতা; কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কতক স্ত্রী-স্বাধীনতা বা অন্তঃপুর-প্রথা-হীনতা বর্ত্তমান, তারপর বাল্য বিবাহ প্রচলিত, তারপর বিধবা বিবাহ নাই, সুতরাং সেখানে বাল-বিধবাদিগের ধর্ম্ম বা চরিত্র রক্ষার আর উপায় কোথায়? ২৪ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক নিম্নশ্রেণীর পুরুষ সাধারণতঃ বাঙ্গলার ৮।১০ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করে। যৌবনের মত্ততায় নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক চরিত্রহীন। যাহারা হরিমাইতির ন্যায় নয়, তাহারা প্রায়ই গুপ্ত প্রণয়ে অন্যত্র আবদ্ধ। সহর বা উপ-সহর, হাট বা বাজার ভিন্ন বেশ্যা অতি অল্প স্থানে থাকে, সুতরাং অশিক্ষিত ধর্ম্মহীন যুবকের যৌবন-মত্ততার জন্য এদেশের হত-ভাগিনী বালবিধবা বিদ্যমানা। যাহাদের মুখের দিকে চাহিতে এ সংসারে কেহ নাই, এমন হতভাগিনী বালবিধবা পিতৃকূলে অব-হেলিতা, শ্বশুরকূলে পরিত্যক্তা! হায়! তাহাদের আশ্রয় কোথায়? বলিতে লজ্জা হয়, তাহাদিগকে ভাল কথা শুনাইতে বা মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে এ সংসারে যৌবনমত্ত নররূপী পশু-গণ যেন কেবল বিদ্যমান। হায়! হায়! পুরুষের অত্যাচারে যাহারা বালবিধবা পুরুষের প্রলোভনেই তাহারা স্বৈরিণী, কলঙ্কিনী, কুলটা। বালিকাবিবাহ পুরুষ প্রচলন করিয়াছে, সুতরাং বাল বিধবার স্রষ্টা তাহারা। বিপত্নীক পতি দশবার বিবাহ করিবে, সমাজে নিন্দা নাই; দশবার বিধবার সতীত্ব নষ্ট করিবে, সমাজে কলঙ্ক নাই—আর বাল-বিধবা—এজীবনে কেবল ব্রহ্মচর্য্য করিবে!! হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায়? এই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য প্রমত্ত-রিপু যুবকগণ যে দেশে অহঃরহ শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিতেছে, পরিত্যক্তা, অবহেলিতা বিধবা সে দেশে কেমনে অবি-চলিতভাবে থাকিবে? সে যখন পাপে ডুবে, তখন তাকেই বা রাখে কে? পুরুষের সাত খুন মাপ, আর রমণীর কথা, রমণীর অবস্থা কে না জানেন? মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কলিকাতার প্রায় বারো আনা বেশ্যা—বাল-বিধবা। রমণী পতিতা হইলে আর সমাজে থাকিবার স্থান পায় না! এমন হৃদয়-বিদারক পক্ষপাতী ব্যবস্থা যে দেশে, সে দেশের পরিণাম কে গণনা করিতে পারে? উড়িষ্যাবাসী নরনারী অশিক্ষিত বলিয়া বাঙ্গালীর নিকট ঘৃণিত, উপেক্ষিত; কিন্তু সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্মে, চরিত্রে, কাজে কর্ম্মে উৎকলবাসী বাঙ্গালীর আদর্শ। একটী উদাহরণ দেখ,—সম্মতির আইনের ঘোরতর আন্দোলনে, রমণী অব-হেলার চূড়ান্ত নিদর্শন বাঙ্গলায় দেখিয়াছি; কিন্তু ধন্য উৎকল-ভূমি! উৎকল-ভূমি আই-নের পোষকতা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উৎকল রমণীর অবনতিতে ব্যথিত। আর একটী উদাহরণ দিব। বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ বৈষ্ণব চরিত্রহীন, "কামিনীর কোল, মুখে হরিবোল" মন্ত্রের জীবন্ত শিষ্য

কিন্তু যতদূর জানিয়াছি, এমন নেড়ানেড়ীর কাণ্ড উৎকলে নাই। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে, এমন কি, বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানে বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভিক্ষুকশ্রেণী দেখা যায়; কিন্তু উৎকলের বৈষ্ণবভিক্ষুক কলিকাতায় বা বাঙ্গালার অন্য কোথাও অতি বিরল। আমরা যতদূর অবগত হইয়াছি, উৎকলে এরূপ সংসারত্যাগী কপট বৈরাগী এক শ্রেণীকে ভিক্ষাকেও সম্বল করিয়া জীবন কাটাইতে দেখা যায় না। উড়িষ্যার বৈষ্ণব গৃহী, সদাচারী, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান। আর বাঙ্গলার বৈষ্ণব বৈরাগী, স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন। বাঙ্গলার সহিত উৎকলের তুলনা করিলে, একদিকে ধর্ম্মের জন্য ত্যাগস্বীকার, ধর্ম্মের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় প্রভৃতি কার্য্যে যেরূপ উৎকল দেশীয় রাজাদিগের মহত্ত্ব দেখা যায়, বাঙ্গলায় সেরূপ বিরল; অন্যদিকে ধর্ম্মকে বজায় রাখিতে, পুণ্যকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে উৎকল যেমন লালায়িত, বাঙ্গলা কদাচ সেরূপ নহে। বাঙ্গলার অনেকেই ভেকধারী, গেরুয়া বা নামাবলী পরিধায়ী কপট সন্যাসী, ধর্ম্মকে পরিচ্ছদের ন্যায় ব্যবহার করেন, আর উৎকলের অনেকেই ধর্ম্মকে জীবনগত করিয়া স্বর্গীয় ভাবে মাতোয়ারা। চৈতন্য মহাপ্রভু শেষ জীবন উৎকলে যাপন করেন, একথা সকলেই অবগত আছেন। ইহার গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাঙ্গলার প্রতি বিরক্ত হইয়াই তিনি বাঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি, ধর্ম্মসুহৃদ নিত্যানন্দকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-জীবনের প্রতি কোনই আশা নাই। বাঙ্গালা, উৎকল, দাক্ষিণাত্য, ভারতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি উৎকলকেই ধর্ম্মের অনুকূল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কবীর, নানক, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, বোধ হয়, ইঁহারা সকলেই উৎকলের প্রতি এই কারণে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। অন্যের কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে না পারিলেও, মহাপ্রভু সম্বন্ধে এ কথা নিঃশংসয়ে বলিতে পারি। তিনি উৎকলের নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মের এক অপরূপ বিমল জ্যোতি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। আমরা উৎকল সম্বন্ধে যে অভিমত আজ সাহস পূর্ব্বক ব্যক্ত করিতেছি, মহাপ্রভুর শেষ জীবন এ কথার প্রমাণ দিতে বিদ্যমান। বৈষ্ণবধর্ম্ম উৎকলকে পরাজিত করিয়া আজও কতক পরিমাণে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের স্বর্গীয় মধুর ভাব সংরক্ষণে সমর্থ হইতেছে। উৎকলের মন্দির সমূহ দেখিয়া আমরা যেরূপ মোহিত হইয়াছি, উৎকলের ধর্ম্মজীবন দেখিয়া তেমনি বিমুগ্ধ হইয়াছি। এমন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-মাতোয়ারা প্রেমিক জীব পৃথিবীতে বিরল। তবে পুরীর পাণ্ডাদের কথা স্বতন্ত্র। পুরোহিত শ্রেণী সর্ব্বত্রই কলুষিত চরিত্র। কাশী, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, কালীঘাট, কামাখ্যা, তারকেশ্বর, সর্ব্বত্রই পাণ্ডারা দুরাচারী। উৎকলের পল্লীর দৃশ্য অতি মনোরম। বহু পল্লীতে ধর্ম্মের ছায়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক কথায় বলিতে কি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা মৃত, উৎকল আজও জীবিত। ধন্য উৎকল! ধন্য পুণ্যভূমি!

চিল্কার পথের পল্লীর বিষয় উল্লেখ করিতে যাইয়া আমরা অনেক অবান্তরিক কথার সমাবেশ করিলাম। অনেক পল্লীই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেক পল্লীতে সুন্দর নারিকেল বৃক্ষ পরিশোভমান। আমাদের

আশা ছিল, সাতপাড়ার লবণ-আফিসে বেলা দুই প্রহরের সময় পৌছিতে পারিব, কিন্তু ক্রমে যখন দুই প্রহর অতীত হইল, তখন শুনিলাম, মানিকপাটনা ডাকঘর বা সাতপাড়ার লবণ-আফিস এখনও বহুদূরে। দুই প্রহরের পর আমরা গ্রাম সমূহ অতিক্রম করিয়া বালুকাময় প্রান্তরে পড়িলাম। সে দুর্গম পথে জল মেলে না, আহারের দ্রব্য কদাপি পাওয়া যায়। জলাভাবে স্নান হইল না, অনেক অনুসন্ধানের পর রাস্তা হইতে বহুদূর গমন করিয়া একটু কর্দ্দমময় সামান্য জলাশয় পাওয়া যাইল। আমাদের সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য ছিল, তদ্দারা এবং সেই কর্দ্দমময় জল দ্বারা আমরা সেদিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। উত্তপ্ত বালু রাশির ভিতর দিয়া যাইতে যে কি কষ্ট পাইতে হইল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য। কিন্তু এত অসহ্য কষ্টের ভিতরেও সুখ ছিল, কেননা এরূপ বিভীষিকাময় মরুভূমি সদৃশ প্রান্তর আমরা এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। কোথাও পর্ব্বতাকার বালুকার স্তূপ, কোথাও বালুকাস্তরে বায়ু-তাড়নে তরঙ্গায়িত শোভা, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল। ক্রমে বেলা অবসান হইতে লাগিল, আর ক্রমেই আমরা জনপ্রাণীহীন রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। সে বিজনে পাখী উড়ে না, গাভী চরেনা, মনুষ্য কদাপি দেখা যায়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যই অতিক্রম করিতে হইল। সন্ধ্যার সময় জনপ্রাণী ও গ্রামের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল। দূর হইতে দুই-চারিটী বৃক্ষ দেখা গেল। সে দৃশ্যও অতি সুন্দর। কিন্তু কোথায় চলিয়াছি, কোথায় সে রাত্রি কাটাইব, এই দারুণ চিন্তায় প্রাণ আকুল হইল। এদিকে গাড়োয়ান বলিল, সাতপাড়ার রাস্তা সে ভাল জানে না, মানিকপাটনার পথ জানে। আমরা সাতপাড়া যাইব। সেখানে লবণের ইন-স্পেক্টর বাবু বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বাস করেন। তাঁহার নিকট আমাদের বন্ধু বিজয় বাবু একখানি পত্র দিয়াছিলেন। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল, কিন্তু সাতপাড়া এখনও দূর। রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, অল্পে অল্পে সমুদ্রের নির্ঘোষ সে বিজনতা ভেদ করিতে লাগিল, আমরা বুঝিলাম, আমরা সাতপাড়ার নিকটে আসিয়াছি। অনেক অনুসন্ধানের পর সাতপাড়ার বেণী বাবুর আফিসের পরিচয় পাওয়া গেল। একে একে সেই বিজনস্থানে কয়েকখানি গৃহ চক্ষুগোচর হইল, সে যেন মরুভূমির ওয়েসিস্, অকূলের কূল, গভীর অরণ্যের আশ্রয়। গৃহ দেখিয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু ভাবিলাম, বেণী বাবু যদি না থাকেন? আরো ভাবিলাম, বেনী বাবু যদি স্থান না দেন! এখানে আশ্রয় না পাইলে আর কোথায় যাইব? ভাবিয়া কূল পাইলাম না। এরূপ বিজন স্থানে কেহ কখনও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়া থাকেন, আমাদের প্রাণের সে সময়ের আবেগ কতক বুঝিতে পারিবেন। ভাবিতে ভাবিতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম, বেনী বাবু তখন নিদ্রা যাইতেছেন। মনের উদ্বেগ আরো বাড়িল। কিন্তু বিধাতার কি ইচ্ছা? কেমনে জানিব! হঠাৎ সেইস্থানে একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া আমাদের পরিচয় লইলেন। পরিচয়ের পর জানিলাম, তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত একজন বন্ধু। বিধাতা এই বিজন অরণ্যে আমাদের সবার

জন্য সেই পরিচিত বন্ধুকে রাখিয়াছেন, পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। সেই বন্ধুর যত্ন ও আকিঞ্চন দেখিয়া অবাক্ হইলাম। গাড়ীর দ্রব্যাদিসহ আমরা সাদরে বেণীবাবুর বাঙ্গলায় আশ্রয় পাইলাম। বাঙ্গলাটী চিল্কার উপকূলে একটী উচ্চপাহাড়ের ন্যায় স্থানে নির্ম্মিত। তাহার পূর্ব্বদক্ষিণদিকে সমুদ্র, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরের কতকাংশেই চিল্কা হ্রদ; ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, স্থানটী কতদূর মনোরমা। বাঙ্গলার ঠিক দক্ষিণদিক দিয়া একটী ছোট খাল সমুদ্র ও চিল্কাকে মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। চিল্কা এবং সমুদ্রের মধ্যে একখণ্ড অপ্রশস্ত বালুকাময় ভূমিখণ্ড চিল্কাকে সাগর হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সেই অতুল শোভার স্থানে এমন আশ্রয় পাইব, জীবনে কখনও ভাবি নাই। বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া চক্ষের জল পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পর বেণীবাবু জাগরিত হইলেন। বেণী বাবু যেন সে রাজ্যের রাজা। চিল্কাতে যত লবণের কারখানা আছে; ইনি তাহার কর্ত্তা। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, মধুর সম্ভাষণ, অতুল যত্ন, নিরহঙ্কার মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইলাম। তিনি সেখানে যেন পিতৃহীনের পিতা, ভ্রাতৃহীনের ভ্রাতা, বন্ধুহীনের বন্ধু। পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর ন্যায় সযত্নে আমাদিগকে তিনি গ্রহণ করিলেন। আলাপে বুঝিলাম, তিনি সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নহেন, অনেক শিক্ষিত চাকুরে লোকের ন্যায় তিনি পৃথিবীর সংবাদ-জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন নাই। দেখিলাম, তিনি সংবাদ রাখেন না, এমন ঘটনা নাই। "প্রচার" নামক বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা এবং অন্যান্য অনেক সংবাদ পত্র তাঁহার টেবিলে দেখিলাম। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, বাঙ্গলা ভাষার প্রতি তিনি উদাসীন না হইয়া একান্ত অনুরাগী। রাত্রে তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইল; দেশের বর্ত্তমান হীনাবস্থা স্মরণে যারপর নাই ব্যথিত হইলেন। মোট কথা, তাহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম। অতুল শোভা, অল্প জ্যোৎস্নালোকে দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল। সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গভীর নির্ঘোষ শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল, বেণী বাবুর বিজ্ঞতাপূর্ণ নানা বিষয়ক আলাপনে মানসিক তৃষ্ণা চরিতার্থ হইল, এবং অবশেষে সুন্দর পরিপাটী সুখাদ্য রাজভোগের দ্রব্যাদি দ্বারা উদরপূর্ণ করিয়া মহাসুখে রাজশয্যায় শয়ন করিলাম। শয়ন করিয়া ভাবিলাম, বালুকাশয্যার পরিবর্ত্তে এ কি। চক্ষের জলে সুস্নাত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সেদিন নীরবে বিধাতার চরণে অঞ্জলি দিয়া শয়ন করিলাম। তার পরদিন কি হইল, বারান্তরে লিপিবদ্ধ করিব।

মেঘ-দূত। *

জনক-তনয়া-স্নান-পুণ্যতীরে,
নিবিড়-নমেরু-কানন মাঝে,
রামগিরি নাম ভূধর-কন্দরে
পবিত্র আশ্রম যথা বিরাজে,—

---

* মহাকবি কালিদাসের প্রসিদ্ধ খণ্ডকাব্যের বঙ্গকবিতানুবাদ।

সেইখানে কান্তাবিরহ ব্যথায়
বর্ষ ভোগ্যশাপে, মলিন বেশে,
যাপিতেছে যক্ষ,—কর্ত্তব্যহেলায়
রোষিত প্রভুর আদেশ বশে। ১
কতিপয় মাস বঞ্চিয়া এ মতে,—
বিরহ বেদনে শীরণ-কায়,
কনককবলয় প্রকোষ্ঠ হইতে
খসিয়াছে রিক্ত করিয়া তায়,—
জলদ-পটল শিখরি-শিখরে
হেরিলা, আষাঢ় প্রথম দিনে,
গজরাজি যেন আনন্দে বিহরে
বপ্রক্রীড়া করি সানুর সনে। ২
মদন সঞ্চার মেঘ দরশনে,
ব্যাকুল পরাণ বনিতা তরে,
বিষাদে সলিল-স্তম্ভিত নয়নে
চাহিল ক্ষণেক তাহার' পরে।
জলদ উদয়ে, মিলিত-প্রেমিকে
উপজে হৃদয় বিকৃত ব্যথা;
দূরে থাকি, প্রিয়া ধরিবারে বুকে
কত যে লালসা, কি তার কথা! ৩
বাঁচাইতে সতী দয়িতা জীবন,
পাঠায়ে আপন কুশল-বাণী
জলধর-যোগে, করিল মনন,
কাতর পরাণী প্রিয়ারে জানি;
পর্ব্বতমল্লিকা যতনে তুলিল,
যতনেতে অর্ঘ্য রচিল তায়,
পুজিয়া সবিধি মেঘে সম্ভাষিল
সাদর-সম্মানে প্রীতি কথায়। ৪
ধূমজ্যোতিঃ বায়ু সলিলে গঠন
অচেতন মেঘ সাধে কেমনে?
বার্ত্তাবহ কার্য্য, যাহে প্রয়োজন
সক্ষম নিপুণ জীবিত জনে,—
পাশরি যুকতি হৃদয় উচ্ছ্বাসে,
জলধরে যক্ষ কহিল কথা;—
বিচ্ছেদ-উন্মাদে প্রেমিক সকাশে
সজীব-নির্জীব বিচার কোথা? ৫
"ভুবন বিদিত আবর্ত্তপুষ্কর
তোমার জনম কুলেতে সেই,
ইচ্ছাতনু তুমি, ইন্দ্রসহচর,
মাগিতেছি ভিক্ষা কাতরে তেঁই;
মহতের কাছে করিয়া প্রার্থনা,
অপূর্ণ-লালসা, কি লাজ তাতে,
হইলেও যেন সফল-বাসনা
নাহি যাচি কভু অধম হাতে। ৬
"তাপিতশরণ তুমি, জলধর,
সেকারণে বলি বিনয়ে বাণী,—
লও মোর বার্ত্তা প্রিয়ার গোচর
যুড়াও আমার হৃদয়রাণী;
করগো গমন অলকা ভবনে
উপবনে যার হরের বাস,
ললাটশশাঙ্ক বিমল কিরণে
যাহার প্রাসাদ ধরে সুহাস। ৭
"আরোহিলে তুমি আকাশের পথে,
প্রিয়-আগমন আশায় কত,
সরায়ে কুন্তল নয়ন হইতে,
হেরিবে তোমায় যুবতী শত;—
তব উপচয়ে, কেনা আসি মিশে
বিরহ বিধুরা বনিতা পাশ,
ব্যতীত সেজন, দগ্ধ বিধিবশে
আমার মত যে পরের দাস? ৮
"সমীরণ ধীরে সুস্বনে বহিবে
অনুকূল পথে তোমার সনে,
গর্ব্বিত চাতক মধুরে গাহিবে
তব বামভাগে পুলক মনে।
বলাকা-দম্পতি উল্লাসে স্মরিয়
তব আগমনে, মিলন-সুখে,
তুষিবে তোমায় আদর করিয়া
গাঁথি শ্বেতমালা তোমার বুকে। ৯

"ভ্রাতাবধূ তব এখনো জীবিতা,
ধরে আছে প্রাণ মিলন-আশে,
গণিতেছে দিন সাধ্বী পতিরতা,—
গিয়ে দেখ, ভাই, কি দুঃখে ভাসে!
কুসুম-পল্লব রমণী-হৃদয়
বিরহ-তাড়নে পড়িত ঝরে,
আশাবৃন্ত যদি জড়ায়ে তাহায়
না রাখিত বাঁধি যতন করে। ১০'

[ক্রমশঃ]

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।"

বঙ্গবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা।

(প্রথম প্রস্তাব।)

বাঙ্গলার পাঠশালার বালকদিগের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া অনেক চিন্তাশীল কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা এই যে, বিজ্ঞান শাস্ত্র বড় দুরূহ, বড় কঠোর, সুতরাং পাঠশালার বালকদিগের পক্ষে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কথাটা আমরা মানিনা। বরং অন্যতরপক্ষে ইহাই বুঝি যে, যদি কোন শিক্ষা বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়, তবে সে বিজ্ঞান শিক্ষা। কুসংস্কার-পরিশূন্য করিয়া মানসিক বৃত্তির পরিস্ফুরণ করিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, একথা একালের পণ্ডিতাগ্রণী হক্স্লে ও স্পেন্সর প্রভৃতি অকাট্যরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তবে যে বিজ্ঞান বালকেরা শিক্ষা করিবে, তাহা তেমনি সরল হওয়া চাই। যদি বাঙ্গলায় বিজ্ঞানের এই সরল ব্যাখ্যার অভাব দেখিয়া কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ এই শিক্ষাদানের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া থাকেন, তবে সেটা খুব চিন্তার কথাই বটে।

এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের যে কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, পণ্ডিত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের প্রাকৃত ভূগোল তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু প্রাকৃত ভূগোল সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে কোন সমালোচনা হইবে না বলিয়া ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিব না। স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্তের পদার্থ বিদ্যা—পাঠশালার উপযোগী প্রথম বিজ্ঞান গ্রন্থ। কিন্তু ঐ গ্রন্থ খানিতে অতি অল্প পরিমাণে বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহোদয়গণ অন্য কোন পুস্তক পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সুবিধার সময় বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, এবং সেইখানি পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত হয়। সেও প্রায় ১২।১৪ বৎসরের কথা। অক্ষয় বাবুর পদার্থবিদ্যা ক্ষুদ্র এবং অসম্পূর্ণ; কিন্তু গুণের হিসাবে মহেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক ভাল। মহেন্দ্রবাবুর পদার্থ বিদ্যায় নানা বিষয়ের আলোচনা থাকিলেও গ্রন্থ খানি যে বড়ই অকর্ম্মণ্য, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১২৮৭ সালে এক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে ঐ গ্রন্থখানির বিদ্রূপাত্মক তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল; কিন্তু শিক্ষা

বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অন্য পুস্তকের অভাবে সেইখানিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজি কালি ঐ বিষয়ে আরও অনেক গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে। টেক্‌ষ্টবুক কমিটিও তাহার মধ্য হইতে একখানি বিশেষরূপে চাহিয়া লইয়া পাঠ্য তালিকায় অন্যতম পাঠ্য পুস্তক স্থির করেন। এখানি বাবু যোগেশ-চন্দ্র রায় প্রণীত সরল পদার্থ বিজ্ঞান। বোধ হয়, যোগেশ বাবুর গ্রন্থ প্রচারের পর প্রতি-দ্বন্দী গ্রন্থের উৎকর্ষ দেখিয়া ১৮৮৮ সালে মহেন্দ্র বাবু তাঁহার পদার্থ বিদ্যার নূতন এক সংস্করণ করিয়াছেন; তাঁহার এই পঞ্চদশ সংস্করণের গ্রন্থই যোগেশ বাবুর সরল পদার্থ বিজ্ঞানের সহিত প্রতিযোগী পাঠ্য পুস্তক রূপে এবৎসর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এবারে নূতন পাঠ্য পুস্তকের যে নির্দ্ধারণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোন বিশেষ গ্রন্থের নামোল্লেখ নাই। কেবল যে বিষয়গুলি পড়িতে হইবে, তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পাঠশালার কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া বালকদিগের হস্তে দিবার ভার ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সময়ে প্রচারিত বিজ্ঞান গ্রন্থগুলির সমা-লোচনার বিশেষ প্রয়োজন।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গ্রন্থ যে অকর্ম্মণ্য, তাহা যদিও বঙ্গদর্শনে কোন কৃত-বিদ্য ব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তথাচ এসময়ে একবার তাহার পুনঃ সমা-লোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি তেছি। প্রথমতঃ বঙ্গদর্শনের অনেক দিনের পূর্ব্বের সমালোচনার কথা অনে কেই জানেন না; দ্বিতীয়তঃ মহেন্দ্র বাবু তাঁহার পঞ্চদশ সংস্করণে পুস্তক খানিকে "সংশোধিত এবং সংবর্দ্ধিত" আকারে প্রচার করিয়াছেন।

প্রথমতঃ মহেন্দ্র বাবুর পদার্থ বিদ্যার ভাষার বিষয় আলোচনা করা যাউক। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম পংক্তিতে পদার্থের সংজ্ঞা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"পদার্থ শব্দে পদের অর্থ। পদের অর্থ দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, তাহাকেই পদার্থ বলা যাইতে পারে। দ্রব্য, গুণ, কার্য্য প্রভৃতি সকলই পদের অর্থের দ্বারা প্রকা-শিত হইতে পারে, সুতরাং ইহারা সকলেই পদার্থ।" মহেন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকের টাইটেল্ পৃষ্ঠায় টুলো রকমের পাণ্ডিত্যের অভিমান করিয়াছেন; এই উদ্ধৃত অংশটুকু তাহার অনুরূপ বটে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য লিখি-য়াছেন "যাহা উপলব্ধি হয়" এটা একটু আরণ্য রকমের বাঙ্গালা বটে; আমরাও জানি "যাহার উপলব্ধি হয়" অথবা যাহা উপলব্ধ হয়। আরও আছে। বিদ্যারণ্য মহাশয়—ঐ প্রথম পৃষ্ঠাতেই চেতন অচেতন পদার্থ বুঝাইতে গিয়া লিখিয়াছেন —"এক-মাত্র পরমাত্মাই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ"। বিদ্যা-রণ্য মহাশয় যে ধর্ম্মারণ্যও বটেন, একথা জানিয়া আমরা সুখী হইতে পারি; কিন্তু তাহাতে পদার্থতত্ত্ব শিক্ষার্থ কচিছেলেদের কি? ঐ প্রথম পৃষ্ঠাতেই আবার দেখুন, "জীবগণের আত্মা চৈতন্যময় বটে। কিন্তু উহারা জড়ময় দেহধারী, সুতরাং উহারা জড়চিৎ, এই উভয় ভাবাপন্ন"। ভো! ভো! ন্যায় কচকচি ঠাকুর! আপনাদের জ্বালায় শ্রাদ্ধের বাড়ীতে লুচি হজম হয় না আবার ছেলেদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান হজমে বাধা দেন কেন? আসল কথা এই যে, যে গ্রন্থ এই প্রকার দুর্ব্বোধ্য জটিল ভাষায় লিখিত,

তাহা কোন ক্রমে বালকদিগের হস্তে অর্পিত হইতে পারে না। মহেন্দ্র বাবুর পদার্থ-বিদ্যার যে কোন পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়ুন, দেখিবেন, হয়, তাঁহার ভাষা দুর্ব্বোধ্য ও জটিল, না হয়, অলঙ্কারের অতি সমাবেশে দুষ্ট। বিজ্ঞানের গ্রন্থ বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া একেই লোকে কত আপত্তি উপস্থিত করে, তাহার উপর যদি আবার ভাষার ছটা করিয়া বিজ্ঞান লেখা যায়, তবে আদৌ তাহা কাহারও পড়িয়া বুঝিবার সাধ্য থাকে না। আরও কথা আছে। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি প্রকাশ করিতে হইলে অতি সাবধানে ভাষা ব্যবহার করিতে হয়; নচেৎ এককথায় আর এক অর্থ বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্ত কোন ইংরাজপণ্ডিত কথনও বিজ্ঞানের গ্রন্থ সরল পরিস্ফুট ভাষায় ভিন্ন লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে মহেন্দ্র বাবু তাঁহাদের দুই এক ছত্র বাঙ্গালায় লিখিতে গিয়া, ভাষা সম্বন্ধে এতটা আদিমত্ত দেখাইতে গিয়াছেন কেন, বুঝিলাম না। দৃষ্টান্তস্থলে ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। 'বায়ু না থাকিলে কি উষাকালীন পরম রমণীয় শোভা, কি প্রদোষকালীন জলদপটলের নিরুপম কান্তি, কিছুই নয়নগোচর হইত না। বায়ু না থাকিলে কাদম্বিনীর ললাটদেশ সৌদামিনী রূপসিঁথিতে সমুজ্জলিত হইত না'' ইত্যাদি। আরো দেখুন; ১৫৭ পৃষ্ঠায় আছে, "কি মানব কণ্ঠ-সমুত্থিত অর্থসংযুক্ত সুস্পষ্ট বাক্য, কি পশুপক্ষী কণ্ঠ-বিনিঃসৃত অর্থবিরহিত অব্যক্ত ধ্বনি, কি জীমূতরাজি-সম্ভূত গভীর বজ্রনির্ঘোষ, কি প্রকাণ্ড মহীরুহ ভগ্নকারী বেগবান্ প্রভঞ্জনের ভীষণ নিঃস্বন, কি বায়ুকম্পিত মহাসমুদ্রের করালতম কল্লোল কোলাহল'' ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, এথানি কি পাঠশালার বালকদিগের জন্ত বিজ্ঞানের বই, না নভেল, না বক্তৃতা, না জ্যাঠামি? তাঁহার যদি মনঘটাছান্ন "বিদগ্ধজননী'' বাঙ্গালা লিখিবার ইচ্ছা ছিল, তবে বালকদিগের বই না লিখিয়া অনায়াসে একখানা "উহু, মরি" "গেলাম গেলাম'' বা "শশিরঞ্জ।'' নামের একখানি নভেল লিখিয়া সস্তামূল্যে বটতলায় ছাপাইলেই পারিতেন। আমাদের লজ্জা হয়, ঘৃণা হয়, যে বাবু সূর্য্যকুমার অধিকারী মহাশয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞান; বাবু যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সরল পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি ভাল ভাল গ্রন্থ থাকিতে এই পদার্থবিদ্যা শিক্ষাবিভাগের তালিকায় স্থান পাইয়াছে। এবারকার নিয়মানুসারে বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা স্বেচ্ছাক্রমে যে কোন পুস্তক ব্যবহার করিতে পারেন; সুতরাং বোধ হয় আর কেহ ইচ্ছা করিয়া এই কদর্য্য পুস্তক বালকদিগের ব্যবহারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

যদিও এই এক ভাষার দোষেই পুস্তকখানি অগ্রাহ্য হওয়া উচিত, তবুও আমরা পুস্তকের অন্যান্য কয়েকটী দোষেরও উল্লেখ করিব।

বিজ্ঞানের গ্রন্থে শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। যে শব্দ ঠিক যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা অন্যকোন অর্থে ব্যবহার করিতে গেলেই দোষ স্পর্শে। কিন্তু অমরকোষবিৎ বিদ্যারণ্য মহাশয় তাঁহার শব্দ জ্ঞানের প্রাচুর্য্য দেখাইবার জন্য বিজ্ঞানের সমুদয় কঠোর নিয়ম পদদলিত করিয়াছেন। চুম্বক—অয়স্কান্ত, অয়স্কর্ষক; চুম্বকের কবচ, অয়স্কান্ত সংরক্ষক; মহাকর্ষণ—সংকর্ষণ

বিপ্রকর্ষণ, বিকর্ষণ; বলযুগ্ম-বলদ্বন্দ্ব; প্রতিফলন, প্রতিক্ষেপণ, বিক্ষেপণ; পুরুষতাড়িৎ, স্বজতড়িৎ, পরতড়িৎ (Positive electricity); ইত্যাদি ইত্যাদি। বালকেরা বিজ্ঞান শিখিবে, না একটা কথার জন্য রাশি রাশি অমরকোষ মুখস্থ করিবে? যিনি ভাষা পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য প্রয়াসী, বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। বিদ্যা দেখাইতে গিয়া, স্থানে স্থানে আবার আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটাইয়াছেন। তিনি যেরূপ হওয়া উচিত তেমনি, বায়ু এবং বাতাসে প্রভেদ করিয়াছেন; অথচ স্থানে স্থানে উভয় শব্দই একার্থে ব্যবহার করিয়া গোল পাকাইয়াছেন। যথা, সংজ্ঞা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে "সচল বায়ুকেই বাতাস (wind) বলি"; কিন্তু আবার অন্যত্র ১২৮ পৃষ্ঠায় বাতাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০০ বলিয়া লিখিয়াছেন। একস্থানে, "গতির হারকে বেগ বলে"; অন্যত্র "তাঁহার পদদ্বয় বেগপ্রাপ্ত হইয়া চালিত হয়"; আবার অন্যত্র "সীসকের পরমাণু সকল হাতুড়ির বেগপ্রাপ্ত হইয়া বিকম্পিত ও উত্তপ্ত হয়।" একস্থানে (atom) অণু, অন্যস্থানে পরমাণু; আবার একস্থানে (molicule) পরমাণু অন্যত্র অণু। এমন একটি দুইটি শব্দ নয়, অনেক স্থলেই "গোশব্দে নানা অর্থ" ঘটাইয়াছেন। এরূপ দোষ বিজ্ঞানের গ্রন্থে সম্পূর্ণ অমার্জ্জনীয়।

এপর্য্যন্ত যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করা গেল, সেগুলি তাঁহার অন্যান্য দোষের সহিত তুলনায় সংসামান্যই বলিতে হইবে। তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকে বিজ্ঞানশাস্ত্র তাঁহার যতটুকু জানাছিল, তাহা বালকদিগের উপযোগী হউক আর নাই হউক, লিখিতে ছাড়েন নাই। সুতরাং অনেক বিষয়ের একত্র ঘেঁসাঘেঁসিতে কোনটাই ভাল ফুটিতে পারে নাই। দৃষ্টান্তস্থলে একটির উল্লেখ করি; তিনি নিমজ্জিত ও ভাসমান দ্রব্যের সাম্যাবস্থার নিয়মটি যেরূপে লিখিয়াছেন, তাহাতে সেটি একেবারেই বুঝাইতে পারেন নাই। তাহার পর তাঁহার গ্রন্থ লিখিবার পদ্ধতিটা পর্য্যন্ত দূষনীয়। সকল স্থানেই, প্রথম একটা সূত্র আওড়াইয়াছেন, তাহার পর তাহার ভাষ্য করিতে গিয়াছেন। এপদ্ধতিতে বিদ্যারণ্যের মধ্যে শেয়ালকাঁটা ভিন্ন অন্য কোন বৃক্ষ জন্মিবার আশা করা যায় না। ইহাতে কেবল বালকদিগের মস্তিষ্ক অযথা পীড়িত হয়, এইমাত্র। বিজ্ঞানে, প্রথম দৃষ্টান্ত ও ঘটনার সমাবেশ করা চাই, তার পর সিদ্ধান্তে স্থূল কথাটি লিপিবদ্ধ করা উচিত। সহজ কথা Inductive প্রণালীই বিজ্ঞানের পক্ষে একমাত্র উপযোগী। আমরা দেখিতেছি যে, কেবলমাত্র যোগেশ বাবুর সরলপদার্থ বিজ্ঞানে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে।

মহেন্দ্র বাবুর পুস্তকে আরও নানা প্রকারের ত্রুটী আছে, কিন্তু সেগুলি বলিবার আমাদের স্থানও নাই, সময়ও নাই। কেবলমাত্র তাঁহার গ্রন্থের রাশি রাশি ভুলের মধ্যে গোটাকতক তুলিয়া দেখাইয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। মহেন্দ্রবাবুর হাতে বৈজ্ঞানিক সত্যের এত গুরুতর অপলাপ ঘটিয়াছে যে, একজন বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে সাহস করিয়া এত অজ্ঞতা দেখাইতে পারেন, বিশ্বাস হয় না।

তিনি লিখিয়াছেন যে, জলীয় বাষ্পের

অপ্রত্যক্ষ গূঢ় তাপের পরিমাণ প্রায় ১৮০×৫.৪=৯৭২' ফা। এখানে উষ্ণতার অংশকে তাপ পরিমাণের একক করা হইয়াছে। এটা খুব নূতন আবিষ্কার নয় কি? ১৭৫ পৃষ্ঠায় আছে, "বাষ্পনিঃসরণ কালে কেবল (জলাদির) উপরিস্থ পরমাণু সকল বাষ্পাকার ধারণ করে, "জলের পরমাণু" (atom) আর সোনার পাথরের বাটি, একই কথা। বিদগ্ধজননার সম্পাদক নিউটন উপাধি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। আবিষ্কারের উপর আর এক আবিষ্কার দেখুন; ঐ পৃষ্ঠায় আর এক স্থানে আছে, "বায়ু নিষ্কাষণ যন্ত্রে কিঞ্চিৎ ইথর নামক এক প্রকার অতি তরল দ্রব দ্রব্য স্থাপন করিয়া বায়ু নিষ্কাষণ করিলে এরূপ প্রবল বেগে বাষ্পনিঃসরণ হইতে থাকে যে, অনতিবিলম্বেই উহা ফুটিয়া উঠে"। এখানে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বিশেষ গোল করিয়াছেন, দেখিতেছি। এরূপ গোলযোগ এ পুস্তকে রাশি রাশি। মহেন্দ্র বাবুব আবিষ্কারেব আর গোটা কতক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই এ সমালোচনা শেষ করিতে চাই। ১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বায়ু নিষ্কাষণ যন্ত্রের আবরণ পাত্র মধ্যে অতিশয় উগ্র গন্ধকদ্রাবক পূরিত কোন পাত্রের উপর একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রশস্ত মুখসম্পন্ন পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া আবরণপাত্রের অন্তর্গত বায়ু নিষ্কাষণ করিলে অভ্যন্তরস্থ জল হইতে বায়ু উঠিতে উঠিতে নিম্নস্থ দ্রাবক দ্বারা পরিশোধিত হয়; ইহাতে প্রবল বেগে বাষ্পোদ্গম হইতে থাকে। জল হইতে বাষ্প না উঠিয়া যাহার প্রভাবে বায়ু উঠিয়া জল বায়ুতে পরিণত হয়, তিনি বায়ুগ্রস্ত বটেন।

আর প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, টোল এবং কলেজের মিশ্রণে কি এক অভূতপূর্ব্ব; বালক-মস্তিষ্ক-ভক্ষণ-কারিণী পদার্থ-বিচার সৃষ্ট হইয়াছে।

ইহার পুস্তক ছাড়িয়া যোগেশ বাবুর কিম্বা সূর্য্য বাবুর পুস্তক বিচাব করিয়া দেখিলে অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে, সে গুলি কতদূর উপযোগী। সর্ব্বাংশে তুলনা করিতে গেলে বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের সরল পদার্থ বিজ্ঞান সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **ত্রিধারা।**—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য ১৲। একথা কেহ শুনে নাই, শুনিবার কেহ ছিলনা, তখন আকাশ ও ধরণী নীরব, বিহঙ্গ বা মানব জন্মে নাই, গাহিবে কে? তখন লতাপল্লব হয় নাই; পাষাণে সেহালা জড়ায় নাই। সেই দিন অতি প্রাচীন দিনে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের মধ্য ক্ষেত্রে, বিশাল ব্যাপিনী ধরণী, তারকা-খচিত নীলাম্বর, আঁধার-প্লাবিত পাতাল মধ্যক্ষেত্রে সহসা উচ্ছাস উঠিল, ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ হইল, সপ্তর্ষি চমকিত হইল, বাণী-স্ফুরিতা তারকাগণ অনিমেষে চাহিয়া রহিল। অনন্ত বিদীর্ণ করিয়া এক অতুল উৎস নির্গত হইয়া শ্বেত, নীল, শ্যাম ধারায় স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল

পবিত্র ও প্লাবিত করিল।' বেদগানে জগত সেই শুভদিনের মঙ্গল ঘোষণা করিয়াছিল। ইহারই নাম ত্রিধারা। পবিত্র নামে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ত্রিপাদে বিশ্ব পরিপূরিত, বলীর আর স্থান নাই। ত্রিপথ ও ত্রিপাদে ভিন্ন কি?

আলোকে ক্ষুদ্রতার পরিচয় হয়, আঁধারে ক্ষুদ্রতা লুকাইয়া যায়। বহ্ম মুহুর্ত্তে গায়ত্রীর জন্ম। কুরুক্ষেত্রের সমরকোলাহলে, ধূলী-মেঘে পাঞ্চজন্য নির্ঘোষে ভগবদ্‌গীতার অভ্যুদয়। নীল অনন্তে বিষাদের গোধূলী ছায়ায় ত্রিধারার উৎপত্তি। বিধুরের অশোক-ছায়ায় শান্ততপোবনে বাল্মিকী শিষ্যের নিকট রামায়ণ রচনা করিতেন, সুরধূনীর পবিত্র সলিলে স্নানপূত হইয়া কৌষেয় পরিধান করিয়া বীণা হস্তে বাল্মিকী শুভ্র-কেশ শুভ্রবেশ শান্ত অশোক তলে যে দিন রামায়ণ গান করিয়াছিলেন, ভারতের সে কি দিন ছিল? শোকশান্ত হৃদয়ে বিষাদের গোধূলী ছায়ায় চন্দ্রনাথ আরম্ভ করিলেন দুইটী ধারা, চক্ষু দিয়াও একটী মুখ পবিত্র করিয়া বাহির হইল। ত্রিধারার সূচনা এইরূপ।

"যাদু! এখন কোথায় আছ? ঠিক জানিনা। যেথানেই থাক, আশীর্ব্বাদ করি এবার দীর্ঘজীবী হইও"। ভৈরবরাগে গায়ত্রী আরম্ভ হইল।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শ্বাশ্বতীসমা" কোথায় ক্রৌঞ্চ মিথুন? কোথায় প্রাণপুতলি? হৃদয় স্তম্ভিত হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, নয়নে ধারা বহিল, আমিও কাঁদিয়া ডাকিলাম "যাদু! এখন কোথায় আছ, ঠিক জানিনা" সপ্তর্ষিমণ্ডলে ত্রিধারার উৎপত্তি গীত হইবে। এমন দেব মন্দিরের আবৃত আলোকে ক্ষুদ্রতা ধরিবার সামর্থ্য সমালোচকের নাই। শান্ত পবিত্র হৃদয়ে এখানে প্রবেশ করিতে হয়।

২। মানসী।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ২৲। সৌন্দর্য্য-অনুভাবকতা এবং অনুভাবনা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে কেহ কবি হইতে পারে না। এই দুটী থাকিলেই যে কবি হওয়া যায়, সে কথা বলি না। কিন্তু এ দুটী প্রধানতঃ আবশ্যক, তাহাই বলা হইল।

যেখানে আমার চক্ষে কিছুই সুন্দর দেখায় না, কবি সেখানে সৌন্দর্য্য দেখেন, এবং আমাকে দেখাইয়া দেন। তাঁহাকে সাক্ষী করিয়া মরুভূমে জল মিলে, আঁধারে আলো দেখি, দিনে জ্যোৎস্না ফুটে, বোবায় বলে। সৌন্দর্য্য-অনুভাবকতা শক্তি বহু দর্শন, তীক্ষ্ণ দর্শন বা ইন্দ্রিয়-প্রখরতার ফল নহে, এ শক্তি স্বভাব-সিদ্ধ। সাধনায়ও লাভ করা যায়, কিন্তু সে শক্তি উচ্চ অঙ্গের নহে।

বর্ণনা শক্তি সাধনা-সিদ্ধ। টেনিস্ বা ক্রিকেট খেলা যেমন অঙ্গের জি, মনাষ্টিক, বক্তৃতা করা তেমনি জিহ্বার জি, মনাষ্টিক, লিখিবার ক্ষমতা তেমনি অঙ্গুলীর জি,মনাষ্টিক, চেষ্টা করিলে সকলেই শিখিতে পারে। এই জন্য লিখিবার গুণে অনেক অকবি কবি নামে কিয়দ্দিনের জন্য লোকসমাজে পরিচিত হয়! সৌন্দর্য্য-অনুভাবকতা শক্তি, অর্থাৎ কবি-কল্পনা-সত্বে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা অভাবে অনেকের নাম কেহ জানিতে পারে নাই। কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি একাধারে দুর্লভ। যাঁহার আছে, তিনিই প্রকৃত কবি।

কাব্য কেবল পদ্য বা গদ্যময় প্রবন্ধ নহে। চিত্রাঙ্কন,ভাস্করাদি কারুকার্য্য সুললিত কাব্য। কিন্তু চিত্রকর ও ভাস্করাচার্য্যের

অপেক্ষা কবির ক্ষমতা কিছু উচ্চাঙ্গের। বর্ণ, যন্ত্র বা প্রস্তরাদি বহিঃ সাধনাও অন্যের সহায়। বায়ুময় বাক্য সহায়ে কবি জগতের রাজা। যন্ত্র বিনা গান, বর্ণ বিনা চিত্র করিবার ক্ষমতা তাঁহার। এ জন্য কবিকে দেবতা শ্রেণীতে গণ্য করা হইয়াছে।

কবির রুচি অনিন্দনীয়। নাগরিকতা তাঁহার লক্ষণ। দেহ পরিচ্ছন্ন, বেশ পরিচ্ছন্ন, ব্যবহার পরিচ্ছন্ন, ভাব পরিচ্ছন্ন, ভাষা পরিচ্ছন্ন। স্থূলতা, অমসৃণতা, অনুপযোগিতা গ্রাম্যতার লক্ষণ। গ্রাম্যের প্রকৃতি, সংযমনশূন্য, ভাষা স্থূল, ভাব স্থূল, ব্যবহার স্থূল। পার্ব্বতীয় নদীর মত কবি কল্পনা উচ্ছ্বাসময় নহে। ধীর স্থির মন্দগতি মনমোহনশ্যামের বাঁশীর মত মিষ্ট, অনুচ্চ, অনধীর, বসন্তের বায়ু।

তাই বলিয়া সে শক্তি অক্ষম নহে; ইচ্ছা করিলে জীমূত-মন্দ্র পবাজয়ে প্রবীণ, শূলের ন্যায় তীক্ষ্ণ, টঙ্কারে জগত আতঙ্কে কম্পিত করে। যাহার ক্ষমতা আছে, সে বিনীত, শূন্য কুম্ভ শব্দায়মান। এজন্য মধুরতা কবিকল্পনার স্বাত্বিক লক্ষণ। ইচ্ছা করিলে কবি হাস্যাত্মক, শোকাত্মক বা বীর্য্যাত্মক কাব্য রচনা করিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃতি-বিশেষই নাগরিক বা কবির লক্ষণ নহে।

অল্পবয়সে রবীন্দ্রনাথ সুকবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি উচ্চাঙ্গের এবং রুচি পরিচ্ছন্ন। এখনও তিনি এমন কোন কাব্য রচনা করেন নাই, যাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহার বয়স অল্প। এখন তিনি বৃন্দাবনের বনে বনে বাঁশী বাজাইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার কবিতাগুলি ক্ষণকালের জন্য মনোমুগ্ধ করে;. অথচ প্রকৃতির প্রতি-শোধে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যে, স্থায়ী কবিতা লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার অনতীত নহে। একটু প্রবীণতা হইলে উচ্চাঙ্গের স্থায়ী কাব্য তাঁহার নিকট আমরা আশা করি। রবিচ্ছায়া ও ভানুসিংহের পদাবলী তাঁহার গীতিকাব্য রচনা করিবার অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যে কবিতা গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বালকত্বের কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছিল। ফিডিয়াস যে কল্পনায় সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সাহস করিয়াছিলেন। উলঙ্গিনী রমণী বা যুবতীর স্তন চিত্র করিবার শক্তি কয় জনের আছে? চুরি করে চাওয়ার মধুরতা রবীন্দ্রনাথ জানেন। অথচ যাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, আতঙ্কে দেবদূত পক্ষপুটে চক্ষু আবরণ করেন, সাহসে রবীন্দ্রনাথ তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন দেখিয়া আমাদের মনে শকুন্দমনের সিংহশিশুর দন্ত দর্শনের চেষ্টা মনে পড়িয়াছিল; বুঝিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথ শিশু হইলেও বীরশিশু বটে।

মানসীতে সেরূপ বালকত্বের আভাস পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু অন্য লক্ষণে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ এখনও পূর্ণ-প্রবীণতা লাভ করিতে পারেন নাই। মানসীর অধিকাংশ কবিতা সরস, উজ্জ্বল, মনোহর। কিন্তু কয়েকটীতে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইবার সম্ভবনা নাই। এগুলি মুদ্রিত না করিলে ভাল হইত। মানসীতে কোন নূতন শক্তি প্রকাশ পায় নাই। কোন কোন কবিতায় অন্য কবির ছায়া পড়িয়াছে। তাঁহার কল্পনায় এত মৌলিকতা আছে যে, এ ঋণের

তাঁহার কোন আবশ্যকতা ছিল না। এবং মূল কবিকে যখন তিনি অতিক্রম করিতে গিয়াছেন কুই, তখন এরূপ ঋণে দ্বিবিধ দোষ-স্পর্শ করিয়াছে।

এইরূপ কয়েকটী সামান্য দোষ উপেক্ষা করিলে মানসীকে মুক্তমালা বলিয়া পরিচয় দিতে আমাদের সঙ্কোচ হয় না। প্রণয়ের সরসক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আনন্দ কুর্দ্দন, বিষাদের ছায়া প্রতিফলিত করিতে তিনি পারদর্শী, স্বভাবের শোভা তাঁহার চিত্র-ফলকে ঝল্‌মল করে, ব্যঙ্গের তীব্রতায় মর্ম্ম-ভেদ হয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর আদরের ধন। মানসী যে ভাবুক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, আমাদের সন্দেহ নাই।

স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলে রসভঙ্গ হয়। সমগ্র গ্রন্থ না পড়িলে কবির বহুধা কল্পনার পরিচয় পাওয়া যাইবে না। সুতরাং কোন স্থানই উদ্ধৃত করিলাম না।

৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত— কবিতাবলী মূল্য ।৵০, স্ত্রী জাতি মূল্য ৵০, ভারতভিক্ষা মূল্য ৵০, দেশানুরাগ মূল্য ।৵০, ভারত-সঙ্গীত মূল্য ।০ আনা। এ সমস্ত-গুলিই পুরাতন জিনিস নূতন ছাঁচে ঢালা। হেম বাবুর কবিতার নূতন করিয়া সমা-লোচনা করা বাহুল্য। সকলগুলি পুস্তকই উচ্চাঙ্গের কবিত্বে পূর্ণ, তথাচ পাঠককে বিশেষ করিয়া অনুরোধ, "ভারত সঙ্গীত" এবং "স্ত্রীজাতি" বারবার পাঠ করুন। "বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে" ইহার ন্যায় উদ্দীপনা ও আবেগময়ী কবিতা বঙ্গভাষায় আর একটিও নাই। লুপ্ত-গৌরব পরপদ-দলিত ভারতবাসীর দুর্ব্বল প্রাণে এই কবিতা বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত করে। নিত্যঃ পাঠ করিলেও ইহার নূতনত্ব বা সরসত্ব দূর হয় না। স্ত্রীজাতি নামক পুস্তক-খানি তাঁহার উদার হৃদয়ের আয়ের ভাবার প্রতিচ্ছায়া।

৮। জাতীয় সম্মিলনী—শ্রীসানুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১৬৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। এখানিও ক্ষুদ্র সঙ্গীত পুস্তক। কলিকাতার বিগত জাতীয় সমিতি অধিবেশনের বিষয় লইয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। দেশীয়দিগের প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, প্রজার প্রার্থিত বিষয় এবং পার্লিয়ামেণ্টের প্রসঙ্গ ইত্যাদি জটিল রাজনৈতিক কথা লইয়া কবিতা লেখা অতিশয় কঠিন। তাহাতে গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তিরও বিলক্ষণ অভাব আছে। এ অবস্থায় পদ্য না লিখিয়া গদ্য লিখিলে গ্রন্থকার সম্ভবতঃ সফলকাম হইতেন।

৯। প্রবন্ধ-পাঠ।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ, প্রণীত। এই পুস্তকে নৈতিক ও ঐতি-হাসিক এবং জীবন-বৃত্ত বিষয়ক ১৯টি প্রবন্ধ আছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বিদ্যালয়ের বালক ও বালিকাগণের পাঠোপযোগী করিয়া 'প্রবন্ধ-পাঠ' লিখিত হইল।" আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, গ্রন্থকারের এই সাধু উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা ভাব-ময়ী ও শ্রুতিমধুর, প্রবন্ধগুলি সুরুচিসঙ্গত এবং শিক্ষাপ্রদ; এবং বর্ণনা সংক্ষিপ্ত এবং লিপি-চাতুর্য্য পূর্ণ।

১০। দেবীপূজা।—কোঁচবিহার ইউ-নিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। এই পুস্তকে কোঁচ-বিহার রাজ্যের রাজকীয় দুর্গোৎসবের বিবরণ এবং দেবীপূজার পৌরাণিক ও

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছে। আধ্যাত্মিক দুর্গামূর্ত্তি পৃথিবীর নানা দেশীয় ও নানা জাতীয় সাধকের হৃদয়ে বিশ্বজননী-রূপে সম্পূজিতা হইতেছে; বঙ্গদেশের মৃণ্ময়ী দেবীর রাজত্ব বিনাশ হইয়া আসিতেছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার লেখক ধর্ম্মচিন্তা ও লিখিবার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

১১। মীরাবাই।—শ্রীশরচন্দ্র সরকার প্রকাশিত, রাজসাহী প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ৵০ আনা। এখানি ঐতিহাসিক পদ্য গ্রন্থ। মীরাবাইর পবিত্র জীবন লিখিলেই যে গ্রন্থ সুখপাঠ্য ও ভাবব্যঞ্জক হইবে, তাহা ভুল। এরূপ পুস্তক বঙ্গযন্ত্রালয় হইতে প্রসূত না হওয়াই প্রার্থনীয়।

১২। পাঠকুসুম।—শ্রীবিহারীলাল গুহ রায় প্রণীত। ৬৪ নং কলেজষ্ট্রীট, দাস গুপ্ত কোং দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য।৵০ আনা। এখানি বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী পুস্তক। এ পুস্তকে বালক বালিকাদিগের প্রীতিকর কয়েকখানি চিত্র এবং পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধ আছে। কবিতাগুলি প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে। লেখকের প্রকৃত কবিত্ব শক্তি আছে। গদ্য প্রবন্ধগুলিও মন্দ হয় নাই।

১৩। বিষাদ-সঙ্গীত।—শ্রীবিহারীলাল মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। অনুরাগের স্তর ভেদ করিয়া কবির মনশ্চক্ষু বিষাদের অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যেখানে আকাঙ্ক্ষা নাই, আশা নাই, আলোক নাই, কবি সেই ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া নৈশ সংগীততান ধরিয়াছেন। কবির নৈপুণ্য অসাধারণ।

১৪ পরিণয় সংস্কার।—৫৫ নং কলেজষ্ট্রীটস্থ শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। বিবাহ সম্বন্ধীয় অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লইয়া এ পুস্তক রচিত হয় নাই। কতকগুলি অনাবশ্যকীয় বিষয়ে গ্রন্থ পূর্ণ। সুতরাং আমরা এ প্রকার পুস্তক প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করিলাম না।

১৫। গীত-পঞ্চ।—শ্রীচন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক সংগৃহীত। ঢাকা আরমানীটোলা শ্রীলছমন বসাক কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। বাবু চন্দ্রনাথ রায় ঢাকার একজন বিখ্যাত গায়ক। সংগৃহীত সঙ্গীতগুলিতে দেশ-হিতৈষণা ও জাতীয় ভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সঙ্গীতগুলি সুললিত হইয়াছে।

১৬। চিন্তানল।—শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ২১১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট কে, সি, দত্ত দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা। এখানি আসামী ভাষার জাতীয় কবিতা। আসামের ভাষা আমাদের অনায়ত্ব; কিন্তু যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, কবিতাগুলি ভালই হইয়াছে। আসামী ভ্রাতাগণের নিকট এ পুস্তক খুব আদৃত হইবে।

১৭। সতীর পতিভক্তি বা সাবিত্রী চরিত।—শ্রীমতিলাল দত্ত প্রণীত। ৬/১ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন বি, বি, দে দ্বারা প্রকাশিত। এ পুস্তকের ছাপা ও বাঁধান উভয়ই পরিপাটী। বিষয়টীও ভাল।

১৮। অভিলাষ কুসুম।—শ্রীবিনয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। এখানি কবিতা পুস্তক। ছাপা অতি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকের স্থানেং কবিত্ব শক্তির সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন।

এ বৎসরের অন্যান্য পুস্তক আগামী মাসে সমালোচিত হইবে। এ মাসে স্থানাভাব।